আনন্দমেলা
পূজাবার্ষিকী ১৩৮৬
পুজো
আমরা সবাই

একদা শ্রীযদুপতি
সঙ্গে নিয়ে রাধাসতী
যমুনাতে করিল গমন
অকস্মাৎ শ্রীরাধার
ছিঁড়িল মোতির হার
অর্দ্ধেক পাইলা নারায়ণ
তেহাই পড়িল জলে
মাসভাগ রইল গলে
পক্ষভাগ পেল শিশুগণ
অবশিষ্ট বিংশতি
তাহা পেল রাধাসতী
কত মুক্তা করহ গণন
এম পি জুয়েলার্স
এণ্ড কোং
বিশাল ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রহরত্ন ও
বৃহত্তম জ্যোতিষ সংস্থা
১ বিবেকানন্দ রোড
(চিৎপুর জংশন)
কলিকাতা-৭০০০০৭
ফোন ঃ ৩৩-১৭৭১
৩৩-৫৭৬৫
২১২ রাসবিহারী এভিনিউ
গড়িয়াহাট মার্কেট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭০০০১৯
ফোন ঃ ৪৬-৮১৩৯
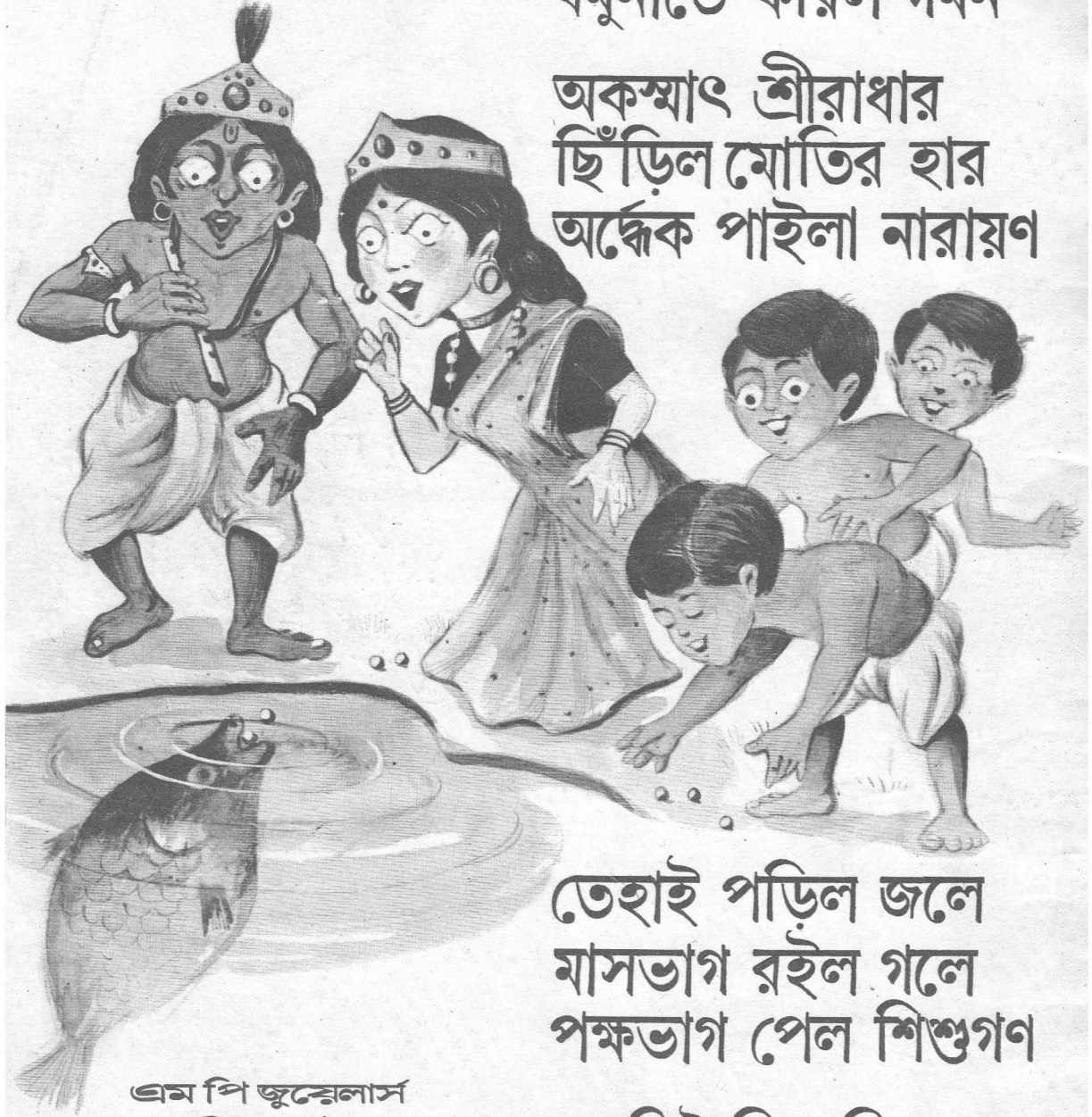
উৎসবের আনন্দ উজ্জ্বল দিনে মৃদু সৌরভের পরশ

কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেলের তৈরী

Dey's

PX/K-P 1/79

HMV

হরলিক্‌স

Horlicks
THE IDEAL FOOD DRINK

রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্য পুষ্টি যোগায়। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

হরলিক্‌স নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার পরিবারের পুষ্টিবৃদ্ধি ক'রে প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যবান রাখবে।

হরলিক্‌স···একমাত্র জিনিষ যা সারা বিশ্বের ডাক্তাররা সুপারিশ করেন। এটি হ'ল একমাত্র বস্তু. যো আপনাকে এত বেশী পুষ্টি যোগাতে পারে; কারণ, অতুলনীয় হরলিক্‌স-পদ্ধতিতে এর মল্যবান সুস্বাদু উপাদানগুলি সংমিশ্রিত হয়ে, এর স্বাভাবিক সৎগুণগুলি অপরিবর্তিত রাখে এবং সহজেই হজম হয়।

সেইজন্যেই সুচিত্রা তার পারিবারিক জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, হরলিক্‌সকে। সে জানে, হরলিক্‌স সকলের স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ।

সুচিত্রার মতই আপনার পরিবারের সকলকে প্রতিদিন হরলিক্‌স খেতে দিন এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি লক্ষ্য করুন।

"হরলিকস পুষ্টির মূল উৎস। এটি বছরের পর বছর সুস্থ-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

হরলিক্‌স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Hx1548-B-2

আনন্দমেলা

পূজাবার্ষিকী ১৩৮৬

বিশেষ রচনা

উপন্যাস

বড় গল্প

ভ্রমণ-কাহিনী

চিত্র-কাহিনী

জঙ্গলের গল্প

গোয়েন্দা-কাহিনী

গল্প

কবিতা ও ছড়া

খেলাধুলো

পরীক্ষার্থীদের জন্য

রচনা-বিচিত্রা

প্রচ্ছদ বিমল দাস

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

গোপন মানিক

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধরাতলে অতল তলে
        গোপন করা মানিকখানি
নীল আঁধারে আড়াল করা
        লুকিয়ে আছে আলোর খনি।
ফণীর ফণা আগলে আছে
        চন্দ্ররেখা চম্পাকলি
অকূল পাথার ঘিরে আছে
        রাতুল সোনার কমলখানি
সন্ধানিয়া রাজার ছেলে
        মানিক খোঁজে দেশে দেশে
খোঁজে সে সাগরতীরে একলা এসে
খুঁজে সোনার চাঁপায়—
        সাতভাই সপ্তসাগর পারায়—
পায় কি না পায় সন্ধানি
        কী জানি—কী জানি।

ছবি বিমল দাস

রবীন্দ্রনাথের লেখায় বর্ণপরিচয়

চিত্তরঞ্জন দেব

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত একটি মূল্যবান রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির (ফোটোকপি) পাতায় রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা দুটি মজার ছড়া পাওয়া গিয়েছে। পাণ্ডুলিপির মলাটে রবীন্দ্রনাথের নামের পরে ১৮৮৯ সাল লেখা আছে। কিন্তু ভিতরের রচনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা। আমাদের আলোচ্য ছড়াগুলির রচনাকাল ১৮৯৫ বলেই আমাদের অনুমান। প্রথম ছড়াটির একটি পাঠান্তর অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়। উক্ত তিনটি ছড়ার কোনোটিই কোথায়ও প্রকাশিত হয়নি। বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়ের অনুমতিক্রমে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষমহাশয়ের আনুকূল্যে ছড়াগুলি এখানে প্রকাশিত হল।

(১)

দুই বাবু অ আ বসে খায় হাওয়া
দুই বিবি ই ঈ শীতে কাঁপে হী হী
দুই বুড়ি উ ঊ কাঁদে বসে হু হু
দুই বুড়ো ঋ ৠ চলে ধীরি ধীরি
দুই বোন ঌ ৡ হাসে খিলি খীলি
দুই ভাই এ ঐ হেঁকে বলে দে দৈ
গুটি সুটি ও ঔ বসে আছে দুই বৌ

(২)

কানে কানে অ আ
করে বলা কওয়া
কোণে বসে ই ঈ
শীতে করে হী হী
শুয়ে শুয়ে উ ঊ
করে শুধু হু হু
খেতে বসে এ ঐ
হেঁকে বলে দে দৈ
খেলা করে ও ঔ
কিনে এনে বেনে বউ।

(৩)

ক কাঠে কাঠ খ খায় খই
গ গায় গান ঘ ঘুমোয় ঘরে
ঙ করে উঁ আঁ
তার চোখে লাগে ধুয়াঁ।
চ চড়ে চালে ছ ছেঁড়ে ছাতা
জ জড়ায় জাল ঝ ঝাড়ে ঝুলি
কুকুরছানা ঞ
কাঁদে ইঁয় ইঁয়।
ট টানে টিকি ঠ ঠেলে ঠিকই (?)
ড ডোবে ডোবায় ঢ ঢোকে ঢাকে
ণ বলে শোনো
আমি মূর্দ্ধন্য ণ।
ত তোলে তেঁতুল থ থাকে থামে
দ দোলে দোলায় ধ ধোয় ধুতি
ন বলে শোন্ ত
আমার নাম দন্ত্য।
প পড়ে পাঁকে ফ ফেলে ফল
ব বেড়ায় বনে ভ ভাঙে ভাঁড়
ম বলে মামা
আমায় মাচা থেকে নামা।
য যায় যশোরে র রাঁধে রাস্তায়
ল লাগায় লাঠি ব বাজায় বীণা
শ ষ স তিন ভাই
শোনায় সানাই।
হ হাঁচে হক্ক ক্ষ কাশে খক্ক

উদ্‌ধৃত ছড়াগুলি যে নিছক ছড়া নয়, ছড়ার আড়ালে যে লুকিয়ে আছে অ আ ই ঈ প্রভৃতি ১৪টি স্বরবর্ণ, এবং ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ সে-কথা সহজেই বোঝা যায়।

এবার আমাদের প্রশ্ন—বিরাট রবীন্দ্রনাথ কেন এই ছোট্ট বর্ণপরিচয় লিখলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের মনে পড়ে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। তাঁর সঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একটি ভাবের মিল আছে। এঁরা উভয়েই এঁদের কর্মের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে মানুষের শিশুকে প্রকৃত মানুষ করে তোলার ব্রত গ্রহণ করে শিশুশিক্ষার বই রচনা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণপরিচয় দিয়ে শিশু-রবির পড়া শুরু হয়, বিদ্যাসাগরের স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবনের কয়েকদিন কাটে। শিশুকালের অনেক কথা রবীন্দ্রনাথ ভুলেছিলেন, কিন্তু ভোলেননি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের ৩য় ও ৮ম পাঠে লেখা 'জলপড়া পাতা নড়া'র ছন্দটি। চার বছরের কম বয়সের সেই অবিস্মরণীয় আনন্দের মুহূর্তটিকে তিনি উজ্জ্বল করে রেখেছেন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে লেখা জীবনস্মৃতির পাতায়। বলেছেনঃ

"কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে', এইটেই আমার জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন
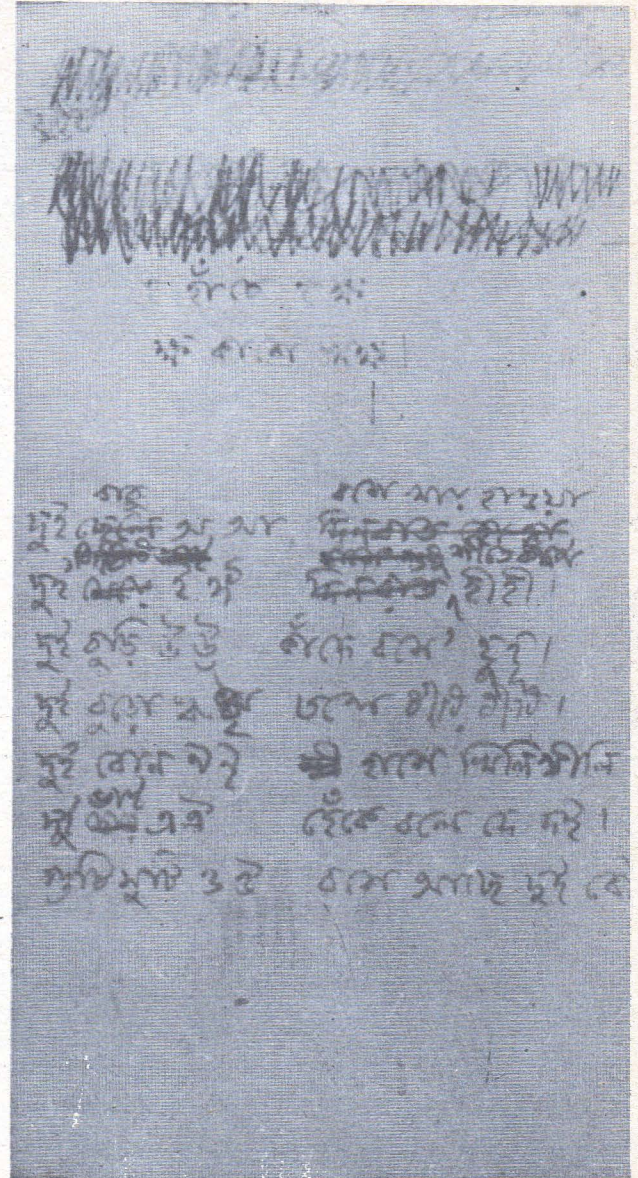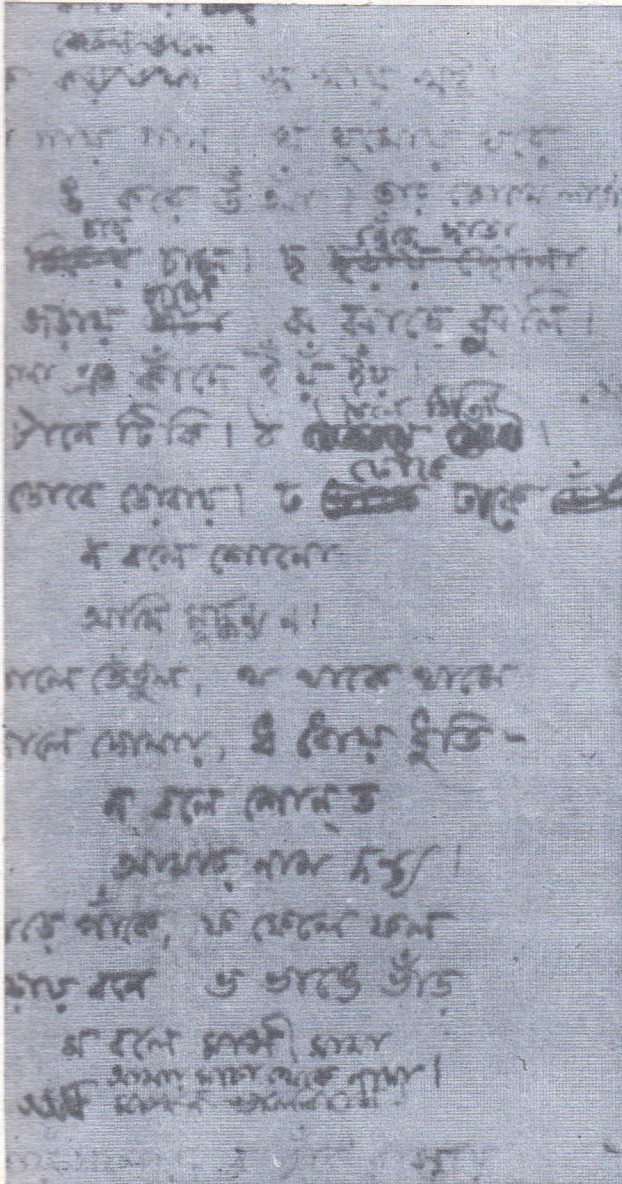
মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' বইখানি ছন্দে রচিত নয়, তবু তার মধ্যে ছন্দ লুকিয়ে ছিল শিশু-রবির জন্য; সেই ছন্দের ঝংকারে নেচে উঠেছিল শিশুর মন। সেদিনের সেই মুহূর্তের আনন্দ তিনি সঞ্চিত রেখেছিলেন তাঁর জীবনের অমৃত ভান্ডারে। সেই আনন্দের ভাগ দিতে চাইলেন পরিণত বয়সে তাঁর নিত্য-প্রিয় শিশুদের। বর্ণপরিচয়ের সূত্র ধরে যে-আনন্দ তাঁর হৃদয়ে পৌঁছেছিল নূতন বর্ণপরিচয় লিখে সেই আনন্দকে তিনি ধরে রাখতে চাইলেন জগতের শিশুদের জন্য। বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়ের আরম্ভে ছিল ৪৮টি নিঃসঙ্গ বর্ণ, মাঝখানে ছিল 'কর খল' প্রভৃতি 'বানানের তুফান', শেষদিকে ছিল 'জল পড়া পাতা নড়ার' ছন্দ ও তার আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ তেমনি ছন্দের আনন্দ নিয়ে আসতে চাইলেন তাঁর লেখা নূতন বর্ণ-পরিচয়ের আরম্ভে। ৪৮টি বর্ণের একটিকেও নিষ্প্রাণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখলেন না। সঙ্গী দিয়ে প্রাণবন্ত করলেন প্রত্যেকটি বর্ণকে। তাঁর লেখা বর্ণপরিচয়ের পড়ুয়াকে আর চেঁচিয়ে বার বার মুখস্থ করতে হবে না—অ, আ, ই, ঈ,......ক, খ, গ, ঘ। সে এখন মনের আনন্দে ছড়া আওড়াবে—

দুই বাবু অ আ বসে খায় হাওয়া
দুই বিবি ই ঈ শীতে কাঁপে হী হী......

উদ্ধৃত এই ছড়াগুলি (১, ৩) রচনার পঁয়ত্রিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত পুস্তকের আরম্ভেও দেখা যায় বর্ণপরিচয়েরই ছড়া—

ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখেনি সে কথা কওয়া···

কিন্তু, ভাবের দিক দিয়ে এক হলেও ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে সহজপাঠের লেখা ও পাণ্ডুলিপির অপ্রকাশিত লেখা এক নয়; তবু অপ্রকাশিত তিনটি বর্ণপরিচয়ের ছড়া সহজপাঠেরই সূচনা বলে মনে হয়।

ছোটদের আসরে

সুনির্মল বসু

যোগ দাও ছোটদের যারা ভালবাসো রে
এসো এসো সবে ভাই
দূরে কেন রবে ছাই
একসাথে সকলেই আনন্দে ভাসো রে
ছোটদের আসরে।

এ আসরে চিরদিন জমকালো বড় যে
নবরসে চিরকাল ছবি নবতর যে
তাজা তাজা কাঁচা প্রাণ
হাসে আর গাহে গান
হেথা এলে চলে যেতে মন আর না সরে
ছোটদের আসরে।

নাহি ভান ভণ্ডামি আসরের মাঝারে
কোলাহল করে শিশু হাজারে ও হাজারে
নাচে তা-তা থৈ-থৈ
করে তারা হৈ-চৈ
স্বর্গের ভাবধারা আনে তারা ভূলোকে
নিখিলের মধু যত ঢেলে দেয় কু-লোকে।
যাহাদের প্রাণ নাই
ঝরে শুধু কান্নাই
এসো তারা যোগ দাও উৎসব-বাসরে
ছোটদের আসরে।

প্রাণহীন পাবে প্রাণ, পাবে নব চেতনা
পাবে তারা পরিতোষ যারা কভু পেত না
মুখ যার ভার-ভার
বলি তারে বার-বার
উৎসাহে নাচো আর উল্লাসে হাসো রে
ছোটদের আসরে।

ছবি সুধীর মৈত্র

লিচুফল টক

অন্নদাশঙ্কর রায়

রাজার মালি মেহের আলি,
লোকটি তুমি ভাল,
ফুলে ফলে ভরা তোমার
বাগানটি জমকালো,
ওরই ভেতর একটি ফল
আমাকে চমকাল।

এদেশে কেউ পায় না খেতে
মেলে না বাজারে,
খেতে চাইলে যেতে হবে
বেঘোরে বেহারে,
রাজার গাছে পেকে আছে
ঘন পাতার আড়ে।

রাজার মালি, মালির রাজা
ঘুরছি তোমার পিছু
ওই ফলটি খেতে পেলে
আর চাইনে কিছু।
পেড়ে নিতে দাও না, চাচা,
একটি শুধু লিচু।

একটি শুধু লিচু, খোকা,
এক টুকরো সোনা,
একটি গাছে ক'টি আছে
সবই আমার গোনা,
একটি শুধু নিতে পারো
তার বেশি নিয়ো না।

এ-লিচুটা মিঠে নয়
নয়কো শাঁসালো,
আর-একটা পেড়ে খাই,
মালিটি কী ভাল!
এটাও তো টক, বলতেই
তক্ষুনি তাড়াল!

চোর! চোর! দৌড়! দৌড়!
মিটল আমার শখ
যাকেই দেখি তাকেই বলি,
লিচুফল টক।
লিচু কিন্তু মিষ্টি ছিল,
বাকিটা নাটক।

ছবি সুধীর মৈত্র
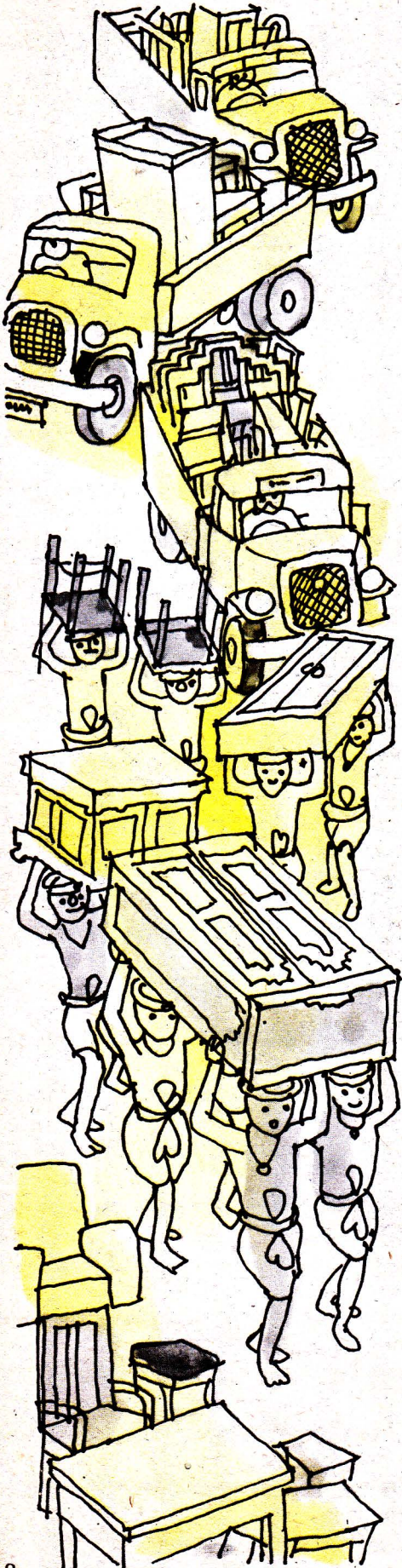
কেঠোভূত

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিলেম থেকে তিনকড়ি রায় কিনলে যখন ঝোঁকের মাথায়
শস্তা দরে টেবিল খাট আলমারি
কৌচ কেদারা—তিন লরি মাল, তখন বাবুর হয়নি খেয়াল
ধরবে কোথায় সেইগুলি তার বাড়ি।
দশটা কুলি হুড়মুড়িয়ে অন্দরে সব ঢুকিয়ে দিয়ে
বিদায় নিল, রাত্রি তখন ন'টা।
গুছিয়ে রাখার হয়নি সময়। (বুদ্ধিমানের মতিভ্রম হয়)
পাহাড় প্রমাণ আসবাবেদের ক'টা
থাকবে কোথায় কেমন ভাবে ভাবতে কিছু সময় যাবে ;
অগত্যা সব ঘরেই গাদায়-গাদায়
রইল ; রাতে দেখছে কে আর ? টেবিলগুলোয় চড়ল চেয়ার,
'টি-পয়'গুলো আলমারিদের মাথায়।
তক্তপোশ আর সিন্দুকেরা ('ফোঁপরা' বলে নিন্দুকেরা)
তিনপুরুষের মৌরসি পাট্টাতে
ছিলেন যাঁরা প্রতিষ্ঠিত, বললে পরেই তক্ষুনি তো
যায় না ফেলা, অগত্যা সব ছাতে
হলেন জড়ো। শোবার ঘরে পরী-বাহার পালঙ্করে
সরিয়ে দিয়ে মেট্রোপ্যাটার্ন জোড়া
সাহেববাড়ির ঝকঝকে মাল বহুক্লেশে হলেন বহাল।
মা তার বলেন, "করলি কী, মুখপোড়া !
বাপ-পিতাম'র চাল-মোতাবেক যা ছিল সব ঘুচিয়ে সাবেক
মেলেচ্ছ চাল ধরলি রাতারাতি ?
ফল কী হবে ভেবেই মরি !" চলল সে একপ্রহর ধরি
কাঠের বোঝা নাড়া। কাজের সাথী
বিরক্ত সব—ভাই আর ছেলে, বললে, "তোমায় হঠাৎ পেলে
ভূত যে কেন ?'' চটল চাকরগুলো।
রাত দুপুরে মুখ হাত ধুয়ে যে যার ঘরে পড়ল শুয়ে ;
তিনকড়ি তার নতুন খাটে শুলো।
ক্লান্তদেহ এলিয়ে ভাবে এবার টেনে ঘুম লাগাবে।
যেমনি দু'চোখ হয়েছে এক করা,
অমনি দেখে পিঠের তলায় কইছে কথা খোনা গলায়—
বুকেতে মুখ—কবন্ধ এক মড়া !
চাঁচাছোলা, হাত-পা-কাটা, চ্যাপ্টা যেন কাঠের পাটা—
তিনকড়ি যে তারই উপর শুয়ে
নিদ্রা যাবার আশায় ছিল ভাবতে গায়ে কাঁটা দিল ;
ধড়মড়িয়ে পড়ল নেমে ভুঁয়ে।
ঘরটা ছিল অন্ধকারই, চারদিকে তার সারি-সারি
আসবাবেরা উঠল হঠাৎ হেসে।
বললে, "জাদু, যাচ্ছ কোথায় ?'' বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়
তাদের হাসির শব্দে সর্বনেশে।
"মানুষ, তোমার সুখের তরে ভূত হয়েছি আমরা ম'রে ;
বনের থেকে আনলে মোদের টেনে ;
মেরে কেটে চালিয়ে র‍্যাঁদা করলে মোদের অমর্যাদা—

বাধা দেবার নেইকো তাকত জেনে।
তক্তা করে আজ এই দশায়   ফেলেছ যে তোমরা, মশায়,
শোধ নেব তার, আজ পেয়েছি একা।
দেখব তোমায় বাঁচায় কিসে,   সবাই মিলে ফেলব পিষে।"
তিনকড়ি রায় রইল হয়ে ভ্যাকা।
পালিয়ে যাবে—নাই যে উপায়,   দু'মন পাথর বাঁধা দু'পায়,
আগলিয়ে পথ সামনে খাড়া আছে
পাঁচ হাত উঁচু চারটে মড়া   সেগুন সিসুর—পালিশ কড়া,
চারজোড়া চোখ জ্বলছে মাথায় কাছে।
কী হিংস্র সেই চোখের দৃষ্টি!   করছে যেন অগ্নিবৃষ্টি!
মেহগিনির এক টেবিল খোদাই-করা
বললে, "আমেরিকায় বনে   ছিলেম সুখে স্বজন-সনে—
বিশ হাত দেহ ডালপালাতে ভরা।
চালিয়ে করাত প্রাণ নিলে মোর   হৃদয়হীন এক বেনের চাকর;
টুকরো করে নকশা কেটে ত্বরা
চড়িয়ে আমায় জাহাজ ট্রেনে   তোদের দেশে ফেললে এনে;
ছেঁড়াছিঁড়ি হেথাও যে মোর তরে।
মরেও আমার সোয়াস্তি নেই,   দু'হাত ফিরে অল্পদিনেই
(দু'হাত কেটে) ঢুকেছি তোর ঘরে।
যাহোক; গোড়ায় মান্যে ছিলেম,   তোর বাড়ি আজ জাত খোয়ালেম
বেজাতের এই চেয়ার তুলে কাঁধে।
পিটলে তোরে, হতচ্ছাড়া!   রাগ যাবে না, মরার বাড়া
এই অপমান। মানুষগুলোয় সাধে
বিশ্বে সবাই ঘেন্না করে?   প্রায়শ্চিত্ত করার তরে
তৈরি আছিস?" চারদিকে তার রেগে
ক্রমেই ওরা এগিয়ে আসে।   তিনকড়ি রায় দারুণ ত্রাসে
জ্ঞান হারাল। আর্তস্বরে জেগে
বাড়ির লোকে ভিড় জমাল,   সুইচ টিপে জ্বালিয়ে আলো
দেখল ধুলোয় লুটোচ্ছে তিনকড়ি;
দাঁতেতে দাঁত আটকে আছে।   চিকিৎসক এক বাড়ির কাছে
ছিলেন, এসে দিলেন ওষুধ, বড়ি।
'সড্‌ন্‌ শক' আর পরিশ্রমে   এই অবস্থা। কোনও ক্রমে
এ-যাত্রাটা জীবন গেছে বেঁচে।
উট্‌কো আপদগুলোয় ত্বরা,—   সবারি মত,—বিদায় করা।
যে ক'টা দিন না যায় দেওয়া বেচে—
(রাতের কথা না ক'রে ফাঁস   উচিত দরে—চলছে প্রয়াস,—
চেনাশোনার মধ্যে ক্রেতা খোঁজা)
তিনকড়ি রায় প্রাণ গেলে তার   শোবার ঘরে ঢুকছে না আর।
বাইরে ঘরে জাজিম পেতে সোজা
বাপ-পিতাম'র সাবেক চালে   দিনটা কাটে। রাত্রিকালে
চায় না ফিরে খাট-আলমারির পানে,
তক্তপোশ আর সিন্দুকেরাও   পাছে করে হঠাৎ ঘেরাও—
মড়ার ভিড়ে একান্ত সাবধানে
তাই সে থাকে। অজ্ঞাতে তার   কার পরে যে কী অবিচার
ঘটেছে কে বলবে? সে তাই ছাদে
মাদুর পেতে জ্বালিয়ে আলো   রাত্রে ঘুমোয়, শুনছি 'ভাল
আছে সে,—দিন কাটছে নির্বিবাদে।

ছবি সুধীর মৈত্র
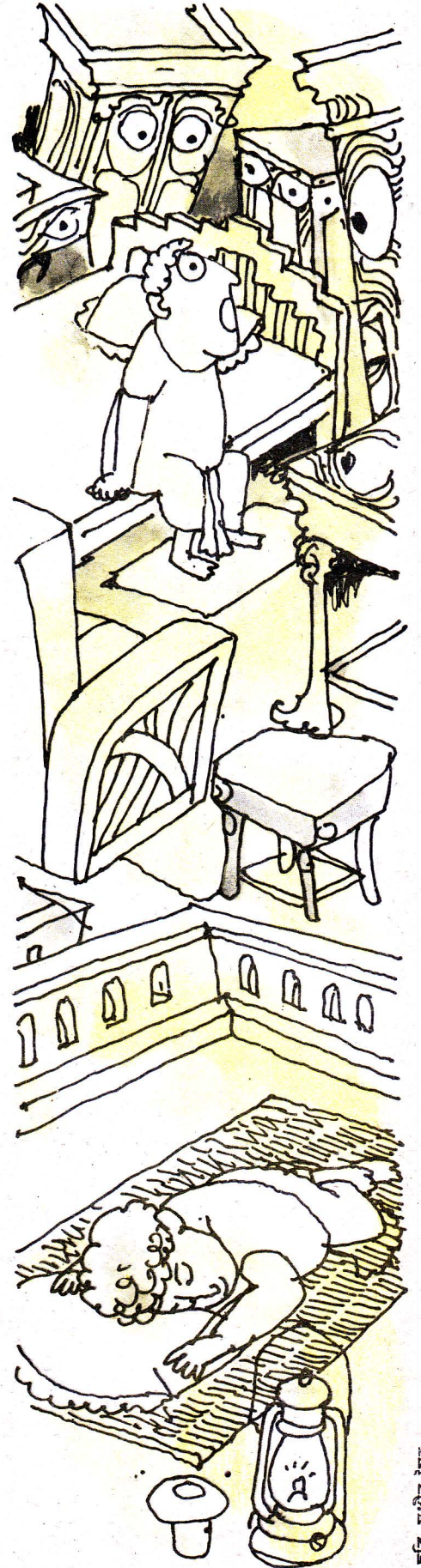
খরার শেষে ছড়া

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এইতো গেল দারুণ খরা
আকাশ যেন আগুন-ঝরা
উবুড় করা সরা।
ছড়া যা ছিল ছিটেফোঁটা
মাথার মধ্যে শুকিয়ে-ওঠা
চড়ায় গেল হারিয়ে,
হঠাৎ একটু মেঘ বুলিয়ে
হাওয়ায় দুটো গাছ দুলিয়ে
দু-চার ফোঁটা জল ঝরিয়ে
ছড়া-টড়া গজায় কি?
গজায় যা, তা খোঁচা-খোঁচা
নেহাত শুধু কাঁটাই,
যা লিখেছি তামাম ছড়া
তাই করছি ছাঁটাই।

রোসো! রোসো! রোসো।
পশলা কয়েক ভেজাক মাটি
তারপরেতে দেখো
ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়া গজায়
সকাল বিকেল ক'শো!

ছড়ায় তখন ছড়াছড়ি
মুড়ি-মুড়কি, না, না, থুড়ি
খোলামকুচির মতো হবে শস্তা।
নগদ একটা নিলে পরে
ফাউ মিলবে অন্তত এক বস্তা!
খরার শেষে আশায় আছি
নয়কো জলের, ডাকবে ছড়ার বান
ছোট্ট যত মিষ্টি মুখে
গুনগুনিয়ে জুড়িয়ে দেবে কান!

ছবি সুধীর মৈত্র

পুজোর মজা

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

কৈলাসেতে করেন ঘর
মা দুর্গা মহেশ্বর
মহেশ্বর শিব দিনভিখারী
দুর্গা নিজে রাজেশ্বরী !
রাজেশ্বরীর বেটাবেটি
চার কিসিমের চার চারিটি !

সবার বড় গণেশদাদা
গণেশদাদার পেটটি নাদা !
মুখটা হাতির রঙটা সিঁদুর
বৌ কলাগাছ বাহন ইঁদুর
ইঁদুর নে যায় গঞ্জে হাটে
রোজ পুজো পান দোকানপাটে।

কার্তিক তিনি বাবু অতি
দেব-দেবীদের সেনাপতি।
ঘোড়ার বদল ময়ূর চড়ে
ময়ূর চড়েই বেজায় লড়ে
লড়তে লড়তে খিদে পায়
খিদে পেলেই মণ্ডা খায়।

মা দুর্গার মেয়ে লক্ষ্মী
মেয়ের বাহন পেচক পক্ষী !
পেঁচার পিঠে অন্ধকারে
ঢোকেন গিয়ে নোটের ঘরে !
বসেন টাকায় আসন পেতে
চাষী মজুর খাটান খেতে !

আর এক মেয়ে সরস্বতী
রঙটি সাদা বিদ্যেবতী !
নানা বিদ্যে জানেন বলে
ভাইবোনেরা নেয় না দলে।
বাজান বীণা, হাঁসটি পাশে,
গাঁটা, টক কুল, ভালবাসে।

এমন চারটি রত্ন সঙ্গে
মা আসছেন ভাঙা বঙ্গে !
ভাঙা বঙ্গে মায়ের পুজো,
বেটাবেটির বেজায় মজা !
মায়ের ভোগের ভাগটি পাবে,
ফেরি চেপে ফিরে যাবে।
লোডশেডিংটা যদি হয়
পুজো মাটি, ভূতের ভয়।

মাথামুণ্ডু

তারুণকুমার সরকার

বুকুনবাবু, যাচ্ছ কোথায় ?
চেয়ার বেয়ে তোমার মাথায়।
আমার মাথায় তিনটে বাঘ।
আমার মুঠোয় দারুণ রাগ ॥
রাগ দিয়ে কি বাঘ তাড়ায় ?
তাড়ায় না তো, পোষ মানায়।
পোষ মানিয়ে করবে কী ?
দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি।
ভাববে কী আর, মাংস চাই।
আচ্ছা, দেব মুণ্ডুটাই ॥
মুণ্ডুটা কী মিথ্যেকারের ?
অঙ্কস্যারের, অঙ্কস্যারের ॥

ছবি সুধীর মৈত্র

টৌরি জঙ্গলের ভক্ত বাঘ

সুবোধ ঘোষ

এদিকে পালামউ জেলার টৌরি বস্তি, ওদিকে হাজারিবাগ জেলার বনসিরি, দুইই বেশ বড়রকমের দুটি লোকালয়, কাজ-কারবারের দুটি গঞ্জ। সড়কটা যেন এই দুই লোকালয়ের মধ্যে ত্রিশ মাইলের ব্যবধান জুড়ে দিয়ে আর দু'পাশের সবুজ শাল-জঙ্গলের ঠাসা বিস্তারের উপর লাল কাঁকরের চেহারা এঁকে দিয়ে পড়ে রয়েছে। এই সড়কেরই পাশে এক জায়গায় ঠাকুর-সাহেবদের টৌরি জমিদারির তসিল কাছারি। তসিলদার রামতনু অন্য কাছারি থেকে বদলি হয়ে এখানে এসে ঠাঁই নেবার আগে শুধু ভাণ্ডারীজি কপিলবাবু একাই এখানে থেকে খাজনার আদায়-উসুলের সব কাজ করতেন। একটানা চল্লিশ বছর এই টৌরি কাছারিতে কাল কাটিয়েছেন কপিলবাবু। যখন এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। এখন তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সের একটি বুড়ো মানুষ, মাথার চুলের প্রায় সবই সাদা হয়ে গিয়েছে।

এখানে এসে প্রথম দিনে কাছারিঘরের মেটে দাওয়ার উপর একটা চারপায়ার উপর আরাম করে বসতে গিয়েই একটু আশ্চর্য হয় রামতনু। এত গভীর জঙ্গলের ভিতরে একটা মন্দির এল কী করে? বেশ পুরনো বলে মনে হচ্ছে। কতকালের পুরনো? মন্দিরের গায়ের উপর হাজার ফাটল ছড়িয়ে রয়েছে। ফাটলের ফাঁকে-ফাঁকে পুরনো বট-অশথের শুকনো শিকড়ের এক-একটা গুচ্ছ ঝুলছে; রাজরপ্পার জঙ্গলের ভিতরে দুই নদীর দুই ধারার মাঝখানে একটা বালিয়াড়ির উপর ছিন্নমস্তার যে মন্দির অনেকবার দেখেছে রামতনু, সে-মন্দিরকেও এত পুরনো বলে মনে হয় না।

ভাণ্ডারী কপিলবাবু বললেন, "মন্দিরটা অন্তত দু-তিনশো বছরের পুরনো হবে। কিন্তু মন্দিরের ভিতরের বিগ্রহটা যে কত পুরনো সেটা কারও বুঝবার ও বলবার সাধ্যি নেই।"

রামতনু—কেন?

কপিলবাবু—বিগ্রহ বলতে তো ওই একটা কালো পাথরের পাটার ওপর খোদাই করা একটা হাত, সেই হাতে একটা খড়্গ আছে বলে মনে হয়। এ ছাড়া আর-কিছুই দেখতে ও বুঝতে পারা যায় না। পাথরের উপর সিঁদুরের প্রলেপও পাথর হয়ে গিয়েছে। এই বিগ্রহ নিশ্চয় হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। লোকে গল্প করে অনেক-অনেক দিন আগে, বনবাসী একজন যোগী ওই পাথরটাকে এই ঝিরিয়া নালার জলের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে কিনারাতে রেখে দিয়েছিল। তারপর কবে সেখানে কে এসে একটা মন্দির তুলে দিল, তা কেউ বলতে পারে না।

রামতনু—কী নাম বললেন? ঝিরিয়া নালা?

কপিলবাবু—হ্যাঁ, এই যে দেখছেন, আমাদের কাছারি আর ওই মন্দিরের মাঝখান দিয়ে ঝিরিঝিরি শব্দ করে ছোট্ট একটা স্রোতের জল বয়ে যাচ্ছে, সেটারই নাম ঝিরিয়া নালা। জল খুব পরিষ্কার আর ঠান্ডা, পাহাড়ের উঁচুতে চুল্‌হাপানি নামে ছোট একটা কুন্ড থেকে খুব সরু একটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে শেষে যে মস্ত বড় একটা চেহারা ধরেছে, সেটাই হল দামোদর নদ। অন্য একটি ধারা সেই একই কুন্ড থেকে ঝর্না হয়ে গড়িয়ে পড়ে আর এতদূরে এইখানে এসে নাম ধরেছে ঝিরিয়া নালা।

রামতনু—ওই মন্দিরে পুজোটুজো হয় না?

কপিলবাবু—হয়, কিন্তু কোনো পুজারি-টুজারি নেই। গাঁয়ের লোকেরা এসে নিজেরাই পাঁটা বলি দেয়, ঢাক বাজায় আর চলে যায়। ওরা মা কালীর নামে পাঁটা বলি দেয়। মন্দিরটাকে ওরা বলে—কালীথান।

টোরি বস্তিতে মঙ্গলবারের বাজার বসেছে। তাই অনেক গো-গাড়ি মালপত্র নিয়ে সামনের ওই সড়ক ধরে টোরি বস্তির দিকে চলেছে। দেখতে পায় রামতনু, সব্‌জি বোঝাই একটা চলন্ত গো-গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে দু'জন চাষি মানুষ নেমে এল। ঝিরিয়া নালার কিনারাতে একটা ডুমুর গাছের ছায়ার কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। মাটিতে একবার মাথা ঠেকিয়েই ওরা আবার চলে গেল।

রামতনু—এ আবার কী ব্যাপার ভাণ্ডারীজি?

ছবি সমীর সরকার

ভান্ডারী কপিলবাবু বলেন—ও একটা ব্যাপারই বটে। আমি তখন সবেমাত্র এই কাছারিতে এসেছি। একদিন ভোরবেলা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, গেরুয়াধারী একজন সাধু ঝিরিয়া নালার কিনারাতে বসে আছে। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে এভাবে বসে আছেন কেন সাধুজি? সাধুজি বেশ মিষ্টিরকমের একটা হাসি হেসে নিয়ে বললেন—আমি এইবার শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। তাই বসে আছি।

আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেসা করলাম—আপনি কী বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আগন্তুক সাধু—আমি আর কিছুই খাব না। উপোস দিয়ে এখানেই পড়ে থাকব। শরীর শুকিয়ে যাবে, বুকের ভিতর থেকে ধুকপুক প্রাণটা একদিন বেরিয়ে যাবে। মুক্তি পেয়ে যাব আমি।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ভান্ডারী কপিলবাবু—এ যে আত্মহত্যা!

আগন্তুক সাধু—আত্মহত্যা নয় বাবুজি, এটা হল ইচ্ছা-মৃত্যু। খুব চমৎকার একটা ব্রত।

কথা বলতে বলতে ভান্ডারী কপিলবাবুর গলার স্বর যেন একটা আবেগের ছোঁয়া লেগে করুণ হয়ে যায়।—আমি অনেক সাধাসাধি করেছিলাম, রামতনুবাবু। রোজই এক লোটা দুধ নিয়ে মিনতি করতাম—খেয়ে নিন সাধুজি। সাধুজি তেমনি মিষ্টি-হাসি হেসে বলতেন—না।

কপিলবাবু এইবার যেন তাঁর মনের ভিতরে দূরস্মৃতির সব কলরোল সামলে নিয়ে কথা বলেন—জঙ্গলের নানা গাঁয়ের কত লোক রোজই আসত। উপোসি সাধুর শরীরটার দিকে তাকিয়ে সবাই দুই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত। সে একটা ব্যাপারই বটে। সাধু ওইখানে ঝিরিয়া নালার কিনারাতে ঘাসের উপর শুয়ে রইলেন। কিছুই খেলেন না। মাঝে-মাঝে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সাধুজি যেন একটা স্বপ্নের আবেশে ডুবে গিয়ে জড়ানো স্বরে ও আস্তে-আস্তে দু-একটা কথা বলতেন। তাঁর একটা কথা আমার মনের মধ্যে এখনও শুনতে পাই—শুনো বাবুজি, মানুষের যেমন ধর্মজীবন আছে, তেমনই ধর্মমরণও আছে।

মনের আবেগ সামলে নিয়ে ভান্ডারীজি বলেন—একদিন দেখলাম, সাধুজির বুকটা খুব জোরে ঢিপঢিপ করছে। বুঝলাম আর বেশিক্ষণ নয়। আর কোনো কথা বলতে পারবেন না সাধুজি। কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু কয়েকটা কথা বেশ স্পষ্ট করে বললেন, তাঁর শেষ কথা। বললেন, আমার মরা শরীরটাকে কেউ যেন সৎকার করবার নাম করে পুড়িয়ে নষ্ট করে না দেয়। এইভাবে এখানেই পড়ে থাকতে দিও। কাক শকুন আর শেয়াল যেন আমার শরীরের মাংস খেয়ে আনন্দ করতে পারে। তোমরা ওদের তাড়িয়ে দিও না।

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। এক দিন ও এক রাতের মধ্যে সাধুজির মরা শরীরটার সব মাংস কাক শকুন আর শেয়ালে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু টুকরো টুকরো কয়েকটা হাড়। ভান্ডারী কপিলবাবু একদিন গঙ্গা স্তব আবৃত্তি করে সেইসব হাড় তুলে নিয়ে ঝিরিয়া নালারই একটা ছোট দহের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন।

রামতনু—শুনে আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে ভান্ডারীজি। অনেক দিন আগে, আমরা যখন স্কুলের ছাত্র, তখন ফ্রান্সিসকান চার্চের এক খ্রীষ্টান সাধুর মুখে ঠিক এইরকম ইচ্ছার কথা শুনেছিলাম। হাজারিবাগের বড় ঝিলের মাঝখানে দ্বীপের মতো একটা জায়গায় খেজুরকুঞ্জের মধ্যে তিনি যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতেন। তিনি বলতেন—আমি চাই আমার মরা দেহটা যেন কবরের ভিতরে ঢুকে নষ্ট না হয়। আমি চাই, পাখিরা যেন আমার মরা শরীরের সব মাংস লুটেপুটে খেয়ে ফেলে আর খুশি হয়।

সাধুর কথা শেষ করেই ভান্ডারীজি হঠাৎ একটা বাঘের কথায় এসে পড়লেন। এই বাঘের জীবনের অদ্ভুত যত আশ্চর্যের গল্প শুনে রামতনুর মনটা এবার আরও বড় বিস্ময়ে ভরে যায়।

নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, এই টোরি জঙ্গলের ভিতরে একটি বড় জাতের ডোরাকাটা চেহারার যে বাঘ বিচরণ করে, সে হল একটি ভক্ত বাঘ। ভান্ডারীজি হিসাব করে নিয়ে বললেন, পাঁচ বৎসর ধরে ওই বাঘ টোরির জঙ্গলের ভিতরে দশটা গাঁয়ের মাটি ছুঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে মারেনি। কোনো মানুষকে না, গরুকেও না।

রামতনু—তবে কী খেয়ে বেঁচে আছে বাঘটা? শুধু হরিণ-টরিন খেয়ে?

ভান্ডারীজি—না, তাও না।

রামতনু—তবে?

ভান্ডারীজি—তার মানে একটা ব্যবস্থা হয়েছে। পালা করে এক-একটা গাঁয়ের মানুষ শনিবারে ও মঙ্গলবারে এই কালী-থানে এসে পাঁঠাবলি দেয়। সেই পাঁঠার অর্ধেক শরীরের মাংস প্রসাদ হিসেবে ওরা ঘরে নিয়ে যায়, বাকি অর্ধেক শরীরের মাংস শালপাতায় মুড়ে কালীথানের ওই কুঠুরির ভিতরে সিঁদুরমাখা বিগ্রহের সামনে রেখে দিয়ে যায়। বাঘ কোনো-সময়ে তার বরাদ্দের ওই মাংস-প্রসাদ খেয়ে ফেলে।

রামতনু—আপনি কোনোদিন এরকম অদ্ভুত দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছেন?

ভান্ডারীজি—হ্যাঁ, রামতনুবাবু, আমি নিজের চোখে দেখেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলাতে দেখেছি। একদিন দুপুর-বেলাতে দেখেছি। একদিন মাঝরাতের চাঁদের আলোতে দেখেছি। বাঘ এল, কালীথানের কুঠুরির ভিতরে ঢুকল, কিছুক্ষণ পরে চলে গেল।

এ যেন কতকটা প্রাচীন ক্রীটের সেই দানব মিনোটরের ইচ্ছার বিধানের মতো একটা বিধানের গল্প। মিনোটরের ইচ্ছার নির্দেশ ছিল, পালা করে প্রতিদিন সাতজন করে তরুণ-তরুণীকে তার ভোজ্য হবার জন্য তার কাছে উপস্থিত হতে হবে। নইলে......। এই দানবীয় শাসনের নিয়ম অনুযায়ী রোজই সাতজন তরুণ-তরুণীকে ভয়ানক এক মৃত্যুর শাস্তি মেনে নিতে হত। মহাভারতের একচক্রা নগরীর বকরাক্ষসের কথাও মনে পড়ে যায়। পালা করে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজনকে বকরাক্ষসের ভোজ্য হতে হত। কুন্তীদেবী একদিন এক পরিবারের করুণ কান্নার শব্দ শুনে জানতে পেরেছিলেন যে......

পাঁচ বছর আগে এদিকের জঙ্গলের ভিতরে একদিন গরু চরাতে এসে একটা রাখাল ছেলে ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল, আর তখনই ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। কালীথানের দাওয়ার উপর একটা সাংঘাতিক চেহারার বাঘ টান হয়ে শুয়ে রয়েছে। সেই দিনই সন্ধ্যায় টোরির জঙ্গলের একেবারে বুকের ভিতর থেকে বাঘের ডাকের শব্দ উথলে উঠে দশটা গাঁয়ের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কোথা থেকে এল এই বাঘ? এতদিন এই জঙ্গলের যত গাঁয়ের গরু মেরেছে খেঁকি নেকড়েরা, বড় বাঘের হাঁক-ডাক ও উপদ্রব ছিল না। হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগে একটা বাঘ তিন-চারদিন ধরে হাঁক-ডাক করেই আবার উধাও হয়ে গিয়েছিল। ফিরে আর আসেনি।

রাখাল ছেলেটা যতই ভীরু স্বরে আর গলা কাঁপিয়ে ভয়ানক এক বাঘের আগমনের বার্তা বলে বেড়াক না কেন, গাঁয়ের মানুষ একদিনেই বুঝে ফেলল যে, এই বাঘ যে-সে ও যেমন-তেমন বাঘ নয়। একজন ভক্ত বাঘ। নইলে কালীথানের

দাওয়ার উপর এসে শুয়ে থাকবে কেন?

তাই সব গাঁয়ের মানুষ পরামর্শ করে ওই ব্যবস্থা করে ফেলেছে। পালা করে শনি ও মঙ্গলবার এক-একটা গাঁয়ের মানুষ কালীথানে এসে পাঁটাবলি দেয়। ঘটনার বিস্ময়টা নানা মুখের কথায়-কথায় আরও ফেঁপে উঠেছে। এদিকে পালামউয়ের লাতেহার আর ওদিকে হাজারিবাগের চাতরা মহকুমার সদর শহর পর্যন্ত গল্প রটে গিয়েছে যে, টৌরি জঙ্গলে এক ভক্ত বাঘের আবির্ভাব ঘটেছে। কালীথানের প্রসাদী মাংস ছাড়া সে অন্য কিছু খায় না।

সব শুনে হেসে ফেলে রামতনু—আপনার কথা বিশ্বাস করেও আবার বিশ্বাস করতে পারছি না, ভান্ডারীজি।

ভান্ডারীজিও হেসে ফেলেন—এই তো, মাত্র একদিন হল আপনি এখানে এসেছেন। কিছুদিন থাকুন, তারপর নিজেই বুঝতে পারবেন।

রামতনু—কী বুঝতে পারব।

ভান্ডারীজি—বুঝতে পারবেন যে, জঙ্গলের গাঁয়ের মানুষের বিশ্বাসটা মিথ্যে নয়। এ-বাঘ সত্যই ভক্তবাঘ।

ভট ভট, ভট ভট, দুরন্ত এক ছুটন্ত মোটর সাইকেলের শব্দ শুনে টৌরি-বনসিরি সড়কের দুই পাশের দুই সারি গাছের মাথা থেকে পাখির দল উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ময়না বুলবুল শালিক আর হরিয়াল ঘুঘু। মোটর সাইকেলের সঙ্গে যুক্ত সাইডকারও ছুটে আসছে। কে ওরা?

মোটর সাইকেলের আরোহী হলেন একজন লালমুখো খাঁটি সাহেব, আর সাইডকারে যিনি বসে আছেন, তিনি হলেন পুলিসের অফিসারি উর্দিপরা একটি দেশী মানুষ। দেখে একটু আশ্চর্য হয় রামতনু, মোটর সাইকেলের শব্দের ভটভটানি ঠিক তহসিল কাছারির বেড়ার কাছে এসে থেমে গেল।

লালমুখো সাহেব তাঁর দুই কড়া চোখের দৃষ্টি তুলে আর রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—হাম্ হ্যায় রেলওয়াইকা ইঞ্জিনিয়ার বড়াসাহেব, মিস্টার স্টীল।

পুলিসের থানাদার দারোগার উর্দিপরা ব্যক্তিটি বললেন—হাম্ হ্যায় রিজুয়া থানাকা দারোগা, বলবন্ত রায়।

রামতনু—শুনে খুশি হলাম।

মিস্টার স্টীল—পাঁচ বছর ধরে কত খোঁজ করেছি, কিন্তু কোনো খোঁজ পাইনি। এখন জানতে পেরেছি, রিজুয়া ফরেস্টের সেই ম্যানইটার পালিয়ে এসে টৌরির এই ফরেস্টে ঢুকেছে!

দারোগা—চৌকিদার রিপোর্ট করেছে, এই টৌরি জঙ্গলের ভিতরে কয়েকবার বড় বাঘের হাঁক শুনতে পাওয়া গিয়েছে। এখন আপনি বলুন, আপনারা এই ম্যানইটারের কোনো নতুন খবর জানেন কি না?

রামতনু—আমি কোন ম্যানইটারের কথা শুনিনি, কোন খবর জানি না।

এইবার ভান্ডারীজির দিকে তাকিয়ে গলা ছাড়েন মিস্টার স্টীল—তুম বোলো বুড্ঢা, ম্যানইটারকা কুছ খবর বোলো।

ভান্ডারীজি ভ্রূকুটি করেন—আমি কিছুই বলতে পারব না।

দারোগা বলবন্ত রায়—আমি শুনেছি ম্যানইটার প্রায়ই এই কালীথানের কাছে এসে ঘুরঘুর করে, বলির পাঁটার বাসি রক্ত চেটে নিয়ে চলে যায়।

ভান্ডারীজি—শুনেছেন যখন, তখন অবশ্যই শুনেছেন।

দারোগা বলবন্ত রায়—জঙ্গলের যত গাঁয়ের মানুষ বিশ্বাস করে, এটা একটা ভক্তবাঘ। তাই না?

রামতনু—হ্যাঁ।

মিস্টার স্টীল আর রিজুয়া থানার বলবন্ত রায়, দুজনে কালীথানের চারদিকের মাটির উপর চোখ রেখে আর ঘুরে ফিরে যেন একটা তল্লাসি চালালেন। হুররে, এ কী দেখছি! আনন্দের আবেগ সহ্য করতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার স্টীল। ভক্তবাঘের থাবার চার-পাঁচটা ছাপ তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, এইসব ছাপ সেই ম্যানইটারেরই সামনের পায়ের বাঁ দিকের থাবার ছাপ। থাবার এক ইঞ্চি পরিমাণ অংশের কাটা-যাওয়া ফাঁকটারও কী স্পষ্ট চিহ্ন এইসব ছাপের মধ্যে ফুটে রয়েছে।

সড়কের উপর দাঁড়িয়ে মিস্টার স্টীল এইবার টৌরি-বনসিরি জঙ্গলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই পাইপ ধরালেন। জঙ্গলের চেহারাটা যেন সবুজ তরঙ্গের একটা উপসাগর, এবং এই উপসাগরের বিস্তার যেন দিগ্বলয়ের রেখার কাছে গিয়ে ফুরিয়েছে। এর মধ্যে ম্যানইটারকে খুঁজে বের করা চারটিখানি সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু মিস্টার স্টীলের ভাগ্য ভাল, ম্যানইটারের সন্ধান জানিয়ে দিচ্ছে ম্যানইটারেরই থাবার ছাপ। ওই তো সড়কের এদিকের জঙ্গলের ভিজে মাটির ওপর ম্যানইটারের থাবার অনেক ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একেবারে টাটকা ছাপ। কোনো সন্দেহ নেই, আজকের শেষরাতে বাঘটা এদিকে এসে ঘোরাফেরা করেছে।

মিস্টার স্টীল বলেন—ওয়েল ডারোগা, হামারা অর্ডার শুনো।

বলবন্ত রায় বিনয়াবনত ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে গিয়ে কথা বলেন—বলুন হুজুর।

মিস্টার স্টীল—ঠিক এখানে আমার তাঁবু কেনবার ব্যবস্থা করে দাও। একটা বড় তাঁবু, তার সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট তাঁবু। একটা খাটিয়া ও একটা চেয়ার। আর, আমার শিকারের কাজে খাটবার জন্য একজন খোঁজি ও একজন চাকর চাই। শিয়ালের ডাক ডাকতে পারে, এরকম একজন ভাল হাঁকোয়া চাকর।

দারোগা বলেন—আমি কালই সব ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু মনে রাখবেন হুজুর ...

মিস্টার স্টীল—ইয়েস ইয়েস। অবশ্যই মনে রাখব। হ্যাঁ, পরশুদিন এসে শিকারের মাচানে বসব।

দারোগা—আমি কালই কুলি লাগিয়ে মাচান তৈরি করিয়ে দেব। জঙ্গলের কোন দিকে কত ভিতরের কোন্ গাছে মাচান বাঁধব হুজুর?

মিস্টার স্টীল—জঙ্গলের খুব ভিতরে নয়। জঙ্গলের ঠিক ওখানে, ওই যে দেখছেন, গ্রেট ওকের মতো চেহারার ওই গাছের উপরে অন্তত কুড়ি ফুট উঁচুতে মাচান বাঁধবেন। উইকেড ম্যানইটার ভয়ানক উঁচু লাফ দিতে পারে।

শিকারি সাহেবটা আর কতদিন আমাদের এই টৌরি জঙ্গলে ঢুকে বাঘটাকে গুলি করে মারবার চেষ্টায় মেতে থাকবেন? রামতনুর উত্তেজিত মেজাজের প্রশ্ন শুনে ভান্ডারী কপিলবাবু বেশ-একটু বিচলিত হয়ে ও নরম-নরম উপদেশ দিয়ে রামতনুকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন।—আপনি সাহেবটার সঙ্গে কোনো ঝগড়া গন্ডগোল বাধাবেন না রামতনুবাবু। ঠাকুর সাহেবের কাছে অভিযোগ করেও কোনো সাহায্য আপনি পাবেন না। টৌরি জঙ্গলে ঢুকে এই সাহেবের শিকার খেলবার শখের বিরুদ্ধে ঠাকুর সাহেব কোনো আপত্তি করতে সাহস করবেন না। গন্ডগোল করতে গিয়ে আপনিই বিপদে পড়বেন। মনে রাখবেন, পালামউ রাঁচি আর হাজারিবাগ তিন জেলার তিন ডেপুটি কমিশনার হলেন তিন খাঁটি সাহেব। স্টীল সাহেবকে সাহায্য করবেন তিন জেলার সব সাহেব। আপনি গন্ডগোল করে বাধা দিলে আপনাকে কালাপানি দেখিয়ে দিয়ে ছাড়বে ওরা। বীর

বিকলা বলেছিলেন—সাহেব সাহেব এক টোপি হ্যায়। তাছাড়া আপনি হলেন বাঙালী, ক্ষুদিরামের জাতভাই।

সাহেবের শুধু চোখ দুটো কড়া নয়, তাঁর জেদ এবং ধৈর্যও খুব কড়া। আজ দশদিন হয়ে গেল, মাচানে বসে আর বন্দুকে টোটা লোড করে নিয়ে রাত কাটিয়েছেন মিস্টার স্টীল, কিন্তু ম্যানইটারের একটা সামান্য আবছায়াও এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মাচানের কাছে আসেনি। মাচানের নীচে একটা জ্যান্ত টোপ সারা রাত ব্যা ব্যা করে ডাক ছেড়েছে। শক্ত দড়ির বাঁধন, থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে সারা রাত ছটফট করেছে সেই টোপ, একটা জ্যান্ত ছাগল। কিন্তু কী নির্লোভ বাঘ! কিংবা কী ধূর্ত বাঘ! বাঘটা ছাগল খেতে আসেনি।

বার বার কতবার মাচান বদলালেন মিস্টার স্টীল! জঙ্গলের এক মাইল ভিতরে গিয়ে নতুন মাচান তৈরি করিয়েছেন। কিন্তু বৃথা, বৃথা তাঁর সারা-রাত-জাগা অপেক্ষা। বন্দুকটাও যেন অপেক্ষার ক্লান্তি সহ্য করতে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে, সাহেবের হাতের শক্ত মুঠো শিথিল হয়ে যায়। তবু আশা ছাড়েন না মিস্টার স্টীল। তিনি রাগ করে খোঁজিটাকেই ধমক-ধামক করেন। সাহেবের মতে এই খোঁজি লোকটার মুখটা শজারুর মুখের মতো দেখতে। খোঁজিটা বাঘের যাওয়া-আসার ঠিকপথের সন্ধান দিতে পারছে না। শুধু আন্দাজে এদিকে-ওদিকে নতুন মাচা বাঁধতে পরামর্শ দিয়ে সাহেবের টাকা খরচ করিয়ে দিচ্ছে। সাহেবের সন্দেহ লোকটা ইচ্ছে করে সাহেবকে হয়রান করাচ্ছে।

খোঁজিটা হাত জোড় করে কথা বলে—নেহি হুজুর, আমি আপনাকে ঠিক রাস্তা দেখিয়েছি। লেকিন...।

সাহেব গর্জন করেন—কেয়া লেকিন ?

খোঁজি—ছাগল-টোপ দিয়ে কাজ হবে না।

সাহেব—কেন ?

খোঁজি—এ তো মানুষখেকো বাঘ। মানুষের মাংসের স্বাদ জানে।

সাহেব—ইয়েস্ !

খোঁজি—সেই জন্যেই বলছি, এই বাঘকে ঘায়েল করতে হলে, মাচানের নীচে একটা মানুষটোপ বেঁধে রাখা চাই।

সাহেব—হোয়াট ননসেন্স! কেয়া বোলতা হ্যায় তুম ?

খোঁজি—আমি খুব ঠিক কথা বলছি হুজুর।

সাহেব হেসে ফেলেন,—বাস্, ঠিক হ্যায়। আমি তবে তোকেই টোপ করে মাচানের নীচে বেঁধে রাখব।

খোঁজি—না গরিব পরবর, আমাকে টোপ করে কোনো লাভ হবে না।

সাহেব—কেন লাভ হবে না?

খোঁজি—আমার এই শুকনো রোগা চেহারার মাংস খেতে কোনো বড়-বাঘের ইচ্ছে হবে না।

খোঁজির হাঁটুতে আস্তে একটা লাথি মেরে সাহেব আবার হাসেন—তুমি খুব চালাক আদমি।

খোঁজি—আমি বেশ বুঝতে পারছি হুজুর, বেশ তাজা ও পুষ্ট চেহারার একটা মানুষকে যদি টোপ করা হয়, তবে বাঘ লোভ সামলাতে পারবে না।

সাহেব—ননসেন্স!

খোঁজি—সত্যি একটা জ্যান্ত তাজা-মোটা মানুষকে টোপ করতে বলছি না হুজুর। বলছি, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে একটা পুষ্ট মানুষের মূর্তি তৈরি করে নিয়ে, তার গায়ে জামা-কাপড় চড়িয়ে দিয়ে যদি মাচানের নীচে রাখা হয়, তবে কাজ হবেই হবে। আমি গল্প শুনেছি হুজুর, মধুডিহির রাজাসাহেব এইরকম নকল মানুষের মূর্তিকে টোপ করে অনেক মানুষখেকো বাঘ শিকার করেছিলেন।

সাহেব—অ্যাঁ, সত্যি কথা?

খোঁজি—আমি শুনেছি হুজুর, নিজের চোখে দেখিনি।

সাহেব—যা-ই হোক, তবে জ্যান্ত ছাগলের টোপে আর দরকার নেই। একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক্‌। ভাল করে একটা রোবাস্ট চেহারার মানুষের মূর্তি তৈরি করে ফেল। খুব জলদি কর।

খোঁজি—আমি নয় হুজুর, টৌরি বস্তিতে একজন দর্জি আছে, সে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিখুঁত চেহারার নকল মানুষের মূর্তি তৈরি করতে পারে। একশো টাকা মজুরি নেয়।

সাহেব—ঠিক হ্যায়, ড্যাম একশো টাকা!

যেমন প্ল্যান, তেমনই কাজ। দশ দিন পরে সত্যিই ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরি একটা নকল মানুষের মূর্তিকে জঙ্গলের গভীরে নতুন মাচানের নীচে রেখে মিস্টার স্টীলের শিকার ক্রিয়ার নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

মিস্টার স্টীল অবশ্য জানেন না যে, জঙ্গলের তিন গাঁয়ের মানুষ কালীথানে এসে মানত করে গিয়েছে—হেই মা, তিনজোড়া পাঁটা একসঙ্গে বলি দিয়ে তোমার পুজো করব, সাহেব যেন ভক্তবাঘকে মারতে না পারে। সাহেবের বন্দুক থেকে গুলি ছুটবার আগে বন্দুকটা যেন ফেটে গিয়ে দু টুকরো হয়ে যায়।

প্রথম দিনেই বুঝতে পারা গেল, জংলি গেঁয়োদের মানত সফল হয়েছে। বাঘটা কখন যে মাচানের কাছে এল আর কখন যে চলে গেল, একটুও টের পাননি শিকারি মিস্টার স্টীল। কিন্তু এ কী কাণ্ড, বাঘটার এ কী অদ্ভুত রসিকতা। ভোরবেলা মাচান থেকে নীচে নেমেই সাহেব দেখতে পেলেন, নকল মানুষের মূর্তিটা রক্তমাখা হয়ে পড়ে রয়েছে। মূর্তির গলাটা পেটটা আর বুকটার সব ছেঁড়া কাপড় বাঘের থাবার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে আর রক্তমাখা হয়ে ঝুলছে।

কী ব্যাপার? ভুতুড়ে ঘটনাতেও এরকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পাওয়া যায় না। রক্ত কেন? রক্ত কোথা থেকে এল? কেমন করে এল?

খোঁজি বলে—সত্যি রক্তের ছোপ নয় হুজুর।

—তবে কিসের ছোপ?

—ওটা পলাশ গাছের ছালের রসের ছোপ।

—কেয়া বোলা?

—বাঘেরা শখ করে মাঝে-মাঝে যেমন নোনা মাটি চাটে, তেমনই শখ করে পলাশ গাছের ছাল ছিঁড়ে নিয়ে চিবোয়। জঙ্গলের গাঁয়ের সব বুড়ো জানে, এটা বাঘের একটা শখের অভ্যেস। পলাশ গাছের ছাল চিবিয়ে বাঘের দাঁতের ও মাড়ির খুব সুখ হয়।

—ম্যানইটার কি তবে আমাকে ঠাট্টা করবার জন্যে...

—না, ঠিক তা নয় হুজুর। বাঘটা বোধহয় আগেই পলাশ গাছের ছাল চিবিয়েছিল। তারপর রাত্রিবেলায় এক ফাঁকে চুপিচুপি এসে আমাদের এই নকল মানুষটোপটাকে চিবিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

তাঁবুতে ফিরে এসেই এক মগ গরম চা খেলেন মিস্টার স্টীল। তারপর মোটর সাইকেল চালিয়ে রাঁচি চলে গেলেন। বলে গেলেন—আমি এক সপ্তাহ পরেই আবার আসছি। আমার প্রতিজ্ঞা, এই ম্যানইটারকে আমি মারবই মারব।

খোঁজি লোকটা রক্তমাখা নকল মানুষের ছেঁড়া মূর্তিটাকে টেনে নিয়ে এসে সড়কের এক পাশে ফেলে রেখে দেয়। পথচারী লোক দেখতে পেয়েই হেসে ওঠে। বাঃ, ভক্তবাঘ শুধু ভক্ত নয়, বেশ রসিকও বটে। মনে হচ্ছে, সাহেব খুব রেগেছে।

রিজুয়া থানার দারোগা বলবন্ত রায়ের কাছে মিস্টার স্টীল তাঁর জীবনের একটা সমস্যার কথা একদিন মুখ খুলে বলে ফেলেছিলেন। দারোগা বলবন্ত রায় সে-কথা টৌরি স্টেশনের মাস্টার ভৃগুবাবু ও জেলাবোর্ডের টৌরি হাসপাতালের ডাক্তার অবনীবাবুকে গল্প করে শুনিয়েছেন। গল্পটা তাই অনেকের কানে পৌঁছে গিয়েছে। বুড়ো ভান্ডারীজি আর তসিলদার রামতনুও শুনতে পেয়েছে। বেচারা স্টীল সাহেব! বাঘটাকে মারতে না পারলে ওর জীবনটাই যে মিথ্যে হয়ে যাবে! রেল-ওয়ের ডানকান সাহেবের রূপসী মেয়ে মিস বারবারা ডানকানের সঙ্গে তাঁর বিয়ের আশাটাই মুষড়ে পড়বে। তারপর হয়তো একেবারে ভেঙেই যাবে। ক্লাবের ঘরে গল্পের আসরে বসে সবারই সামনে একটা মোহময় আশার ইঙ্গিত একদিন ভাষিত করেছিল বারবারা।—ভয়ঙ্কর ম্যানইটারকে মারতে পারে যে-মানুষ তাকে সত্যিকারের একজন হিরো বলে মনে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

খোঁজি লোকটা আবার পরামর্শ দিল—একটা ময়ূর ছাড়ুন হুজুর। বলেন তো লাতেহার বাজার থেকে আমি একটা ময়ূর কিনে আনি। ময়ূরের অভ্যেস, জঙ্গলের ভিতরে বাঘকে দেখতে পেলেই উঁচু গাছের ডালের উপর বসবে আর চেঁচাবে। বাঘকে ধরিয়ে দিতে ময়ূরের খুব আনন্দ। কেউ-কেউ বলে বাঘের ডোরাকাটা হলদে চেহারা দেখতে খুব ভালবাসে ময়ূর। যেখান দিয়ে বাঘ হাঁটাহাঁটি করবে, ময়ূর ঠিক সেখান দিয়ে গাছের মাথায় মাথায় উড়বে আর বসবে। ময়ূরের উড়ে চলার নিশানায় লক্ষ রেখে শিকারি যদি এগিয়ে যায়, আর ছোট একটা টিলার উপর উঠে দাঁড়ায়, তবেই চোখে পড়বে, ঘোর জঙ্গলের বাঘ কেমন চুপি-চুপি চলে যাচ্ছে। তখন এক গুলিতে বাঘের প্রাণ সাবাড় করে দিলেই হল।

আপত্তি করেন না মিস্টার স্টীল, যদিও খোঁজির মুখের কথাগুলিকে খুব বিশ্বাসও করতে পারেন না। তিন দিন সকালের দিকে, আর তিন দিন বিকেলের দিকে কেনা ময়ূরের কেরামতির দৃশ্য দেখলেন মিস্টার স্টীল। সকালের দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে, আর বিকেলের দিকে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে গাছের মাথা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ময়ূরটা উড়েছে। বিচক্ষণ শিকারি স্টীল সাহেব বুঝতে পারলেন, সকালের দিকে যদি বাঘটাকে পেতে হয়, তবে সড়কের বেশ নিকটের ওই ডুমুর গাছের উপর মাচান বাঁধলেই চলবে। ময়ূরটা সকালের দিকে পুব থেকে পশ্চিমের ওই ডুমুর গাছের কাছে এসেই যেন গতি বন্ধ করে দিয়ে ডুমুরের ডালের উপর বসে পড়ে। তবে তো বুঝতে হয় যে, বাঘটাও ওই পর্যন্ত এসে গতি থামিয়ে দেয়। হয়তো বাঘটা সেখানেই মাটির উপর বসে পড়ে আর সামনের দুই পায়ের এক জোড়া থাবার উপর মাথা রেখে ঘুমোতে থাকে। নয়তো শুধু হাই তোলে। এই অবস্থায় বাঘকে দেখতে পেলে এক গুলিতে সাবাড় করে দেওয়া খুবই সম্ভব, খুবই সহজ।

কী আশ্চর্য! এটাও কি একটা ধূর্ত কৌতুকের কীর্তি। ডুমুর গাছের উপরে মাচানে বসে পুরো পাঁচটা ঘণ্টা অপেক্ষা করেও বাঘের আর্বিভাবের কোনো ছায়াও দেখতে পেলেন না শিকারি মিস্টার স্টীল! ময়ূরটাও কেমন যেন অলস হয়ে একটা গাছের মাথার উপর বসে আছে। ময়ূরটা কি অন্ধ হয়ে গেল? বাঘের আসা-যাওয়ার দৃশ্যটাকে দেখতেই পাচ্ছে না? কিংবা গাছের মাথায়-মাথায় উড়ে জঙ্গলের ভিতরে চলন্ত বাঘকে ধরিয়ে দেবার অভ্যাসটাই ছেড়ে দিল?

মাচানের উপর সাহেবের পাশে বসেই চমকে ওঠে খোঁজি, যেন একটা ভয়ানক আশ্চর্যের দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। ফিসফিস করে কথা বলে খোঁজি, "হুজুর ওই দেখুন, কী আশ্চর্য, বাঘটা সারা গায়ে কাদা মেখে, যেন চেহারাটাকে ঢাকা দিয়ে কাদা দিয়ে তৈরি একটা অদ্ভুত জন্তুর মতো আস্তে-আস্তে হেঁটে চলে

হচ্ছে। না, ময়ূরের দোষ নেই। ভুলও করেনি ময়ূরটা। ওই অদ্ভুত কাদামাখা প্রাণীকে কী করেই বা চিনতে ও বুঝতে পারবে ময়ূরটা, ওটা যে একটা বাঘের কাদামাখা চেহারা? ... কিন্তু যাক গে, পালিয়েছে বাঘটা।"

রাগ করে ও গলার স্বর গরম করে নিয়ে খোঁজিকে ধমক দিলেন মিস্টার স্টীল—তুমি কি বলতে চাও, বলো। বাঘটা কি আবার একটা ঠাট্টার খেলা দেখিয়ে দিল? বাঘটা কি ইচ্ছে করে সারা গায়ে কাদা মেখে চেহারাটাকে পালটিয়ে দিয়েছে আর ময়ূরের চোখ দুটোকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে দিয়েছে?

খোঁজি—কী করে বলব হুজুর। ময়ূরের বুদ্ধি হল ময়ূরের বুদ্ধি, বাঘের বুদ্ধি হল বাঘের বুদ্ধি।

ঘটনার কথা রটে যেতে দেরি হয়নি। দু'দিনের মধ্যেই রটে গেল, কেনা ময়ূর লাগিয়ে ভক্ত বাঘের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করে-ছিলেন স্টীল সাহেব, কিন্তু ভক্ত বাঘ শিকারি সাহেবটাকে একেবারে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে।

মিস্টার স্টীলের ভাগ্যে আরও কঠিন একটা ঠাট্টার আঘাত একদিন আঃখ্ আঃখ্ শব্দ করে বেজে উঠল। সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। প্রিয় দোনলা ম্যান্টনকে আঁকড়ে ধরে মাচানের উপর বসে আছেন শিকারি মিস্টার স্টীল। এ হেন এক চমৎকার গোধূলিবেলার শেষ লগ্নের ক্ষণে মিস্টার স্টীলের দুই চোখ সহসা বিস্ফারিত হয়ে জ্বলজ্বল করে। বাঘটা মাচানের ঠিক নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই মুহূর্তে প্রিয় দোনলা ম্যান্টনের ট্রিগার টিপলেন সাহেব। বার বার দু'বার। কিন্তু প্রিয় ম্যান্টনের কোন নলের মুখ থেকে শব্দ করে গুলি ছুটে বের হল না। বন্দুকের চেম্বার হঠাৎ জ্যাম হয়েছে। আঃখ্ আঃখ্, বার কয়েক যেন ভয়ানক বিরক্ত-হওয়া প্রাণের একটা আক্ষেপের শব্দ ছেড়ে দিয়ে বাঘটা চলে গেল। কিংবা হতে পারে, ওটা ভয়ানক একটা ঠাট্টার আঃখ্ আঃখ্ শব্দ।

মিস্টার স্টীল বুঝলেন, তাঁর ভাগ্যটাই তাঁকে ঠাট্টা করেছে। নইলে, যে বন্দুকের চেম্বারে এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোনোদিনও কখনও জ্যাম হয়নি, সেই বন্দুক কেন একটা সুবর্ণ-সুযোগের লগ্নে এভাবে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে?

মিস্টার স্টীল টৌরি তসিল কাছারির দাওয়াতে উঠে রাম-তনুকে ইংরেজি ভাষাতে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথাটা শুনিয়ে দিয়ে গেলেন।—হাসছ কেন ম্যান? বাঘটাকে মারতে বারবার ফেল করেছি বলে? তবে জেনে রাখো, আমার নাম যেমন স্টীল, আমি নিজেও তেমনই স্টীল। আমি দমে যাবার ও নুয়ে পড়বার মতো মানুষ নই। আমার প্রতিজ্ঞার কথাটা দুজনেই শুনে রাখো, ইউ ইয়ং ম্যান আর ইউ বুড্ঢা ম্যান, এক মাসের মধ্যে আমি এই ম্যানইটারকে মেরে ফেলব। রিজুয়া জঙ্গল থেকে পালিয়ে এই জঙ্গলে চোরের মতো লুকিয়ে থাকলেও আমার বন্দুকের মার থেকে ওর প্রাণ রেহাই পাবে না।

শিকারি মিস্টার স্টীলের নতুন চেষ্টা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানতে পেরেছে রামতনু, তিনি নতুন বন্দুক কেনবার জন্য কল-কাতায় গিয়েছেন। মিস্টার স্টীলের তাঁবুর অবস্থা দেখবার জন্য রিজুয়া থানার দারোগা বলবন্ত রায় একদিন টৌরিতে এসে অনেক খোঁজখবর নিলেন। বাঘটা কি সত্যিই একটা ভক্ত বাঘ? ওকে গুলি করে মেরে ফেলা কি সত্যিই কারও সাধ্যি নয়? তসিল-কাছারিতে এসে খবরটা শুনিয়ে গেলেন দারোগা বলবন্ত রায়—এবার কিন্তু আপনাদের ভক্ত বাঘের আর রক্ষে নেই। শিগগির এসে পড়বেন মিস্টার স্টীল, বেশ দামি একটা নতুন হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড কিনেছেন সাহেব।

কিন্তু ওদিকে সবার গোপনে মিস্টার স্টীলকে তিনি একটা

পঞ্চভূত

অরুণ সরকার

জগু বলল, "কী রে রঘু
পরীক্ষাটা কীর'ম দিলি?
—পঞ্চভূত কী কী লিখ—
এ-প্রশ্নটা লিখেছিলি?"

রঘু বলল, "লিখব কী ছাই,
মানে যায় না বোঝা।"

জগু বলল, "কী বল্‌ছিস রে
ওটা তো খুব সোজা!
একটা ভূত ব্রহ্মদৈত্য,
একটা গো-ভূত, আর
পেত্নি একটা, তিনটে হল
শাঁকচুন্নি—চার।
একটা পয়েণ্ট ছেড়ে দিলাম,
নম্বর তো দুই।"

রঘু বলল, "ছাড়লি কেন?
আরেকটা তো তুই।"

ছবি সুধীর মৈত্র

চতুর বুদ্ধিময় পরামর্শ দিয়েছেন। জানতে পেরে খোঁজিটা আর হাঁকোয়া চাকরটা অনেকেরই কানে খবরটা তুলে দিয়েছে। বাঘটাকে গুলি করে মেরে গৌরবের ও বীরত্বের একটা ট্রফির মতো মোটর ট্রাকের উপর চড়িয়ে নিয়ে মিস্টার স্টীল একেবারে রাঁচির ইউরোপীয়ান ক্লাবের চোখের কাছে, আর একবার বারবারা ডানকানের চোখের কাছে উপস্থিত করবেন। তাহলেই তো তাঁর জীবনের অন্য স্বপ্নটি সফল হয়ে যাবে। তাই মিস্টার স্টীলকে একটা সুপরামর্শ দিয়েছেন দারোগা বলবন্ত রায়—আমি বলি, একটা মরা ছাগলের গায়ে বিষ মাখিয়ে আপনি জঙ্গলের ভিতরে কোথাও রেখে দিন। প্রথম দিনে না হোক দ্বিতীয় দিনে, দ্বিতীয় দিনে না হোক তৃতীয় দিনে বাঘটা এসে লোভে-লোভে ছাগলটাকে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলবে। তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যে মরে যাবে। আপনি তখন জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে এক গুলিতে মরা বাঘটাকে মেরে ফেলবেন। কে বুঝবে, ওটা বিষ খেয়ে মরা বাঘ, না আপনার বন্দুকের গুলি খেয়ে মরা একটা দুরন্ত বাঘ? আপনার শিকার-কীর্তির ট্রফি, বিরাট এক ম্যান-ইটারের ডোরাকাটা দেহটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে মিস বারবারা ডানকান। তারপর আর কোনো সমস্যাই থাকবে না। তারপর আপনি শুধু মনে রাখবেন হুজুর, অন্তত রায়সাহেব খেতাব না পেলে আমার.........।

সাহেব—ও ইয়েস, খুব মনে থাকবে, আমি ডেপুটি কমিশনারের কাছে রায়সাহেব খেতাবের দাবিদার হিসাবে তোমার নাম রেকমেণ্ড করব।

তসিল-কাছারির সবাই এবং টোরি বস্তির আরও অনেকে জেনে ফেলেছে, সাহেবের শিকারের কাজের খোঁজি আর চাকর একটা মরা ছাগলের গায়ে ভয়ানক কড়া বিষ মেখে দিয়ে জঙ্গলের ভিতর রেখে এসেছে। কেন? বুঝতে দেরি হয়নি কারও, সাহেব মরা বাঘের উপর গুলি চালাবার মতলব ধরেছেন। কেন? তা'ও সবারই জানা হয়ে গিয়েছে।

মিস্টার স্টীল ঠিক তৃতীয় দিনের সকালবেলায় জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে বিষমাখানো মরা ছাগলের অবস্থাটা দেখলেন। একই অবস্থা। বিষমাখানো মরা ছাগলের শরীরটাকে স্পর্শও করেনি বাঘ। কিন্তু সেই মরা ছাগলেরই পাশে রাখা একগাদা নাড়িভুঁড়ির অর্ধেকটা খেয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে বাঘটা। কী ব্যাপার? কোথা থেকে নাড়িভুঁড়ির এই গাদা এখানে এল?

সাহেব রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—এটা আবার কী ব্যাপার?

খোঁজি বলে—জী হাঁ, হুজুর। বাঘটা খুবই ধূর্ত। কালীথানের বলিতলার গর্ত থেকে পাঁটার একগাদা নাড়িভুঁড়ি তুলে নিয়ে এসেছে, আর এখানেই বসে মজা করে খেয়েছে।

সাহেব—তবে তো বুঝতে হয় যে, বাঘটা আবার আমাকে ঠাট্টা করেছে।

জঙ্গলের বাইরে এসে আর তসিল-কাছারির সামনের সড়কে মোটর সাইকেলের সীটের উপর বসে গর্জন করেন মিস্টার স্টীল —শুনে রাখো তসিলদার, শুনে রাখো ইউ ভাণ্ডারী, ইউ বুড়ঢা হায়েনা, আমি আবার আসছি, ম্যানইটারের ধূর্ত প্রাণটাকে আমি আমার এই নতুন হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ডের এক গুলিতে সাবড়ে দেব আর এইখানে ওটাকে শুইয়ে রেখে ওর বুকের উপর আমার এই বুটপরা একটা পা তুলে দিয়ে ফটো তোলাব।

ভট্ ভট্ শব্দ করে মোটর সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন মিস্টার স্টীল।

ভক্ত-বাঘের কীর্তির কথা চমৎকার রকমের একটা মহিমার কথা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই সঙ্গে রাঁচির রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার বড়-সাহেব মিস্টার স্টীলের ভয়ানক প্রতিজ্ঞার কথাও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কালীথানে পুজো দিয়ে এসে জঙ্গলের গাঁয়ের মানুষ বেশ বিষণ্ণ ভীরু-ভীরু স্বরে রামতনুকে জিজ্ঞাসা করে—কী হবে, তসিলদারজি? সাহেব কি সত্যিই ভক্তবাঘকে মেরে ফেলতে পারবেন?

রামতনুও বিষণ্ণ স্বরে জবাব দেয়।—আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি ঠিক করে কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই ঠিক করে কিছুই বলতে পারব না।

একদিন দু'দিন তিনদিন, শীতের দিনের কুয়াশামাখা দিনগুলি একের পর এক চলে যাচ্ছে। আট-দশদিন পরে একদিন অনেক রাতে ভক্তবাঘের ডাক টোরি জঙ্গলের বাতাস কাঁপিয়ে দিল। সকালবেলা ঘরের বাইরে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়াতেই রামতনুর মনে একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। কী যেন অদ্ভুত রকমের একটা কাণ্ড হয়েছে। সড়কের উপর কিছু লোক এরই মধ্যে ভিড় করেছে। ডুমুর গাছের ছায়ার কাছে ঝিরিয়া নালার জলের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে, কী যেন ভাবছে।

আবার চমকে ওঠে রামতনু, ঝিরিয়া নালার স্রোতের কিনারাতে সবুজ-নরম ঘাসের উপর, যেখানে একদিন শুয়ে পড়েছিল এক সাধুজির ইচ্ছামৃত্যুর নিষ্প্রাণ দেহটা, ঠিক সেই-খানে পড়ে রয়েছে নিষ্প্রাণ এক বাঘের শরীর। মরেছে, মরে পড়ে রয়েছে ভক্তবাঘ। চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যায়, ভক্তবাঘ বেশ বুড়ো হয়েছে। তাই আয়ু ফুরিয়েছে। না, ভক্তবাঘ কোনো শিকারির গুলি খেয়ে কিংবা বিষ খেয়ে মরেনি। তবে কি নিজের ইচ্ছায় মরেছে?

চেঁচিয়ে ওঠে রামতনু—হতে পারে, আমার বিশ্বাস ভাণ্ডারীজি, ভক্তবাঘ নিজের ইচ্ছায় মরেছে।

বেলা বাড়ছে। এরই মধ্যে সাত-আটটা শকুন উড়ে এসে ভক্ত-বাঘের শরীরটাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে। কেঁদে ফেললেন ভাণ্ডারীজি,—আমিই তবে গঙ্গাস্তব করে ভক্তবাঘের সব হাড্ডি তুলে নিয়ে ঝিরিয়া নালার দহের জলে ফেলে দেব।

ভট্ ভট্ ভট্ ভট্। দুরন্ত বেগে শব্দ ছুটিয়ে মিস্টার স্টীলের মোটর সাইকেল ছুটে আসছে। ভিড়ের সবারই চোখের দৃষ্টি যেন একসঙ্গে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। থমকে দাঁড়ায় মিস্টার স্টীলের মোটর সাইকেল। সাহেবের কাঁধে চকচকে হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড ঝুলছে।

ততক্ষণে ভক্তবাঘের অর্ধেক, শরীরের সব মাংস খেয়ে ফেলেছে শকুনির দল। মিস্টার স্টীলের দুই চোখ কুঁকড়ে গিয়ে কাঁপতে থাকে—অ্যাঁ, কী লজ্জা, ম্যানইটারের এই দশা!

কেয়া বোলা রে সাহেব? লোকের ভিড় হঠাৎ উগ্র হয়ে মিস্টার স্টীলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

সেই মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট করে দিলেন মিস্টার স্টীল। ভট্ ভট্। ভট্ ভট্। যেন একটা ব্যর্থ প্রতিজ্ঞা ও বিফল স্বপ্নের বুকফাটা আওয়াজ ছুটে পালিয়ে গেল।
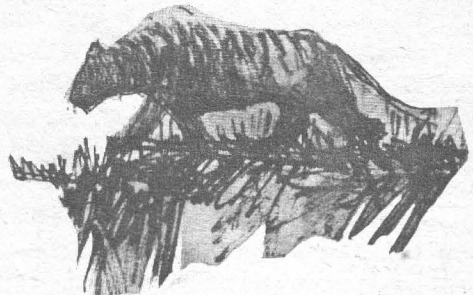
সিঁড়ি

লীলা মজুমদার
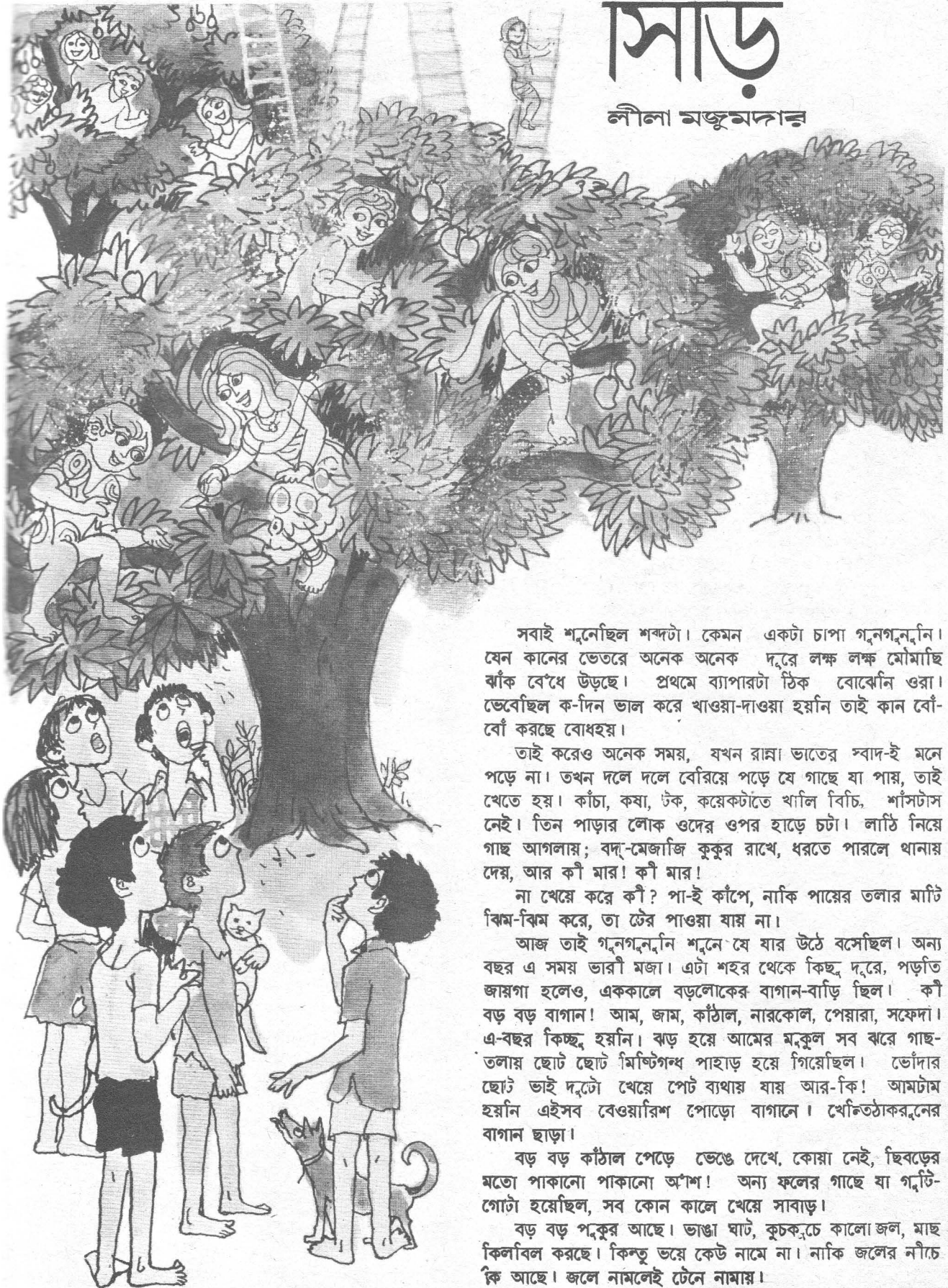
সবাই শুনেছিল শব্দটা। কেমন একটা চাপা গুনগুনুনি। যেন কানের ভেতরে অনেক অনেক দূরে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি ওরা। ভেবেছিল ক-দিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হয়নি তাই কান বোঁ-বোঁ করছে বোধহয়।

তাই করেও অনেক সময়, যখন রান্না ভাতের স্বাদ-ই মনে পড়ে না। তখন দলে দলে বেরিয়ে পড়ে যে গাছে যা পায়, তাই খেতে হয়। কাঁচা, কষা, টক, কয়েকটাতে খালি বিচি, শাঁসটাস নেই। তিন পাড়ার লোক ওদের ওপর হাড়ে চটা। লাঠি নিয়ে গাছ আগলায়; বদ্‌-মেজাজি কুকুর রাখে, ধরতে পারলে থানায় দেয়, আর কী মার! কী মার!

না খেয়ে করে কী? পা-ই কাঁপে, নাকি পায়ের তলার মাটি ঝিম-ঝিম করে, তা টের পাওয়া যায় না।

আজ তাই গুনগুনুনি শুনে যে যার উঠে বসেছিল। অন্য বছর এ সময় ভারী মজা। এটা শহর থেকে কিছু দূরে, পড়তি জায়গা হলেও, এককালে বড়লোকের বাগান-বাড়ি ছিল। কী বড় বড় বাগান! আম, জাম, কাঁঠাল, নারকোল, পেয়ারা, সফেদা। এ-বছর কিচ্ছু হয়নি। ঝড় হয়ে আমের মুকুল সব ঝরে গাছ-তলায় ছোট ছোট মিষ্টিগন্ধ পাহাড় হয়ে গিয়েছিল। ভোঁদার ছোট ভাই দুটো খেয়ে পেট ব্যথায় যায় আর-কি! আমটাম হয়নি এইসব বেওয়ারিশ পোড়ো বাগানে। খেন্তিঠাকরুনের বাগান ছাড়া।

বড় বড় কাঁঠাল পেড়ে ভেঙে দেখে, কোয়া নেই, ছিবড়ের মতো পাকানো পাকানো আঁশ! অন্য ফলের গাছে যা গুটি-গোটা হয়েছিল, সব কোন কালে খেয়ে সাবাড়।

বড় বড় পুকুর আছে। ভাঙা ঘাট, কুচকুচে কালো জল, মাছ কিলবিল করছে। কিন্তু ভয়ে কেউ নামে না। নাকি জলের নীচে কি আছে। জলে নামলেই টেনে নামায়।

আর সে মানুষ ওপরে ওঠে না! পুকুরের পাড়ের শামুক-

গুগুলি খেয়ে শেষ। নাকি ওতে হাঁপানি সারে। তা বটুর ঠাকুমা কিছুতেই খাবে না। বলে কিনা ওসব মাছ-মাংস, বিধবাদের খেতে নেই। বটুর যমজ ভাই গবু চটে গেছিল, "গরিবদের অত কী! যাদের বাড়িতে ভাত চড়ে না. তাদের ওসব বড়মানুষি কিসের!"

ওদের বন্ধু প্যাঙা বলেছিল, ''তাছাড়া বিধবা হলে কোত্থেকে? স্বামী ম'লে তো বিধবা হয়। যার স্বামীই নেই সে আবার বিধবা কিসের?'' সবাই যখন সেই কথাই বলল, কেউ কোনো জন্মে দেখেইনি স্বামীটামিকে. সে আবার মরবে কী করে—তখন শেষ পর্যন্ত বুড়ি রাজি হল।

জগবন্ধু ধোপাদের কাছ থেকে এই বড় মাটির হাঁড়ি আনল। ভজা, নরহরি, গিলে, নটে ইত্যাদি ছোট ছেলেরা পোড়ো-বাড়ির বন-বাদাড় থেকে রাশি রাশি শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনল। বটু পোড়া ইঁট পেতে, মধ্যিখানটা খোঁদল করে, ফাগুর কাছ থেকে দেশলাই কাঠি নিয়ে উনুন ধরাল।

ঠাকুমা উঠে এসে বলল, ''সরু দিকিনি। শামুক গুগলি-গুলো ধুয়ে আন।'' তাপ্পর আধ হাঁড়ি জল দিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিল। গয়লানিমাসি হাট সেরে বাড়ি যাচ্ছিল, সে খানিকটা নুন আর শুকনো লংকা ছেড়ে দিয়ে গেল। গিলে গাছতলা খুঁড়ে একগাদা মুখি কচু তুলেছিল; সেগুলো ছেড়ে দিল। টুবুর-টুবুর করে ফুটতে লাগল, কী তার সুবাস! সবার শেষে ঢ্যাঙাদা আগের দিন পাওয়া কারখানার শুখো-ভাতের চাল এক গাদা ঢেলে দিল।

কলাপাতা, পদ্মপাতা, ভাঙা সান্‌কি, যে যা পেল, তাতে করে পেট পুরে খেয়েছিল। সব্বাই বলেছিল জন্মে কখনো এত ভাল খায়নি। ঠাকুমাও সবার খাওয়া হলে হাঁড়ির তলা থেকে বেশ খানিকটা খেয়ে, সারা রাত ঘুমিয়েছিল। একবারও হাঁপায়নি। আর যেটুকু হাঁড়ির গা চেঁচে বেরুল, পোষা জানোয়ারদেরও তাইতেই হয়ে গেল।

কিন্তু তারপর আরও দু-দিন কেটে গেছে. খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সবাই এখন কানে মৌমাছির গুন্‌গুনুনি শুনছে। এর মধ্যে নগা এসে বলল, "যাচ্চলে! খেলার মাঠ বে-হাত! বুড়ো চৌধুরী সরকারি লোক লাগিয়ে জরিপ করিয়ে, পোস্তো গেঁথে, দেয়াল তুলছে। হয়ে গেল তোদের ফুটবল।"

বলে দাঁড়ালে মাটি ঝিমঝিম করে, তারা আবার ভোঁদা মেমোরিয়েল কাপে ফুটবল খেলবে!! কিন্তু বুড়ো ভেবেছেটা কী! পোস্তো উপড়ে দোব না! দেয়ালের ইঁট খুলে কালোরবনে ঘর তুলব না! দাঁড়াও না, একটু পায়ের ঝিমঝিমটা যাক।

যেই না ভাবা, অমনি ক্কর্‌ করে কানের গুন্‌গুন্‌, পায়ের ঝিমঝিম সব সেরে গেল। সব্বাই আশ্চর্য হয়ে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। চারদিক কী অদ্ভুত চুপচাপ। পোষা জানোয়ারগুলোও কাছে ঘেঁষে এল। বটুর ঠাকুমাও তাদের সঙ্গে এল।

তারই মধ্যে খেন্তিঠাকরুন উঠি-পড়ি করে ছুটে এসে, "ওরে কে আছিস্! আমাকে বাঁচা! আমার সব পাকা আম খেয়ে নিল রে! আমার জমা-দেওয়া ভাল ভাল আমগুলো পটাপট ছিঁড়ছে আর মুখে পুরছে, থলিতে ভরছে! সিঁড়ি বেয়ে কী শত্তুর-ই নেবে এল। তাড়ালেও যায় না, ঘুঁষি দেখালে হাসে!''

ওরা তো অবাক্। সিঁড়ি আবার কোত্থেকে এল? ঠাকরুনের বাড়ি তো একতলা। বিষ্টির জল যাওয়ার নালা বন্ধ হলে, মই লাগিয়ে নালা সাফ করতে হয়। তবু কিছু দেয় না বুড়ি।

বুড়ি বলল, "ওরে, বসে আছিস কী বলে? ওঠ্, গাছে চড়ে ভাগা ওদের!''

"তুমি নিজে ভাগাও!"

"ও মা! আমি ভাগাব কী করে, মাটিতে নাবে না যে! সিঁড়ির ওপর থেকে গুচ্ছের সব ছিঁড়ে নেয়! চল্, লক্ষ্মী সোনা!''

"হ্যাঁ, চল না আরো কিছু! বলি, দিয়েছিলে একটা নারকোল কি পেয়ারা কি কাঁচা আম, যখন খিদের চোটে চাইতে গেছলাম? জানোয়ারদের অদ্দেক না খেয়ে ম'ল!" সে-কথা মনে পড়াতে ছোটরা সবাই জানোয়ারদের শোকে নাক টেনে, চোখ মুছে নিল।

খেন্তিঠাকরুন যেন গাছ থেকে প'ল। "ও মা, কী বলে! গাছগাছলা সব ফড়ের কাছে জমা দেওয়া। ও-ফল কি আমার, যে তোদের দোব? দুটো-একটা মাটিতে পড়ে যায়, তা-ছাড়া নিজেই খেতে পাইনে।''

"তারই কিছু না হয় দিতে। ওরা প্রাণে বাঁচত!"

বুড়ি সত্যি রেগে গেল, "আরে রেখে দে। কী ছিরির সব জানোয়ার! দেখে হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনে! যত রাজ্যের নর্দমা ঝেঁটিয়ে তুলে এনেছে! বাজে জঞ্জাল!''

বকুর ছোট বোন দুটো চটে গেল। ভীষণ তোতলা তারা। বড়টা বলল, "ব-ব-ব-আ-জে! ক-ক-ক—" আর কথা বেরোয় না! তাই দেখে ছোটটা বলল, "ক-ক-কা--গের ছ-ছ-ছানা ব-ব-ব-আজে?"

"পালক নেই, বাজে না তো কী?"

বকু বলল, "চিল ঠুকরে চোখ খেয়ে নিয়েছে। তাই তো উড়তেও পারে না। পোষা জানোয়ারকে খেতে দেব না? জানো. কথা শেখালে কাগ কথা বলে।''

''পোষা জানোয়ার দেখে বাঁচি না! লোম-ওঠা নেড়ি-কুত্তো! কান-কাটা বেড়াল। ঠ্যাং-খোঁড়া ভাম—ভাঁড়ের মধ্যে কী?"

শিবু বলল, "খল্‌সে মাছের ছানা। ভীষণ তেজি!"

বুড়ি হাসল, "তা আঁশ নেই কেন গায়? কানকাটা বেড়ালে খেয়েছে বুঝি?"

বেড়ালের মালিক তেড়ে উঠল, "হ্যাঁ! বেড়ালে খেয়েছে! আঁশ থাকবে কী করে? সারাক্ষণ কামড়াকামড়ি করে যে! আঁশও নেই. খানিকটা খানিকটা কান্‌কোও নেই!"

খেন্তিঠাকরুন বললেন, "তা হলে আমার আম বাঁচাতে যাবিনে তো?"

"না, যাব না! তুমি আমাদের কিচ্ছু দাও না। খালি বল যা, চলে যা, দূর হ—"

"বেশ! আমিও যাচ্ছি চৌধুরীদাদার কাছে, ঐ ছোঁড়া-গুলোর একটা ব্যবস্থা কত্তে। আর তোদেরও এই বলে গেলাম, শিগ্‌গির সরকারের নতুন ইস্তাহার বেরুচ্ছে, এই অভাবের সময়ে যারা বাজে জন্তুদের খাবার খাইয়ে লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়, তাদের সব জন্তু জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হবে, হ্যাঁ!''

অমনি জন্তুগুলোকে বুকে জাপটে চ্যাঁ-ভ্যাঁ লেগে গেল।

পালের গোদা ভিমু তার লিকপিকে হাত-পা নেড়ে বলল, "থামবি কি না! ও কী ছিঁচকাঁদুনে স্বভাব, চল দেখি গিয়ে। আমরা একটা আম পাই না তো বাইরে থেকে সিঁড়ি নিয়ে কারা এসে আম পাড়ে। এ তল্লাটে আর তো কারও বাগানে আম হয়নি।''

দপাদপিয়ে চলে যাওয়ার সময় বুড়ি ভুলে খিড়কিদোর খুলেই গেছল। ওরা সবাই সুড়সুড় করে ভেতরে গিয়ে একেবারে থ!

দেখে গাছে গাছে সিঁড়ি! কিন্তু এ আবার কেমনধারা সিঁড়ি বাবা! মাটি থেকে ওপরে না উঠে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে! সিঁড়ির মাথা একেবারে চোখের বাইরে চলে গেছে আর পাঁচশো ছেলেমেয়ে গাছের সব আম মুড়িয়ে তুলে নিচ্ছে!! খাচ্ছে, নীচে ফেলছে, থলিতে ভরছে, হি-হি করে

হাসছে! কী সুন্দর দেখতে তারা, কী ভাল কাপড়-চোপড় পরা!

তাই দেখে ভুলো, খাঁদা, নেপু, ন্যাকা, বকু, শিবু আর দাঁড়াতে না পেরে থপাথপ মাটিতে বসে পড়ে ভেউ-ভেউ করে কান্না জুড়ে দিল। কত সইবে?

ছেলেমেয়েগুলো এমনি অবাক হয়ে গেল যে, একেবারে চুপ! তারপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় আর সবচেয়ে সুন্দর, সে বলল, "কী হয়েছে? কাঁদছ কেন? কেউ কিছু বলেছে?"

তিনু বলল, "তিন দিন কেউ খাইনি, তাই কাঁদছি। আমাদের পোষা জানোয়ারদের মেরে ফেলবে বলছে, তাই কাঁদছি।"

"ও মা! কী কষ্ট! কী কষ্ট! ছেঁড়া ময়লা কাপড় কেন ভাই?"

তিনু বলল, "ফরসা আস্ত কাপড় নেই, তাই।"

বকুর সাহস সবচেয়ে বেশি, সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথা থেকে এসেছ তোমরা, উলটো মই চেপে?"

ওরা দেখিয়ে দিল রাতের কালো আকাশে অনেক দূরে একটা নীল তারা মিটমিট করছে, তার দিকে, "ঐ আমাদের সূর্য! ওরই চারদিকে আমাদের পৃথিবী ঘোরে। বল তো জন্তু-জানোয়ারগুলোকে সেখানে নিয়ে যাই। খেয়ে বাঁচুক।"

অমনি সবার মুখে হাসি ফুটল, "নাও, নাও, এই নাও, ভাই! খেয়ে বাঁচুক। এক দিনও ওরা পেট ভরে খায় না।"

তিনু বলল, "ওখান থেকেই যদি এসে থাক, তাহলে আমাদের ভাষা শিখলে কী করে? অন্য দেশের লোকরা তো ইংরিজি বলে!"

শুনে ওদের কী হাসি! "তোমরা যেমন করে শিখেছ, আমরাও তাই। মাস্টারের কাছে। মাস্টার এসে বাংলা শিখে গেছে!" তারপর কত কান্না, জন্তুগুলোকে কত আদর, কত চুমু। ফকিরের বাঁদর তার গলা জড়িয়ে ধরে, ছাড়তে চায় না।

বড় বড় চোখ করে ছেলেমেয়েগুলো তাই দেখে অবাক হয়ে বলল, "তা তোমরাও এসো না, ওদের ছাড়বে কেন? তোমাদের মা-বাবা নেই? তারা কিছু বলবে না তো?"

বকু বলল, "আমার ছিল। মরে গেছে। ওদের কারও ও-সব নেই-টেই। ছিলও না কখনো। খালি বটুর ঠাকুমা বেচারি আসবে।"

"তবে এসো, তবে এসো! সে বড় ভাল জায়গা।"

সিঁড়িগুলো আরো নীচে নেমে এল। মাটি থেকে আধ হাত ওপরে থামল। পিলপিল করে জানোয়ার বগলে সবাই উঠতে লাগল। ততক্ষণে কথাটা রটে গেছিল। ঘরছাড়ারা সবাই নিঃশব্দে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ি আধাবয়সী; কারও পেটে ভাত পড়েনি দু' দিন।

তারপর দূর থেকে মানুষের সাড়া পেতেই মানুষজনসুদ্ধু সিঁড়িগুলো উঠে যেতে লাগল। উঠতে উঠতে এক সময় চোখের বাইরে চলে গেল।

খেন্তিঠাকরুন, তার দাদা বুড়ো চৌধুরী, দলবল লাঠি-সোঁটা পেয়াদা বরকন্দাজ নিয়ে এসে দেখে আমবাগান ভোঁ-ভাঁ! একবার মনে হল মাথার অনেক ওপরে কী যেন ঝিলিক দিল; কানে এল হাজার হাজার মৌমাছির গুনগুনুনি, পায়ের তলার মাটি ঝিমঝিম করতে লাগল! তারপর সব চুপ।

সবাই হতভম্ব হয়ে আকাশপানে চেয়ে রইল। গুনগুন্ শব্দ দূর থেকে আরও দূরে চলে যেতে লাগল। হঠাৎ খেন্তি-ঠাকরুন কোমর থেকে চাবির গোছা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডুকরে কেঁদে বললেন, "ওরে! আমাকেও নিয়ে যা! আমারও কেউ নেই।"

ছবি সুধীর মৈত্র

মোক্ষদা

শঙ্খ ঘোষ

কামড়াল কি জোঁক খোকাকে?
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।

ব্যাপারটা যে অলক্ষুনে
সেই কথাটা বলুক খুলে।

ছারপোকারা তক্তপোশে
কাদের জন্য রক্ত পোষে?

প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।

ঠুকরিয়ে খায় আরশোলাটা
কারই-বা গুড়? কার ছোলাটা?

টিকটিকিরও লক্ষ্যটা কে?
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।
উচ্চিংড়ের মন তো ভোঁতা
জানতে তুমি অন্তত তা—

কিন্তু কেন মত্ত এসে
নাচায় আমায় কত্থকে সে?

কেই-বা পাবে মোক্ষ তাতে?
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে!

ছবি সুধীর মৈত্র

যমজ কই

জরাসন্ধ
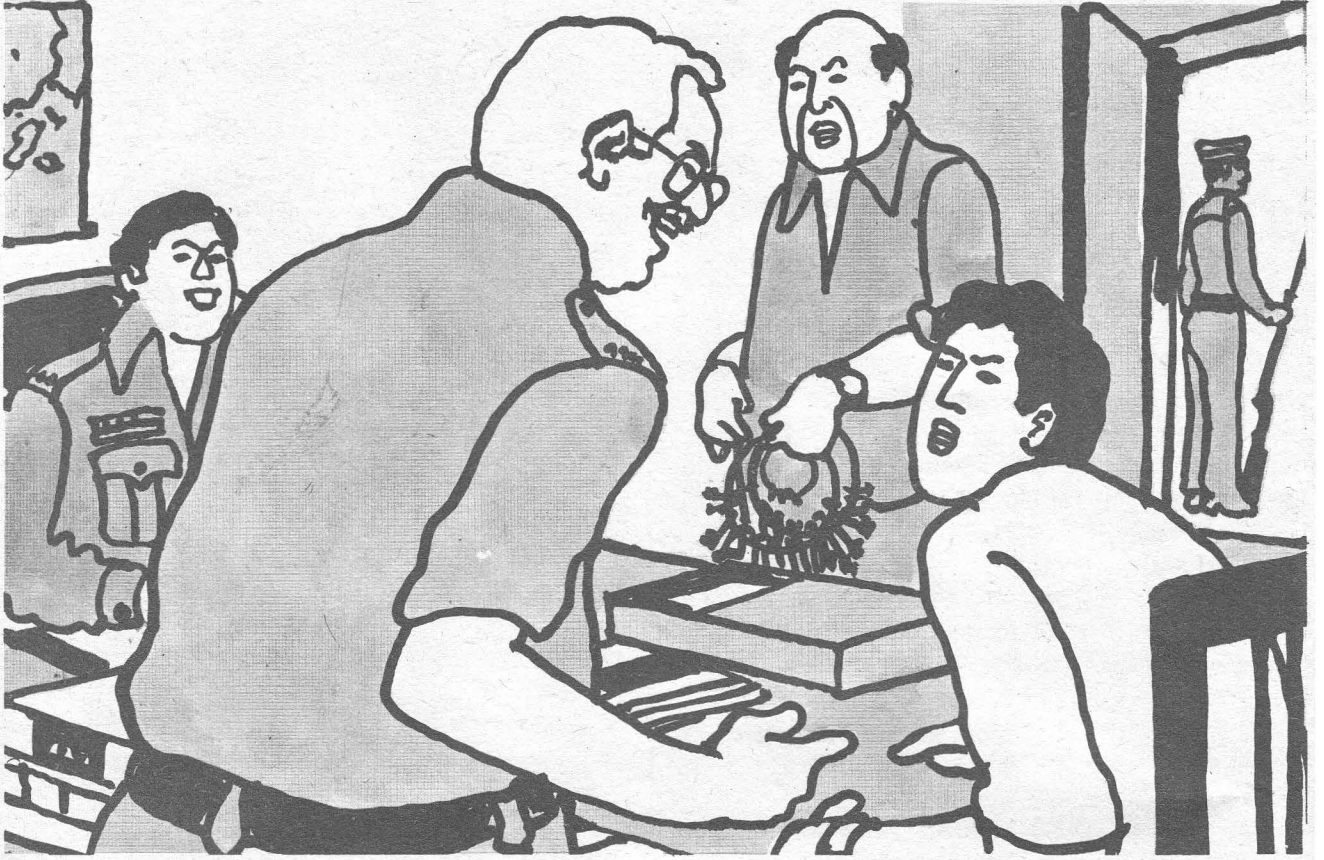
দেশে সেবার খুব বড় রকম রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল। ফলে, যা হয়ে থাকে, ছোট বড় অনেক নেতা ডেটেনিউ বা রাজবন্দী হয়ে জেলে চলে এলেন। জেলের কাজ হল শুধু তাঁদের আটক রাখা। কাপড়চোপড় খাবার-দাবার ইত্যাদি দরকারি ও অদরকারি জিনিসের জন্যে সরকারি ভাতা পান তাঁরা। অর্ডারমতো জেল সেগুলোর যোগান দেয়।

খাবার-ভাতা ছিল জনপ্রতি আড়াই টাকা। বছর পাঁচশের আগের কথা বলছি। বেশ সস্তাগণ্ডার দিন। খাওয়া-দাওয়াটা বেশ ভালভাবেই হত। ওঁদের সংখ্যা তখন দুশো ছাড়িয়ে গেছে। মেস করে থাকতেন। ঠাকুর-চাকর মানে জেলের কয়েদি। তাদের তো আর মাইনে দিতে হত না। রোজই প্রায় ভোজ। হরেক রকম মেনু। সেগুলো যোগাড় করতে গিয়ে জেলকে মাঝে মাঝে হিমসিম খেতে হত। একদিন তাই নিয়ে বাধল গোল।

এটা-সেটা নিয়ে গোল অবিশ্যি প্রায়ই বাধত। সরকারের সঙ্গে যাঁদের বিরোধ জেলে তাঁরা লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবেন সেটা আশা করা যায় না। আজ এ-দাবি, কাল ও-দাবি, তাছাড়া নালিশ ফরিয়াদ বাদ-বিসংবাদ লেগেই থাকত। জেল-সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট মলয় চৌধুরীর অনেকটা সময় চলে যেত সে-সব মেটাতে। কাজ-কর্ম প্রায় শিকেয় উঠেছিল।

সেদিন তাই খুব সকাল সকাল আফিসে এসে সবে একটা ফাইলের ফিতে খুলেছেন, দরজার পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এল একখানা থমথমে মুখ, সেই সঙ্গে একটা হাঁক—"আসতে পারি?"

মেস কমিটির সেক্রেটারি ডেটেনিউ মিহির সোম।

চৌধুরীসাহেবের পিত্তি জ্বলে উঠল। কিন্তু মুখে একখানা মোলায়েম হাসির মুখোশ পরে বললেন, "আসুন, আসুন।"

মিহিরবাবু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, "আপনার ঐ গুদামবাবুকে এবার সরাতে হবে। ওকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।"

'গুদামবাবু' মানে স্টোর ক্লার্ক নিরঞ্জন ভৌমিক। ডেটেনিউ-দের মালপত্তর সরবরাহ করা তার কাজ। জেলের বিশাল গুদাম—চাল ডাল তেল নুন থেকে কয়লা কেরোসিন আলকাতরা—সবকিছুর ভারও তার উপর। তাই সিপাই ও কয়েদিরা তার নাম দিয়েছে গুদামবাবু।

সুপার জানতে চাইলেন, "কী করেছে সে?"

"তার কাজই তো হল আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি করা। আজ যা করেছে, সেটা আমাদের কাছে রীতিমত অপমান।"

"অপমান!"

"তাছাড়া আর কী? কালকের জন্যে আমি চারশো আটান-ব্বইটা কইমাছের অর্ডার দিয়েছিলাম। স্লিপ ফেরত দিয়ে দিয়েছে আর কিচেনের মেটকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, আমাদের কইমাছের ফ্যাক্টরি নেই।"

একরাশ মালপত্তর আর শুকনো হিসাব-নিকাশ নিয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর স্টোর ক্লার্কের এতটা রসজ্ঞান আছে দেখে মনে মনে তার তারিফ করলেন মিস্টার চৌধুরী। মুখে অবশ্য বেশ রাগত ভাব দেখিয়ে বললেন, "তাই নাকি? আচ্ছা আমি দেখছি।"

নিরঞ্জনকে ডেকে পাঠানো হল। সাড়ে পাঁচসের ওজনের চাবির

[বস্তা] (বস্তা বললেই হয়) কাঁধে ঝুলিয়ে সাহেবকে সেলাম করে এসে দাঁড়াল। তার বিরুদ্ধে মিহির সোম যে অভিযোগ করেছেন জানাতেই বলে উঠল, "আসল ব্যাপারটাই তো উনি আপনার কাছে চেপে গেছেন স্যার।"

"আসল ব্যাপার মানে?" জানতে চাইলেন সুপার।

"ঐ চারশো আটানব্বইটা কই ঠিক এক সাইজের হওয়া চাই। একটু উনিশ-বিশ হলে নেবেন না। আপনিই বলুন স্যার, এ কখনো হয়? কইমাছ তো কারখানায় তৈরি নাট-বল্টু নয় যে ঠিক এক সাইজের হবে।"

চৌধুরীসাহেব মিহিরবাবুর দিকে ফিরলেন। তিনি স্বীকার করলেন, ছোটবড় হলে পরিবেশনের বেলায় তাঁদের অসুবিধা হয়। কয়েকজন লোক আছেন, ঐ নিয়ে বড় ঝামেলা করেন।

নিরঞ্জনকে বললেন, বেশ খানিকটা শ্লেষ মিশিয়ে, "আপনার কন্ট্রাক্টরবাবু একটু চেষ্টা করলেই শ'পাঁচেক এক সাইজের মাছ যোগাড় করতে পারেন। পাঁচটা বাজার ঘুরতে হবে, এই যা। লাভ একটু কম হতে পারে। আসলে আপনি সেটা চান না।"

"এসব আপনি কী বলছেন?" ঝাঁজিয়ে উঠল নিরঞ্জন। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। সুপার হাত তুলে থামিয়ে দিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন জেলার। সুপারের ঠিক নীচে তাঁর পদ। বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় পাকা। কাজকর্মে চৌকস। সবচেয়ে আশ্চর্য ভদ্রলোকের উপস্থিত বুদ্ধি। ডেটেনিউরা তাঁকে পছন্দ করেন না এবং এড়িয়ে চলেন। তিনি সেটা জানেন। সেই-জন্যেই বোধহয় প্রথমেই মিহির সোমের দিকে নজর দিলেন, "কী খবর আপনাদের? এত সকাল সকাল কী মনে করে?"

মিহির কোন জবাব দিলেন না। সুপার বললেন, "ওদের কইমাছ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"কইমাছ? কী আশ্চর্য! এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে সাহেবের কাছে এসেছেন! আমাকে বললেই তো পারতেন।..... কী হয়েছে নিরঞ্জন?"

নিরঞ্জন আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বলল। শুনে একটুখানি কী ভাবলেন জেলারবাবু। তারপর, এটা যেন কোনো সমস্যাই নয়, এমন ভাবে মিহির সোমকে জানালেন, "শ'পাঁচেক কইমাছের মামলা। তার জন্যে ভাবনা কিসের? পেয়ে যাবেন।"

"এক সাইজের হবে তো?" কথাটা যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না ; তাই স্পষ্ট করে নিতে চাইলেন মিহিরবাবু।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক সাইজই পাবেন। ইচ্ছে হলে ফিতে দিয়ে মেপে নেবেন। তবে কিছুটা সময় লাগবে।"

"কদিন?" জানতে চাইলেন মেস কমিটির সেক্রেটারি। তাই বুঝে তাঁকে মেনু তৈরি করতে হবে।

জেলারবাবু আবার একটু ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, "তা, বছরখানেক তো বটেই।"

"বছরখানেক!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিহির সোম, "আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?"

জেলার দাঁতে জিব কাটলেন, "ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন। আপনাদের সঙ্গে কি আমাদের ঠাট্টার সম্পর্ক? একদম সিরি-য়াসলি বলছি। আপনিও নিশ্চয়ই বোঝেন, ঠিক একরকম পাঁচশো কইমাছ একদিনে জোটানো, ভগবান হয়তো পারেন, মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ আপনাদের চাই। তাই আমরা আজই সরকারি মৎস্যবিভাগ অর্থাৎ ফিশারিজ ডিপার্টমেণ্টে অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা একটা আলাদা পুকুরে ডিম ফেলবে, সে ডিম ফুটবে, বাচ্চা বেরোবে, সেগুলো বড় হবে। খাবার মতো অর্থাৎ আপনাদের খাবার মতো পুরুষ্টু হতে অন্তত এক বছর তো লাগবেই। তবে সাইজে বা দেখতে তফাত হবে না। সব যমজ ভাই তো।"

ছবি সুধীর মৈত্র

বাক্যবীর

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বেয়াক্কেলে বাক্যবীর
ধর্মরাজের সত্যপীর
বুঝতে পারে দু'পাঁচজন
মাঝেরহাটে প্রভঞ্জন
আটের বি-তে জোয়ার জল
দিনদুপুরে রাতবদল
রথের মেলায় আটের-বি
বেল পাকলে কাকের কী
প্রশ্ন নিয়ে তুষ্ণী কাক
নাস্তা করে সুষনি শাক
বেয়াক্কেলে বাক্যবীর
দায়িত্বে রয় ধীরস্থির
ভলতেয়ারের ভুল ভেলায়
হলদিঘাটে জলদি যায় ॥

ছবি দেবাশিস দেব

মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কথায় ভেজে চিড়ে মুড়ি
খই বাতাসা
সেইটুকুনি দেখতে আসা।
জল ভেজাতে পারল কিছু?
হাঁসের পালক, মুখটি নিচু—
রানার গায়ের গুগলি-গেঁড়ি
জল ভেজাতে পারল কিছু?

তাই তো বলি, কথায় ভেজে
ভরন-কাঁসার বদনা-গাড়ু—
জল থই-থই থাক নাগাড়ু।
মিষ্টি কথায় ছিষ্টি ভেজে
বিষ্টিতে নয়, মিষ্টি কথায়
যত্রতত্র, যথাতথা॥

ছবি দেবাশিস দেব

ছড়ার মুখোশ

আনন্দ বাগচী

মুখোশ মানে মুখের ঢাকা মুখোশ মুখপাত্র
চিনবে না কেউ ঘুরে বেড়াও আদুল করে গাত্র।
পালটে দেবে জিওগ্রাফি মুখ বদলের মুখোশ
জুজুর ভয়ে ঘরের কোণে মিথ্যে কেন লুকোস।
মুখোশ আছে হরেক রকম মুখোশ আছে মজার
বহুরূপীর অয়েল কালার কর্মকর্তা ভজার।
ছন্নছাড়া ছড়ার মুখোশ শিশুর হাসি বোঝার
এবড়ো-খেবড়ো মুখের ওপর চালাচ্ছে বুলডোজার।

॥ ২ ॥

টাউনের ক্লাউনের অ্যায়সাই মুখোশ এ
ছড়াটে কবির হাতে হল দুর্মুখো সে।
চীন দেশী ভিনদেশী পায়ে পরে শু কষে
ছিপে ধরে গুলমাছ, ভাত খায় শুখো সে।
বাঁ হাতে সে গাড়ু ধরে, ডান হাতে হুঁকো সে,
একদিন অনাহারে একদিন উপোসে।
দাঁতে ঘন মিশি মেখে ঘষেছিল উকো সে
কাকতাড়ুয়ার মতো চুনকালি-মুখো সে।
মুখ যেন খোলতাই ফোল্ডিং ছাতা
মুড়ে রাখো এতটুকু, খুললেই ইয়া,
আঠা-সাঁটা করে ফিরি করে কলকাতা
কখনো সে কোরিয়ায়, কখনো গড়িয়া॥

ছবি দেবাশিস দেব

আমার বাড়ি

আলোক সরকার

আমার বাড়ি ঠিক কেমন হয়
যখন থাকি আমি ইস্কুলে!
জাহাজ? ভেসে যায় দুলে-দুলে?
নাকি সে হীরামন ছোট্ট পাখি
একলা ঘোরে সারা আকাশময়।

তখন রোদ্দুর কেমন রঙ
মালতীফুলগুলো কী ভাবে ঝরে?
কে এসে বসে থাকে আমার ঘরে—
সিঁড়ির বাঁকে যায় সিঁড়ির থেকে
দালানে, নেই তার পরিশ্রম।

দাঁড়ের কাকাতুয়া হঠাৎ নাকি
ছোট্ট ছেলে হাতে তীর ধনুক
দুচোখ বড় বড় চওড়া বুক।
দুপুর কেটে যায় ভাবনা শুধু
ভাবনা গড়ে ভাঙে, ভাবনা আঁকি

ছবি দেবাশিস দেব

সাবুখেকো

সুনীল বসু

উটকো একটা লোক দ্যাখো ওই
বোঁটকা গন্ধ গায়ে,
ও নাকি রোজ পদ্য লেখে
দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
লোকটা ভারী মজার এবং
এক পায়ে দেয় মোজা
একটা কিছু হারিয়ে গেলে
করবে গোরুখোঁজা।
শুঁটকো-মতন কুকুরটা ওর
ঢেকুর তোলে রাতে
আধখানা চাঁদ মারলে উঁকি
পোড়ো বাড়ির ছাতে।
কান্না পেলে লোকটা নাকি
খুকুর-খুকুর হাসে,
গাছের ডালে বসলে পাখি
পদ্য-টদ্য আসে।
এ-পাড়াতে সবাই বলে
লোকটা ভারী মজার,
হাটখোলাতে ব্যবসা আছে
টাটকা জিবেগজার।
মজার সঙ্গে গজার মিলই
করল ওকে কাবু,
ভাত খাওয়া তো ছেড়েই দিল
ধরেছে দুধ-সাবু।

ছবি দেবাশিস দেব

সত্যজিৎ রায়

মহাকাশের
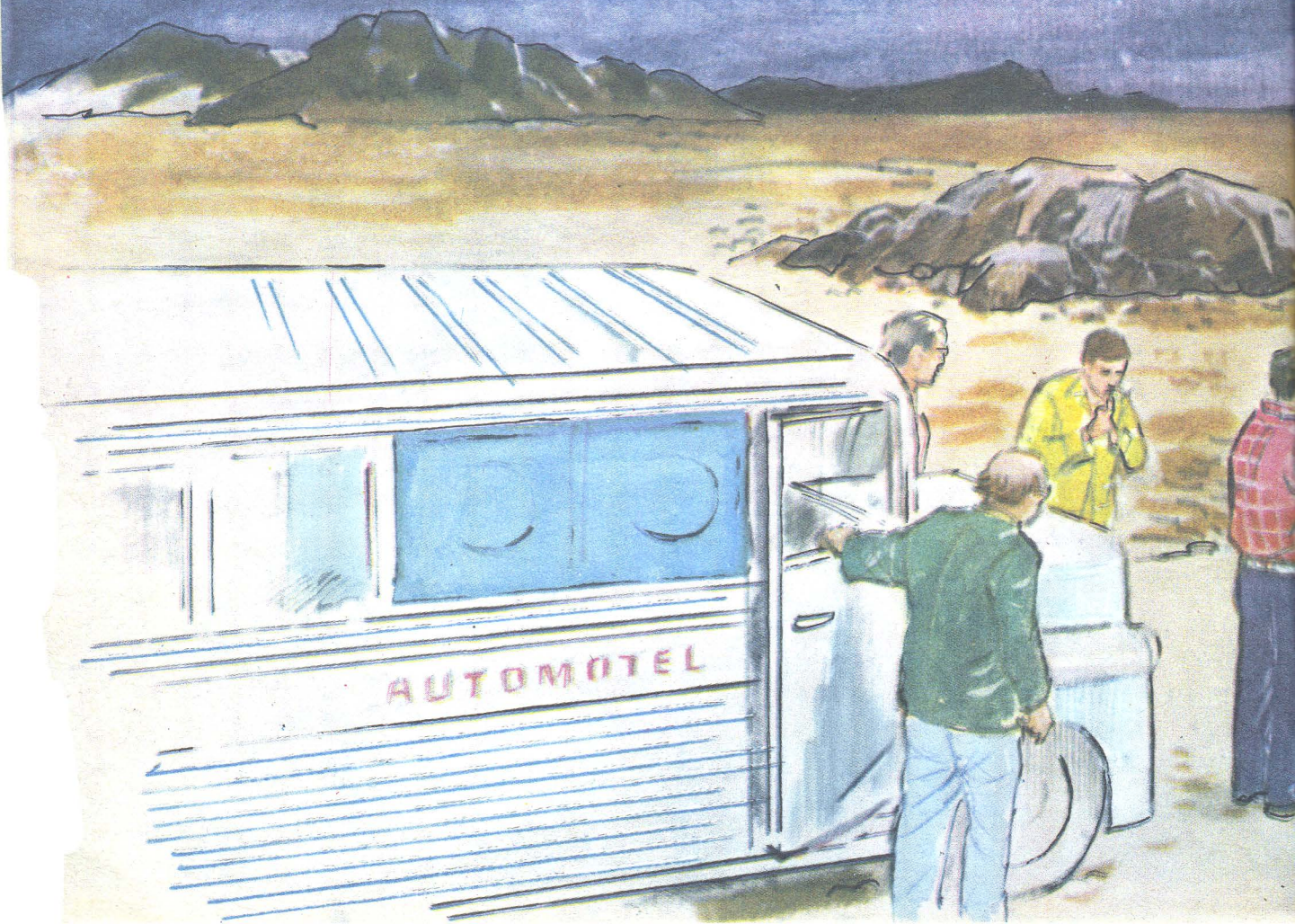
২২শে অক্টোবর

ব্রেন্টউড, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় শঙ্কু,

মনে হচ্ছে আমার বারো বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেতে চলেছি। খবরটা এখনো প্রচার করার সময় আসেনি, শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি।

কাল রাত একটা সাঁইত্রিশে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো একটা অংশ থেকে আমার সংকেতের উত্তর পেয়েছি। মৌলিক সংখ্যার সংকেতের উত্তর মৌলিক সংখ্যাতেই এসেছে; সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ছায়াপথের ওই অংশে কোনো একটি গ্রহ বা উপগ্রহে এমন প্রাণী আছে যারা আমাদের গণিতের ভাষা বোঝে এবং যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

তবে আশ্চর্য এই যে, পৃথিবী থেকে এই বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের যে দূরত্ব তাতে বেতার তরঙ্গে সংকেত পৌঁছাতে লাগা উচিত দশ বছর। আমি প্রথম সংকেত পাঠাই আজ থেকে বারো বছর আগে; নিয়মমতো উত্তর আসতে লাগা উচিত ছিল আরো আট বছর। সেখানে মাত্র দু' বছর লাগল কেন? তাহলে কি এই প্রাণী বেতার-তরঙ্গের গতির চেয়েও অনেক বেশি দ্রুত গতিতে সংকেত পাঠানর উপায় আবিষ্কার করেছে? এরা কি তাহলে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত?
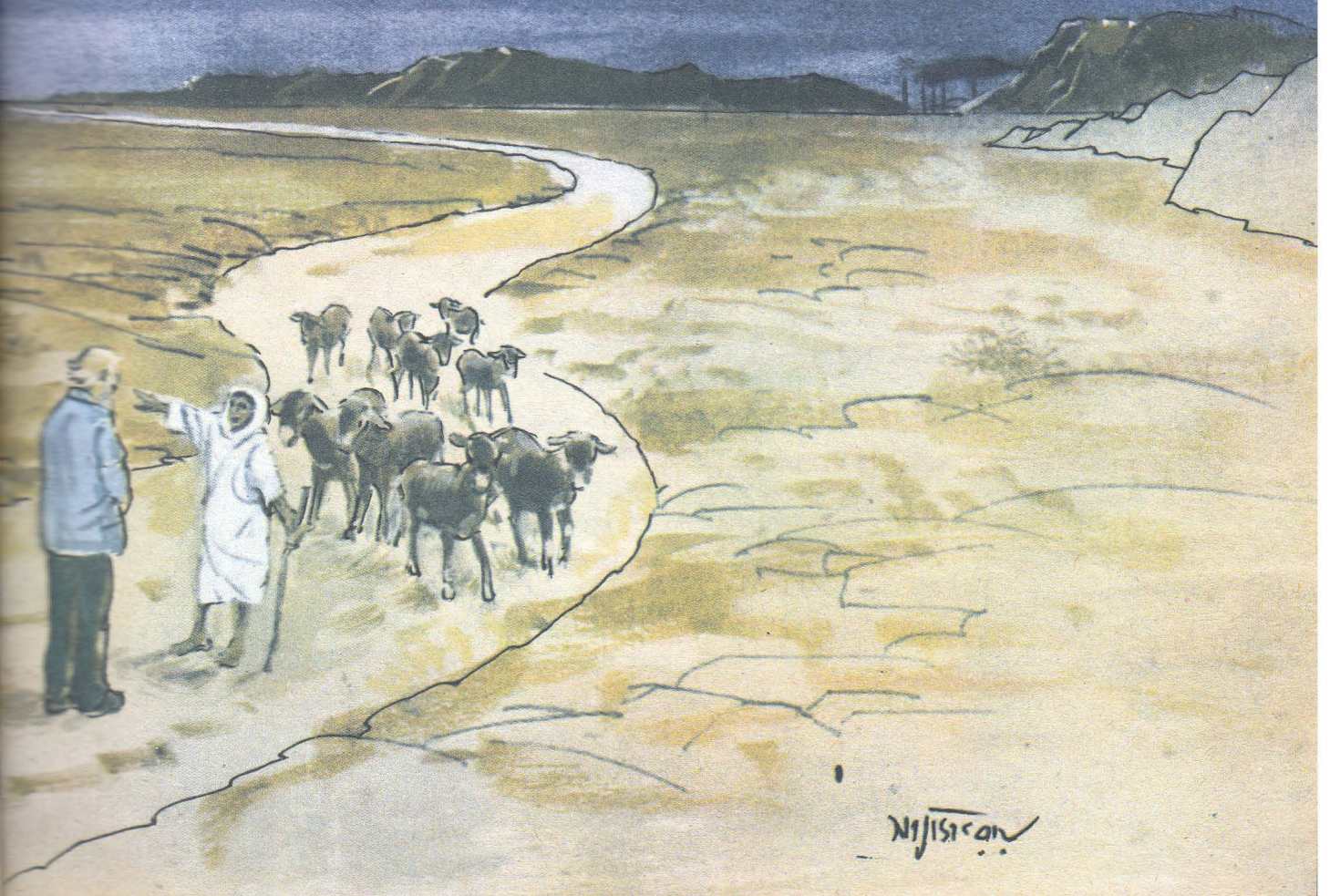
যাই হোক, এই নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমাকে খবরটা দিলাম কারণ আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই মিশরের সেই প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ছে।

আশা করি ভাল আছ। নতুন খবর পেলেই তোমাকে জানাব। শুভেচ্ছা নিও।

ফ্রানসিস :

ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রানসিস ফীল্ডিং হল আমার বাইশ বছরের বন্ধু। অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কিনা, বহু চেষ্টায় তার কোনো ইঙ্গিত না পেয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যখন প্রায় হাল ছাড়তে বসেছে, ফীল্ডিং তখনও একা তার নিজের তৈরি ৯৫ ফুট ডায়ামিটারের রিসীভার তার নিজের বাড়ির পিছনের জমিতে বসিয়ে এক নাগাড়ে বছরের পর বছর ছায়াপথের একটি বিশেষ অংশে ২১ সেণ্টিমিটারে বেতার তরঙ্গে গাণিতিক সংকেত পাঠিয়ে চলেছে। আজ তার সফলতার ইঙ্গিত পেয়ে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ফ্রানসিস যে প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সে বিষয় কিছু বলা দরকার।

প্রাচীন মিশরের একটানা সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে অনেক রাজার উল্লেখ আছে, এবং এদের সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিৎরা অনেক আশ্চর্য জিনিস পেয়েছেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মা যাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য কফিনবন্ধ শবদেহের সঙ্গে ধনরত্ন পুঁথিপত্র পোষাক - পরিচ্ছদ বাসনকোসন ইত্যাদি বহু সামগ্রী পুরে দেওয়া হত সমাধির মধ্যে। এই সমাধির প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেও, ভিতরের জিনিসপত্র অনেক সময়ই লুট হয়ে যেত। ১৯২২ সালে বালক-রাজা তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার হবার পরে যখন দেখা গেল যে প্রবেশদ্বারের সীলমোহরটি অক্ষত রয়েছে, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। আজ কায়রো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায় কী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল এই সমাধিতে।

গত মার্চ মাসে আমেরিকান ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন কায়রোতে বেড়াতে এসে খবর পান যে সেইদিনই সকালে স্থানীয় পুলিস দুটি চোর ধরেছে যাদের কাছে প্রাচীন মিশরের কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে। তারা স্বীকার করেছে যে জিনিসগুলো এসেছে একটি মাস্তাবা বা সমাধি থেকে। নাইলের পূব পারে বেনি হাসানে একটি চূনা পাথরের টিলার গায়ে লুকোন ছিল এই মাস্তাবার প্রবেশপথ।

মর্গেনস্টার্ন তৎক্ষণাৎ মিশর সরকারের অনুমতি নিয়ে নিজের খরচে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল খাড়া করে এই মাস্তাবার ভিতরে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। ধনরত্ন বিশেষ অবশিষ্ট না থাকলেও, একটি জিনিস পাওয়া যায় যেটা খুবই অদ্ভুত এবং মূল্যবান। সেটা হল একটা প্যাপাইরাসের দলিল।

প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে নিয়ে তাকে পানের তবকের মতো করে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজের মতো ব্যবহার করত মিশরীয়রা। এতদিন যে-সব প্যাপাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই রাজপ্রশস্তি, বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বা স্থানীয় উপকথা। কিন্তু এবারের এই প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় সেটা কতকগুলি দৈববাণী, যাকে ইংরাজিতে বলে ওর্যাকলস। ফ্রান্সের দৈবজ্ঞ নস্ট্রাডামুসের ওর্যাকলসের কথা অনেকেই জানে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পদ্যে লেখা এক হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলোই পরবর্তী কালে আশ্চর্যভাবে ফলে গেছে। লণ্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসী বিপ্লবে ষোড়শ লুই-র গিলোটিনে মুণ্ডপাত, নেপোলিয়ন-হিটলারের উত্থান-পতন, এমন-কি হিরোশিমা ধ্বংসের কথা পর্যন্ত নস্ট্রাডামুস বলে গিয়েছিলেন।

মিশরের এই প্যাপাইরাসেও এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বিজ্ঞান সংক্রান্ত। হয়ত যাঁর সমাধি, তিনিই করেছেন এইসব ভবিষ্যদ্বাণী। যিনিই করে থাকুন, তাঁর গণনায় স্তম্ভিত হতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাষ্পযান আকাশযান টেলিফোন টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা; যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা আছে; কম্পিউটারের বর্ণনা আছে, এক্স-রে ইনফ্রা-রেড রে আল্ট্রা ভায়োলেট-রে'র কথা বলা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে—এবং যেটা সবে বৈজ্ঞানিক মহল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে—সেটা হল এই যে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরো অসংখ্য সৌরজগৎ আছে যেখানে নাকি নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটিমাত্র গ্রহে। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের চেয়ে নাকি অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয়, বহুকাল

থেকে নাকি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এবং পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্যাপাইরাসের লেখক নিজেই নাকি এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার জন্য নাকি এই ভিন্‌গ্রহের মানুষই দায়ী।

এই আশ্চর্য প্যাপাইরাসটি মর্গেনস্টার্ন কায়রোর সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে বলে-কয়ে আদায় করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। গত মে মাসে লণ্ডনে একটি বিশেষ বৈঠকে পৃথিবীর কয়েকজন বাছাইকরা বৈজ্ঞানিকের সামনে মর্গেনস্টার্ন এই প্যাপাইরাসটি উপস্থিত করেন, এবং সে সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করেন বিখ্যাত মিশর-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডওয়ার্ড থর্নিক্রফ্‌ট। জীর্ণ প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়ত সেখানে লেখকের নাম ছিল ; কিন্তু সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তবু, যেটুকু জানা গেছে তাও খুবই চমকপ্রদ। সন-তারিখের যা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের সঙ্গে ভিন্‌গ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ঠিক কবে এবং কোথায় আবার সেই গ্রহের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল, এবং তাই নিয়ে মর্গেনস্টার্ন গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

আমার সঙ্গে আমার জার্মান বৈজ্ঞানিক বন্ধু উইলহেল্‌ম ক্রোলও উপস্থিত ছিল এই সভায়। এমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক আমি কমই দেখেছি। বক্তৃতার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে সে যে কতবার 'হামবাগ, ফ্রড, ধাপ্পাবাজ' ইত্যাকার মন্তব্য করেছে তার হিসেব নেই। বক্তৃতার শেষে সে সরাসরি বলে বসল যে প্যাপাইরাসটা সে একবার হাতে নিয়ে দেখতে চায়। ক্রোলের যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলেই বোধ-হয় মর্গেনস্টার্ন অপমান হজম করে তার অনুরোধ রক্ষা করে। আমিও দেখলাম প্যাপাইরাসটাকে খুব মন দিয়ে, কিন্তু সেটা জাল বলে মনে হল না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ফীল্ডিং যে গ্রহ থেকে তার বেতার-সংকেতের উত্তর পেয়েছে, প্যাপাই-রাসে কি সেই গ্রহের প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে?

ব্যাপারটা আরো কিছু দূর না এগোলে বোঝার উপায় নেই।

২৬শে অক্টোবর

কাগজে আশ্চর্য খবর।

গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন আত্মহত্যা করেছে।

সে ইতিমধ্যে আবার কায়রোয় ফিরে গিয়েছিল ; কেন তা খবরে বলেনি। যেটা বলেছে সেটা হল এই—

কায়রোতে পৌঁছানর দুদিন পরেই সে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে তার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কারণ ঘুম ভাঙলেই সে দেখতে পায় তার জানালায় একটা শকুনি বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজার নাকি প্রথমে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভালো হয়নি। মর্গেনস্টার্ন রেগে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এদিকে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে এহেন অবিশ্বাস্য অভিযোগ সত্ত্বেও মর্গেনস্টার্নের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নিতে পারেনি ম্যানেজার। জানালাটা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করাতে মর্গেনস্টার্ন বলেন যে হাঁপানির জন্য তিনি বন্ধ ঘরে শুতে পারেন না।

দুদিন অভিযোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে কফি নিয়ে রুমবয় মর্গেনস্টার্নের ঘরের বেল বারবার টিপে কোনো জবাব না পেয়ে শেষে মাস্টার কী দিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। ভদ্রলোকের সুটকেস রয়েছে, স্নানের ঘরে প্রসাধনের জিনিসপত্র রয়েছে, আর বেডসাইড টেবিলের উপর রয়েছে টিকিট লাগানো একটা ছোট্ট পার্সেল, আর একটা খোলা চিঠি। চিঠিতে লেখা শুধু একটি লাইন—'নেফদেৎ আমায় বাঁচতে দিল না।'

মিশরীয়রা সেই প্রাচীন যুগ থেকে নানা-রকম জন্তু জানোয়ার পাখি সরীসৃপকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা করে পুজো করে এসেছে। শেয়াল কুকুর সিংহ প্যাঁচা সাপ বাজপাখি বেড়াল ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। শকুনি ছিল তাদের কাছে নেফদেৎ দেবী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় মর্গেনস্টার্ন ভোর রাত্তিরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় দ্বাররক্ষককে বেশ ভালো রকম বকশিস দিয়ে। পুলিস প্যাকেটটা খুলে দেখে তাতে কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা। সেটা থেকে বেরোয় মর্গেনস্টার্নের মহামূল্য রিস্টওয়াচ, যেটা সে পাঠাতে চেয়েছিল নিউ ইয়র্কে তার এক ভাইপোর কাছে।

এখানে বলা দরকার যে মিশরের প্রাচীন সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের নজির এটাই প্রথম নয়। তুতানখামেনের সমাধি

খননের ব্যাপারে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই লর্ড কারনারভনকেও কিছুদিনের মধ্যেই ভারী অদ্ভুতভাবে মরতে হয়েছিল। কায়রোর এক হোটেলেই তার গালে এক মশা কামড়ায়। সেই কামড় থেকে সেপটিক ঘা, এবং তার ফলে রক্তদৌর্বল্য থেকে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু।

কারনারভনের মৃত্যু যে সময়ে ঘটে, ঠিক সেই একই সময়ে ইংল্যাণ্ডে হ্যাম্পশায়ারে কারনারভনের পোষা কুকুরটি বিনা রোগে অকস্মাৎ মারা যায়। এই দুই মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে এই সমাধির কাজের সঙ্গে জড়িত আরো আটজন পর পর মারা যায় এবং কারুর মৃত্যুই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে ব্রায়ান ডেক্সটার এখন কোথায় আছে। ডেক্সটার একজন তরুণ বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ফোটোগ্রাফার। সে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে ছিল এই সমাধি খননের ব্যাপারে। কথা ছিল কায়রোর কাজ শেষ হলে ও ভারতবর্ষে চলে আসবে। বছর তিনেক আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে: আমার চিঠিতেই ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেক্সটারকে কালিবঙ্গনে গিয়ে হারাপ্পা সভ্যতার নিদর্শনের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দেয়। ও বলে রেখেছে এবার এলে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

২৮শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর চিঠিতে চাঞ্চল্যকর খবর।

ছায়াপথ থেকে সংকেত এখন রীতিমত স্পষ্ট, এবং তা শুধু মৌলিক সংখ্যায় নয়।

ফীল্ডিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহই হচ্ছে প্যাপাইরাসের গ্রহ। যেভাবে ঘন ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম-না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, অনেক দিনের পুরোন বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

ফীল্ডিং-এর উত্তেজনা আমিও আমার শিরায় অনুভব করছি। গভীর আপশোষ হচ্ছে প্যাপাইরাসের ওই হারানো শেষাংশের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহের প্রাণী আবার কবে পৃথিবীতে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তার ইঙ্গিত এই হারানো অংশে ছিল। কালই রাত্রে আমার বাগানে ডেক-চেয়ারে বসে ছিলাম অন্ধকারে, নিউটন আমার কোলে, আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। এমনিতেই অক্টোবরে উল্কাপাত হয় অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি; কাল দেড় ঘণ্টায় সতেরটা উল্কা দেখেছি, আর প্রতিবারই প্যাপাইরাসের গ্রহের কথা মনে হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর কাছ থেকে জরুরী টেলিগ্রাম—'পত্রপাঠ চলে এসো কায়রো—তোমার জন্য হোটেল কার্ণাকে ঘর বুক করা হয়ে গেছে।' আমি জানিয়ে দিয়েছি ৩রা নভেম্বর পৌঁছচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ কায়রো কেন?

ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা নভেম্বর

আমি কালই পৌঁছেছি, যদিও প্লেন ছিল তিন ঘন্টা লেট। আমার মন বলছিল এয়ার-পোর্টে এসে দেখব শুধু ফীল্ডিং নয়, ক্রোলও এসেছে; কিন্তু সেই সঙ্গে যে আরেকজন থাকবে, সেটা ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন ব্রায়ান ডেক্সটার। ব্রায়ানকে দেখেই বুঝলাম যে তার ওপর ভারতবর্ষের সূর্যের প্রভাব পড়েছে, কারণ তার এত তামাটে রঙ আগে কখনো দেখিনি।

ব্রায়ান এবারও কালিবঙ্গন গিয়েছিল, আর সেখানে থাকতেই মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সোজা লণ্ডনে চলে আসে। আত্মহত্যার বিবরণ শুনে সে নাকি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যদিও আমি জিগ্যেস করাতে বলল, অভিশাপ-টভিশাপে তার বিশ্বাস নেই। তার ধারণা মর্গেনস্টার্নের সানস্ট্রোক জাতীয় কোনো ব্যারামের সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলে মাথাটা বিগড়ে যায়। ব্রায়ান নাকি বেনি হাসানের সমাধি খননের সময়ই লক্ষ্য করেছিল যে মর্গেনস্টার্ন রোদের তাপ একদম সহ্য করতে পারে না।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কি সে সত্যিই উৎসাহী ছিল?' ব্রায়ান বলল, 'অগাধ টাকা থাকলে অনেক লোক নানারকম শখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তাছাড়া খ্যাতির প্রতিও মর্গেনস্টার্নের একটা লোভ ছিল। শুধু বড়লোক হয়ে আর আজকাল আমেরিকায় বিশেষ কেউ নাম করতে পারে না। সবাই চায় একটা কোনো কীর্তি রেখে যেতে। হয়ত মর্গেনস্টার্ন চেয়েছিল এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ফিনান্স করে সে বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করবে।'

আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফীল্ডিং বাধা দিয়ে বলল বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে।

লাঞ্চের পর কার্ণাক হোটেলের দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে বাকি কথা হল। সামনে নীল নদ বয়ে চলেছে, টুরিস্টদের জন্য নানারকম বোট সাজানো রয়েছে জেটিতে, রাস্তায় দেশ-বিদেশের বিচিত্র লোকের ভীড়।

প্রথমেই ব্রায়ান তার ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা বড় খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'দেখ ত জিনিসটা তোমার চেনা কিনা।'

খুলে দেখি, আরে, এ যে সেই প্যাপাইরাসটার ফোটোগ্রাফ!

'জিনিসটা পাওয়া মাত্র এটার ছবি তুলে রেখেছিলাম,' বলল ব্রায়ান।—'তুমি যে প্যাপাইরাসটা লণ্ডনে দেখেছিলে সেটার সঙ্গে কোনো তফাৎ দেখছ কি?'

দেখছি বৈ কি!—ছবিটা হাতে নিতেই ত তফাৎটা লক্ষ্য করেছি। এটা সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।

ব্রায়ানকে জিগ্যেস করাতে সে ব্যাপারটা বলল।—

'আসলে প্যাপাইরাসটার অবস্থা এমনিতেও ছিল বেশ জীর্ণ। পাঁচ হাজার বছর পাকানো অবস্থায় সমাধিকক্ষের এক কোণে পড়ে ছিল। এটা আমিই প্রথম পাই। আর পেয়ে প্রথমেই সাবধানে পাক খুলে মাটিতে ফেলে চারকোণে চারটে পাথর চাপা দিয়ে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট ফোটো তুলে নিই। মর্গেনস্টার্ন এটা দেখেই বগলদাবা করে। আমি ওকে বলি সে যেন খুব সাবধানে জিনিসটা হ্যাণ্ডল করে। মুখে হ্যাঁ বললেও বেশ বুঝতে পারি ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।

'ও প্রথমেই যায় থর্নিক্রফ্‌টের কাছে। থর্নিক্রফ্‌ট লেখাটা পড়ে দেবার পর মর্গেনস্টার্ন সোজা চলে যায় কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর মিঃ এব্রাহিমের কাছে। আমার মনে আছে সেদিন খুব ঝড় ছিল; বালিতে শহর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস তখনই প্যাপাইরাসের শেষ অংশটা খোয়া গেছে।'

'ওয়েল, শঙ্কু?'

ক্রোল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রথম থেকেই

লক্ষ্য করছি। ক্রোল হায়রোগ্লিফিক্সের ভাষা ভালো ভাবেই জানে, এবং বুঝতেই পারছি সে ইতিমধ্যে শেষ অংশটির মানে বার করে ফেলেছে, আর তাই এই উত্তেজনা।

আমি বললাম, 'এই অংশতে ত দেখছি দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে—মেনেফ্রু। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তাও দেওয়া রয়েছে।'

ফীল্ডিং বলল, 'সেই জন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনালাম। অমাবস্যা ত আর দুদিন পরেই, আর দৈবজ্ঞ যদি সনে ভুল না করে থাকেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এতে যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে তার থেকেই ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার হিসাব করে দেখেছিলাম, ছিয়াত্তর বছর পর পর যদি হ্যালির ধূমকেতু আসে, তাহলে আজ থেকে ঠিক পাঁচহাজার বছর আগে একবার সেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল—অর্থাৎ ৩০২২ বি সি-তে।'

ক্রোল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, 'আমারও হিসেব তোমার সঙ্গে মিলছে। প্যাপাইরাসে বলছে দৈবজ্ঞের যখন অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আকাশে

ধূমকেতু ছিল। সেটা ৩০২২ হওয়া এই জন্যই সম্ভব কারণ তখন ঈজিপ্টে মেনিসের রাজত্ব-কাল, আর সেটাকেই বলা হয় ঈজিপ্টের স্বর্ণ-যুগের শুরু। সব মিলে যাচ্ছে, শঙ্কু!'

ডেক্সটার বলল, 'কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি? এক-আধ বছরও কি এদিক-ওদিক হতে পারে না?'

ফীল্ডিং তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, এতে কোনো ভুল নেই, কারণ আমি এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এবং তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা হল এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।'

'তার মানে মরুভূমিতে?' ডেক্সটার প্রশ্ন করল।

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

'কিন্তু কী ভাষায় পেলে এই সংকেত?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'টেলিগ্রাফের ভাষা,' বলল ফীল্ডিং, 'মর্স।'

'তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর?'

'সেটা আর আশ্চর্য কী, শঙ্কু। ভুলে যেও না তাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।'

'তাহলে ত তারা ইংরেজিও জানতে পারে।'

'কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে আমি ইংরেজ কিনা সেটা হয়ত তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তারা মর্স কোড ব্যবহার করেছে।'

'তাহলে আমাদের গন্তব্যস্থল হল কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।—'তারা ত আর এই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না!'

ফীল্ডিং হেসে বলল, 'না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমরা যাব বাওয়িতি—এখান থেকে দুশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তা আছে, তবে তাকে হাইওয়ে বলা চলে না। অবিশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ক্রোলের গাড়িটা ত তুমি দেখেছ।'

তা দেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে ক্রোলের গাড়িতেই এসেছি। বিচিত্র গাড়ি—যেন একটি ছোটখাটো চলন্ত হোটেল। সেই সঙ্গে মজবুতও বটে। 'অটোমোটেল' নামটা ক্রোলেরই দেওয়া।

'ডাঃ থর্নিক্রফ্‌টও আসছেন কাল সকালে,' বলল ফীল্ডিং, 'তিনিও হবেন আমাদের দলের একজন।'

এ খবরটা জানা ছিল না। তবে থর্নিক্রফ্‌টের আগ্রহের কারণটা স্পষ্ট। হাজার হোক তিনিই ত প্যাপাইরাসের পাঠোদ্ধার করেছেন।

'তোমার অ্যানাইহিলিনটা সঙ্গে এনেছ ত?' ক্রোল জিগ্যেস করল।

আমি জানিয়ে দিলাম যে এ ধরণের অভিযানে সেটা সব সময়ই সঙ্গে থাকে। আমার তৈরি এই আশ্চর্য পিস্তলের কথা এরা সকলেই জানে। যত বড় এবং যত শক্তিশালী প্রাণীই হোক না কেন, তার দিকে তাগ করে এই পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই সে প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবশুদ্ধ বার দশেক চরম সংকটের সামনে পড়ে আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। প্যাপাইরাসের বিবরণ থেকে এই ভিন্-

গ্রহের প্রাণীকে হিংস্র বলে মনে হয় না, কিন্তু এবার যারা আসবে তাদের অভিপ্রায় যখন জানা নেই, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলে ক্ষতি কী?

আমরা চার জনে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়ে রইলাম যেন আমাদের এই আসন্ন অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আমরা উঠে যে-যার ঘরে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দেখি হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুম আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখানে বলে রাখি যে এই কার্ণাক হোটেল থেকেই মর্গেনস্টার্ন উধাও হয়েছেন, এবং এই মিঃ নাহুমকেই মর্গেনস্টার্নের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

নাহুম জানালেন যে মর্গেনস্টার্নের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। কাজেই ধরে নিতে হয় মর্গেনস্টার্ন শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

'আর কোনো শকুনি-টকুনি এসে কোনো ঘরের জানলায় বসছে না ত?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল ক্রোল।

জিভ কাটার অভ্যাস ঈজিপ্সিয়দের থাকলে অবশ্যই মিঃ নাহুম জিহ্বা দংশন করতেন। তার বদলে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ফিস্-ফিস্ করে বললেন, 'আপনাদের বলতে দ্বিধা নেই—আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ কোনদিন শকুনি দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বেড়াল-কুকুর যে এক-আধটা দেখা যাবে না তার ভরসা দিতে পারছি না, হে হে।'

আমরা ঠিক করেছি কাল লাঞ্চের পরেই রওনা দিয়ে দেব। কী আছে কপালে জানি না, তবে আমি মনে করি ঈজিপ্টে আসার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। এখানে এসে দু মিনিট চুপ করে থাকলেই চারপাশের আধুনিক শহরের সব চিহ্ন মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই প্রাচীন যুগের মিশর। ইমহোটেপ, আখেনাতন, খুফ্রু, তুতানখামেনের দেশে এসে নামবে ছায়াপথের কোন্ এক অজ্ঞাত সৌর-জগতের প্রাণী? ভাবতেও অবাক লাগে।

৫ই নভেম্বর

আজ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুটো ঘটনা আমাদের সকলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখনো তার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি ঠিক করেছিলাম আজ ভোর পাঁচটায় উঠে হোটেল থেকে বেরিয়ে নাইলের ধারে একটু ঘুরে আসব। গিরিডিতে রোজ ভোরে উশ্রীর ধারে বেড়ানোর অভ্যেসটা আমার বহু-কালের।

ঘুম আমার আপনা থেকেই সাড়ে চারটেয় ভেঙে যায়। আজ কিন্তু ভাঙল স্বাভাবিক ভাবে নয়। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাই এই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

ব্যস্তভাবে উঠে জাপানে উপহার পাওয়া বেগুনী কিমোনোটা চাপিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডেক্সটার—তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দম ফেলছে যেন ম্যারাথন দৌড়ে এল!

'কী ব্যাপার?'

'এ স্নেক—এ স্নেক ইন মাই রুম!'

কথাটা শেষ করে টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকে সে ধপ্ করে আমার খাটে বসে পড়ল।

আমি জানি ডেক্সটারের ঘর আমার তিনটে ঘর পরে। বাকি দুজন রয়েছে আমাদের উপরের তলায়, তাই সে আমার কাছেই এসেছে।

ডেক্সটারকে আশ্বাস দিয়ে দৌড়ে প্যাসেজে গিয়ে হাজির হলাম।

মেঝেতে মিশরীয় নকশা-করা কার্পেট বিছানো সুদীর্ঘ প্যাসেজের এমাথা থেকে

ওমাথায় একটি প্রাণীও নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘড়ি বলছে আড়াইটে। যা করার আমাকেই করতে হবে।

সুটকেস থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে ছুট দিলাম একশো ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের দিকে। ডেক্সটারের কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছিল তা বলব না, তবে জরুরী অবস্থার জন্য তৈরি থাকা দরকার।

ঘরের দরজা হাট হয়ে আছে, ভিতরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘর আর আমার ঘরের মধ্যে তফাত শুধু দেয়ালের ছবিতে।

বাঁয়ে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম সাপটাকে। গোখরো। খাটের পায়া বেয়ে মেঝের কার্পেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্ধেক দেহ খাটের উপর। ভারতীয় গোখরোর মতো অত মারাত্মক না হলেও, বিষধর ত বটেই। প্রাচীন যুগে এই সাপকেও মিশরীয়রা পুজো করত দেবী হিসেবে।

আমার পিস্তলের সাহায্যে নিঃশব্দে নাগ-দেবীকে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

ডেক্সটার এখনো কাবু। মেনেফ্রুর রুষ্ট আত্মার অভিশাপে যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি, এই গোখরো তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমার মন অন্য কথা বলছে। তাই তরুণ ত্রস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌কে আমার তৈরি নার্ভিগারের এক ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

তাতেও অবিশ্যি পুরোপুরি কাজ হল না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তার ঘরের আর কোথাও কোনো সাপ নেই সেটা দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

ম্যানেজারের সঙ্গে একটা তুলকালাম হয়ে যেত, কিন্তু সাপটা কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হত বলে সেটা আর হল না। যেহেতু আজই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটালাম না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল হোটেলের পিরামিড রুমে, ব্রেকফাস্টের সময়। থর্নিক্রফ্‌টের প্লেন এসে পোঁছাবে ভোর ছটায়, সুতরাং তার হোটেলে পোঁছে যাওয়া উচিত সাড়ে সাতটার মধ্যে। আটটায়, তখনও আমাদের প্রাতরাশ শেষ হয়নি, ম্যানেজার স্বয়ং এসে খবর দিলেন যে থর্নিক্রফ্‌ট এসে পোঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটি আঘাত পেয়ে থর্নিক্রফ্‌ট সংজ্ঞা হারান। দুজন সুইস্‌ টুরিস্ট পুলিসের সাহায্যে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটা রাহা-জানি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনশো পাউন্ড সমেত থর্নিক্রফ্‌টের ওয়লেটটি লোপ পেয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয়নি। ভয় ছিল থর্নিক্রফটকে হয়ত দল থেকে বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রস্তাবটা উনি কানেই নিলেন না। বললেন ওঁর যে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য উনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। কারণ জিগ্যেস করাতে বললেন, 'জানি তোমাদের যুক্তি-বাদী মন এসব মানতে চায় না, আমি কিন্তু অভিশাপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তোমাদের যদি আমার মতো পড়াশুনা থাকত, তাহলে তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হতে।'

৫ই নভেম্বর, বিকেল পৌনে তিনটে

আমরা আর আধ ঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা লিখে রাখছি।

মিনিট পনের আগে মিঃ নাহুম একটি আজব জিনিস এনে দেখালেন আমাকে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পকেট ডায়রি। বোঝাই যায় সেটা বেশ কিছুকাল জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। ভিতরে লেখা যা ছিল তা সব ধুয়ে-মুছে গেছে; ছাপা অংশগুলোও আর পড়া যায় না। শুধু একটা কারণে জিনিসটার মালিকানা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না; সেটা হল ডায়রির ভিতরে পাতার সঙ্গে জেম ক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ফোটোগ্রাফ। বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, যার ফোটো তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। লন্ডনের সেই সভায় এনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ইনি মর্গেনস্টার্নের স্ত্রী মিরিয়াম। কায়রো থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে একটি জেলের বাড়ি থেকে পুলিস এই ডায়রিটা উদ্ধার করেছে। জেলের একটি সাত বছরের ছেলে নদীর ধারে কাদার মধ্যে এটাকে পায়।

মর্গেনস্টার্ন যতই বেআক্কেলি করে থাকুক না কেন, এই ডায়রিটা দেখে তার জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ফীল্ডিং।

৫ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

বাওয়িতি যাবার পথে কায়রো থেকে তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে অল্ ফাইয়ুমের একটা সরাইখানায় বসে কফি আর আখরোট খাচ্ছি আমরা পাঁচজনে।

থর্নিক্রফ্ট অনেকটা সুস্থ। ডেক্সটার চুপ মেরে গেছে। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, এবং তাকে বলা হয়েছে সে যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও না যায়। ক্রোল তার ক্যামেরার সরঞ্জাম সাফ করছে। তিনটে নতুন মডেলের লাইকা। তার একটায় বিরাট টেলিফোটো লেন্স। মহাকাশযানের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা সে ক্যামেরায় তুলে রাখবে। কয়েক বছর থেকে 'আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট' বা 'অনির্দিষ্ট উড়ন্ত বস্তু' নিয়ে যে পৃথিবীর বেশ কিছু লোক মাতামাতি করছে, তাদের সম্বন্ধে ক্রোলের অবজ্ঞার শেষ নেই। বলল, 'এই সব লোকের তোলা বহু ছবি পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে, কিন্তু ধাপ্পাটা ধরা পড়ে এতেই, যে সব ছবিতেই

উড়ন্ত বস্তুটিকে দেখান হয় একটি চাকতির মতো। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অন্য গ্রহের মহাকাশযান হলেই কি তার চেহারা চাকতির মতো হবে?'

ফীল্ডিং আমাদের দিকে চোখ টিপে প্রশ্ন করল, 'ধরো যদি আমাদের এই মহাকাশযানটিও চাকতির মতো দেখতে হয়?'

'তাহলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত আমার এই তিনটে ক্যামেরাই নাইলের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব,' বলল ক্রোল, 'চাকতি দেখার প্রত্যাশায় আসিনি এই বালি আর পাথরের দেশে।'

একটা চিন্তা কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা আর না বলে পারলাম না।—

'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যে এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে বেশ কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে? পাঁচ হাজার বছর আগে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু সে ত দেখেইছি। আরো পাঁচ হাজার পিছোলে দেখছি মানুষ প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে। আরো পাঁচ হাজার পিছিয়ে গেলে দেখছি মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়শী ইত্যাদি তৈরি করছে, আবার সেই সঙ্গে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকছে। ত্রিশ হাজার বছর আগে দেখছি মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে।... পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই পাঁচের হিসেবে যতটুকু ধরা পড়ছে সেটা আশ্চর্য নয় কি?'

আমার কথায় সবাই সায় দিল।

ক্রোল বলল, 'হয়ত এদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আছে—একেবারে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু অবধি।'

'তা তো থাকতেই পারে,' বলল ফীল্ডিং।—'এরা যদি জিগ্যেস করে আমরা কী চাই, তাহলে ওই দলিলের কথাটাই বলব। ওটা বাগাতে পারলে আর কোনো কিছুর দরকার আছে কি?'

কফি আর আখরোটের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

আজ অমাবস্যা।

বাকি পথটা আকাশের দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

৬ই নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছ'টা

বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখায় আমার অবাধ গতি বলে আমি নিজেকে সব সময় বৈজ্ঞানিক বলেই বলে এসেছি, কোনো একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি করিনি। আমাদের দলের বাকি চারজনেই বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে, যদিও বয়স, অভিজ্ঞতা, কীর্তি বা খ্যাতিতে সকলে সমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, ফীল্ডিং, ক্রোল, থর্নিক্রফ্ট, ডেক্সটার, আমি—এদের কারুর মধ্যেই এখন আর কোনো তারতম্য ধরা পড়ছে না। মহাসাগরের তুলনায় টলির নালা আর গঙ্গার মধ্যে খুব একটা তফাৎ আছে কি?

কালকের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পরপর গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

অল্ ফাইয়ুমের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে মিনিট দশেক চলার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যেটার বিষয় বলার আগে ক্রোলের অটোমোটেলের ভিতরটা কিরকম সেটা একটু বলা দরকার।

সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজনের বসার জায়গা। তার ঠিক পিছনেই একটা সরু প্যাসেজের একদিকে একটা বাথরুম ও একটা স্টোররুম, আর অন্যদিকে একটা কিচেন ও একটা প্যানট্রি। প্যাসেজ থেকে বেরিয়েই দুদিকে দুটো করে বাঙ্ক—আপার ও লোয়ার। একজন অতিরিক্ত লোক থাকলে সে অনায়াসে দুদিকের বাঙ্কের মাঝখানে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে পারে।

গাড়ি চালাচ্ছিল ক্রোল, আর আমি বসে ছিলাম তার পাশে। পিছনে, লোয়ার বাঙ্কের একটায় বসে ছিল থর্নিক্রফ্ট, আরেকটায় ফীল্ডিং আর ডেক্সটার।

আমরা যখন বেরিয়েছি, তখন পৌনে সাতটা। আকাশে তখনও আলো রয়েছে। পথের দুধারে বালি আর পাথর। জায়গাটা মোটামুটি সমতল হলেও মাঝে মাঝে চুনা পাথরের ঢিলা বা টিলার সমষ্টি চোখে পড়ছে, তার মধ্যে এক-একটা বেশ উঁচু।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুমের মুখটা মনে পড়ছে, আর মনটা খচ্ খচ্ করে উঠছে। ভদ্রলোকের অতি-অমায়িক আচরণটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে—যেন তিনি কোনো একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আকাশে সবে দু-একটা তারা দেখা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা আর্তনাদ, আর তার পরমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের শব্দে স্টিয়ারিং-এ ক্রোলের হাতটা কেঁপে গিয়ে গাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারে একটা খানায় পড়ছিল।

দুটো শব্দই এসেছে আমাদের গাড়ির পিছন দিক থেকে।

জায়গা ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে পিছনে এসে দেখি থর্নিক্রফ্টের হাতে রিভলভার, ডেক্সটার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে. আর ফীল্ডিং যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হতভম্বের মতো বসে আছে, তার চশমার কাঁচে কোনো তরল পদার্থের ছিটে লেগে তাকে যেন সাময়িকভাবে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ডেক্সটারের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে মাথাথেৎলানো অবস্থায় পড়ে আছে আরেকটি গোখুরো। এর জাত কালকের গোখুরোর থেকে আলাদা। ইনিও মিশরের অধিবাসী। এঁর নাম স্পিটিং কোব্রা। ইনি ছোবল না মেরে শিকারের চোখের দিকে তাগ করে বিষের থুতু দাগেন। এতে মৃত্যু না হলেও অন্ধত্ব অবধারিত। ফীল্ডিং বেঁচে গেছে তার চশমার জন্য। আর সাপবাবাজী মরেছেন থর্নিক্রফ্টের সঙ্গে হাতিয়ার ছিল বলে।

অটোমোটেল থামিয়ে ফীল্ডিং-এর পিছনে কিছুটা সময় দিতে হল। বিষের ছিটে চশমার কাঁচের তলা দিয়ে বাঁ চোখের কোলে লেগেছিল সেখানে আমার মিরাকিউরল অয়েণ্টমেণ্ট লাগিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অভিশাপ-টভিশাপ নয়; কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। আমরা যখন সরাইখানায় বসে কফি খাচ্ছিলাম সেই সময় গাড়ির জানালা দিয়ে সাপটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে এই কাজটা করেছে. সে নিশ্চয় কায়রো থেকেই এসেছে।

আবার যখন রওনা দিলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাওয়িতি এখান থেকে আরো একশো কিলোমিটার। ম্যাপে তার পরে আর কোনো রাস্তার ইঙ্গিত নেই. তবে মোটামুটি সমতল জমি পেলে বালি পাথর অগ্রাহ্য করে এ গাড়ি এগিয়ে চলবে যদি সেটার প্রয়োজন হয়।

মিনিট দশেক চলার পর পথে একই সঙ্গে মানুষ ও জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল।

একটি বছর পনেরর ছেলে, হাতে লাঠি, এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে আমাদেরই দিকে. তার পিছনে এক পাল গাধা।

আমাদের গাড়িটা দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে হাত দুটোকে মাথার উপরে তুলে ঝাঁকাতে শুরু করল ছেলেটা।

'এস্টাপ্, এস্টাপ্, সাহিব! এস্টাপ্!'

ক্রোল বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল কারণ পথ বন্ধ।

ব্যাপারটা কী? হেডলাইটের আলোতে ছেলেটির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে. গাধাগুলোও যেন কেমন অস্থির।

হাতছানি দিয়ে আমাদের বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করাতে আমি থামলাম। ছেলেটি দৌড়ে এল আমার দিকে।

'পিরমিট, সাহিব, পিরমিট!'

ছেলেটি যে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত সেটা তার ঘন ঘন নিশ্বাস আর চোখের চাহনি থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে পিরামিড কোথায়?

জিগ্যেস করাতে সে সামনে বাঁয়ে দেখিয়ে দিল।

'ওগুলো ত পাহাড় — চুনোপাথরের পাহাড়। ওখানে পিরামিড কোথায়?'

ছেলেটি তবুও বার বার ওই দিকেই দেখায়।

'তার মানে ওগুলোর পিছনে?' ক্রোল জিগ্যেস করল। ছেলেটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল—হ্যাঁ, ওই পাহাড়গুলোর পিছনে।

আমি ক্রোলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনও এসে জুটেছে। তাদের বললাম ব্যাপারটা। ফীল্ডিং বলল, 'আস্ক হিম হাউ ফার।'

জিগ্যেস করাতে ছেলেটি আবার বলল টিলাগুলোর পিছনে। কত দূর সেটা জিগ্যেস করে লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি পৃথিবীর সব দেশেই অশিক্ষিত চাষাভূষোদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা থাকে না। অর্থাৎ পিরামিড এখান থেকে দু' কিলোমিটারও হতে পারে, আবার বিশ কিলোমিটারও হতে পারে।

'হিয়ার'—থর্নিকফ্ট পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিল—এবার তুমি প্রস্থান কর।

ছেলেটি মহা উল্লাসে পিরমিট পিরমিট করতে করতে গর্দভবাহিনী সমেত যে পথে যাচ্ছিল সে পথেই চলে গেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। আকাশে আলোকবিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে, তবে চলমান বিন্দু এখনো কোনো চোখে পড়েনি। আমি

জানি পিছনের কামরার তিনজনই জানালায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, বেচারা ক্রোলই শুধু রাস্তা থেকে চোখ তুলতে পারছে না।

মিনিট তিনেক যাবার পরই বাঁয়ে চোখ পড়তে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভুল বলেনি।

টিলার আড়াল সরে যাওয়াতে সত্যিই একটা পিরামিড বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কত দূরে বা কত বড় তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আকৃতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপগুলোর পাশে ওটা একটা পিরামিডই বটে।

ঈজিপ্টের সব জায়গা দেখা না থাকলেও এটুকু জানি যে এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়, আর ভুঁইফোঁড়ের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা-টাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ক্রোলই বলল যে রাস্তা খারাপ হোক না কেন, একবার কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে আসা দরকার। মহাকাশযান সত্যিই যদি আজ রাত্রেই এসে নামে, তাহলে তার সময় আছে এখনো প্রায় আট ঘণ্টা। আর, আকাশযান এলে আকাশে তার আলো ত দেখা যাবেই, কাজেই কোনো চিন্তা নেই।

অতি সন্তর্পণে বালি আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে অটোমোটেল এগিয়ে চলল পিরামিডের দিকে।

শ'খানেক মিটার যাবার পরই বুঝতে পারলাম যে মিশরের বিখ্যাত সমাধিসৌধগুলির তুলনায় এ পিরামিড খুবই ছোট। এর উচ্চতা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়।

আরো খানিকটা কাছে যেতে বুঝলাম পিরামিডটা পাথরের তৈরি নয়, কোনো ধাতুর তৈরি। ক্রোলের গাড়ির হেডলাইট পড়ে পিরামিডের গা থেকে একটা তামাটে আলো প্রতি-ফলিত হয়ে বাঁয়ের টিলাগুলোর উপর পড়ছে।

ক্রোল গাড়ি থামিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমরা পাঁচজন নামলাম।

ফীল্ডিং এগোতে শুরু করেছে পিরামিডটার দিকে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ক্রোল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'কীপ ইওর হ্যান্ড অন ইওর গান। দিস্ মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।'

আমারও অবিশ্যি সেই কথাই মনে হয়েছে। গাড়ির ভিতর ছিলাম, তাই আকাশের সব অংশে চোখ রাখতে পারিনি। এই ফাঁকে কখন ল্যান্ড করে বসে আছে কে জানে।

সামনে ফীল্ডিং থেমে হাত তুলেছে। বুঝতে পারলাম কেন। শরীরে একটা উত্তাপ অনুভব করছি। সেটা স্পেসশিপটা থেকেই বেরোচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ্য কেন?

আলো নেই কেন?

নামবার কোনো শব্দ পাইনি কেন?

আর উত্তাপের কারণ কি এই, যে এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?

কিন্তু না, তা তো নয়। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে। মাথার উপরে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ দেখা দিয়েছে। মরু অঞ্চলের রাতের আকাশ আমার চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু।

'ওয়ান — থ্রী — সেভেন — ইলেভ্ন— সেভ্নটীন — টোয়েন্টি থ্রী...'

ফীল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র—স্পেসশিপের ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।

'ফর্টি ওয়ান—ফর্টি সেভ্ন — ফিফ্‌টি থ্রী — ফিফ্‌টি নাইন...'

এটা মানুষেরই কণ্ঠস্বর, তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কারুর নয়। এর উৎস ওই পিরামিড।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা দেখছি, শুনছি, আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

এবার কথা শুরু হল।—

'পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।'

ফীল্ডিং তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ডেক্সটার ও ক্রোলের হাতে ক্যামেরা। কিন্তু এখনো ছবি তোলার মতো কিছু ঘটেনি।

আবার কথা। নিখুঁত ইংরিজি, নিখাদ উচ্চারণ, নিটোল কণ্ঠস্বর।—

'তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর তখনই আমরা প্রথম তোমাদের গ্রহে আসি, এবং সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর এসেছি। প্রত্যেকবারই এসেছি একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণপোত এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছে। আমরা যখনই এখানে আসি, তখন

পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের কতকগুলো সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান—পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।

'এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনো হাত নেই। অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্য-বিস্তার শেখাইনি, শ্রেণীভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত, তাহলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তার সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে। সেটা কী সেটা বলার আগে আমরা জানতে চাই তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা।'

'আছে।'—চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল।

'করো প্রশ্ন।'

'তোমরা মানুষেরই মতো দেখতে কিনা সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে,' বলল ক্রোল।—'তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তাহলে তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনো বাধা নেই নিশ্চয়ই।'

ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে রেডি।

উত্তর এল—

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'—ক্রোলের অবাক প্রশ্ন।

'কারণ এই মহাকাশযানে কোনো প্রাণী নেই।'

আমরা পাঁচজনেই স্তম্ভিত।

'প্রাণী নেই?' ফীল্ডিং প্রশ্ন করল, 'তার মানে কি—?'

'কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কা-খণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়। অবশিষ্ট আছে কয়েকটি গবেষণাগার ও কয়েকটি যন্ত্র—যার মধ্যে একটি হল এই মহাকাশযান। দুর্যোগের দশ বছর আগে, দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্ব-পরিকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। আমি নিজে যন্ত্র। এই আমাদের শেষ অভিযান।'

এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী জানতে পারি?'

'বলছি শোন,' উত্তর এল পিরামিডের ভিতর থেকে।—'তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক—ইচ্ছা মতো আবহাওয়া বদলানো—যাতে খরা বা বন্যা কোনটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই—শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়। তিন—বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায়; এবং চার—সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর পাঁচশো বছর পরে শুকনো ডাঙায় আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না।...এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।'

'সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?' প্রশ্ন করল ফীল্ডিং।

'হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাই-জেশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাত বছর আগে আমাদের গ্রহে দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আশা করি এই ক' বছরে মিনিয়েচারাইজেশনে তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ?'

'হয়েছি বই-কি!' বলে উঠল ক্রোল। 'গণিতের জটিল অঙ্কের জন্য আমরা এখন যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, তা একটা মানুষের হাতের তেলোর চেয়ে বড় নয়।'

'বেশ। এবার লক্ষ্য কর, মহাকাশযানের গায়ে একটি দরজা খুলে যাচ্ছে।'

দেখলাম, জমি থেকে মিটার খানেক উপরে পিরামিডের দেয়ালে একটা ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারের আবির্ভাব হল।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বলে চলল—

'মহাকাশযানের ভিতরে একটি টেবিল ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। সেই টেবিলের উপর একটি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের নিচে যে বস্তুটি রয়েছে, তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও

পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। তোমাদের মধ্যে থেকে যে-কোনো একজন প্রবেশ-দ্বার দিয়ে ঢুকে আচ্ছাদন তুলে বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে। তবে মনে রেখো, সমাধানগুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনো স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তাহলে—'

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

কারণ কথার মাঝখানেই চোখের পলকে আমাদের সকলের অজান্তে অন্ধকার থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে তীরবেগে মহাকাশ-যানে প্রবেশ করে, আবার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পর মুহূর্তে দেখলাম, ত্রিকোণ প্রবেশ-দ্বারটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গগনভেদী হাহাকারের মতো শব্দ করে পিরামিড মিশরের মাটি ছেড়ে শূন্যে উত্থিত হল।

আমরা পাঁচ হতভম্ব অভিযাত্রী অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম একটি চতুষ্কোণ জ্যোতি ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রের ভীড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দে আমরা সকলে আবার সম্বিত ফিরে পেলাম।

গাড়িটা আমাদের না। শুনে মনে হচ্ছে জীপ, এবং সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে।

'কাম অ্যালং!'—চাবুকের মতো আদেশ এল ক্রোলের কাছ থেকে। সে তার অটোমোটেলের দিকে ছুটেছে।

এক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িও ছুটে চলল রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে।

কোন্ দিকে গেল জীপ? রাস্তায় গিয়ে ত উঠতেই হবে তাকে।

শেষ পর্যন্ত একটা কানফাটা সংঘর্ষের শব্দ, ও ক্রোলের গাড়ির তীব্র হেডলাইট জীপটার হদিস দিয়ে দিল। হেডলাইট না জ্বালিয়েই মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল সেটা, আর তার ফলেই জমিতে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সজোর সশব্দ সংঘাত।

আর তাড়া নেই, তাই সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রোল তার গাড়িটাকে জীপের দশ হাত দূরে দাঁড় করাল। আমরা পাঁচজনে নেমে এগিয়ে গেলাম।

জীপের দফা শেষ। সেটা উল্টে কাত হয়ে পড়ে আছে বালি ও পাথরের মধ্যে, আর তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে দুজন লোক। একজন স্থানীয়, সম্ভবত গাড়ির চালক, আর অন্যজন—থর্নিক্রফ্‌টের টর্চের আলোয় চেনা গেল তাকে—হলেন মার্কিন ধনকুবের ও শখের প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন।

সাপ ও শকুনের রহস্য মিটে গেল। কার্ণাক হোটেলের ম্যানেজার নাহুমের সঙ্গে এনার ষড় ছিল নিঃসন্দেহে। স্বার্থান্বেষণের পথে যাতে কোনো বাধা না আসে, তাই আমাদের হটাবার জন্য এত তোড়জোড়। এটা বেশ বুঝতে পারছি যে মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু হয়েছে প্রাচীন মিশরের কোনো দেবতার অভিশাপে নয়; তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে ছায়াপথের একটি বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রহ।

'লোকটার পকেটে ওটা কী?'

ক্রোল এগিয়ে গিয়ে মর্গেনস্টার্নের কোটের পকেট থেকে একটি জীর্ণ কাগজের টুকরো টেনে বার করল। সেটা যে মেনেফ্রুর প্যাপাইরাসের ছেঁড়া অংশ সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি।

মর্গেনস্টার্নের মুঠো করা ডান হাতটা বালির উপর পড়ে আছে, আর সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা নীল আভা বেরিয়ে পাশের বালির উপর পড়েছে।

ফীল্ডিং এগিয়ে গিয়ে মুঠোটা খুলল।

এই কি সেই বস্তু, যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান, আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস?

ফীল্ডিং তার ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে ধরে আছে একটি দেদীপ্যমান প্রস্তরখণ্ড, যার আয়তন একটি মটরদানার অর্ধেক।

২৭শে নভেম্বর, গিরিডি

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা যদি কেউ বের করতে পারে ত আমিই পারব, এই বিশ্বাসে আমার চার বন্ধু সেটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। আমি গত দু সপ্তাহ ধরে আমার গবেষণাগারে অজস্র পরীক্ষা করেও এটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। আমি বুঝেছি আরো সময় লাগবে, কারণ আমাদের বিজ্ঞান এখনো এতদূর অগ্রসর হয়নি।

পাথরটা আপাতত আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি আংটির উপর বসানো রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যখন বিছানায় শুয়ে এটার দিকে দেখি, তখন এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।

কাকিনী-মা

মনোজ বসু

জঙ্গলে মেলা ফুল, ফুলে ফুলে মধু। মৌমাছিরা চাক জোগে মধু জমায়—মউলেরা গিয়ে চাক কাটে, মধু ভেঙে আনে। গাছের মাথায় লতাপাতার মধ্যে চাক, ঠাহর করা মুশকিল। সেজন্য উড়ন্ত মৌমাছি দেখলেই মউল তার পিছু পিছু ধাওয়া করে। নজর উপরমুখো—মৌমাছি ডাইনে উড়ছে তো মউল ডাইনে চলল, মৌমাছি বাঁয়ে যাচ্ছে তো মউলও বাঁয়ে। কখনো

মৌমাছিকে নজরছাড়া হতে দেবে না। মৌমাছি যে গাছের ভিতরে ঢুকে গেল, আর বেরুচ্ছে না—বুঝতে হবে চাক সেইখানে। এই কাজে বিপদ খুব। মউল চারিদিকের জঙ্গল দেখতে পাচ্ছে না—বাঘ হয়তো ওত পেতে ছিল টুপ্ করে মুখে তুলে নিল।

এবারে টোটোন মউলের নৌকোয় এসেছে। চেনো না টোটোনকে? তোমাদের বয়সি, কিম্বা দু-চার বছরের বড়ই হবে। বিষম সাহসী—ভয় কাকে বলে জানে না। এই টোটোনের কথা আরও একবার বলেছি। রক্তধুতরো নামে জংলি ফুল আছে, টোটোন চেনে সে ফুল, কানে গুঁজলে পশুপাখি কীটপতঙ্গ সকলের কথ পরিষ্কার বোঝা যায়। ছুঁচো-পেঁচা-শুয়োর তিন বন্ধুর কথাবার্তা বুঝে নিয়ে টোটোন সেবারে গুপ্তধন পেয়েছিল, মিঠাজলের ইঁদারা বের করেছিল, একটা মেয়ের কঠিন রোগ সারিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ছে না?

আজও সে একটা রক্তধুতরো পেয়ে গেছে। কাজকর্মে সারাদিন ফুরসত পায়নি। সন্ধ্যাবেলা বাইনতলার ঘাটে নৌকো বেঁধেছে, কটা দিন থাকা হবে এখানে, মধু কেনাবেচা হবে, পাইকার আসবে। আপাতত সকলে রাঁধাবাড়ায় ব্যস্ত—টোটোন টুক করে নৌকো থেকে নেবে পড়ল। মানুষের কথা বসে বসে কত আর শুনব—যাই, ঘুরে আসি খানিক, পশুপাখির কথা যদি কিছু শুনতে পাওয়া যায়।

এগিয়ে চলল সে। পশুপাখির কথা মাঝেমধ্যে কানেও আসে। হঠাৎ একসময়ে হুঁশ হল, অনেকটা দূর এসে পড়েছে, রাত্রি অনেক। জায়গাটাও ভাল নয়, জন্তু-জানোয়ার বেরিয়েছে, নিশানা পাওয়া যাচ্ছে। গাছে চড়ে তখন সে ডালের উপর শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিল। এ কিছু নতুন নয়—কত রাত সে এমনি ভাবে কাটিয়ে থাকে।

উপর দিককার ডালে ঝপাস করে এক পাখি এসে পড়ল।

পাশের ডাল থেকে শুধায়, "কী গো চিলভায়া, ফিরতে আজ এত দেরি।"

এহেন গম্ভীর গলা ভীমরাজ পাখির না হয়ে যায় না—টোটোন অনেক শুনেছে। নিশিরাত্রে পাশাপাশি বাসায় বসে চিলে আর ভীমরাজে কথাবার্তা। তাড়াতাড়ি টোটোন কানে রক্তধুতরো গুঁজে দিল।

ভীমরাজ বলে, ''ফিরেছ বড্ড দেরিতে।''

চিল বলল, "করালীতলায় আজ আবার মেয়ে ধরে আনল। ফুটফুটে খাসা মেয়ে। কেঁদে ভাসাচ্ছে, কাপালিক ঠাকুরের পায়ে মাথা খুঁড়ছে। ভাবলাম, দয়া করে যদি ছেড়ে দেয়। তেমনি পাত্তর কি কাপালিক?"

ভীমরাজ বলল, ''আরও পাঁচ-সাতটা তো ধরে এনে রেখেছে।''

"পাঁচ-সাত নয়, পুরোপুরি দশ—।" চিল অনেক সময় আশ্রমের বটের ডালে চুপচাপ বসে থাকে, ফাঁক পেলে মাছখানা সন্দেশটা ছোঁ মেরে নিয়ে উপরে উঠে যায়—তার কাছে সঠিক খবর।

বলে, ''দশ মেয়েকে বলে দশ-মহাবিদ্যা। কালী, তারা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী—এই সমস্ত নাম। পুজো করে তাদের দস্তুরমতো। সকলের ছোট কমলা—সেটি মারা গেছে। তার জায়গায় এই নতুন আমদানি—এরও নাম দিয়েছে কমলা।''

একটু চুপ থেকে চিল আবার বলে, "এক মজা দেখে আসছি জানো ভীমরাজদা, এত যে কান্নাকাটি মাথা-ভাঙাভাঙি—কিন্তু কাপালিক কী মন্তোর জানে, কী সব খাওয়ায়—দীক্ষার পরে ক'টা দিনের মধ্যেই মেয়ে পুরোপুরি ওদের বশে এসে যাবে, খুন করে ফেললেও তখন আর করালীতলা ছাড়বে না।"

টোটোনের সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প, এই নতুন কমলাকে উদ্ধার সে করবেই। দীক্ষা দিয়ে মন্তোরতন্তোর খাটিয়ে কাপালিক বশ করে ফেলবে, তার আগেই। ভোর হতে না হতে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে সে বাইনতলার ঘাটে ছুটল। নৌকো থেকে পুঁটলিটা নিয়ে নিল। মউলের দলের এক মুরুব্বি মানুষ করালীতলার পথ তন্নতন্ন করে বুঝে নিল তার কাছ থেকে। তার পরে হাঁটা— । দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তখনো হাঁটছে।

বড় গাঙ এক দিকে, অন্য দিকে খাল—খালেরও করাল স্রোত। বন কেটে আবাদ হবে এদিকটা—গাঙ ও খালের মাঝে মাটি ফেলে ভেড়ির মতন বানিয়েছে, তার উপর দিয়ে যাচ্ছে টোটোন। কাকের বাসা থেকে কি গতিকে বাচ্চা পড়ে গেল। পড়বি তো পড় একেবারে খালের জলে—স্রোতের টানে হাবুডুবু খেতে খেতে যাচ্ছে। বাচ্চার মা কাকিনী জলের উপরে চক্কর দিচ্ছে আর ক-খ-খা কা-কা, ক-খ-খা কা-কা খোকা খোকা করে অবিরত হাহাকার। টোটোন তাড়াতাড়ি রক্তধুতরো কানে নিল, কান্না পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঃ"গেল গেল আমার খোকা ডুবে গেল রে—কেমন করে রক্ষে হবে, কে বাঁচাবে?''

কোমল মন টোটোনের, কান্না সইতে পারে না। পুঁটলি ভেড়ির উপর রেখে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। সাঁতার কেটে কেটে বিস্তর কষ্টে বাচ্চা তুলে আনল ডাঙায়, পরম যত্নে দোডালার উপর বসিয়ে দিল। ইতিমধ্যে অনেক কাক জুটে গেছে, কী কলরব তাদের। বাচ্চার মা কাকিনী বাচ্চার গায়ে ঠোঁট বুলাচ্ছে—ডাইনে থেকে বাঁয়ে গিয়ে বসছে, বাঁ থেকে আবার ডাইনে। বাচ্চাকে কত রকমে আদর করবে দিশা পাচ্ছে না যেন।

সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, হুঁশ হল টোটোনের। গাছের তলায় বসে পুঁটুলি খুলে সে চিঁড়ে-বাতাসা মুখে ফেলছে। গাছের উপরে তখন তারই প্রশংসায় কাকেরা শতমুখ। সোনা ছেলে!—কাকিনী মা বলছে, "প্রাণের মমতা না করে আমার খোকাকে ডাঙায় তুলে দিল। এমন যার উপকারি স্বভাব, জীবনে সে খুব বড় হবে।"

খাচ্ছে টোটোন আর সকৌতুকে এই সব শুনছে। ওদের মধ্যে আছে ভূশন্ডী কাক—অনেক বয়স তার, জ্ঞান-বুদ্ধি অঢেল, অঞ্চলের সব কিছু তার নখদর্পণে। ভূশন্ডী বলে, ''সোনা-ছেলের কিন্তু সাংঘাতিক বিপদ সামনে।"

''কী বিপদ? কী বিপদ?"—এক সঙ্গে অনেক কাক প্রশ্ন করে ওঠে।

ভূশন্ডী বলে, ''খানিকটা গিয়েই ডেয়োপিঁপড়ের বাঁধাল। গাদা গাদা ডেয়ো ভেড়ির এদিক থেকে ওদিক পথ বন্ধ করে আছে। না বুঝে পা চাপিয়ে দিয়েছে কি রক্ষে নেই—ডেয়োরা থিকথিক করে উঠে পলকে সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলবে, কালো কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিলে এমনি দেখাবে।—কামড়াবে। ডেয়োর কামড়ে সাংঘাতিক জ্বলুনি, সর্বাঙ্গ ফুলে উঠবে, পরিণামে নির্ঘাত মৃত্যু। এমন সৎ ছেলে আহা বেঘোরে প্রাণটা দেবে—"

ভূশন্ডী কাক আহা ওহো করতে লাগল। বলে, ''ঠেকাও ওকে, ওদিকে না যায়।"

টোটোন ভয় পায় না, আরও তার রোখ চেপে যায়। যাবই। না গেলে করালীতলা পৌঁছব কেমন করে? যেতেই হবে।

উঠে পড়ল সে তাড়াতাড়ি। কাকেরাও যেতে দেবে না—রীতিমতো এক ব্যূহ বানিয়ে ঘিরে ধরেছে। সামনে পা বাড়ালেই ঠোক্কর মারে। মাথায় ঠোক্কর—মুখে বুকে হাতে। দাঁড়িয়ে পড়ল তো কাকেরাও অমনি চুপ। মুশকিল হয়েছে—কাকেরা অনেক, টোটোন একলাটি। তবু সে নিরস্ত হবার পাত্র নয়—ফাঁক কাটিয়ে ওরই মধ্যে দু-পা চার-পা করে এগোচ্ছে। খেলা যেন একটা—কে হারে কে জেতে, কাকেরা না টোটোন?

ডালের উপর থেকে ভূশন্ডী আবার বলে উঠল, ''যাবার

গজ বড্ড বেশি বোঝা যাচ্ছে। ডেয়োদের সঙ্গে জোরজবরদস্তিতে পেরে উঠবে না—ছেলেকে বলে দাও, ভাব করে ফেলুক। বাইনতলার ঘাটে মউলেরা নৌকো বেঁধে আছে—এক টিন মধু কিনে এনে ডেয়োদের ভোজ দিক। আমরাও বলে-কয়ে দেব ডেয়োদের—মধু খেয়ে খুশি হয়ে তারা সবার পথ করে দেবে। তোমাদের সোনা ছেলেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলো কথাটা।''

কাকিনী-মা বিরক্ত গলায় বলল, ''বোঝাই কেমন করে? ডেকে ডেকে গলা ভাঙলেও তো ডাকের মানে বুঝবে না। মানুষ জাত দেমাকে মটমট করে, আসলে মহা মুর্খ ওরা—আপন ভাষাটি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।"

কানে রক্তধুতরো, টোটোনের বোঝবার অসুবিধা কী? আবার সে বাইনতলার ঘাটে ছুটল। মধুর টিন কিনতে হবে না—তার অমনই চার-পাঁচটা। রাতটা নৌকোয় কাটিয়ে পরের সকালে সে [illegible]মাথায় চলল। কাকিনী মহানন্দে ভূশন্ডীকে দেখাচ্ছে। "সব মানুষকে মুখ্যু বলেছিলাম, আমার সোনা-ছেলেটা কিন্তু বড়। কথাবার্তা বুঝে নিয়ে ঐ দেখুন সে মধু নিয়ে হাজির। ডেয়োর বাঁধালে গিয়ে আগেভাগে আমি ভোজের খবর জানিয়ে দিইগে।''

উড়ল কাকিনী। ডেয়োর বাঁধাল দেখা যাচ্ছে—ভেড়ির আড়াআড়ি যেন গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে একখানা। ডেয়োপিঁপড়ে কালো বলে গুঁড়ির রংও কালো। ডেয়ো-বাহিনীর সেনাপতিকে কাকিনী ডাকে, "গর্ত থেকে একটুখানি মাথা বের করুন সেনাপতি মশায়। মস্ত খবর, একটা ছেলে আপনাদের ভোজ খাওয়াবে। কত দূর থেকে মধুর টিন কাঁধে বয়ে আনছে, ঐ দেখুন।''

ডেয়ো-সেনাপতি বিশ্বাস করে না। বলে, "মানুষের ছেলে তো? মানুষ পায়ে মাড়ায় আমাদের—তাদের ঘরের ছেলে হয়ে মধু খাওয়াবে, এ কেমন কথা! নিরিখ করে দেখুন কাকিনী দেবী, টিনে কক্ষনো মধু নয়—হয়তো কেরোসিন। ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে।''

টোটোন ততক্ষণে বাঁধালের কাছে টিন নামিয়ে খানিক খানিক ছিটিয়ে দিয়েছে। মধুই বটে। ডেয়োরা কতদিন এ জিনিস খায়নি, খুশির অন্ত নেই তাদের। লাইনবন্দি হয়ে সব আসছে। কাকিনী বলে, "ছেলেটি ঐদিকে যাবে। আপনার সৈন্যসামন্তকে হুকুম দিয়ে দিন, সরে গিয়ে একটু পথ করে দিক।''

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—এ তো সামান্য জিনিস।'' সেনাপতির আদেশে ডেয়োরা একদিকে সরে এল, অন্য প্রান্ত খালি। টোটোন ছুটল করালীতলার দিকে।

মধু খেয়ে সেনাপতি মশগুল। বলে, "আপনাকে বলা রইল কাকিনী দেবী, ছেলেটির কোনো কাজে যদি কখনো আমাদের লাগে, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে পড়ব।''

পৌঁছে গেল টোটোন। কাকিনীও উড়তে উড়তে সঙ্গে এসেছে। বিশাল বটগাছ। বটতলায় হাড়িকাঠ, চকচকে মেলতুক পাশে। অদূরে করালী-মন্দির ও নাটমণ্ডপ। মন্দিরের সামনে বাঁধানো চাতাল। পিছনদিকে অনেকগুলো খুপরি ঘর ও অন্দরের উঠোন। টোটোন মন্দিরে ঢুকছিল—মুখোমুখি কাপালিক। দৈত্যের মতন চেহারা, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুর-ফোঁটা, লাল কাপড় পরনে। গম্ভীর গলায় কাপালিক বলে, "কে তুমি ছোকরা? কী চাই?''

"আমি টোটোন—।'' একটুও ভয় পায়নি সে। চটপট বানিয়ে বলে দিল, "আমার বোনকে ধরে এনেছেন—তাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।''

কাকিনী বটগাছের উপর থেকে বাহবা দেয়ঃ "কা-ক্ক-কা কা-ক্ক-কা বাহবা বাহবা—সোনা-ছেলে, খাসা বলেছ।''

এইটুকু ছেলের মুখে এমনিধারা কথা—কাপালিক তো অবাক! বলে, "তোমার বোন এখানে এসে দেবী কমলা—দশ মহাবিদ্যার একটি। সংসারের পাঁকে সে কেন ফিরতে যাবে?''

টোটোন দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "যাবেই—আমি তাকে নিয়ে যাব। আপনি জোর করে এনেছেন, কাঁদতে কাঁদতে সে এসেছে—''

কাপালিক বলে, "পারবে তুমি?''

টোটোন কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কাকিনী এই সময় কা-কা ডাকতে ডাকতে বটগাছ থেকে মন্দিরের কার্নিশে এসে বসল। ডাকের মানে বুঝল টোটোন, ঝগড়াঝাঁটিতে যাসনে রে ছেলে, নরমে-গরমে চেষ্টা দেখ—''

কাপালিক বলছে, "নিয়ে যেতে পারবে এই করালীতলা থেকে?''

তৎক্ষণাৎ টোটোন মিষ্টি করে বলল, "আপনি ছেড়ে দেবেন—তবেই পারব। যা কান্নাকাটি করছে—দয়া হবে আপনার, না-ছেড়ে পারবেন না।''

টোটোনের সাহস ও কথাবার্তা কাপালিকের ভাল লেগে গেল। একটুখানি ভেবে নিয়ে সে বলে, "ছাড়তে পারি, একটা কাজ তা হলে তোমায় করতে হবে। চালের বস্তা ছিঁড়ে চাল ছড়িয়ে পড়েছিল, কাঁকর মিশে গেছে। কাঁকর বেছে দেবে তুমি।''

টোটোন একপায়ে খাড়াঃ "খুব পারব, খুব—''

"ভাল করে না শুনেই 'হাঁ' দিয়ে দিলে? চাল অনেক, এক কুইন্টালের বেশি। কাঁকরও অঢেল।''

পরিমাণ শুনে টোটোন থতমত খেয়ে যায়। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে পরক্ষণে বলল, "যত কঠিনই হোক, করব। করতেই হবে বোনের উদ্ধারের জন্য।''

কাপালিক বলে, "সময় একটা দিন মোটে—কাল সন্ধেয় শেষ করে দেবে। পরশু মা-করালীর পুজো। ভক্তজনেরা প্রসাদ পাবেন, চালের মোটা খরচ তখন।

অত চাল একটা দিনের মধ্যে বেছে দেওয়া—তাই তো, হয়ে উঠবে কি?—টোটোনের এমনি একটা ইতস্তত ভাব। বুঝে নিয়ে কাকিনী কার্নিশের উপরে ডেকে উঠলঃ কাক্কর, কাক্কর। অর্থাৎ—পারব, পারব। কাকিনীর কথাটা টোটোনও অমনি হুবহু বলে দিল, "পারব।''

কাপালিক বলে, ''যদি পারো নতুন-কমলাকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে। কিন্তু চালের মধ্যে যদি এক কণিকা কাঁকর খুঁজে পাই—''

হাড়িকাঠ ও মেলতুকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বলল, "দেখতে পাচ্ছ? পুজোয় ছাগল বলি দিই, মোষ বলি দিই, নরবলিতেও অসুবিধা নেই। দিয়ে থাকি কখনো-সখনো। চালে যদি কাঁকর বেরোয়, হাড়িকাঠে গলা না ঢুকিয়ে ড্যাডাং করে মেলতুকের কোপ। মুন্ডু ছিটকে গিয়ে পড়বে—''

ভয়-দেখানো কথা শেষ করার আগেই কাকিনী ডেকে উঠলঃ কা-কই কা-কই। অর্থাৎ চাল কই, চাল কই? শিগগির বের করে দিন, কাজে লেগে যাই। কাকিনীর কথা শুনে শুনে টোটোনও কাপালিককে তাই বলল।

দুই মরদে মিলে প্রকাণ্ড চালের বস্তা ধপ্‌্পাস করে চাতালের উপর এনে ফেলল। ঢেলে দিল চাল। কাপালিক বলে, "মা-করালীর অতিথি তুমি। প্রসাদ এসে খাবে—কাজ করবে খাবে ঘুমোবে, যখন যেরকম খুশি। কাল সন্ধেবেলা কাজের হিসাবে পাওনাগণ্ডা ঠিক হবে—নতুন-কমলা কিম্বা হাড়িকাঠ-মেলতুক। পালানোর চেষ্টা কোরো না, সব দিকে আমার লোকজন—''

টোটোন চটেমটে বলে, ''পালাবই যদি—এসেছি কেন অ্যাদ্দুর এত কষ্ট করে? বোনকে নিয়ে তবে আমি যাব। না পারলে প্রাণ দেব, তার জন্যে তৈরি।''

বড় একটা কেরোসিনের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে কাপালিক

তোর তাতে কী ?

আশা দেবী

এই যে ভুতো
চেঁচাস কেন
দুপুর রাতে?
চোর ঢুকেছে আমার বাড়ি?
ঢুকুকগে চোর
সে চোর আমার
বাড়ির সবই—যাচ্ছে নিয়ে?
নিকগে আমার টাকাকড়ি
তোর তাতে কী?
ফের যদি তুই
অকারণে পরের বাড়ি
নাক গলাবি এমন করে
কানটি ধরে দেব ছুঁড়ে
পড়বি গিয়ে ঘরের ছাতে।
এমন করে নাক গলাতে
তোকে তো ভাই
কেউ ডাকেনি॥

ছবি দেবাশিস দেব

অন্দরের দিকে চলে গেল। এক মুঠো চাল তুলে দেখে টোটোনের চক্ষু তো ছানাবড়া। কাঁকর গিজগিজ করছে। একটা দিনের মধ্যে কিসে কী হবে, ভেবে পাচ্ছে না। কাকিনী ওদিকে মাথার উপর ক্রমাগত সাহস দিচ্ছে: আলবত হবে, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। প্রসাদ এসে গেলে খেয়ে-দেয়ে নাটমন্ডপে ঘুমিয়ে পড়োগে। চাল বাছাই আপনি হয়ে যাবে, দেখো।

উড়ল কাকিনী—উড়তে উড়তে সেই ডেয়োর বাঁধালে। ডাকছে, "সেনাপতি মশায় আছেন?"

ডেয়ো-সেনাপতি মুখ বাড়িয়ে বলল, "আসুন কাকিনী দেবী। কী খবর?"

সৈন্যসামন্ত নিয়ে এক্ষুনি একবার করালীতলায় চলুন।

বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনে সেনাপতি সগর্বে বলল, "মানুষ নই আমরা—পিঁপড়ের জাত। কথা যখন দিয়েছি, নিশ্চয় গিয়ে কাজ তুলে দেব।"

ডেয়োসমাজে সঙ্গে সঙ্গে খবর হয়ে গেল। শুধু এই ডেয়োর বাঁধালটুকু নয়, এ দিগরে যেখানে যত ডেয়ো-পিঁপড়ের ঘাঁটি, সর্বত্র। 'চলো করালীতলা, চলো— চলো— চলো—' সকল ডেয়োর মুখে এক বুলি। পিলপিল করে চলেছে মরদ-মেয়ে বাচ্চা-বুড়ো ডেয়োরা—হাজার লাখ কোটি, তারপর গোনার বাইরে চলে গেল আকাশের তারার মতো, সাগরতটের বালির মতো। করালীতলা তল্লাট জুড়ে কালো-কালো হয়ে গেছে—রাত্রিবেলা কৃষ্ণপক্ষ এবং গাছগাছালির ছায়া বলে তেমনধারা মালুম হচ্ছে না।

সেনাপতি মাঝে দাঁড়িয়ে হুকুমহাকাম দিচ্ছে। ডেয়োরা লাইনবন্দি একটা করে কাঁকর মুখে নেয়, চাতালের বাইরে নামিয়ে রেখে আবার এসে লাইনে দাঁড়ায়। অবিরাম চলছে এমনি—স্রোতের মতন। কাকিনী মাথার উপরে ক্রমাগত চক্কর দিচ্ছে। টোটোন ধারেকাছে নেই—নাটমন্ডপে। কাকিনীর ধমকানিতে কাজে হাত দিতে পারেনি। থাকতেও দিল না তাকে কাজের জায়গায়। নাটমন্ডপে শুয়ে পড়তে বলেছিল। কিন্তু শুয়ে কী হবে—আসে ঘুম এত বড় উদ্বেগের মধ্যে? বেড়া ঠেশ দিয়ে চুপচাপ সে বসে রয়েছে।

অনেকক্ষণ কাটল। বাইরে থেকে হঠাৎ কাকিনীর ডাক, "এসোগো সোনা ছেলে, দ্যাখোগে এসে এইবার।"

টোটোন তো ঘুমিয়েই আছে, ছুটে বেরুল। আকাশে পোহাতি তারা, ভোর হব-হব, পাখ-পাখালি ডাকছে। কাকিনী বলে, "কাজ শেষ, চালে আর একটিও কাঁকর নেই। যত কাঁকর চাতালের নীচে ঐ দিকটা ফেলে দিয়েছে। ডেয়োরা এবার ডেরায় ফিরবে, সেনাপতি তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন বলে দাঁড়িয়ে আছেন।"

সেনাপতি সকলের আগে, ডেয়োরা দলে দলে পিছন দিকটায় কাতার দিয়ে আছে। এক ঠ্যাং মাথার দিকে তুলে সেনাপতি টোটোনকে স্যালুট করল। কুইক মার্চ—হুকুম দিন তারপর, আর পিলপিল করে ডেয়োরা সব ফিরে যাচ্ছে। কালো ডেয়োয় পথঘাট ঢেকে গিয়ে চারিদিক একেবারে কালো-কালো হয়ে গেল। ক্রমশ অদৃশ্য—একটা ডেয়োও আর চোখে পড়ে না করালীতলা অঞ্চলে। নিশ্চিন্তে এইবার টোটোন নাটমন্ডপের মেজেয় গড়িয়ে পড়ল। ঘুম।

ভাল করে রোদ না উঠতেই কাপালিক এসে উপস্থিত। এ সময়ে আসার কথা ছিল না—তবু ডেঁপো ছোঁড়াটা কীরকম নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, মজা দেখতে এসেছে দলবল নিয়ে। টোটোন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, দেখতে পেল। বেশ খানিকটা হাসাহাসি করে—বয়সে ছেলেমানুষ তো। লম্বা লম্বা বচনই শুধু মুখে—কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। ডেঁপোমির উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে—ঐ হাড়িকাঠ ও মেলতুক। দয়াধর্ম নেই কোনোরকম।

ঘুমন্ত ছেলের ঘাড়ে কষে এক রন্দা—টোটোন ধড়মড় করে উঠে বসল। কাপালিক খলখল করে হাসে, "আমার কথার নড়াচড়া নেই। দিনমানটুকু তোমার পরমায়ু। বেলা ডুববে, হাড়িকাঠে অমনি মুণ্ডপাত।"

টোটোনও হাসে। "মুণ্ড খাড়াই থাকবে ঠাকুরমশায়। বেলা ডুববে, বোনের হাত ধরে ততক্ষণে বাড়ির অর্ধেক পথ চলে গেছি। আপনার কথার নাকি নড়াচড়া নেই—বিশেষ যখন মা করালীর সামনে দাঁড়িয়ে কবুল করেছেন।"

দলের এক পারিষদ খিঁচিয়ে উঠল, "কাজ সারা হয়ে গেলে তবে তো বাড়ি যাওয়ার কথা। কাজটা বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সারা হয়ে যাবে?"

টোটোন বলে, "সারা হয়েছে বলেই আমার ঘুম।"

সবিস্ময়ে কাপালিক টোটোনের দিকে তাকিয়ে পড়ল। "কাঁকর বাছাই হয়ে গেছে?"

চাতালের নিচে কাঁকর যেখানটা গাদা হয়ে গেছে, টোটোন দেখিয়ে দিল। কাপালিক বলে, কেরোসিনের আলোয় রাত্রিবেলা একলা হাতে করে ফেলেছ—বলি, মন্তোরতন্তোর জানো নাকি হে? চালের মধ্যে একটি কাঁকর পেলে আমি কিন্তু রক্ষে রাখব না।"

কাপালিকের লোক, এখান থেকে ওখান থেকে চাল তুলে নিয়ে দেখছে। কাঁকর নেই—আশ্চর্য!

কাপালিক শুধায়, "কেমন করে করলে বলো দিকি?"

টোটোন ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে বলে, "তা কেন বলতে যাব? কাম সারা হয়েছে, এবারে যে-রকম কথা আছে—বোনকে এনে দিন, বিদায় হয়ে যাই।"

নতুন-কমলাকে তবে তো ছাড়তেই হয়। মেয়েটা দেখতে শুনতে ভাল—কাপালিক তাক করে রেখেছে, খানিকটা বশে এসে গেলে নতুন ভক্ত ষণ্ডেশ্বরের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবে। অন্য মেয়েগুলোর সঙ্গেও এমনি এক একটার বিয়ে ঘটিয়ে দিয়েছে—বিয়ের পরে আর তারা তেমন কান্নাকাটি করে না, করালীতলার কাজকর্ম নিয়ে আছে। মতলব সবই এখন ভেস্তে যাবার যোগাড়।

আপাতত কিছু সময় তো নেওয়া যাক, দলবলের সঙ্গে সারাটা দিন শলা-পরামর্শ হতে পারবে। কাপালিক বলল, "সন্ধে অবধি তোমায় সময় দিয়েছি—সময় শেষ হওয়ার আগে আমার তরফের কোন বিচার-বিবেচনা নেই। কাজ আগেভাগে হয়ে গিয়ে থাকে, আরও একবার না-হয় নেড়েচেড়ে দেখ। অথবা শুয়েবসে কাটাও, যেমন খুশি। আমার যা করবার, সন্ধের পর এসে করব। কাঁকরের কণিকা পেয়ে গেলে কিন্তু রক্ষে থাকবে না, বলে রাখছি।"

কাকিনী বটগাছ থেকে উড়ে টোটোনের পাশে এল। বলছে, "এখন ঘুমুতে যেয়ো না ছেলে—খবরদার, খবরদার! চোখ মেলে খাড়া বসে থাক। ফাঁক পেলে ওরা হয়তো এই চালে কাঁকর মিশিয়ে যাবে। বাসায় গিয়ে বাচ্চাকে একনজর দেখে এক্ষুনি আমি ফিরব, কড়া নজর রেখো ততক্ষণ।"

উড়ল কাকিনী। ফিরেও এল। অনতিপরে, সঙ্গে একপাল কাক। বলছে, "এদের সব ডাকতে গিয়েছিলাম। সারা রাত জেগে কাটিয়েছ সোনা আমার—এবারে ঘুমোও। আমরা পাহারায় রইলাম। কেউ শয়তানি করতে এলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে আধ-মরা করব, ডেকে শোরগোল তুলব। নির্ভয়ে ঘুমোও তুমি।"

কাঁকর মেশাতে কেউ আসেনি। কাপালিক ভিন্ন এক মতলব ফেঁদেছে।। সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ খানিকটা রাত্রি, অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার—তখন সে এল। টোটোনকে বলে, "দশমহাবিদ্যার মেয়েগুলো অন্দরের উঠোনে। নতুন-কমলাও তার মধ্যে। এক জায়গায় বসে সবাই প্রসাদ পাচ্ছে। কোনো মেয়ে জানে না। বাইরের কেউ তল্লাশে এসেছে। ঘন্টা বাজলে ভক্তেরা যাবে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও। গিয়েই অমনি নতুন কমলার হাত চেপে ধরবে।"

দলের একজন বলে, "ভুল করে যদি অন্য কারো হাত ধরো—"

কাপালিক শেষ করে দেয়, "তা হলে বুঝব, বোন-টোন ভাঁওতা। ভাঁওতাবাজির যা শাস্তি সরাসরি হাড়িকাঠ।"

রায় দিয়ে সদলবলে সে চলে গেল। এবার টোটোনের ভয় হচ্ছে। মেয়েটিকে চোখের দেখাও দেখেনি—বোন বলে কার হাত ধরে বসে ঠিক কী।

কাকিনী বুঝি মন পড়তেও পারে—অমনি তার কা-কা ডাক। টোটোনকে ডেকে বলছে, "ভয় কী রে বোকা ছেলে, আমি রয়েছি না? তুই না চিনিস, আমি খুব চিনে রেখেছি। মগডালের উপর থেকে সমস্তটা দিন তাকে দেখেছি। আমার ভুল কিছুতে হবে না, আমি তোকে চিনিয়ে দেব।"

ঘণ্টা বাজলে টোটোন অন্দরের উঠোনে ঢুকল। মেয়েরা সারবন্দি বসেছে। অন্ধকারে আবছা রকম দেখা যাচ্ছে, মাথায় কাপড় তোলা—দেখতে সবাই প্রায় একরকম। থতমত খেয়ে টোটোন একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে।

পাখায় অন্ধকার দুলিয়ে কাকিনী উড়তে উড়তে ওদিকে চলে গেল। ফিরল তক্ষুনি আবার—উড়ে গিয়ে বটের ডালে বসল। ঠিক একই মাথার উপর দিয়ে উড়ল ওদিকে এবং এই-দিকে। আর কী ভাবনার আছে—খপ করে মেয়েটার হাত ধরে টোটোন বলে, "তোমায় নিতে এসেছি বোনটি আমার। ওঠো, বাড়ি চলো—"

আকাশে মেঘ করে অন্ধকার আরও বেড়েছে। তারই মধ্যে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। কাপালিক বলেছিল, রাত্তিরটা এখানে থেকে সকালবেলা বরঞ্চ যেয়ো। কিন্তু ছাড়া পাবার পরে তিলার্ধ আর নয়—কাপালিক আবার কোন্ প্যাঁচ কষে দেয়, ঠিক কী।

যাচ্ছে, যাচ্ছে। মেয়েটার মনে কিছু ভয় হয়ে থাকবে। বলে, "পথ হারিয়ে আবার কোনো বিপদে না পড়তে হয়।"

নিঃশব্দ কণ্ঠে টোটোন বলে, "পথ হারাব কেমন করে, কাকিনী আছেন না?"

"কাকিনী কে, কোথায় তিনি?"

আকাশের দিকে হাত ঘুরিয়ে টোটোন বলে, "সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। আমি যে করালীতলায় যেতে পারলাম, কাপালিকের কবল থেকে তোমার যে উদ্ধার হল, আসলে তিনিই সমস্ত করালেন।"

মেয়ে ভাবল, কোনো অলক্ষ্য দেবী হবেন বুঝি কাকিনী। দু'হাত তুলে উদ্দেশে সে নমস্কার করল।

কা-কা ক্কা-ক্কা কা—দূরের ডাক। টোটোন বলে, "ঐ—ঐ যে তিনি। ডেকে ডেকে সাড়া দিচ্ছেন। করালীতলা থেকেই সঙ্গে আছেন, কাছছাড়া হননি। উড়তে উড়তে খানিকটা দূর গিয়ে ডালে বসে ডাক দেন, 'চলে আয় রে, তাড়াতাড়ি—আমি এখানে।' যে-ই না ওখানে পৌঁছে যাব আবার উড়বেন, উড়ে আগে গিয়ে 'আয় আয়—' করে ডাক ছাড়বেন। পথ ভুল হবে কেমন করে?"
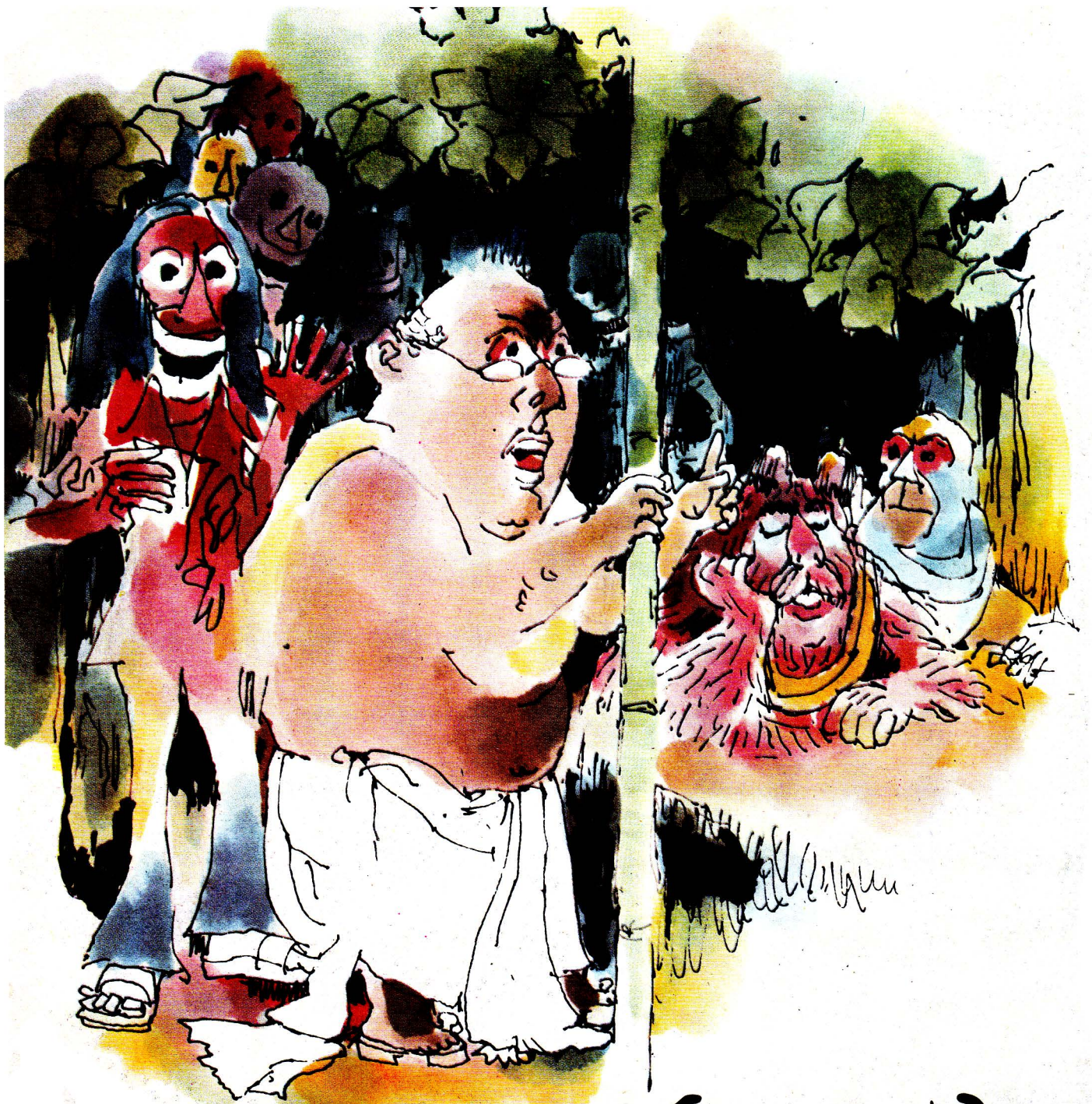
ছবি সুধীর মৈত্র

'ওনা'রা থাকবেনই

আশাপূর্ণা দেবী

শনিবারের সন্ধেকাল, চণ্ডীতলা মাঠের পাকুড়বাগান ক্লাবে আজ বিশেষ অধিবেশন। ক্লাবের মহা-মহা সদস্য থেকে চুনো-পুঁটিরা পর্যন্ত জমায়েতে এসে হাজির হয়েছে। তবে জমায়েতটা যে কত বিরাট হয়েছে তা কারুর জানবার উপায় নেই, কারণ এই করালীপুর গ্রামের লোকেরা তো আর কেউ বিকেল পড়ার পর এই চন্ডীতলা মাঠের ত্রিসীমানা দিয়ে হাঁটে না। একশো কাজ পড়লেও না। ইস্টিশানে যেতে হলে হুই বড় হাসপাতালের পিছন দিয়ে, 'ভবতারিণী হাইস্কুলের' ধার দিয়ে ঘুরে যায়।

দিনদুপুরেও নেহাত কারো ট্রেন ফেল করা তাড়া ঘটলে শর্টকাট করতে যদি ওই মাঠের ধার দিয়ে যেতে হয় তো—যায় চোখ বুজে রামনাম জপ করতে করতে, ছুট মেরে মেরে। কিন্তু জায়গাটি তো একটুখানি নয়, এ-হদ্দ ও-হদ্দ মাঠ। 'বেয়াইডুবি খালটা' যতখানি তো চণ্ডীতলা মাঠও ততখানি।

কবে কোন অতীতে গ্রামের কার বেয়াই নাকি এই চণ্ডীতলার মা চণ্ডীকে পুজো দিতে এসে ফেরার পথে ওই খালে ডিঙি ভাসিয়ে পাশের গ্রামে যেতে গিয়ে ডিঙি উল্টে ডুবে মারা গিয়েছিল। তদবধি খালটার নাম হয়ে গেছে—'বেয়াইডুবি খাল'। আগে যে কী নাম ছিল ওর, তা আর এই করালীপুরের বাসিন্দাদের কারো মনে নেই।

খালের এপারে জঙ্গলের মধ্যে মা চণ্ডীর আস্তানা। মন্দির টন্দির নয়, স্রেফ ইয়া বিরাট এক অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বহু বহু বছরের সিঁদুর লেপা একখানা পাথরের চাঁই। অনেকটা বাটনা বাটা শিলের মতো গড়নের। অবিশ্যি গড়ন আর বোঝা যায় না তেমন, সিঁদুরে আর শ্যাওলায়, পচা ফুল আর শুকনো পাতায় গাছের গোড়াটা তো আগাগোড়াই ঢাকা। এই 'মা চণ্ডী'র জমিদারিতেই পাকুড়বাগান।

আর খালের ওপারটা হচ্ছে তিন গাঁয়ের শ্মশান। করালীপুর, বিজনপুর আর নবীননগর—এই তিন গাঁয়ের যত লোক মরবে,

উই খালপারের শ্মশানেই তাদের শেষগতি। তাই জায়গাটার 'মাহাত্ম্য' এত। যারা এর ধার দিয়ে যায় আসে, তাদের—ছুট-মারা গায়েও কাঁটা দিয়ে ওঠে. আর বোজা চোখের পাতার সামনেও পাকুড় ডাল থেকে দুলদুলিয়ে দুলতে থাকে লম্বা লম্বা কালো কালো জোড়া জোড়া অশরীরী পা!

হ্যাঁ, দিনদুপুরেই ওই কান্ড, ভরসন্ধের দিকে কেউ এমুখো না। তা তুমি কাউকে কেটে দুখানা করবার ভয়ই দেখাও আর হাজার হাজার টাকার লোভই দেখাও।

আর ওই চন্ডীমাকে যে পুজো দিতে আসে, সে কি কেউ একা আসে? নাকি সাঁঝ-সন্ধেয় কিম্বা ঠিক দুপুরে আসে? আসে ভোর সকালে দলবল জুটিয়ে, 'মা মা' রব করতে করতে ড্যাডাং ড্যাডাং বাদ্যি বাজিয়ে। সঙ্গে থাকেন ঘোর রক্তবর্ণ কাপড় পরা সেবাইত ভৈরব কাপালিক। ভৈরবের হাতে থাকে জ্বলন্ত ধুনুচি, ধোঁয়া কমে এলেই তার ওপর ধুনোর আছড়া মারতে মারতে আসেন।

ধুনোর ধোঁয়াটা 'ওনা'রা একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না কিনা। যাত্রীরা যেমন ভাবে আসে আবার তেমনি ভাবেই ফিরে যায় সবাই, পাকুড়বাগানের দিকে না তাকিয়ে।

কাজেই পাকুড়বাগান ক্লাবের আজকের এই 'আলোচনা সভা'র সান্ধ্য সম্মেলনের বিরাটত্বটা কারো নজরে পড়বার ভয় নেই।...তা হ্যাঁ, 'ভয়' ওনাদেরও আছে বৈকী। হলেও বা অশরীরী।

এমন এক একখানি রোজা থাকে যে, মন্তরের ঝাঁজে ওই শরীরহীন শরীরেও জ্বালা ধরিয়ে দিতে পারে. আর সেই মন্তরের সঙ্গে হলুদপোড়া, এবং কাঁচা কালকাসুন্দে পাতা. আর বিছুটির ডাল পোড়া গন্ধে—মুন্ডুহীন কন্দকাটারও মাথা ধরিয়ে ছাড়তে পারে।

সে যাক, আজকে কোনো ভয় নেই।

শনি মঙ্গলের সন্ধেয় রোজার ঠাকুর্দাও আসে না এখানে। তায় আবার আজ চতুর্দশী তিথি।

তবু আজকের এই আলোচনা-সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'ভূত জাতির ভবিষ্যৎ, ও ভূত সমাজের সমস্যা'।

হ্যাঁ, সমগ্র ভূত-সমাজ আজ বিশেষ সমস্যায় পীড়িত, আর ভূতজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। আলোচনার প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, ভূতেরা ক্রমশই উদ্বাস্তু হয়ে পড়ছে। শত শত বছর ধরে যেসব জায়গায় বাস করে আসছিল তারা, নিজের জমিদারির মতো নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়, সে-সব জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাদের।

কারণ চিরকালের সেই সব বাঁশবন, বাদাবন, শ্যাওড়াঝোপ, কচুঝোপ, পানাপুকুরের পাড়, এঁদো ডোবার ধার হানাবাড়ি. পোড়োদালান সব উড়িয়ে দিয়ে দিয়ে দুমদাম বসে যাচ্ছে কল-কারখানা, ইস্কুলবাড়ি, হাসপাতাল, দশ-কুড়িতলা ফ্ল্যাটবাড়ি আরো কত কী।

তবে? সাত দশ চোদ্দ পুরুষ ধরে দখল করে থাকা জায়গা-গুলো থেকে সরে পড়তে হচ্ছে কিনা ভূত বেচারিদের! অথচ পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই তাদের জন্য।...একমাত্র ব্রহ্ম-দত্যিরাই যা ওরই মধ্যে একটু সুখী, বেলগাছগুলোকে তেমন মারকাট্ করা হচ্ছে না। তা'ছাড়া বেলগাছেরা তো ঠিক এক জায়গায় বন জঙ্গল করে থাকে না. যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

কিন্তু ব্রহ্মদত্যিরা সুখে থাকলেই তো আর সমগ্র ভূত জাতির দুঃখ কমবে না?

বেম্মদত্যিরা তো চিরদিনই নাকউঁচু অহঙ্কারী। আলতু-ফালতু ভূতদের তো 'মানুষ' বলে মানে আর কী, ভূত বলে গণ্যই করে না। কিন্তু সবাই কি নগণ্য? নামজাদা ঘরের ভূতেরা নেই? ধরো—যেমন 'গলায়দড়ে ভূত', 'উল্টোগোড়ালি ভূত', 'হানাবাড়ির ভূত', 'ভাঙামন্দিরের ভূত', এরা সব যে-সে নাকি? ভূতসমাজে এরা অভিজাত।

আর মামদোভূত, হামদোভূত, স্কন্ধকাটা, গলাকাটা? এরাই কি কম? এছাড়া—ধরো, গেছোভূত, মেছোভূত, পেঁচোভূত জঙ্গলে-ভূত, জলারভূত, (এ'রা অবশ্য অবশ্য মহিলা ভূত) বুনোভূত কুনোভূত, বুড়োভূত, খোকাভূত, ন্যাকাভূত, পাকাভূত, কান্নাভূত, হাসিভূত, মুখ্যুভূত, বিজ্ঞভূত, খোনাভূত, কানাভূত এরাও সবাই সমাজজানিত।

তবে হ্যাঁ, কবন্ধ, বিটকেল-গন্ধ, তেঠেঙে, আধঠেঙে, কুলোকান, মুলোদাঁত, নাদাপেট, মাথাহেঁট, ভাঁটাচোখ, ফ্যাটানাক, কানেকথা, পিঠে-হাঁ, এরা কিছু কিঞ্চিৎ অনুন্নতশ্রেণীর। 'ভূতজাতির ইতি-হাস ও তাদের কার্যবিধি' নামক মহাগ্রন্থে এদের নাম-টাম তেমন নেই। এরা সব ঠাকুমা দিদিমা বড়পিসিমা কি বুড়ো ধাইমার ঝুলির মধ্যেই রয়ে গেছে।

অথচ আবার দেখো, 'না-মানুষ' প্রাণীদের প্রেতাত্মারাও দিব্যি জাতে উঠে বসে আছে। গোভূত, গাধাভূত, খেউ ঘেউ ভূত, মিউ মিউ ভূত, এরা তো রীতিমত প্রতিষ্ঠিতদের দলে। কিন্তু কে এসব হিসেব নেয়? কে বা এদের নিয়ে ভাবে? কে এদের কথা হৃদয়ে রাখে? মানুষ জাতির মধ্যে কি সেই ভক্তি শ্রদ্ধা আছে যে এদের নিয়ে রিসার্চ করবে? অথচ উক্টরেট করবার জন্যে কী নিয়েই না খাটে তারা? কীটপতঙ্গ, সাপ-ব্যাঙ. ঘাসপাতা, মাটি-পাথর সব কিছু নিয়েই গবেষণা, শুধু হতভাগ্য ভূত সমাজ তাদের কাছে অবহেলিত। একবার ভেবেও দেখে না. ভবিষ্যতে তাদের ভাগ্যেও হয়তো এই গতিই হবে। সবাই কি আর ভগবানের অতিথি হয়ে স্বর্গে উঠে যাবে?

যাক—জীবিত মানুষদের কার ভবিষ্যতে কী হবে কে জানে। তা নিয়ে ভূতেদের মাথা ব্যথা নেই। তাদের চিন্তা ভূতের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এত এত ভূত যে বাস্তুহারা হয়ে যাচ্ছে, তার কী উপায়? হলেও অশরীরী, তবু তাদের যখন মন বুদ্ধি ইচ্ছে অনিচ্ছে রাগ অভিমান সুখ দুঃখু হিংসে প্রতিহিংসে সবই আছে, তখন তাদের থাকবার একটা জায়গাও থাকা দরকার নয় কি?

আগে আগে তো মানুষ চিরকাল এসব জেনে আর মেনেই এসেছে। ভূতেদের মৌরুসিপাট্টার জায়গায় কক্ষনো নাক গলাতে আসেনি তারা। এখন তাদের এত দরকার পড়ে যাচ্ছে যে, সারা পৃথিবীটাই ইট কাঠ পাথর লোহা দিয়ে ভরে দেবে? অশরীরীদের জন্যে কিচ্ছুটি রাখবে না? এ কী স্বার্থপরতা!

শহর থেকে কবেই তো বিতাড়িত হয়ে এসেছে বেচারারা, এখন গ্রামে-গঞ্জেও চোখ? এই পাকুড়তলা ক্লাবের মেম্বাররা অবশ্য সারা পৃথিবীর খবর রাখে না। কোথাকার ভূতের কী কী গতি হচ্ছে জানে না। শুনেছে হিজলবন না কোন অঞ্চল থেকে যেন 'ভূতদর্পণ' নামে একটা খবরের কাগজ বেরোয় তা চোখে কখনো দেখেনি।

একবার এখান থেকে একটা দুঃসাহসী তরুণ গেছোভূত গাছ চালিয়ে অমাবস্যায় তাজমহল দেখতে গিয়েছিল, সে এসে গল্প করেছিল, সেখানে নাকি অলিতে-গলিতে অশরীরী আত্মা। হোটেলে বাজারে, পুরনো পাথুরে মালের দোকানে, চাঁদনি চকে, টাঙাগাড়িতে সর্বত্র তার স্বজাতির সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে।

বাংলা থেকে গিয়েছে বলে 'গেছো'কে খুব আদর-যত্ন করেছে তারা। গল্প করেছে তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন নাকি মুর্শিদা-বাদের হাজার-দুয়ারি প্রাসাদে এবং তার আশপাশে এখনো বস-বাস করছে সেই নবাবি আমল থেকে। তা আগ্রার ওরা নাকি দিব্যি নবাবি চালেই ছিল তখন দেখে এসেছে গেছো. কে জানে এখন কী হাল তাদের। সেও তো হয়ে গেল কত বছর। ক্যালেন্ডার না থাকায় ঠিক বলতে পারবে না. তবে তখনো এমন ভূত-তাড়ানো অভিযান শুরু হয়নি।

ওই একবারই বাইরের খবর এনেছিল গেছো।

তা নইলে খবর যা রাখে এরা, ওই হাতের কাছের কলকাতা শহরের। জানে সেখানে যতই উৎখাত হোক, কিছু কিছু নাছোড়-বান্দা ভূত এখনো খাশ শহরের বুকের মধ্যে শেকড় গেড়ে বসে আছে।

তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় হেস্টিংস হাউসে, মোরেল সাহেবের বাংলোয়, ইহুদি গির্জার গম্বুজে, রাজা রাজবল্লভের ভাঙা প্রাসাদের স্তূপে, গোবরার কবরখানায়, মোতি সহিসের আস্তাবলে।

গেরস্ত বাড়িতেও যে একেবারে নেই তা নয়। সেকেলে বনেদি বাড়ি-টাড়িতে আছে কেউ কেউ, চিলেকোঠায়, ঘুঁটে কয়লার ঘরে, চোরকুঠুরির মধ্যে।

মাঝরাত্তির হলেই তৎপর হয়ে ওঠে ওই নাছোড়বান্দারা। কোথাও খটখট খটাখট আওয়াজ তুলে ঘোড়া চালিয়ে বেড়ায়। কোথাও নাচ আর গাওনা বাজনা জুড়ে দেয়, কোথাও গম্ভীর আওয়াজে পাড়ার ঘুমন্ত বাসিন্দাদের বুক কাঁপিয়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত জুড়ে দেয়। কোথাও কাঁটা চামচের টুংটাং আওয়াজ তুলে ডিনার টেবিল জমকে বসে। অনেক দূর পর্যন্ত নাকি রাজাই খানার সুবাস ছড়ায়।

আর কবরখানায় তো চাঁদের আলোর দিন স্পষ্টই দেখা যায় কবরের উপরে উপরে উঠে বসে আছে সবাই। কখনো হাহা করে কখনো হিহি করে হাসছে, কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কি ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। আস্তাবল থেকে ঘোড়ার চিঁহি শোনা যায় অনেক দূর পর্যন্ত, তার সঙ্গে সহিসের হাতের চাপড়ের শব্দ। ঘোড়াকে দলাইমলাই করতে যেমন হয়।

আর গেরস্তদের বাড়িতে?

সেও মাঝরাত্তির, হল কি চিলেকোঠায় ধুপধাপ দুপদাপ পায়ের শব্দ, কয়লার ঘরে দুমদুম কয়লা ভাঙার শব্দ। ছাতে মার্বেল গড়িয়ে দেওয়ার শব্দ, শেকল বন্ধ করে দিয়ে আসা রান্না-ঘরের মধ্যে বাসনপত্র নাড়ার শব্দ, মানে আর কী, রীতিমত জল-জ্যান্ত সব ভূত।

এসব ভৌতিক লীলা গা-সওয়া হয়ে গেছে লোকের। কিন্তু সেই নাছোড়বান্দারা আর কজন? সারা শহরই তো ভূতমুক্ত এলাকা হয়ে গেছে। এই যে পাতালরেল বসাতে শহর খুঁড়ে উপড়ে ফেলছে। কই, একটা পাতালভূতের সন্ধান পাওয়া গেছে?

যায়নি। অথচ পাতালে কত-শত ভূত ছিল। সেই দেড়শো বছর আগে যখন প্রথম রেল লাইন বসেছিল দেশে, অনেক ভূত কাটা পড়েছিল।

করালীপুর চণ্ডীতলার এই বিশাল ক্ষেত্রটা অবশ্য এখনো হাতছাড়া হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? একবার ওই কলকারখানা-ওয়ালাদের নজরে পড়লে হয়। এই পাকুড়বাগান সাফ করে ফেলে লোহার বীম পুঁততে বসবে। সম্মেলনের উপযুক্ত জায়গাই আর পাওয়া যাবে না। কাজেই এই বেলা একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলা দরকার। দ্বিতীয় সমস্যাটিও গুরুতর। যার থেকে ভূতজাতির মানসম্মান নষ্ট হতে বসেছে।

সমস্যা এই—মানুষ আর ভূতকে স্বীকার করতে রাজি হচ্ছে না। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছে। চিরকালের জিনিসটাকে অস্বীকার করে দিয়ে বলছে—ভূত বলে কিছু নেই।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে পর্যন্ত কুশিক্ষা দিয়ে দিয়ে ভয়শূন্য করে তুলছে। তারা একটু ভয়-ভয় ভাব করলে জোর-গলায় বলছে, দূর বোকা! ভয় আবার কিসের? ভূত পেত্নি, রাক্ষস খোক্কস একানড়ে, জুজুবুড়ি, শাঁখচুন্নি, বেম্মদত্যি ওসব কিছু নেই। স্রেফ সেকালের বুড়ো-বুড়িদের বানানো গল্প!

বোঝো ব্যাপার!

তার মানে, ভূতসমাজকে 'নেই' করে দেবার মতলব। এখন-কার বাপগুলো পর্যন্ত বেয়াড়া ছেলেকে কব্জা করতে—ওই ভূত আসছে, ওই ভূত এসে ধরে নেবে—বলে না। বাচ্চাদের পিটিয়ে পিটিয়ে ঘুম পাড়াবার সময় ছড়া আওড়ায় না—

"এক যে আছে একানড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে
দাঁতগুলো তার মুলোর মতো,
কান দুটো তার কুলোর মতো,
চোখ দুটো তার ভাঁটা,
নাকে দুটো ফ্যাঁটা—
হাতেতে বিচিলির দড়ি—
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।
যে ছেলেটা কাঁদে, তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে!
গাছের ওপর চড়ে—
তুললে আছাড় মারে।"

কিম্বা ছেলেপুলে অবাধ্যতা করলে শাঁখচুন্নির কথা তুলে ভয় দেখায় না—

"ওই আসছে শ্যাওড়া গাছের আসল দেবী—
খোনা খোনা রা—
সামনে দিকে গুড়মুড়ো (গোড়ালি) তার
পিছন দিকে পা।"

'ভয়' শব্দটাই তুলে দিতে চায়। কী অসহ্য! কী অন্যায়!

একদা কত ছড়া পদ্য গল্প গাথা রচিত হয়েছে এই ভূত-সমাজকে নিয়ে, সে সমস্তই ভুলে উড়িয়ে দেবে মানুষ? অথচ এই সেদিনও ওদেরই এক মহাকবি লিখে গেছেন—

"হানাবাড়ি, পোড়োবাড়ি
ভূতের সঙ্গে আড়াআড়ি।
ভূত ছাড়ে না আমি ছাড়ি?
ওরেববাবা ভূতের থাবা—
পিটটান দিই তাড়াতাড়ি।"

তার মানে তিনিও ভূতকে স্বীকার করেছেন।

অথচ এখন?

বুড়োবুড়িরা অবশ্য উড়িয়ে দিতে ততটা সাহস করে না। কিন্তু কমবয়সীরা? একেবারে বেপরোয়া। নেহাত এই করালীপুর চণ্ডীতলার ছেলেমেয়েগুলো ভাল, তাই—এখানে এখনো মান-মর্যাদা বজায় রয়েছে। কিন্তু কদিন থাকবে?

এখন থেকে প্রতিকারের কথা না ভাবলে?

গ্রামের বাড়ি বাড়ি সন্ধের শাঁখ বেজে শেষ হয়ে গেলে, সভা আরম্ভ হল। শাঁখের শব্দ তো মুখের সামনে 'অপ' লাগানো দেবতাদের সহ্য হয় না, এতক্ষণ তাই সবাই কানে পাকুড়পাতা চাপা দিয়ে দিয়ে বসে ছিল। শাঁখ শেষ হতে পাতা ফেলে দিয়ে নড়ে-চড়ে বসল। উদ্বোধক, 'ত্রিকচ্ছ শর্মা' মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন!

ত্রিকচ্ছর বাস মহাবিল্ববৃক্ষে।

যেখানে সেখানে নামেন না তিনি।

তবে আজকের বিষয়টি গুরুতর, আর এই ক্লাবের সম্পাদক ঘোরানন্দ ঘুটঘুটে ওই বিল্ববৃক্ষতলে গিয়ে গিয়ে ধর্না দিয়ে দিয়ে রাজি করিয়েছে তাঁকে।

তিন হাতে তিনটি কাছা সামলাতে সামলাতে ত্রিকচ্ছ শর্মা ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন, "মাইক?"

মাইক!

সেরেছে। ওটা যে সভার প্রধান অঙ্গ সেটা তো মনে পড়েনি ঘুটঘুটের। পড়বে কেন? নিজেদের গলা তো বাতাস-চেরা, ঘোড়া-কাঁদা। কিন্তু ত্রিকচ্ছ হচ্ছেন অভিজাত ব্যক্তি তাঁর গলা মাইক ফিটিং। শুধু গলা উঠবে না।

বিপদে পড়ে ঘোরানন্দ বাঁ হাতখানাকে বাড়াতে শুরু করল। আর মুহূর্তের মধ্যেই বাড়াতে বাড়াতে ইয়া লম্বা করে ফেলে

উ-ই ও পাড়ার বোসেদের বাঁশবাগান থেকে একখানা মাঝারি সাইজের তলতা বাঁশ উপড়ে এনে ধরিয়ে দিল ত্রিকচ্ছর হাতে। তলতা বাঁশ হল ফাঁপা বাঁশ, ওই থেকেই কৃষ্ণের বাঁশি তৈরি হয়েছিল। আর এখনো যারা আড়বাঁশি বাজায়, ওই তলতা বাঁশই তাদের ভরসা।

তা ছাড়া?

তা ছাড়া ভূতেদের স্বরক্ষেপণের মাধ্যমেই তো ওই ফাঁপা বাঁশ। ওর মধ্যে দিয়ে এই ভূত সম্মেলনের বার্তা চাউর করা হয়েছে।

ত্রিকচ্ছ শর্মা সেটাকে হাতে নিয়ে কেটে-কেটে বলতে লাগলেন, "সমবেত বন্ধুগণ, আজ আমরা যে বিশেষ বিষয় নিয়ে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছি, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূতজাতি আজ ধ্বংসের মুখে। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন, আজ তাই আমরা বলতে চাই—"

ত্রিকচ্ছ তো এদের সমস্যা বিশেষ জানতেন না, কারণ তিনি ভূত নন। তবু এদের কাছে যা যা শুনেছিলেন, তা সব মন দিয়ে শুনে মুখস্থ করেছিলেন। পন্ডিত লোক, মুখস্থ করতে দেরি হয় না। সেই মুখস্থ কথাগুলি বলে নিয়ে তিনি বললেন, "এর একটা প্রতিকার চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে জমায়েতের মধ্যে থেকে রব উঠল "চাই, চাই। প্রতিকার চাই।"

মানুষের জগৎ থেকে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবার পর যে আত্মারা স্বর্গ অবধি পৌঁছতে না পেরে এই পৃথিবীরই এখানে-সেখানে লেপটে থাকে, তাদের কথাবার্তায় সব অক্ষরের মাথায় মাথায় ওই চন্দ্রবিন্দুটাকে জুড়ে দেওয়াই হচ্ছে ভৌতিক অভিধানের নীতি, কিন্তু ক্রমেই তো যুগ পালটাচ্ছে? অনেক নিয়ম-টিয়মও পালটাচ্ছে, তাই ওই চন্দ্রবিন্দুর নিয়মটাও পালটে গেছে। মানে মুছে দেওয়া হয়েছে চন্দ্রবিন্দুদের ভৌত অভিধান থেকে।

তবে যারা নিরক্ষর ভূত, অভিধান-টভিধান দেখেনি, মানে আর কী ঠাকুমা-দিদিমাদের ঝুলির মধ্যেই রয়ে গেছে এখনো গ্রামে-

নামে তারা ওটা রেখেছে। এ সভায় তারাও কেউ কেউ এসেছে, পিছনের সারি থেকে তাদের গলা শোনা গেল, "ঠিঁক, ঠিঁক! [illegible]তকাঁর চাঁই।"

ত্রিকচ্ছ শর্মা এতে একটু বিরক্ত হয়ে তাকালেন, তারপর মাইক রেখে বললেন, "আমায় এবার ছেড়ে দেওয়া হোক, আর একটা মিটিং আছে।"

"সে কী! সে কী। ছেড়ে দেব কী?"

পাকুড়বাগান ক্লাবের সম্পাদক বলল, "এখন ছেড়ে দেব কী করে? এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।'

ত্রিকচ্ছ তিন হাতে তিনটি কাছা গুঁজে নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে পড়ে বললেন, "না বাপু না, আমার যেখানে সেখানে খাওয়া চলে না। আমি তো নিরামিষাশী। তা কী আয়োজন?"

ঘোরানন্দর উত্তরের আগেই তার সাকরেদ বিভীষিকা-উৎপাদন চটপট আউড়ে যায়, (সেই রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত কিনা) "আজ্ঞে আয়োজন বাঘের চর্বির পোলাউ, গন্ডারের কালিয়া ঘোড়ার কোর্মা, হাতির মাথা দিয়ে ডাল, টিকটিকির ছ্যাঁচড়া, কোলা ব্যাঙের

চার্টনি, গাধার কাটলেট নেংটির পায়েস. ছুঁচোর পুডিং—"

আ ছি ছি!

ত্রিকচ্ছ কানে আঙুল দিয়ে বলেন, "শুনতেও ঘেন্না। এইসব কুৎসিত আমিষ-ফামিশ আমায় অফার করছিলে?"

ঘুটঘুটে বিনয়ের গলায় বলেন "তাহলে ফলটল দিই?"

সঙ্গে সঙ্গে টপাটপ মঞ্চে এসে হাজির হয়, বড় বড় চালতা তাজা তাজা মাদার, থোলো থোলো টককুল, গোছা গোছা মাকাল ফল।

ত্রিকচ্ছ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, "ফল আবার কে খেতে যায় বসে বসে? ফলটল খাই না আমি।''

"ফলও খান না? তবে কী খেয়ে থাকেন আপনি?'' ঘুট-ঘুটের কাতর প্রশ্ন।

ত্রিকচ্ছ একটু তিনকোনা হাসি হেসে বলেন, "কেন, মানুষের ঘাড় কি পৃথিবী থেকে উপে গেছে? না তাদের ঘাড়ের শিরায় আর রক্ত থাকে না? আর ভুলে ভুলেও একবার বেলগাছতলা দিয়ে হাঁটে না তারা?''

ঘুটঘুটে শিউরে উঠে বলে, "অ্যাঁ—তবে যে বললেন, নিরামিষাশী—''

ত্রিকচ্ছ একটু কৃপার হাসি হাসলেন।

বললেন, "মানুষ যে আমিষ, একথা কোন শাস্তরে লেখা আছে বাপু?''

ঘুটঘুটে তেমন কোনো শাস্ত্র মনে করতে পারল না, মাথা, মানে খুলি চুলকোতে লাগল।

ত্রিকচ্ছ তাঁর বেলের ডালে তৈরি রণপা দুখানায় বাগিয়ে পা বসিয়ে বললেন, "হাড়ও খাই না, মাংসও খাই না, ছালচামড়া নোখ দাঁত কিচ্ছু না। যেমন মানুষ তেমনিই থাকে, শুধু ঘাড়ে একটি দাঁতের ফুটো। বলুক দেখি কেউ ত্রিকচ্ছ শর্মা অসাত্ত্বিক!"

উদ্বোধক চলে যেতে প্রধান অতিথি নিরলম্বচরণ, ভাষণ দিতে উঠলেন। তিনি মাইকের ধার ধারলেন না। সেই তলতা বাঁশখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভীম-গর্জনে বলতে লাগলেন, "এখনো ভূত জাতির এই দুর্দশা নিবারণ না করতে পারলে জাতটা পৃথিবী থেকে উপে যাবে। ভূতেদের চিরকালের জমিদারি রক্ষা করা হোক, মানুষ যাতে আবার ভূত-বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করা হোক, ভূতেদের মধ্যে একতার সৃষ্টি হোক।" চলল দীর্ঘক্ষণ ধরে এই হোক, তাই হোক, হ্যানো হোক, ত্যানো হোকের লিস্টি। কী করে হোক তা বললেন না। শুধু বলতেই লাগলেন, ভূতের জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা হোক, ভূত-হৃদয়ে সাহস ফিরিয়ে আনা হোক।

তাঁর কথার ধাক্কায় সভা থরথরিয়ে ওঠে, পাকা পাকুড় পাতারা ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ে যায়। তিনি নিজেও কেঁপে কেঁপে উঠে দুলতে থাকেন। দুলবেনই তো, 'চরণ' তো 'নিরবলম্ব'। পায়ের তলা তো বেবাক ফাঁকা। দুটি পা শূন্যে দুলছে।

আর সভাপতি বসে বসে ঢুলছেন।

একে একে আরো বক্তা উঠলেন।

ভূতদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য, এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে এসেছেন। তাঁরাও তাঁদের সমস্যার কথা বললেন, তবে কথা একই। মানুষরা আর তাঁদের মানতে চাইছে না, এবং থাকবার জায়গাগুলো কেড়ে নিচ্ছে। কথা আর থামে না।

শেষ অবধি অধৈর্য সভাপতি ওদের হাত থেকে মাইকটা টেনে নিয়ে মোচড় পাকে দু'টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বজ্রকণ্ঠে বললেন, "বন্ধুগণ!"

সভাপতি লোমকণ্টক শৃঙ্গির নাকি বয়সের গাছপাথর নেই। অন্তত নিজে তো তাই বলেন। তাঁর দাবি তিনি নাকি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখেছিলেন, আর সেই দেখার ফলে তাঁর গায়ে যে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, সেই কাঁটাগুলি কালক্রমে আধহাত-প্রমাণ লম্বা হয়ে গেছে। শজারুর কাঁটার মতো ছুঁচলো আর শক্ত কাঁটা। সেই কাঁটা তাঁর সর্বাঙ্গে। আর মাথার দু'পাশে যে একজোড়া করে শিং (হ্যাঁ জোড়া শিংই) সে দুটো নাকি লোমকণ্টকের মাসতুতো মামা ভৃঙ্গির। একদা ভৃঙ্গি নিজের ক্ষয়া পুরনো শিং দু'জোড়া কৈলাস পর্বত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, আর পড়বি তো পড় খটাস করে তারই ভাগ্নের মাথায়। সেই যে এসে গিঁথে গেল আর মাথা ছেড়ে নড়ল না। তদবধি তিনি তার লোমকণ্টক নামের সঙ্গে শৃঙ্গিটাও জুড়ে দিয়েছেন।

লোমকণ্টক হাঁক দিলেন, "বন্ধুগণ!"

কিন্তু ভাষণের দিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, "বন্ধুগণ! রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর ভাষণ শুরু করলে ভোজের আয়োজন সব পণ্ড হয়ে যাবে। ভোরের আলো ফুটলেই তো রসুইখানার সব খানা হাওয়া হয়ে যাবে, আর আমাদেরও হাওয়া হয়ে যেতে হবে। অতএব এইখানেই সভাভঙ্গ।"

সভাভঙ্গ! সভাভঙ্গ!

সমবেত 'আত্মাগণ' ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে থাকে।

অন্ধকারের গায়ে শত শত ছায়া-বাহুর সেই নৃত্য!! দেখতে পাওয়া গেলে দেখবার মতো হত! আহা সভাপতি কী ভাল!... কতক্ষণ ধরে রসুইখানা থেকে নানাবিধ সুরভি সৌরভ বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে।

ঘোরানন্দ ঘুটঘুটে গলাটা হাত-কুড়ি লম্বা করে বাড়িয়ে চেঁচিয়ে শুধোল, "পিসি, আর কতদূর?''

কোথা থেকে যেন সাড়া এল, "দূর কিঁসের? পাঁতা পঁড়েচে। শুঁদু কাঁছিমের খোঁলা, আঁর কুঁমিরের কাঁনকোঁ ভাঁজাটা বাঁকি! তেঁল চাঁপিয়েছে, গঁরম ভেঁজে দেব।''

গলা শুনে সভাপতি লোমকণ্টক চমকে উঠে বললেন, "কেঁ বঁলল কঁথাটা? আঁহা! কঁতদিন এ ভাঁষা শ্রবণ কঁরি নাই। কাঁন প্রাঁণ দুঁই শীঁতল হঁল। কেঁ উনি?"

ঘুটঘুটে তাড়াতাড়ি বলে, "আমার পিসি! কিছুতেই সভা ভাষা শিখবে না বুড়ি! কথায় চন্দরবিন্দুটি দেওয়া চাই। আমরা তো কবে ছেড়েছি। উনি আর—"

লোমকণ্টক সগর্জনে বলেন, "ঠিঁক কঁরেন! ওঁর কঁথা শুঁনে আঁমাঁরও সেঁই পুঁরনো সুঁরে কঁথা বঁলতে ইঁচ্ছে হঁচ্ছে। তাঁ উঁনি কি পঁর্দানশিন? সঁভায় তো দেঁখলাম নাঁ।''

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পিসি বেরিয়ে এল একটা ঘোড়ার ঠ্যাং হাতে নিয়ে। এটাই পিসির খুন্তি। সেইটা নাচিয়েই বলে উঠল পিসি, "পঁর্দানশিন আমাঁর শঁত্তুর হোঁক। দেঁখবেন কোঁতা থেঁকে? সেঁই ভঁর সঁন্দে থেঁকে সাঁড়ে চোঁদ্দঁটা উনুন জেঁলে রঁসুঁই পাঁকাচ্ছি নাঁ? বেঁয়াইডুঁবির খঁলের ওঁপারের শ্মশাঁনে আঁজ অঁনেঁক মঁড়া, তাঁই তঁবু কিঁছুটা সুঁবিদেঁ হঁল। হাঁত বাঁড়িয়ে বাঁড়িয়ে ওঁই চিঁতের আগুনে—ডাঁলটা, পাঁয়েসটা, ছাঁচড়াটা বাঁনিয়ে নিলাঁম। ...সঁভায় আঁসতে পাঁরি নাঁই তাঁই বঁলতে পাঁরি নাঁই, অ্যাঁতো মিঁটিঁং ইঁটিঁং ফিঁটিঁং ফাঁটিঁংয়ের রাঁন্নার কোঁনো দঁরকাঁর ছেঁল না। যাঁতক্ষণ মাঁনুষ আঁচে, ত্যাঁতক্ষঁণ ভূঁতও আঁচে। ভূঁতকেঁ আঁবার মাঁনে নাঁ কেঁ?"

ঘোরানন্দ তাড়াতাড়ি বলে, "এই করালীপুরের সবাই মানে টানে বটে, কিন্তু শহরে বাজারে—"

"রাঁক তোঁর কঁতা!"

পিসি জোর গলায় বলে, "শঁহঁর তোঁ কোঁন ছাঁর, বিঁলেত আঁমেরিঁকা পর্যঁন্ত ভূঁত মেনেঁ ভূঁত হঁয়ে যাঁচ্ছে। পঁড়ুক নাঁ এঁকবাঁর ভূঁতের কঁবলে? হুঁ! বাঁপ বাঁপ কঁরে মাঁনবে। তঁবে ফ্যাঁশানেঁর খাঁতিরে মুঁখে নাঁ মাঁনার ভাঁন কঁরে। কিঁছুটি নাঁ মাঁনাই যেঁ ফ্যাঁশান হঁয়েচেঁ আঁজকাঁল। ভূঁত ভঁগবান আঁচাঁর নেঁয়ম শাঁস্তঁর পাঁলা, মাাস্টঁর পঁণ্ডিত মা বাঁপ কাঁউকেঁ মাঁনবাঁনি। ...এঁই তোঁদেরও যেঁমন ফ্যাঁশান জেঁগেঁচেঁ—সঁব্য হঁব। এঁকেঁলে হঁব। চঁন্দর বিঁন্দু বাঁদ দিঁয়ে কঁতা বঁলব,

বাড়িতে গিয়ে বাসা বেঁদে উৎপাত উপদ্রপ করবীন—ভূতুড়ে কান্ড-মান্ড করবীন তেমনি আর কিং।...ইটিং-ইটিং না করে. দেং না এবার লাগ্ ঝমাঝম লাগিয়ে। লোকে ভূত মানে কিং না মানে।"

"ঠিক ঠিক।"

রোমকণ্টক সর্বাঙ্গের কণ্টক কাঁপিয়ে বলেন, "ঠিক বলেছেন আপনি। শুনে আমাঁরও এই বৃদ্ধ বয়সে একবার তাল ঠুকে লেগে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।"

পিসি বলে, "আঁচ্চা তাঁ লাগবেন। এখন খেতে চলেন। বাতাস বইচে পাঁতা পাঁত না উড়ে যাঁয়।...ওঁদিকে তেল কুটছে। জ্বলে যাঁবে—"

"চলেন চলেন, কোঁথায় পাঁত?"

আহ্লাদের তোড়ে অভিজাত অনভিজাত শত শত ভূত সমস্বরে নিজের ভাষায় কথা বলে উঠে হাততালি দিতে থাকে। থামতেই চায় না।

শত শত কঙ্কালের এই সমবেত করতালির খট খট শব্দ পুকুর বাগান ছাপিয়ে, মা চন্ডীতলা ভেদ করে, বোসেদের বাঁশ-বাগান ডিঙিয়ে, বড় হাসপাতালের দেয়ালে ধাক্কা মেরে করালীপুরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

শেষ রাত্তিরের ঘুম-ঘুম অনুভূতি!

অনেকক্ষণ ধরে শুনেও কেউ ধরতে পারল না শব্দটা কিসের। কী করেই বা পারবে? এই রাত্তির শেষ হবার মুখে শত শত কঙ্কাল একসঙ্গে করতালি দিতে লেগেছে। এটা কি ভেবে পাবার কথা? ...মনে হচ্ছে একদল ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে। কিন্তু এত ঘোড়াই বা আসবে কোথা থেকে?

দূর বাবা! ঘুম চোখে কে অত হিসেব কষে? এসে থাকলেও, গেলেও তো গেল। আবার পাশ ফিরে শোওয়া চলবে, এখনো কিছুটা রাত বাকি আছে।

সভাপতি আর প্রধান অতিথি সেই রাত্রে আর বাড়ি ফিরতে পারেননি না।

ভূরিভোজটা খুব জব্বর হয়ে গিয়েছিল তো!

ঐ রকম ঘোরালো নেমন্তন্ন আজকাল আর বড় একটা জোটে না। 'বায়ুভুক' হয়েই তো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কাটাতে হয়। ঘোরানন্দ ঘুটঘুটের পিসি ক্ষ্যান্তমণি খুব বেশিদিন এই ভৌতিক দেহ লাভ করেনি। এখনো তার মধ্যে ইহ পৃথিবীর করণ কারণ ধরন ধারণ লেগে আছে কিছু কিছু। তাই নেমন্তন্নর এই বিরাট 'মেনু'।

রান্নাবান্নার হাতটা ক্ষ্যান্তমণির রয়ে গেছে এখনো, পদ্ধতি পদ্ধতিগুলোও ভোলেনি। পিসির শ্বশুরবাড়ির গ্রামে ডাকসাইটে রাঁধুনি বলে নাম ছিল পিসির।...বড় বড় যজ্ঞিতে ডাক পড়ত তার।

অবিশ্যি মসলাপাতির স্টাইল বদলেছে। এখন ছ্যাঁচড়ায় এক-মুঠো পাঁচফোড়নের বদলে হয়তো এক মুঠো উচ্চিংড়ে গুবরে পোকা কেঁচো-কেন্নো মিশোনো—আরশোলা ফোড়ন দেয়, কালিয়ায় গরম মসলার বদলে উই পোকার গুঁড়ো, তবু ক্ষ্যান্তমণির হাতের গুণে এ রান্না ভূতের রসনায় অমৃততুল্য।

ভাগ্যক্রমেই একদা পিসি ভাইপোয় দেখা হয়েছিল।

দু'জনেই দেহের খোলশ থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যমার্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ দু' জনের কপালে কপালে ঠোকাঠুকি। দুশ্যত দেহটা না থাক কপালটা তো আছে।

ক্ষ্যান্তমণি ধাক্কা খেয়ে রেগে উঠে বলল, "কেঁরে লক্ষীছাড়া—ঢুঁ মারলিং এসে? চোঁকে দেঁকতে পাঁস না? কাঁনা নাঁকি?"

বলেই হঠাৎ নিজের গালে চটাচট চড় বসিয়ে হায় হায় করে উঠল, "আঁ আঁমার কপাল। ঘঁটাই তুঁই? তোঁর আঁবার কঁবে এ দঁশা হঁল? কঁবে এঁলি পিঁথিমী থেঁকে?"

তখনো পূর্ব নামেই ডাকল পিসি। এখানে এসে যে ওর নাম-করণ হয়েছে 'ঘোরানন্দ ঘুটঘুটে', পিসি তখনো জানে না তো!

ঘোরানন্দ বলল, "তুই চলে আসার কিছু দিন পরেই পিসি কাঁকির হাতে খেয়ে খেয়ে নরদেহেই কঙ্কাল বনে গিয়ে হঠাৎ একদিন দেহ রাখলাম।"

"আঁহা!"

পিসি বলল, "মঁরে যাঁই! ছোঁট বোঁয়ের রাঁন্না তো ছেল জন্মের অখাঁদ্য। তাঁ এসেছিস বেশ করেচিস, আঁমার কাঁচে কাঁচে থাঁক। ...তাঁ হ্যাঁ রে, এখনো পিঁথিমীর কঁতার মঁতন চোঁস্ত কঁতা বঁলচিস যেঁ?"

ঘোরানন্দ বলল, "চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা কওয়া এখন আর ফ্যাশান নেই পিসি।"

পিসি বলল, "কীঁ দিঁয়ে?"

"চন্দরবিন্দু গো! মানে খোনা খোনা নাকি নাকি সুর দিয়ে।"

"অঁ! বুঁজেচিঁ! তাঁ এ ফ্যাঁশান কেঁন?"

ঘোরানন্দ 'মাথা', মানে খুলি চুলকে বলল, "তা নইলে মানুষ বড় ধরে ফেলে গো পিসি! অদৃশ্য হয়ে ওদের দলে মিশে নিজেরা নিজেরা একটু কথা কইবার জো নেই। তাছাড়া—নরলোকে তো নিত্যি নতুন ফ্যাশান পালটাচ্ছে পিসি। ওখেনে থাকতে আমাদের বেটাছেলেদের কী ফ্যাশান ছিল, মনে আছে তো তোর? বাবুদের বাড়ির সবাই পুজোয় গ্রামে ঘরে আসত—লম্বা কোঁচা, লম্বা টেরি, লম্বা পাঞ্জাবি। হাঁ হয়ে দেখতাম। একদম দুধের মতন সাদা। ...আর এখন? দেখ তাকিয়ে—ছেলে বুড়ো, বুড়ো হাবড়ারা পর্যন্ত পেন্টুল পরছে, আর লাল নীল হলদে সবুজ চকরা-বকরা জামা গায়ে দিচ্ছে। আরো কত ফ্যাশানই বদলাচ্ছে। ...বাবুদের চুলে আর দশ আনা ছ' আনা বাবুছাঁট নেই, মেয়েদের মতন ঘাড়ে ঝাঁপানো চুলের বাহার। ...বলতে গেলে অনেক! তবে? আমাদের ভূতলোকেই বা ফ্যাশান বদলাবে না কেন?"

পিসি বলল, "ফ্যাঁশানের নিকুঁচিঁ। বাঁবা বঁলতঁ, মানেঁ তোঁর ঠাঁকুর্দা, পন্ডিতঁ লোঁক ছেঁল তোঁ? বঁলতঁ—সঁধম্মে নিধঁনো শেঁয়ো, পঁরোঁ ধঁম্মো ভঁয়াঁবঁহো। মাঁনেটা বুঁজতে পাঁরলিঁ তো? তাঁ যাঁকগে—তোঁর সঙ্গে যাঁখঁন দেঁকা হঁয়ে গেঁল তাঁখঁন আঁর বাঁতাসে ভেঁসে ভেসে নাঁ বেঁড়িয়ে পিঁসি ভাঁইপোতে এঁকট বাঁসা খুঁজে নিঁই। দুঁটো ভাঁল মঁন্দ রেঁদে বেঁড়ে খাঁওয়াই তোঁকে। আঁবার যঁদি গাঁয়ে এঁকটুঁ গঁত্তি লাঁগে।"

তদবধি পিসি ভাইপো একত্রে। পাঁচ জায়গা ঘুরতে ঘুরতে, এখানে সেখানে উৎখাত হয়ে এই চন্ডীতলার মাঠে এসে বাসা বেঁধেছে। ঘোরানন্দই এখন এ পাড়ার নেতা, ক্লাব-ট্লাব তারই গড়া।

রান্নাটা ক্ষ্যান্তমণি ভোলেনি, ঘুটঘুটে সেটা ভুলতে দেয়ওনি। রোজই তার নতুন নতুন বায়না। নতুন মানে আর কী, সেই পুরনো জন্মের হঠাৎ হঠাৎ সেই ফেলে আসা বাড়িটার রান্নাঘরের দাওয়া, কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িখানা, আর পিসির হাতের পিঠেপুলি, মালপো, পুরের ভাজা, তালের বড়া, নারকেল নাড়ুর স্মৃতি মনে পড়ে গিয়ে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়. আর তখনই বায়না করে. পিসি ওইসব বানা।

বেচারি ক্ষ্যান্তমণি (এখানের কোনো নাম নেয়নি পিসি) বহু কষ্টে ওইসব মালমশলা জোগাড় করে করে ভাইপোকে খাওয়ায়। কত জন্মের ভাগ্যি তাই ভাইপোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। নইলে কে কোথায়?

খেতে বসে ঘুটঘুটে বলে, "আচ্ছা পিসি, আমার মাকে কোনো-দিন দেখতে পেয়েছিস?"

পিসি মাথা নাড়ে, "কঁই আঁর?" ...নিশ্বাস ফেলে।

আর ভাইপোর মন ভাল করতে তাড়াতাড়ি বড় বড় দুটো ছুঁচোর পিঠেপুলি, কী ঢোঁড়া সাপের পুরের ভাজা, কিম্বা সোনা

ব্যাঙের মালপো পাতে ফেলে দিয়ে বলে, "থাঁক থাঁক ও' স'ব ক'থা। তু'ই খাঁ তোঁ।"

গালগল্পের সময় ঘুটঘুটে বলে, "এ সময় তোর ওই চন্দর বিন্দুটা বাদ দে পিসি।"

"কেন রে'?"

"দুজনায় আগের মতন কথা কইলে, মনে হবে, যেমন—সেই তুই, সেই আমি, আর এটা আমাদের সেই কুসুমপুর।"

ক্ষ্যান্তমনি নিশ্বাস ফেলে বলে, "মনে হয়ে আর লাভ কী বল? সত্যি তো আর তা হবে না?"

"তবু, দু দণ্ড ভুলে থাকা।"

তারপর বলে, "মা যদি এসে জুটত, কী মজাই হত পিসি।"

"তোর মা এখানে এসে জুটবে না। সে সগ্গে গেচে।"

"কে বলল তোকে?"

"কেউ বলেনি। নিজেই বুজতে পারি। কত গুণ ছেল তার, কত ভাল মন।"

দুজনেই একটু চুপ করে যায়।

আবার পিসি তাড়াতাড়ি বলে, "হালুয়া দেব একটু? হালুয়া?"

এটার জন্যে খাটুনি কিছু নেই। বেয়াইডুবির খালের ধারে কত পাঁক, হাত বাড়িয়ে একটু তুলে আনলেই হল।

বাসাটা ঘুটঘুটের মন্দ নয়।

লোমকণ্টক আর নিরলম্বচরণ, দুজনেই বেশ হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোতে পেয়েছেন।

এদের দুজনকে অবশ্য সারাটাদিন ডোবার ধারে, বাঁশ-বনের আড়ে পা ঝুলিয়ে বসে বসে ঢুলতে হয়েছে, তা হোক, অতিথি বলে কথা।

পিসি নিজে থেকেই বলেছিল, "আঁপনাদে'র বয়েস হ'য়েচে. আঁপনাদে'র এ'কটু'ক বিশ্রামের দ'রকার। আঁজ এখে'নেই গা গ'ড়িয়ে ফে'লু'ন।"

শুনে তাঁরাও বে'চেছিলেন।

সারাদিন সারা সন্ধে ঘুমিয়ে আর নাক ডাকিয়ে যখন উঠে বসলেন তাঁরা তখন রাত গভীর। ওনারা তো ভোরবেলা শোন, ভর সন্ধেয় ওঠেন। উঠেই কিছু ঢেলা সংগ্রহ করে নিয়ে টপাটপ টকাটক চারিদিকে ছু'ড়ে, তারপর চরতে বেরোন।

ওই ঢিল ছোঁড়ার কারণটা হচ্ছে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়া, দেখা, এদিকে - সেদিকে কোনো রোজা-ফোজা আছে কি না। রোজারা যদি ভূতবন্ধন করে রেখে থাকে তো, ঢিল ছু'ড়ে বুঝে নেওয়া যায়। ঢিলটা ফিরে আসে।

রোজার মন্ত্র ভেদ করে মাটিতে পড়তে পারে না।

যেদিকের ঢিল ফিরে আসে না, সেদিকে নির্ভয়ে যাওয়া যায়। এই জন্যেই সন্ধে হলেই ছেলেপুলেরা হঠাৎ খেলা ফেলে হাত ঝেড়ে দুহাত জোড় করে বসে পড়ে বলে ওঠে,—

> "ভর সন্ধেবেলা, ভূতে মারে ঢেলা
> ভূতের নাম রসি—
> হাঁটু গেড়ে বসি।"

তবে এসব প্রায় তামাদি কথাই হয়ে গেছে।

রোজারা আর যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূতবন্ধন করে রাখে না। কাজেই ভূতেদেরও ঢিল ছোঁড়বার দরকার হয় না। আর ছোট ছেলেপুলে? তারাও তো ক্রমশই ভূতে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ছে। এসব শুনলে হাসে। গ্রামে-ট্রামে যদিও বা কিছু আছে, শহরে মোটেই না।

কিন্তু লোমকণ্টক আর নিরলম্বচরণ বনেদি ভূত, ও'রা নিয়ম-টিয়ম সব পালন করে থাকেন। লোমকণ্টক তো নিরলম্ব-চরণের থেকে আরো সাবেককালের। তাই হলেও গভীর রাত ঘুম থেকে উঠে দশদিক স্মরণ করে একে একে দশটি হাই তুলে, হাত লম্বা করে সেই খালপারের শ্মশানধার থেকে দশটি ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে, পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈশান অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু আর ঊর্ধ্ব অধঃ, এই দশদিক লক্ষ করে খটাখট ছু'ড়ে, আর একটি বড় হাই তুলে বললেন, "বাবা ঘুটঘুটে, তোমার এখানে একটু সিদ্ধির শরবত পাওয়া যায় না?"

ঘোরানন্দ ঘুটঘুটে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "সিদ্ধির শরবত? দেখি পিসিকে জিগ্যেস করে। আমরা তো মানে ওসবের অব্যেস করিনি, চা খাই।"

"চা? অ্যাঁ।"

নিরলম্বচরণ হাই তুলতে ভুলে গিয়ে লাফিয়ে উঠে বসে বলেন, "চা পাওয়া যাবে? বে'চে থাকো বাবা, জন্ম জন্ম বে'চে থাকো। প্রমোশন পেতে পেতে এই ভূত-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হও। আহা। কতকাল চা খাইনি।"

'লোমকণ্টক' প্রধান অতিথির এই আহলাদ দেখে উৎসুক হয়ে বললেন, "বাবা ঘুটঘুটে, তবে না হয় আমাকেও ওই দ্রব্যটি দাও। সিদ্ধির শরবত তো প্রায়শ খাই, ওটি তো কখনো খাই নাই।"

ঘোরানন্দ ছুটে পিসির কাছে চলে গেল।

নিরলম্ব এতক্ষণে হাই তুলে আর ঢিল ছু'ড়ে বললেন, "ইশ। কী বেদম ঘুম ঘুমোনো হল, অমাবস্যের রাতটা বরবাদ গেল।"

লোমকণ্টক মাথার শিঙে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "আরে রেখে দিন আপনার অমাবস্যা। কী আর করতেন? আগের সেই সোনার দিন আর আছে? তার চেয়ে এমন তোফা ঘুমটি অনেক আরামের। বায়ুভক্ষণ করে থাকি, ঘুম তো আসতেই চায় না। কাল যা ভোজটি হয়েছে, আহা! এমন খাওয়া শেষ খেয়েছি সেই জব চার্নক সাহেবের আমলে। যেমনি তার ফর্দ তেমনি উচ্চাঙ্গের রান্না। পাকা রাঁধুনির হাত।"

নিরলম্ব উৎসুক হয়ে বলেন, "বটে বটে। আহা। ভোজের গল্প শুনেও সুখ। বলুন বলুন, কে সেই নেমন্তন্ন-কত্তা, আর কে সেই রাঁধুনি।"

লোমকণ্টক ঝেড়ে ফু'ড়ে উঠে বলতে যাচ্ছেন, এই সময় ঘুটঘুটে আর পিসি দুজনে দুটো মাটির গেলাসে করে দুপাত্র চা নিয়ে এসে সামনে ধরল।

নিরলম্বচরণ তাড়াতাড়ি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে একচুমুক দিয়েই হৈহৈ করে উঠলেন, "শ্রীমান ঘোরানন্দ এ চা কোথায় পেলে বাপ? এ-যে পৃথিবীর স্বাদমাখা মানবিক মানবিক গন্ধে ভরপুর। অ্যাঁ। সেই আমাদের পটলডাঙা স্টুডেন্ট জীবনের স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিল। কী দিয়ে এ চা বানিয়েছেন তোমার পিসি?"

ঘোরানন্দ লাজুক হেসে বলল, "পিসি বানায়নি। জিনিসটা মানবিকই। ইস্টিশনের চায়ের দোকানে—এই শেষ কেটলি ফুট-ছিল, সাড়ে বারোটার প্যাসেঞ্জারদের জন্যে। সেটাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে এল পিসি। তার সঙ্গে গেলাস দুটো। বাসায় তো পেয়ালা বলতে শুধু মড়ার খুলি।"

"ঘেন্না ধরে গেছে ওতে—"

লোমকণ্টক বলেন, "কতকাল ধরে যে ওই হতচ্ছাড়া পাত্তরে খাচ্ছি। আহা! কী খাসা গেলাসটি। আমাদের পলাশীতে এক কুমোর জ্যাঠা ছিল, বালক বয়েসে তার কাছে বসে থেকে হাঁ করে চাক ঘোরানো দেখতাম। একই যন্তর থেকে হাঁড়ি কলসি গেলাস খুরি থেকে ইস্তক পাতকুয়োর পাট ইয়া ইয়া জালা সবই বেরিয়ে আসত, দেখে তাজ্জব হয়ে যেতাম। ঠিক তেমনি গেলাসটির জগতের এত ওলটপালট হল, দেখো কুমোরের চাকটি অবিকল আছে।"

ক্ষ্যান্তমণি মাথার খুলিতে একটু ঘোমটা টেনে বলে, "উঁই স'গগে ব'সে যি'নি লীলাখে'লা ক'রচেন। এ'কই য'ন্তরে মাঁনুষ গোঁরু, হাঁতি, পাঁখি, পোঁকা মাঁকড়, গ'ড়ে চ'লেচে'ন। ঠিঁক তে'নার মত'ন আঁর ক'ী। তাঁ যাঁক—ক'ী যে'ন পাঁকা রাঁদুনির ক'তা ব'লতে'ছিলেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ!"

নিরলম্বচরণ মহোৎসাহে বলেন, "কী যেন ভোজের গল্প বলছিলেন?"

"বলছিলাম জব চার্নক সাহেবের বিবির শ্রাদ্ধর ভোজের কথা।"

"অ্যাঁ। সাঁহেবে'র বি'বি'র ছে'রাদ্দ?"

পিসি চমকে ওঠে, "ওনাদের তো গোঁর দে'য়। সাঁহেবভূ'ত তো দেখি নাই তাঁ ন'য়।"

লোমকণ্টক গোঁফের কাঁটায় তা দিয়ে মৃদু হেসে বলেন, "গোর ওনারও হয়েছিল। ভদ্দর কথায় কবর। ঘটা করেই হয়েছিল। কিন্তু হলে কী হবে? হিন্দুর ঘরের মেয়ে তো? কবরের মধ্যে হাঁফ ধরে, ঘাম ঝরে। একদিন উঠে এসে আমাদের ভূতলোকের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, দেখ, যতই হোক হিন্দুর মেয়ে তো ছিলাম, তা একটু শ্রাদ্ধ-শান্তি ব্রাহ্মণভোজন না হলে শান্তি পাচ্ছি না। তা ভোজনের জন্যে ব্রাহ্মণ আর কোথায় পাব? ভূত-ভোজনই করাই। আপনারা কি আমার নেমন্তন্ন নিতে রাজি হবেন?

"আমরা যারা ছিলাম, বললাম, নিশ্চয় নিশ্চয় ভূতের আবার জাতপাত। কবে খাওয়াচ্ছেন? বিবি হেসে বললেন, কাল মঙ্গলবার আছে, কালই হোক। আহা, সে যে কী ভোজ খেয়েছিলাম। এখনো মুখে লেগে আছে।"

পিসি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, "রান্নাটা ক'রল' কে'?"

"রান্না? করলেন স্বয়ং বিবি নিজে।"

"নিজে গঁ'ল দিচ্চেন নাঁ তোঁ?"

"এ বয়সে আর ওসব ছেলেমি করব কেন বাছা? তিনি যে পাকা রাঁধুনিও ছিলেন। তাঁর হাতের রান্না খেয়েই তো চার্নক সাহেব হিন্দু-বাঙালির মেয়েকে বিবি করেছিলেন। তা তোমার কালকের রান্না, সেই স্বাদ মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল।"

পিসির মুখ প্রসন্ন হল।

বলল, "আঁমি ম'খ্যু' মেঁয়েছে'লে। কীঁ বাঁ জাঁনি।"

নিরলম্বচরণ নিশ্বাস ফেলে বলেন, "ভোজের গল্প বড় খারাপ। পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, বছরে একটা দিন একটা ভোজ-বাড়িতে ডাক পড়ে।"

"ফি বছর?" ঘুটঘুটের ভাঁটাচোখ আরো গোল হয়ে ওঠে।

"হুঁ, ফি বছর। জষ্টি মাসের পনেরো তারিখে। বঁড়শের রাজবাড়িতে।"

"তাঁরা আঁপন'াকে ডাঁকে?"

অবাক হয় পিসি।

নিরলম্বচরণ বলেন, "এখন কি আর ডাকে? আশিবচ্ছর আগে একবার ডেকেছিল। রাজার মেয়ের বিয়ে, আত্মীয় বন্ধু কর্মচারী সব্বাইয়ের নেমন্তন্ন, রান্নার গন্ধে বাড়ি ম-ম, পাত পাতা হয়েছে। দৈ কই? মিষ্টি কই? বোঁদে আন, মন্ডা আন, লুচি ভাজ, কচুরি ভাজ রব, বর-কনে সবে বাসরে বসেছে। কেউ দেখেনি আকাশে কখন মেঘ জমেছে, হঠাৎ হঠাৎ কড়-কড়-কড়াত। ভয়ঙ্কর এক বাজ পড়ল সোজা বিয়ে-বাড়ির ওপর।"

"অ্যাঁ!"

"অ্যাঁ!"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে পুরো বাড়ি ভস্মস্তূপ। আর যে যেখানে ছিল, সব মরে কাঠ। হাঁটুর নীচে থেকে পা দুখানা যে উড়ে গেল সে ওই বাজের আগুনে। আর আমিও—"

"আঁহা। মরেঁ যাঁই।"

পিসি চোখ মুছল।

নিরলম্বচরণ বললেন, "সেই অবধি বছরের ওই তারিখটিতে রাজবাড়ি থেকে ডাক পড়ে। নেমন্তন্ন খেতে আসা যারা যারা সেই রাত্তিরে কাঠ হয়ে গিয়ে, পরে কোথায় না কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, তারা এসে হাজির হয়।

"বাড়িটা যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে, আলোয় ঝলমল করে চারদিক, আবার রান্নার গন্ধে ম-ম করে হাওয়া-বাতাস। দৈ কই? মিষ্টি কই? বোঁদে আন, মণ্ডা আন, লুচি ভাজ কচুরি ভাজ রব ওঠে। পাত পড়ে, পাতে খাবার পড়ে, বাস, হঠাৎ কড়-কড়-কড়াত করে সব শেষ। আলো উপে যায়, ভীষণ অন্ধকার নেমে আসে। যেমন ধ্বংসস্তূপ তেমনি ধ্বংস স্তূপ পড়ে থাকে মাঠের মাঝখানে। বঁড়শে গ্রামের সবাই জানে একথা, দূরে থেকে আলোও দেখেছে কেউ কেউ। তবে ওই রাত্তিরে কাছে-পিঠে থাকে না কেউ। পাড়া ছেড়ে পালিয়ে বসে থাকে।"

কথা শেষ হলে ঘুটঘুটের প্রশ্ন, "পাতে খাবার পড়ার সঙ্গেই আবার সেই কড়-কড়-কড়াত? তবে যে বললেন, ফি বছর ভোজ খান!"

নিরলম্ব করুণ হাসি হাসেন, "'খাই' একথা বলেছি কই? বলেছি ডাক পড়ে। ডাক পড়লে যেতেই হয়, আর আশি বছর আগের সেই ঘটনাটা আবার একখেপ দেখতে হয়। রাজা-বাবু, আর রানীমা নতুন বাসরে বসা মেয়ে-জামাইকে নিয়ে ওর তলাতেই থেকে গেছেন কিনা। নড়েননি তো। যেই ওই তারিখটি আসে, তাদের ধারণা হয়, মেয়ের বিয়ের তারিখ এসেছে ; বিয়ে দিতে হবে। ভোজের আয়োজন করতে হবে।"

ক্ষ্যান্তমণি দুঃখের গলায় বলে, "আহা! মাঁজে মাঁদ্যে আঁমার এ'খেনে এ'সে খাঁবেন। আঁমার তো রোঁজ রাঁন্না হ'য়।"

রোজ রান্না হয়।

দুজনেই চমকে ওঠেন, "বাবা ঘোরানন্দ, তুমি কী ভাগ্যবান!"

ঘোরানন্দ বলে, "পিসির সঙ্গে দেখা হওয়াটাই বিশেষ ভাগ্য! তা যাই হোক, উঠি-উঠি করবেন না, পিসির হাতের ভুনি খিচুড়ি খেয়ে যেতে হবে।"

"অ্যাঁ! আজ আবার খাওয়া? তায় আবার ভুনি খিচুড়ি। আহা। ইশ, উহু। তা কিসের খিচুড়ি হবে বাপ?"

"হবে নয়, হচ্ছে। পিসি শামুক গুগলি গেঁড়ি আর কানকোটারি পোকা, এই নিয়ে তো ঝেড়ে বেছে বসেছিল দেখে এসেছি। তাই তো, না পিসি?"

ক্ষ্যান্তমণি বলে, "হ্যাঁ! ও'টাই জ'মে ভাঁল। ও'র সঁঙ্গে টিক'টিকি'র ঝাঁল, ডেঁয়ো পিঁপড়ে'র চাঁটনি, আঁর বোঁয়াল মাঁছের পিঁত্তির ব'ড়া।"

"বাবা ঘুটঘুটে, তোমার সঙ্গে দাদু পাতাব?"

লোমকণ্টক বিগলিত গলায় বলেন, "তাহলে পুরনো বাসা ছেড়ে এখানেই এসে পড়ে থাকি।"

পিসি তাড়াতাড়ি বলল, "তাঁ থাঁকুন ন'া মে'সোম'শাই। আঁমাদে'র একটাঁ গাঁর্জে'ন হ'য়। এই যে কাঁলকে মাঁটিংয়ে কতা হ'ল, ন'রলোঁকের বি'রুদ্ধে যু'দ্ধ চাঁলাতে হ'বে। ঝাঁপিয়ে প'ড়তে হ'বে। সে স'ব বুদ্ধি দে'বে কে'? আঁপনাদের কাঁলের ক'তা দি'য়ে বো'জাল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—"

ঘুটঘুটে বলে ওঠে, "স্মিঁতিকথা বলুন কিছু—"

স্মৃতিকথা!

লোমকণ্টক বলেন, "সে কি আর আজকের কথা বাপু?
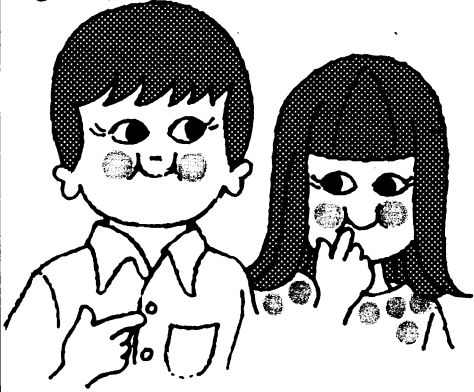
জগতের সবই পালটে গেছে. সে কথা কি আর তোমাদের মনে ধরবে?''

"ধরবে ধরবে!"

অনেকগুলো গলা একসঙ্গে বলে ওঠে।

লোমকণ্টক চমকে বলেন, ''এত সব কারা কথা বলল?''

''কেউ নয় দাদু! ওই আমার ক্লাবের ছেলেরা। গপ্পো শুনতে এসেছে।''

এসেছে সত্যি দল বেঁধে!

ভূতের বাসার তো আর দরজা জানলা থাকে না। শূন্যের মধ্যে শুধু এরিয়া মেপে বাসার ভাগ! ঘুটঘুটের এরিয়ার ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

লোমকণ্টক বলেন, "তাহলে গোড়া থেকেই বলি। পলাশীর যুদ্ধের পর মনের অবস্থা খুব খারাপ, ভেবে পাচ্ছি না মানুষে মানুষে এত মারামারি কাটাকাটি কেন? একজন অন্যজনের অনিষ্ট করে কেন? তা যাক, এখন যখন নরদেহের খোলশ খুলে গেছে, সর্বত্র অবাধ গতি, যা খুশি করতে পারি, যা ইচ্ছে বেশ করতে পারি, তো—মানুষের উপকার করে বেড়াই।...এই ভেবে ওই উপকারের চেষ্টায় ঘুরছি, দেখি গঙ্গায় একখানা সাজানো গোছানো রাজসই বজরা! রেলগাড়ি তো ছিল না তখন, যাওয়া আসা ওই বজরা নৌকোয়। তো সন্ধান নিয়ে জানলাম, এক জমিদারের মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে বজরা এসেছে। তার সঙ্গে পাঁচজন দাসী, চোদ্দজন পাইক-পেয়াদা। রান্নার পাচকও আছে, তিন দিনের রাস্তা, কোথাও কোথাও বজরা বেঁধে, চড়ায় নেমে রান্না করে খাওয়া দাওয়া হবে। সেকালে তাই নিয়ম ছিল।

"আমার মনে হল সঙ্গে যাই, দেখি জমিদার-কন্যের কেমন শ্বশুরবাড়ি। একটা চন্দনা পাখি হয়ে বজরার মাস্তুলের ওপর চড়ে বসলাম। দুপুরে বজরা ছেড়েছে, যেতে যেতে যখন সন্ধে হয়-হয়, হঠাৎ দেখি—পিছনে আর একখানা বজরা আসছে। খুব তাড়াতাড়ি আসছে, এসে গেল বলে। সেই বজরায় কারা জানো? বজরাভর্তি দৈত্যের মতো এক ডাকাতের দল। নির্ঘাত খবর পেয়েছে এ বজরায় অনেক টাকাকড়ি গহনাগাঁটি আছে। থাকবেই তো! জমিদারের মেয়ে, জমিদার-বাড়ির বৌ!

''মাস্তুল থেকে নেমে পড়ে বজরার মাঝিদের কানের কাছে গিয়ে বলতে গেলাম 'সাবধান ভাই!' কিন্তু ওরা কিনা 'এই পাখিটা আবার কোথা থেকে এল—' বলে উড়িয়ে দিল।...এদিকে ও বজরা কাছে এসে গেছে। ...ততক্ষণে আকাশে অন্ধকারও নেমেছে। ...আর গোটা চার-পাঁচ ডাকাত, টপাটপ জমিদার-কন্যের বজরায় উঠে পড়েছে। হাতে সড়কি, বল্লম, টাঙ্গি। দাসীরা আর জমিদার-কন্যে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল, আর ওই চোদ্দটা লেঠেল বজরার মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না, ঝপ করে ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজমূর্তি ধরে ডাকাত কটাকে একটা একটা করে তুলে ঝপাঝপ জলে ফেলে দিয়ে, মানুষটানুষ সমেত পুরো বজরাখানাকে জল থেকে তুলে শোঁ করে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে, শূন্য পথেই সো-জা চালান করে দিলাম তার শ্বশুরবাড়ি। এক দন্ডের মধ্যেই হাজির। ভাবলাম কী উপকারই করলাম।

"কিন্তু কী হল জানো?

''দু দিনের রাস্তা হঠাৎ একরাত্তিরে এসে পড়ায় তুমুল শোরগোল। মহাকলরব! 'কী হয়েছে কী হয়েছে' জেরা সেই দাসীদের আর পাইক-পেয়াদাদের।...তারপর, তারপর কী বিচার হল শুনবে? শ্বশুরবাড়ি থেকে বলল, ঘটনা শুনে বোঝা যাচ্ছে ভৌতিক কান্ড। তা ভূতে-ছোঁওয়া বৌকে তো আর ঘরে নেওয়া যায় না। কে বলতে পারে। বৌকে ভেতরে-ভেতরে ভূতে পেয়ে বসে আছে কি না? তখন চালাল রোজার ব্যাপার! ভূতে

জন্ম করেছে বলে খামোকা মেয়েটাকে ঝাড়ফুঁক লাগিয়ে, মেরে আধমরা করে চুল কেটে, হলুদপোড়া শুঁকিয়ে, বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। কে জানে তারপর কী হল তার। ব্যস, সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম আর মানুষের উপকারে নেই। ভূতে ছুঁলে যদি তাদের এত ইয়ে, তো—অপকারই করি। তদবধি ওই কর্ম করছি। জানবে যেখানে যত যুদ্ধ অশান্তি মারামারি কাটাকাটি, জাহাজডুবি নৌকোডুবি, তারপর গিয়ে রেলগাড়ি জন্মানোর পর যত রেল কলিশন, লাইন উপড়োনো, সব এই লোমকণ্টক শর্মার কাজ! আবার এরোপ্লেন দুর্ঘটনা, খনি দুর্ঘটনা, সেতু ভেঙে বাস উলটে পড়া,...গাড়ি চাপা। সবের মূলেই বুড়ো লোমকণ্টকের কারসাজি। এই তো সেদিন—"

"ও দাদু—আমাদের যে একেবারে ফালতু করে দিচ্ছেন!"

বাইরে কলরব ওঠে, "সব ক্রেডিটটাই নিজে নিচ্ছেন? সবের মূলেই যদি আপনি, তবে আমরা কোথায় আছি? ঘোড়ার ঘাস কাটছি? 'স্মৃতিকথা' বলতে বসলে কি এই ভাবে সব গুণ গরিমা নিজের দিকে জড়ো করতে হয় দাদু?"

ঘুটঘুটেও বলে, "সত্যি, আমরা কর্তাদিকে যে কত কী করে বেড়াচ্ছি, সেসব বুঝি একেবারে মাঠে মারা যাবে দাদু? আমরা রেললাইন উপড়োই না? বাস উল্টোই না? বস্তাকে বস্তা মাল উড়িয়ে নিই না? যার জন্যে বদনামের শেষ নেই। যেখানে যা কিছু ভয়ঙ্কর রহস্যময় ঘটবে, অমনি লোকে বলতে শুরু করবে, 'ভূতুড়ে কাণ্ড। ভৌতিক ব্যাপার। কে খাচ্ছে? ভূতে নিশ্চয়!'... এইসব। যেটা আমরা করি না। মানুষ নিজেই করে, অনায়াসে বলে, 'ভূতের কীর্তি!'...এই সব বদনাম ঘাড়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। আর আপনি কিনা বলছেন, সব করছেন আপনি!"

লোমকণ্টক মৃদু হাসেন।

বলেন, "উত্তেজিত হয়ো না বাপু। এখনো বলছি এসব করার মালিক আমিই। তবে সবই কি আর নিজে হাতে-পায়ে করি? ভূত-হৃদয়ে প্রেরণা দিই। যেমন ভগবান! নিজে কি আর হাতে করে কিছু করে? ইচ্ছেশক্তিতে হয়। আমার ব্যাপারেও তাই। ভূত আর ভগবান একই পর্যায়ের। বর্তমান কালে, তোমাদের এই বাংলা অঞ্চলে এই লোমকণ্টকের ইচ্ছেশক্তিতেই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। ওটাই আমার ব্রত কিনা। তা যাক, কাল থেকে তো নতুন উৎসাহে কাজ শুরু? কোন্ দিকে অভিযান?"

কথার মাঝখানে ক্ষ্যান্তমণি লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়ায়। বলে, "খিঁচুড়ি নেঁবেচে, চঁলেন সবাঁই! তঁবে এঁই কঁতাটি বলি, যাঁ কঁরেন, কঁরুন, এঁই কঁরালীপুর চন্ডীতঁলায় নঁয়। এঁখেনেঁর নোকেঁরা ভঁদ্দর। আঁমাদেঁর মানে ভঁয় ভঁক্তি কঁরে। তাঁছাড়া মাঁয়ের থাঁন! আঁর...অঁমরা হঁচ্চি, মঁায়ের সঁখি সাঁমুন্তি, চেঁলা চাঁমুণ্ডি!"

ঠিক আছে!

ঠিক আছে!

কিন্তু রেল ইস্টিশানটা হাতে থাক। ওটা করালীপুর নয়, নবীননগর। আব ওই নবীননগরটা হচ্ছে মহাবদ-অবিশ্বাসী! করালীপুরের লোক চন্ডীতলা মাঠকে ভয় খায় বলে, ওরা দাঁত বার করে হাসে!

তবে ওই রেল ইস্টিশান থেকেই চালানো হোক অভিযান!

কিন্তু সেটা তো প্রায় শুরুই হয়ে গেছে এই খানিক আগে।

রেলস্টেশনটা নবীননগরে।

স্টেশন প্লাটফর্মে দুখানা রোদে জলে পচে যাওয়া বাঁশের খুঁটিতে আটকানো একটা টিনের বোর্ডের গায়ে লেখা আছে নামটা। তবে সব অক্ষরগুলো এখন আর নেই, ধুয়ে মুছে ফর্সা হয়ে গেছে দুটো 'ন'। তাই ট্রেনে চড়ে চলে যাওয়া যাত্রীরা দেখে জায়গাটার নাম'—বীন—গর'।

নামটার কী মানে হতে পারে, ভাবতে ভাবতে যায় অনেকে। তবে এ অঞ্চলের লোকেদের ওই অক্ষর মুছে যাওয়ায় কিছু এসে যায় না। তাদের তো জানা।

মাঝে মাঝে আবার বিজনপুর, নবীননগর, কাতলাডাঙার লোকে দাঁত বার করে হেসে বলে, চন্ডীতলার মাঠের ভূতেরা 'ন' দুটোকে চেটে সাফ করে গেছে।

এ স্টেশনে শেষ ট্রেন থামে রাত সাড়ে এগারোটায়।

দূরপাল্লার ট্রেন, এখানে থামার কথা এক মিনিট, তবে গার্ড সাহেবের এখানে মাসির বাড়ি, তাই বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকে গাড়ি। গার্ডসাহেব নামেন, হাত-মুখ ধুয়ে নেন। আর রাতের খাবারটা মাসির বাড়ি থেকে হাতিয়ে নিয়ে গাড়িতে ওঠেন। তারপর ট্রেন চললে ধীরে-সুস্থে টিফিনকৌটো খুলে খান।

নবীননগরের বাঁড়ুজ্যেগিন্নির তিনি সবেধন বোনপো। তাই অবারিত নেমন্তন্ন করে রেখেছেন তিনি—আমার এই গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ, খামারে ঝুড়ি ঝুড়ি হাঁসের ডিম, বাগানে শাক-পাতা, ফল-ফুলুরি, আর তুই কিনা পাঁউরুটি চিবিয়ে রাত কাটাস? চলবে না এমন অনাছিষ্টি! রেলগাড়িকে খানিক দাঁড় করাবি, এখানে চলে এসে হাতমুখ ধুয়ে, দুধের গেলাশটায় চোঁ-চোঁ চুমুক দিয়ে, রাতের খাবারটা কৌটোয় পুরে নিয়ে যাবি। ব্যস! গাড়িকে একটু দাঁড় খাওয়ালে, এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

গার্ডসাহেব অবিশ্যি বলেছিলেন, তুমি জানো না মাসি, আজকাল নিয়ম-টিয়মের খুব কড়াকড়ি।

মাসি কথাটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন, রাখ তোর কড়া-কড়ি! সব কড়াকড়িই ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে! ইস্টিশানে একটা চায়ের দোকান ফাঁদ, দেখবি সেই ফাঁদে পড়ে গাড়ির নোকেরা সব টপাটপ নেবে পড়ে চা খেতে বসে যাবে। গাড়ি ছাড়তে দেরি হচ্ছে, টেরও পাবে না।

তা মাসির পরামর্শ নিয়েছেন গার্ডসাহেব। স্টেশনের চা-ওলাটিকে ওই রাত বারোটা অবধি বসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। গাড়ি ছাড়ার পর যখন মাসির বাড়ির বিগ সাইজের পেতলের কৌটোটি খুলে লুচির পরতে পরতে দেখতে পান পুকুরের টাটকা মাছের ঝালের বিগ বিগ টুকরো, দুজোড়া ডিমের ডালনা, আলুর দম, বেগুনভাজা, চাটনি, আমের আচার, ছানাচিনি, ক্ষীরপুলি, শুকনো পায়েস, তখন ভাবেন গুরুজনের আদেশ শুনে ভালই করেছি, এটাই ঠিক।

গাড়িকে দাঁড় করানোর জন্যে যদিই কেউ রাগারাগি করে রিপোর্ট করে, সোজা জবাব দিয়ে দেবেন, ব্যাপারটা চন্ডীতলা মাঠের বাসিন্দাদের কীর্তি!

মনটা তাই সুস্থ করে ট্রেন থামিয়ে নেমে পড়ে, ঢুকে যান একটা রাস্তায়। রোজই যান। এই সময়টুকুর মধ্যেই যাতে চা পর্ব শেষ হয়ে যায় তা বলে যান চা-ওলাকে।

চা-ওলা বিপিন আবার তার সাকরেদ ভাগ্নে পটলাকে হুকুম দেয়, আগে থেকে চা রেডি রাখবি পটলা। ঠান্ডা মেরে গেলে উনুনে চাপিয়ে ফুটতে দিবি।

তা পটলা যে মামার হুকুম পালন করেনি তা তো নয়?

কিন্তু কোথায় সেই চা?

গাড়ি থামতেই যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ে কাকেদের 'কা কা-র মতো' 'চা চা' করতে থাকে। দেরি করবার তো সময় নয়। অন্যদিন তো দেরি হয়ও না। সুতো-ঝোলা হাফ-প্যান্ট আর পিঠ-ছেঁড়া শার্ট পরা সেই বাঁটকুল ছেলেটা তো ছুটোছুটি করে সকলের সামনে সামনে চা ধরে দেয়। গেল কোথায় ছেলেটা?

বিপিন এদিক ওদিক তাকিয়ে পরিত্রাহি হাঁক পাড়তে থাকে, "পটলা, এই পটলা! ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা, নবাব খাঞ্জাখাঁ! কোন-

খানে বসে আছিস? চা কোথায়?''

কিন্তু বেচারি পটলা কী করে উত্তর দেবে চা কোথায়? সেও তো এতক্ষণ আকাশমুখো হয়ে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল 'চা কোথায়।'

জ্বলন্ত উনুন থেকে ফুটন্ত চায়ের বৃহৎ কেটলিটা হঠাৎ ফটাফট দুটো মাটির গেলাশ গায়ে গেঁথে শোঁ—ও' করে উঁচুতে উঠে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল, এ দৃশ্য জলজ্যান্ত দুটো চোখে দেখেও কি মুখে বলা যায়?

বললে মামা আস্ত রাখবে?

'গাঁজা ধরেছিস বুঝি আজকাল?' বলে পিঠের ছাল তুলবে না?

পটলা তাই মামার গলা পেয়েই ফট করে আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে প্লাটফর্মের একটা অন্ধকার কোণ ঘেঁষে গুটিয়ে শুয়ে পড়ে, চায়ের টেবিলে পাতবার চিনি-চটচটে প্লাস্টিকের শীটটা টেনে নিয়ে মাথা অবধি মুড়ি দিয়ে।

ট্রেনটা তো সত্যি যাত্রীরা চা পায়নি বলে চিরকাল বসে থাকবে না? ছাড়বেই, তখন—'নী নী' করা রাত্তিরে মানুষ-শূন্য ফাঁকা রেল লাইনের ধারে বসে কথাটা গুছিয়ে বলা যাবে।

এখন ওই মারমুখী যাত্রীর দল, চেঁচামেচি, হৈচৈ, গোল-মালের মধ্যে সেকথা বললে, শুধু মামা কেন, সবাই মিলে চামড়া ছাড়াবে পটলের।

ছাড়াবেই তো।

ট্রেন ছাড়ো-ছাড়ো মুখে চায়ের আশায় ছুটে আসা লোকেরা যদি দেখে শুধু একটা উনুন জ্বলছে পড়ে পড়ে, আর চা-দাতা ভাগলবা! কার মাথা ঠান্ডা থাকে? কেউ তো আর মাথায় আইস-ব্যাগ চাপিয়ে আসেনি?

বিপিন ওই 'চা-চা'দের মন রাখতে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচায়। "পটলা! তুই কি মরে গেছিস? গেছিস যদি, তো বলে যাসনি কেন? আজকের রাতটা পার করেও তো মরতে পারতিস শয়তান, বদমাস, নির্লজ্জ গবেট। পটলা! পটলা রে—"

হায়! কোথায় পটলা!

অন্ধকার কোণের দিকে গুটিয়ে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের শীটটাকে আর কে 'পটলা' ভাববে?

এই হৈচৈ হট্টগোলের মধ্যে গার্ডসাহেব এসে পড়েন হন্ত-দন্ত হয়ে। এক হাতে টর্চ, অপর হাতে বৃহদাকার টিফিন-কৌটো।

''কী, হয়েছে কী?''

শুধোন তিনি আকাশকে বাতাসকে, জনতাকে, বিপিনকে। তবে উত্তরটা বিপিনই দেয়, "কিচ্ছু হয়নি স্যার, পটলটা হঠাৎ ফস করে উড়ে গেছে।''

''কী উড়ে গেছে ফস করে?''

"আজ্ঞে, আমার ভাগ্নে পটলা! ওই যে, যে চা দেয়! তা গেলি গেলি বাবুদের চা-টা দিয়ে তবে যাবি তো? আক্কেল নেই একটু?''

"কী বকছ যা তা? নেশা-টেশা করেছ নাকি?" বলে গার্ড-সাহেব গটগট করে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড়িয়ে সবাই উঠে পড়ে। 'পটলার কী হল' বলে তো আর কেউ পড়ে থাকতে পারে না।

গার্ড সাহেব জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে [illegible] ''তোমার গাঁজা খাওয়া বার করছি আমি! দোকান তুলিয়ে [illegible] লোক বসাব! হ্যাঁ। চেনো না আমায়! পটলা উড়ে [illegible] পটল-ভাজা না?''

বলতে বলতে, আরে আরে, এ কী! এর মানে কী! মাসির প্রাণভরা অবদানসমেত সেই বৃহৎ বিরাট টিফিন কৌটোটা হঠাৎ ফস করে কোলের ওপর থেকে উঠে পড়ে শাঁ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল মানে? শুধুই কি বেরিয়ে গেল?

দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে কোথায় যেন উড়ে গেল না? হলেও অমাবস্যার রাত, আকাশে তারারা রয়েছে তো? আর স্টেশনের আলোগুলোও রয়েছে।

গাড়ির শব্দ বিলীন হয়ে গেলে, বিপিন বাজখাঁই গলায় বলল, ''পটলা, উঠে আয় বলছি। নেহাত 'পাঁচজনের হাতে খুন হবি,' ভেবে তখন আর টেনে বার করিনি। আয় নিজের হাতে খুন করি।''

''করো। তাই যদি তোমার ধম্মে হয়, করো।''

বলে পটলা প্লাস্টিকখানা গায়ে জড়িয়েই উঠে এসে মামার সামনে দাঁড়ায়। প্রথম চোটটা এটার ওপর দিয়েই যাক।

বিপিন কিন্তু মারল না।

বলল, "হয়েছেটা কী? কেটলি উলটে চা পড়ে গেছে?"

পটলা মাথা নেড়ে বলল, ''না, উড়ে গেছে।''

"নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনিসনে পটলা। ভাল চাস তো সত্যি কথা বল।"

''ভালই তো চাইছি মামা।...নিজের চক্ষে দেখনু উনোন থেকে ফুটন্ত চা-ভরতি কেটলিটা শোঁ করে উঠে পড়ে একদম বেপাত্তা হয়ে গেল।''

"অনেক কষ্টে মেজাজ ঠিক রাখছি পটলা, আর পারছিনে। কখন থেকে ঘুমোচ্ছিলি?''

''ঘুমোই নাই।''

''ঘুমোও নাই? স্বপন দেখ নাই? কেটলিটা শোঁ করে আকাশে উড়ে গেল, এইটা বিশ্বাস করতে হবে আমায়?''

"না করো তো পটলার চামড়া ছাড়াও। কিন্তু তাতে তোমার কেটলি ফিরে আসবেনি মামা। সে এই নরককুন্ডু থেকে উটে সগ্গে চলে গেছে।''

"পটলা, তোর মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল না তো?... এখন আমি করি কী? গার্ট সাহেব কীরকম মারমুখী হয়ে শাসিয়ে গেল দেখলি তো? মাথাটা একটু ঠান্ডা করে বল না বাবা—এ কী, এ কী, এর মানে কী? পটলা! পটলা রে—"

আর পটলা!

মামা ভাগ্নে দুজনের চোখের সামনে দিয়ে চায়ের দোকানের লেড়ো বিস্কুটের টিনটা ফট করে লাফিয়ে উঠে শোঁ করে উঠে গিয়ে শূন্য-পথে ছুটতে থাকে।

নবীননগরের বাঁড়ুজ্যে-গিন্নি ঘুম থেকে ওঠেন কাকভোরে। আজ উঠেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন। উঠোনে ওটা কী গড়াগড়ি যাচ্ছে? চকচকে মতন? পেন্টুর টিফিন কৌটোটা না?

হ্যাঁ তাই! সেই বৃহৎ বিশাল পেতলের কৌটোটা। যার মধ্যে বাঁড়ুজ্যেগিন্নি গত রাত্রে তিনজনের যুগ্যি মাল ঠেসেঠুসে ভরে ফেলে বোনপোর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

হায় কপাল! অত যত্নের দেওয়া খাবারটা নিতে ভুলে গেছে?

কিন্তু ভুলে যাবার মতো কি? ভুলে গেলে তো দালানেই পড়ে থাকবে। উঠোনে নেমে গড়াগড়ি খাবে কেন? যাবার সময় তাড়াতাড়িতে হাত থেকে পড়ে যায়নি তো? তা পড়ে গেলে তো কৌটোর ঢাকনি খুলে খাবার ছড়িয়ে পড়বে। এটা কেমন?

সাবধানে উঠোনে নেমে কৌটোটা তুললেন!

—ঠক্ করে উঠে এল।

তার মানে ফাঁকা।

ভয়ে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল!

কখন কী ভাবে খেয়ে-দেয়ে ফাঁকা কৌটোটা রেখে গেল পেন্টু? কোন রাত্তিরে রেখে গেল?

ও চলে যাওয়ার পরই তো সদরে তালা পড়েছে। আর সে তালার চাবি তাঁর নিজের আঁচলে বাঁধা। পেন্টু কি তাহলে বাইরে কোথাও বসে খেয়ে নিয়ে উঠোনের পাঁচিল ডিঙিয়ে খালি কৌটোটা ফেলে দিয়ে গেছে? কিন্তু তাই বা কী করে হয়? ও হল গে গার্টসাহেব। ও যাবে, তবে সরকারের রেলগাড়ি নড়বে। ওর কি আর মাঠে বসে খেয়ে নেওয়া করতে সময় নষ্ট করলে চলে? তাছাড়া—ও চলে যাওয়ার একটু পরই তো রেলের বাঁশি বেজে উঠল, রোজ যেমন বাজে। তার মানে গাড়ি ছাড়ল।

কৌটোটা নিয়ে ভারী চিন্তায় পড়লেন বাঁড়ুজ্যেগিন্নি।

সদর দরজা খুলে দেখলেন এদিক-ওদিক। কিছু বুঝলেন না।

কর্তাকে কি ঘুম ভাঙাবেন?

ভাঙিয়ে কী বলবেন? পেন্টুর কৌটো পড়ে কেন?

শুনলে কর্তা রেগে আগুন হবেন না? ভাবতে ভাবতেই আপনিই ঘুম ভেঙে গেল কর্তার। ভাঙবে না? গোয়াল পরিষ্কার করার বুড়ি গদাইয়ের মার গলাটি হল গিয়ে সাইরেনের বড়দি। সেই গলায় সে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে বাড়ি ঢুকে এল, "মা! অ মা। তোমার গোয়ালডা কনে গেল?''

বাঁড়ুজ্যেগিন্নি তো হাঁ!

"গোয়ালটা কনে গেল কী?"

"বলতেচি গোয়ালডা গেল কোতা?''

"গোয়ালটা গেল কোতা কী কথা গদার মা? রাতারাতি পাগল হয়ে গেলে না কি?"

"পাগল হবারই ব্যবস্তা মা! দেখে তুমিও হবে তাই। সাত সাতটা গাইবাছুর সমেত গোয়ালডা লোপাট! শুধু খাঁ-খাঁ জমিডা পড়ে রইচে।"

ঘুম আর ভাঙাতে হল না বাঁড়ুজ্যে-কর্তার। গদার মার চিৎকার আর গিন্নির বুকচাপড়ানির শব্দেই ধড়মড়িয়ে উঠে এসে শুনতে পেলেন গোয়ালের দিক থেকে কান্নার আওয়াজ। গিয়ে পড়ে তিনিও হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, পাথরের স্ট্যাচুর মতো।

গোয়ালের বেড়া খুঁটি চাটিবাটি সমেত সমস্ত হাওয়া।

পুকুরচুরির কথা চিরকাল শোনা যায়, কিন্তু গোয়ালচুরি? এ কথা কে কবে শুনেছে?

বাঁড়ুজ্যেবাড়ির এই গোয়ালচুরির খবরে সারা নবীননগর তোলপাড়!

গ্রাম ঝেঁটিয়ে সবাই আসছে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে। এই.

কাল সন্ধে বেলাও নীরি-গয়লানি গাই দুয়ে দিয়ে গেছে। গোরুতে বাছুরেতে খড়েতে খোলেতে গোয়াল একেবারে রমরম করছিল তখন।

গাঁসুদ্ধু সবাই গবেষণা করতে বসে, কেমন সেই চোরেরা কেমন তাদের যন্ত্রপাতি! যাতে রাতারাতি নিঃশব্দে এমন একখানা বৃহৎ চুরি হাসিল করে ফেলা যায়।

নির্ঘাত বিলেত আমেরিকা থেকে কোনো ইলেকট্রিকের যন্তর এনেছিল। এখন ছোটখাট একটার ওপর দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখল, এরপর শহরকে শহর গ্রামকে গ্রাম উপড়ে নিয়ে চলে যাবে।

করালীপুর আর নবীননগর পাশাপাশি খবরটা চাউর হতেই করালীপুরের লোকরা ফিসফিস করে বলাবলি করতে থাকে, ব্যাপারটা সুবিধের নয়। এ বাপু ভৌতিক কান্ড!

ওদের এই ফিসফিসও চাউর হয়ে নবীননগরে পৌঁছে গেল। নবীননগর ভূতে বিশ্বাসী নয়, তাই হো-হো করে হেসে বলল, এটা করালীপুরেরই উপযুক্ত কথা। বিজ্ঞানের কত উন্নতি হয়েছে আজকাল। একটা গোয়াল উপড়ে নিয়ে যাওয়া এমন কী?

কিন্তু গোয়াল নিয়ে কী করবে তারা?

আহা, ওই তো বলা হচ্ছে, এটা পরীক্ষামূলক। এরপর গ্রাম-গঞ্জ শহর বাজার সব উপড়ে নিয়ে যাবে।

আমাদের এই পচা গ্রাম নিয়ে ওরা কী করবে?

কী করবে? শোনো কথা! রিসার্চ করবে, রিসার্চ। মানে গবেষণা। এদেশের মাটিতে এত ধান চাল পাট তুলো হয় কী করে তাই দেখবে?

কিন্তু অতখানি চোরাই মাল পাচার করল কী করে?

লরি এনেছিল, ট্রাক এনেছিল, আবার কী?

কর্তারা—যাঁরা চুপিচুপি ভূত বিশ্বাস করে থাকেন, এখনো করছেন, তাঁরা বললেন, কিন্তু তার তো একটা শব্দ হবে? মাঠে চাকার দাগ থাকবে?

বিজ্ঞানে কী না হয়! শব্দ ওঠে না, দাগ পড়ে না, এমন জিনিস দিয়ে চাকা তৈরি।

বলছে বটে এসব, কিন্তু যেন ফাঁকা ফাঁকা। গলায় জোর নেই। কারণ বলার সময় হঠাৎ হঠাৎ ওদের পায়ের তলা থেকে চটির পাটিরা ঘসটে বেরিয়ে এসে চটাপট চটাপট হাঁটা দিতে শুরু করছে, গায়ের জামাটা ফস করে খুলে বেরিয়ে পড়ে নদের নিমাইয়ের মতন দু'হাত তুলে শূন্যে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে।

'ঝড়' বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গায়ের জোরে বলা। বললেই তো হল না? ঝড়টা কোথায়?

কিন্তু এই নিয়ে গুলতানি করে দিন কাটালে তো চলবে না? মাথায় মাথায় যে জোড়া বিপদ।

তারক বাঁড়ুজ্যে অর্থাৎ বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের মাথার ওপরই সেই বিপদের খাঁড়া। জেলা স্কুল থেকে খবর এসেছে—দুদিন বাদে স্কুল-পরিদর্শক আসছেন? তার মানে স্কুলের সেক্রেটারির মাথায় মুগুর। আর বর্তমানে তিনিই তো নবীননগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি!

বছর-দুই হল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারি সত্যহরিবাবু মারা গিয়ে এই বিপদটি ঘটিয়ে গেছেন তারক বাঁড়ুজ্যের।

এর সঙ্গে আবার 'চাঁদের ওপর চুড়ো' স্কুলের ফুটবল টীমের শীল্ডের খেলা সামনের শনিবার। সব দায়িত্ব তো তাঁরই। খেলা করালীপুর ভবতারিণী টীমের সঙ্গে। চিরকাল যাদের সঙ্গে রেষারেষি।

দিঘি থেকে চান করে ভিজে গামছাখানা চারপাট করে মাথায় চাপিয়ে বাড়ি এসে হাপসে বসে পড়তেই গিন্নি এক খোরা বেলের পানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাছে বসে পড়ে পাখা নাড়তে নাড়তে বললেন, "তা হ্যাঁ গো, শুনলুম তোমাদের ইস্কুলের 'নিসপেকটার' আসবে, তাকে একবার শুদোলে হয় না?"

তারক অবাক। "কী শুধোবো"

"এই যে—যাঁরা 'গোরসনা' না কী যেন করবার জন্যি গোয়ালটা হাপিস করে নে' গেল, তারা তাদের কাজ মিটলে আমার বুধি, মুংলি, সোমাবতী, নারানী আর রবু, শুকো, শনাইকে ছেড়ে দেবে না? যতই তাঁরা বিলেত আমেরিকার লোক হোক, এটা তো জানে গোরু হচ্ছে গোমাতা ভগোবতী, তানাদের কষ্ট দিলে মহাপাপ!"

তারক বাঁড়ুজ্যে দুঃখের হাসি হেসে বলেন, "ইস্কুলের ইনসপেকটার এর কী জবাব দেবে?"

"দেবে না কেন? জ্ঞানী-গুণী-পন্ডিত লোক। একবার শুদিয়েই দেকো-না।"

বাঁড়ুজ্যে ভিজে গামছাখানা মাথায় চাপতে চাপতে বলেন "ওসব কথা ছাড়ান দাও।"

গিন্নি চটেন। বলেন, "বেশ, তুমি না পারো, আমি কেনোকে দিয়ে শুদোবো!"

"কেনো শুনবে তোমার কথা?"

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নি দুঃখের গলায় বলেন, "ফুটবল ম্যাচ ফুটবল ম্যাচ করে কেনো এখন আর কতাই শুনতেচে না অবিশ্যি, কল-কেতা থেকে নাকি খ্যালোয়াড় আনবে সেই চিন্তেয় পাগল। তবে হাতে-পায়ে ধরে বলব।"

"ছেলের হাতে-পায়ে ধরবে? বাঃ!"

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নি তেজের সঙ্গে বলেন, "তা দরকার পড়লে মশাটা মাছিটারও পায়ে পড়তে হয়। কী। এ কী! এটা কী হল। ও মা গো, কী সব্বোনাশ। অ বিন্দি, বিন্দি রে, ছুটে এসে আমার মুকে চোকে জল দে, বাতাস কর। আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্চি!"

বলে মাটিতে শুয়ে পড়েন বাঁড়ুজ্যে-গিন্নি।

কারণ তারকচন্দ্রের মাথা থেকে পাটকরা ভিজে গামছাখানা ফট করে উঠে পড়ে ঘরের কড়িকাঠের গায়ে গিয়ে দুলতে লেগেছে।

তারক গলা নামিয়ে বলেন, "এখন বুঝতে পারছ, গিন্নি, গোয়াল উড়িয়ে নিয়ে গেছে কারা?"

কিন্তু এ তো শুধু নবীননগর।

বিজনপুর থেকেও জবর খবর আসছে যে। সেখানেও হুলু-স্থুল কান্ড! কাদের কোন্ আমবাগানের আমগাছেরা নাকি উঠছে নামছে, উঠছে নামছে। কাদের বাড়ির বুড়ো কর্তা মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে—'ল্যাবনচুষ খাব' বলে বায়না ধরে রসাতল করছেন, বালিশ ছিঁড়ছেন, পাথরবাটি ভাঙছেন। আবার কাদের বাড়ির বৌ নাকি নাকী সুরে কথা কইছে, আর কিছুতেই মুখের ঘোমটা খুলছে না। ভাত খাবার সময় দেয়ালমুখো হয়ে বসছে।

আরও কত কী-ই সব হচ্ছে।

অথচ নিয়মমাফিক কাজকর্ম তো চালিয়ে যেতেই হবে। বিদ্যালয়-পরিদর্শক যখন আসছেনই, আসাটা যখন কিছুতেই ঠেকানো যাবে না, তখন প্রস্তুত হতেই হবে। দু'দিন ধরে সেক্রেটারি তারক বাঁড়ুজ্যে, আর হেডমাস্টার যশোদাজীবন ছেলেদের পাখিপড়া করাচ্ছেন, ইনসপেকটর কী জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দিতে হবে।

নিচু ক্লাসের ছেলেদের ধরে ধরে বোঝাচ্ছেন যশোদাজীবন, "পৃথিবীটা কিসের মতো জিজ্ঞেস করলে যেন বাপু বলে বসিসনি রসগোল্লার মতো কিংবা লুচির মতো। বলবি—বলবি—আচ্ছা কী বলবি?"

একসঙ্গে অনেকগুলো ছেলে বলে ওঠে, "জানি স্যার। বলব, উত্তর-দক্ষিণ একটু চাপামতো।"

"চমৎকার! কিসের উত্তর-দক্ষিণ?"

"কেন, কমলালেবুর।"

"ওভাবে বলবি না। বলবি—।''

কী ভাবে বলবে, কী-কী প্রশ্ন আসতে পারে—বোঝাতে দম ছুটে যায় যশোদাজীবনের।

তারক পড়েছেন বড়দের নিয়ে।

গতকাল নাকি করালীপুর হাই স্কুল পরিদর্শন হয়ে গেছে, সেখানে নাকি উঁচু ক্লাসের ছেলেদের আধপাতার মতো একটি 'এসে' লিখতে বলেছিলেন ইনসপেকটর, ছেলেরা খুব খুশি করেছে তাঁকে। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল—"তোমার মতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী?''

করালীপুরের ভবতারিণী হাই স্কুলের ছেলেরা নাকি বেশ মহৎ মহৎ উদ্দেশ্য জানিয়েছে।

তারক নবীননগর উচ্চ বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের বোঝান, "বেশ মহৎ-মহৎ কথা লিখবি, বুঝলি? মাত্র দশমিনিট সময়, তখন ভাবতে সময় পাবি না, এখন থেকে ভেবে রাখ।"

তারপরেই নিজের ছেলে কানাই বলে ওঠে, "সাবজেক্টটা না জানলে ভাবব কেমন করে স্যার?"

স্কুলে সে বাবাকে স্যারই বলে।

এটাই নাকি ফ্যাশান।

বাবা-স্যার বলে ওঠেন, "ফাজলামি করিসনে।"

সকাল থেকে স্কুলবাড়িতে সাজ-সাজ রব।

খেলার মাঠের ঘাস ছাঁটানো হয়েছে অবশ্য গতকাল। আজ ভোর থেকে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মোছা হচ্ছে চেয়ার টেবিল বেঞ্চ আলমারি। খাবার জলের কুঁজোগুলির গায়ের শ্যাওলা পরিষ্কার করা হয়েছে নারকেল ছোবড়া দিয়ে রগড়ে রগড়ে ধুয়ে।

প্রতিষ্ঠাতা সত্যহরি রায়ের ফোটোখানি দেওয়াল থেকে পেড়ে ধুল ঝেড়ে কাঁচ মুছে আবার টাঙানো হয়েছে। অফিসঘরের টেবিলে রাখা দোয়াতটা ধুয়ে নতুন কালি ভরা হয়েছে, পিন-কুশনটা থেকে মরচে-পড়া পিন ফেলে দিয়ে নতুন পিন সাজানো হয়েছে পরিদর্শকের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে।

আরও কত কী-ই যে হয়েছে।

এমনকী দরজার পাশে যে ঘরঝাড়ার ঝাড়ুটা থাকে চিরকাল, দরজা বন্ধ না করলে চোখে পড়ে না, সেটাকে পর্যন্ত সরানো হয়েছে। অথচ?

অথচ পরিদর্শক মশাই কোনো দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। এমনকী সত্যহরির ছবিটা পর্যন্ত না। ক্লাসে ক্লাসে ঢুকে একটা একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করে, নাইন-টেনের ছেলেদের সামনে এসে লেখার জন্যে একটা সাবজেক্ট ধরে দিলেন। 'তোমার মতে মানুষ বলা যায় কাহাকে?'

স্লিপটা ফেলে দিয়ে পরিদর্শক জিতেন ঘোষ জলখাবার খেতে বসলেন। মানে তাঁকে বসানো হল। যশোদাজীবন আর তারকচন্দ্র দুজনে মিলে ধরাধরি করলেন। রোদ পড়ে গেলে নাকি আমপোড়ার শরবতের কোনো মানে হয় না। ফলটলেরই বা মানে কী?

কাজেই জিতেনবাবুকে 'মানেওলা' কাজটাই সেরে নিতে হল আগে। এসে ছেলেদের লেখা দেখবেন।

দেখলেনও তাই।

কিন্তু বেচারা জিতেন ঘোষ!

এখন তাঁর সামনের কাগজগুলো একেবারে মানে হারিয়ে বসল কেন?

কী লিখেছে এরা? হেডমাস্টার মশাইয়ের দিকে তাকালেন জিতেন ঘোষ। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "প্রধান শিক্ষক মহাশয়, আমাকে তাহলে ধরে নিতে হবে, আপনার এই দুটি ক্লাসের সবগুলি ছেলেরই মাথায় কিছু গন্ডগোল আছে।"

হেডমাস্টারের মাথায় বাজ!

কী লিখেছে ছেলেরা!

দুষ্টুমি মাথায় চাপিয়ে পরিদর্শকের প্রতি কোনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে লেখেনি তো? যেমন তাঁর সম্পর্কে লেখে। তিনি তো নিজে দেখেছেন ক্লাসঘরের বাইরের দেয়ালে, দরজায় ঢুকতেই যাতে চোখে পড়ে এভাবে লেখা—

"হেড়ু স্যার, হেড়ু স্যার,
কোটি কোটি নমস্কার,
কবে হবে ভবপার?"

তেমন যদি কিছু লিখে বসে থাকে? কিন্তু সবাই সমান দুষ্টুমি করবে? শুকনো শুকনো মুখে বললেন যশোদাজীবন, "কেন স্যার? কেন স্যার? কী ব্যাপার?"

"আমায় জিজ্ঞেস করছেন কী ব্যাপার? এত কাল এই কর্ম করে বেড়াচ্ছি, এমন মার্ভেলাস টীচিং তো দেখিনি কখনো। এতগুলো ছেলের খাতায় এক লেখা এক ভাষা, এক বানান এমন-কী হাতের লেখাটা পর্যন্ত একই রকম কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং! নাঃ, আশ্চর্য! মনে হচ্ছে যেন একটার কার্বন কপি।"

হেড-স্যার হেড চুলকে বললেন, "আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না স্যার।"

"আমিও পারছি না।"

জিতেন ঘোষ একজনের একখানা খাতা টেনে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন, "দেখুন, সেক্রেটারিমশাই যদি পারেন।"

বলেই উচ্চস্বরে পড়তে লাগলেন, "মানুষ কাহাকে কহে? যাহারা এখনো 'ভুত' হয় নাই, তাহাদেরই মানুষ কহে। মানুষজাতি ওতীশয় নিরশংসো এবং সারথোপর, ভুতজাতিকে ধংসো করিবার ফিকিরেই থাকে ইহারা। তবে ইহাদের ভিতোর কিছু কিছু ভদ্রোবেক্তি আছে, যাহারা ভুতজাতিকে মানুনো করে। আমার মতে ইহারাই যথারথো মানুষ।"

ঠিক সামনেই সেক্রেটারির নিজের ছেলে।

এমন ভ্যাবলা মুখে বসে আছে যেন সেও কোনো মানে বুঝতে পারছে না। তার মানে ন্যাকামির চূড়ান্ত করছে।

স্কুল-ঘরের ছাদ ফাটিয়ে হাঁক দিলেন তারক, "কানাই। এই রাস্কেল!"

কানাই আরও ভ্যাবলা মুখে তাকাল।

"এসব কী লিখেছিস?"

কানাই মাথা নেড়ে বোকাটে গলায় বলল, "এসব তো লিখিনি আমি।"

"তুমি লেখনি? পাজি শয়তান। তাহলে আমি লিখেছি? তুমিই পালের গোদা। তুমিই সবাইকে শিখিয়েছ—।"

সব ছেলেগুলো একইরকম ভ্যাবলা মুখে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল জিতেন ঘোষের দিকে। যেন তারাই কোনো পাগলের প্রলাপ শুনছে।—

এখন সবাই মিলে একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, "এসব আমি লিখিনি। কানাই কিছু শেখায়নি। আমি তো—।"

এরকম জলজ্যান্ত প্রতিবাদে হেড়ুও খেপে যান।

শয়তানি করে আবার আস্পর্দা! নির্ঘাত সবাই মিলে পরিদর্শকের সামনে অপদস্থ করবার জন্যেই ষড়যন্ত্র করে—ওঃ! অসহ্য!

এইসব মান্যগণ্যদের সামনেই পরিত্রাহি চেঁচিয়ে ওঠেন যশোদাজীবন, "তোমরা লেখনি? তোমরা সব সোনার গোপাল। ভূতে এসে লিখে দিয়ে গেল, কেমন? কী? কী? আবার হাসি? কে হাসছিস! কে হাসছিস। অ্যাঁ। মরণের পাখা উঠেছে না? আয় তবে এই পাখার বাঁট তোদের পিঠে ভেঙে মরণ ত্বরা করে দিই।''

চেয়ার-টেবিল ঠেলে পাখা উঁচিয়ে তেড়ে যান যশোদাজীবন পিছনের ছেলেদের দিকে। দেখিয়ে দেবেন জিতেন ঘোষকে কী

রকম শাসন করেন তিনি ছেলেদের।

কিন্তু দেখছে কে?

জিতেন ঘোষ তো ততক্ষণে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেছেন। শুধু শোনা গেল, "আমায় এক্ষুনি যেতে হবে। কাজ আছে।''

ছেলেগুলোর সবাইয়ের মুখ দেখেছেন জিতেন।

নিরীহ কাঁদো-কাঁদো। অথচ হাসির আওয়াজ উঠছে। অলক্ষ্য থেকে।

সর্বনাশ!

এরকম গোলমেলে জায়গায় আর থাকে মানুষ?

যশোদা, তারকও ছেলেগুলোর মতো ভ্যাবলা মুখে বসে রইলেন। ছুটে গিয়ে তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা করতে ভুলে গিয়ে।

ক্ষ্যান্তমণির আজকাল খুব নামডাক, খুব বোল-বোলাও। যে 'শ্যাওড়াগাছ মহিলা সংঘ' এতদিন ক্ষ্যান্তমণিকে পুঁছতই না, তারাও আজকাল 'মাসিমা মাসিমা' করে গায়ে পড়তে আসছে, নতুন নতুন রান্না শিখতে আসছে ক্ষ্যান্তমণির কাছে।

তার কারণ?

কারণ, ক্ষ্যান্তমণির কাছে স্থায়ী আসন গেড়েছেন, দু'জন মহা-মহা গুণী ভূত। লোমকণ্টক আর নিরলম্বচরণের তো নামডাক কম নয়। এরা তো এদের 'মহিলা সংঘের' বার্ষিক উৎসবে একবারও আনতে পারেনি ও'দের পৌরোহিত্য করতে। গিয়ে ধর্না দিলেই বয়েস দেখান, স্বাস্থ্য দেখান, সময়ের অভাব দেখান। গতবার অনেক বলে-কয়ে বাঁকুড়া-বীরভূমের দিক থেকে সভাপতি আর প্রধান অতিথি করতে নিয়ে এসেছিল প্রঃ দিগন্তবাস, আর ডঃ দুন্দুভিনিনাদকে। এ'রাও অবশ্য নামকরা, কিন্তু ওই ও'দের মতো প্রবীণ পণ্ডিত তো নয়? প্রায় তরুণ ভূত।

তাঁরাই তো যেই শুনেছেন লোমকণ্টক শৃঙ্গী আর নিরলম্বচরণ এখন এই অঞ্চলেই রয়েছেন, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছুটে গিয়েছেন দেখা করতে। শুধু তাই নয়, ওই ঘোরানন্দর বাসায় দুদিন আতিথ্যও নিয়ে গেছেন।

কারণ?

কারণ ক্ষ্যান্তমণির রান্না।

কাজে কাজেই মহিলা সঙ্ঘের মেয়েরা এখন ক্ষ্যান্তমণির কাছে ঘুর-ঘুর করছে রান্না শেখবার জন্যে।

ক্ষ্যান্তমণি বলেছে, "রাঁন্নাটি শিকতে' হ'বে বৌ'কি মেয়ে'-ছে'লেকে'। ভাঁল খাঁওয়া'টি পে'লে ভূ'ত ভগমান সব'াই তু'ষ্ট।"

তা শেখায় ক্ষ্যান্তমণি যত্ন করে।

কিন্তু ক্রমেই জায়গার বড় অকুলান হচ্ছে।

ঘুটঘুটের সাঙ্গোপাঙ্গরা অনবরতই কোথা থেকে না কোথা থেকে জিনিস উড়িয়ে নিয়ে আসছে, আর অদৃশ্য করে করে ক্ষ্যান্তমণির উঠোনে জমা করছে।

উঠোনের মাঝখানে সাত-সাতটা গোরু সমেত বৃহৎ একখানা গোয়াল বসানো রয়েছে। একেই পা মেলবার জায়গা নেই, তার ওপর এটা-সেটা আসছেই ঘটাঘট, ঠকাঠক।

গতকাল আবার ভয়ঙ্কর এক ঘটনা। সুন্দর একখানা মোটরগাড়ি উড়িয়ে এনেছে ঘুটঘুটের ক্লাবের সহ-সম্পাদক।

আর ঘুটঘুটে নিজে এনে হাজির করেছে মালভর্তি একটা ট্রাক। মালটা কি এখনো দেখার সময় হয়নি। ওদিকে খবরের কাগজে কাগজে খবর—

''একটি রহস্যজনক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গত শনিবার শহরের একটি বিখ্যাত রাস্তা হইতে সহসা একটি অ্যামবাসাডর গাড়ি ও একটি মালভর্তি ট্রাক অদৃশ্য। কে বা কাহারা কীভাবে এই রাহাজানিটি করিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই, তদন্ত চলিতেছে।''

শহরের ঘটনা, তাই কাগজে বেরিয়েছে।

গ্রামের খবরকে কোথায় ছাপতে যাচ্ছে।

সে যাক, ক্ষ্যান্তমণি এখন বিরক্ত।

এত ভূতের বাসা থাকতে, তার বাসাতেই বা সব 'ওড়াই মাল' এসে জমা করা কেন?

ভাইপোকে বলবে-বলবে করছিল, দুপুর থেকে তার পাত্তা নেই। ভরদুপুরটা অবিশ্যি 'চরা' করে বেড়াবার সময়, তবে বিকেল হয়ে গেলে তো ফিরবে? পাকুড়গাছে পা ঝুলিয়ে বসে এদিক-ওদিক দেখছে ক্ষ্যান্তমণি। ঘুটঘুটে ফিরল হাসতে হাসতে।

''পিসি! আজ জোর একখানা দেওয়া গেল।''

''কাকে?''

''কাকে আবার? ওই নবীননগরের ছেলেগুলোকে। যারা এততেও আমাদের স্বীকার করতে চায় না। ইনিস্‌পেকটার এসেছিল ইস্কুলে, লেখা লিখতে দিয়েছিল ছেলেদের একধার থেকে, সবকটার খাতায় মোক্ষম করে লিখে দিয়েছি। থাক এখোন ঠ্যাঙানি।''

ক্ষ্যান্তমণি অসন্তুষ্ট গলায় বলে ওঠে, "কে'ন? ছে'লে-পু'লে ঠ্যাঙাঁনি খাঁবে, এম'ন ক'াজে' দ'রক'ার কী?''

''বাঃ, শিখ্যে দিতে হবে না?''

"সে' অন্য র'কম ক'রে দি'স! এখোঁন শোঁন দি'ক, তোঁ এ'ই ওঁড়াঁই মাঁলের জ্বালায় অ'ামি তো' হ'াটতে' চ'লতে' পা'রচি'নে। এ'র এ'কটা বি'হিত ক'র।''

ঘুটঘুটে বলল, "বাঃ! ওসব তো অদিশ্য করা আছে।"

আঁদি'শ্য তোঁ ক'রেচিস ঠি'কই, মান'ুষ জ'ন দে'খতে পা'চ্চেনি। কিন্তু'ক হাঁতে পাঁয়ে তোঁ ঠে'কচে? মে'সোম'শাই ব'ুড়ো মাঁন'ুষ, ওনাঁর অসুবিদে হ'চ্চে।''

ঘুটঘুটে বলল, ''ঠিক আছে। কিছু কিছু মাল নয় ফেরত দেব। তা বলে গাড়িটা দিচ্ছি না। অনেক দিনের সাধ একটা অ্যামবাসাডর গাড়ির।"

''তোঁ ওঁটা থাঁক। অ'ার ও'ই বীর'ভদ্দ'র ল'রি' গ'াড়ি? ক'ী অ'াচে ও'তে?''

ঘুটঘুটে আস্তে বলে, ''বোলো না কাউকে। চাল আছে, ভাল চাল। টন-টন চাল।"

ক্ষ্যান্তমণি একটু ভেবে বলে, "তোঁ সে'গ'ুনাঁন অ'াদিশ্য ক'রে তু'লে রে'কে কী' হবে'? কাঁঙাল ভি'কি'রিদেরং বি'লিয়ে' দি'গে যা না। খে'য়ে বাঁচবে'। মি'থ্যে' প'চিয়ে নষ্ট করা কে'ন?"

ঘুটঘুটে বলে, ''আমিও ভাবছিলাম সেটা। কিন্তু দেব কেমন করে? আমাদের ছোঁওয়া জানতে পারলে খাবে না তো। কাঙালিও খাবে না।"

ক্ষ্যান্তমণি গুম হয়ে গিয়ে তারপর বলে, "সাঁবধানে ন'রদে'হ ধ'ারণ ক'রে য'াবি। তে'ার সাঁকরে'দদে'রও নে' যাঁ।''

''দেখি দাদুকে জিজ্ঞেস করে।''

''দাঁদু নাঁ ক'রবে'নি। র'াগে'র মাত'ায় এ'কদ'া পিতিজ্ঞে' ক'রেছেল ব'টে, আঁর কখ'নো মাঁনষে'র উবগাঁর ক'রবেনি। কি'ন্তু ম'নটা তোঁ উ'চু'। তোাঁরা ক'রলে ভ'ালই ব'লবে'।''

ঘুটঘুটে বলল, ''আচ্ছা পিসি, তবে ক'টা দিন যাক।''

''কে'ন? কী হ'ল?''

''সে শুনলে তুমি হাসবে। হয়েছে কি, এই করালীপুর আর ওই নবীননগরের ইস্কুলের ছেলেগুলো নাকি বল খেলবে। জোর খেলা। শুনে অবধি আমার ক্লাবের ছেলেগুলো লাফাচ্ছে দেখবে দেখবে করে। এই হুড়োটা মিটে যাক।''

''তোঁ গোঁয়াল'টা'ই স'রা। গো'রু ক'টা অ'বো'লা জ'ীব, ওঁদে'র কোঁন দুঃখু দে'ওয়া'! ক'তো দিন আঁর ঘাঁসপা'ত খে'য়ে থাঁকবে?"

নবীননগর স্টেশনে রাতের ট্রেনের আর সে জেল্লা নেই। ট্রেন আধমিনিট দাঁড়ায়, ভোঁ করে বেরিয়ে যায়। গার্ড সাহেব স্টেশনে নামা তো দূরের কথা, জানলার ধারেও আসেন না।

বিপিনের চায়ের স্টল উঠে গেছে।

বিপিন এখন ঝালমুড়ি, লজেন্স, হজমিদানার ব্যবসা করেছে। আগেভাগে রেলগাড়িতে চড়ে বসে, সারাদিন বিনা টিকিটে মাল ফেরি করতে করতে কত দূর-দূর চলে যায়। সন্ধেয় ফিরে আসে। ভালই আছে।

প্রথমটা অবশ্য মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল বিপিনের। বড়ো বিস্কুটের টিনটা নাচতে নাচতে আকাশে উঠে যাওয়ায়, বড় বিশ্বাস হয়েছিল বিপিনের পটলাটা নির্ঘাত এখনকার ওই ম্যাজিক-ফ্যাজিক শিখেছে কোথাও। যাকে নাকি জাদুবিদ্যে বলে। সেই বিদ্যের বলে কেটলি পাচার করেছে, বিস্কুটের টিন নাচিয়ে হাপিস করেছে। রাগ করে তাই পটলাকে ফেরত দিতে গিয়েছিল বিপিন তার মায়ের কাছে।

মা মানে বিপিনের বোন পুঁটি।

''চ তোকে নিজের ভূমিতে রেকে আসি।''

বলে পটলার জামা-প্যান্ট যা ছিল তার গামছায় পুঁটলি বেঁধে রেল লাইনের ওধারে বোনের বাড়ি গিয়ে বলল, ''নে, তোর ছেলে ফেরত নে।''

পুঁটু তো ভয়ে কাঠ।

''কেন দাদা?''

''কেন আবার কী? ছেলে মায়ের কাছে থাকবে এটাই তো ঠিক।''

পুঁটু বলল, ''মায়ের দাদা মামা, তার কাছে থাকাই বা বেঠিক কী?''

"না না। তোর এই ধনুর্ধর ছেলে আমি রাখতে পারব না। বাবু আবার ভোজবাজি শিখেছেন।''

"সেটা আবার কী? তুবড়ি? ফুলঝুরি ভুঁইপটকা? নাকি—।''

''না না, ওসব বাজি না, ভোজবাজি। মানে ম্যাজিক শিখছেন বাবু। চোখের সামনে থেকে জিনিস উড়িয়ে দিচ্ছেন। উড়ে গেল আমার চায়ের দোকানের ইয়া বড় কেটলি। উড়ে গেল বিস্কুটের টিন। না না, এ ছেলেকে রাখা মানে দোকানই উড়িয়ে ফেলা। থাক ও।''

বলে চলে এসেছিল গটগটিয়ে।

বোন একশোবার বলল, "দাদা, খাওয়া-দাওয়া করো, রাতটা থেকে যাও, ভোরে তখন যাত্রা কোরো। ঝড় আসছে।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

তা যেমন কর্ম তেমনি ফল।

বেরোতে যা দেরি।

এমন ঝড় উঠল যে, বিপিনকে নিয়ে যেন ডাংগুলি খেলে নিল। গায়ে মাথায় একমন ধুলোবালি, চোখ কাঁকরে ঢাকা। কোথায় বা গায়ের চাদর, কোথায় বা পায়ের চটি। জ্ঞানগম্যি লোপাট।

যখন জ্ঞান হল, দেখল ভরা সন্ধে, আর সে বেহাইডুবি খালের ধারে বসে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। দিচ্ছে তো দিচ্ছে, ভালই করছে। চোখের বালি-কাঁকরগুলো গেল। কিন্তু ওটা কী দেখতে পেল?

বিপিনের চোখের সামনে ও কী?

নাঃ, বিশেষ কিছু নয়, শুধু দেখতে পেল সামনের শ্মশানে একটা চিতা জ্বলছে। আর সেই আগুনের উপর চাপানো রয়েছে বিপিনের চায়ের দোকানের সেই বৃহৎ বিশাল কেটলিটি!

বিপিন কাঠ! বিপিন পাথর। বিপিন পোড়ামাটির পুতুল। নড়ার ক্ষমতা থাকলে বিপিন নির্ঘাত চোখ বুজে খালের জলে ঝাঁপ দিত। কিন্তু নড়ার ক্ষমতা তো ছিল না। চোখ বোজবারও না। তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, কিছুক্ষণ পরে একটা রোগা কালো বাহান্ন মিটার লম্বা হাত কোথা থেকে নেমে এসে কেটলিটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

আর একবার যখন জ্ঞান হল বিপিনের, দেখল সে পুঁটুর বাড়িতে চৌকিতে শুয়ে। পুঁটু দাদাকে বাতাস করছে। আর পটলা মামার পা টিপছে।

পুঁটু বলল, "দেখলে তো দাদা, বললাম ঝড় আসছে। ঝড়ে তোমায় এখানে নিয়ে এল। খালের জলেটলে ফেলে দিলে কী হত?''

বিপিন বলল, "কে বলল ঝড়ে ফেলে দিয়ে গেছে? নিজেই এসেছি। পটলাকে রেখে দিয়ে বেরিয়েই মনটা কেমন করে উঠল। ভাবলাম নিয়েই যাই। তাই চলে এলাম। চায়ের দোকান আর নয়, মামা-ভাগনে এবার অন্য ব্যবসা ফাঁদব।"

তা সেই ফেঁদেছে।

বিপিন ঝালমুড়ি নিয়ে ট্রেনে ওঠে, আর পটলা তার খিদমতগারি করে। তবে একটা দিন ছুটি চেয়েছে পটলা। করালীপুর ভবতারিণী বনাম নবীননগর। শীল্ড ফাইনালের চূড়ান্ত খেলার দিনটিতে সে খেলার মাঠে গিয়ে বসে থাকবে।

সেদিন বড় কেটলিতে চা চাপিয়েছিল ক্ষ্যান্তমণি, বাড়িতে অতিথি আসায়। ভূতসমাজে 'চা' দেখিয়ে ফেলে, বেশ কাজ বেড়ে গেছে ক্ষ্যান্তমণির। মুখে মুখে বার্তা পেয়ে অনেকেই একটা কোনো ছুতো করে এসে জুটছে, আর চা খেয়ে যাচ্ছে।

মস্ত ছুতো তো রয়েইছে।

লোমকণ্টকের সঙ্গে দেখা করতে আসা।

ওই প্রাচীন ব্যক্তিটি তো জনালয়ে বিশেষ থাকতেন না। সেই আদ্যিকাল থেকে কোথায় কোন বনে-জঙ্গলে বাসা বেঁধে জ্ঞান-চর্চা করতেন। কেউ সহজে দেখতেই পেত না। ডাকলেও আসতে চাইতেন না। এখন আবার এসে পড়ে, আর যত্ন খেয়ে মন বসে গেছে, তাই নড়তেই চাইছেন না।

উনি এখানে আছেন, এই খবরে বাসায় সর্বদা ভূত-সমাগম। ঘুটঘুটের বাসা সারাক্ষণই ভূতে ভূতারণ্য।

বিপিনের কেটলিটা খুব কাজে লেগেছে ক্ষ্যান্তমণির।

বিপিন যেদিন তার কেটলির পরিণাম দেখতে পেয়েছিল, সেদিন ক্ষ্যান্তমণিদের বাসায় এসেছিল 'ভূতদর্পণ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক 'করোটিকবন্ধ'।

একটা পত্রিকার সহ-সম্পাদক হলে কী হবে, লোকটা ভারী ছটফটে, তড়বড়ে।

এসে ওনাদের প্রণাম করেই বলে উঠল, "দেবলোকে দারুণ সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে, নাম রেজিস্ট্রি করতে হলে তিনদিনের মধ্যে করতে হবে। বলুন এখানে কে কে চান জমি?''

জমি! সস্তায়! কে না চাইবে? ভূতজাতির প্রধান সমস্যাই তো ছিল ওই। জায়গার অভাব। যেখানে যত জায়গাজমি ছিল তাদের, সবই তো যেতে বসেছে। অথচ ভূত - উৎপাটন - কাণ্ড চলছেই। কিন্তু দেবলোকে?

ঘুটঘুটে বলল, "সেখানে আমাদের ঢুকতে দেবে নাকি?''

"দেবে, দেবে!" করোটিকবন্ধ বলে ওঠে, "জায়গা নাকি পড়ে পড়ে খাঁ-খাঁ করছে, 'টু-লেট'-এ ভর্তি। না দিয়ে করবে কী? দেবে বলেই তো ফোর্সপ্রিন্টারে ভূতদর্পণে বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে।''

পিসি চা নিয়ে এসে ঢুকছিল, শুনতে পেয়ে বলে উঠল, "তা সংগে হঠাৎ এত জ্যায়গাঁ-জঁমির ছড়াছড়ি ক্যানো?"

করোটিকবন্ধের চটপট উত্তর, "কেন আর? মানুষ আর স্বর্গে-টর্গে যেতে চায় না।"

"সি' কী ক'তা? স'গগো বলে যে মরে যে'ত মা'ন্‌ষ?

"এখনো চায়। তবে সশরীরে। মরে গিয়ে শরীর হারিয়ে নয়। তাই বিজ্ঞানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রলোক তো হাতে এসেই গেছে, এখন শুক্রলোক, মঙ্গললোকও এসে গেল বলে। দেবলোকে পৌঁছতেই বা কতক্ষণ? অথচ সেখানের নিয়ম হচ্ছে, শরীর-টরির চলবে না। তাই এখন এই অশরীরীদের প্রতি নজর পড়েছে। এইবেলা চটপট যদি আমরা ফাঁকা জায়গাগুলো দখল করে বসি, তাহলে সেখানের হাহাকার করা শূন্যতাটা ঘোচে। বলুন বলুন, কে কে নাম রেজিস্ট্রি করতে চান। ফরম এনেছি।"

ঘুটঘুটে বলে ওঠে, "চাই তো আমরা সকলেই। সমগ্র ভূত-লোকে খবর পাঠাতে পারলে লাইন পড়ে যাবে, কিন্তু—"

"কিন্তু কিসের? অ্যাঁ, কিন্তু কিসের?" করোটিকবন্ধ কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে চায়ের খুলিটা তুলে নেয়। হ্যাঁ, এখন তো ওই মড়ার মাথার খুলিই সার। রোজ রোজ আর মাটির গেলাশ পাচ্ছে কোথায়?

ক্ষ্যান্তমণি কেটলিটা নিয়ে বসে আছে বারে বারে ঢেলে দেবে বলে। শুনে বলল, "কিন্তু আঁছে বৈ'-কী বাঁছা'। দে'বলোক হল দা'মি জাঁয়গা, আমরা সে দা'ম দে'ব কো'থা থেকে?"

করোটিকবন্ধ কেটলির সামনে খুলিটা আর একবার এগিয়ে দিয়ে বলল, "সে ভাবনা নেই! সে ভাবনা নেই। এখন শুধু নাম রেজিস্ট্রি করালেই চলবে। পরে ভবিষ্যতে দেখা যাবে। শিগগিরই ডাক পড়বে কিন্তু।"

লোমকণ্টক আহ্লাদে উথলে উঠে হঠাৎ নিজস্ব প্রাচীন ভাষায় কথা কয়ে উঠলেন, "দাঁম লাগবে' না? অ্যা। খু'ব ভা'ল। ক'বে দে'বে?"

সঙ্গে সঙ্গে পাকুড়বাগান - গোষ্ঠী হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "খু'ব ভাঁল, খু'ব ভা'ল। কঁবে দেবে?"

ক্ষ্যান্তমণি কেটলি, চা-খাওয়া পাত্তর সব গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলল, "ঘ'র গেঁরস্তি'র জি'নিসপ'ত্তর নে' যেঁতে দে'বে তো'?"

করোটিকবন্ধ হাঁ-হাঁ করে উঠল, "কী দরকার? কী দরকার? দেবলোকে তো ইচ্ছেমাত্রই সব হাতে এসে যায়।"

"তা' হো'ক। হা'তের জি'নিস হা'তছা'ড়া ক'রা ঠি'ক ন'য়। এ'রপ'র হ'য়তো' শুনব, ওঁ নে'য়ম শু'দ্দু দে'বতাঁদে'র জ'ন্যে'! ভূ'তেদে'র জ'ন্যে' ন'য়।"

ক্লাবের ছেলেরা বলল, "ঘুটঘুটেদা, আমাদের কথাটা বল না।"

করোটিকবন্ধ শুনতে পেয়ে বলল, "কী কথা?"

ঘুটঘুটে মাথা চুলকে বলল, "এরা বলছে ডাক পড়ার দিনটা কবে? সামনের শনিবারটা বাদ দিয়ে হলে ভাল হয়।"

"কেন বলুন তো?"

"কিছু না। গ্রামে একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে। এরা দেখতে চায়। দেখেই চলে যাবে।"

করোটিকবন্ধ লম্বা লম্বা দাঁতে হেসে বলে উঠল, "শুধু দেখতে তো? অংশগ্রহণ করতে নয় তো? সেবার কলকাতার এক মাঠে আমাদের 'দর্পণের' রিপোর্টাররা গিয়ে যা ধুন্ধুমার কাণ্ড করেছিল! উঃ! দেখতে দেখতে হঠাৎ উৎসাহ উত্তেজনায় নেমে পড়ল অংশগ্রহণ করতে! ব্যস, তারপর যা হবার হল। 'লণ্ডভণ্ড ভুতুড়ে কাণ্ড' নাম দিয়ে শহরের সব কাগজে বেরিয়েওছিল তার বিবরণ। কিন্তু কাদের ভূত তা তো কেউ জানল না? আমরাও চেপে গেলাম। যাক আপনার মেম্বারদের সাবধান করে দেবেন। ওই ম্যাচ খেলা বড় ভয়ংকর জিনিস।"

অতঃপর—

এসে গেল সেই ভয়ংকর।

ভজহরি শীল্ড ফাইনালের চূড়ান্ত খেলার তারিখ। সামনের শনিবার।

ভবতারিণী হাইস্কুল টীমের সঙ্গে নবীননগর উচ্চ বিদ্যা-লয়ের টীমের এসপার-ওসপার লড়াই।

হলেও স্কুলের টীম, এ অঞ্চলে এদের দারুণ নামডাক। তবে ভবতারিণীই জেতে বেশির ভাগ। লোকে বলে 'করালীপুরের ছেলেদের নিষ্ঠা আছে।'

আর নিষ্ঠাটাই তো প্রধান। যে-কোনো সাধনাতেই। খেলাও একটা সাধনা বৈকী। খেলা মানে তো খেলা করা নয়।

গত দু' দুটি বছর নবীননগরের হার হয়েছিল, তাই শোনা যাচ্ছে এবার নাকি তাদের মরণপণ প্রতিজ্ঞা, খেলার শেষে তারাই শীল্ড নিয়ে ঘরে ফিরবে ড্যাডাঙ ড্যাডাঙ বাদ্যি বাজিয়ে। তলে তলে নাকি কলকাতার কোন্ নামকরা খেলোয়াড় জোগাড় করেছে নবীননগর টীম।

এরকম 'অতিথি খেলোয়াড়' আনা রেওয়াজ আছে। করালীপুরও এনেছে এক- আধবার। কাজেই তাদের আপত্তি খাটবে না। তাহলে? যে ভবতারিণী স্কুল দু' দুটি বার বাঁশের আগায় শীল্ড ঝুলিয়ে বাজনা-বাদ্যি করে গ্রাম ঘুরেছে আর নবীননগরকে দুয়ো দিয়ে ছড়া বেঁধেছে, সেই ভবতারিণী টীম কি রুমালে মুখ ঢেকে ঘরে ফিরবে?

স্কুলের টীম, কিন্তু কিছু কিছু ওপরওলা তো থাকেনই যাঁরা উৎসাহ জোগান, বুদ্ধি জোগান দেন। স্পোর্ট মাস্টার ছাড়াও, অঙ্কের মাস্টার সুবল মিত্তিরের উৎসাহ দেখলে মনে হয়, অনুমতি পেলে মাঠে নেমে পড়তেও রাজি। ওদিকে নবীন-নগরেও তেমন পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই। এবারে তাই সাজ-সাজ রবটা যেন বেশি।

নবীননগর করালীপুর দুটো গ্রামই তো একদা একই জমি-দারের এলাকাভুক্ত ছিল। আর দু' গ্রামের দুটো হাই স্কুলই গড়ে উঠেছিল তাঁরই দানে আর চেষ্টায়। স্কুলের জমি-টমি তো সবই সেই জমিদার সত্যহরি রায়ের। এই খেলার টীম দুটো তাঁরই উৎ-সাহের অবদান। ভজহরি শীল্ড সত্যহরির বাবার নামে। আর ভবতারিণী হাই স্কুল মায়ের নামে।

দুটো স্কুল একই লোকের তৈরি, দুটো খেলার টীম সেই একই লোকের উৎসাহে গড়া, কিন্তু মজা এই, দুজনের সঙ্গে দুজনের সম্পর্ক যেন আদায় কাঁচকলায়। যেন সাপে নেউলে। চিরদিন দু'পক্ষে রাম রেষারেষি। কে কাকে ডাউন করতে পারবে এই চিন্তাতেই মাথা ঘামিয়ে অস্থির। ছাত্ররা থেকে মাস্টাররা পর্যন্ত।

খেলাতে তো লড়ালড়ি হারজিত আছেই স্কুল ফাইনালের রেজাল্টে পর্যন্ত এই রেষারেষির ঢেউ। নবীননগরের রেজাল্ট ভাল হলে করালীপুর কালো পতাকা টাঙায়, আর করালীপুরের রেজাল্ট ভাল হলে নবীননগর তিনদিন ধরে কাঁদুনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায়। এর গোড়া কিন্তু সত্যহরিই। নিজেরই জিনিস তবু একদা খেলোয়াড় সত্যহরি এতে বেশ মজা পেতেন। আর এই রেষারেষির জেতায় বাহবাও দিতেন। এখন অবশ্য সত্যহরি নেই, তবে ছিলেন তো অনেকদিন। স্কুল দুটোর রজত জয়ন্তী-টয়ন্তি দেখে তবে মারা গেছেন। তাই ওই দলাদলির খেলাটা আছে। যদিও স্কুলের ছেলেরা লটে লটে বদলে যায়, একদল যায় একদল আসে, কিন্তু মনের ভাবটি একই রয়ে যায়।

দু'পক্ষে যেন শত্রু-শিবির শত্রু-শিবির ভাব।

অবশ্য করালীপুর স্থিরনিশ্চিত, এবারেও শীল্ড করালী-পুরেই থেকে যাবে। কারণ নবীননগরের খেলায় নিষ্ঠা নেই।

স্কুলের শেষে মাঠে জটলা করে এই কথাই হচ্ছিল। এমন-কী পরাজিত নবীননগরের নামে এবারে নতুন কী শ্লোগান দেওয়া যায়, তারই জল্পনা-কল্পনা চলছিল।

সতুচরণ 'ভবতারিণীর' ফার্স্ট বয়, ফার্স্ট খেলোয়াড় সতুকে সবাই স্বেচ্ছায় নেতার আসনে বসিয়েছে। তাই এ ব্যাপারেও সতুর সার্টিফিকেটটাই আসল।

বটুক বলল, "আমি একটা ভেবেছি—"

সতু তাকাল।

তার মানেই কী ভেবেছিস?

বটুক বলল. "নবীননগরের মুখ চুন
শীল্ড হারিয়ে কেঁদে খুন।"

সতু মুখ বাঁকাল,"দূর, এসব এখন অচল।"

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বলল, "আমিও একটা ভাবছিলাম—"

"কী?"

"হায়! হায়! নবীননগর, ছি ছি ছি
বছর বছর তোর কপালে—
পান্তাভাতে ঘি!"

সতু বলল. "মন্দ নয়, তবে এও বড্ড যেন গাঁইয়া-গাঁইয়া। একটু আধুনিক স্টাইলে ভাব।"

সন্তোষের পিছনে দাঁড়িয়ে চাঁদু উসখুস করছিল। এখন ফস করে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে এগিয়ে এসে বলল, "আমি এইটা ভাবছিলাম।"

সতু বলল, "কই শুনি?"

চাঁদু বোধহয় নার্ভাস হয়েই গড়গড়িয়ে তড়বড়িয়ে পড়ে গেল,

"নবীননগর কেঁদে ঢোল,
খেয়ে গোল, বেদম গোল।
কটা গোল? অনেক গোল।
থাক হিসেবের গণ্ডগোল—
মুড়িয়ে মাথা ঢালগে ঘোল।
ঢালগে ঘোল, ঢালগে ঘোল।
ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং বোল!"

সতু এবং আরও সবাই বলে উঠল, "বাবাঃ! তুই যে একেবারে ঝড় বইয়ে দিলি। আস্তে আর একবার পড় তো শুনি। মনে হচ্ছে মন্দ হবে না।"

চাঁদু বিজয়গৌরবমাখা মুখে একটু কেসে শুরু করতে যাবে. এমন মহামুহূর্তে নেদো এসে ভগ্নদূতের মতো হাপসে পড়ল।

"কী তোরা এখানে বসে গুলতানি করছিস? ওদিকের দুঃসংবাদের খবর রাখিস?''

নেদো হাঁপাতে থাকে।

পর পর বারচারেক ক্লাসে উঠতে না পারায়, দাড়িগোঁফওলা নেদো এখন এদের সহপাঠী। কাজেই সমবয়সীও হয়ে গেছে। নচেৎ নেদোর এতদিন পার্ট টু দেবার কথা। সে যাক, সমবয়সীই যখন হয়ে গেছে, তখন সবাই সেই ভাবেই কথা বলে।

চাঁদু বলল, "কী দুঃসংবাদ? বুড়ি টেঁসেছে?''

নেদোর বাবার দিদিমার নাকি যায়-যায় অবস্থা চলছে, রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে নেদো, "একশো বছর ধরে বেঁচে আছে বুড়ি আর ঠিক এই সময়ই তার মরতে ইচ্ছে হল! ঠিক ফাইন্যাল খেলার দিনই না বুড়ি পটল তোলে। তার মানেই আমার খেলার দফা গয়া।''

নেদো ভাল খেলে।

তাই একমুখ গোঁফদাড়িওলা নেদোকেও এরা এত আগ্রহে দলে রেখেছে।

এরা বলে, "তোর বাবার দিদিমা তো তোর কী? অকাল-মৃত্যু তো নয় যে, শোকের সমুদ্রে ভাসবি?"

নেদো বলে, "উঁহু, জানিস না তো আমার বাবাকে? দিদিমা-অন্ত প্রাণ। তেমন দুর্ঘটনা ঘটলে, আমায় শ্মশানে নিয়ে না গিয়ে ছাড়বে ভেবেছিস?"

রোজই বলছে এসব।

এখন এরা আঙুল গুনে দেখল, এখনো মাঝে দুদিন। ভালই হল ঝঞ্ঝাট মিটে গেল। শ্মশান-ফশান যা ঘুরে আসবার তা ঘুরে আসা হয়ে যাবে নেদোর।

কিন্তু নেদো একেবারে ওদিক দিয়ে গেল না।

বলে উঠল, "আরে দূর তোর বুড়ি। টেঁশে যাবে এই ভব-তারিণী টীম, বুঝলি?''

"তার মানে?''

"তার মানে?''

"মানে খুব সোজা। নবীননগরটা কলকাতা থেকে কাকে আনছে জানিস?''

"কাকে?''

"প্রাণ শক্ত কর! বলছি—।''

নেদো কপালের ঘাম মুছে বলে, "আনছে ট্যাঁপা ব্যানার্জির ভাইপো টুনু ব্যানার্জিকে!''

"অ্যাঁ, ধেত। যাঃ।"

"যাঃ নয়, হ্যাঁ। ভেতরের খবর।''

সতু বলল, "কে তোকে এই গুলতাপ্পি দিয়েছে?''

"গুলতাপ্পি? হুঁ! 'বিশ্‌সস্তো সূত্রে' জেনে এসেছি, বুজলি।''

"টুনু ব্যানার্জি? মানে সত্যিকার টুনু ব্যানার্জি?"

"সত্যিকার নয় তো মিথ্যেকার? ট্যাঁপার ভাইপো টুনু আবার কটা আছে?''

জোরালো-বুক সতুও এখন দমে গিয়ে বলে, "জোগাড় করল কী করে?''

"লাক্! লাকের জোর। ওদের ওই ফটা? মানে ফটকেটা? তার কোন্ একটা মাসতুতো দিদির নতুন বিয়ে হয়েছে, আর সেই জামাইবাবুটা হচ্ছে ট্যাঁপা ব্যানার্জির প্রাণের বন্ধু। ফটকে নাকি কলকাতায় মাসির বাড়ি গিয়ে, সেই জামাইবাবুকে ধরে ধরে—''

"টুনু ব্যানার্জি তো শুনি কাকার থেকে ভাল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে।''

"লোকে তো তাই বলে।''

চাঁদু বলে ওঠে, "ওঃ, আমরা এমনি অভাগা, আমাদের কারুর একটা ফেমাস্ বন্ধুওলা জামাইবাবু নেই রে?"

"কোথা থেকে থাকবে? নিজেই তো বললি অভাগা। ঠাকুমা বলে, অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই।

সতু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে ইস্কুল-মাঠের চাঁপা গাছটার গোড়ায় ঠেশ দিয়ে। ক্লাস এইট-নাইন পর্যন্তও গরমকালে মর্নিং স্কুলের সময় অতি মর্নিংয়ে এসে এসে কত চাঁপা ফুল পেড়েছে তার ঠিক নেই। কী কাজে লাগবে ফুলগুলো তা জানে না। ইস্কুলের জামা পরে পাড়া, আর চার-পাঁচ ঘণ্টা প্যান্টের পকেটে থাকা ফুল দিয়ে তো আর ঠাকুমার, ঠাকুরের পুজো হবে না। প্যান্টের পকেটটা তো ওনাদের মতে 'জগতের নোংরা।'

ভগবান জানেন কেন!

যদিই বা পকেটে খাবার জিনিস-টিনিস থাকে, তাতে নোংরা হতে যাবে কেন? ডালমুট, ঝালমুড়ি, আলুকাবলি, পকৌড়ি, ছোলাসেদ্ধ, বাদামচাক্তি--এই সব স্বর্গীয় জিনিসগুলোকে যদি নোংরা বলা হয়, তাহলে 'ভাল' জিনিস বলতে কী আছে পৃথিবীতে? ওইগুলোকে তো স্বর্গীয় বলেই মনে হত সতুর। আর ওই ফেরিওয়ালাটাকে দেবদূত। দূর থেকে আসছে, দেখলেই আহ্লাদ হত। এখন বড় হয়ে গিয়ে লজ্জা করে। তবে এখন তো মনের মধ্যে আহ্লাদের লেশ নেই।

নবীননগরটা তলে তলে এত শয়তানি করল?

ভাবতে ভাবতে সতুর যখন মাথা ঝিমঝিম করে এসেছে, তখন হঠাৎ বটুক বলে উঠল, "হয়ে গেছে!''

"কী হয়ে গেছে?"

"জামাইবাবু আর তার ভাইপো। হয়ে গেছে জোগাড়!"

সতু প্রায় খিঁচিয়েই বলল, "এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর জামাইবাবু আর তার ভাইপো জোগাড় হয়ে গেল?"

বটুক বলল, "আরে বাবা, হাতে কি আর এসে পড়ল? মনে পড়ে গেল তাই বলছি। এখন হচ্ছে হাতে এনে ফেলা।"

সন্তোষ বটুকদের একেবারে পাশের বাড়ির ছেলে, সে ওদের সব খবর রাখে। তাই বলে উঠল, "আজেবাজে বকছিস কেন? তিনকুলে একটা দিদি নেই তোর, জামাইবাবু জোগান দিবি কোথা থেকে?"

বটুক জোর গলায় বলল, "আমি জোগান না দিতে পারি, আমার বাবা দেবে।"

শুনে এরা রেগে উঠল, "অসভ্যতা করবি না বটা, বাবা-টাবা বলবি না।"

বটুক কিন্তু দমল না। বলল, "অসভ্যতার কী আছে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার দর্জিপাড়ার পিসেমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা কী? বাবার জামাইবাবু হল না পিসেমশাই? এ কথায় দোষ আছে?"

"তা নেই বটে—"

সতু ক্ষমার সুরে বলে, "কিন্তু ওই জামাইবাবু বা পিসেমশাইকে নিয়ে আমাদের কী স্বর্গলাভ হবে? আমাদের টীমে খেলবার মতন ফুটবল খেলোয়াড় ভাইপো আছে তাঁর?"

বটুক জোর গলায় বলল, "ভাইপো না থাক, ভাইপোর মতন আছে। আর খেলোয়াড় না হোক—"

সন্তোষ বলল, "ভাইপোর মতনটা আবার কোন্ জন্তু রে বটা?"

বটুক কিছুতেই দমে না। অবলীলায় বলে ওঠে, "প্রাণের বন্ধুর ছেলে! প্রাণের বন্ধুকে লোকে ভাইয়ের মতো বলে কি না? তার ছেলে ভাইপোর মতন হবে না কেন?"

"তা বটে।"

সতু একটু নরম সুরে বলে, "তা সে ভাইপোর মতনটি ফুটবল খেলোয়াড়?"

"ওই তো বলছিলাম, খেলোয়াড় নয়, খেলোয়াড়ের মতন।"

"যা ব্বাবা! কী সব ভাষা আওড়াচ্ছিস? ভাইপো নয়, ভাইপোর মতন, খেলোয়াড় নয় খেলোয়াড়ের মতন! ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার কিছুই নয়।"

বটুক আত্মস্থ গলায় বলে, "গোলকীপার! নাম শুনবি? ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের মোনা ঘোষাল।"

"মোনা ঘোষাল! ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের।"

হোহো করে হেসে ওঠে সবাই।

"ওয়েস্ট বেঙ্গলের মোনা ঘোষাল! সে আসবে এই করালীপুর ভবতারিণী স্কুল টীমের খেলায় গোলকীপার হতে? জানিস না, শুধু মোনা ঘোষালের বাহাদুরিতেই ওয়েস্ট বেঙ্গল পরপর তিনবার নেবুবাগানকে কব্জা করে ফেলেছে, একটা গোল দিতে দেয়নি! গতবার অবশ্য ড্র গেছে, কিন্তু ওবারে? মনে কর রেজাল্ট! শুধুমাত্র ওই মোনা ঘোষালের জন্যেই। নইলে 'নেবুবাগানে' তো যত বাঘা-বাঘা খেলোয়াড়। মোনা ঘোষাল আসবে আমাদের এখানে! তাও তোর দর্জিপাড়ার পিসের 'ভাইপোর মতন' বলে! ধুস।"

বটুক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলে, "বিশ্বাসে কী না হয়, কী না হয় চেষ্টায়! চল না কালই ভোরের ট্রেনে কলকাতা চলে যাই সতুতে আমাতে। পিসেকে তোয়াজ দেব, আর তার সঙ্গে গিয়ে সেই ভাইপোর মতনের কাছে আছড়ে পড়ব। দরকার হলে হাতে-পায়েও পড়ব।"

চাঁদু বলে ওঠে, "হাতে-পায়ে পড়া তো কিছুই না, দরকারে পড়ে সে আর কাকে না করতে হয়? তেমন দেখলে, জুতোর সুকতলা চিবোতেও রাজি আছি। বলিস তো আমিও যাই। গ্রাম্য প্রকৃতির শোভা-টোভার লোভ দেখিয়ে যদি—"

"তুই?"

"আমার ভাড়া আমি দেব বাবা।"

পরদিন ভোরেই যাওয়া ঠিক হল।

"তিনজনে? তেরোস্পর্শ হচ্ছে না?"

বলে বটুক একটু খুঁত-খুঁত করেছিল, কিন্তু চাঁদু সেকথা উড়িয়ে দিল। বলল, "তিন সংখ্যাটা খারাপ হল? ওর মতন মঙ্গল-সংখ্যা আর আছে? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, আদি মধ্য অন্ত, ইয়ে—উত্তম মধ্যম অধম—"

"থাক থাক, আর বলতে হবে না। বুঝেছি। ওই ঠিক রইল।"

নেদো একবার করুণ মুখে বলল, "আমায় একটু নিয়ে যাবি না? অনেক দিন কলকাতা দেখা হয়নি।"

বটুক তাড়াতাড়ি সামলাল, "না না, পিসে আবার একটু ইয়ে আছে। গোঁফদাড়ি গজানো স্কুলবয় দেখলে তেমন—মানে আর কি বুঝতেই পারছিস।"

বাড়িতে অবশ্য কেউই যাওয়ার প্রকৃত কারণ বলল না।

'ফুটবল কিনতে যাচ্ছি' বলে, কলকাতায় যাওয়ার পারমিশান আদায় করে নিল। সেটাও অবশ্য আছে একটা কারণ। নতুন একটা বল কেনার কথা চলছিলই। কাজেই সত্যগোপালের পাপটাও হল না।

প্রাণপণ চেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব করা যায় বৈকী!

অসাধ্যসাধনও করা যায়।

নইলে মোনা ঘোষাল সত্যিই করালীপুরের মাটিতে পা দেয় একটা স্কুলটীমের গোলকীপার হতে? অবশ্য বয়েসে মোনা ঘোষাল খুব একটা বিজ্ঞ নয়, আর ইস্কুলের গণ্ডিও জীবনে কোনোদিন পার হয়নি। 'খেলা খেলা' করে লেখাপড়াটা ছেড়ে দিয়েছিল। 'মরা মরা' করতে করতে যেমন রাম।

এই অসাধ্যসাধনটি করিয়েছে বটুক।

পিসের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে জেনে ফেলেছিল, খেলা ছাড়াও আরও একটা 'হবি' আছে মোনার। সেটি হচ্ছে মাছ ধরা। পুকুরধারে ছিপ নিয়ে বসে থাকবার সুযোগ পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারে সে।

বটুক তাই সকলের আড়ালে চুপি-চুপি জানিয়ে দিয়েছিল মোনাকে, করালীপুরে তেরোটা পুকুর আছে, আর সব পুকুর-গুলোই মাছ ভর্তি। যার যার পুকুর সবাই মাছ ছাড়ে, পুকুরের তদ্বির করে। আর এও জানিয়ে রেখেছিল, করালীপুরের লোকের কাছে 'অতিথি' হচ্ছে নারায়ণ। যে পুকুরে ইচ্ছে ছিপ হুইল নিয়ে বসে পড়তে পারেন মোনাবাবু, পুকুরের মালিকরা ধন্য হয়ে যাবে। উপরিপাওনা 'চার'-এর জোগান দিয়ে দেবে তারা। পান্তাভাত, কেঁচোর ডিম, মসনে তিসি ভাজা আর গুগলির শাঁস। গ্রামে এসবের কিছুরই অভাব নেই।

খেলার আগের দিন বিকেলে এসে পৌঁছল ওরা নবীননগর স্টেশনে। খানিকটা গিয়ে ডানদিকে করালীপুর আর বাঁদিকে বিজনপুর। আহা রে, কেউ একবার দেখতে পেল না!

পেলে গৌরবে বুক দশহাত হয়ে যেত সতুদের। একটু গিয়েই ঘোষণা করল মোনা ঘোষাল, "তোমাদের এখানে আমি দু' পাঁচদিন থেকে যাব হে। ভারী চমৎকার জায়গা।"

বটুক মনে মনে হাসল।

কেন যে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে তা' সে ভালই বুঝেছে। তেরোটা পুকুরেই ট্রাই করার বাসনা আর-কি।

তা সে তো মহা আনন্দের বিষয়।

দেখবে নবীনগর ড্যাবডেবে চোখ করে।

তাদের টুনু ব্যানার্জিকে রাখতে পারবে বাড়তি এক বেলা?

দল বেঁধে এখানের অনেকজন স্টেশনে এসেছে। মোনা ঘোষাল এখানের সৌন্দর্যে দিশেহারা হয়ে দু' পাঁচ দিন থেকে যেতে চাইছেন এ শুনে সবাই কৃতজ্ঞতায় দিশেহারা।

তায় আবার লোকটা দারুণ ভদ্র।

বলে কিনা, "শুধু আমার জন্যে গাড়ি এনেছ আর তোমরা সবাই হেঁটে হেঁটে যাবে? না না, চলো সবাই মিলে হাঁটা যাক!"

এরা হাঁ-হাঁ করে উঠল।

করবেই তো। বলল, "সে অনেকখানি রাস্তা।"

মোনা ঘোষাল বলল, "আরে দূর। খেলোয়াড়দের পা এত বাবু করলে চলে না। চলো চলো, এই বিকেলের চমৎকার হাওয়ায়, সুন্দর আলোয় গ্রামের পথে হাঁটা। আহা!"

বাধ্য হয়েই অনেক চেষ্টায় চেয়েচিন্তে আনা গ্রামের একমাত্র ডাক্তারবাবুর একমাত্র (ভাঙা ঝড়ঝড়ে) মোটর গাড়িখানি ফেরত দিয়ে সবাই হাঁটতে শুরু করল।

কিন্তু শুরু করলে কী হবে? একটানা শর্টকাটটি তো হবার উপায় থাকল না। বেলাটি তো পড়ে এল।

যতই দল বেঁধে আসা হোক, সন্ধে-সন্ধে মুখে তো আর চণ্ডীতলার মাঠের ধার দিয়ে পাস করা যায় না? হত। তাড়াতাড়ি চলে এলে হয়তো—চোখকান বুজে পার হওয়া যেত। কিন্তু মোনা ঘোষাল যে গ্রামের আকাশের গোধূলিবেলার আলোর তারিফ করতে করতে, আর রাস্তার দুপাশের যত গাছ আছে, তাদের নাম জানতে জানতে আসতে গিয়েই বেলাটি শেষ করে ফেলল।

খানিকটা এসেই তাই সতুকে বলতেই হল, "এবার একটু ঘুরে যেতে হবে। এই ডানদিকে বেঁকে, একটু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পার করে—।"

মোনা ঘোষাল হৈ-চৈ করে বলল, "কেন? কেন? এই তো

বেশ সোজা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি অনেক দূর পর্যন্ত। এ রাস্তাটা তোমাদের গ্রামের নয়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের তো নিশ্চয়।"

সতুই দলনেতা, তাই অগ্রণী হতে হয় তাকে।

চোখকান বুজে বলে ফেলে, "তবে ওই মাঠের ধারটা বিশেষ সুবিধের নয়।"

"কেন? অসুবিধের কী? এই তো চমৎকার রাস্তা চলে গিয়েছে। মাঠের ওখানটায় কেমন ফাইন ঝোপ-জঙ্গল মতো! ওগুলো আমবাগান নাকি?"

সতু ভয় চেপে আস্তে বলে, "না পাকুড় গাছের জঙ্গল।"

"পাকুড় গাছ? সেটা আবার কী গাছ? দেখি দেখি—"

মোনা ঘোষাল গটগট করে এগোতে থাকে, "ফল হয়? মানে খাদ্যযোগ্য ফল?"

এদিকে পাকুড়ের ছায়ায় অন্ধকার নেমে এসেছে।

সতু, চাঁদু, বরেন, নেদো এরা আর স্থির থাকতে পারে না। একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, "যাবেন না! যাবেন না, ও মোনাবাবু! জায়গাটা ভাল নয়!"

মোনা ঘোষাল দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "ব্যাপারটা কী হে? ঠগী-দস্যুদের আড্ডাটাড্ডা নাকি?"

নেদো তড়বড়িয়ে বলে উঠল, "আজ্ঞে সে হলে তো ভালই ছিল। আমরা এতজন আছি। আড্ডা অন্যরকম।"

আর সবাই মুখ-চাওয়াচায়ি করছে।

"কী মুশকিল! হলটা কি তোমাদের? সবাই যেন গুম্ খেয়ে যাচ্ছ! কিসের আড্ডা? জুয়ার? নাকি গাঁজার?"

নেদো একটু সামনে এগিয়ে আসতে চায়, তাই কথার ভার নিজের হাতে নিয়ে বলে, "সেটা আর ভয়ের কী?—ভয় হচ্ছে আড্ডাটা, ইয়ে—যাঁদের নাম করতে নেই তাঁদের। এ মাঠের ধার-কাছ দিয়ে সন্ধের দিকে কেউ হাঁটে না। চলুন চলুন। ওদিক দিয়ে এগোই। একেবারে ভরসন্ধে হয়ে গেল।"

কিন্তু বাহাদুর মোনা ঘোষাল ওদের এই কথায় ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, অট্টহাস্য করে উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল, "নাম করতে নেই? হা-হা-হা! তোমরা সব ইয়াং ছেলে, খেলাধুলো করো। তোমরা ভূত মান? ভূত বলে সত্যি কিছু আছে একথা বিশ্বাস কর? নাঃ, তোমরা হাসালে। চলো চলো, এগিয়ে গিয়ে দেখি কেমন দেখতে তাঁরা। দেখিনি তো কখনো, তোমাদের দেশে এসে একটা নতুন জিনিস দেখা হবে। হাঃ! হাঃ। হাঃ!"

"মোনাবাবু, দোহাই আপনার, যাবেন না। আপনার পায়ে পড়ছি।"

মোনা কিন্তু শোনে না। তার এখন বাহাদুরি দেখাবার শখ। তাই আরও এগোয় আর হাততালি দিয়ে দিয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে ডাক দেয়, "কই হে শ্রীযুক্ত ভূতবাবুরা—ও না, আপনারা তো আর এখন 'শ্রী' যুক্ত নেই, চন্দ্রবিন্দুযুক্ত যে। যাই হোক—আছেন কোথায়? একটু বেরিয়ে আসুন! দেখে চক্ষু সার্থক করে যাই।"

বেশি বাহাদুরি দেখাতে বেশি বেশি কথার কায়দা করে। আর অট্টহাসি হাসে।

কিন্তু এ কী! ছেলেগুলোও এমন জোর গলায় হাসছে কেন? সামনে-পিছনে, এপাশে-ওপাশে, হাঃ! হাঃ! হাঃ! হোঃ হোঃ হোঃ! হিঃ হিঃ হিঃ! ...খিক খিক খুক খুক খুক!...যেন মোনা ঘোষালকে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে।

এ আবার কী অসভ্যতা!

করালীপুরের ছেলেগুলো এত অসভ্য? কই এতক্ষণ তো বোঝা যায়নি। ওদের বারণ না মানায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে? তাই কি সম্ভব? মুখ ফিরিয়ে তেড়ে বকতে গিয়ে হতভম্ব বনে যায় মোনা ঘোষাল!

কে কোথায়!

একটা ছেলেরও তো টিকি দেখা যাচ্ছে না।

মাঠের ধারে একা দাঁড়িয়ে আছে মোনা ঘোষাল আর অদৃশ্য জায়গা থেকে বেয়াড়া হাসির আওয়াজ আসছে অনেক রকম গলার।

তার মানে মোনা ওদের ভূতের ভয় দেখে হেসেছে বলে, ওরা ষড়যন্ত্র করে মোনাকে ভয় দেখাচ্ছে—সরে পড়ে, গাছের আড়াল-টাড়াল থেকে এই রকম বিতিকিচ্ছিরি হাসি হেসে হেসে।

আচ্ছা! আমিও জব্দ করছি তোদের, অ্যাবাউট্ টার্ন দিয়ে এক্ষুনি ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়!

মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে স্টেশনমুখো রাস্তায়, কিন্তু কে যেন পিছন থেকে টানছে! ওঃ! ছেলেগুলো কি তাহলে মোনার সঙ্গে পূর্বজন্মের শত্রুতা সাধতে এত তুতিয়ে-পাতিয়ে নিয়ে এল! কিন্তু কই? কেষ্ট তো নেই। টানতে হলে তো আর গাছের আড়াল থেকে হবে না। নাঃ, বাতাসের টানই বোধহয় বাধা ঘটাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে মনে হল, চলেই বা যাব কী? ব্যাগট্যাগ সবই তো ওদের কাছে। সৌজন্য করে মোনার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা বইতে লেগেছিল!

এখন কী করা!

রাগে অপমানে মাথা জ্বালা করতে থাকে মোনা ঘোষালের। উঃ, কী করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কলকাতায় ফিরে পুলিসে খবর দেবে? কিন্তু ফিরবে কী করে? কাল সকালের আগে তো আর ফেরার গাড়ি নেই। রাত্তির সাড়ে-এগারোটায় না কি এই নবীননগরে একটা ট্রেন থামে, তা সেটা তো কলকাতা-গামী নয়, সেখান থেকে আসা।

দাঁতে দাঁত চেপে মোনা ঘোষাল প্রতিজ্ঞা করল, রোসো, ওই নবীননগর টীমে গিয়েই যোগ দিচ্ছি। করালীপুরের অসভ্যতার শাস্তি হোক। কিন্তু মোনাকে যে কে কোথা থেকে এক পা হাঁটতে দিচ্ছে না। যেন টেনে ধরে আছে। ওদিকে হাসির পাট চলছেই।

এ আবার অন্য এক ধরনের হাসি।

খলখল খ্যাঁস খ্যাঁস, হিক হিক।

খ্যানখ্যানে বাঁশ-চেরা শব্দ।

এ হাসি পিসির।

পাকুড়বাগান কোম্পানি হেসে হেসে কাহিল হয়ে দম নেবার ফাঁকে পিসি হাল ধরেছে। মোনা আপ্রাণ চেঁচিয়ে ভাঙা গলায় বলে ওঠে, "খবরদার বলছি হাসবেন না কেউ। পুলিস এনে ধরিয়ে দেব।"

হঠাৎ মোনার সর্বশরীর হিম করে দিয়ে শূন্য থেকে বৃহৎ একপাটি মাড়িহীন দাঁত নেমে এসে তার সামনে ঝুলতে থাকে। সেই দাঁতের ওপিঠ থেকে কথা, "পুঁলিস? পুঁলিস ডেঁকে ধঁরিয়ে দিঁবি আঁমাদেঁর? এঁই আঁমাদেঁর? হিঁ! হিঁ!"

ঘাড়ের কাছে কটা বরফ বরফ-আঙুলের স্পর্শ পায় মোনা ঘোষাল। তারপর আর কিছু টের পায় না। বুঝতে পারে না যে ওই আঙুলের সাঁড়াশি আক্রমণে সে শূন্যে উঠছে তরতর করে।

মোনা ঘোষালকে ভাগ্যের হাতে ফেলে রেখে সতু কোম্পানি পাঁই-পাঁই করে ছুটে একেবারে তাদের লাইব্রেরি-ঘরের সামনের দাওয়ায় এসে বসে পড়ে বলে, "কী হবে রে—"

সকলের মুখে এক কথা, "কী হবে রে—"

মোনা ঘোষালকে আনতে যাচ্ছে, এই কথাটাই তো বড়দের কাউকে বলেনি, (বলেনি, যদি ফেলিওর হয় তো কী লজ্জায় পড়বে এই ভেবে) না বাড়িতে, না মাস্টারমশাইদের কাছে। এখন

হঠাৎ কী করে বলবে, তাকে এনেছিলাম, কিন্তু চণ্ডীতলার মাঠে ছেড়ে এসেছি।

কিন্তু এ ছাড়া আর কী করার ছিল বেচারাদের? অদৃশ্য-লোকের সেই হাসি কি তাদের কানে এসে পৌঁছে মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েনি? মাথায় ড্রাম পেটায়নি?—এখনো তো পিটোচ্ছে, হাহা-হিহির হাতুড়ি দিয়ে।

"গাড়িটা কেন চাইছিস জিজ্ঞেস করেছিলি তোর জেঠুকে?"

সন্তোষকে জিজ্ঞেস করল সতু।

ডাক্তারবাবু সন্তোষের জ্যাঠামশাই।

সন্তোষ মাথা নাড়ল। "কারণ বলিনি, শুধু এমনি চেয়েছিলাম।"

"তবু ভাল। পুরো ঘটনাটাই তাহলে চেপে যাওয়া যাক।"

বলল, কিন্তু মনে কি স্বস্তি থাকে?

মোনা ঘোষালের কী গতি হল?

কলকাতা থেকে ডেকেডুকে এনে লোকটাকে ভুতের হাতে সঁপে দিয়ে এসে, নিজেরা নিশ্চিন্ত হয়ে খাবে, ঘুমোবে?

নাঃ।

ভুতের ভয়ের কামড়ের থেকেও জোরালো কামড় বিবেকের। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হয়।

আস্তে আস্তে উঠে আবার দল বেঁধে ডাক্তারবাবুর গ্যারেজের কাছে যায়।

ড্রাইভার বনমালী গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বশে আনছিল। মাঝে মাঝেই সবকিছু আটকে যায় গাড়িটার। মেরে-ধরে ঠিক করতে হয়।

গাড়ি সন্তোষের জ্যাঠামশাইয়ের, তাই সন্তোষই এগিয়ে গিয়ে বলে, "গাড়িটাকে আর একবার বার করতে হবে বনমালীদা।"

"কেন? এই তো তখন ফেরত দিলে?"

"কেন ফেরত দিলাম, তোমায় পরে বলব বনমালীদা। সে অনেক কথা। এখন চলো।"

"ক্বী? আবার ইস্টিশানে? কিন্তু এখন ট্রেন আসছে কোথা?"

"না না, ইস্টিশানে নয়—"

"তবে?"

সতু মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, "চণ্ডীতলার মাঠে।"

"উপায় নেই বনমালীদা। না গেলে একটা মানুষ মারা যেতে পারে।"

"বেশ চলো। মরতে হয় বনমালীই মরবে।"

"মরলে সবাই একসঙ্গেই মরব বনমালীদা। আমরাও তো যাচ্ছি।"

কিন্তু নাঃ। মরেনি কেউ। শুধু চেঁচিয়ে মরা ছাড়া। আকাশ

বাতাস কাঁপিয়ে সবাই সমবেত চিৎকার করেছে, "মোনাবাবু, আপনি কোথায়। মোনাবাবু, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।"

উত্তর আসেনি কোনোখান থেকে।

নিঝুম চণ্ডীতলার মাঠে শুধু পাকুড়-পাতায় বাতাস লাগার শনশন শব্দ।

যে শব্দে গা ছমছম করে ওঠে, বুক শিরশির করে। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

রাগ করে চলে গেছেন।

স্টেশনে গিয়ে বসে আছেন।

"আমাদের ওঁকে ফেলে চলে যাওয়াটা উচিত হয়নি।"

"উনিও কিছু উচিত কাজ করেননি। এত বারণ করা হল, তবু—"

"কলকাতার দর্জিপাড়ার ছেলে তো! তেজী!"

"চল্, একবার দেখেই আসা যাক স্টেশনে।"

গাড়িটা রয়েছে এই ভরসা। নইলে পায়ে হেঁটে আর এই রাত্তিরে ওই মাঠ পার হয়ে স্টেশনে যেতে হত না।

কিন্তু কেনই যে গেল। শুধু দুঃখ বাড়াতে। ঠিক সেই সময়ই কি ট্যাঁপা ব্যানার্জির ভাইপো টুনু ব্যানার্জির আসতে হয়? সমারোহ সহকারে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে। বোঝা যাচ্ছে কলকাতা থেকে টানা মোটরে এসেছে।

সেই দৃশ্য দেখতে হল করালীপুরকে।

সতু আর্তনাদ করে উঠল, "ভবতারিণী টীম এবার শীল্ড হারাল রে বটুক।"

"চোখের সামনে দেখছি। গোহারান হারব।"

"ভূত ভগবান সবাই আমাদের বিরুদ্ধে। মাঠে নামতে হয় নামব এই পর্যন্ত। ভবিষ্যৎ স্ট্যাম্প কাগজে লিখে রাখছি।"

"ওরা আমাদের নামে স্লোগান দেবে।"

"ওরা ড্যাডাং ড্যাডাং বাজনা বাজিয়ে শীল্ডটাকে সারা করালীপুর ঘুরিয়ে তবে নিয়ে যাবে।"

"অঙ্কের মাস্টারমশাইকে বললে গোলকীপার হতে রাজি হবেন?" বলল চাঁদু।

সতু নিশ্বাস ফেলল, "আর কিছুতেই কিছু হবে না রে। মনোবল ভেঙে গেছে।...কিন্তু মোনা ঘোষালের কী হল?"

ঘুটঘুটেরও সেই প্রশ্ন, "লোকটার কী হল পিসি? কোথায় রাখলে?"

"রাঁকব' আঁবাঁর কোঁতায়? বঁড় জাঁয়গা আঁমাঁর। টুঁটিটি ধঁরে ওঁর কঁলকেতাঁর বাঁড়িঁর ছাঁতে বঁসিয়ে রেঁকে এঁইচি।"

"ঠিক করেছ। যেমন কর্ম তেমনি ফল।"

"তাঁ তোঁ বটে। তঁবে রিঁদয়ে' সুঁক নাঁই। আঁমাদেঁর ভক্ত পাঁর্টি কঁরালীপুঁর, ওঁই নঁবনেঁ-নঁগরের কাঁচে হেঁরে যাঁবে?"

"অ্যাঁ! তাই তো! এটা তো খেয়ালে আসেনি।"

ঘোরানন্দ একটু গুম হয়ে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, "ঠিক আছে। আমিই মোনা ঘোষাল হচ্ছি। গেছো, তুই নবীননগরের গোলকীপার হগে যা। করালীপুরের বল টেনে নিয়ে নিয়ে গোল দেওয়াবি। নচেৎ চুপচাপ থাকবি। যা করবার আমি করব। আর মেছো, তুই ওদের আসল গোলকীপারটাকে বাঁশবাদাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ভুলভুলাইয়া ফেলে ঘোরা গিয়া। আর জঙ্গলে, তুই ওদের সেই মালাগলায় খ্যালোয়াড়টাকে ঘণ্টা কতক অদিশ্য করে জঙ্গলে বসিয়ে রেখে দিগে যা।—"

কাজের নির্দেশ শুনে সাকরেদ-মহলে মহাফুর্তি।

"ওঃ! হি হি! তার মানে আমরাও অংশগ্রহণ করছি? কী মজা! কী মজা! কী মজা!"

আহ্লাদে ডিগবাজি খায়, গেছো মেছো জঙ্গলে।

মলিন বিষণ্ণ ভবতারিণী টীম ঘরের মধ্যে খেলার পোশাক

স্বাছিল, হঠাৎ চাঁদুর নজরে পড়ল। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রেলিঙে মুখ রেখে।

চেঁচিয়ে উঠল চাঁদু, "বটুক! সতে! সন্তোষ! দেখ!"

"কী? কী?"

"এসে গেছেন! এসে গেছেন!"

"কে এসে গেছেন?"

বলতে বলতেই সকলের নজর জানালায়।

"মোনা ঘোষাল!"

"ওরে আমরা কি নাচব?"

"আমরা কি গান গাইব?"

"আমরা কি লাফালাফি করব?"

"আরে বাবা, আগে দরজাটা খুলে দে।"

এলেন মোনা ঘোষাল! তবে গম্ভীর চুপচাপ, মুখে কথা নেই। তার কারও হৈ-চৈ করবার সাহস হল না। রাগের মাথায় চলে গিয়েছিলেন, দয়ার বশে ফিরে এসেছেন।

চুপচাপ থাকা যাক বাবা!

শুরু হয় খেলা।

কিন্তু নবীননগরের মাথায় যে আকাশ নেমে এসেছে।

মোক্ষম সময় টুনু ব্যানার্জি নোপাত্তা।

কোন্ দিক দিয়ে যে বেরিয়ে গেল কে জানে।

তারপর?

তারপর মাঠে যেন একখানা প্রলয় ঝড় উঠল। উঠল, বইতে লাগল। দাপাদাপি, চেঁচামেচি, হৈচৈ, সে এক তুলকালাম কাণ্ড! কে বল নিচ্ছে, কে শুট করছে, কে কোন্ দলের হয়ে খেলছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছে, বলটা কে নিল। বল কোথায় গেল...তার পরই উল্লাসধ্বনি 'গোল্ গোল্।'

নবীননগরকে ধপাধপ গোল দিচ্ছে ভবতারিণী টীম। দুর্নীতি।

আজ নবীননগরের গোলকীপার যেন মাটির পুতুল!

এদিকে মোনা ঘোষাল?

দৈত্যের মতো এলাকা আগলাচ্ছে। ওকে ছাপিয়ে নবীননগর একদিকিন একটা গোল।

খেলার মাঠ তো নয়, যেন রণক্ষেত্র। রাম-রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে যেন। কে কীরকম স্টাইলে খেলছে তাও কিছু বোঝা যাচ্ছে না, শুধু ধুলো উড়ছে দশদিক জুড়ে।

তবু তার মধ্যে করালীপুরের উল্লাসধ্বনি, 'গোল। গোল।'

"মোনাদা আপনাকে যে কী বলব!"

"হা হা হা! নবীননগর! খুব খেলোয়াড় আনিয়েছিল।"

যুদ্ধজয়ের পর বাঁশের আগায় শীল্ড ঝুলিয়ে ড্যাং ড্যাং বাদ্যি বাজিয়ে সারা করালীপুর ঘুরে বেড়াচ্ছে ভবতারিণী টীম। তার সঙ্গে সারা করালীপুরবাসী।

চাঁদুর ছড়াটাই কাজে লাগল।

সবাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—

> ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাডাং বোল!
> নবীননগর কেঁদে ঢোল।
> কটা গোল? অনেক গোল!

চেঁচাচ্ছে, তবু যেন মনের মধ্যে কী যেন নেই, কী যেন নেই ভাব।

জিতল বটে ভবতারিণী, কিন্তু খেলল কে?

কেউই বুঝতে পারছে না কে খেলেছে।

কার পায়ে বলের স্পর্শ? কই? কারুরই তো মনে পড়ছে না। আর এত সব কারা আসছে সঙ্গে সঙ্গে?

দলে দলে, পালে পালে। কালো-কালো ছায়া-ছায়া।

ছায়া-ছায়া কিন্তু ওদের ছায়া পড়ছে কই? সূর্য তো পশ্চিমে ঢলেছে, ইস্কুলবাড়ির পুবের দেয়ালে ছায়া পড়বে তো? সতুদের তো পড়ছে। কিন্তু মোনা ঘোষালের? প্রসেশনের সামনে রাখা হয়েছে যাকে! কোথায় তার ছায়া?

থেমে যাচ্ছে স্লোগান। কেউ আর সামনে তাকাচ্ছে না। পিছনেও না।...দাঁড়িয়ে পড়ছে।

কাজেই পিছনের সেই ছায়াদল এগিয়ে আসছে। দলে দলে আসছে...তারাই স্লোগানের ধারা চালিয়ে যাচ্ছে—

> ক'টা গোল? অনে'ক গো'ল।
> ড্যাডাং ডা'ডাং ড্যা'ডাং বো'ল।
> মু'ড়িয়ে মাঁতাঁ ঢালগে' ঘো'ল।

নাচছে...আর নাচছে! নাচ থামছে না।

শত শত হাত আকাশে এগিয়ে যাচ্ছে।...এদিক ওদিক থেকে আরো এসে জুটেছে...হাতের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে...মাপেও বেড়ে যাচ্ছে।

নাচতে নাচতে কীর্তনীয়াদের মতো শূন্যে উঠে পড়ছে। কিন্তু কীর্তনীয়ারা আর কতটুকু ওঠে? এই ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে নাচুনে পঙ্গপালের মতো আকাশ অন্ধকার করে, উঠে যাচ্ছে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে, ইস্কুলবাড়ির দোতলার ছাদ ছাড়িয়ে।

আহ্লাদে ভাসা সেই ড্যাডাং ড্যাডাং বাদ্যিও ক্রমশ মিলিয়ে আসছে।

করালীপুর, বিজনপুর, নবীননগর, যে যেখানে ছিল সেই-খানেই উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে রইল স্ট্যাচুর মতো।...ওরা আরও উঠতে লাগল।

সাহিত্যিক জীবন বাজপেয়ী কলমটা থামালেন। টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। যাক, 'ভয়ংকরের বিভীষিকার' পুজো সংখ্যার লেখাটা শেষ করা গেল। যা তাগাদা আসছিল।

কাল সকালবেলাই নিতে আসবে।

সই-টই করে একেবারে রেডি রাখাই ভাল।

ফের কলমটা তুলে নিলেন, আর আশ্চর্য, ঠিক এই মহা-মুহূর্তে ফস্ করে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। অবশ্য আশ্চর্যই বা কী! এই রকম ফস করেই তো লোডশেডিং হয়। ...চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়েছে, জলের গ্লাসটা মুখে তুলতে যাচ্ছে, পৃথিবী অন্ধকার।

তা অন্ধকার তো অন্ধকার! হয়ই তো এমন। কিন্তু ঠিক এমন মোক্ষম সময়, এমন ভাঙা খোনা বাঁশচেরা আওয়াজ ওঠে কি? কই? কোনোদিন না। আজ উঠল, আওয়াজ নয়, আর্তনাদ—

"এ'ই ঘ'ুটঘ'ুটে, স'বাই নাঁচতে নাঁচতে উ'ঠে যাঁচ্চিস যে'? আ'মি এ'ত স'ব মাল নিয়ে না'চুনে ছু'ট দি'তে পাঁরি? ব'ললি' তোঁ—হো'তা'য় অ্যা'লোটমে'ন্টো' পে'য়ে গি'চিস। ত'বে'-আঁবাঁর অ্যা'তো ছু'ট কো'ন?"

আচমকা কোথা থেকে এই আর্তনাদ এল?

জীবন বাজপেয়ী কি ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছেন? না, এই তো বসে আছেন চেয়ারে।...চেয়ার ঠেলে জানলার ধারে গেলেন। আর? আর জীবন বাজপেয়ীর আতঙ্কিত চোখের সামনে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি! তিনতলার ছাদে ভারা বাঁধার বাঁশের মতো লম্বা লম্বা দুটো ঠ্যাং চালিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। ছায়ামূর্তির মাথায় একটা বোঝা, কাঁধে একটা পুঁটুলি, আর হাতে ঝোলানো বৃহৎ বিশাল একটা কেটলি!

পাঁচমিশেলি ধাঁধা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম ধাঁধা॥ একটা বাড়িতে জানালা ভেঙে চুরি হয়ে গিয়েছে। সেই চুরির তদন্ত করতে ডাকা হয়েছে চারজন বাঘা গোয়েন্দাকে। গোয়েন্দা চারজনের নাম—ব্যোমকেশ, জয়ন্ত, কিরীটী এবং প্রদোষ। সারা বাড়িটায় তন্নতন্ন অনুসন্ধান চালিয়ে চারটে সূত্র পাওয়া গেল—ভাঙা জানালা, পায়ের ছাপ, একটা চাবি আর এক টুকরো কাপড়।

নীচে কয়েকটি সূত্র দেওয়া হল। সেই সূত্র থেকে বার করতে হবে কোন্ গোয়েন্দা কোন্ সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

(ক) ভাঙা জানালার ব্যাপারটা যখন চোখে পড়ে এক

গোয়েন্দার, জয়ন্ত তখন পাশের ঘরের একটা চোরাসিন্দুক দেখতে ব্যস্ত।

(খ) চাবিটি যে-গোয়েন্দার প্রথম চোখে পড়েছে, সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে চাবিটি কিরীটীকে দেখায়।

(গ) ব্যোমকেশ বা জয়ন্ত কেউই চাবি খুঁজে পায়নি। কাপড়ের টুকরোটাও তারা কেউ আবিষ্কার করেনি।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ একটা অ্যালার্ম-ঘড়ি ঘণ্টায় চার মিনিট করে স্লো হয়ে যায়। সাড়ে-তিন ঘণ্টা আগে ঘড়িটাকে মিলিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আরেকটা বড় ঘড়িতে—যেটা নির্ভুল সময় দেয়—বারোটার ঘণ্টা বাজল এখন।

কত মিনিট বাদে অ্যালার্ম-ঘড়িটায় বারোটা বাজবে? খুব সূক্ষ্ম হিসেব করার দরকার নেই, মোটামুটিভাবে কত মিনিট বললেই চলবে।

তৃতীয় ধাঁধা॥
বয়স্ক, তবু তিনি হৃদয়ে নবীন
বয়সের শেষ অঙ্কটি তাঁর "তিন",
বয়সটি পুরো যদি ওলটানো চাও—
প্রথম অঙ্কটির বর্গ বানাও।
সহজ সূত্র অতি, কাজ যা বাকি—
চটপট বলে ফেলো—বয়সটা কী?

চতুর্থ ধাঁধা॥ চারজন উঠতি ক্রিকেট-খেলোয়াড়। জয়দীপ, চন্দন, বরুণ ও স্বপন। চারজন চার দলের খেলোয়াড়। ক্লাব চারটির নাম, মিলনী, লহরী, হীরামন ও দক্ষিণায়ন। পরপর বলা হয়নি কিন্তু। এদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন অধ্যাপক, একজন ব্যবসায়ী, একজন ব্যাংক-অফিসার।

জয়দীপ এবং যে-খেলোয়াড়টি ইঞ্জিনীয়ার, দুজনেই স্পিন বোলার। বরুণ মিলনীর উইকেট-কীপার। অধ্যাপক যে, সেও উইকেট-কীপার।

স্বপন লহরীর বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিল। চন্দনের রেকর্ড আরও ভাল। হীরামনের বিরুদ্ধে ডবল সেঞ্চুরি করেছে সে, লহরীর বিরুদ্ধে একটি খেলায় চারজনকে স্টাম্প আউট করেছিল সে গত সীজনে।

মিলনীর কোনো খেলোয়াড় ব্যবসায়ী নয়।

এবার বলো, ইঞ্জিনীয়ার কে? কোন্ দলেই বা সে খেলে?

পঞ্চম ধাঁধা॥ পাঁচটা ৩ দিয়ে ৩৭ লিখতে পারো?

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ—যে-কোনো চিহ্ন দিতে পারো, তবে কমপক্ষে দু-রকম উত্তর চাই।

উত্তর॥ (১) ব্যোমকেশ বা জয়ন্ত কেউই চাবি খুঁজে পায়নি (সূত্র গ), যে-গোয়েন্দা চাবি পেয়েছে, সে গিয়ে তক্ষুনি চাবিটা কিরীটীকে দেখিয়েছে (সূত্র খ), সুতরাং চাবি কিরীটীরও আবিষ্কার নয়। চাবিটি, সুতরাং, খুঁজে পেয়েছে প্রদোষ।

কাপড়ের টুকরো ব্যোমকেশ বা জয়ন্ত খুঁজে পায়নি (সূত্র গ), প্রদোষও নয় জানা গেল। সুতরাং কাপড়ের টুকরো খুঁজে পেয়েছে কিরীটী।

ভাঙা জানালা জয়ন্তর আবিষ্কার নয় (সূত্র ক), সুতরাং জয়ন্তর আবিষ্কার পায়ের ছাপ। ব্যোমকেশ আবিষ্কার করেছে ভাঙা জানালা।

(২) সাড়ে-তিন ঘণ্টায় অ্যালার্ম-ঘড়িটা ১৪ মিনিট স্লো হয়ে গেছে। আগামী ১৪ মিনিটে আরও প্রায় ১ মিনিট স্লো হয়ে যাবে।

সুতরাং প্রায় ১৫ মিনিট বাদে অ্যালার্ম-ঘড়িটায় বারোটা বাজবে।

(৩) ৬৩ বছর।

(৪) দেওয়া সূত্রগুলো ধরে একটু একটু করে এগিয়ে যাও। দরকার হলে একটা ছক কেটে নিতে পারো।

দেখবে ছক থেকে প্রত্যেকের দল ও পেশা বেরিয়ে আসবে।

জয়দীপ লহরীতে খেলে। তার পেশা ব্যবসা।

চন্দন খেলে দক্ষিণায়নে। সে অধ্যাপক।

বরুণ খেলে মিলনীতে। সে ব্যাংক-অফিসার।

স্বপন খেলে হীরামনে। সে ইঞ্জিনীয়ার।

জয়দীপ ও স্বপন স্পিন বোলার। উইকেট-রক্ষক হল চন্দন ও বরুণ।

(৫) দুটো উত্তর দেওয়া হল— $৩৩ + ৩ + \frac{৩}{৩} = ৩৭$

$$\frac{৩৩৩}{৩ \times ৩} = ৩৭$$

ওঠানামার গল্প

সন্তোষকুমার ঘোষ

বিল্টু প্রথমে হাত তুলে টিকিট দুটো দেখায়। অন্তু দেখতে পায়নি। এই বছর সবে একটা শিউলি ফুটেছে, তার চোখ ছিল সেই গাছটার ছড়ানো ডালাপালার দিকে।

"সারকাস এসেছে, দারুণ সারকাস।"

প্রথমবার বিল্টু যখন বলল, অন্তুর কানে গেল না। বিল্টু যখন আবার বলল, সারকাস এসেছে, তাঁবু পড়েছে টাউন ক্লাবের মাঠে; তখনও অন্যমন, অন্তু শুনতে পায়নি। তখন বিল্টু বলল জোরে জোরে, ওর কানের কাছে মুখ এনে প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, "এই কোথায় আছিস?"

"উঁ," অন্তু বলল, "কেন এখানেই তো!"

খুব নিচু গলা, অন্তুর কথা যেন ভেসে এল অনেক দূরের কোনও গুমটি-ঘরের ভিতর থেকে।

বিল্টু তখন লোকে যেভাবে কুলগাছের ডাল নেড়ে নেড়ে কুল পাড়ে, সেইভাবে অন্তুর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকল।

"তোর হয়েছে কী বল তো!"

"কিছু না তো।"

অন্তু এবারও জবাব দিল আস্তে আস্তে।

"এতবার করে বলছি সারকাস এসেছে, শুনছি বাঘ-সিংহ ছাড়াও ওদের অনেক জানোয়ার আছে, দুটো টিকিট কেটে এনেছি, যাবি? শুধু তুই আর আমি।"

"তা যাওয়া যায়।"

এবারও অন্তুর গলা আগের বারের মতোই দূর-দূর, চোখ দুটো নিরালা আকাশের একটা চিলের একটুও ডানা না কাঁপিয়ে সাঁতার দেওয়ার কায়দাটা পরখ করছে।

ওর পিঠ চাপড়ে দিল বিল্টু। সাইকেলের হ্যানডেল সিধে করে ক্লিং-ক্লিং বাজাল একবার, তারপর সীটে গ্যাঁট হয়ে বসে প্যাডল চেপে বলল, "তাহলে ওই কথাই রইল! ঠিক পৌনে ছটায় আমার বাড়ি। মনে থাকবে তো?"

অন্তু এ-কথার কোনও উত্তর দিল না।

ওর চোখের পাতা কাঁপছিল। এই একটা অসুখ কয়েক দিন হল ধরেছে তাকে, বিল্টুর কাছাকাছি এলেই কেমন যেন শামুকের মতো গুটিয়ে যায়।

পিঠে যখন চাপড় মেরেছিল বিল্টু, অন্তুর সারা শরীর তখন কাঠ। আজকাল প্রায় কারোরই চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না সে, বিল্টুর সঙ্গে তো নয়ই। অথচ ক'দিন আগেও দুজন দুজনের ছিল প্রাণের বন্ধু। বিল্টুর কাছে অন্তু হয়তো তা-ই আছে, কিন্তু অন্তুর চাওয়ায়, কথা বলায় কেমন একটা জড়জড় ভাব—এটা নতুন। এ যেন বেলা পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কেউ বারান্দার মাদুরটাকে গুটিয়ে নিল, সেইরকম।

তাই তো বিল্টু যখন মুখের সামনে টিকিট নাড়ে, অন্তু দেখতে পায় না, খুব চেঁচিয়ে না বললে কোনও কথা তার কানে ঢোকে না। নিজে যা বলে, তাও হয় মাথা নুইয়ে, নয় তো ঘাড় একেবারে আকাশের দিকে চিতপাত করে, যেন উত্তরের কথা কয়টি মাটিতে কিংবা আকাশের নীলে লেখা আছে, অন্তু দেখে দেখে. বানান করে করে পড়বে।

সোজাসুজি ভাষাই কি মুখে আসতে চায় ? বিল্টু বলেছিল, "দুটো টিকিট কেটে এনেছি, যাবি ?" অন্তু জবাব দিল, "তা যাওয়া যায়।" ভাববাচ্যে। ওর ইচ্ছে আছে কি নেই. কোনোটাই উচ্চারণের ভাবে-ভঙ্গিতে ফুটে উঠল না।

এইটেকেই অন্তু এক দিন টের পেয়েছিল অসুখ বলে। চোখে চোখে না চাইতে পারা, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্তে, যেন পিঁপড়ের গলা নকল করে কথা বলা। সেই অসুখটা একদিন আবার সেরেও গেল। যেদিন দুপুরে দেখা হল ইতিহাসের স্যারের সঙ্গে. উনি—আকাশে মেঘ জমজমাট—তবু তারই মধ্যে, সে-সব আমলে না এনে নদীর ধারের রেনট্রী গাছগুলোর ছায়ায় ছায়ায় পায়চারি করছিলেন।

আর কয়েক দিন পর অসুখটা একেবারে মিলিয়ে গেল, মেঘ কেটে হঠাৎ চারদিক হলদে আলোয় গেল ভরে, পিকনিকে গিয়ে পাহাড়টাকে দেখে।

চারদিকে ছোট-বড়-মাঝারি ছড়ানো টিলা, মাঝখানে মাথায় তাজ-পরা পাহাড়টা ঠিক যেন মহারাজ। চুড়োয় সাদা মন্দির কিংবা গুম্ফা, থেকে থেকে ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ, ওই মন্দিরটা পাহাড়টার মুকুট বা তাজই তো ! সারা গায়ে সবুজ গাছপালার সাজ, মাঝখান দিয়ে থাক-থাক-কাটা আঁকাবাঁকা সিঁড়ি। ধাপগুলো শেষ হয়েছে মন্দিরটার যেখানে শুরু, তার ধার ঘেঁষে।

ওই সিঁড়িটা অনেক দিন অন্তুর মনে ছিল; এখনও আছে। ওই সিঁড়িটাই তার অসুখটা সারিয়ে দিয়েছে।

সারানোর কথা পরে, আগে অসুখটার কথা বলা যাক।

অসুখটার কথা মনে পড়লে অন্তু এখনও ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে চমকে-চমকে ওঠে। আবার, যেসব রাত্রে ঘুম আসে না, সেসব রাতেও। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা দুদ্দাড় ঝড় এল, আকাশে একটু আগেও এক চিলতে মেঘ ছিল না তো, কিন্তু কখন সব দিক ঘন হয়ে থেকে থেকে বিদ্যুৎ হাসতে থাকল, কড়াত কড়াত শব্দ, সেই সঙ্গে ঘরের বিদ্যুৎ গেল নিভে, ঠিক তখনই মনের কোন্ গর্ত থেকে কে জানে, ওই অসুখটার স্মৃতি তাকে অস্থির করে তোলে। এই অস্থিরতার জন্যে কোনও ভোমরা বা বোলতার হুল ফোটানোর দরকার হয় না। অন্তু এমনিতেই জ্বলতে থাকে।

সেবারের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পরেই বোধহয় অসুখটার শুরু। অন্তুর ভাগে পড়েছিল সোজা একটা কবিতা— 'আমাদের ছোট নদী'। কতবার যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে মহড়া দিয়েছে! বাংলার মাস্টারমশাই বলে দিয়েছিলেন, "তুমি বড্ড হাত ছোঁড়, বলবার সময় কিন্তু সাবধান ; সামলে শান্ত হয়ে বলে যাবে ; কেমন? ভাল করে মুখস্থ করা চাই।"

দুজনের পরেই ওর ডাক পড়ল। চোখে পড়ছিল বেগনি রঙের ঝোলানো স্কাই, ঝালরের মতো দুলছে, প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি ; এক কোণে মা মাসিমা আর মাসিমার মেয়ে শান্তাকেও দেখা যায়। চমৎকার একটা ফ্রক পরে এসেছে আর গোলাপি রিবনে বাঁধা বিনুনি, এই ছাঁদটাকে কী বলে, হর্সটেল না পিগ-টেল ? শান্তা চুইংগাম চুষছে বোঝাই যায়, কারণ ওর গাল এখন গোলগাল, কোনও টোল নেই, আর সীটে বসে মজাসে পা দোলাচ্ছে। ঝোলানো বাতিতে ঘরটা জ্যোৎস্না, তবু অন্তুর হাঁটুটার কী বিচ্ছিরি অভ্যেস, খালি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল। দুটো স্তবক এক রকম ভালই উতরে দিল সে, তারপরই কালো মোটাসোটা এক ভদ্রলোককে কারা যেন খুব খাতির দেখিয়ে সামনের সীটে বসিয়ে দিয়ে গেল, আর তখনই কী সর্বনাশ, সেই পুরনো তোতলামিটা ওকে পেয়ে বসল। যে-সব শব্দের আগে 'ক', সেগুলো উচ্চারণ করতে বরাবরই অন্তুর একটু অসুবিধে হয়, কিন্তু আজ যেন সে বোবা বনে যাচ্ছে।

যত ভয় বুকের মধ্যে কইমাছের মতো খাবি খাচ্ছে, ততই জানা লাইনগুলো বেমালুম যাচ্ছে গুলিয়ে। শান্তা তো শান্তা, মাসিমার মুখেও চাপা হাসি না ? মার মুখ নোয়ানো, গম্ভীর।

গরমকাল, তবু শীত করছিল অন্তুর, নাকি আরও বেশি গরম লাগছে বলেই তার সারা গায়ে গলগল করে ঘাম বেরুচ্ছে ? মাস্টারমশাই মুখস্থ করতে বলেছিলেন, মুখ থেকে লাইনগুলো কি সেঁধিয়ে গেছে পেটে, আর উঠতে চাইছে না? মাস্টারমশাই বলেছিলেন, হাত-টাত বেশি না নাড়তে, এখন হাত তো হাত; অন্তুর মনে হল, জিভটাকে নাড়ানোর সাধ্যও তার নেই।

অনেক চাপা হাসি আর হাততালির মধ্যে সে যখন থামল, তখন চোখমুখ লাল, আড়চোখে চেয়ে দেখল, প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন যিনি, সেই বিশিষ্ট লেখিকা অনীতা দেবীর ঠোঁটেও কেমন যেন বাঁকা হাসি। ওই হাসি কি সান্ত্বনার? সান্ত্বনারই যদি হবে, তবে হাসিটা এত বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন ?

অথচ এই স্টেজেই আগের দিন বিল্টু, শান্তারা মারচেণ্ট অব ভেনিস-এর একটা দৃশ্য অভিনয় করে গেছে, বিল্টু ছিল শাইলক, আর শান্তা পোরশিয়া, সমস্ত ঘরটা যেন গমগম করছিল। অভিনয় শেষ হতে, সে কী তুমুল হাততালি !
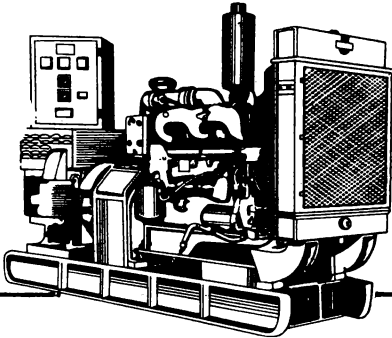
তার পরদিন ফুটবল খেলা। হেডমাস্টার বনাম স্পোর্টস টীচারস ইলেভ্‌ন-এর ম্যাচে অন্তুরা জিতল ঠিক, কিন্তু জয়ের একটি মাত্র গোল বিল্টু ছাড়া আর কেউ কি দিতে পারত না? আর নেটের সামনে জড়াজড়িতে অন্তু পা পিছলেই বা পড়ল কেন? রেফারী বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামালেন। লাইন থেকে চার-পাঁচ জন ছুটে এল। ওরা যখন ওকে ধরাধরি করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আকাশের দিকে চেয়ে অন্তুর চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। কষ্ট যতটা না হাঁটুর যন্ত্রণায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মনের ভিতরে থমথমে মেঘের মতো জমে ওঠা লজ্জায়।

তাঁবু থেকে যখন জয়ধ্বনি শোনা গেল, কে না কে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ওকে বিল্টু গোল দিয়েছে বলেই ছুট দিল, তারপর আর কিছু মনে পড়ে না, মনে পড়ে না। অন্তু বুঝি অনেকক্ষণ বেহুঁশ, অন্তত বেহুঁশ হবার ভান করে পড়ে ছিল। উপরের পাটির দাঁতে তার নীচের ঠোঁটটা নিজের অজান্তেই সে কামড়ে ধরেছে। অন্তু অনেক দিন অবধি বুঝে উঠতে পারেনি, সেদিন হার হলেই সে বেশি খুশি হত কি না।

সব পর-পর মনে পড়ে যায়, কালীপুজোতে যেন একটার পর একটা চীনে পটকা ফাটছে।

শান্তাকে বিল্টু ঝাঁপ দিয়ে নদীর জল থেকে টেনে তোলে, সে এর কত দিন পরে? দশ-বারো দিনও হবে না বোধহয়। তখনও অন্তুর পায়ের গিঁটে গিঁটে খুব ব্যথা, সেটা আবার একাদশী অমাবস্যায় আরও বাড়ে। চুন-হলুদে কাজ হল না, কোবরেজমশাই একটা মালিশ পাঠিয়ে দিলেন, তাতেও না।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নদীর ধার পর্যন্ত চলে এসেছিল অন্তু। শান্তা ওর শুকনো জামা-টামা অন্তুর কাছেই জমা দিয়ে জলে নামল।

ভেসে যাচ্ছে শান্তা, ভেসে যাচ্ছে। একবার বুঝি দাঁতে আঙুল কামড়ে লাফিয়ে উঠেছিল অন্তু। কিন্তু তার আগেই—

বিল্টুর যখন হাত চেপে ধরেছে অন্তু, ছলছল চোখে বলছে, তোর জন্যেই ভাই আজ শান্তাটা জোর বেঁচে গেল, আচ্ছা, তখনও কী সর্বনেশে কথা; অন্তু মনে মনে বিল্টুকে বলেনি তো যে, হতভাগা, এত তাড়াতাড়ি হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলে মূর্তিমান তুমি? একটু কি তর সইছিল না? আরে, অন্তু ঝাঁপ দিতই তো, তার মাসতুতো বোন, সবচেয়ে আগে তারই তো লাফিয়ে পড়া উচিত। নেহাত পায়ে ব্যথা, তাই উঠতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল, নেহাত শান্তারই জামাকাপড়ে হাত আটকা. আরে, নামিয়ে রাখতেও তো সময় লাগে!

অন্তু এসব কথা নিশ্চয় মনে মনেও বলেনি, কিন্তু কী করে আজ যে বাড়িতে মাসিমার কাছে মুখ দেখাবে, কী করে? মাথা যেন কাটা গেছে। মাথা ধড়ে থাকলে, তবে তো মুখ?

এই বিল্টুই যেদিন অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পেল, সেদিনই অন্তু ঠিক করে ফেলে, দূর ছাই, এ ইসকুলে আর না।

বিকেলের দিকে সে ফিরে যায় নদীর ধারে। এই জলের অনবরত চলে যাওয়ার মধ্যে কী যে আছে, অন্তু জানে না, তবু যখনই পারে, তখনই নদীর কাছে আসে। জলকে তার সব কথা বলে। আঃ, চোখে আর বুকে জমা সব জল যদি স্রোতের জলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যেত।

খানিক আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্তু দেখেছে তার চোখের তারাও যেন অনেক গভীরে ডুবে যাওয়া। কারও কারও চোখের মণি যেন ভাসতে থাকে, তারটা তেমন নয়।

ছলাত ছলাত করে ঢেউ আছড়ে পড়ছিল ওর পায়ে, মাঝে মাঝে ধপাস করে পাড় ভাঙছিল। দিনের আলো একটু একটু করে মরে এল। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল অন্তু, তাকে ঘিরে যেন বন্দী করে চার ধারে একটা চিড় ধরেছে। এক্ষুনি হয়তো সবটাই ধস করে নামবে, ওকে সুদ্ধু সঙ্গে টেনে নিয়ে।

ইচ্ছে করলেই সরে বসতে পারে, অন্তু, চাই কি পালাতেও পারে; কিন্তু সে সরবে না তো, নড়বে না। কিছুতেই না। এখানে ঠায় বসে থাকবে। সন্ধ্যা আরও অন্ধকার হয়ে নামুক ডালে প্যাঁচা ডাকুক, পাড় ভেঙে সে তলিয়ে যাক, তবু না।

দাঁতে দাঁত চেপে অন্তু যখন এই সংকল্পে স্থির হয়ে বসে আছে, তখনই সে টের পেল, তার পিঠে কার যেন হাত। চমকে ফিরে তাকিয়ে ছায়া-ছায়া আভাসে-আন্দাজে মনে হল, সেই ইতিহাসের স্যার। রোজ যেমন নদীর ধারে বেড়াতে বেরোন, আজও বুঝি তেমনই বেরিয়ে থাকবেন।

কী বলছিলেন মাস্টার-মশাই? 'অন্তু, শিগগির উঠে পড়ে চলে এসো, ধস নামল বলে'?

কই কিছু তো শুনতে পাচ্ছে না সে, স্যারের চেহারাটাও চোখে স্পষ্ট হচ্ছে না। শুধু বোঝা যায়, ধুতি পরার ধরনে. হাতের লাঠিতে আর গলার চাদরে।

অন্তু চিৎকার করে বলে উঠল, "স্যার, আপনাকে আমি তবু একটু দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কী বলছেন, শুনতে পাচ্ছি না কেন? আপনার গলা দেখতে পাই, কিন্তু গলার স্বরটাকে দেখা যায় না যে!"

ততক্ষণে মাস্টারমশাই ওকে টেনে নিয়ে এসেছেন একটু দূরে, একটা গাছের তলায়। ওর মাথায়, গালে হাত বুলিয়ে বলছেন, "পাগলা ছেলে, কারও গলার স্বর বুঝি কখনও দেখা যায়?"

ওঁর কোলে মাথা গুঁজে কাঁদতে শুরু করেছিল অন্তু। দেখা যায় না, শোনা যায় না অনেক কথা, আশ্চর্য, বলাও যে যায় না! গেলে অন্তু কী বলত? বিল্টু কেন একটুও না ভুলে নাটকের একটা চরিত্রের পাঠ চমৎকার বলে যায়, অথচ অন্তু ছোট্ট একটা কবিতাও রাখতে পারে না মনে, কেন সে অঙ্কে পায় পুরো নম্বর, আর? অন্তু যখন তৈরি হচ্ছে, তখন কেন সে আগে লাফিয়ে পড়ে শান্তাকে বাঁচায়? দূর, এসব কথা বলা যায় না, এমন- কী টীমের হয়ে একমাত্র গোল স্কোর করার কথাও না।

অস্পষ্টভাবে অন্তু শুনতে পাচ্ছে, মাস্টারমশাই তাকে বলছেন, "বাড়ি চলো। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। ইশ, তুমি যে বেজায় কাঁপছ, কী হচ্ছে বলো তো অন্তু?" মাথা নিচু করে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্তু, প্রথমে তার মুখে একটা কথাও এল না।

খানিক পরে সে ধরা গলায় বলে থাকবে, "আমি নিজেই যেতে পারব স্যার। আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন কেন? আপনার হস্টেল তো আমাদের বাড়ির উলটো দিকে। পৌঁছে দিতে গেলে অনেকটা রাস্তা একা ফিরতে হবে।"

"তাতে কী?"

মাস্টারমশাইকে বলতে শোনা গেল, "আমি একাই তো অনেক ঘুরি। রোজ দ্যাখোনি?"

"অন্য স্যারেরা তো তাস-টাস খেলেন।"

"আমার ভাল লাগে না। যতক্ষণ পারি, কিছু বইপত্তর পড়ি, একটা বয়সের পরে, অন্তু, বইটই ছাড়া আর সঙ্গী-সাথী বিশেষ থাকে না। এ-সব কথা তুমি পরে বুঝবে, এখন হয়তো ঠিক মানেটা ধরতে পারছ না। যাকগে, আসছে রবিবার সব ছেলেরা পিকনিকে যাবে, তুমিও যাচ্ছ তো?"

কতক্ষণ পরে মাস্টারমশাই চলে গেলেন, অন্তুর হিসেব নেই।

এর পরের কয়েকটা দিন ঝাপসা। বিল্টু ভাব জমাতে ওস্তাদ, সারকাসের টিকিট নিয়ে এল, সে কবে? সে কি শনিবার?

অন্তুর ভাল লাগছিল না। ইনটারভ্যালে যখন ভিড়, তখন বিল্টুর চোখ এড়িয়ে সে চুপে চুপে সরে পড়ল।

পরদিন রবিবার, পিকনিক। ভোর থেকেই অন্তু ছুতো তুলেছিল, গা ম্যাজম্যাজ করছে, যাবে না। মা আর মাসিমাই একরকম ঠেলেঠুলে ওকে পাঠিয়ে দিলেন।

"সবাই যাচ্ছে, তুই যাবি না কেন? চনমনে রোদ উঠেছে, পাহাড়ের ধারে দারুণ লাগবে দেখিস!"

ইচ্ছে নেই, তবু অন্তু শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে বাসে তুলল। সারা রাস্তা ওদের গান, বাস থামিয়ে রাস্তার ধার থেকে টকটকে লাল ফুল পেড়ে আনা, কোনও কিছুতে নেই অন্তু, সে থেকেও নেই, আসলে সে যেন পিকনিকে যাচ্ছে না।

এইভাবেই দুপুর, তারপর বিকেল, বাড়ি ফেরার তাড়া। জলটলে হাতমুখ ধুয়ে ওরা যখন সাফ হয়ে নিচ্ছে, তখন ক্লীনার জানাল, গাড়ি খারাপ। অনেক কসরত, অনেক ঠোকাঠুকি। কিছুতেই চাকা গড়ায় না।

শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যে-মাস্টারমশাই এসেছিলেন, তিনি ঠিক করে দিলেন। একটা রেস্টহাউস আছে পাহাড়টার কোল ঘেঁষে, ছেলেরা রাতটা ওখানেই থাকুক। ক্লীনার সাইকেল নিয়ে যাক শহরে, মেরামতির পার্টস কিনতে আর বাড়ি-বাড়ি খবর দিতে সে-ই পারবে।

সারা শরীরে ব্যথা, চোখের পাতা সিসের মতো ভারী হয়ে এসেছে, সরষেখেতটা মিশে গেছে অন্ধকারে, তবু এরই মধ্যে পাহাড়টাকে চেনা যায়। উঁচু মাথা, সব আবছা টিলাগুলো ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে এক ঝাঁক পাখি কী একটা না-জানা গত্ গাইতে গাইতে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে একটা মালা ছিটকে ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

যখন পাহাড়ের আড়াল থেকে থালার মতো চাঁদ উঠল, ততক্ষণে অন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে।

সেই ঘুম তার ভাঙল শেষ রাত্তিরের দিকে। হয়তো কেউ শব্দ করেছিল, কিংবা শীতে গা শিঁটিয়ে গিয়েও থাকবে। জানালার লম্বা লম্বা শিক ঘরটাকে জ্যামিতির আঁকজোকের কায়দায় ভাগ করে ফেলেছে, বোঝা যায় না এখন রাত না ভোর। পূর্ণিমার ওই এক মজা, রাত্তির আর খুব সকালের আকাশের চেহারা মিষ্টি-মিষ্টি আলোয় একেবারে একরকম করে দেয়।

উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল অন্তু। আর তখনই তার চোখে জল পড়ল। থাক-থাক ধাপ, এখন একটু ঝাপসা, তবু বোঝা যায়। চূড়ার ওটা মন্দির না গুম্ফা কে জানে, কোনও দিন জানা হবে না। কিন্তু এত সকালে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে?

কে আবার—বিল্টুকে দু-মাইল দূর থেকেও বলে দিতে পারে অন্তু, চিনতে তার কয়েক সেকেন্ডও লাগল না। এত ভোরে ওখানে বিল্টু উঠে গিয়েছে? মনের মধ্যে এত উত্তেজনা, বিস্ময় বাষ্পের মতো টগবগ করে ফুটছিল যে, জানালা থেকে সরে এসে অন্তু ঠেলতে থাকল অন্য ছেলেদের।

"দ্যাখ দ্যাখ, বিল্টু কোথায় গেছে।"

একটা ছেলে ঘুম-জড়ানো চোখে বলল, "জানি তো। তুই কাল যখন ঘুমিয়ে পড়লি, তারপরে আমরা সবাই বাজি রেখে ধাপ ভেঙে ভেঙে পাহাড়টায় চড়তে শুরু করেছিলাম। বিল্টুটা তরতর করে উঠে গেল, আমরা সবাই আর যেতে পারিনি, সারা দিন খুব খাওয়া-দাওয়া আর হয়রানি হয়েছে তো!"

রুদ্ধশ্বাসে অন্তু বলল, "তারপর?"

হাই তুলে সেই ছেলেটি বলল, "তারপর আর কী? শেষ পর্যন্ত উঠতে পারব না জেনে, কে কোথায় অন্ধকারে পা হড়কে পড়ি ঠিক নেই, আমরা সবাই নেমে আসছি, দেখি সিতুকে। সেই যে বাচ্চা ছেলেটা রে! ও বেচারা একদম উঠতে পারেনি, সক্কলের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে গেছে বলে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে। আমরা ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম। বললাম, কী রে, এভাবে বসে আছিস যে? সিতু আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। কী বলল জানিস, ভারী অদ্ভুত কথা। বলল, সারা রাত এখানে ঠান্ডায় আমি ঠকঠক করে কেঁপেছি, তোরা চলে গেলি, আমি একেবারে একলা হয়ে গেছি। তখন আমরা তাকে বলি, ভ্যাট পাগলা, ওপরে উঠেছে তো খালি বিল্টু। ওখানে আর কেউ নেই। এইবার বুঝেছিস তো, একদম যে পিছিয়ে পড়ে, সে যেমন একলা, সবচেয়ে আগে যে যায়, সবচেয়ে উঁচুতে চড়ে, তারও আশেপাশে কেউ থাকে না, সেও একলা।"

সেই মুহূর্তে অন্তুর ইতিহাসের মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ল। গায়ে চাদর, দোহারা চেহারা, সারা জীবন কত-না পড়েছেন, এখন তাঁর আর কিছু জানার নেই, কথা বলার মতো বন্ধুবান্ধব নেই—অন্য মাস্টারমশাইরাও না—তাই রোজ সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে একা একা হেঁটে বেড়ান।

ফরসা হয়ে এসেছিল। ইউক্যালিপটাস আর পাহাড়ের গায়ের পাইনগাছগুলোর সটান উঠে যাওয়া আবার স্পষ্ট। মন্দিরের সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে পাহাড়ের ডগায় বিল্টুকে এখন নির্ভুল দেখা যায়। এদিকে হাত নেড়ে নেড়ে ইশারা করে কী বলছে বিল্টু? অন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছে না। বিল্টু এই কথাই বোঝাতে চাইছে কি যে, ভাই, উঠে তো এসেছি আমি, কিন্তু পাহাড়ের ওদিকটাতেও কিস্যু নেই?

বলুক, অন্তু কান দেবে না। যা দেখার, তা দেখে নিয়েছে সে। বিল্টুকে হিংসে করবে কি, বরং মায়াই হচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ-খাঁজ সিঁড়ি কাটা, সব-কটা সিঁড়িই খোলা তার সামনে, যদি চেষ্টা থাকে তরতর করে উঠে যেতে বাধা কোথায় বিল্টুর, আহা, ভাঙবার মতো একটা সিঁড়িও বাকি নেই।

আবেশে চোখ বুজে এল অন্তুর।

(আপনি সেদিন সন্ধ্যাবেলা কী যেন বলছিলেন ইতিহাসের মাস্টারমশাই? একশো-তে একশো পেলে আর বেশি পাওয়া যায় না, কিন্তু ষাট যে পায়, তার সত্তর, আশি এমনকী নব্বই পাবারও আশা থাকে, এই রকম একটা কিছু না? বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার আর একটুও কষ্ট নেই। আমার অসুখটা হঠাৎ কেমন সেরে গেল দেখুন, আমি আবার সব দেখি, সব শুনতে পাই। আপনি শুধু একটিবার আমার মাথায় হাত রাখুন মাস্টারমশাই।)

ছবি সুধীর মৈত্র

ইঁদুর-সুন্দরী

বিমল মিত্র

আমার বাবা চিরকাল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সকালবেলাটা কাটিয়ে দিতেন। কেউ আসত শুধু গল্প করতে। কেউ আসত কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে। কেউ বা আবার আসত বিনা-খরচায় তামাক খেতে।

অর্থাৎ, বলতে গেলে আমাদের বাড়িটা ছিল সবরকম লোকের মিলন-স্থল। আমার বাবা গল্প বলতে আর গল্প শুনতে বড় ভালবাসতেন। সকালবেলা থেকেই বাইরের লোকেদের জন্যে চা তামাক সাজার ধুম পড়ে যেত।

আমি তখন ছোট। আমার অধিকার ছিল না সেখানে একবার। শুধু ভেতরের দরজার ফাঁক দিয়ে আমি একজনকে উঁকি মেরে দেখতাম।

পাড়ার যত বৃদ্ধদের মেলামেশা করবার জায়গা ছিল আমাদের বাড়ির বৈঠকখানাটা।

বাবা বলতেন, "তারপর রায়মশাই, দেশের হালচাল কী রকম? ফজলুল হক কী বলেছে কালকে? আপনি মীটিংয়ে গিয়েছিলেন নাকি?"

তখন ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিক। কংগ্রেস আন্দোলন করছে দেশের স্বাধীনতা আনবার জন্যে। আর ওদিকে মুসলিম লীগও চাইছে পাকিস্তান করতে। দলাদলি চরমে উঠেছে। খবরের কাগজে চারদিকের গরম-গরম খবর বেরোচ্ছে।

আমি মাঝে-মাঝে তাঁদের কথাগুলো শুনতাম বটে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারতাম না। ঘরময় শুধু নয়, বাড়িময় অম্বুরি তামাকের গন্ধ ভুর-ভুর করত। আর আমাদের বাড়ির কাজের লোকটি ঘন-ঘন চা করে নিয়ে বৈঠকখানায় দিয়ে আসত।

বাবা বৈঠকখানা থেকেই তাকে ডাকতেন, "ভৈরব, আরো চার কাপ চা দিয়ে যা—"

বোঝা যেত আরও চারজন আড্ডাধারী লোক এসে হাজির হয়েছে।

একজন লোক যে একবার চা খাবে তা নয়, বার বার চা খাবে। তার জন্যে যা খরচ হবে সমস্ত দেবেন বাবা। কারণ আড্ডা না দিলে বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

যেদিন ঘটনাচক্রে কেউ আসত না, সেদিন বাবা লোক দিয়ে ডেকে পাঠাতেন। তাঁরা এলে বাবা বলতেন, "কী গো মুখুজ্যে, আজ তুমি এলে না যে বড়?"

মুখুজ্যে মানে হরিহর মুখোপাধ্যায়। তিনিই ছিলেন আড্ডার প্রাণ। তাঁকে বাবা যেমন ভালবাসতেন, তেমনি আবার বকুনিও দিতেন।

বাবা বলতেন, "আফিমের নেশাটা বুঝি বেশি হয়ে গিয়েছিল তোমার?"

হরিহর মুখুজ্যে মশাই আফিম খেতেন। আফিমের নেশায় তিনি প্রায় সব সময় ঝিমোতেন।

ভৈরবকে বলতেন, "আমার চায়ে একটু বেশি করে দুধ দিও বাবা—"

যারা আফিমখোর তারা একটু বেশি দুধ খায়। ভৈরব জানত সে-কথা কিন্তু কাজের ভিড়ে তা মাঝে-মাঝে ভুলে যেত।

তাই মুখুজ্যে মশাইয়ের কথায় ভেতর থেকে আবার বেশি দুধ নিয়ে তাঁর কাপে ঢেলে দিয়ে আসত।

তিনি বলতেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে—"

বাবা জিজ্ঞেস করতেন "তা এ নেশা তুমি কেন ধরলে মুখুজ্যে? কেন ধরতে গেলে?"

হরিহরবাবু বলতেন, "আজ্ঞে, আফিম তো অমৃত। আপনিও ধরুন না, দেখবেন আপনার সব ব্যামো সেরে গেছে—"

বাবা বলতেন, "ছাই, ছাই, ও এক হতচ্ছাড়া নেশা। একবার ধরেছ কি সঙ্গে সঙ্গে সর্বনাশ!"

একদিন হরিহর মুখুজ্যে মশাই আর এলেন না। লোক পাঠানো হল তাঁকে ডাকতে. কিন্তু খবর এল মুখুজ্যে মশাইয়ের শরীর খারাপ।

শেষ পর্যন্ত বাবা নিজেই একদিন গেলেন মুখুজ্যে মশাইয়ের বাড়িতে। তখন তাঁকে দেখতে এসেছে ডাক্তারবাবু।

বাবা ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তার, কী রকম দেখছ? মুখুজ্যের কী হয়েছে?"

ডাক্তার আমাদের পাড়ার খুব নাম-করা লোক। বহু রোগীকে সারিয়ে দিয়েছে। যার যখনই অসুখ-বিসুখ হয় ওই ডাক্তার-বাবুকেই ডাকে।

বাবার কথা শুনে ডাক্তারবাবু বললে, "অসুখটা এমন কিছু নয় কিন্তু আমার কোনও ওষুধই কোনও কাজ করছে না।—"

"কেন?"

ডাক্তারবাবু বললে, "ওই যে উনি আফিম খান। ওঁর শরীরের মধ্যে আফিমের বিষ রয়েছে, ওঁকে যদি কোনও দিন সাপে কামড়ায় তো সাপই ওই বিষে মারা যাবে, ওঁর কিছু হবে না—"

তা সত্যি-সত্যিই একদিন মুখুজ্যে মশাই মারা গেলেন। কোনও ডাক্তারই তাঁকে বাঁচাতে পারলে না।

বাবার আড্ডা থেকে একজন মেম্বর কমে গেল। কিন্তু বাবার আড্ডা তা বলে বন্ধ হল না। তা আগে যেমন চলছিল পরেও তেমনি চলতে লাগল।

শুধু হরিহর মুখুজ্যের কথা উঠলেই বাবা বলতেন, "ওই আফিমই মুখুজ্যের সর্বনাশ করলে।"

রায়মশাই বললেন "আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছি মিত্তির-মশাই, আমি আর ও জিনিস ছুঁচ্ছি নে। মুখুজ্যে আমাকেও আফিম ধরবার চেষ্টায় ছিল। আমাকে অনেকবার মুখুজ্যে আফিম খেতে বলেছে। আমি দাদা ও-সব ধরিনি—বাবা বলতেন, "পৃথিবীতে আফিম কী করে এল, জানো?"

রায় মশাই বললেন. "না।"

বাবা বললেন, "তবে শোনো, আমি বলে দিচ্ছি। আমি যেবার কাশীতে গিয়েছিলুম. তখন সেখানকার এক সাধুর কাছে গল্পটা শুনেছিলুম।"

বলে বাবা গল্পটা বলতে আরম্ভ করলেন—

আমি পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

বহুকাল আগে গঙ্গার ধারের একটা নির্জন জায়গায় এক সাধু বাস করত। মানুষের নাম-গন্ধ নেই সে জায়গাটায়। নিবিড় জঙ্গল চারদিকে। সাধন-ভজনের পক্ষে জায়গাটা খুব ভাল। সাধুজি গাছের ডাল-পালা দিয়ে নিজের একটা আস্তানা তৈরি করে নিয়েছিল। সারাদিন কাছের একটা পাহাড়ে চলে যেত আর বিকেলবেলা নিজের আস্তানায় ফিরত।

সেদিনও রোজকার মতো সাধুজি ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে গঙ্গায় স্নান করে সাধন-ভজন করতে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলে তার বিছানার কাছে একটা ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাধুজিকে দেখে ইঁদুর-বাচ্চাটা পালিয়ে যাচ্ছিল। সাধুজি তাকে ডাকলে, "এই কোথায় যাচ্ছিস, দাঁড়া—পালাচ্ছিস কেন?"

ইঁদুরটা থমকে দাঁড়াল। বললে, "আপনি আমাকে মারবেন না বাবা আমি আপনার ছেলের মতন—"

সাধুজি জিজ্ঞেস করলে, "তুই কোথায় থাকিস?"

ইঁদুরটা বললে, "আমি আপনার এই আস্তানাতেই থাকি!"

"কী খাস?"

ইঁদুর বললে, "আপনি যে-সব ফল-ফুলুরি জঙ্গল থেকে আনেন সেই খাবারের যে টুকরো-টাকরা পড়ে থাকে তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাই। আমায় আর খাবারের জন্য অন্য কোথাও যেতে হয় না—"

সাধুজি বললে, "ঠিক আছে. তোর কোনও ভাবনা নেই, তুই যতদিন ইচ্ছে আমার আস্তানাতেই থাক, কেউ তোকে কিছু বলবে না। কেউ যদি কখনও তোকে কিছু বলে তো আমাকে বলে দিবি।"

"ইঁদুর নিশ্চিন্ত হল। সাধুজি সারাদিন পরে যখন জঙ্গল থেকে ফলমূল নিয়ে আস্তানায় ফেরে তখন ইঁদুরটাও এসে সামনে হাজির হয়। সাধুজি তাকে ভাল করে খেতে দেয়। ইঁদুরটাও খুব আরামে থাকে। তাকে আর আগেকার মতো খাবার খাওয়ার জন্যে লুকিয়ে থাকতে হয় না।

সাধুজি জিজ্ঞেস করে, "কী রে তোর কোন কষ্ট নেই তো?"

ইঁদুর বলে, "না—"

সাধুজি অভয় দিয়ে বলে, "হ্যাঁ, কিছু কষ্ট হলে আমাকে বলবি—"

কিন্তু কিছুদিন পরে ইঁদুরটা দেখলে কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আর তাকে ধরবার জন্যে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরটা তার নিজের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এক চুলের জন্যে ইঁদুরটা বেঁচে গেল। নইলে বেড়ালটা তাকে ধরে খেয়ে ফেলত।

সন্ধেবেলা সাধুজি আস্তানায় আসতেই ইঁদুরটা বললে, "প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে—"

"কীসের সর্বনাশ? কার সর্বনাশ?"

ইঁদুর বললে, "প্রভু আমার—"

"কী রকম?"

ইঁদুর বললে, "একটা বেড়াল আমাকে ধরতে এসেছিল—"

সাধুজি বললে, "বেড়াল কোত্থেকে এল?"

ইঁদুর বললে, "তা জানি নে প্রভু, তবে আর একটু হলেই আমাকে ধরে খেয়ে ফেলত, খুব জোর বেঁচে গিয়েছি—"

সাধুজি খুব ভাবনায় পড়ে গেল। এর বিহিত কী হবে?

ইঁদুর বললে, "আপনি যখন বাড়িতে থাকেন তখন কিছু ভয় নেই. আপনি যখন বাড়িতে থাকবেন না, তখন যদি বেড়ালটা আবার আসে! তাহলে আমি আর বাঁচব না—"

সাধুজি বললে, "তাহলে এক কাজ কর তুই, আমার সঙ্গে তুইও জঙ্গলে চল, আমি যেখানে সাধন-ভজন করব, তুইও সেখানে আমার পাশে থাকবি!"

ইঁদুর বললে, "না, সে অনেক কষ্ট। আমার জন্যে আপনার পুজোতেও মন থাকবে না—তাতে আপনার ক্ষতি হবে—"

সাধুজি বললে. "হ্যাঁ, তা ক্ষতি হবে বটে—তাহলে আমি কী করব। আমি তো তোর জন্যে সারাদিন আস্তানার ভেতরে থাকতে পারব না। আমাকে ঘর থেকে বেরোতেই হবে—"

ইঁদুর বললে, "তাহলে একটা কাজ করুন না—"

"কী কাজ, বল?"

ইঁদুর বললে, "আমি বলি কী, আপনি তো অনেক ক্ষমতা রাখেন, আমাকে বেড়াল করে দিন না—"

"বেড়াল?"

"হ্যাঁ, আমাকে মন্ত্র পড়ে বেড়াল করে দিন। তাহলে আর কোনও ভয় থাকবে না আমার। বেড়াল তো বেড়ালকে খেতে

ফেলতে পারবে না—''

সাধুজি বলল, "তোর বেড়াল হবার খুব শখ?''

ইঁদুর বললে, "হ্যাঁ প্রভু, আমাকে বেড়াল করে দিলে আমার সব ল্যাঠা চুকে যায়, আর কোনও দিন আপনার কাছে কিছু চাইব না—''

"ঠিক আছে—তুই স্থির হয়ে দাঁড়া—''

বলে সাধুজি তার কমণ্ডলুর জলে মন্ত্র পড়ে সেই জল ইঁদুরের গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে ইঁদুরটা বেড়ালে পরিণত হল। দেখে কেউ আর বলতে পারবে না যে, সে আগে ইঁদুর ছিল।

বেড়ালটা সাধুজির পায়ের কাছে মাথা হেঁট করে প্রণাম করলে। বললে, "আপনি আমায় বাঁচালেন হুজুর—''

সাধুজি বললে, "ঠিক আছে, এবার তো তুই খুশি?''

ইঁদুর বললে, "হ্যাঁ প্রভু, আমার আর কোনও দুঃখ নেই—''

একদিন সাধুজি জিজ্ঞেস করলে, "আর তো তোর কিছু কষ্ট নেই—''

ইঁদুর বললে, "না প্রভু, আর আমার কোনও কষ্ট নেই।''

"এখন তুই দুনিয়ার সব বেড়ালের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারিয়ে দিতে পারবি তো?''

ইঁদুর বললে, "তা পারব, কিন্তু এবার আর এক নতুন বিপদ এসেছে—''

"নতুন আবার কী বিপদ এল তোর?''

ইঁদুর বললে, "আপনি বাড়ি চলে যাবার পর একদল কুকুর আমাকে দেখতে পেলেই তাড়া করে আসে। আমি তখন তাদের হাত থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে কোনওরকমে প্রাণ বাঁচাই—আর তারা বাইরে ঘেউ-ঘেউ করে শব্দ করে সমস্ত পাড়া মাত করে—''

সাধু জিজ্ঞেস করে, "তাহলে আমি এখন কী করব?"

ইঁদুর বললে, "প্রভুর আমার ওপর অপার দয়া, আপনি যদি আমার দয়া করে কুকুর করে দেন তাহলে জীবনে আমার আর কোনও কষ্ট থাকবে না—''

সাধুজি বললে, "তথাস্তু—''

বলেই সাধুজি তার কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটা কুকুর হয়ে গেল। বেশ নধর লোমওয়ালা কান-ঝোলা একটা কুকুর—

কুকুর হয়ে বেড়ালটা নির্ভয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ আর তাকে তাড়া করে না। বেশ সুখেই দিন কাটতে লাগল তার।

কিন্তু সাধুজির ফেলে যাওয়া খাবার খেয়ে আর তার পেট ভরতে লাগল না। যতদিন ইঁদুর ছিল সে ততদিন বেশ চলেছিল। বেড়াল যখন সে হল তখনও সে কিছু অসুবিধে ভোগ করেনি।

কিন্তু কুকুরের খিদে বেশি। ওই অল্প খাবারে তার অসুবিধে হতে লাগল। মনে হল, আরও বেশি খাবার পেলে ভাল হত।

এবার সাধুজি বাড়ি আসতেই সে সামনে গিয়ে জোড়হাত করে পেছনের পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

সাধুজি বুঝতে পারলে যে, তার কাছে কুকুরটার কিছু নিবেদন আছে।

জিজ্ঞেস করলে, "কী রে, তুই কিছু বলবি?''

"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু! একদিন যখন আমি ইঁদুর ছিলাম তখন আপনিই আমাকে দয়া করে বেড়াল করে দিয়েছিলেন। তারপর যখন আমার কথায় আপনি আমাকে আবার কুকুর করে দিলেন তখনও আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।''

সাধুজি বললে, "তাহলে এবার আর কী হতে চাস? খরগোশ?''

"না প্রভু, খরগোশ হয়ে কী হবে?''

"তাহলে বল না, এবার কী হতে চাস তুই?''

ইঁদুর বললে, "আমাকে আপনি এবার দয়া করে হনুমান করে দিন প্রভু?''

সাধুজি বললে, "তা এত জিনিস থাকতে তুই হনুমান হতে যাবি কোন দুঃখে? হনুমান হয়ে তোর কী লাভ হবে?''

ইঁদুর বললে, "সত্যি কথা বলতে কী প্রভু, আপনি খেয়ে-দেয়ে যা পাতে ফেলে রেখে যেতেন এতদিন তাই খেয়েই আমার পেট ভরেছে। কিন্তু এখন তো আমি কুকুর হয়েছি, এখন আর ওতে আমার পেট ভরে না। তাই বলছি, আপনি আমাকে কুকুর করে দিয়ে পেটটা বড় করে দিয়েছেন। এখন আর ওই খাবারে আমার এত বড় পেটটা ভরে না। আপনি যদি আমাকে হনুমান করে দিতেন তো আমি গাছে উঠে নিজেই নিজের খাবার জোগাড় করে নিতুম। আপনার ফেলে দেওয়া খাবারের ওপর আর নির্ভর করতে হত না।'

"তা সত্যিই বলছিস তুই হনুমান হবি? হনুমান হলে তোর ইচ্ছে পূর্ণ হবে?''

"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু!''

"আচ্ছা ঠিক আছে। তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক। আমি তোকে হনুমানই করে দিচ্ছি। কিন্তু তোকে বলে রাখছি এর পর যেন অন্য কিছু আবার হতে চাসনি। অত বড় হওয়ার ইচ্ছে ভাল নয়। সবারই নিজের নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।''

ইঁদুর বললে, "না প্রভু, পরে আর কিছু হতে চাইব না। আমি হনুমান হয়েই থাকব চিরকাল—''

"তথাস্তু।''

বলে সাধুজি কমণ্ডলুর জল নিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে কুকুরের গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা হনুমান হয়ে গেল!

তা প্রথম কয়েক মাস বেশ কাটতে লাগল। বেশ এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। যে-ফল খেতে ইচ্ছে হল তাই-ই গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। কত মজা হনুমান হওয়ার। কেউ তাকে বাধা দেবার নেই। কেউ তাকে বারণ করার নেই। সারাদিন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াত সে। জঙ্গলে কত রকমের ফলের গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল কত ফল খাবে খাও না। যতক্ষণ পেট না ভরে ততক্ষণ খাও কেউ তোমায় কিছু বলবে না।

সারাদিন সে খেয়ে বেড়ায় আর সন্ধে হলে সাধুজির আস্তানায় এসে শুয়ে থাকে।

সাধুজি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, "কী রে, এখন সুখে আছিস তো?''

হনুমানরূপী ইঁদুর বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু, আমার মতো সুখী আর কেউ নেই—''

"এখন খেয়ে পেট ভরে তো?''

"হ্যাঁ প্রভু, এখন খেয়ে খেয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি না। জঙ্গলে যে এত ফল হয় তা আগে জানতুম না। আর বেড়ানো! পৃথিবীটা যে এত বড় তা আগে জানতুম না।''

সাধুজি বলে, "কিন্তু এতেই তুই খুশি থাকার চেষ্টা করিস। এর চেয়ে বড় হতে চেষ্টা করিসনি। বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাল নয়।''

হনুমান বলে, "না প্রভু, এখন এই-ই আমার ভাল, এর চেয়ে আর বড় কিছু হতে চাই না—''

কিন্তু বেশি দিন এ-সুখ রইল না।

একদিন হনুমান ওপরের গাছের ডাল থেকে দেখতে পেলে জঙ্গলের ভেতরে একটা ডোবায় একদল বুনো শুয়োর জলের ভেতরে বেশ গা ডুবিয়ে আরাম করে খেলা করছে।

হনুমানটার মনে হল ওদের কী আরাম! এই গরমের দিনে

আমি যখন ঘামে ছটফট করছি ওরা তখন কেমন আরামে জলের ভেতরে গা ডুবিয়ে বসে আছে। আমি যদি ওই রকম বুনো শুয়োর হতুম তো বেশ হত!

কিন্তু না, সাধুজিকে সে কথা দিয়েছে যে, আর সে অন্য কিছু হতে চাইবে না। এর চেয়ে অন্য কিছু সে হতে চাইবে না। সে সাধুজির কাছে শুনেছে যে, বেশি উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা থাকা ভাল নয়। তাতে বিপদ আছে!

সেদিন সাধুজি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে, তুই ভাল আছিস তো?"

হনুমান বললে, "না প্রভু, আমার আবার একটা নিবেদন আছে আপনার কাছে—"

"আবার নতুন কী নিবেদন?"

"আজ্ঞে, আপনি আমাকে বুনো শুয়োর করে দিন।"

"বুনো শুয়োর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু! শেষবারের মতো একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবেই—"

"তা বুনো শুয়োর হয়ে কী লাভ হবে তোর?"

হনুমান বললে, "বুনো শুয়োর হলে আর আমাকে খেটে

খেতে হবে না। বুনো শুয়োর হলে আমি তাদের মতো ডোবার জল-কাদায় ডুবে আরাম করব। আর গাছের মুলোটা-কলাটা খাব। আমাকে গাছে গাছে আর ঝাঁপ দিয়ে বেড়াতে হবে না। আর তাছাড়া গরমে ঘেমে নেয়ে উঠতে হবে না। ওদের কত আরাম, আর আমার কত কষ্ট। আমাকে এবারের মতো বুনো শুয়োর করে দিন। আর আমি আপনার কাছে কখনও কিছু চাইব না।"

সাধুজি মনে মনে হাসতে লাগল। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলে না।

আবার কমণ্ডলুর জলে মন্ত্র পড়ে সাধুজি তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে হনুমানটা একটা বুনো শুয়োরে পরিণত হল।

জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে, এবার খুশি তো?"

হনুমান বললে, "হ্যাঁ প্রভু, এবার খুব খুশি আমি—"

বুনো শুয়োর হওয়ার যে কী আনন্দ তা সে প্রথম দিনেই বুঝতে পারলে। তাকে গাছে-গাছে চড়ে বেড়াতে হয় না আর। সে এবার ডোবার জলে গা ডুবিয়ে দিব্যি চোখ বুজে আরাম করতে লাগল।

এই রকম করে বেশ চলছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক মুশকিল হল।

দেশের রাজা একদিন লোক-লশকর নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে সেই জঙ্গলে এসে হাজির হল। উদ্দেশ্য শিকার করবে।

রাজার হাতে তীর-ধনুক। সামনে যে-সব জন্তু জানোয়ার নজরে পড়ছে, তাদের সকলকে তীর মেরে ধরে ফেলছে। কত জন্তু-জানোয়ার যে রাজা শিকার করলে তার ঠিক নেই।

তখন বুনো শুয়োরটারও খুব ভয় হল। তাকে যদি ধরে ফেলে, তার গায়ে যদি একটা তীর এসে লাগে তো তখন কী হবে?

না, তা হল না, রাজার লোকেরা কেউ যাতে তাকে না দেখতে পায় তার জন্যে সে নিজেকে জলের ভেতর আড়াল করে চোখ দুটো উঁচু করে চারদিকে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল।

দেখলে রাজার হাতিটা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সামনে যা পাচ্ছে সব পেট ভরে খাচ্ছে। হাতিটাকে দেখে তার খুব হিংসে হল। কেমন আরাম হাতিটার। রাজা তার পিঠে চড়ে বেড়ায়। কত সুখ হাতিটার। সে যদি ওই রকম হাতি হত তাহলে রাজা তার পিঠেও চড়ে বেড়াত।

সেই দিন রাত্রে সাধুজির কাছে এসে সে বললে, "প্রভু, আমি আর বুনো শুয়োর হয়ে থাকব না। আমার আর এ-জীবন ভাল লাগছে না।"

"কেন রে? আবার কী হল তোর?"

বুনো শুয়োরটা বললে, "আপনাকে অনেকবার আমি বিরক্ত করেছি। আমি সামান্য একটা ইঁদুর ছিলুম, আমার কথায় আপনি আমাকে বেড়াল করে দিলেন। তারপর আপনার দয়ায় আমি কুকুর হলাম। তারপরও আমার সাধ মিটল না। আমার অনুরোধে আপনি আমায় হনুমান করে দিলেন। তাতেও আমার সাধ মিটল না, আপনি আমাকে বুনো শুয়োর করে দিলেন।"

সাধুজি বললে, "তা তো আমি জানি, এবার আবার কী হতে চাস?"

সে বললে, "হাতি। এবার আমি হাতি হতে চাই। ভেবে দেখেছি হাতিরাই সব চেয়ে সুখী। হাতি হতে পারলে রাজারা তার পিঠে চড়ে বেড়ায়। রাজারা বড় আদর করে হাতিকে। জীবনে যদি একবার হাতি হতে পারি তো রাজাও আমার পিঠে চড়বে—"

সাধুজি বললে, "কিন্তু তোকে যে বলেছিলুম বেশি বড় হতে চাসনি, তাতে তোর খারাপ হবে!"

"আমার কী খারাপ হবে তা তো আমি বুঝতে পারছি না।"

"বলেছি তো বেশি লোভ করা উচিত নয়।"

বুনো শুয়োরটা বললে, "আমার এ তো লোভ নয়। আমি শুধু একটু ইজ্জত চাইছি। তার বেশি কিছু নয়।"

সাধুজি বললে, "ঠিক আছে, তোকে আমি হাতিই করে দিচ্ছি. তবে হাতি হওয়ার মধ্যে কোনও ইজ্জত নেই, এইটে তোকে আমি বলে রাখছি—। জানিস আমাদের শাস্ত্রে আছে—'অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে উড়ে যাবে—' নে এবার মাথাটা নিচু কর—"

বলে আবার নিজের কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে বুনো শুয়োরের গায়ে ছড়িয়ে দিলে।
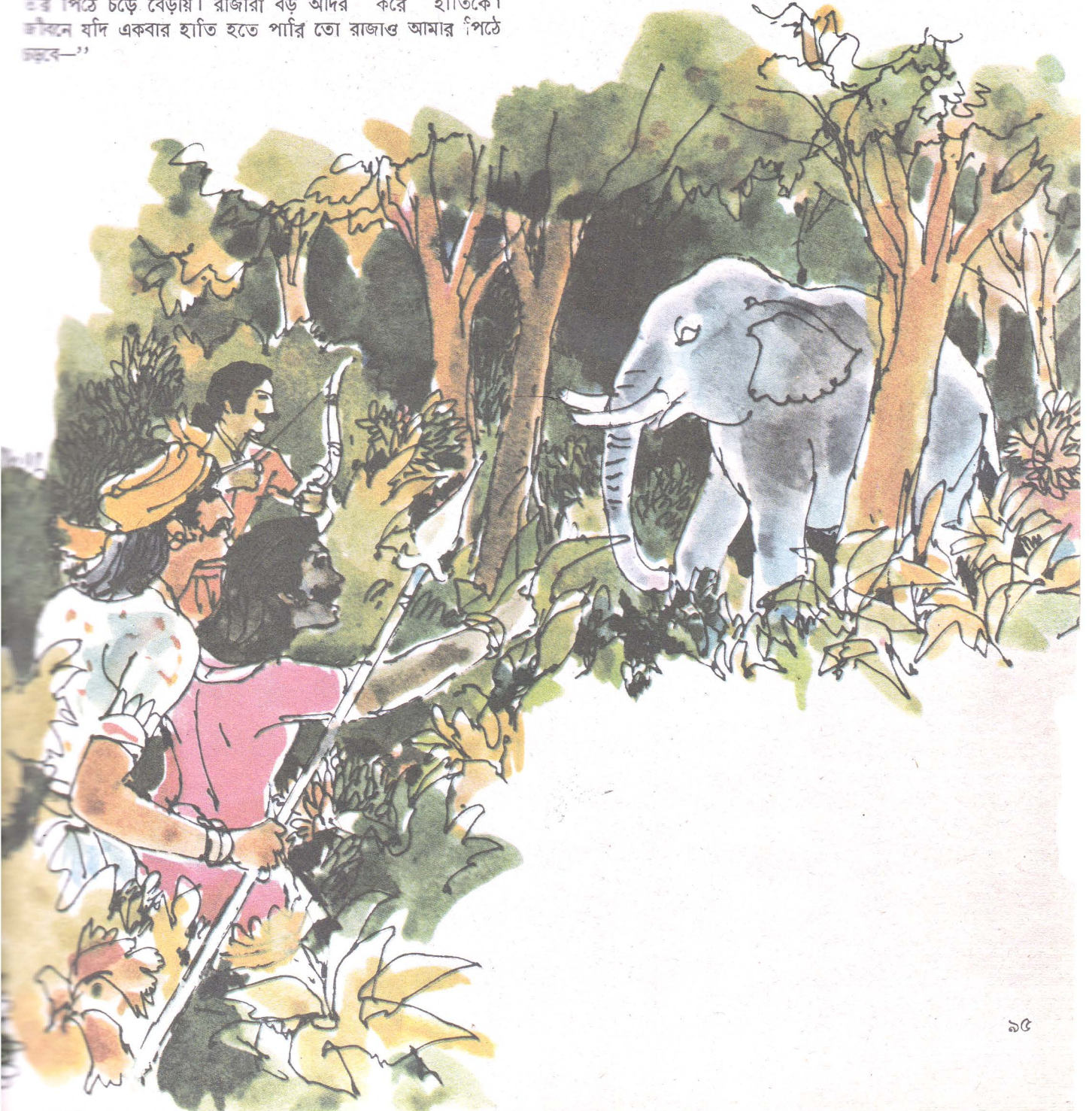
আর সঙ্গে সঙ্গে বুনো শুয়োরটা একটা মস্ত হাতিতে পরিণত হয়ে গেল।

তখন হাতির সে কী আনন্দ। একেবারে আহ্লাদে আটখানা। এখন তার চেষ্টা হল কী করে রাজার নজরে পড়া যায়।

সেই দিন থেকেই হাতিটা একা একা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একমনে সেই সেদিনকার দেখা রাজার কথাই ভাবতে লাগল সে। কেমন সুন্দর দেখতে রাজাকে। অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে অমন রাজাকে পিঠে নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যায়। তার কি অত সৌভাগ্য হবে?

সত্যি একদিন অত সৌভাগ্যই তার হল।

আবার দেশের রাজা লোক-লশকর নিয়ে বনের মধ্যে একদিন শিকার করতে লাগল। তাদের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগল, যাতে রাজার নজরে পড়ে যায় সে।

দূর থেকে রাজা হঠাৎ তাকে দেখতে পেলে। জিজ্ঞেস করলে, "ওই হাতিটা কোত্থেকে এল রে? ওটা কার হাতি?"

পেয়াদা বরকন্দাজরা তাকে দেখেছিল।

তারা বললে, "ওটা কারোর হাতি নয় রাজামশাই, ওটা একটা বুনো হাতি।"

রাজামশাই হুকুম দিলেন, "ওকে বাঁধ্, বেঁধে ফেল্, তারপর আস্তাবল-বাড়িতে রেখে ওটাকে পোষ মানাবি—"

তা, যে কথা সেই কাজ।

কিন্তু হাতিটা তো এই সুযোগই খুঁজছিল। তাকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হল না কাউকে। বলতে গেলে সে নিজেই একরকম ধরা দিলে।

তারপর তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজ-বাড়ির আস্তাবলে রেখে পোষ মানানোর চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু সবাই দেখে আশ্চর্য হল যে, কত সহজে একটা বুনো হাতি পোষ মানলে। আগে অন্য হাতির বেলায় এত সহজ হয়নি পোষ মানানো। রাজার ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি। সে কী এলাহি কাণ্ড। হাজারটা লোক সেই সব জানোয়ারদের সেবা করতে ব্যস্ত।

একটা হাতি নতুন হাতিকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, "তোমাকে রাজা কী করে ধরলে ভাই?"

হাতিটা বললে, "আমি বনের মধ্যে একা-একা চরছিলাম, ওরা আমাকে টপ্ করে ধরে ফেললে—"

"তা তুমি পালাতে পারলে না?"

"না।"

"তোমাকে কি ওরা পায়ে দড়ি বেঁধে ধরলে?"

"না, আমাকে সবাই মিলে লাঠি নিয়ে ঘিরে ফেললে, আর আমি পালাতে পারলুম না—। শেষকালে আমার গলায় লোহার শেকল বেঁধে দিয়ে হিড়হিড় করে সবাই টানতে লাগল।"

"তা তুমি তাড়া করলে না কেন ওদের?"

নতুন হাতিটা বললে, "আমি একলা আর ওরা অনেক লোক, আমি ওদের সঙ্গে পেরে উঠব কী করে?"

"তুমি এত ছোট হাতি, তোমার তো একলা জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করা উচিত হয়নি। তোমার মায়ের সঙ্গে ঘোরাই উচিত!"

নতুন হাতিটা বললে, "আমার তো মা নেই—"

"আহা! যার মা নেই তার কেউই নেই। যা হোক, এখানে থাকো, দুদিন বাদেই সব সহ্য হয়ে যাবে।"

নতুন হাতিটা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে খেতে দেয় ভাল?"

"তা দেয়, সেদিক থেকে কোনও কষ্ট হবে না তোমার। শুধু মাঝে-মাঝে রাজা-রানীকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরতে হবে ওইটেই যা একটু কষ্ট!"

নতুন হাতিটা বললে, "সে আর কষ্ট কিসের? সে তো আরাম।"

"কেন, আরাম কেন?"

"বা রে, রাজা-রানীকে পিঠে নিয়ে ঘুরব, কত লোক রাজা-রানীকে সেলাম করবে, আর তার সঙ্গে আমিও সেলাম পাব—"

ওদিকে রাজামশাই একদিন মন্ত্রীকে ডাকলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "সেদিন যে জঙ্গল থেকে নতুন হাতিটা ধরে আনলুম, সেটার কী অবস্থা?"

মন্ত্রী বললে, "আজ্ঞে রাজামশাই, সে খুব পোষ মেনেছে।"

"এত তাড়াতাড়ি পোষ মানল?"

"আজ্ঞে পোষ মানাতে খুব মেহনত করতে হয়েছে।"

"সে কী? হাতিটাকে দেখে তো তেমন মনে হয় না। মনে হয় বেশ নিরীহ!"

মন্ত্রী বললে, "দেখে এ-রকম অনেক কিছুই মনে হয়, কিন্তু আসল মূর্তি পরে বেরিয়ে পড়ে!"

"তা নিয়ে এসো তো তাকে আমার কাছে। দেখি কেমন পোষ মেনেছে হাতিটা। যদি দেখি পোষ মেনেছে তাহলে ওর পিঠে চড়ে আমি রানীকে নিয়ে আজ বেড়াতে বেরোব!"

নতুন হাতিটাকে রাজার সামনে নিয়ে আসা হল।

তাকে দেখে রাজা খুব খুশি। মাহুত তাকে পা মুড়ে বসতে বলতেই সে বসল। উঠতে বললে উঠে দাঁড়াল॥ শুঁড় তুলে সেলামও করলে রাজাকে।

রাজা সব কিছু পরীক্ষা করে খুশি হলে বললে, "ওর পিঠে হাওদা লাগিয়ে দে—"

হাতির পিঠে সোনার জরি দিয়ে ঢাকা হাওদা লাগানো হল। হাতিটা নিচু হয়ে বসল। প্রথমে রাজা উঠল হাতির পিঠে। তারপর হাত ধরে টেনে রানীকে হাতির পিঠে উঠিয়ে নিলে।

হাতি খুব খুশি। সে আস্তে আস্তে চলতে লাগল হেলে দুলে। রাস্তার দুপাশের লোকরা রাজা-রানীকে দেখে প্রণাম করতে লাগল।

প্রথম দিনটা এমনি কাটল। দ্বিতীয় দিনটাও তাই। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই মনে হল পৃথিবীতে সত্যিকারের সুখী যদি কেউ থাকে তো সে হচ্ছে রাজার বউ—রানী। তার সামনেই রাজা কত ভালবাসে রানীকে। অথচ রাজা তাকে তো কই ভালবাসে না। রানী হওয়ার অনেক সুখ! রানী হলে কত সোনার গয়না পরা যায়। সাধুজিকে বলে যদি একবার রানী হতে পারে তো তাহলেই তার জীবন সার্থক হয়ে যাবে। আর কখনও কিছু সে চাইবে না।

একদিন যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, সে রাজার আস্তাবল থেকে বেরিয়ে কিছু না বলে বন-জঙ্গল পেরিয়ে একেবারে সাধুজির আশ্রমে এসে হাঁফ ছাড়ল।

সাধুজি যখন সন্ধের আগে আস্তানায় ফিরে এল তখন হাতিটা সাধুজির পায়ের ওপর নিজের সামনের পা দুটো বাড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ল।

সাধুজি জিজ্ঞেস করলে, "কী রে, কী হয়েছে তোর? আবার কী চাই?"

হাতিটা বললে "প্রভু, এবার আমি রানী হতে চাই, আমাকে আপনি রানী করে দিন—"

"কেন রে? হঠাৎ আবার তোর রানী হবার সাধ হল কেন?"

হাতিটা বললে, "হ্যাঁ প্রভু, আমি আপনার কৃপায় ছোট্ট ইঁদুরছানা থেকে একেবারে মস্ত হাতি হয়েছি। কিন্তু সুখ পাইনি। ভেবেছিলুম হাতি হতে পারলেই আমি সুখী হব কিন্তু না, দেখলুম রাজা হাতির চেয়ে রানীকেই বেশি ভালবাসে।"

সাধুজি বললে, "কিন্তু রাজা তোকে যদি বিয়ে করে তবেই

তো তুই রানী হতে পারবি। আমি তোকে সুন্দরী মেয়ে করে দিতে পারি, রাজা যদি তোকে দেখে পছন্দ করে তবেই তো তুই রানী হতে পারবি। কিন্তু তা করা তো আমার ক্ষমতায় নেই—''

''আজ্ঞে প্রভু, আপনি আমাকে সুন্দরী মেয়েই করে দিন, আমার রানী হওয়া সে আমার ভাগ্য—আপনি তা নিয়ে ভাববেন না—''

তা তাই-ই হল। আগের আগের বারের মতো কমণ্ডলুর জলে মন্ত্র পড়ে তা হাতির গায়ে ছিটিয়ে দিতেই সে একটা সুন্দরী মেয়েতে পরিণত হল। আর এমন সুন্দরী হয়ে গেল যে যে-কেউ তাকে দেখবে সেই-ই মুগ্ধ হবে!

''আমার নাম কী দেবেন প্রভু? এবার আমি তো মানুষ হয়েছি, এবার তো আমার একটা নাম চাই।''

সাধুজি বললে, ''ঠিক আছে, তোর নাম দিলাম—সুন্দরী। খুশি তো?''

''হ্যাঁ প্রভু, এবার আমি খুব খুশি।''

বেশ আনন্দে দিন কাটাতে লাগল সুন্দরী। সাধুজি আস্তানা থেকে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই সুন্দরী সেজেগুজে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সাধুজি তাকে শুধু সুন্দরীই করেনি, মন্ত্র দিয়ে ভাল ভাল কাপড় গয়নাও করে দিয়েছে। তখন সুন্দরীর একমাত্র স্বপ্ন রাজার জন্যে অপেক্ষা করা।

তা একদিন তার অপেক্ষা করা সার্থক হল।

সেদিন রাজা শিকার করতে এসেছিল জঙ্গলে। একটা হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে সুন্দরীর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সুন্দরীর রূপ দেখে রাজা অবাক। এত রূপও কোনও মেয়ের হয়? তার নিজের রানীর চেয়েও রূপসী!

কাছে এসে সুন্দরীকে রাজা জিজ্ঞেস করলে, ''তুমি কে?''

সুন্দরীর বুক তখন আনন্দে রোমাঞ্চে ঢিবঢিব করছে। কোনও রকমে তার মুখ বললে, ''আমি এক সাধুর মেয়ে—''

''তোমার নাম কী?''

সুন্দরী বললে, ''সুন্দরী!''

রাজা বললে, ''তোমার নামটা যেমন, তোমাকে দেখতেও তেমনি—সাধুজি কোথায়?''

সুন্দরী বললে, ''তিনি এখন নেই জঙ্গলে তিনি রোজ এই সময়ে সাধন-ভজন করতে যান, বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যায়—''

''আমি তোমাকে আমার রানী করতে চাই, তুমি রাজি?''

''আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি যদি রাজি থাকেন তো আমার আপত্তি নেই—''

''ঠিক আছে—''

বলে রাজা চলে গেল। বিকেলবেলা সাধুজি আশ্রমে ফিরে আসতেই সুন্দরী তাকে সব কথা বললে।

সাধুজি বললে, ''তুই তাহলে রানী হবি?''

সুন্দরী বললে, ''হ্যাঁ প্রভু, রানী হওয়াই আমার শেষ ইচ্ছে। রানী হতে পারলে দেখবেন আমি আর কিছু চাইব না আপনার কাছে। আপনি এ-বিয়েতে আপত্তি করবেন না—''

পরের দিন যথাসময়ে রাজা এল সাধুজির কাছে। সাধুজি মত দিলে। রাজা সুন্দরীকে নিয়ে গেল নিজের প্রাসাদে। রাজা দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে শুনে রাজ্যের সমস্ত লোক মহা খুশি। বিয়ের দিন মহা ধুমধাম।

বিয়ের পর গোলমাল বাধল প্রথম রানীকে নিয়ে। প্রথম রানী তখন দুয়োরানী হয়ে গেছে। সুন্দরীই হয়েছে রাজার কাছে সুয়োরানী। রাজা আর দুয়োরানীর কাছে যায় না। সুন্দরীর কাছেই সব সময়ে থাকে। সুন্দরীকেই তখন রাজা বেশি ভালবাসে।

দুয়োরানীকে তখন ঝি সব সময় সান্ত্বনা দেয়। বলে, ''অত দুঃখ কোরো না রানীমা, আমি তোমার সব দুঃখ দূর করব।''

দুয়োরানী জিজ্ঞেস করে, ''তুই কী করে আমার দুঃখ দূর করবি?''

ঝি বলে, ''দেখ না, আমি কী করি!''

''কী করবি তুই বল্ না—''

ঝি বললে, ''আমি ছোটরানীর দুধে ধুতরোর বিষ মিশিয়ে দেব—''

''যদি কেউ জানতে পারে?''

''কে আর জানতে পারবে? আর জানতে পারলেই বা কী? বাড়ির কেউই তো ছোটরানীকে দেখতে পারে না।''

তা শেষ পর্যন্ত সেই সর্বনাশই হল। একদিন সকালে যেমন রোজ সুন্দরী দুধ খায়, তেমনি খাবার পরই কেমন গা-বমি-বমি করতে লাগল আর রাত হবার আগেই সে মারা গেল। বৈদ্য-কবিরাজ এসে কত চেষ্টা করলে বাঁচাতে, কিন্তু কিছুতেই আর সুন্দরীকে বাঁচানো গেল না।

রাজা খুব মুষড়ে পড়লে। সোজা সাধুজির কাছে এসে সব খবর জানালে।

সাধুজি সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ''রাজন্, আপনি দুঃখ করবেন না। যা ওর কপালে ছিল তাই-ই ঘটেছে। আসলে ওর শরীরে রাজ-রক্ত ছিল না। ও এককালে ছিল একটা ছোট নেংটি ইঁদুর। ওর ইচ্ছেতেই ওকে একদিন আমি বেড়াল করে দিয়েছিলুম। তারপর ওর পীড়াপীড়িতেই আমি ওকে কুকুর করে দিয়েছিলুম। তারপর কুকুর থেকে ওকে করেছিলুম হনুমান, তারপর হনুমান থেকে বুনো শুয়োর, বুনো শুয়োর থেকে করেছিলুম হাতি। কিন্তু তাতেও ওর মনে সুখ ছিল না। হাতি হয়ে ওর মন ভরল না, রানী হতে চাইল। আমি ওকে কত সাবধান করে দিয়েছিলুম। বলেছিলুম অত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডাবে—এখন আপনি আপনার প্রথম রানীকে আবার গ্রহণ করুন। আর আমার সুন্দরী যদিও মারা গেছে, কিন্তু তবু ঈশ্বরের আশীর্বাদে ওকে আমি অমর করে রাখব।''

''কী করে?''

সাধুজি বললে, ''ওকে আপনি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াবেন না। দশ হাত একটা গর্ত খুঁড়ে ওকে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। তারপর চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে দিন। আর ওকে যেখানে পুঁতবেন তার ওপরে চোদ্দ দিন ধরে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালতে বলবেন। এক মাস পরে ওর হাড়-মাংস থেকে একটা গাছের চারা জন্মাবে। সেই গাছের চারা যখন লোকে দেখবে, ও-গাছের নাম দেবে 'পোস্ত'। ওই গাছ থেকে এমন একটা ওষুধ তৈরি হবে যার নাম হবে আফিম। মানুষ চিরকাল ধরে ওই ওষুধ খেয়ে সমস্ত রকমের রোগ সারাবে। কেউ কেউ ওই ওষুধ গিলে খাবে, কেউ কেউ বা ওটাতে আগুন জ্বালিয়ে ওর ধোঁয়া খাবে। ওটা খেলে মানুষের খুব নেশা হবে। আর ওটা যারা গিলে খাবে বা ওর ধোঁয়া টানবে তাদের সকলের মধ্যে ওই সব জন্তু-জানোয়ারের গুণ থাকবে। যেমন তারা ইঁদুরের মতো চালাক হবে, বেড়ালের মতো দুধ খেতে ভালবাসবে, কুকুরের মতো ঝগড়াটে হবে, হনুমানের মতো কুৎসিত হবে, শুয়োরের মতো অসভ্য হবে আর রানীর মতো মেজাজি হবে—''

বাবা গল্প শেষ করলেন। বললেন, ''এই হল আফিমের জন্ম-কথা। হরিহর মুখুজ্যে এই রকম মানুষই ছিল, তোমরা তো সবাই তা দেখেছ, আমি আর কী বলব। তাই আমি হরি-হরকে অনেকবার আফিম ছেড়ে দিতে বলেছিলুম, কিন্তু যার যা নিয়তি তা কে খণ্ডাবে?''

ছবি অলোক ধর

রাজধানী এক্সপ্রেসের হত্যারহস্য

সমরেশ বসু

দিল্লি যাওয়ার মুশকিল আসান

গোগোল একটা বিষয় বেশ ভাল বুঝেছে। স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির আগে ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা শেষ হয়ে রেজাল্ট বেরিয়ে যায়। তারপরে কোথাও বেড়াতে বেরোবার মতো আনন্দ আর নেই। কিন্তু পুজোর ছুটিটা ওর কাছে একটু গোলমালের মনে হয়। কারণ, পুজোর ছুটি শেষ হওয়া মানেই অ্যানুয়াল পরীক্ষার ধাক্কাটা যেন মাথায় এসে লাগতে আরম্ভ করে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ পুজোর ছুটি শেষ, আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই অ্যানুয়াল পরীক্ষার শুরু। পড়াশুনো যত ভাল করেই করা যাক, ছুটি শেষ হতে না হতেই পরীক্ষার শুরু। বেশ একটু ভাবিয়ে তোলেই। অ্যানুয়াল পরীক্ষা বলে কথা! রিভাইজের ব্যাপারটা থাকবেই। নতুন পড়া তখন সামান্যই থাকে। গোটা বছরের পড়াগুলো সবই নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হয়।

অবশ্য ফার্স্ট টার্মের পরে স্কুল খুললে, উইকলি পরীক্ষাগুলো মনোযোগ দিয়ে দিতে পারলে, অ্যানুয়াল পরীক্ষার ভিতটা বেশ মজবুত থাকে। অ্যানুয়ালের পরেই নতুন ক্লাসে প্রমোশন, আর নতুন নতুন বই। তারপরে শীতের ছুটিটাও ভালই উপভোগ করা যায়। কিন্তু নতুন নতুন বইয়ের নতুন নতুন বিষয় মনকে এমন টানে, তার মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনাও থাকে। তা ছাড়া, শীতের সময়টা গোগোলের কলকাতাকেই ভাল লাগে বেশি। শীতের সময়টা কলকাতা যেন নতুন নতুন উৎসবে মেতে ওঠে। ময়দানে নানারকমের একজিবিশন তো লেগেই থাকে। যেমন বইমেলা কুটিরশিল্প প্রদর্শনী, আরও নানারকমের উৎসব। তার সঙ্গে আছে ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, বিদেশের খেলোয়াড়দের আগমন আর দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার উত্তেজনা। তা ছাড়া, বড়দিন, ইংরাজি বছরের প্রথম দিনে বাবা-মা'র সঙ্গে কোথাও-না-কোথাও বেড়াতে যাওয়া আছেই। চিড়িয়াখানা জাদুঘর নয়, ওসব তো অনেকবার দেখা হয়েছে। তবু চিড়িয়াখানা বরাবরই ভাল লাগে। কেবল কলকাতার নয়, যেখানেই যাওয়া যাক। আর জাদুঘরের তো কথাই নেই। ভাল লাগার থেকেও, জাদুঘর নিয়েই গোগোলের কৌতূহল বেশি। যদিও ও এখন নিজেকে যথেষ্ট বড় ভাবতে আরম্ভ করেছে, আর ওর এই এগারো বছর বয়সে বুঝতে পারে, জাদুঘরের প্রতিটি বিভাগে আর ঘরে ঘরে সারা জীবন ঘুরে দেখলেও, দেখা আর জানা শেষ হবে না।

যাই হোক, ছুটির ব্যাপারে শীতকালটা ওর কলকাতাতেই ভাল লাগে। বাবার ছুটি থাকলে, কাছেপিঠে, কয়েকদিনের জন্য সুন্দরবন বা শান্তিনিকেতন, দিঘায় বা বেথুয়াডহরির ডিয়ার পার্কে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দও কম নয়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জমে আছে অনেক আশ্চর্য ছোটখাটো সব ঘটনা। মোটের ওপর, শীতকালের ছুটিটা কলকাতায় আর কাছেপিঠে ঘুরে বেড়াতেই গোগোলের ভাল লাগে। যদিও শীতের ছুটিটা লম্বা কিছু কম নয়, এক মাসের ওপর। তবু। শীতের সময় পাহাড়ে যাওয়ার অসুবিধা, কারণ শীতের সময় পাহাড়ের লোকেরাই সমতলে নেমে আসে। গোগোল বাবা-মার সঙ্গে, শীতের সময় দু-একবার সমুদ্রের ধারেও বেড়াতে গিয়েছে, কিন্তু শীতের সময় সমুদ্র যেন কেমন ঝিমিয়ে থাকে। বাবা-মা'র হাত-পা জড়িয়ে ধরে স্নানেও তেমন আনন্দ নেই। আশপাশের গাছপালাগুলো যেন পাতা-ঝরা ন্যাড়া-ন্যাড়া। গরমে বা পুজোর ছুটিতে অনেক ভাল লাগে। কিন্তু পুজোর ছুটি মানেই, মাথার মধ্যে যেন অ্যানুয়াল পরীক্ষার ঘণ্টা বাজতে থাকে।

গোগোলের কাছে, গরমের ছুটিতেই বাইরে বেড়াতে যাবার আনন্দ বেশি। গরমে কাশ্মীর দার্জিলিং কালিম্পং বেড়ানো হয়ে গিয়েছে। বাবা বলেছেন, একবার কুলুভ্যালি আর ডাল-হৌসি পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। গোগোল অবশ্য বাবাকে বলে রেখেছে, জিম করবেট যে-সব পাহাড়ে জঙ্গলে মানুষখেকো
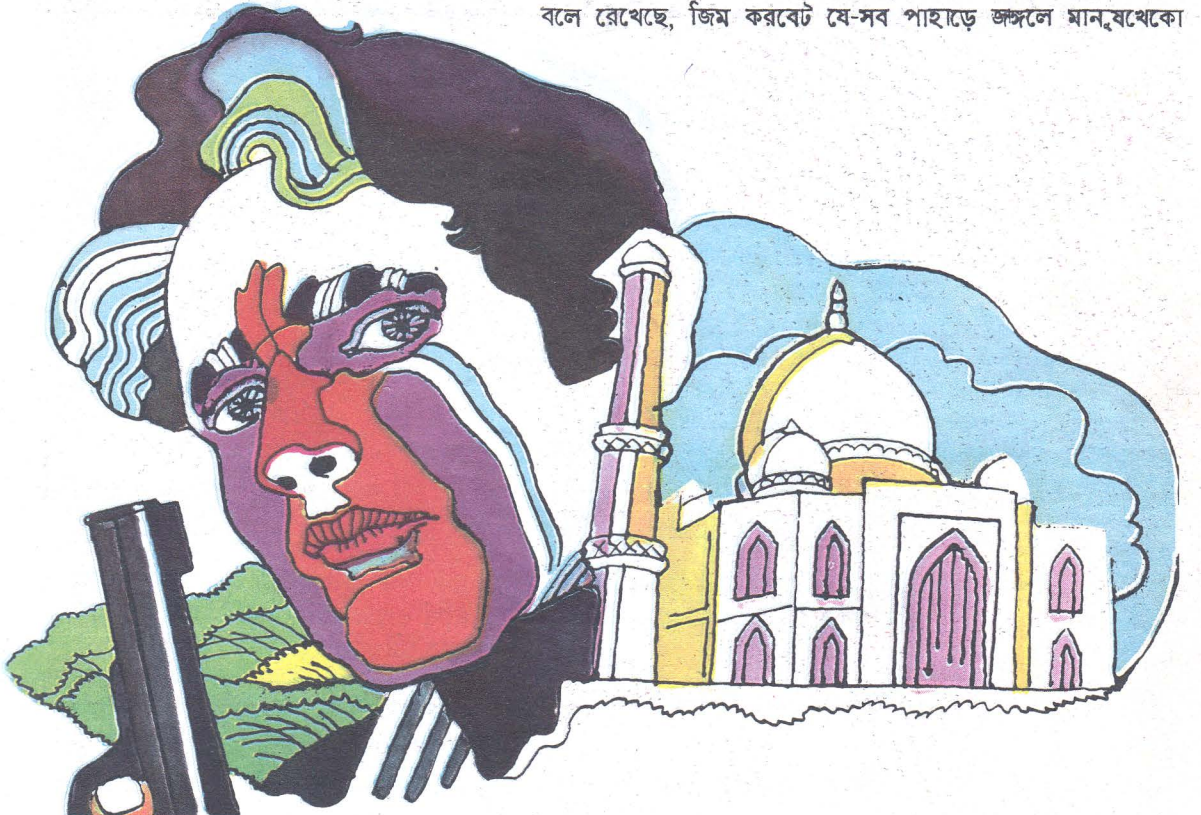
বাঘ শিকার করে বেড়িয়েছেন সেই সব পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াতে যাবে। বাবা হেসে বলেছেন, "সব বেড়ানোই যে আমার সঙ্গে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের দেশটা এত বড়, আর এত দেখবার বেড়াবার জায়গা আছে, ছেলেবেলাতেই সব শেষ করে উঠতে পারবে না। যেমন, ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশ তোমার দেখাই হয়নি। এ দেশের বিশাল সব জঙ্গল তুমি এখনও দেখনি। বড় হয়ে, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি নিজেই অনেক জায়গায় বেড়াতে যেতে পারবে। হয়তো এখন আমাদের সঙ্গে যে-সব জায়গা দেখছ, বড় হয়ে সেসব জায়গা দেখলে, অন্যরকম লাগবে। তবে সে হল ভবিষ্যতের কথা।"

গোগোল বাবার কথাগুলো ভেবে দেখেছে। অবশ্য ও জানে না, বড় হয়ে ও যদি আবার কাশ্মীর যায় বা দার্জিলিং কালিম্পং, পুরীর সমুদ্রের ধারে যায়, তবে অন্যরকমটা কী লাগবে!

যাই হোক, গত বছরের গরমের ছুটিটা সব দিক দিয়েই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। আপাতত গত বছরের গরমের ছুটির দিনগুলোতেই ফিরে যাওয়া যাক। যে-কারণে, গোগোল জুন মাসের এই দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরছে। গরমের ছুটিতে দিল্লি, কেউ ভাবতে পারে?

ভাবতে না পারলেও অনেক ঘটনা ঘটে যায়। গত বছরের গরমের ছুটিটাও ভাবতে না পারার মতোই ঘটে গেল। ছুটির আগে থেকেই বাবা-মা'তে শলাপরামর্শ চলছিল, কোথায় যাওয়া যায়? বাবার খুব ইচ্ছে ছিল জঙ্গল দেখতে যাবেন। তাঁর এক বন্ধু থাকেন উড়িষ্যার রাউরকেলায়, চাকরি করেন স্টীল প্ল্যান্টে। তিনি বাবাকে অনেকবারই রাউরকেলায় বেড়াতে ডেকেছেন, বলেছেন সেখানে গেলে, গাড়ি চেপে আশেপাশে অনেকগুলো গভীর জঙ্গলে বেড়ানো যাবে।

কিন্তু গরমের সময়ে, জঙ্গলে বেড়াতে যেতে মায়ের তেমন ইচ্ছা ছিল না। বিশেষ করে উড়িষ্যা বা ছোটনাগপুর এলাকায়। গরমে নাকি কষ্ট পেতে হবে। ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা আর পড়া-শুনোর মধ্যেই, বাবা-মার আলোচনা গোগোলের কানে কিছু কিছু ঢুকেছিল। বাবার মুখে, বাঘ হাতি হরিণ ময়ূর বন-মোরগের কথা শুনে, গোগোলের মনটা সেদিকেই টানছিল। যদিও উত্তরবঙ্গে হলং-এর জঙ্গলে, খোদ বুনো হাতির সঙ্গেই ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। বিরাট বুনো হাতিটাকে সবাই পাগলা হাতি বলত। গোগোলের তা মোটেই মনে হয়নি, বরং বন্ধুত্বই হয়ে গিয়েছিল।

বাবা-মায়ের শলাপরামর্শ যা-ই চলুক, গোগোলের পরীক্ষা শেষ হতেই, হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। ওর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে আর ছুটি হতে দুদিন মাত্র বাকি। বাবা জানালেন, বিশেষ জরুরি কাজে তাঁকে অন্তত দশ দিনের জন্য দিল্লি যেতে হবে। মে মাসের তখন মাঝামাঝি। ওই গরমে দিল্লি? মা তো নিজের বা গোগোলের যাবার কথা ভাবেননি মোটেই, বাবার কথা ভেবেই রীতিমত চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, মে মাসের দিল্লির গরমে বাবা থাকবেন কী করে!

বাবা হেসে মাকে বললেন, "কেন, মে মাসে কি দিল্লিতে লোকে থাকে না? আমি তো শুনেছি, আমাদের এখানকার প্যাচ-পেচে গরমের থেকে দিল্লির শুকনো গরমে কষ্ট কম হয়। তবে, দুপুরে বাইরে বেরোনো চলে না। ওখানে গরম বাতাসের ঝড় চলে, যাকে বলে লু। কিন্তু সে-সময়টা তো আমি থাকব অফিসের ঠান্ডা এয়ারকন্ডিশনড্ ঘরে। গরম টেরই পাওয়া যাবে না।"

মা বললেন, "আর রাত্রে? আমি তো আমার জ্যাঠতুতো দাদা-বউদির মুখে শুনেছি, দিল্লিতে তাঁরা রাত্রে ছাদে খাটিয়া পেতে শোন।"

বাবা তবু হেসে বললেন, "আহা, তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি যাচ্ছি অফিসের কাজে। আমাদের অফিসের একটা বেশ বড় গেস্টহাউস আছে, যার প্রত্যেকটা শোবার ঘরেই এয়ারকুলার বসানো আছে। তা ছাড়া ফ্যান তো আছেই। বন্ধুদের মুখে শুনেছি, গেস্ট-হাউসের শোবার ঘরে নাকি বেশ আরামেই কেটে যায়। তা ছাড়া তুমি তোমার যে-জ্যাঠতুতো দাদার কথা বললে, যিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, তাঁর একবারের একটা কথা আমার বেশ মনে আছে।"

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী কথা বলো তো?"

বাবা বললেন, "তোমার জ্যাঠতুতো দাদা বলেছিলেন, সুন্দর-বনে গেলেই যেমন বাঘ খেয়ে ফেলে না, তেমনি দিল্লির গরমে থাকলেই মানুষ মরে যায় না। গরমের সময়েও দিল্লির আবহাওয়া বেশ এনজয় করা যায়। একটু বৃষ্টি নামলে তো কথাই নেই। তা ছাড়া দিল্লি এখন আর সে-দিল্লি নেই, কলকাতার থেকেও দিল্লি বেশি সবুজ, সারা পৃথিবী থেকে গাছপালা এনে সাজানো হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না, দিল্লি হল ভারতের রাজধানী।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, দাদা-বউদির মুখে সেরকম কথাও শুনেছি বটে। বউদি তো আমাকে বলেছিলেন, বরং দিল্লির প্রচণ্ড শীতের থেকে কলকাতার শীতটা ভাল লাগে।"

বাবা বললেন, "তা হলেই ভেবে দেখ, দিল্লির গরমকে ভয়ের কোনো কারণই নেই। আমাকে তো অফিস থেকে বলা হয়েছে আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে আর গোগোলকেও নিয়ে যেতে পারি। গেস্ট হাউসেই থাকব। অফিসের গাড়িও চাইলে পাওয়া যাবে। তোমরা দিল্লিটা, আর তার আশেপাশে দেখে নিতে পারবে।"

মা বললেন, "রক্ষে করো, এই গরমে আমি দিল্লি যেতে পারব না।"

গোগোলের চোখের সামনে ভেসে উঠল, দিল্লি আর তার আশেপাশে সব ঐতিহাসিক কেল্লা মসজিদ মিনারের বইয়ে-দেখা ছবি। ওর মনে খুব উৎসাহ আর কৌতূহল জেগে উঠল। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, আমরা কি সত্যি সব ঘুরে ঘুরে দেখতে পাব?"

বাবা বললেন, "না পাবার তো কোনো কারণ দেখছিনে। খবরের কাগজে তো দেখি, আজকাল বারো মাসই লোকে দিল্লিতে যায়। তা সে কাজেই হোক, আর বেড়াতেই হোক।"

গোগোল মাকে ধরল, "তা হলে চলো-না মা, এবার আমরা দিল্লি বেড়িয়ে আসি।"

মা কেমন ঠোঁট কুঁচকে বললেন, "যেমন বাবা তেমনি ছেলে। আমি এ-সবের কিছু জানিনে।"

মা একথা বলেই সামনে থেকে চলে গেলেন। গোগোল তাকাল বাবার দিকে। বাবার চোখে হাসির ঝিলিক, তিনি মায়ের দিকে দেখিয়ে, গোগোলকে একটু ইশারা করে তাড়াতাড়ি মাকে বললেন, "আমি আর দেরি করতে পারছিনে, অফিসে বেরোচ্ছি। হাতে আর মাত্র তিনদিন সময়। যাবার সময় আমাকে প্লেনেই যেতে হবে। আজ মে মাসের সতেরো তারিখ। দিল্লিতে একুশ তারিখে আমার কাজ। কুড়ি তারিখে আমাকে পৌঁছুতেই হবে। তোমরা যদি যাওয়া ঠিক কর, তা হলে, দুপুরের মধ্যে আমাকে অফিসে একটা টেলিফোন করে দিও, তোমার আর গোগোলের প্লেনের টিকেটও কেটে রাখতে বলব।"

মা খাবার ঘর থেকে বললেন, "আমি এখন কিছুই বলতে পারিনে।"

বাবা তখন অফিসে বেরোবার জন্য তৈরি ছিলেন। বসার ঘরের টেবিলের ওপর থেকে অ্যাটাচি কেসটা হাতে তুলে নিয়ে বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। গোগোল তখনও

বাবার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বাবা যেন তা বুঝতেই পেরে-ছিলেন, তাই দরজার বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে, গোগোলের দিকে একবার তাকিয়ে, খাবারের ঘরের দিকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। গোগোল পরিষ্কার বুঝতে পারল, ওর যাওয়াটা সবই মায়ের ওপর নির্ভর করছে। মা গেলে, ওর যাওয়া হবে। বাবা ইশারায় সে-কথাটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। তার মানে, বাবা মনে মনে রাজি। গোগোল মাকে রাজি করাতে পারলেই, দিল্লি যাওয়া আর ঠেকায় কে?

কিন্তু ব্যাপারটা খুবই কঠিন। গোগোলের কাছে "হু উইল বেল দ্য ক্যাট" নয়, "হাউ টু বেল দ্য ক্যাট?" মায়ের কাছেই গোগোলের যত আবদার, অথচ মাকেই ওর ভয় বেশি। অবশ্য বাবার কাছেও ওর আবদার কম নয়, বা বাবাকে ভয়ও পায়। কিন্তু বাবা কখনোই প্রায় ভয় দেখান না। সে-রকম অবসরও বাবার নেই। গোগোলের সময়টা বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই বেশি কাটে। তাই, ওর যে-কোনো আবদারই মা বিবেচনা করেন, ওর চলাফেরা খেলাধুলো সব বিষয়েই মায়ের চোখ থাকে বেশি। মায়ের বকুনিও তাই বেশি খেতে হয়।

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাবার পরেই গোগোলের স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হয়। তবুও একবার খাবারঘরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল, মা কী করছেন। মা তখন রান্নাঘরে, কাজের লোক বঙ্কিমদাকে কিছু বলছিলেন। সেখান থেকেই একবার গোগোলকে দেখলেন। গোগোল সরে এল। ও জানে, মা এখুনি চানের তাড়া দেবেন। স্কুলের গাড়ি এসে পড়লে আর উপায় নেই। অবশ্য আর মাত্র দুদিন স্কুলে যেতে হবে। উনিশ তারিখে একবার গিয়ে কেবল রেজাল্টটা নিয়ে আসতে হবে।

মা হঠাৎ বসবার ঘরে ঢুকে গোগোলকে দেখে অবাক আর বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ কী, তুমি এখনও এ ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছ? যাও যাও, তাড়াতাড়ি চান করে স্কুলের পোশাক পরে নাও, আমি তোমার খাবার বাড়ছি।"

গোগোল যা-ও বা দিল্লি যাবার কথাটা বলবে ভেবেছিল, মায়ের ধমক খেয়ে কিছুই বলতে পারল না। তাড়াতাড়ি চান করে, স্কুলের পোশাক আর ব্যাজ এঁটে নিয়ে, বইয়ের ব্যাগ গুছিয়ে খাবারঘরে খেতে এল। মা ওর জন্য টেবিলে খাবার বেড়েই বসে-ছিলেন। গোগোল খেতে বসেও দিল্লির কথাই ভাবছিল, আর খাবার নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করছিল।

মা বলে উঠলেন, "কী হল তোমার? স্কুলের গাড়ি আসার সময় হয়ে গেল, এখনও খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছ? তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।"

গোগোল বলল, "আমার তেমন খিদে নেই।"

মা বললেন, "খিদে নেই বললে তো হবে না। সকালে তুমি অন্য দিনের থেকে এমন কিছু বেশি খাওনি যে, এখন খেতে পারবে না। যা পার, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।"

গোগোল জানে, মায়ের কথা মোটেই মিথ্যে নয়। ও খেতে লাগল, কিন্তু মুখটা হয়ে রইল ভার। কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে, বেসিনের কাছে হাত ধুতে যাবার আগেই, আর থাকতে না পেরে বলল, "মা, বাবা তো বলছেন, কোনো কষ্ট হবে না। চলো-না, এবারের সামার ভ্যাকেশনে দিল্লিতেই বেড়িয়ে আসি।"

মা অমনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, তোমার মুখ ভার, খিদে নেই কেন, সবই আমি বুঝেছি। যাও যাও, হাত ধুয়ে নাও, মনে হচ্ছে স্কুলের গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

গোগোল মনে মনে খুবই হতাশ হয়ে বেসিনের সামনে গিয়ে কলের মুখ ঘুরিয়ে জলে মুখ ধুয়ে নিল। মায়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বইয়ের ব্যাগ দু হাতের পিছনে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বাইরের ঘরে এল। মা সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "খুব তো আমার ওপর রাগ দেখানো হচ্ছে। ভেবে দেখেছ কি, বাবার কাজ মাত্র দশ দিনের। দশ দিনে দিল্লি দেখা বেড়ানো, সব হবে তো?"

গোগোল সে কথাটা ভাবেনি। বরং মা কোন্ দিক থেকে ভাবছেন, তা ও বুঝতেই পারেনি। বলল, "তবে বাবা তোমাকে আমাকে নিয়ে দিল্লি যাবার কথা বলল কেন?"

মা গোগোলের মাথায় ঠোঁট ছুঁইয়ে বললেন, "সে-কথা তোমার বাবা-ই জানেন। আমি একবার টেলিফোনে জিজ্ঞেস করে দেখব।"

নীচের রাস্তার মোড় থেকে তখন স্কুলের গাড়ির চেনা হর্ন ভেসে এল। গোগোল তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বঙ্কিমদা তার আগেই ছুটে এসে দরজার ছিটকিনি খুলে ঘরের বাইরে গিয়ে লিফটের বেল টিপতে আরম্ভ করেছে। বঙ্কিমদা নীচে গিয়ে গোগোলকে বাসে তুলে দিয়ে আসে। যদিও গোগোল অনেকদিন বারণ করেছে, কারণ ও এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। ওকে আর স্কুলের বাসে তুলে দিয়ে আসার দরকার হয় না। কিন্তু মা সে-কথা শুনতে চান না।

গোগোল দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। মা যে বাবাকে অফিসে টেলিফোন করবেন, সেই আনন্দে মাকেই চুমো খেতে ভুলে গিয়েছে। দরজার কাছ থেকে আবার মায়ের দিকে ছুটে আসতে, মা নিজেই এগিয়ে এলেন। গোগোল মায়ের গালে চুমো খেয়ে, দৌড়ে লিফটের কাছে চলে গেল। লিফটও তখন উঠে এসেছে। ও বঙ্কিমদার সঙ্গে নীচে নেমে গেল।

স্কুলে গেলেও গোগোলের মনটা পড়ে রইল বাড়িতেই। অবশ্য ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষার পরে এখন ক্লাসে তেমন পড়া নেই। ছুটির হাওয়া লেগে গেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার উপায় নেই। তার ফলে, বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই প্রায় বিকেল চারটে। বাড়ি ফিরেই গোগোল মায়ের খোঁজ করল। দেখা গেল, মা গোগোলের পড়ার টেবিলে বসে কী লিখছেন। গোগোল অবাক হয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী লিখছ মা?"

মা মুখ না তুলে লিখতে লিখতেই জবাব দিলেন, "চিঠি।"

গোগোল যে-কথাটা জিজ্ঞেস করবে ভাবল, মায়ের চিঠি লেখা দেখে, সে-কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারল না। বইয়ের ব্যাগটা টেবিলের এক পাশে রাখতে রাখতে মায়ের মুখের দিকে দেখল। মা বললেন, "স্কুলের জামাপ্যান্ট বদলে তুমি খেতে যাও, বঙ্কিমদা খেতে দেবে।"

গোগোল সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চিঠি লিখছ মা?"

মা বললেন, "দিল্লিতে আর আগ্রায় তোমার দুই মামাকে।"

গোগোল মায়ের কথা শুনে আর নড়তে পারল না। ওর মনটা কেমন চনমন করে উঠল। জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "কেন মা, দিল্লি আর আগ্রার মামাদের লিখছ কেন?"

মা বললেন, "যাওয়া যখন হচ্ছেই, তখন আগে থেকে চিঠি দিয়ে জানানোর দরকার নেই?"

গোগোল প্রথমটা যেন মায়ের কথা বুঝতেই পারল না। তার-পরেই মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে ওঠার মতো কথাটা ওর মাথায় ঝলসে উঠল। প্রায় দমবন্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে, বাবার সঙ্গে আমরা দিল্লি যাচ্ছি?"

মা বললেন, "তা যাচ্ছি। তবে তোমার বাবা চলে এলে আমরা তোমার মামাদের বাড়িতেই থাকব।"

গোগোল প্রায় হাততালি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু মায়ের চিঠি-লেখায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে, বা মা বিরক্ত হতে পারেন। এর পরে আর বুঝতে বাকি থাকে না, বাবার সঙ্গে মায়ের টেলিফোনে যা কথাবার্তা বলার তা বলা হয়ে গিয়েছে। ও কিছু না বলে এক ছুটে চলে গেল ঘরের এক পাশে। কোনো-রকমে স্কুলের পোশাক আর ব্যাজ খুলে, অন্য জামাপ্যান্ট পরে,

ছুটল খাবার-ঘরের দিকে। তখন মাথায় একটি মাত্র ভাবনা— খেয়ে নিয়ে, নীচে গিয়ে বন্ধুদের দিল্লি যাবার খবরটা দিতে হবে।

দিল্লি থেকে ফেরা— রাজধানী এক্সপ্রেস

জুন মাসের আজ তেরো তারিখ। গোগোল রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরছে। মায়ের জ্যাঠতুতো দাদা, গোগোলের বড়মামা আর বড়মামিমা, তাঁদের ছোট মেয়ে টুলটুলি, গোগোলেরই সমবয়সী, বাবা-মায়ের সঙ্গে গোগোলদের তুলে দিতে এসেছে। বড়মামিমা আর টুলটুলি ট্রেনের কামরার মধ্যে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। গোগোল বড়মামার সঙ্গে প্ল্যাটফরমে বেড়াচ্ছে। গাড়ি ছাড়তে তখনও প্রায় আধ ঘণ্টার মতো দেরি আছে।

গোগোল মাইকের ঘোষণা শুনতে পাচ্ছে, ইংরেজি আর হিন্দিতে মাঝে মাঝেই বলা হচ্ছে, "একশো দুই নম্বর ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেস আঠারো ঘণ্টা পনেরো মিনিটে ছাড়বে।" এইট্টিন আওয়ারস ফিফটিন মিনিটস কাকে বলে, গোগোল বড়মামার কাছ থেকে আগেই জেনে নিয়েছিল। ওর আসলে মজা লাগছিল, মা যে-কামরার মধ্যে চেয়ার-কারে যেখানে বসে আছেন, সেটা ও ভিতরে দেখে এসেছে। ভিতর থেকে বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে সব-কিছুই দেখা যাচ্ছিল। অথচ বাইরে থেকে কামরার ভিতরের কিছুই কাচের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে না।

দিল্লিতে আসবার সময় এত তড়িঘড়ি তৈরি হতে হয়েছিল, আর এয়ারবাসে করে আকাশের ওপর দিয়ে মাত্র সোয়া দু'ঘন্টায় দিল্লি পৌঁছে গিয়েছিল। একটা উত্তেজনা ছাড়া গোগোল কোনো রকম মজাই পায়নি। প্লেনে চেপে কোথাও হুসহাস উড়ে যাওয়ার মধ্যে তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না। একমাত্র জানালার কাছে বসে, নীচের দিকে তাকিয়ে, অদ্ভুত রঙচঙে স্থলভূমিকে দেখা ছাড়া। অবশ্য আকাশের অনেক রকম রঙও দেখা যায়। কিন্তু সব ব্যাপারটাই খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

আসবার সময় তৈরি হবার জন্য মাকেই কষ্ট পেতে হয়েছিল বেশি। হাতে মাত্র দু দিন সময় ছিল। বাবা তো কেবল তাঁর অফিসের কাগজপত্র গোছাতে আর টেলিফোনে হাজারবার কথা বলতেই ব্যস্ত ছিলেন। আর সব-কিছু গুছিয়ে নেবার ধাক্কা মাকেই সামলাতে হয়েছিল। দমদম এয়ারপোর্টেও সব-কিছুই তাড়াতাড়ি। অবশ্য গোগোলের সে-অভিজ্ঞতা আগে থেকেই ছিল। শিলং, দার্জিলিং বা বম্বে যাবার সময় প্লেনে উড়েছিল। আগ্রাতেও গিয়েছিল প্লেনে করেই।

আজ গোগোল খুব খুশি। বাবা অবশ্য ওকে আর মাকে নিতে আসতে পারেননি। কিন্তু অসুবিধেও কিছু হয়নি। দিল্লির রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বড়মামা বেশ ভাল পোস্টেই চাকরি করেন। তাঁর বাড়িও আছে। আগ্রাতে আছেন বড়মামারই ছোট ভাই, মেজমামা। কিন্তু মেজমামা একেবারে অন্য মানুষ। তিনি আগ্রা কলেজে পড়ান, আর ভাল এস্রাজ বাজান। মেজমামিমা গান করেন, উনি এস্রাজ বাজান। তা ছাড়া নিজেও ভাল গাইতে পারেন। অথচ বেড়াতে বেরোলে মেজমামা যেন গোগোলের মতোই ছোট হয়ে যান। ছুটোছুটি, হাততালি, কিছু আর বাকি রাখেন না।

বড়মামা অবশ্য ততটা ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করেন না। কিন্তু খুব হাসিখুশি লোক। বাবার সঙ্গে দশ দিনে, প্রায় কিছুই দেখা হয়নি। বাবা এসেছিলেন বিশেষ কাজে। সকাল বেলা সামান্য জলখাবার খেয়ে, অফিসের গাড়িতে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন বিকেলে। বড়মামা দিল্লিতে না থাকলে, সব মাটি হয়ে যেত। গোগোল তখন বুঝেছিল, মা কেন দিল্লি আর আগ্রাতে মামাদের চিঠি লিখেছিলেন।

তবে, মা যেমন ভেবেছিলেন, দিল্লিতে গরমে খুবই কষ্ট হবে, তা হয়নি। বরং মা বলেছেন, "দুপুরের গরম হাওয়াটা বাদ দিলে, দিল্লির গরমে তো তেমন কষ্টই নেই" ...অবশ্য বাবার অফিসের গেস্টহাউসটাও খুবই সুন্দর। বড় দোতলা বাড়িটা নতুন দিল্লির বেশ খোলামেলা জায়গায়,একটা চওড়া রাস্তার ওপরে। সামনেই অনেকখানি খোলা জায়গা, বিরাট মাঠ আর জঙ্গল বলা যায়। শিগগিরই নাকি সেই মাঠ আর জঙ্গলকে পার্ক তৈরি করা হবে। আর অনেক দূরে, আকাশের গায়ে একটা পাতলা রেখা দেখা যায়। গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার বৈজুনাথ গোগোলকে বলেছে, ওটা আরাবল্লী পাহাড়ের রেখা। বাবাও অবশ্য পরে তাই বলেছিলেন।

গেস্টহাউসের উপরে-নীচে ছ'টা শোবার ঘরের প্রত্যেকটাতেই এয়ারকুলার লাগানো ছিল। তার সঙ্গে যখন ফ্যান ঘুরত, ঘর একেবারে ঠান্ডা হয়ে যেত। ওপরের বসবার ঘরে ছিল টেলিভিশন। পাশেই খাবার-ঘর। মস্ত বড় একটা বিলিতি ফ্রিজ ছিল সেই ঘরে। গোগোলরা থাকত দোতলার একটা ঘরে। ঘরের মধ্যেই লাগোয়া বাথরুম। সামনে গেলেই ছাদঢাকা লম্বা-চওড়া বারান্দা। নীচে সবুজ লন আর তার পাশে ফুলের বাগান।

গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার বৈজুনাথকে গোগোলের ভাল লেগেছিল, তার মস্ত মুখে ছোট ছোট চোখের হাসি আর গমগমে গলার কথার জন্য। তবে কিষেণ সিংয়ের রান্নার কোনো তুলনাই হয় না। সে একজন গাড়োয়ালি হয়েও এমন চমৎকার বাঙলা রান্না করতে পারে, মা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো অবাঙালি যে ও-রকম বাঙলা রান্না করতে পারে, মা যেন বিশ্বাসই করতে পারেননি। মায়ের জিজ্ঞাসার জবাবে সে জানিয়েছিল, যে-সব বাঙালি মাঈজিরা গেস্টহাউসে বেড়াতে আসেন, তাঁদের কাছ থেকেই সে বাঙলা রান্না শিখেছে। তারপরেই সে মাকে বলেছিল, "আপনিও আমাকে কোনো বাঙলা রান্না শিখিয়ে দিয়ে যান।"

অবশ্য কিষেণ সিং কথাগুলো মাকে হিন্দিতে বলেছিল। মা পড়ে গিয়েছিলেন ফাঁপরে। এমন কোনো বাঙলা রান্নাই ছিল না, যা কিষেণ সিং জানত না। শেষ পর্যন্ত মা তাকে বড়ির ঝাল রান্না শিখিয়েছিলেন। তবে দিল্লিতে বেড়াতে আসার সব আনন্দই মাটি হয়ে যেত, যদি বড়মামা না থাকতেন। দশদিন তো দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছিল। বাবাকে কলকাতায় ফিরতে হয়েছিল। কথাবার্তা আগে থেকেই হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, বাবা কলকাতায় ফিরে যাবার দিনই, গোগোল আর মাকে বড়মামা তাঁর ডিফেন্স কলোনির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বড়মামার বাড়িও বিরাট বাড়ি। সেখানে জুটেছিল বড়মামার দুই ছেলে, গোগোলের
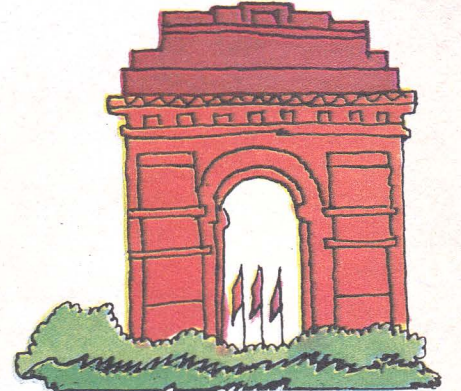
দুই দাদা। বড়মামাতো দাদার নাম টুপু, সে ডাক্তারি পাস করে হসপিটালের হাউস সার্জন। ছোটজনের নাম কচি। টুপুদা ডাক্তার। কচিদা জওহরলাল ইউনিভারসিটিতে পড়ে। টুলটুলি স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্রী।

মে মাসের শেষের দিকেই বৃষ্টি নেমেছিল। দিল্লির হাওয়া বেশ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। বড়মামার ছুটির দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হত না। তিনি অফিসে গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন, আর গোগোল কখনও মা, অথবা একলাই কচিদার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। টুলটুলিও সঙ্গে থাকত। ছুটির দিনের ব্যাপার তো ছিল আলাদা। সকাল থেকেই বাড়ির বাইরে। লালকেল্লা থেকে শুরু করে কুতবমিনার, জামা মসজিদ থেকে শুরু করে হুমায়ুনস টম্ব, ফিরোজ শা কোটলা, জাহানারার কবর, কিছুই দেখতে বাকি ছিল না। কোনো কোনো দিন দুপুরে, এমন-কী রাত্রেও বাড়ির বাইরে খেয়ে ফেরা হত। দিনগুলো কেটেছিল যেন ঝড়ের বেগে।

আগ্রাতে মেজমামাকে ওদের যাওয়ার কথা আগেই জানানো হয়েছিল। বড়মামা মে মাসের শেষে, একদিনের ছুটি নিয়ে সবাইকে গাড়িতে তুলে, আগ্রায় গিয়েছিলেন। বড়মামার ডিফেন্স কলোনির বাড়ির তুলনায়, আগ্রায় মেজমামার বাড়িটা একেবারে অন্যরকম ছিল। অবশ্য দিল্লির সঙ্গে আগ্রা শহরেরও কোনো মিলই নেই। গোগোলের মনে হয়েছিল, আগ্রা পুরোটাই একটা ঐতিহাসিক পুরনো জায়গা, যেখানে নতুন করে যেন কিছুই হয়নি। দিল্লিতে যেমন পুরনো কীর্তি অনেক থাকা সত্ত্বেও, ইংরেজ আমলের প্রাসাদ শহর, তারপরে স্বাধীনতার পরে আবার নতুন করে গড়ে ওঠা দিল্লি, সব মিলিয়ে, যে-দিকেই তাকানো যাক, নতুন-পুরনোয় একেবারে ছড়াছড়ি।

কিন্তু আগ্রাকে সে-রকম মনে হয়নি। দিল্লির সঙ্গে তো কোনো তুলনাই চলে না। মেজমামার বাড়িটা যে-পাড়ায়, সেটাকে মাঠের কাছাকাছি প্রায় একটা নিরিবিলি গ্রামের মতো বলা যায়। বাড়িটাও একেবারে অন্যরকম। একতলা বাড়িতে, অনেকগুলো ঘর। সামনের উঠোনটা কাঁচা, আশেপাশে কয়েকটা আম-জামের গাছ। উঠোনের একদিকে সন্ধ্যাকলি ফুলের ঝাড়ও ছিল। বাড়ির রক অনেক উঁচু, প্রায় ছ' ধাপ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত। আর সব ঘরগুলো ছিল, পাথরের মেঝে, পুরনো দেওয়াল, দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গি, আর দেওয়াল-আলমারি। বাড়ির পিছন দিকে বিরাট একটা বাগান। ফুলের গাছ সামান্যই ছিল। জুঁই আর বেলফুলের গাছ কিছু ছিল। আসলে আম জাম পেয়ারা, এসব গাছই ছিল বেশি। পেয়ারা জোটেনি, তবে, আম আর জাম জুটেছিল। পিছনের বাগানের দিকে, একতলা ঘরগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, তারই একটা ঘরের প্রায় মাঝখানে বিরাট এক ইঁদারা। তার একদিকে স্নানের ঘর, উলটো দিকেই রান্নাঘর।

গোগোল ওর জীবনে ও-রকম ইঁদারাওয়ালা ঘর দেখেনি। অথবা বলতে হয় ইঁদারা-ঘর। কপিকলের সঙ্গে দড়ি-বালতির ব্যবস্থা। জল তুলে দেবার লোক ছিল। মেজমামার বাড়িতে জল-কলের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এমনকী, খাওয়া হত ইঁদারার জলই। সে-জল যে কী ঠান্ডা আর মিষ্টি, যে না খেয়েছে তাকে বোঝানো যাবে না। জলকল, কমোড, বাথরুম, ফ্ল্যাশ ওসব দেখে দেখে, মেজমামার বাড়ির মতো একটা ইঁদারা-ঘর দেখে, গোগোল সত্যি খুশি হয়েছিল। ঘরটাও মোটেই ছোটখাটো নয়, বেশ বড়। দেওয়ালের ওপর দিকে, মোটা লোহার গরাদ দেওয়া জানালা দিয়ে ঘরে আলোও বেশ আসে। আগ্রা শহরের সঙ্গে মেজমামার বাড়িটা বেশ মানানসই।

গোগোলের কাছে দিল্লির থেকে আগ্রা ভাল লেগেছিল। তার কারণ, ওর মনে হয়েছিল, দিল্লির থেকে আগ্রাতেই যেন বাদশাহি ছাপটা বেশি আছে। আধুনিক শহর নয়। খোলা জায়গা, মাঠ, ছড়ানো জঙ্গল ভেড়ার পাল নিয়ে রাখালের ঘোরাফেরা, হঠাৎ-হঠাৎ উটের পিঠে মানুষ, সবই অন্যরকম। গোগোলরা আগ্রায় বড়মামার গাড়ি চেপে বেড়ালেও, কাঁচা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে টাঙা ছুটতে দেখেই ওর ভাল লেগেছিল বেশি। ওর শখ দেখে মেজমামা ওকে নিয়ে টাঙায় চেপে আগ্রা শহরে ঘুরেছেন।

আগ্রায় যমুনা নদীর ধারে তাজমহল দেখে গোগোল খুব একটা তাজ্জব হয়নি। তাজমহলের ছবি ওর এত দেখা ছিল, নতুন কিছুই মনে হয়নি। অবশ্য নীচে নেমে, যেখানে নাকি মমতাজের আসল কবরটি আছে, সেখানে নিজের গলার অবিকল প্রতিধ্বনি শুনে মজা লেগেছিল। কিন্তু তাজমহলে যমুনার ধারে দাঁড়িয়ে দূরে আগ্রার কেল্লাই ওর মনকে বেশি টেনেছিল। কেল্লাতে গিয়ে ওর ভালও বেশি লেগেছিল। কেল্লাতে গেলে কত কথা যে মনে পড়ে যায়। কেল্লার অনেক ঘটনা। তাজমহলে কোনো ঘটনা ঘটেনি। সত্যি কথা বলতে কী, দিল্লি শহরের বুকে লালকেল্লার থেকেও, আগ্রার কেল্লাই যেন গোগোলের ভাল লেগেছিল বেশি। কেমন একটা পুরনো ছাপ, পুরনো ইতিহাসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। মেজমামা অনেক ইতিহাসের গল্পও বলেছিলেন। বিশেষ করে যে-ঘরে শাজাহানকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সে-ঘরে গিয়ে গোগোল অনেক কিছু কল্পনা করেছিল। মেজমামা দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট পাথর বা আয়না দেখিয়ে বলে-ছিলেন "সম্রাট শাজাহান বন্দী অবস্থায় এ ঘরের এই পাথরে চোখ দিয়ে তাজমহল দেখতেন। তুমিও দেখতে পার।"

গোগোল সেই ছোট্ট পাথর বা কাচে চোখ রেখে অবাক হয়ে দেখেছিল, সত্যি, দূরের তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। মেজমামা বলেছিলেন, "শাজাহান বুড়ো বয়সে তো দূরের তাজ-মহল দেখতে পেতেন না, তাই এখান থেকে ও-ভাবে দেখতেন। তুমি এখনও বোধহয় মুঘলদের ইতিহাস পড়নি?"

গোগোল বলেছিল, "না।"

মেজমামা গোগোলকে শাজাহানের শেষজীবনের গল্প বলে-ছিলেন. তাঁর এক ছেলে ঔরংজেব তাঁকে কীভাবে বন্দী করে রেখেছিল। আর তিন ভাই, দারা সুজা মুরাদকে হত্যা করে. নিজেই বাদশা হয়ে বসেছিল। গোগোল খুব অবাক হয়েছিল। একটা লোক বাদশা হবার জন্য নিজের বাবাকে বন্দী করেছিল. আর নিজের ভাইদের মেরে ফেলেছিল? মেজমামার কাছে বৃদ্ধ শাজাহানের কথা শুনে, গোগোলের মনে কষ্ট হয়েছিল। ও এক-গাদা প্রশ্ন করেছিল মেজমামাকে। মেজমামা হেসে বলেছিলেন, "বড় হয়ে সব যখন বুঝতে পারবে, তখন সব কথার জবাব পাবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, বাদশা হবার জন্য অনেক খুন খারাপি আর রক্তারক্তি হয়েছে। সে-সব দারুণ দারুণ সব ঘটনা। যে-কোনো গল্প ফেলে ও-সব পড়তে আর জানতে ইচ্ছে করবে।"

তবে, আগ্রার কেল্লা থেকে যশোবন্ত সিং ঘোড়া নিয়ে নীচের কুয়োয় লাফিয়ে পালাবার ঘটনাটা শুনে, আর সেই জায়গাটা দেখে, গোগোলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল। কী সাহস! ঘোড়াটা বাঁচেনি শুনে গোগোলের মনটা খারাপ হয়েছিল। আগ্রার কেল্লার সব ঘটনার থেকে এই ঘটনাটাই গোগোলের মনকে বেশি নাড়া দিয়েছে।

গোগোল মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, কলকাতায় ফিরে সুযোগ পেলেই মুঘল আমলের ইতিহাস পড়তে হবে। যাই হোক, আগ্রার দুর্গ ওর খুবই ভাল লেগেছিল। তারপর একদিন গিয়েছিল ফতেপুর সিক্রি। সেটাও একটা দুর্গ, কিন্তু লালকেল্লা বা আগ্রার কেল্লা থেকে অন্যরকম। মেজমামা বলেছিলেন, ফতেপুর সিক্রি আসলে আকবরের তৈরি একটা প্রাসাদ। তবে বাদশাদের প্রাসাদ মানেই দুর্গ। গোগোলেরও ফতেপুর সিক্রি গিয়ে পাহাড়ের টিলার ওপরে প্রাসাদটাকে কেল্লাই মনে হয়েছিল। আর কেল্লা থেকে নীচে,

পরে একটা বড় মাঠ দেখিয়ে মেজমামা বলেছিলেন, এখানে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। সব দেখেশুনে গোগোলের মনে হয়েছিল, ও একটা অন্য যুগে ফিরে গিয়েছে। ইতিহাস পড়ে, বড় হয়ে আবার ওকে দিল্লি-আগ্রা আসতেই হবে।

এদিকে রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল। বড়মামার সঙ্গে ইতিমধ্যে কয়েকজন ভদ্রলোক কথা বলছিলেন। তাঁদের ধারণা, বড়মামা বুঝি কোথাও যাচ্ছেন। বড়মামা হেসে জানিয়ে দিলেন, তিনি তাঁর বোন আর ভাগনেকে তুলে দিতে এসেছেন। তারপরে গোগোলকে বললেন, "তোর মা আর মামিমা আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবে না, গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এল। চল্, সেই ফাঁকে তুই আর আমি কোল্ড ড্রিংকে গলা ভিজিয়ে নিই।"

গোগোল খুশি হয়েই বড়মামার সঙ্গে একটা দোকান থেকে ঠান্ডা কোকাকোলা খেয়ে নিল। তখনই ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠল, আর মাইকেও ইংরেজি আর হিন্দিতে ঘোষণা শোনা গেল। বড়মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "চল্ গোগোল, এবার তোর মামিমা আর টুলটুলিকে নামিয়ে নিয়ে আসি। এর পর দরজার কাছে ভিড় জমে যাবে।"

গোগোল বড়মামার সঙ্গে ট্রেনের কামরায় গিয়ে ঢুকল। ভিতরে বেশ ঠান্ডা। মামিমা তখন মায়ের সঙ্গে পাশের চেয়ারে বসে গল্প করছিলেন। বড়মামা এসে তাড়া দিতেই উঠলেন। টুলটুলি মা আর মামিমার কথা শুনছিল। মা চেয়ার থেকে উঠে বড়মামা আর মামিমাকে প্রণাম করলেন। দুজনেই 'থাক থাক' বলে হাসলেন। মামিমার চোখ তো বেশ ছলছলই করছে। গোগোল দেখল মায়ের অবস্থাও প্রায় সেইরকম।

টুলটুলি গোগোলের মাকে প্রণাম করতেই গোগোলের মনে পড়ে গেল, ওরও মামা-মামিকে প্রণাম করা উচিত। ও ঢিপঢিপ করে দুজনকে প্রণাম করল। মামিমা চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন, আর বড়মামা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বললেন, "শোনো বীরপুরুষ, হাওড়া স্টেশনে তোমার বাবা থাকবেন, কিন্তু গোটা রাস্তাটা তুমিই মাকে নিয়ে যাবে। পারবে তো?"

গোগোল ঘাড় কাত করে বলল, "খুব পারব।"

টুলটুলি হেসে উঠে বলল, "তুই তো আবার মস্ত বড় একজন গোয়েন্দা।"

গোগোল বলল, "আমি বুঝি বলেছি ?"

বড়মামা বললেন, "তুই বলবি কেন ? গোগোলের কীর্তি-কাহিনী তো আমরা খবরের কাগজেই পড়েছি।"

গোগোল লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল। কথাটা সত্যি, ওকে নিয়ে কোনো কোনো ঘটনা খবরের কাগজে বেরিয়ে গিয়েছে।

মা বললন, "ভারী বিরক্তিকর, আমার ওসব একটুও ভাল লাগে না।"

বড়মামা আর মামিমা হেসে উঠলেন, তারপরে শেষবার বিদায় নিয়ে টুলটুলির হাত ধরে দুজনেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠান্ডা কামরার মধ্যে তখন অনেকেই বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে। গোগোল বলল, "মা, আমি বড়মামাদের সঙ্গে দরজা অবধি যাচ্ছি।"

মা বললেন, "খবরদার, নেমো না।"

বড়মামা বললেন, "আমিই ওকে নামতে দেব না। তবে দরজার কাছে যা ভিড় হবে, তুই চিড়েচ্যাপটা হয়ে যাবি।"

বাইরে ফাইনাল বেল বেজে উঠল। লোকজন তাড়াহুড়ো করে নামতে লাগল। কামরার মধ্যে মাইকে তখন ইংরেজিতে গাড়ি ছাড়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। গোগোল দরজার কাছ অবধি পৌঁছতেই পারল না। লোকজন সব মাঝখানের করিডর দিয়ে ছুটোছুটি করছে। মাইকের কথাগুলো শুনলে প্লেন ওড়বার সময়ের কথা মনে পড়ে যায়।

গাড়ি নড়ে উঠতেই গোগোল বুঝতে পারল, চলতে আরম্ভ করেছে। ও দরজার কাছ থেকে সরে এসে, কামরার জানালা দিয়ে প্ল্যাটফরম দেখতে পেল। সেখানে অনেক মহিলা, পুরুষ হাত নাড়ছেন। কিন্তু তাঁরা তো কামরার ভিতরের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কামরার ভিতরের যাত্রীরাও হাত নাড়ছেন। গোগোল বড়মামা, মামিমা, বা টুলটুলি, কারোকেই দেখতে পেল না। ও দুদিকের আসনের মাঝখান দিয়ে মায়ের কাছে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ওর পাশ থেকেই একজন বাঙলায় বলে উঠল, "গোগোল যে! তুমি কি সামার ভ্যাকেশনে দিল্লি বেড়াতে এসেছিলে নাকি?"

গোগোল পাশ ফিরে মুখ তুলে দেখল, ওর আশেপাশে দু-তিনজন লোকের মধ্যে একজনের মুখে হাসি। কিন্তু তার চোখে কালো চশমা। অবশ্য খুব গাঢ় কালো কাচের চশমা নয়। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। গোগোলের মনে হল, সেই চোখের দৃষ্টি ওর মুখের দিকেই। মাথার চুলগুলো ছোট আর কপালের সামনের দিকে টেনে আঁচড়ানো। গোঁফদাড়ি দেখেই বুঝতে পারল, একেই বলে ফ্রেঞ্চকাট। গোগোল লোকটির দিকে তাকিয়ে খুবই অবাক হয়ে গেল, এরকম কোনো লোককে ও চেনে না, কখনও দেখেওনি। ও আশেপাশের আরও দু-একটা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। ভাবল, হয়তো ওর ভুল হয়েছে। অন্য কেউ ডেকেছে। তখনই সেই কালোচশমা ফ্রেঞ্চকাট আবার বলে উঠল, "তুমি বোধহয় ভাবছ, অন্য কেউ তোমাকে ডেকে কথা বলেছে। তা নয়, আমিই তোমাকে ডেকেছি।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ?"

লোকটির মুখের হাসি যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠল, বলল, "তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ?" গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "না তো ?"

লোকটি এবার শব্দ করে হেসে উঠল, বলল, "তোমার কোনো দোষ নেই, আমাকে না চিনতে পারারই কথা। এ-রকম বেশে তো দেখনি। ঠিক আছে, এখন তুমি বাবা-মা'র কাছে গিয়ে বোসো, তাঁরা নিশ্চয়ই তোমার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

গোগোল বলল, "বাবা তো সঙ্গে নেই, আমি আর মা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।"

লোকটি বলল, "তা হলে তো আর এক সেকেন্ডও দেরি করা উচিত নয়, তুমি মায়ের কাছে ফিরে যাও। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, তোমার মা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আমার সঙ্গে একবার এক জায়গায় তোমার দেখা হয়েছিল। কোথায় কীভাবে, সেটা যদি নেহাতই জানতে চাও, তা হলে পেছন দিকে যেখানে বার্থ আছে, সেখানে খাবার আগে একবার এসো, মনে করিয়ে দেব।"

লোকটি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। কথা শেষ করেই পিছন ফিরে চলে গেল। গোগোল একেবারে হতবাক! ওর মেমারি এত খারাপ না যে, একটা দেখা লোককে আবার দেখলে চিনতে পারবে না। ও-রকম ফ্রেঞ্চকাট মুখের, আর কপালের সামনে গোগোলদের মতো চুল টেনে আঁচড়ানো, কোনো লোকের সঙ্গেই ওর কখনও পরিচয় হয়নি। অথচ লোকটির কথাবার্তা বলার ভঙ্গি খারাপ নয়। ফ্রেঞ্চকাট না থাকলে হাসিটাও ভাল। তবু বিশ্বাস হয় না।

গোগোল ভাবতে ভাবতে মায়ের কাছে যেতেই মা ধমকে উঠলেন, "গাড়ি কখন স্টেশন ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে, তুমি এতক্ষণ দরজার ওখানে কী করছিলে?"

গোগোলের ঠোঁটের ডগায় লোকটির কথা এসে গিয়েছিল। কিন্তু ও তাড়াতাড়ি ঢোক গিলল। কারণ, ও জানে, ও-সব কথা শুনলেই মা বিরক্ত হবেন, আর গোগোলকে একলা বাথরুমেও যেতে দেবেন না। অথচ মাকে মিথ্যে কথা বলতেও খারাপ লাগে। তবু ওকে বলতেই হল, "লোকজন দেখছিলাম, আর একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম।"

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার

প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলীর অনন্য সব উপাদানগুলি আপনার চামড়ার গভীরে গিয়ে এমন বিপরীতভাবে কাজ করে, যাতে রঙ, ময়লা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়—খুব স্বাভাবিকভাবে, সযত্নে, নিরাপদে! ছ'সপ্তাহ নিয়মিত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী ব্যবহার করলে আপনার রঙ এমন ফর্সা হবে—যা নজরে পড়বে।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী ফর্সা হবার এক কোমল উপায়।

লিনটাস-FALOV.9 2415 BG

মা একটু রেগেই বললেন, "ও-সব আমি একদম পছন্দ করি না, তুমি ভালই জানো। যাও, নিজের জায়গায় বোসো।"

মা তাঁর পা একটু ঘুরিয়ে নিলেন। গোগোল জানালার পাশের চেয়ারে বসল। চেয়ার-কার কমপার্টমেন্টের এক দিকে তিনটি করে চেয়ার, আর একদিকে দুটো। মাঝখান দিয়ে চলাচলের রাস্তা। প্রত্যেকটা কামরারই সামনে-পিছনে দরজা। দরজার বাইরে বাথরুম। গোগোল আগেই জেনে নিয়েছে, রাজধানী এক্সপ্রেসের সামনে থেকে পিছন অবধি যাতায়াত করা যায়। মাকে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। ওর খুব ইচ্ছা, গাড়িটার সামনে-পিছনে একবার ঘুরে আসবে। কিন্তু এখন সে-সব কথা ওর মাথায় নেই। বাইরে এখনও দিনের আলো। ট্রেন যমুনা নদীর ব্রিজের ওপর দিয়ে গমগম করে ছুটে চলল। গোগোলের চোখের সামনে ভাসছে সেই লোকটির মূর্তি। এতক্ষণে লোকটির ফ্রেঞ্চকাট, কালো চশমা আর চুল বাদ দিয়ে, পোশাকসুদ্ধ চেহারাটা মনে পড়ে গেল। তার গায়ে ছিল স্যুট, নীল শার্ট আর বেগুনি রঙের নেকটাই।

কম্পার্টমেন্টে তখন আস্তে রবিশংকরের সেতারের রেকর্ড বাজছে। গোগোল তা শুনছে না, বরং ভাবছে, লোকটা যদি ওকে না-ই চিনবে, তবে নামটা জানল কী করে? লোকটার সঙ্গে দেখা করে কৌতূহল মেটাবার জন্য ওর মনটা ছটফট করতে লাগল। আর মা ভাবলেন, বড়মামাদের ছেড়ে এসে ওর মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। বললেন, "বড়মামাদের ছেড়ে এসে তোমার মন খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারছি, তাই চুপচাপ বসে আছ। কিন্তু এই তো আর শেষ দেখা নয়, আরও অনেকবার দেখা হবে। ও'রা কলকাতায় যাবেন, তুমি দিল্লি আসতে পারবে।"

গোগোল মায়ের দিকে একবার দেখে আবার কাচবন্ধ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বড়মামা মামিমা টুলটুলি নেমে যাবার সময় সত্যি ওর মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁদের ভাবনা ওর মাথায় নেই। অথচ মাকে সে-কথা না বলতে পেরে খারাপ লাগছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পারছে, লোকটা কে, সত্যি বলেছে কি না, ততক্ষণ ওর শান্তি নেই।

বাইরে আকাশ ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে। দু পাশে ছিটকে যাচ্ছে মাঠ খেতখামার গ্রাম আর গরু-মহিষের পাল। লোকজনও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। গোগোল শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলল, "মা, আমি একটু বাথরুম যাব, আর গাড়ির পেছন দিকটা দেখে আসব?"

মা কী ভেবে বললেন, "যাও, কিন্তু বেশি দেরি কোরো না।"

গোগোল চেয়ার ছেড়ে উঠে মায়ের পাশ দিয়ে পেরিয়ে পিছন দিকে গেল।

নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়

গোগোল কামরার দরজার বাইরে এসে বাথরুমের দিকে গিয়েও তাকাল না। আসলে ওর তো বাথরুম মোটেই পায়নি। ও দেখল দরজার বাইরে কিছু লোক জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলছে। ও এক-একটা দরজা খুলে কয়েকটা কমপার্টমেন্ট পেরিয়ে, নতুন জায়গায় এসে পড়ল। এদিককার কম্পার্টমেন্টের করিডর ফার্স্ট ক্লাসের মতো, এক পাশ দিয়ে, আর পাশে বার্থ। সব বার্থগুলোই দরজা বন্ধ। ভিতরে লোকজনের কথাবার্তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, গার্ডের মতো পোশাক পরা একজন লোক করিডরে গোগোলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোন্ বার্থ?"

গোগোল দেখল বার্থগুলোর দরজার মাথায় এ বি সি ডি লেখা আছে। কিন্তু ও লোকটির কাছ থেকে জেনে নেয়নি, সে কোন্ বার্থে আছে। গোগোল ভাল হিন্দিও বলতে পারে না, সোজা বাংলায় বলল, "আমার একজন রিলেটিভ কোনো বার্থে আছে।"

গার্ডের মতো পোশাক পরা লোকটি কিছু বলবার আগেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। গোগোল অবাক হয়ে দেখল, সেই লোক! কেবল চোখে এখন চশমাটা নেই। দরজাটা খুলেই বলল "আমি ভেতর থেকে গলা আর বাঙলা কথা শুনেই বুঝেছি, শ্রীমান গোগোল এসেছে। এসো, ভেতরে এসো।"

গার্ডের মতো পোশাক পরা লোকটি ফ্রেঞ্চকাটকে একটা সেলাম দিয়ে সামনের দিকে চলে গেল। গোগোল কামরাটার ভিতরে তাকিয়ে দেখল, ফার্স্ট ক্লাসের মতোই দুই-বার্থওয়ালা ছোট কামরা। ও ঢুকবে কি না ভাবছে। লোকটি হেসে দরজার কাছ থেকে সরে বলল, "চলে এসো গোগোল, কোনো ভয় নেই।"

গোগোল লোকটির ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি দেখে দরজার সামনে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রাজধানী এক্সপ্রেসে কি ফার্স্ট ক্লাসও আছে?"

লোকটি হেসে বলল, "কেন থাকবে না? জনতা এক্সপ্রেস আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়া সব ট্রেনেই ফার্স্ট ক্লাস থাকে। তবে তুমি রাজধানী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসের সীটে হাত দিয়ে দেখতে পার, একদম ডানলোপিলোর গদি আর তেতরে এসে দ্যাখো, ডানলোপিলোর বালিশ আর ধবধবে নরম চাদরও দিয়েছে। চলে এসো ভেতরে।"

গোগোল তবু একটু ভাবল, দেখল আবার লোকটির মুখের দিকে। তারপরে ভিতরে ঢুকল। লোকটি দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। গোগোলের মনটা যেন কেমন ছ্যাঁত করে উঠল। বাইরে তখনও দিনের আলোর আভাস রয়েছে, তবু ছোট কুপে-র মধ্যে আলো জ্বলছে। ও পিছন ফিরে বন্ধ দরজাটার দিকে দেখল।

লোকটি হেসে বলল, "আমি বুঝতে পারছি গোগোল, তুমি একটু ভয় পেয়ে গেছ। কিন্তু তোমার ভয় পাবার কোনো কারণই নেই। তুমি সীটে বোসো।"

গোগোল বসতে পারল না, বলল, "আপনাকে আমি চিনি না, কখনও দেখিওনি।"

লোকটি হেসে উঠে বলল, "ঠিক বলছ কখনও দেখনি? ভাল করে আমার দিকে তাকাও।"

গোগোল লোকটির মুখের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড দেখে, মাথা নাড়াতেই, লোকটি এক টানে তার গোটা ফ্রেঞ্চকাট গোঁফ দাড়ি খুলে ফেলল। কপালের ওপর থেকে চুল পিছন দিকে টেনে জিজ্ঞেস করল, "এবার?"

গোগোল চমকে গেলেও আবার লোকটির মুখের দিকে প্রায় এক মিনিট তাকিয়ে দেখল। তারপরে মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি এখনও আপনাকে চিনতে পারছি না। তবে আপনাকে অনেকটা তিতুদার মতন দেখতে।"

লোকটি হেসে উঠে বলল, "আমি তোমার কোনো দাদাই নই, বয়সটা সে-রকম হতে পারে। আচ্ছা, এ কামরায় আর একজন যাত্রীর আসার কথা। সে হয়তো বাইরে কোনো কামরায় কারো সঙ্গে কথা বলছে, যে-কোনো সময় এসে পড়তে পারে। তাই আমি গোঁফদাড়িটা লাগিয়ে নিই।" বলে সে কামরার দেওয়ালের গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফদাড়ি লাগিয়ে নিল। চুল টেনে দিল কপালের ওপর।

গোগোল ইতিমধ্যে আকাশপাতাল ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে। লোকটির চেহারা আবার একটু আগের মতোই দেখাচ্ছে। গোগোলের দিকে ফিরে বলল, "তুমি না বসলে আমি কিছুই বলতে পারছি না।"

গোগোল এবার নরম গদির আসনে বসল। লোকটির পাশে বসে বলল, "তোমার পুরী বেড়াতে যাবার কথা মনে আছে?"

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আছে।"

লোকটি বলল, "বেশ, সেই খালি বাড়ির কথা মনে আছে যে-বাড়ির উঠোন ভর্তি বালি, আর সেই বালি খুঁড়ে তুমি একটি সোনালি পাড় দেখতে পেয়েছিলে? মানে, সেই সোনালি পাড়ের রহস্য?"

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তাও মনে আছে—।" বলতে বলতেই গোগোল থেমে গেল, ওর চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল। বলে উঠল, "মনে পড়েছে। আপনিও সেখানে ছিলেন, আমি যখন বালি খুঁড়ে সেই পাড় দেখতে পেয়েছিলাম, আপনি তখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি আপনার ছায়া দেখে চমকে উঠেছিলাম।"

লোকটি বলল, "তার চেয়েও সাংঘাতিক কথাটাই তুমি বললে না, হঠাৎ একটা গুলি ছুটে এসেছিল, আমি তোমাকে নিয়ে বালিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছিলাম।"

গোগোল চোখ বড় করে বলল, "আমাদের কানের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছল। আপনি না থাকলে, আমি নিশ্চয় মরেই যেতাম।"

ভদ্রলোক এবার গোগোলের কাঁধে একটু হাতের চাপ দিয়ে বললেন, "আরে না না, মরে যাবে কেন? মরা কি এতই সোজা? আসলে, যে লোকটা গুলি করার জন্য রিভলবার তুলেছিল, তাকে আমি দেখে ফেলেছিলাম।"

গোগোল ভদ্রলোকের দিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল, "কিন্তু আমার মনে পড়ছে, তখন আপনার ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছিল।"

ভদ্রলোক গোগোলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "গুড, এই তো দেখছি, এখন তোমার সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। ঠিক বলেছ, তখন আমার ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছিল। আর কী মনে পড়ছে বল দেখি ?"

গোগোল বলল, "তার পরেই তো সেই বাড়িটার ভেতরে পুলিস এসে ঢুকেছিল।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আর আমার মুখ থেকে সব কথা শুনে, সবাই তোমাকে মাথায় তুলে নাচতে আরম্ভ করেছিল। আসলে, তোমাকে মাথায় তুলে আমারই নাচা উচিত ছিল।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "কারণ তোমার জন্যই বালির তলায় লুকিয়ে রাখা সেই ভদ্রমহিলার ডেডবডি খুঁজে পাওয়া গেছল। তা নইলে, কতকাল যে ডেডবডিটা বালির নীচে চাপা পড়ে থাকত, কে জানে ? এবার তোমাকে বলি, আমি পুরী গেছলাম, ভদ্রমহিলাকে বাঁচাতে। কারণ আমি সংবাদ পেয়েছিলাম, ভদ্রমহিলাকে তাঁর স্বামীই মেরে ফেলার জন্য পুরীতে নিয়ে গেছেন। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, আমি আগে গিয়ে পৌঁছুতে পারিনি। তবে তোমার কথা থেকে আর একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়েছিল, বিষের ইনজেকশন দিয়ে ভদ্রমহিলাকে মারা হয়েছিল। তুমি অবশ্য সে-সব বুঝতে পারনি। এখনও বোঝার দরকার নেই। ধরে নাও, তুমি সেই খালি বাড়িটায় ঢুকেছিলে বলেই, অন্ধকার ঘরে উঁকি দিয়ে যা দেখতে পেয়েছিলে, আর বালিতে এক জায়গায় চোখ পড়ে যাওয়ায়, হাত দিয়ে বালি সরাতে আরম্ভ করেছিলে, তাতেই সব ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছল।"

গোগোল অবাক হয়ে বলল, "আমি তো তখন জানতাম না, ভদ্রমহিলার স্বামীই তাঁকে মেরে ফেলেছেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "সে-সব কথা তোমার জানবার বা বোঝবার নয়, তাই জানতে না।"

গোগোলের মনটা খারাপ হয়ে গেল, মুখটা হল গম্ভীর। বলল, "দেখুন, আগ্রায় আমার ছোটমামার মুখে যখন শুনেছিলাম, ঔরংজেব তার বাবা শাহজাহানকে বন্দী করে রেখেছিল, আর তিন ভাইকে মেরে ফেলেছিল, আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। এখন দেখছি, আজকালের মানুষও অনেকে ঔরংজেবের মতন আছে।"

ভদ্রলোক বললেন, "ও-সব হল রাজা-বাদশাদের ব্যাপার, আমরা যাদের অপরাধের কথা বলছি, তাদের সঙ্গে রাজা-বাদশাদের মেলাতে গেলেই নানা লোকে নানা কথা বলবে। যাই হোক, তুমি ওসব ভেবে মন খারাপ কোরো না। তোমার আরও কয়েকটা ঘটনার কথা আমি খবরের কাগজে পড়েছি। তোমার বিশেষ কৌতূহল থেকেই ব্যাপারগুলো ঘটে যায়, তা-ছাড়া তোমার দেখবার নজর আর বুদ্ধিও বেশ ভাল।"

গোগোল একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, "আমি কিন্তু পুরীতে আপনার নামটা জানতে পারিনি, এখনও জানি না।"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক বলেছ, আমার নামটা তোমাকে বলা দরকার। অবশ্য আমার নাম বললেও তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমার নাম অশোক ঠাকুর।"

গোগোলের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। অশোক ঠাকুরের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল, তারপরেই ওর চোখ দুটো বড় হয়ে ঝলকে উঠল, বলল, "আপনি অশোক ঠাকুর! আমি তো আপনার নাম শুনেছি। আপনি তো একজন গোয়েন্দা।"

অশোক ঠাকুর হেসে বললেন, "কিন্তু তোমার চেয়ে আমি বড় গোয়েন্দা নই।"

গোগোলও হেসে বলল, "ইশ! আমি যেন জানি না। আপনার কথাও তো কাগজেই বেরিয়েছে, তা ছাড়া বাবার কাছেও আপনার কথা শুনেছি। হ্যাঁ, এখন আমি বুঝেছি, আপনি কেন এসব গোঁফদাড়ি লাগিয়েছেন। নিশ্চয় এই ট্রেনে কিছু ঘটবে? না কি আপনি কারোর পিছু নিয়েছেন?"

অশোক প্রথমে হেসে উঠলেন তারপর দরজার দিকে একবার দেখে বললেন, "দেখ গোগোল, তোমাকে তো আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। আমি একটা বিশেষ কাজে দিল্লি এসেছিলাম। কাজটা মোটামুটি শেষ করে কলকাতায় ফিরছি, কিন্তু একটু সাবধানে ফিরতে হচ্ছে। হয়তো আমারই পিছু নিতে পারে কেউ, মানে কোনো এনিমি। তাই আমি চেহারা আর নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতায় ফিরছি। কথাটা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এবার তোমার কথা বলো। এই গরমে দিল্লি বেড়াতে এলে কেন?"

গোগোল অবাক চোখে অশোক ঠাকুরকেই দেখছিল, আর তার নানান কাজের কথা মনে পড়ছিল, ফলে অশোক ঠাকুরের প্রশ্নটা ওর কানেই গেল না।

অশোক আবার প্রশ্ন করল, "কী হল, তুমি আমার কথার জবাব দিলে না গোগোল?"

গোগোল চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁ, কী বলছিলেন?"

অশোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী ভাবছিলে বলো তো?"

গোগোল লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, "আমি কেবল আপনার কথাই ভাবছিলাম। আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না আপনার পাশে বসে আছি, আপনার সঙ্গে কথা বলছি।"

অশোক হেসে বলল, "আমিও তোমাকে প্রথম এ গাড়িতে দেখে খুব অবাক আর খুশি হয়েছিলাম। যাই হোক, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, এবারের গরমের ছুটিতে দিল্লি বেড়াতে এলে কেন? গরমে তো কেউ দিল্লি আসতে চায় না।"

গোগোল দিল্লি আসার আগের ঘটনার কথা বলল, মা বাবাকে গরমের ভয়ে কী বলেছিলেন। তারপরে বলল, "গরমকে ভয় পেলেই ভয়। মা তো বেড়াবার আনন্দে গরমের কথা একবারও বলেননি। আমারও মোটেই গরম লাগেনি।"

অশোক বলল, "তার মানে তুমি সত্যিই বেড়াতে ভালবাস। তা কী-রকম বেড়ালে?"

গোগোল দিল্লি-আগ্রার গল্প বলল। তারপরেই মায়ের কথা মনে হতেই লাফ দিয়ে উঠে বলল, "ইশ, অনেক দেরি করে ফেলেছি। মা নিশ্চয় খুব রাগ করবেন। আমি এখন যাচ্ছি।"

অশোকও উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতে পারলে বেশ মজা হত। কিন্তু কী আর করা যাবে। শেষ পর্যন্ত আমার এই কুপে-তে যে আর

একজন প্যাসেঞ্জার কে আসবে, কী-রকম লোক হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে তোমাকে বলা রইল, খাবার পরে, মায়ের অনুমতি পেলে, আর একবার এসে ঘুরে যেও, তখন গুডনাইট করা যাবে।"

গোগোল ঘাড় কাত করে, করিডর দিয়ে তাড়াতাড়ি কয়েকটা চেয়ার-কার কামরা পেরিয়ে, নিজেদের কামরায় মায়ের কাছে ফিরে এল। মায়ের মুখ গম্ভীর, পা সরিয়ে গোগোলকে জানালার পাশে যেতে দিলেন। গোগোল নিজের জায়গায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, দিনের আলো আর নেই, অন্ধকার নেমেছে। মা বললেন, "এখন বুঝেছ তো, তোমাকে কেন আমি কোথাও যেতে দিতে চাই না? গোটা ট্রেনটা কয়েকবার ঘুরলেও আধঘণ্টা লাগে না। তুমি আধঘণ্টা কাটিয়ে এলে।"

গোগোল এবার আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না। মায়ের দিকে ফিরে বলল, "জান মা, দেরি আমার হয়েছে, কিন্তু একটা আশ্চর্য কাণ্ড হয়েছে।"

মা ভুরু কুঁচকে গোগোলের মুখের দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কী আশ্চর্য কাণ্ড হয়েছে?"

গোগোল বলল, "আবার বলছ কেন? একটাই তো কাণ্ড ঘটেছে। আমার সঙ্গে অশোক ঠাকুরের পরিচয় হল।"

মায়ের ভুরু দুটো তেমনিই কোঁচকাল, একটু ভেবে, তারপরে, হঠাৎ অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, "মানে, সেই গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর?"

গোগোল বলল, "হ্যাঁ মা। উনি ছদ্মবেশে ছিলেন। হঠাৎ আমার নাম ধরে ডেকে উঠলেন।"

মা যেন বিশ্বাস করতে পারেননি, এইরকম চোখে তাকিয়ে বললেন, "উনি তোমাকে চিনলেন কী করে?"

গোগোল মাকে পুরীর ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিল, আর অশোক ঠাকুর যা বলেছিলেন, সে-কথা বলল।

মা এবার মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কোথায় বসেছেন?"

গোগোল বলল, "উনি ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন। তবে ওঁর ছদ্মবেশের কথা কারোকে বলতে বারণ করেছেন।"

মা বললেন, "তা হলে আমাকে বললি কেন?"

গোগোল হেসে বলল, "আমি তোমার কাছে কথা চাপতে পারি না।"

মা গোগোলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গোগোলও হাসল। মা গোগোলের গলা জড়িয়ে ধরে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, "অশোক ঠাকুর যখন বারণ করেছেন, তখন আর কারোকে বোলো না যেন। কিন্তু কেন ছদ্মবেশে যাচ্ছেন, সে-কথা তোমাকে কিছু বললেন নাকি?"

গোগোল বলল, "না, সে-রকম কিছু বলেননি। ওঁর কামরায় আর কেউ ছিল না। দরজাটা বন্ধ করে আমার সামনে এক টানে ওঁর ফ্রেঞ্চকাট গোঁফদাড়ি খুলে ফেললেন। বললেন, দিল্লিতে একটা কী কাজে এসেছিলেন, ফেরবার সময় একটু সাবধানে ফিরতে হচ্ছে।"

মা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "বুঝেছি।"

গোগোল নিজের গালে আর চিবুকে হাত বুলিয়ে বলল, "ও-রকম গোঁফদাড়ি পরলে, আমারও চেহারাটা নিশ্চয় বদলে যাবে, না মা?"

মা হেসে বললেন, "ব্যস্, অমনি তোর যত আজেবাজে ভাবনা শুরু হয়ে গেল। তোর এই কচি মুখে গোঁফদাড়ি দেখলেই লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে।"

গোগোল পা দাপিয়ে বলল, "কবে যে বড় হব, আর গোঁফদাড়ি গজাবে।"

মা আবার হেসে উঠলেন। গোগোল আবার বলল, "বড় হলে আমি কিন্তু অশোকদার মতো ফ্রেঞ্চকাট গোঁফদাড়ি রাখব।"

মা শব্দ করে হেসে উঠে আশপাশের চেয়ারের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রায় চুপিচুপি বললেন, "ওঁর তো আসল ফ্রেঞ্চকাট নয়। উনি তো চোখে ধুলো দেবার জন্য ওটা পরেছেন। বড় হয়ে তুই যেমন খুশি গোঁফদাড়ি রাখিস, আমি কিছুই বলতে যাব না। কিন্তু তুই কি ওঁকে অশোকদা বলে ডেকেছিস নাকি?"

গোগোল অবাক হয়ে বলল, "তা ছাড়া কী বলব। উনি ফ্রেঞ্চকাট খুলতেই মনে হল, তিতুদাদের মতো বয়স হবে।"

মা গোগোলের মুখের দিকে একবার দেখে হেসে বললেন, "বেশ, তাই যদি তোমার মনে হয়ে থাকে, ওঁকে দাদা বলেই ডেকো।"

গোগোল বুঝতে পারল, অশোক ঠাকুরের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে শুনে মা খুশিই হয়েছেন। ওর ভয় ছিল, মা হয়তো সব শুনে রাগ করবেন। মা যে কখন কোন্ কথা শুনে রেগে যান আর খুশি হন, গোগোল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ও জিজ্ঞেস করল, "মা, অশোকদা সত্যি একজন বড় ডিটেকটিভ, না?"

মা বললেন, "সেটা তো তুমি ভালই জানো। খবরের কাগজেও তো ওঁর কথা বেরিয়েছে।"

গোগোল মায়ের মতামতটা শুনতে চেয়েছিল। বলল, "সে তো জানিই। বাবার মুখেও কিছু কিছু শুনেছি।"

মা বললেন, "উনি একজন অসাধারণ ডিটেকটিভ। এই তো মাস ছয়েক আগেই কলকাতায় এক ভদ্রলোককে বিষ খাইয়ে মারার ঘটনার খুনীকে উনি হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন।"

গোগোলের ঘটনাটা মনে পড়ে যেতেই চোখ বড় বড় করে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। অশোকদা আর তাঁর এক বন্ধু কলকাতার এক বড় হোটেলের ঘরে খুনীকে কায়দা করে আটকে ফেলেছিল!"

মা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ।"

গোগোল চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, "বাবা কী বলেন জানো মা? অশোকদার এত বুদ্ধি, তদন্ত করতে করতেই উনি নাকি বুঝতে পারেন, পরে কী ঘটতে যাচ্ছে।"

মা বললেন, "তোমাকে ওসব নিয়ে এত ভাবতে হবে না। তুমি তো আর ওঁর মতো ডিটেকটিভ হতে যাচ্ছ না।"

গোগোল দেখল, মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তার মানে, মা আর এসব কথা পছন্দ করছেন না। গোগোলও আর কিছু না বলে, জানালার কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল মাঝে মাঝে হঠাৎ বিন্দুর মতো এক-একটা আলো অন্ধকারে ভেসে উঠছে। গাড়ি চলছে বেশ জোরে। এখন আর রবিশংকরের সেতার বাজছে না, তার বদলে, একটা বিলিতি সুরের বাজনা বাজছে খুব আস্তে আস্তে। চেয়ার-কারের চেয়ারগুলো উড়োজাহাজের মতোই, বোতাম টিপলেই এলিয়ে পড়ে, আর আধশোয়া অবস্থায় বসা যায়। সামনের আসনে খাবার জন্য বোতাম আঁটা ট্রে রয়েছে। উড়োজাহাজের মতোই ট্রে নামিয়ে খাবার খেতে হয়।

গোগোলের মাথায় অশোক ঠাকুর ছাড়া কোনো চিন্তাই নেই। ওর মনে হচ্ছে, আজকের রাজধানী এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরে যাবার দিনটা সত্যি শুভদিন। তা নইলে এভাবে অশোক ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়? গোগোল যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, অশোক ঠাকুর নিজে ডেকে ওর সঙ্গে আলাপ করেছেন। উনি কথা না বললে গোগোল ওঁকে কিছুতেই চিনতে পারত না। এমন-কী নকল ফ্রেঞ্চকাট খুলে ফেললেও নয়। কারণ, পুরীর সেই পোড়ো বাড়ির উঠোনের বালি খুঁড়তে খুঁড়তে যে-ঘটনা ঘটেছিল, তার মধ্যে সামান্য সময়ের জন্য দেখা একজনকে মনে করে রাখা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অশোক ঠাকুর গোগোলকে ঠিক ঠিক চিনে রেখেছে।

গোগোলের এ-সব ভাবনার মধ্যেই, কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল। রাজধানী এক্সপ্রেসের উর্দিপরা বেয়ারারা রাত্রের খাবার পরিবেশন শুরু করে দিল। খাবার দেবার আগে একবার একজন মাকে জিজ্ঞেস করল, গোগোলরা ভেজিটেরিয়ান, না ননভেজিটেরিয়ান। মা জানালেন, ননভেজিটেরিয়ান। কিন্তু গোগোল বা মা, কারোরই খাবার মোটে ভাল লাগল না। নিরামিষ বিরিয়ানি, নিরামিষ আলুর দমের মতো একটা কিছু, একটা বোধহয় ভেজিটেবল চপ আর কয়েক টুকরো মাংস। মা বিশেষ খেলেনই না। গোগোল তবু যা হোক খানিকটা খেল। রাত্রি তখন ন'টা প্রায় বাজে।

হাত ধোবার জন্য বাইরে যাবার দরকার ছিল না। পেপার ন্যাপকিন দিয়েই মুখ মুছে নেওয়া গেল। এবার গোগোলের আবার একটা অগ্নিপরীক্ষা। কয়েকবার মার মুখের দিকে দেখল, তারপরে বলেই ফেলল, "মা, অশোকদা বলেছিলেন খাবার পরে একবার দেখা করে যেও।"

মা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

গোগোল বলল, "এমনি। বলেছিলেন খাবার পরে একবার এসো, একটু কথা বলা যাবে।"

মা আশেপাশে তাকিয়ে, নিজের হাতের ঘড়ি দেখে বললেন "দশ মিনিট বাদে যেও, এখন লোকজন খাচ্ছে, বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে। কিন্তু ফিরতে দশ মিনিটের বেশি দেরি করবে না।"

গোগোল লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘাড় কাত করল। কিন্তু এখন দশ মিনিট থাকাটাই ওর পক্ষে কষ্টকর। অবশ্য মা ঠিক কথাই বলেছেন। লোকজন খাচ্ছে, বেয়ারারা এঁটো ডিশ গ্লাস সরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত। গোগোল তাই দেখতে লাগল, আর মায়ের কথাই ঠিক। দশ মিনিটের মধ্যেই বেয়ারাদের ছুটোছুটি ব্যস্ততা কমে গেল। মা বললেন, "যাও, ঘুরে এসো।"

গোগোলের ভিতরটা চনমন করে উঠল, ও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড আর লাল চৌকো টর্চলাইট

গোগোল দুটো চেয়ারকার কামরা পেরিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের করিডরে এল। দেখা গেল সব বগিতেই প্রায় খাওয়া-পর্ব শেষ। ও অশোক ঠাকুরের কামরার সামনে এসে দেখল, দরজাটা বন্ধ। চোখ তুলে দেখে নিল, 'C' মার্ক আছে কি না দরজার মাথায়। আছে দেখে ও দরজায় হাত দিয়ে ঠকঠক শব্দ করল। ভাবল অশোকদা কি খেয়ে শুয়ে পড়েছেন?

দরজাটা একপাশে সরে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে অচেনা এক ভদ্রলোক। অশোকদার থেকে বয়স কিছু বেশি, ফর্সা দোহারা চেহারা। গায়ে সাদা ট্রাউজারের ওপরে সাদার ওপরে কালো ডোরাকাটা শার্ট। মাথায় ছোটখাটো টাক। গোগোলকে দেখে অবাক হয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই?"

গোগোল জবাব দেবার আগে দেখে নিল, ভিতরে আলো জ্বলছে। অশোকদারই বয়সি প্রায় একজন, সাদা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে, নীচের সীটে এক পাশে বসে আপন মনে বই পড়ছে। রোগা লম্বা কিন্তু বেশ শক্ত চেহারার লোকটি অশোকদার থেকে কালো। মাথার চুলও ছোট করে কাটা। গোঁফ-দাড়ি কিছুই নেই। গোগোল দরজার সামনে ভদ্রলোককে ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করল, "এ কামরার আর একজন যাত্রী কোথায় গেলেন?"

ভদ্রলোক অবাক চোখে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ভিতরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "তোমার সামনেই আর একজন যাত্রী বসে আছেন, দেখতে পাচ্ছ। তুমি কি ওঁকে খুঁজছ?'

গোগোল ভিতরে একটু মুখ বাড়িয়ে যাত্রীটিকে দেখল। সে নিজের মনে বই পড়েই যাচ্ছে, এদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। বোধহয় ইংরেজি জানে না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! অশোকদা কোথায় গেল? সে তো এ কামরাতেই ছিল, আর গোগোলকে খাবার পরে এখানেই একবার আসতে বলেছিল! ও আবার দরজার মাথায় 'C' অক্ষরটা দেখল। মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি ওই ভদ্রলোককে চিনি নে।"

দরজার সামনের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তুমি কোন ভদ্রলোককে খুঁজছ? তাঁর নাম কী?"

গোগোল প্রায় বলে ফেলতে যাচ্ছিল, আমি যাকে খুঁজছি তার নাম মিঃ অশোক ঠাকুর। ও মনে মনে জিভ কেটে ভাবল এখনই কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল! কারণ অশোকদা ছদ্মবেশে রয়েছে। তার নাম কোনরকমেই উচ্চারণ করা উচিত না। ওর চোখের সামনে বড়মামার বড় ছেলে টুপুদার কথা মনে পড়ে গেল, আর তার ভাল নামটাও। ও বলল, "আমি যাকে খুঁজছি তার নাম ডক্টর বিমল ব্যানার্জি।"

ভদ্রলোক গোগোলের চোখের দিকে যেন কটকট করে তাকিয়ে দেখছিলেন। তারপরে হঠাৎ একটু হেসে বললেন, "তুমি বেশ ভেবে নামটা বললে। তবে এই কামরায় ওই নামে কারো যাবার কথা নয়। আমি লিস্ট দেখেছি। এখন তুমি যাকে ভেতরে

দেখতে পাচ্ছ, এই ভদ্রলোক দক্ষিণ দেশের। লিস্টে আমি নামটা দেখেছি। কিন্তু তুমি যে-নাম বললে, তা তো একজন বাঙালির নাম?''

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ''হ্যাঁ স্যার।''

ভদ্রলোক গোগোলকে একটুও ভাববার সময় না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''ডক্টর বিমল ব্যানার্জি কি তোমাকে এই কামরায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন?''

ভদ্রলোকের জেরা করার ধরনটা গোগোলের মোটেই ভাল লাগল না। মিথ্যা কথা বলবে না ভেবেও ওকে বলতে হল, ''আমার ঠিক মনে নেই। আমি হয়তো ভুল করেছি।''

গোগোল একথা বলার সময়, হঠাৎ ওর ভিতরে চোখ পড়ল। বই পড়ায় ব্যস্ত যাত্রীটি ওর দিকেই তাকিয়ে দেখছে, আর স্পষ্ট দেখল, সে মিটিমিটি হাসছে! এমন-কী একটু ঘাড়ও ঝাঁকাল। দরজার সামনে ভদ্রলোক পিছন ফিরে তাকাবার আগেই, সে তাড়াতাড়ি বইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। গোগোল বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। ভিতরের লোকটা কে? সে কি সত্যি হাসল আর ঘাড় ঝাঁকাল? যেন গোগোলকে বোঝাতে চাইল, ও ঠিক জবাবই দিয়েছে? না কি আসলে ও ভুল দেখল? কিন্তু এ-রকম ভুল কী করে দেখবে? অশোকদা-ই বা কোথায় উবে গেল? সে কি অন্য কোনো কামরায় চলে গিয়েছে? ভাবতে ভাবতে গোগোল দরজার সামনে ভদ্রলোককে বলল, ''আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।''

ভদ্রলোক যেন নাছোড়বান্দার মতোই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আমার মায়ের কাছে।"

"তোমার মা কোথায়?"

"চেয়ার-কার কম্পার্টমেন্টে।"

গোগোল যে-দিকে পা বাড়াবার কথা, সেদিকে না গিয়ে, উলটো দিকে পা বাড়াল। ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ডঃ বিমল ব্যানার্জি তোমাকে কখন কোথায় বললেন, যে তিনি এখানে থাকবেন?"

গোগোলের ইচ্ছা হল জবাব দেয়, "আপনার তাতে কী দরকার?" কিন্তু ও ভালভাবেই বলল, "আমাকে ডঃ বিমল ব্যানার্জি কিছুই বলেননি। গতকাল টেলিফোনে আমার মাকে বলেছিলেন। তাই বোধহয় আমার শুনতে ভুল হয়েছে।"

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "তাই হয়তো হবে, তুমি অন্য কোনো কামরা দেখতে পার, আরও দুটো ফার্স্ট ক্লাস বগি আছে।'' বলতে বলতেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

গোগোল লোকটার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে স্বস্তি পেল। যদিও ভিতরের অন্য যাত্রীটির বিষয়ে ওর মনটা খচ খচ করতেই লাগল। লোকটা কি সত্যি দক্ষিণ দেশের? অর্থাৎ মাদ্রাজ বা কেরল, ওই সব দিকের? দরজার সামনের ভদ্রলোক যেন সেই-রকমই বললেন। কিন্তু গোগোল তা হলে লোকটাকে মিটিমিটি হেসে ঘাড় ঝাঁকাতে দেখল কেন? মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। আর নিজেদের কামরার দিকে না গিয়ে, অন্য আরও দুটো ফার্স্ট ক্লাস বগি দেখবার জন্য এগোতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই করিডরের আলো কয়েকটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। করিডর এখন আগের মতো আলোকিত নয়।

গোগোলের মনে আশা, হয়তো কোনো কারণে অশোকদাকে কামরা বদলাতে হয়েছে। অন্য ফার্স্ট ক্লাসে দেখাই যাক। গাড়ি ছুটে চলেছে বেশ জোরে। গোগোল রীতিমত টলছে। একটা ফার্স্ট ক্লাস পেরিয়ে আর-একটাতে পা দিল। দেখল গার্ডের পোশাক পরা একটি লোক, পাশের একটা আসনে বসে চোখ বুজে আছে। গোগোল ভিতরে পা দিয়ে দেখল, এই বগির করিডরও আধো-আলো, আধো-অন্ধকার মতো। ও মুখ তুলে কামরার দরজার মাথা দেখতে দেখতে এগোল। এখানেও 'C'-অক্ষর কামরা রয়েছে। তার দরজা খোলা, দুজন ভদ্রলোক সীটে বসে, নিজেদের মনে তাস খেলছেন। তার পরের চার বার্থের কামরার দরজাটাও খোলা, সেখানে কয়েকজন মহিলা পুরুষ, এখনো খাচ্ছেন, আর নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন।

গোগোল টলতে টলতে শেষ ফার্স্ট ক্লাস বগিটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই প্রথম ও দুটো বগির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখল, শেষ ফার্স্ট ক্লাসের বগিটার পর্দা-টাঙানো কাচের দরজা বন্ধ। দু পাশে বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভিতরে কেউ আছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না।

গোগোল একটু ভাবল, তারপরে দরজাটা আস্তে ঠেলতেই খুলে গেল। ভেবেছিল, গার্ডের পোশাক পরা লোক এখানেও থাকবে। দেখল, আসন খালি, গার্ডের পোশাক পরা কেউ নেই। এখানেও করিডরের মাঝখানে একটি মাত্র আলো জ্বলছে, বাদ-বাকি সবই নেভানো। অথচ দরজা-বন্ধ কামরাগুলোর মধ্যে লোকজনের কথাবার্তার অস্পষ্ট স্বর শোনা যাচ্ছে। গোগোল এগিয়ে গিয়ে এই বগির 'C'-অক্ষরের কামরাটা দেখল। দরজাটা বন্ধ। কিন্তু এ দরজায় ধাক্কা দিতে ওর সাহস হল না। অশোকদার যে-কামরায় থাকার কথা, সেখানেই যখন নেই, অন্য কোথাও থাকতে পারে কি? অশোকদার মতো লোকের এ-রকম ভুল হতেই পারে না।

গোগোল তবু কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, ভিতরে কারোর গলা শোনা যায় কি না। শোনা যাচ্ছে না। দুরন্ত বেগে চলা কেবল রাজধানী এক্সপ্রেসের ঝমঝম খটাখট শব্দ। গোগোল ফিরতে গেল, আর দেখল, বগির শেষ দিক থেকে একজন লোক এগিয়ে আসছে। তার মাথায় একটা নেপালি টুপি, গায়ে কালো রঙের গলাবন্ধ লম্বা কোট, আর ট্রাউজার পরা। মুখটা রোগা ফর্সা, চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। লোকটির দুটো হাতই পকেটে ঢোকানো।

গোগোল লোকটার দিক থেকে ফিরে, যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে এগিয়ে চলল। কয়েক পা যেতেই, আচমকা ওর সামনে একটি লোক এসে পড়ল। তার পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি, পায়ে নাগরা, মাথায় বড় বড় চুল। সে গোগোলের দিকে না তাকিয়ে সামনে তাকিয়ে ভয়ে যেন শিউরে উঠল। তার মুখটা সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি পকেটে এক হাত দিয়ে, অন্য হাত গোগোলের কাঁধে রেখে বলে উঠল, "কৃপা জওহর সিং, মুঝে মারো মৎ।"

গোগোল অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখল, মাথায় নেপালি টুপি, গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট, জ্বলজ্বলে-চোখ লোকটার হাতে একটা রিভলবার চকচক করছে। তার মুখটা শক্ত দেখাচ্ছে। সে ঠোঁট নেড়ে কী বলল, গোগোল কিছুই বুঝতে পারল না। এ সময়েই হঠাৎ ওর মনে হল, ওর কাঁধ ধরে যে-লোকটা দাঁড়িয়েছে, সে যেন ওর প্যান্টের পকেটে কী একটা ঢুকিয়ে দিল। ও দেখবার জন্য সামনের লোকটার দিকে মুখ ফেরাল। আর তখনই ফট্ করে একটা শব্দ হল। গোগোল দেখল, ওর মাথার ওপরেই, লোকটার বাঁ দিকের বুকের কাছে পাঞ্জাবিতে রক্ত ফুটে উঠল, আর গোগোলের কাঁধ থেকে হাত পিছলে গিয়ে, সে এক পাশে কাত হয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল। গলা দিয়ে সামান্য একটা শব্দ বেরোল। মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

গোগোল ভাবতেই পারল না, সামান্য একটা ফট্ শব্দে কী করে গুলি ছুটে আসতে পারে। রিভলবার ছুঁড়লে নিশ্চয়ই গুড়ুম করে শব্দ হবে, লোকজন সব হৈ-হৈ করে ছুটে আসবে। কিন্তু তখন আর ওর সে-সব কথা ভাববার সময় ছিল না। ও

একেবারে দৌড় লাগাল। দুটো ফার্স্ট ক্লাস আর দুটো চেয়ার-কার বগি পেরিয়ে, ছুটতে ছুটতে নিজেদের কামরায় এসে পড়ল। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা মায়ের পাশে, জানালার ধারে বসে হাঁপাতে লাগল। আর প্যান্টের পকেটের ওপরে হাত দিয়ে টের পেল, একটা সিগারেটের প্যাকেটের মতো চৌকো কী যেন রয়েছে। কিন্তু সিগারেটের প্যাকেটের থেকে জিনিসটা ভারী আর শক্ত। ভাগ্যিস, এয়ার কন্ডিশনড গাড়িতে সারা রাত থাকতে হবে বলে মা ওকে ট্রাউজার পরিয়ে দিয়েছেন। পকেটটা বড় আছে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

মা অবাক হয়ে গোগোলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''এ কী, তুমি এভাবে ছুটতে ছুটতে কোথা থেকে এলে?''

গোগোল প্রথমেই বলল, "অশোকদাকে দেখতে পেলাম না।"

মা'র ভুরু কুঁচকে উঠল, "দেখতে পেলে না মানে? উনি চলন্ত গাড়ি থেকে কোথায় যাবেন? নিশ্চয় বাথরুম-টুমে গেছেন?"

গোগোল মাথা নেড়ে সবিস্তারে অশোকদার অন্তর্ধানের কথা বলল, এমন-কী ও যে আরও দুটো ফার্স্ট ক্লাসে অশোকদাকে খুঁজতে গিয়েছিল, তাও বলল। কেবল, সেই খুনের ঘটনাটা, আর ওর পকেটের জিনিসটার কথা বলতে সাহস পেল না। তা হলে, মা ওকে একেবারেই সীট ছেড়ে নড়তে দেবেন না! মা বললেন, "অশোকবাবু হয়তো কোনো কামরার মধ্যে তাঁর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছেন, তাই তুমি দেখতে পাওনি। কিন্তু তোমার ছুটে আসা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন ভয়-টয় পেয়েছ? কিছু ঘটেছে নাকি?"

গোগোল মায়ের চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না, বলল, "না, কিছু ঘটেনি। তবে আমি কী ভাবছি জানো মা? অশোকদা ছদ্মবেশে রয়েছেন, সেই অবস্থায় নিজের কামরা ছেড়ে কোথায় যেতে পারেন? আর ওই টাকমাথা মোটা গোছের লোকটাকে আমার একটুও ভাল লাগেনি।"

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "তাই তুমি একেবারে এভাবে ছুটতে ছুটতে এলে। সব বিষয়েই তোমার বাড়াবাড়ি। অশোকবাবু তাঁর নিজের কথা যথেষ্ট ভাবতে পারেন। তোমাকে এত ভাবতে হবে না। দেখছ, কামরার কয়েকটা আলো এর মধ্যেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, সবাই ঘুমোবার তাল করছে। তুমি ও-সব ভাবনা ছেড়ে এবার ঘুমোও। কাল সকালে অশোকদার সঙ্গে দেখা করার সময় পাবে।"

গোগোল আর কথা না বাড়িয়ে, লক্ষ্মীছেলের মতো মাথাটা পিছন দিকে এলিয়ে দিল। আসলে কথা বাড়াবার কোনো উপায় ছিল না। কথা বলতে গেলে, কী বলে ফেলবে, তার ঠিক নেই। মাঝখান থেকে মা অস্থির হয়ে পড়বেন। অবশ্য গোগোলও মনে মনে খুবই অস্থির আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর চোখের সামনে, রিভলবার হাতে সেই লোকটার চেহারা ভেসে উঠল। লোকটা যেন তৈরি হয়েই ছিল, যেন জানত, সামনে থেকে কেউ আসবে। গোগোলকে সে যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছিল না। আর অন্যদিক থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটা যেন পিছনে কারো কাছ থেকে তাড়া খেয়ে, প্রায় দৌড়েই এসেছিল। নেপালি টুপি মাথায় লোকটাকে দেখেই, গোগোলের কাঁধে হাত রেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভয়ে লোকটা শিউড়ে উঠেছিল। গোগোলের স্পষ্ট মনে আছে, লোকটা বলেছিল, "কৃপা জওহর সিং, মুঝে মারো মৎ।"

তার মানে, লোকটা কৃপা চেয়েছিল, আর জওহর সিংকে মারতে বারণ করেছিল। নেপালি-টুপি আর গলাবন্ধ লম্বা কোট গায়ে লোকটার নাম তা হলে জওহর সিং। কিন্তু রিভলবারে গুড়ুম শব্দ না হয়ে, ফট্ করে শব্দ হয়েছিল কেন? ভাবতে ভাবতেই গোগোলের মনে বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। ও সোজা হয়ে বসল। মনে পড়ে গেল, দিল্লিতে আসার আগেই কলকাতায় একটা ছবিতে দেখেছিল, রিভলবারে সাইলেনসার লাগানো থাকলে, গুলি ছোঁড়ার শব্দটা ওইরকমই শোনায়। তা হলে জওহর সিংয়ের রিভলবারে সাইলেনসার লাগানো ছিল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটা বুকে গুলি খেয়ে যে নির্ঘাত মরে পড়ে গেল, গোগোলের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

গোগোল কিছুই বুঝতে পারছে না, এরা কারা? কী ব্যাপার? অশোকদা-ই বা তার কামরা থেকে, এই চলন্ত গাড়ির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল? সে কি এ ব্যাপারের কিছু জানে? তা-ই বা কী করে সম্ভব? অশোকদা যদি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতই থাকবে, তা হলে এ-রকম একটা খুন হয়ে গেল কী করে?

"কী হল গোগোল, তুমি আবার মাথা তুলে বসলে কেন?" পাশ থেকে মা হঠাৎ বলে উঠলেন।

গোগোল চমকে পাশ ফিরে দেখল, মা ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। মাকে ফাঁকি দেবার কোনো উপায় নেই। ও একটু হেসে বলল, "কিছু নয়, এমনি।"

"সে আমি খুব ভালই বুঝতে পারছি। তোমার মাথায় অশোকদা ঘুরছে। আমি বলছি, তুমি এখন ঘুমোও, কাল সকালে তোমার অশোকদার সঙ্গে দেখা ঠিকই হবে।" মা এই কথা বলে, পায়ের কাছে রাখা একটা ছোট ব্যাগ থেকে, পাতলা একটা ভাঁজ করা চাদর গোগোলের কোলের ওপর রেখে বললেন, "যখন বেশি শীত করবে, এটা গায়ে চাপিয়ে নিও। নাও, এখন শুয়ে পড়ো।"

গোগোল আবার মাথাটা পিছনে এলিয়ে দিল। মা তাঁর গায়ের আঁচলটাই আর একটু ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। মাথাটা পিছনে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন। গোগোলও চোখ বুজল, আর তৎক্ষণাৎ ওর মনে হল, পিছন থেকে ওকে যেন কেউ এক নজরে দেখছে। কেন এ-রকম মনে হয়, গোগোল কারুকে কখনো বোঝাতে পারে না। ও আস্তে আস্তে মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল, কামরার শেষ প্রান্তের দরজার কাছে, সেই টাকমাথা দোহারা চেহারার ভদ্রলোক গোগোলের দিকেই তাকিয়ে আছেন। ও মুখ ফেরাতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। আশ্চর্য গোগোলের মনে হওয়ার সঙ্গে ব্যাপারটা একেবারে মিলে গেল!

গোগোল তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে, কয়েক সেকেন্ড পরে আবার মাথা ঘুরিয়ে দেখল। ভদ্রলোকও তখন পিছন ফিরে দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই ভদ্রলোক তো অশোকদার কামরার সেই লোক, যে গোগোলকে নানা ভাবে জেরা করেছিলেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপারের কোনো যোগাযোগ নেই? অন্তত গোগোল ভাবতে পারছে না। অথচ ভদ্রলোক যেভাবে গোগোলকে পিছন থেকে দেখছিলেন, মনে হল যেন উনি ওর ওপরেই নজর রাখছেন। নইলে ফার্স্ট ক্লাস থেকে চেয়ার-কার কামরার দরজায় এসে দাঁড়াবেন কেন আর গোগোল ফিরে তাকাতেই চোখাচোখিই বা হয়ে যাবে কেন?

গোগোল কিছুই বুঝতে পারছে না, অথচ ওর মন বলছে রাজধানী এক্সপ্রেসে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা কিছু ঘটছে। তার একটা প্রমাণ ও একটু আগেই পেয়েছে, চোখের সামনে খুন অশোকদার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। টাকমাথা ভদ্রলোকের কথানুযায়ী, একজন দক্ষিণদেশীয় লোকের নাম ওই কামরার লিস্টে ছিল। অর্থাৎ যে-লোকটি সাদা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে বই পড়ছিল। সেটাও একটা রহস্য, লোকটার ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, আর একটু ঘাড় ঝাঁকানো। সব ঘটনাগুলো ভাবলে মাথার জট পাকানো ছাড়া 'আর কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু টাকমাথা ভদ্রলোক কেন এ কামরার দরজায় এসে গোগোলকে দেখছিলেন?

ভাবতে ভাবতেই গোগোলের মনে পড়ে গেল পকেটের জিনিসটার কথা। ও একবার মায়ের দিকে দেখল। মা চোখ বন্ধ করে আছেন। ঘুমোচ্ছেন কি না, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবু, ও আস্তে আস্তে ডান দিকের পকেটে হাত ঢোকাল। সিগারেটের প্যাকেটের থেকে একটু বড়, প্লাস্টিক বা ওই জাতীয় কিছুর তৈরি একটা বাক্স বলে মনে হচ্ছে। গোগোল আবার মায়ের দিকে দেখল। সামনে পিছনে আশেপাশে দেখল। ওর দিকে কারোর নজর নেই। ও খুব সাবধানে পকেট থেকে জিনিসটা বের করে, ডান হাঁটুর পাশে রেখে, মুখ নিচু করে দেখল। লাল চকচকে চৌকো লম্বা একটা টর্চলাইট। মাথার দিকটা কালো বর্ডার, এক কোণে কাচের ভিতরে টর্চের ছোট বাল্‌ব দেখা যাচ্ছে। বোতামটা ডান দিকের মাথার কাছেই। গোগোল এ-রকম টর্চলাইট আগেও দেখেছে। কিন্তু এত ভারী লাগছে কেন? এর ভিতরে বড় জোর ছোট ছোট চারটে ব্যাটারি থাকতে পারে। তার জন্য এত ভারী হওয়া উচিত নয়।

গোগোল আবার মাকে এবং আশেপাশে দেখে, টর্চের মুখ নীচের দিকে করে, বোতাম টিপল। টর্চটা জ্বলল না। গোগোল আস্তে দু-একবার ঝাঁকুনি দিল, আবার বোতাম টিপল। টর্চ জ্বলল না। ব্যাটারিগুলো খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি? লোকটা মরবার আগে, গোগোলের পকেটে এটা ঢুকিয়ে দিয়েই বা গেল কেন? এমন চোখের পলকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সেই নেপালি টুপি মাথায় খুনী লক্ষই করেনি। এমন কী দামি টর্চলাইট হতে পারে, খুন হবার আগেই গোগোলের পকেটে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল?

গোগোল টর্চলাইটের তলাটা দেখল। খুলে দেখবে কি না ভাবল। এ সময়েই গাড়ির স্পীড কমে এল। আর মাইকে নিচু স্বরে ইংরেজিতে শোনা গেল, "আর দশ মিনিটের মধ্যেই রাজধানী এক্সপ্রেস কানপুরে পৌঁছুবে। কানপুরে পাঁচ মিনিট স্টপেজ......।"

গোগোল মাকে নড়ে উঠতে দেখেই, টর্চলাইটটা আর পকেটে পোরার সময় পেল না। পায়ের কাছে রাখা ব্যাগের মধ্যে একটা তোয়ালের নীচে ঢুকিয়ে দিল। দিয়েই আবার মাথা এলিয়ে দিল। মা চোখ মেলে হাতের ঘড়ি দেখলেন। গোগোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঘুমোওনি এখনো?"

গোগোল বলল, "ঘুম আসছে না।"

মা বললেন, "রাত্রি সাড়ে-দশটা বেজে গেছে। ঘুমোবার চেষ্টা করো।"

গোগোলের তখন মাথায় চিন্তা ঢুকেছে, যে-লোকটা খুন হয়ে ফার্স্ট ক্লাসের করিডরে পড়ে আছে, তাকে কি কারোর চোখে পড়েনি? পড়লে তো এতক্ষণে গাড়িতে একটা হৈ-চৈ লেগে যেত। কিন্তু গাড়ির মনে গাড়ি চলেছে। যেন রাজধানী এক্সপ্রেসে কিছুই ঘটেনি। মাইকে ঘোষণা করছে, গাড়ি কানপুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে।

গোগোলের এই ভাবনার মধ্যেই গাড়ি কানপুর স্টেশনে দাঁড়াল। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। প্ল্যাটফরমটা উলটো দিকে পড়েছে। ও দেখতে পাচ্ছে, কয়েকটা রেললাইন, দাঁড়িয়ে থাকা এঞ্জিন। আরও দূরে একটা মালগাড়ি আস্তে আস্তে চলছে। দু জায়গায় কয়লা পুড়ছে, আশেপাশে কয়েকটা লোক।

গোগোল মুখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে দেখতে গেল, আর ওর নজর পড়ে গেল, সামনের দরজার দিকে। সেখানে অশোকদা দাঁড়িয়ে ওকেই দেখছেন। মুখে সেই ফ্রেঞ্চকাট। গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আবার সরে গেলেন। দরজায় দাঁড়াবার উপায় নেই, অনবরত কামরার দরজা দিয়ে লোক যাতায়াত করছে। গোগোল মনে মনে উত্তেজিত আর চঞ্চল

হয়ে উঠল। অশোকদা! যেমন করে হোক একবার দেখা করতেই হবে। তাকে তাড়াতাড়ি সব কথা বলা দরকার। ও মায়ের দিকে দেখল। মা বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফরমের লোকজন আলো দেখছেন।

গোগোল বলল, "মা, আমি একটু বাথরুমে যাচ্ছি।"

মা কোনোরকম সন্দেহ না করেই বললেন, "যাও, কিন্তু বাইরে জল খেও না, ব্যাগে বোতলে জল আছে।"

গোগোলের কানে সে-সব কথা গেলই না। মা'কে ডিঙিয়ে, সীটের মাঝখান দিয়ে, তাড়াতাড়ি সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

গোগোল-হরণ

গোগোল দরজা ঠেলে বাইরে এসে দেখল, সামনে আর বাথরুমের দু পাশে বেশ ভিড় হয়েছে। বাঁ দিকে প্ল্যাটফরমের দরজাটা সামান্য ফাঁক করা। ডান দিকেরটা বন্ধ। বেশির ভাগ বড়রাই সিগারেট খাচ্ছেন। গোগোল দেখল, বাঁ দিকে, দরজাটার কাছেই, অশোকদাও সিগারেট টানছে। বাঁ হাতে ইলেভেন

দুর্গতি নাশিনি, ক্ষুধা বিনাশিনি

দুর্গতির ধ্বংস অনিবার্য্য। মা দুর্গা প্রতি বছর এক অভিনব, বর্নাঢ্য রূপে একথা আমাদের স্মরন করিয়ে যান। প্রতি শরতে আমরা তাঁর এই বিজয় উৎসব পালন করি এবং প্রার্থনা করি তাঁর আশির্বাদ।

ফুড করপোরেশন তার সদিচ্ছা এবং শপথ নিয়ে এই জাতীয় উৎসবের শরীক। তার শপথ ও আশা— দেশে সুষম খাদ্যের যোগান। ধন ধান্যে ভরে উঠুক সারা দেশ— বার মাস। চিরস্থায়ী হোক এই মহান উৎসব। দেশের কৃষক এবং উপভোক্তার মুখের হাসি অটুট থাক।

ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া

দেশের সেবায় নিয়োজিত

FDS/FCI/11B/8/79

-এর বোতল। গোগোলকে দেখেই অশোকদা কেমন যেন ত হয়ে উঠল, বলল, ''এ কী, তুমি এখানে এলে কেন? মি তো তোমাকে ডাকিনি, বা আসতেও বলিনি।''

গোগোল ভিড়ের দিকে একবার দেখে, গলা নামিয়ে বলল, শোকদা, একটা ভীষণ খবর আছে। কিন্তু আপনি কোথা য়ে এখানে এলেন? ভেতর দিয়ে এলে তো দেখতে পেতাম।"

অশোকদা যেন কেমন সন্দেহের চোখে আশেপাশে সকলের খের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, "কী করে আবার নে আসব? বাইরে প্ল্যাটফরম দিয়ে এসেছি, আর আমি মাকে দেখতেই এসেছিলাম। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মে যাব। তোমার আসা উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি ভেতরে য়ের পাশে গিয়ে বসে পড়ো।"

গোগোল ভীষণ উত্তেজিত, বলল, "আমি জানি নে, আপনি পনার কামরা থেকে কোথায় চলে গেছেন, কিন্তু এদিকে কটা—।"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ সমস্ত আলো ভে গেল। অন্ধকারের মধ্যে ঠেলাঠেলি লেগে গেল। গোগোল তে পারল, ওর হাত শক্ত করে ধরে, ওকে ডান দিকে টেনে য়ে চলেছে। ও প্রথমে ভাবল অশোকদা। কিন্তু কিছু বুঝে র আগেই ডান দিকের দরজাটা খুলে গেল, আর গোগোলকে উ ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল। গোগোল ভয়ে শব্দ করে র আগেই নীচে থেকে কেউ ওকে লুফে নিয়েই ছুটতে রম্ভ করল, আর ওর নাকের কাছে ভয়ঙ্কর উগ্র গন্ধ মাখা পড় চেপে ধরল। গোগোল বুঝতে পারল, ওর নিশ্বাস বন্ধ য়ে আসছে, ও নির্ঘাত মরে যাচ্ছে। ওর চোখের সামনে একবার শোকদার, তারপরে বাবা-মায়ের মুখ ভেসে উঠল। আর ছুই ভাবতে পারল না, মনে করতে পারল না, ওর জ্ঞান লোপ পেল।

এই হৈ-চৈ গোলমাল আর অন্ধকারের মধ্যে, অশোক বাঁ দিকের দরজাটা খুলে প্ল্যাটফরমে লাফিয়ে পড়ল। পড়েই পিছন দিকে ছুটল। লোকজন সব কামরার মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগল। কামরার বাইরে করিডরে আলো নিভলেও, ভিতরে আলো জ্বলছে। সবাই বলাবলি করছে, কারা যেন অন্ধকারে ধস্তাধস্তি করছিল। কেউ বলল, ডান দিকের দরজা খুলে কারা যেন বাইরে লাফিয়ে পড়েছে।

গোগোলের মা সব শুনে উঠে দাঁড়ালেন। তখনই মাইকে রেষের উত্তেজিত গলা শোনা গেল, "যাত্রিগণ, আপনারা যে-যার কামরায়, নিজের নিজের আসনে বসে পড়ুন। রাজধানী এক্সপ্রেসে ফার্স্ট ক্লাসে একটি হত্যাকান্ড ঘটেছে। পুলিস এসে গাড়ির দায়িত্ব নিলেই গাড়ি ছাড়বে। তার আগে কানপুর থেকে গাড়ি ছাড়বে না। আশা করি, যাত্রিগণ রেলকর্তৃপক্ষ এবং পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ।"

গোগোলের মা তবু তাঁর আসনে বসতে পারলেন না। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। একজন ভদ্রলোক ইংরেজিতে গোগোলের মাকে বললেন, "বাইরে বাথরুমে যেতে পারবেন না, ওখানে অন্ধকার।"

মা বললেন, ''কিন্তু আমার ছেলে যে বাইরে রয়েছে। সে বাথরুমে গেছল, এখনো ফেরেনি।''

যে দু-চারজন তখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে একজন বলল, ''আপনি আসুন, আমরা আপনার সঙ্গে দেখছি। কত বড় ছেলে?''

মা বললেন, "দশ-এগারো বছর।''

গোগোলের মায়ের সঙ্গে কয়েকজন বাইরে এল। তখনই প্ল্যাটফরমের দরজা দিয়ে বন্দুক হাতে দুজন পুলিস ঢুকল। একজন হিন্দিতে বলল, "এ কী, এখানে অন্ধকার কেন?''

একজন যাত্রী হিন্দিতেই জবাব দিল, "গাড়ি এসে দাঁড়াবার কয়েক মিনিট পরেই এখানকার করিডর আর বাথরুমের আলো নিভে যায়।''

একজন পুলিস বলল, "নিশ্চয়ই তা হলে ওখানে বিজলির লাইনে কিছু গড়বড় হয়েছে। কিন্তু আপনারা ওখানে কী করছেন? সবাইকেই যার-যার কামরায় নিজের জায়গায় বসতে বলা হয়েছে।''

প্ল্যাটফরমের আলোতেই সবাইকে কিছুটা দেখা যাচ্ছিল। একজন যাত্রী গোগোলের মাকে দেখিয়ে বলল, "এই ভদ্রমহিলার ছেলে বাথরুমে এসেছিল। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা খুঁজতে এসেছি।''

বন্দুকধারী দুই পুলিসই যেন অবাক হল। একজন জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটি কি এদিকেই এসেছিল?''

গোগোলের মায়ের ভয়ে আর উদ্বেগে কান্না এসে গিয়েছে। তিনি হিন্দিতেই বললেন, "হ্যাঁ, আমার ছেলে এদিকের বাথরুমেই এসেছিল।''

অন্য একজন পুলিস মুখোমুখি দুটো বাথরুমের দরজাই খুলে ফেলল। কেউ কেউ লাইটার জ্বালাল, কেউ দেশলাই। পুলিসের সঙ্গে কয়েকজন যাত্রীও বাথরুমের ভিতরে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল। গোগোলের মা-ও দেখলেন। যদিও তিনি জানেন, এ-রকম অবস্থায় গোগোল কখনোই অন্ধকারে একলা বাথরুমে থাকতে পারে না। সবাই বলল, "বাথরুম একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই।''

কথা শেষ হতে না-হতেই বাথরুম আর করিডরের আলো জ্বলে উঠল। সবাই সবাইকে দেখতে পেল। কিন্তু কেউ কিছু বলবার আগেই, পাশাপাশি দুটো চেয়ার-কার বগির কনডাকটর প্ল্যাটফরমের দরজা দিয়ে ঢুকল। তার সঙ্গে একজন রেল পুলিসের ইনস্পেকটর। কনডাকটর ডান দিকের খোলা দরজাটা দেখিয়ে হিন্দিতে বলল, "দেখুন সাহেব, এখনো দরজাটা খোলা রয়েছে।''

ইনস্পেকটরের কোমরের বেল্টে রিভলবার। সে কোমরে হাত দিয়ে খোলা দরজাটা দেখে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ওদিক দিয়ে যে কেউ লাফিয়ে পড়েছে, তা তুমি দেখলে কেমন করে?''

কনডাকটর বলল, "চোখে দেখব কী করে সাহেব? আমি তখন প্যাসেনজারদের বোতলের ঠান্ডা পানি আর বরফ দিচ্ছিলাম। পয়সাও নিচ্ছিলাম। ওই দরজাটা খোলবার কথা নয়। কিন্তু যেই অন্ধকার হয়ে গেল, মনে হল, কারা যেন ঠেলাঠেলি আর ধস্তাধস্তি করছে। দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, আর মনে হল নীচে পাথরের ওপর কেউ লাফিয়ে পড়ল। আমি আওয়াজেই টের পেয়েছি।''

ইনস্পেকটরের বয়স বেশি নয়, কিন্তু মুখটা খুবই গম্ভীর। যাত্রীদের সকলের এবং বিশেষ করে গোগোলের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আপনারা এখানে কী করছেন? জানেন না—।"

তার কথা শেষ হবার আগেই একজন বন্দুকধারী গোগোলের মাকে দেখিয়ে বলল, "স্যার, এই মায়ীজীর ছেলে বাথরুমে এসেছিল, এখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ইনসপেকটর গোগোলের মায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি? এ তো খুব আশ্চর্যের কথা! একটা খুনের সঙ্গে বাচ্চা ছেলের হারিয়ে যাবার কী থাকতে পারে? ঠিক আছে, আপনি এদের একজনের সঙ্গে গোটা ট্রেনের সব বগি-গুলো ঘুরে দেখুন, আপনার ছেলেকে পাওয়া যায় কি না। না পাওয়া গেলে, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।" সে একজন বন্দুকধারীকে

বলল, "তুমি ওঁর সঙ্গে গাড়ির শুরু থেকে শেষ, সব দ্যাখো। আমি সুপারকে খবর দিয়ে গাড়ি ছাড়তে বারণ করছি। কারণ ছেলেটি হয়তো কোনো কারণে ভয় পেয়ে অন্য কামরায় চলে গেছে, অথবা ট্রেনের বাইরে কোথাও ঘোরাঘুরি করছে। আপনার ছেলের নামটা জানতে পারি?" ইনসপেকটর গোগোলের মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা বাঙালি স্টাফ দিয়ে মাইকে তাকে নাম ধরে ডেকে আপনার কাছে ফিরে আসতে বলব।"

গোগোলের মায়ের তখন বুক ঠেলে কান্না আসছে। তবু তিনি বললেন, "আমার ছেলের নাম গোগোল। শুধু ওই নামটা শুনতে পেলেই, সে যেখানেই থাক, চলে আসবে।"

ইনসপেকটর পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে নামটা টুকে নিয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে গেল। গোগোলের মা বন্দুকধারীর সঙ্গে প্রথমে এগিয়ে চললেন করিডর দিয়ে সামনের দিকে। কিন্তু তিনি ভালই জানেন, গোগোল এভাবে মায়ের কাছ থেকে সরে থাকবার ছেলে নয়। অথচ কী ঘটতে পারে, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁর মনে পড়ল অশোক ঠাকুরের কথা। তার সঙ্গে কি গোগোলের কোনো যোগাযোগ ঘটেছে? কিন্তু গোগোল নিজেই বলেছিল, অশোক ঠাকুরের দেখা ও পায়নি। মাঝখান থেকে বন্দুকধারীর সঙ্গে গোটা রাজধানী এক্সপ্রেসের মাথা থেকে ল্যাজা অবধি ঘুরে মাকে ঢুকতে হল ফার্স্ট ক্লাসের এক চার বার্থের কামরায়। বোঝা গেল, সেখানে তখন কানপুর রেল আর বাইরের পুলিসের কর্তাব্যক্তি এবং রেলের অফিসাররা রীতিমত কনফারেন্স বসিয়ে দিয়েছেন।

গোগোলের মাকে তাঁরা নানা জনে নানারকম প্রশ্ন করলেন। যেমন, তিনি কিছু অনুমান করতে পারছেন কি না, তাঁর ছেলে কোথায় যেতে পারে? অর্থহীন সব প্রশ্ন। মা যদি তা জানবেনই, আগেই বলে দিতেন। অবশ্য একটা প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতেই হল। তাঁদের পরিচিত আর কেউ এই ট্রেনে যাচ্ছেন কি না, যাঁর সঙ্গে গোগোল থাকতে পারে? মায়ের মনে পড়ে গেল অশোক ঠাকুরের কথা। কিন্তু সে-কথা তিনি বলতে পারলেন না। তারপরে গোগোলের বাবার নাম, দিল্লি আর কলকাতার ঠিকানা, গোগোলের চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি লিখে নিয়ে, মাকে তাঁর জায়গায় গিয়ে বসতে বলা হল।

মা তখন চোখের জলে সবই ঝাপসা দেখছেন, আর গোগোলকে নিয়ে আকাশপাতাল ভাবছেন। আসনে বসতে গিয়ে দেখলেন, গোগোলকে যে-চাদরটা দিয়েছিলেন, সেটা সীটের নীচে পড়ে আছে। মা সেটা তুলে পায়ের কাছে ব্যাগে রাখতে গিয়ে একটু চাপ দিতেই শক্তমতো কিছু ঠেকল। তিনি অবাক হয়ে মাথা নিচু করে তোয়ালের নীচে দেখলেন একটা লাল চৌকো টর্চলাইট। আশ্চর্য, এটা এল কোথা থেকে? তিনি হাত দিয়ে টর্চলাইটটা ছুঁয়ে দেখলেন, কিন্তু তুলে নিলেন না। তুলে নিলেই তাঁর আশেপাশে সবাই দেখতে পাবে। এমনিতেই সবাই তাঁর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে দেখছে। কারোরই জানতে বাকি নেই, তাঁর ছেলেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া মা ভাবলেন, এই লম্বা সিগারেটের বাক্সের মতো লাল টর্চলাইট নিশ্চয় গোগোল কোথাও থেকে এনে ঢুকিয়েছে। দিল্লি থেকে এটা ব্যাগে ঢোকানো হয়নি, মায়ের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথা থেকে গোগোল এই টর্চ যোগাড় করল? একথা কি পুলিসকে জানানো উচিত?

মায়ের মন বলল, না থাক। গোগোল যখন কিছু বলে যায়নি, যেখানকার জিনিস সেখানেই থাক। মা তোয়ালে আর চাদর দিয়ে টর্চটা আগের মতোই ঢাকা দিলেন। এখন কামরার সব আলোগুলোই আবার জ্বলছে। কোনো কামরাই এখন আর অন্ধকার নেই।

অশোক যে-মুহূর্তে দেখল, করিডর আর বাথরুম অন্ধকার হয়ে গেল, সে হাত বাড়িয়ে গোগোলকে ধরতে গেল। কিন্তু গোগোলের ছোট হাতের বদলে বড় মানুষের গায়ে হাত পড়ল। কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সে দেখল, উলটো দিকের দরজাটা খুলে গেল। তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি ধস্তা-ধস্তি লেগে গিয়েছে। অনেকেই ডাকাত পড়ার কথা ভাবছিল, আর যে যার পকেট, হাতের ঘড়ি সামলে, কামরার দিকে ঠেলে ঢোকবার চেষ্টা করছিল। তার মধ্যেই অশোক লক্ষ করল, উলটো দিকের খোলা দরজার ওপরে একটা মানুষ, তার হাতে ছোট একটি মূর্তি হাত-পা ছুঁড়ছে। গোগোল? ভাববার মুহূর্তেই, ছোট মূর্তিটাকে ঠেলে বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া হল। অশোক ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে উলটো দিকের দরজার কাছে গেল। কিন্তু অন্ধকারে দরজার সামনে লোকটা ভিড়ের মধ্যে চোখের পলকে হারিয়ে গিয়েছে। অশোক বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রেল লাইনের ওপর দিয়ে গায়ে চাদর জড়ানো, ট্রাউজার-পরা একটি মূর্তি ছুটে চলেছে, আর তার ঘাড় এবং মাথার ওপর দিয়ে যেন দুটো ছোট হাত-পা ছিটকে ঠেলে উঠছে। অশোক মুহূর্তেই বুঝে নিল, গোগোলকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তবু সে একবার গোগোলদের চেয়ারকারের দরজা খুলে দেখে নিল, গোগোলের মা একলা বসে আছেন। বসে আছেন এদিকে তাকিয়েই।

অশোক আর এক সেকেন্ড অপেক্ষা না করে প্লাটফরমে লাফিয়ে পড়ল। পেছন দিকে ছুটে গিয়ে প্রথম ফার্স্ট ক্লাসের বগিতে উঠে 'সি' কামরার খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সেই টাকমাথা দোহারা চেহারার লোকটি নেই। বাকি সেই রোগা লম্বা সাদা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা লোকটি তখনো বই পড়ছিল। অশোক ভিতরে ঢুকে বলল, "ফটিক, আর বই পড়তে হবে না, এখানেই আমাদের নামতে হবে। তোর কামরার সেই টেকো কোথায় গেল?"

যাকে এতক্ষণ দক্ষিণ-ভারতীয় বলে জানা গিয়েছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "বিক্রমের কথা বলছিস? সে তো গাড়ি থামতে না-থামতেই ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এই কানপুরে নামবি? হঠাৎ? কী হল?"

অশোক বলল, "আমি পরিষ্কার দেখেছি, গোগোলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়েছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাকে খুঁজতে গিয়ে থার্ড বগির ফার্স্ট ক্লাসে গোগোলের চোখের সামনেই কিছু একটা গোপন ঘটনা ঘটেছিল, আর যারা ঘটনা ঘটিয়েছিল, তারাই গোগোলকে লোপাট করেছে।"

ফটিকের আসল নাম অয়স্কান্ত রায়, অশোকের ছেলেবেলার বন্ধু। হিলহিলে শক্ত স্টীলের মতো শরীর। ভাল জুডো শিখেছে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে নিজেই কল-কাতায় অফিস করেছে। আজকাল অশোকের যে-কোনো কাজেই ফটিক সঙ্গে থাকে। দিল্লিতে কয়েক কোটি টাকার একটা জালি-য়াতি, আর তার সঙ্গে জড়িত একটা খুনের রহস্য উদ্ধারের কাজে অশোকের সঙ্গে ফটিকও এসেছিল। টাকার জালিয়াতি ধরা পড়েছে, খুনটার সূত্র ধরেই ওকে আর ফটিককে ছদ্মবেশে কলকাতায় ফিরতে হচ্ছে। ফেরবার জন্য দুজনের দু জায়গায় আলাদা বগিতে বার্থ নেওয়া হয়েছিল। অবশ্যই নাম পালটাতে হয়েছিল। এই ফেরার পথে গোগোলকে দেখে চিনতে পেরে, অশোক তার সঙ্গে আলাপ না করে পারেনি। একবার মনে হয়েছিল, গোগোলের সঙ্গে ট্রেনে আলাপটা না করলেই হত। এখন মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিকই হয়েছে। কেবল গোলমাল হয়ে গিয়েছে, অশোকের কামরা বদলানো। আসলে অশোক তো গোগোলকে বাজে কথা বলেনি। তার এ কামরাতেই থাকার কথা ছিল। সে জানত মিঃ এ কে কারলা নামে এক ভদ্রলোক ওর দুই বার্থের একজন যাত্রী। কিন্তু গোগোল চলে যাবার পরেই, ফটিক

তার হাতব্যাগ নিয়ে অশোকের কামরায় ঢুকে ফিসফিস করে বলেছিল, "অশোক, তুই শিগগির এ কমপার্টমেন্ট থেকে ভেগে পড়। মিঃ এ কে কারলা মানে হাউস খাসের সেই বিক্রম সিং, দিল্লির কেসে যাকে আমরা সব জেনেশুনেও কিছুতেই জড়াতে পারিনি। বিক্রম সিং এ কে কারলা নামে তোর পিছু নিয়েছে। তুই যতই ফ্রেঞ্চকাট লাগাস, বিক্রম তোকে ঠিক চিনে ফেলবে। বিক্রম জানে, তুই এই গাড়িতে যাচ্ছিস। বোধহয় বিশেষ এই কামরার খবরটাও জানে। যাই হোক, তুই আমার জায়গায় চলে যা, আমি তোর জায়গায় থাকছি। বিক্রম তোকে চিনলেও চিনতে পারে, আমাকে পারবে না, কারণ সে আমাকে দিল্লিতে সামনা-সামনি একবারও দেখেনি। তা ছাড়া তুই আর আমি দুজনেই সাউথ ইন্ডিয়ান নাম নিয়েছি, বিক্রম আমাকে ধরতে পারবে না।"

ফটিকের কথাগুলো অশোকের মনে ধরেছিল। সে আর দেরি না করে, নিজের স্যুটকেসটা নিয়ে, ফটিকের জন্য নির্দিষ্ট কামরার আসনে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কানপুরে গাড়ি দাঁড়াতেই গোগোলকে একবার দেখা দেবার জন্য তার মনটা ছটফট করছিল। তাই সে প্ল্যাটফরমে নেমে, গোগোলদের চেয়ার-কার কামরার বাইরের করিডর থেকে দরজা খুলে উঁকি দিয়েছিল। গোগোল দেখেই ছুটে এসেছিল। অশোকের ভয় ছিল তার সঙ্গে গোগোলকে দেখলে, বিক্রম সিংয়ের আর কোনো সন্দেহ থাকবে না, সে-ই অশোক ঠাকুর। তাই সে তাড়াতাড়ি গোগোলের উত্তেজনা লক্ষ করেনি বা কোনো কথা শুনতে চায়নি, তাড়াতাড়ি কামরার মধ্যে মায়ের কাছে ফিরে যেতে বলেছিল। ইচ্ছে থাকলেও গোগোলকে বলা সম্ভব ছিল না, ও যেন বিক্রম সিং সম্পর্কে সাবধান থাকে। আর কোনো ঘটনা যদি দেখে থাকে, তবে কারো কাছে যেন একদম মুখ না খোলে। তার মধ্যেই হঠাৎ অন্ধকার নেমে এসেছিল, আর যা ঘটবার তা ঘটে গিয়েছিল।

অশোক যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ফটিককে ঘটনা বুঝিয়ে বলতে বলতেই মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, রাজধানী এক্সপ্রেসে হত্যাকাণ্ড, পুলিসের আগমন, যে-যার কামরায় এবং আসনে যেন বসে, ইত্যাদি। অশোক মাইকের সব কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল, "ফটিক, আমি বোধহয় খুব ভুল ভাবিনি। জানিনে, গোগোলের চোখের সামনে খুনের ঘটনাটা ঘটেছে কি না, কিন্তু আমাদের আর এক সেকেন্ড অপেক্ষা করা উচিত নয়। এখানেই আমাদের নামতে হবে।"

ফটিক বলল, "নামতে তো কোনো অসুবিধেই নেই। আমারও তো একটা অ্যাটাচির সাইজের চেয়ে একটু বড় একটা স্যুটকেস মাত্র। কিন্তু কানপুরে নেমে যাবি কোথায়? গোগোলকে যারা নামিয়ে নিয়েছে, তারা যে আবার অন্যদিক দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসেই উঠবে না, তা জানলি কেমন করে?"

অশোক বেশ জোর দিয়ে বলল, "অসম্ভব! ওরা গোগোলকে ট্রেনে রাখা নিরাপদ মনে করেনি বলেই ওইরকম রিস্ক করে নামিয়ে নিয়েছে। সে-রকম ঘটনা হলে ট্রেনের মধ্যেই গোগোলকে চোখে চোখে রাখত। কিন্তু ফটিক, অন্য কিছু ভেবে লাভ নেই। এ কে কারলা ওরফে বিক্রম সিং এসে পড়লে গোলমাল হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি চল্।"

ফটিক সীটের নীচে থেকে এক টানে নিজের ছোট স্যুট-কেসটা টেনে নিয়ে বলল, "চল। কিন্তু দেখিস, আমাদের না আবার পুলিস কানপুর স্টেশনেই আটকে দেয়।"

অশোক বলল, "পুলিস আসবার আগেই আমরা রিফ্রেশ-মেন্ট রুমে গিয়ে কিছু খাবার অর্ডার দিয়ে বসব। একদম তাড়া-হুড়ো করিসনে, ধীরেসুস্থে হেঁটে চল, আর চারদিকে কান পেতে রাখ।"

অশোক আর ফটিক, দুজনেই প্লাটফরমে নেমে এল। প্ল্যাটফরমের চেহারা দেখেই বোঝা গেল, খবরটা সেইমাত্র রটেছে, আর সবাই গাড়ির মধ্যে খুনের কথা নিয়ে আলোচনা করছে। পুলিশ রাজধানী এক্সপ্রেস ঘিরে ধরবার আগেই, অশোক আর ফটিক সোজা এক নম্বর প্ল্যাটফরমের রিফ্রেশমেন্ট রুমে ঢুকে পড়ল। বইয়ের স্টলের পাশে, পাশাপাশি দুটো খাবার হল, একটা ভেজিটেরিয়ান, আর একটা নন-ভেজিটেরিয়ান। ওরা নন-ভেজি-টেরিয়ান রুমে ঢুকল। অধিকাংশ টেবিলই ফাঁকা। দু-চারটিতে যারা বসে আছে, বা খাচ্ছে, তাদের তেমন কোনো তাড়া নেই। বোঝা যাচ্ছে, তারাও মাইকের ঘোষণায় শোনা রাজধানী এক্স-প্রেসের খুনের বিষয় নিয়েই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কাউন্টারের টেবিলে কোনো লোক নেই। বেয়ারারা অধিকাংশই বাইরে গিয়ে হাঁ করে রাজধানী এক্সপ্রেসের দিকে তাকিয়ে দেখছে। বোঝা যাচ্ছে, রাজধানী এক্সপ্রেসের ঘটনা শুনে, কারো কিছু করার থাকুক বা না থাকুক, সবাই ওই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অশোক রিফ্রেশমেন্ট রুমের চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল। তারপরে ফটিকের সঙ্গে চোখাচোখি করে উলটো দিকের দরজা দেখিয়ে নিচু স্বরে বলল, "বসবার দরকার নেই, বরং বেরিয়ে পড়া যাক। আস্তে আস্তে চল।"

দুজনে পাশাপাশি টেবিলের মাঝখান দিয়ে উলটো দিকের পাশাপাশি কয়েকটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল চওড়া বারান্দায়। রিফ্রেশমেন্ট রুম ছাড়াও চওড়া লম্বা বারান্দার এক ধারে পাশাপাশি কয়েকটা অফিস-ঘর। অশোক ডাইনে বাঁয়ে দেখে, বাঁয়ে এগিয়ে চলল। ফটিক অনুসরণ করল। রেলের সাধারণ কর্মচারী, দু-একজন ঝাড়ুদার ছাড়া, কেউ ওদের সামনে পড়ল না। কেউ ওদের বিশেষ লক্ষও করল না। দুজনে সোজা বুকিং অফিসের চত্বরের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এল একেবারে স্টেশনের বাইরে। রাত প্রায় এগারোটা বাজলেও কানপুর স্টেশন-চত্বরে সাইকেল-রিকশা, টাঙা আর ট্যাক্সির ভিড় কিছু কম ছিল না। কিন্তু যাত্রীদের হৈ-চৈ ছুটো-ছুটি ব্যস্ততা ছিল না। অশোক আর ফটিকের আশপাশ দিয়ে লোক চলাচল করছে, আর কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, সকলেই রাজধানী এক্সপ্রেসের খুনের বিষয়েই কথা বলছে। অশোক আর ফটিককে লক্ষ করে দু-একটা সাইকেল-রিকশা আর টাঙাওয়ালা দু-একবার আওয়াজ দিল।

অশোক নিচু স্বরে বলল, "ওরা গোগোলকে নিয়ে উলটো দিকে নেমে কোন্ দিকে যেতে পারে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না।"

ফটিক বলল, "তোর কি মনে হয়, ওরা রেললাইন পেরিয়ে উলটো দিকে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে?"

অশোক স্টেশনের সামনে রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "গোগোলকে নিয়ে ওরা গা-ঢাকা দিয়েছে ঠিক, কিন্তু বসে থাকবে বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য লাইন ক্রস করে ওপারে গেলে, রাস্তা কোন দিকে কোথায় গেছে, কিছুই জানি না। তা ছাড়া, গোগোলকে নিয়ে যে-লোকটা যাচ্ছিল, সে সোজা এঞ্জিনের দিকে যাচ্ছিল, তার মানে সামনের দিকে। বোধহয় লাইন ক্রস করতে গেলে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের সামনে পড়ার ভয় আছে। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স কথায় কথায় গুলি চালিয়ে দেয়।"

অশোক আর ফটিক, দুজনেই স্টেশন-চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল। স্টেশনের কাছে শহর এখনো বেশ সরগরম। ফটিক বলল, "কিন্তু এই অচেনা জায়গায় অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবি কোথায়?"

অশোকের মনে গোগোলের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগ থাকলেও একটু হেসে বলল, "মিঃ অয়স্কান্ত রায়, দিল্লিও আমাদের খুব
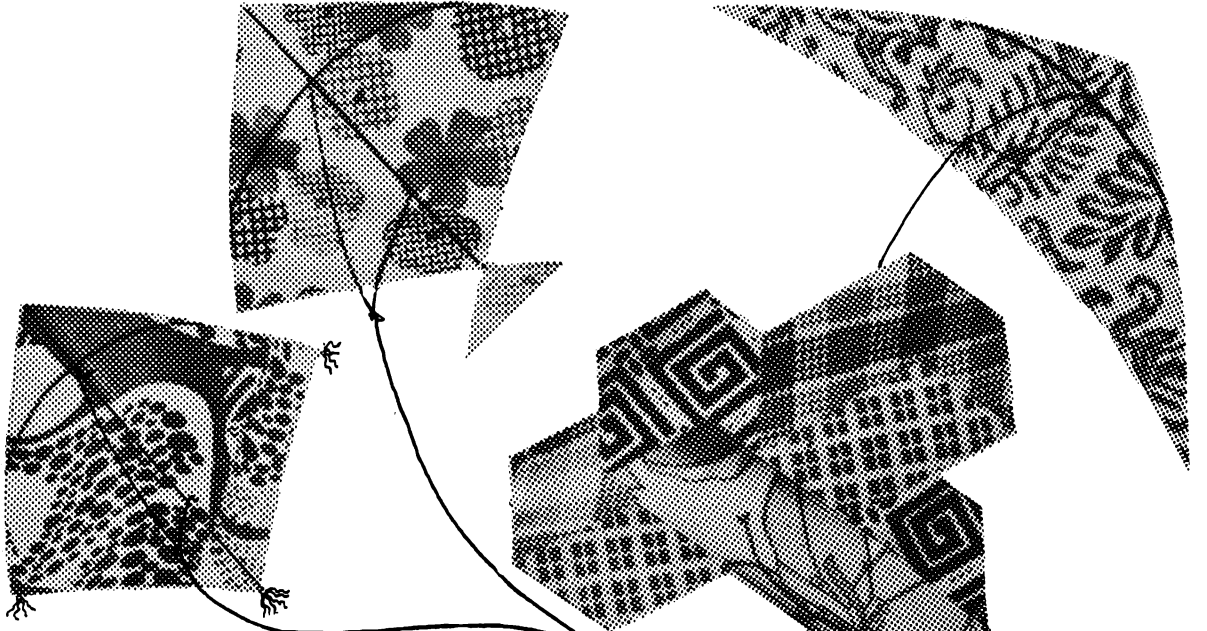
আজকের সুন্দরতম-ফ্যাসান বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আপনি ফ্যাসান বিপ্লবের পুরোগামী হোন।
• "ট্রিপল ক্রাউন" এবং "ভেনাস সুপ্রিম" সুটিংস
• পলিফিল এবং পলিকট সারটিংস
৪৮/৫২, ৬৭/৩৩ ও ৮০/২০ অনুপাতের মিশ্রবোনট
• "সুপারষ্টার" ১০০% পলিয়েষ্টার প্রিণ্টস
• "রাজেশ্বরী" শাড়ী এবং পরমানন্দ ধুতি।
• লিজেণ্ডারি এম ৭ এ্যাণ্ড এম ১১ মুলস্
• একাক্লুসিভ এম ২৪ এ্যাণ্ড S ৬ লং ক্লথ
একই সঙ্গে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যকে আড়ম্বর উনমুখতায় মিলিয়ে কোঠারীর তৈরী বস্ত্র যে কোন ব্যাপারে যে কোন জায়গায় এবং যে কোন সময়ে আপনাকে আদর্শ সাজে সাজাবে। আজকের ফ্যাসানের ঘূর্ণাবর্ত্তে আপনাকে রাখবে সকলের আগে।
তাই আসুন কোঠারীর বস্ত্রের রংগীন জগতে ঢুকে ফ্যাসান দুনিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটান।
KOTHARI'S FABRICS
কোঠারী (মাদ্রাজ) লিমিটেড
কোঠারী বিলডিংস ১১৪/১১৭, নুংগমবাককম হাই রোড, মাদ্রাজ-৬০০ ০৩৪
কোঠারী ভবনের উৎকৃষ্ট বস্ত্র
কোঠারীর বস্ত্রে পরুন
ফ্যাসানে উৎফুল্লিত হয়ে উঠুন
national 639 BN

চেনা জায়গা ছিল না, তবু অন্ধকারে হাতড়েই কিছু তো বের করা গেছল, তাই না?”

ফটিকও হেসে বলল, “তা যা বলেছিস।”

অশোক আবার বলল, “এমনকী, রাত্রের অন্ধকারে পাতৌদি হাউসের সামনে দুটো লোককে চিনতে তোর কোনো ভুল হয়নি। দুটোকেই বাঘের মতো ঘাড়ে তুলে ছুটে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়েছিলি।”

ফটিক হেসে বলল, “ওসব কথা এখন বাদ দে। গোগোলের কথা ভাব।” বলতে বলতেই ওর ভুরু কুঁচকে উঠল, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, রাজধানী এক্সপ্রেসের তো এক নম্বর প্ল্যাটফরমে দাঁড়াবার কথা। তিন নম্বরে দাঁড়িয়েছে কেন?”

অশোক বলল, “ভাববার মতো কথা বটে, তবে আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটার মধ্যে খুনীদের বা গোগোলকে যারা লুট করেছে তাদের হাত নেই। তা হলে ধরে নিতে হয়, চক্রান্তটা এক বিরাট, রেলও এর সঙ্গে জড়িত। অবশ্য কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।”

ফটিক বলল, “তোর কি মনে হয় না, এক নম্বর প্ল্যাটফরমে গাড়ি দাঁড়ালে গোগোলকে ও-ভাবে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া বেশ শক্ত ছিল? দু নম্বর প্ল্যাটফরমের লোকেরা ঘটনাটা দেখতে পেতই। অথচ তিন নম্বরের ওপারে, চার নম্বরে কয়েকটা খাপ-ছাড়া ওয়াগন দাঁড়িয়ে ছিল, লোকজন বিশেষ ছিল না।”

অশোক বলল, “তোর কথা আমি মোটেই উড়িয়ে দিতে চাইছি না। কিন্তু রাজধানী এক্সপ্রেসকে একদল ষড়যন্ত্রকারী নিজেদের ইচ্ছেমতো প্ল্যাটফরমে দাঁড় করাচ্ছে, সেটা একটা বিরাট ব্যাপার! সেটা নিয়েও হৈ-চৈ পড়ে যাবার কথা। স্টেশনে সে-রকম কিছু শোনা যায়নি। যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভেবে এখন লাভ নেই।”

ফটিক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই স্টেশন থেকে মাইকে স্পষ্ট বাঙলায় পুরুষের গলা শোনা গেল, “গোগোল! গোগোল, তুমি যেখানেই থাকো, যে-কোনো কামরায় বা বাইরের প্ল্যাটফরমে, তাড়াতাড়ি তোমার মায়ের কাছে চলে এসো...।”

ফটিক বলে উঠল, “লোকগুলোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গোগোল কোথায় পাচার হয়ে গেছে, তার ঠিক নেই, এখনো মাইকে বাঙলায় গোগোলকে ডাকা হচ্ছে।”

অশোক যেন ও-সব শুনেছিলই না। সে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, “রাজধানী এক্সপ্রেসের এঞ্জিনের দিকটা এদিকে। গোগোলকে নিয়ে লোকটা লাইনের ওপর দিয়ে এদিকেই ছুটে-ছিল। আমাদের দেখা দরকার, লোকটা গোগোলকে নিয়ে সামনে গিয়ে বাঁ দিকে কোথাও ফাঁক পেয়ে বা ইয়ার্ডের পাঁচিল ডিঙিয়ে শহরের এদিকে বেরিয়ে এসেছে কি না।”

ফটিক বলল, “হ্যাঁ, যদি উলটো দিকে লাইন ক্রস না করে থাকে, তবে শহরের এই দিকে আসাই সম্ভব।”

অশোক স্যুটকেশ হাতে ডান দিকে চলতে চলতে বলল, “রাস্তাটা খুব ছোটখাটো নয়, কিন্তু অচেনা শহরের কোন্ রাস্তা যে কোন্ দিকে গেছে, কিছুই বুঝতে পারছিনে।”

ফটিক অশোকের পাশে চলতে চলতে বলল, “আমি তো দেখছি, তিনটে রাস্তা তিন দিকে গেছে, আর তিনটে রাস্তাই বড়। শুধু একটা কথাই আমার জানা আছে। ন্যাশনাল হাই-ওয়ে টু, মানে জি টি রোড কানপুর থেকে দক্ষিণে টার্ন নিয়ে পশ্চিমে আগ্রার দিকে চলে গেছে।”

অশোক বলল, “দিল্লি বলতে, আমরাও তো পশ্চিম দিক থেকেই আসছি।”

ফটিক বলল, “হ্যাঁ, কিন্তু দিল্লি টু কানপুর মেন রেল লাইনের সঙ্গে জি টি রোডের যোগাযোগ ভায়া আগ্রা।”

অশোক না থেমে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “দিল্লি-আগ্রা-জি টি রোড যাই হোক গে, আমরা পশ্চিম দিক থেকে এসে হিসেবমতো এখন পুব দিকে হাঁটছি, তাই না?”

ফটিক বলল, “রেল লাইন বরাবর তাই হওয়া উচিত।”

অশোক হতাশভাবে বলল, “কিন্তু রেল লাইন দেখতে পাচ্ছিনে। অন্তত রেল লাইনের সীমানার পাঁচিলটা তো—।”

“অশোক!” ফটিক চুপিচুপি কিন্তু উত্তেজিত গলায় ডেকে উঠল, আর অশোকের বাঁ হাতটা চেপে ধরল, বলল, “রাস্তার বাঁ দিকে সাইকেল রিকশাটা দ্যাখ্। কে যাচ্ছে, চিনতে পারছিস?”

অশোক রাস্তার বাঁ দিকে ফিরে তাকাল। দোকানপাট আর রাস্তার আলোয় চলন্ত রিকশার ওপর টাকমাথা লোকটাকে দেখেই নিচু স্বরে বলল, “বিক্রম সিং না?”

ফটিক বলল, “হ্যাঁ, ট্রেনে নাম ভাঁড়ানো সেই এ কে কারলা। এ হঠাৎ রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে কানপুরের রাস্তায় রিকশায় কোথায় চলেছে?”

অশোক মুহূর্তের মধ্যেই যা করবার তা স্থির করে ফেলল। প্রায় দমবন্ধ চুপিচুপি গলায় বলল, “যেখানেই চলুক, বিক্রম সিংকে ছাড়লে হবে না, ওর পেছন নিতেই হবে।”

ফটিক অবাক আর কিন্তু-কিন্তু করে জিজ্ঞেস করল, “ট্রেনে খুন বা গোগোলকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে বিক্রম সিংয়ের কি কোনো যোগ থাকতে পারে? আমার তো ধারণা ছিল, ও তোর পিছু নিয়েছে?”

অশোক বলল, “তোর কি মনে হচ্ছে, বিক্রম সিং আমার পিছু নিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে কানপুরের রাস্তায় রিকশায় চলেছে? আমরা দুজনেই ওটা ভুল বুঝেছি। মনে রাখিস, কানপুরে গাড়ি দাঁড়াবার আগেই ও কামরা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। এতক্ষণ কোথায় ছিল, কিছুই জানিনে। ট্রেনের খুন আর গোগোলকে লোপাট করার সঙ্গে বিক্রমের কোনো সম্পর্ক আছে কি না বুঝতে পারছিনে, কিন্তু ফটিক, এটাই বোধহয় অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবার ফল।”

“মানে?” ফটিক জিজ্ঞেস করল।

অশোক বলল, “মনে রাখিস, বিক্রম সিং সহজ লোক নয়, আর এখন সে রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে কানপুরের রাস্তায় সাইকেল রিকশায়। কোনো দিকে নজর নেই, সামনের দিকে তাকিয়ে চলেছে। অন্ধকারের এ ফলটাকে কোনোরকমেই ছাড়া-ছাড়ি নেই। কিন্তু বিক্রমের রিকশা যে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়া-তাড়ি একটা রিকশা ধর।”

শহরের অন্য দুটো রাস্তার তুলনায়, এ রাস্তাটা কম চওড়া। দোকানপাটও খুব বেশি নেই, আলোও কম। ফটিক উলটো দিকে চলন্ত একটা খালি রিকশা ডাকবার জন্য হাত তুলতেই একটা মোটরের হর্ন বেজে উঠল, তখন অশোক বলে উঠল, “ডাকিস নে ফটিক, বিক্রমের রিকশা দাঁড়িয়ে পড়ছে। ডান দিকে সরে আয়।”

দুজনেই রাস্তার ডান দিকে একটা গাছ আর রাস্তার আলো-আঁধারিতে সরে দাঁড়াল। দেখা গেল, প্রায় একশো হাত দূরে ডান দিকেই একটা অ্যামব্যাসাডর দাঁড়িয়ে আছে। হর্ন বাজানো হয়েছে সেই অ্যামব্যাসাডর থেকেই। স্পষ্টই বোঝা গেল, বিক্রমকে ডাকবার জনই হর্ন বাজানো হয়েছে। হর্ন শুনেই বিক্রম রিকশা-ওয়ালাকে কিছু বলল, আর তার রিকশার গতি আস্তে হয়ে গেল। ডান দিকে ঘুরে অ্যামব্যাসাডর গাড়ির সামনে গিয়ে রিকশাটা দাঁড়াল। বিক্রম সিং অ্যাটাচি হাতে লাফিয়ে নামল, মোটরের পিছনের দরজায় মুখ বাড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে কিছু দেখল।

অশোক আশেপাশে একবার দেখে নিল, কেউ ওদের লক্ষ করছে কি না। সে-রকম কারোকে দেখা গেল না। ও ফটিককে

বলল, "গাড়ির মধ্যে কেউ আছে কি না দেখা যাচ্ছে না, তবে আছে নিশ্চয়ই। মনে হচ্ছে, একটা প্ল্যান-মাফিক কাজ করছে বিক্রমের দল। নইলে আগে থেকেই মোটরগাড়ির ব্যবস্থা থাকত না, অপেক্ষাও করত না।"

ফটিক বলল, "হর্ন যখন বেজেছে, তখন গাড়ির ভেতরে নিশ্চয় কেউ আছে।"

অশোক বলল, "আমি ড্রাইভারের কথা বলছি না। ড্রাইভারের সীটে যে একজন বসে আছে, সেটা তো এখান থেকেই আবছা দেখা যাচ্ছে। আমি বলছি, পেছনের সীটের কথা। কিন্তু ফটিক, বিক্রম সিং রিকশার ভাড়া মেটাচ্ছে। তার মানে, মোটরে চেপে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে, কিছুই করতে পারব না?"

ফটিক বলল, "কেন পারব না? তুই পকেট থেকে যন্ত্রটা বের কর। গাড়ি স্টার্ট করতে গেলেই টায়ারে গুলি করবি। আমি তার মধ্যেই বিক্রম সিংকে পেড়ে ফেলে দেব।"

অশোক বলল, "তোর কি ধারণা, বিক্রম সিংদের কাছে যন্ত্র নেই? আমি যখন টায়ারে গুলি করব, ওদের গুলি তখন তোর আমার বুকে আর মাথা লক্ষ করে ছুটে আসতে পারে।"

অশোকের কথা শেষ হবার আগেই স্টেশনের দিক থেকে একটা ক্রীম কালারের ভক্‌স ওয়াগন হেডলাইট জেবলে শাঁ করে ছুটে এসে অদ্ভুত শব্দ করে বিক্রম সিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। অশোক চমকে ফটিকের হাত ধরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝতে পারল ভক্‌স ওয়াগনের ড্রাইভার ওদের দুজনকে দেখতে পায়নি। বরং বিক্রম সিং চমকে এক লাফে অ্যামব্যাসাডরের অন্য পাশে সরে গিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল। তখনই ভক্‌স ওয়াগনের হেডলাইট অফ হয়ে গেল। সামান্য আলোয় অ্যামব্যাসাডরের আশেপাশে যা দেখা যাচ্ছিল, তাও যেন অন্ধকারে ডুবে গেল।

ফটিক বলল, "ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। বিক্রম সিংয়ের রিকশাওয়ালাটা তো এদিকেই চলে আসছে। ব্যাটাকে ধরব নাকি?"

অশোক প্রায় আঁতকে উঠে বলল, "তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে, ও চলে যাচ্ছে। আমাদের এখন বিক্রম সিংদের দিকে লক্ষ রাখা উচিত। ওয়াগন ভক্‌সটার নাম্বার কত, দেখেছিস?"

ফটিক বলল, "দেখেছি। ডি এল ভি ট্রিপল থ্রি ফাইভ। দিল্লির গাড়ি মনে হচ্ছে না?"

অশোক বলল, "বিক্রম সিংয়ের ব্যাপার হলে কিছুই বলা যায় না। যে-কোনো নকল নাম্বারের প্লেট লাগিয়ে দিতে পারে।"

ফটিক বলল, "তা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী ঘটছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দুটো গাড়ি দু-দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কী করছে?"

অশোক বলল, "ব্যস্ত হোস্ নে, দেখে যা।"

অশোকের কথা শেষ হতে না হতেই অ্যামব্যাসাডরের ভিতরে আলো জবলে উঠল। তার মানে সামনের দরজাটা খোলা হয়েছে। সেই আলোতেই দেখা গেল, অ্যামব্যাসাডরের পিছনের সীটে অস্পষ্ট একটা মানুষের মূর্তি। মুহূর্তেই শব্দ করে সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, আলোও নিভে গেল। ভক্‌স ওয়াগনের ডান দিকের পিছনের দরজা খুলে গেল। অশোক তীক্ষ্ন চোখে লক্ষ করল, কেউ নামছে কি না। কিন্তু না, নামার বদলে, অ্যামব্যাসাডরের পিছনের দরজা খুলে গেল, আর খুব তাড়াতাড়ি একজন যেন দু হাতে কোনো বোঝা নিয়ে নেমে ভক্‌স ওয়াগনের পিছনের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম সিং অ্যামব্যাসাডরের পিছন থেকে এসে, ভক্‌স ওয়াগনের খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিল। দিয়ে তাড়াতাড়ি ভক্‌স ওয়াগনের পিছন ঘুরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বাঁ দিকের পিছনের দরজা খুলে, অ্যাটাচি নিয়ে ঢুকে পড়ল।

ফটিক বলে উঠল, "বিক্রম সিং ভক্‌স ওয়াগনে উঠল।"

অশোক বলল, "দেখেছি। রেডি হ।"

ফটিক অবাক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ভক্‌স ওয়াগনের এঞ্জিন গর্জে উঠল। কয়েক ফুট ব্যাক করে পিছনে এল, তারপরেই রাস্তার ওপর উঠে জোর স্পীড নিয়ে ডাইনে বেঁকে ঘুরে গেল। অশোক দৌড় দিল, ডাকল, "শিগগির আয় ফটিক।"

অশোক কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে যখন অ্যামব্যাসাডরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন একজন ছাড়া আর কেউ নেই। সেই একজন যে ড্রাইভার, তা তাকে দেখেই বোঝা গেল। সে গাড়ির ডান দিকের সামনের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে, অশোককে দেখে থমকে দাঁড়াল, হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "কে? কী চাই?"

অশোক ফটিকের হাত থেকে তার স্যুটকেসটা নিয়ে পরিষ্কার বাঙলায় বলল, "ফটিক, মাঝারি ওজনের একটা দিয়ে পিছনের সীটে ঢুকিয়ে দে। আমি আশেপাশে লক্ষ রাখছি ঢুকিয়ে দিয়েই স্টীয়ারিংয়ে বসে পড়।"

বলার অপেক্ষা মাত্র। ফটিকের ডান হাতটা ড্রাইভারের মাথা লক্ষ করে যেন একটা ধারালো ভোজালির মতো এক পাশ থেকে আর-এক পাশে ঝলকিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ লোকটা একটা পাক খেয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল। ফটিক তার আগেই অ্যামব্যাসাডরের পিছনের দরজা খুলে লোকটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। অশোক দুটো স্যুটকেশ নিয়েই ইতিমধ্যে গাড়ির বাঁ দিকের সামনের সীটে বসে পড়েছে। ফটিক ডান দিকের দরজা খুলে স্টীয়ারিংয়ে বসে আগে দেখল, ইগনিশনের চাবিটা আছে কি না। আছে দেখেই চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করল। অশোক বলল, "দেড় মিনিট সময় নিয়েছি আমরা। এবার ডি এল ভি ট্রিপল থ্রি অ্যান্ড ফাইভের পেছন নিতে হবে।"

ভক্‌স ওয়াগন যে-রকম ডাইনে বেঁকে ঘুরে গিয়েছিল, ফটিকও সেইদিকে বাঁক নিয়ে বলল, "খুঁজে পেলে পেছন নিতে অসুবিধে হবে না। কথা হচ্ছে, রাস্তাটা আমাদের অচেনা, আর ভক্‌স ওয়াগনটা কোথাও গলিঘুঁজিতে ঢুকে না পড়লেই হয়।"

অশোকের দৃষ্টি সামনে। রাস্তাটা মোটামুটি ফাঁকা। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। ও বলল, "ভক্‌স ওয়াগনটা যেভাবে ছুটল, মনে হয় না, কাছেপিঠে কোনো গলির মধ্যে ঢুকে পড়বে। এখন কথা হচ্ছে রাস্তাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে? আমার হিসেব-মতো, পুব থেকে আমরা একটু দক্ষিণে বাঁক নিয়ে চলেছি।"

অশোকের কথা শেষ হবার আগেই ফটিক ব্রেক কষল, বলল, "একটা ক্রসিংয়ের মোড় দেখছি। একটা ডাইরেক্ট দক্ষিণে যাচ্ছে, আর একটা পুবদিকে।"

অশোক আশেপাশে তাকাল। রাস্তায় আলো আছে। দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ। ডান দিকের রাস্তাটা একটু সরু, অর্থাৎ দক্ষিণের রাস্তাটা। পুবের রাস্তাটা একটু বেশি চওড়া। ফটিক মোড়ের বাঁ দিকে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিল। অশোক হঠাৎ মাথা নিচু করে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, "পুবের সোজা রাস্তাটার অনেকটা দূরে, দুটো ছোট ছোট লাল চোখ দেখা যাচ্ছে না?"

ফটিকও মাথা নিচু করে দেখে বলল, "হ্যাঁ। একটা গাড়ি যাচ্ছে মনে হচ্ছে।"

অশোক বলল, "ছোট্।"

ফটিক এঞ্জিন বন্ধ করেনি। পুবের রাস্তা ধরে ছুটল। ইতি

মধ্যে দূরের লাল ছোট ছোট চোখ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফটিক স্পীডোমিটারের কাঁটা তুলে দিল নব্বুই আর একশো কিলোমিটারের মাঝামাঝি। অশোক ডায়নামো চার্জার আর তেলের কাঁটা দেখে আশ্বস্ত। বোঝা গেল, গাড়িটা দূরে যাবার জন্য তৈরি ছিল। কারণ ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রল ভরা রয়েছে।

ফটিক হঠাৎ বলে উঠল, "বাঁ দিকের রোড পোস্ট দেখলি?"

অশোকের লক্ষ্য ছিল দূরের হারিয়ে যাওয়া লাল দুটি বিন্দুর দিকে। বলল, "না তো! কেন?"

''আমরা এন এইচ টু দিয়ে চলেছি,মানে জি টি রোড ধরে।''

অশোক চিন্তিত। জি টি রোড নিয়ে ওর বিশেষ মাথা-ব্যথা নেই। ভক্স ওয়াগন ডি এল ভি ট্রিপল থ্রি ফাইভ, বিক্রম সিংয়ের গাড়ি চাই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, কানপুরে অ্যামব্যাসাডার থেকে ভক্স ওয়াগনে গোগোলকে তোলা হয়েছে। অতএব রাস্তা যাই হোক, বিক্রম সিংয়ের ভক্স ওয়াগন চাই। ফটিক আবার বলল, ''সামনে একটা গাড়ি, চেহারা দেখে লরি কি না বোঝা যাচ্ছে না।"

অশোক বলল, "ওভারটেক করে বেরিয়ে যা।"

ওভারটেক করতে গিয়ে দেখা গেল, একটা নয়, ছটা লরি পর পর চলেছে। সহজে ওভারটেক করতে দিতে চায় না। রাত্রের লরিওয়ালাদের এটাই একটা মজার খেলা। তবু ফটিক বারে বারে সিগন্যাল করে। লরিগুলোকে ওভারটেক করার পরেই, দূরে আবার দুটো লাল আলোর বিন্দু অন্ধকারে দেখা গেল। ফটিক স্পীড বাড়াল। প্রায় দশ মিনিট পরে, দূরের লাল আলোর বিন্দু দুটো সামনে এসে পড়ল, আর পিছনের আবছা আলোয় ইউ পি এস নাম্বারটা পড়ার আগেই দেখা গেল, ভক্স ওয়াগন নয়, গাড়িটা একটা অ্যামবাসাডর।

অশোক একবার মুখ ফিরিয়ে পিছনের সীটের লোকটার দিকে দেখল। লোকটা নড়ছে, গলা দিয়ে একটু-আধটু শব্দও বেরোচ্ছে। ও বলল, "ইউ পি এস-টার স্পীড খুবই কম। ওটাকে ওভারটেক করে, যতটা সম্ভব হাই স্পীডে বেরিয়ে গিয়ে আগে পেছনের সীটটা খালি কর। লোকটার জ্ঞান ফিরে আসছে।"

ফটিক আগে সামনের গাড়িটা ওভারটেক করল, তারপরে জিজ্ঞেস করল, "সীট খালি করব মানে কী? লোকটাকে নামাতে হবে তো?"

অশোক বলল, "হ্যাঁ, তাছাড়া আবার কী? জ্ঞান ফিরে এলেই তো চেঁচামেচি লাগাবে। আর একটু এগিয়ে একটা গাছ দেখে দাঁড়া, আমি কয়েক সেকেন্ডে লোকটাকে নামিয়ে শুইয়ে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে, জ্ঞান ফিরে আসতে আর দেরি নেই।"

ফটিক বাঁ হাতে ভিউ ফাইন্ডারের আয়নাকে ঠিক করে নিল, যাতে পিছনের গাড়িটা দেখা যায়। মিনিট দশেকের মধ্যে পিছনের গাড়িটা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আরও মিনিট পাঁচেক চালিয়ে ফটিক রাস্তার বাঁ পাশ ঘেঁষে একটা গাছ দেখে গাড়ি দাঁড় করাল। অশোক মুহূর্তে নেমে, পিছনের দরজা খুলে, সীট থেকে লোকটিকে দু হাতে তুলে অনায়াসে গাছের নীচে শুইয়ে দিল। লোকটা এখন গোঙাচ্ছে। অশোক কোনো দিকে না তাকিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসতেই ফটিক দুরন্ত বেগে ছোটাল। বলল, "দূরে আবার দুটো লাল বিন্দু দেখা যাচ্ছে।"

অশোকও লক্ষ করল, কিন্তু ওর মনটা আশা-নিরাশায় দুলছে। রাস্তার মাইল পোস্টের হিসাব অনুযায়ী আধ ঘণ্টার একটু বেশি সময়ের মধ্যে আশি কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছে। রাস্তার হিসাবটা এখন অশোকই রাখছে। ইতি-মধ্যে ওরা ফতেগড় পেরিয়ে এসেছে। এখন রাস্তার ধারের পোস্টে একটা জায়গার নাম লেখা দেখা যাচ্ছে 'খাগা'। অশোক গাছতলায় কানপুরের ড্রাইভার বা বিক্রম সিংয়ের দলের লোক, যেই হোক, তাকে নামিয়ে দেবার পরে মাইল পোস্টে প্রথম চোখে
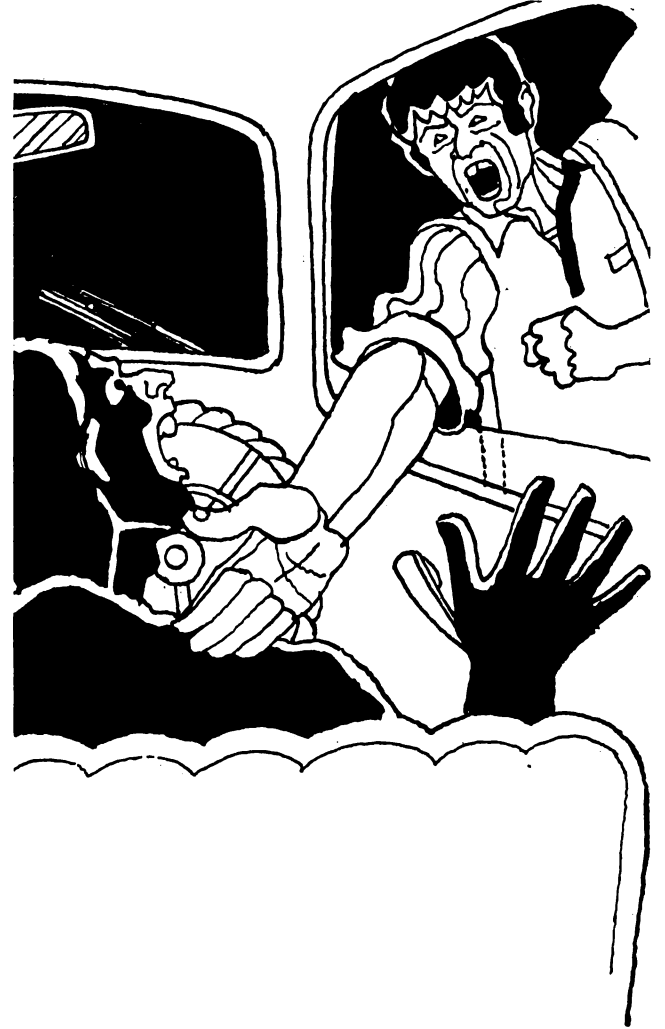
পড়েছে 'খাগা', নীচে '২০ কিঃ মিঃ'। আর মাইল পোস্টের সাইডে দেখা গিয়েছে, 'এন এইচ টু' নীচে '৫৭৭ কিঃ মিঃ'। তার মানে দিল্লি থেকে জি টি রোডের হিসেবে, পাঁচশো সাতাত্তর কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছে। রেলের রাস্তা আর মোটর চলার রাস্তায় নিশ্চয়ই তফাত আছে। কিন্তু অশোকের মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে অন্য কারণে। আশি কিলোমিটার রাস্তা ছুটেও সেই ভক্স ওয়াগনের দেখা পাওয়া গেল না? এমন কী গাড়ি যে, এত জোর পাল্লা দিয়েও বিক্রম সিংদের দেখা পাওয়া গেল না? অশোকরা যে অ্যামব্যাসাডরে চলেছে, এটাও যথেষ্ট শক্ত গাড়ি। নইলে ফটিক হাজার চেষ্টা করলেও এ গাড়িকে এত জোরে ছোটানো যেত না।

ফটিক মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''কী রে অশোক, চুপ করে গেলি কেন?"

অশোক বলল, "মনটা কেমন দমে যাচ্ছে। আমরা কানপুর থেকে বেরিয়েছি, এখন ঠিক আটচল্লিশ মিনিট হয়েছে, তিরাশি কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছি। এখনো বিক্রম সিংয়ের ভক্স ওয়াগনের দেখা পাওয়া গেল না? এদের গাড়িটা কি উড়ে চলেছে? নাকি তোর কথাই সত্যি। মাঝখানে কোথাও কোনো ডাইনে-বাঁয়ের গলি-ঘুঁজিতে ঢুকেই পড়েছে?"

ফটিক মুখ না ফিরিয়ে বলল, "এখন আর ওসব কথা ভেবে লাভ নেই। এগিয়ে যখন চলেছি, তখন এগিয়েই যেতে হবে। বিক্রম সিং যদি মনে করে, আগে গিয়েও এলাহাবাদ বা বেনারস কোথাও ঢুকে পড়তে পারে। তার মনের কথা তো আমরা বুঝতে পারছি না, তার মতলবও জানতে পারছি না।"

অশোক ফটিকের একথাটা ঠিক মেনে নিতে পারল না। কারণ, বিক্রম সিং আর তার দলবল রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠেছিল। নিশ্চয়ই কলকাতা যাবার মতলব করেই। অন্তত এ কে কারলা ওরফে বিক্রম সিং যে কলকাতার যাত্রী, অশোক তা লিস্টেই দেখে নিয়েছিল। পরে ফটিকের মুখে শুনেছিল, এ কে কারলা আর বিক্রম সিং একই লোক। তখন অবশ্য মনে হয়েছিল, বিক্রম সিং অশোকের পিছন নিয়েছে। যে-কারণে সে ফটিকের জায়গায় চলে গিয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা ওলট-পালট করে দিয়েছে রাজধানী একসপ্রেসে খুন, আর গোগোলকে লোপাট করা।

অশোকের মনে প্রশ্ন, কে খুন করতে পারে, কাকে এবং কেন? বিক্রম সিংয়ের সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক? গোগোলকে লুট করার পিছনে বিক্রম সিংয়ের হাত আছে, এখন সেটা স্পষ্ট। বিক্রম সিং কি হঠাৎ খুনের ঘটনা আর গোগোল-লুটের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে? নাকি আসলে সে অশোকের পিছন নিয়ে কলকাতাতেই যাচ্ছিল? দিল্লির জালিয়াতি আর খুনের ব্যাপারে বিক্রমের বাঁচবার একমাত্র পথ অশোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। অশোক জানে, বিক্রমের তা-ই ধারণা। যদিও অশোক ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছে, দিল্লির জালিয়াতির ব্যাপারে খুনটা বিক্রম সিং নিজের হাতে করেনি। খুনী তার হাতের লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজধানী এক্সপ্রেসের খুনের ব্যাপারেও কি বিক্রম সিংয়ের হাত আছে? গোগোল যে বিক্রম সিংদের কোনো অপরাধের সাক্ষী, সে বিষয়ে অশোকের কোনো সন্দেহ নেই। সেই জন্যই গোগোলকে লুট করতে হয়েছে, এবং কানপুর থেকে মোটরে তুলে নিয়েছে। তুলে নিয়ে কোথায় যেতে পারে? এলাহাবাদ? বেনারস? কী দরকার? গোগোলকে যদি মেরে ফেলতেই হয়, তার জন্যে এলাহাবাদ বেনারসে যাবার কী দরকার? জি টি রোডের ওপরেই সেটা বিক্রম সিংরা করতে পারে।

এইসব নানা প্রশ্নোত্তরের থেকে অশোক ধারণা করেছে, বিক্রম সিং রাজধানী এক্সপ্রেসে থাকা নিরাপদ মনে করেনি, সেই জন্য মোটরের রাস্তায় কলকাতায় যাওয়া স্থির করেছে। যে পথ ঘুরেই হোক, কলকাতায় তাকে যেতেই হবে। আর তার মতো ঝানু অপরাধীর পক্ষে, সামান্য সময়ের মধ্যেই কানপুরে গাড়ির ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, সেটা তো দেখাই গিয়েছে। এখন অশোকের মনে একটাই মাত্র সন্দেহ খচখচ করছে। বিক্রম সিংকে কলকাতা যেতে হবে ঠিকই, কিন্তু তার আগেই গোগোলের ভাল-মন্দ একটা কিছু ঘটে যাবে না তো? তাহলে কানপুরে নামা, গাড়ি নিয়ে বিক্রম সিংয়ের পিছু তাড়া করা, সব অর্থহীন হয়ে যাবে। কিছু না হোক, বিক্রম সিংদের ভক্স ওয়াগনটা একবার চোখে পড়লেও মনকে একটা সান্ত্বনা দেওয়া যেত। ফটিককে কিছুই বলার নেই। এ গাড়ি এর থেকে জোরে কোনো রকমেই চালানো যায় না।

দূরে যে দুটো লাল আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছিল, সম্ভবত রাস্তা ঘুরে যাওয়ায় তা আর দেখা যাচ্ছে না। অশোক জিজ্ঞেস করল, "ফটিক, তুই যে বললি, এখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, তার মানে কী? এইভাবে জি টি রোড ধরে আমাদের কলকাতায় পৌঁছুতে হবে?"

ফটিক পালটা জিজ্ঞেস করল, "তোর মাথায় কি আলাদা কোনো প্ল্যান আছে?"

অশোক বলল, "আছে। কানপুরের পরে রাজধানী এক্সপ্রেসের নেক্সট স্টপেজ হচ্ছে মোগলসরাই। শেষ রাত্রে তিনটে নাগাদ পৌঁছুবার কথা। কানপুরে লেট তো হয়েছেই, হয়তো এতক্ষণে ছেড়েছে। মোগলসরাইয়ের মধ্যে যদি বিক্রমের ভক্স ওয়াগনের দেখা না পাই; তাহলে এ গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মোগলসরাই থেকে রাজধানী ধরব।"

"তাতে লাভ?"

"অন্তত এ গাড়িটার সঙ্গে আমাদের কেউ জড়াতে পারবে না।"

"আর গোগোল?"

"তোর কি মনে হয়, এর পরেও বিক্রমের গাড়ির দেখা পাওয়া যাবে?"

"আমি একেবারে আশা ছাড়িনি। অবশ্য যদি বিক্রম অন্য কোনো রাস্তায় ঢুকে না পড়ে।"

"ধরে নিলাম বিক্রম অন্য কোনো রাস্তায় ঢুকে পড়েনি। না পড়লে কি এতক্ষণে তার গাড়ির নাগাল আমরা পেতাম না?"

"না-পাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। অ্যামব্যাসাডরের বদলে বিক্রম ইচ্ছে করেই ভক্স ওয়াগন নিয়েছে। সে হুঁশিয়ার লোক জানে সাবধানের মার নেই। কন্ডিশন ভাল থাকলে, ভক্স অ্যামব্যাসাডরের থেকে জোরেই ছুটবে। আর ছোটার নিয়ম হচ্ছে একবার যদি দু-তিন কিলোমিটার পেছিয়ে পড়তে হয়, সমান সমান ছুটলেও ওই দুই-তিন কিলোমিটার কভার করা খুব মুশকিল। এখন তুই যদি ভেবে থাকিস, বিক্রম জি টি রোডে চলা সত্ত্বেও তাকে ধরা যাবে না, তা হলে ভুল হবে। কোনো কারণে তাকে দু-এক মিনিট দাঁড়াতে হলেই আমি ধরে ফেলব। এখন তোর মনের কথাটা খুলে বল।"

"কী বলব?"

"তুই কি বিশ্বাস করিস, বিক্রম বাই রোড কলকাতায় ফিরবে?"

অশোক কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিজের আগের বিশ্বাসেই বলল, "হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।"

ফটিক বলল, "তা হলে মোগলসরাইয়ে রাজধানী ধরার প্ল্যান করে লাভ নেই। বরং শেষ চেষ্টা হিসাবে—"

ফটিককে বাধা দিয়ে অশোক বলল, "না ফটিক, তবু এ গাড়ি আমাদের রাস্তায় ছেড়ে দিতেই হবে। কেননা, মনে রাখিস, যে লোকটাকে রাস্তায় গাছতলায় শুইয়ে দিয়ে এসেছি, তার জ্ঞান হলেই সে কাছের কোনো থানায় যাবে। থানা থেকে টেলিফোনে বা অয়্যারলেসে খবরটা ছড়িয়ে পড়লেই আমরা যে-কোনো জায়গায় ধরা পড়ে যাব। আমরা যে অন্যায় করিনি, তখন সেটা প্রমাণ করতেই আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে।"

ফটিক বলল, "তাহলে রাস্তা থেকে পর পর এক-একটা আলাদা গাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে চলতে হয়।"

অশোক হেসে বলল, "পারবি? মোটের ওপর গোগোলকে চাই।"

ফটিক বলল, "চেষ্টা করে দেখা যাক।"

স্পীডোমিটারের কাঁটা এখন ১১০ কিলোমিটারে ঠেকেছে।

গোগোলের জ্ঞান ফিরে এল

গোগোল নিজেও জানে না, জ্ঞান ফিরে আসার আগে ওর গলা দিয়ে গোঙানোর মতো শব্দ বেরোচ্ছিল। তারপরে এক সময়ে ওর মনে হল, গলাটা ভীষণ শুকিয়ে গিয়েছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই কেউ যেন ওর গলায় অল্প গরম আর একটু মিষ্টি স্বাদের কিছু ঢেলে দিল, আর হিন্দিতে কোনো লোকের মোটা স্বর শোনা গেল, "ছেলেটার জ্ঞান ফিরে আসছে। গাড়ির পিছনের পর্দাটা পুরো টেনে দাও, যেন পিছনের কোনো গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়লে, আমাদের গাড়ির ভেতরটা দেখা না যায়।"

আর একজনের গলা শোনা গেল, "তা দিচ্ছি। কিন্তু ছেলেটার মাথাটা আমার কোলের ওপর রয়েছে।"

একটা হাত গোগোলের ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা তুলে নিজের কোলের ওপর টেনে নিতে নিতে বলল, "ঠিক আছে,

ছেলেটার মাথা আমি আমার দিকে টেনে নিচ্ছি। তুমি পেছনের পর্দাটা টেনে দিয়ে টর্চলাইটটা নিচু করে জ্বালো।"

টর্চলাইট! কথাটা শোনামাত্রই গোগোলের চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে উঠল লাল চৌকো সিগারেটের বাক্সের মতো সেই টর্চলাইট! তারপরেই রাজধানী এক্সপ্রেস আর পর পর ঘটনাগুলো ছবির মতো ওর চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। এমনকী কামরার বাইরে করিডরে অশোকদার সঙ্গে দেখা, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়া আর ওকে তুলে ট্রেনের বাইরে একজনের কোলের ওপর ছুঁড়ে মারা, যে ওর নাকের সামনে একটা কী চেপে ধরতেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। তারপরে আর কিছুই মনে নেই। তাহলে ও এখন কোথায়?

গোগোলের একথা মনে হতেই ও লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই সামনের দিক থেকে একটা আলাদা লোকের হিন্দি কথা ভেসে এল, "সাব, পেছনের পর্দাটা টেনে দিলে আমি ভিউ ফাইন্ডারের কাচে পেছনের কিছুই দেখতে পাব না।"

গোগোলের ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা যে তার কোলের কাছে ধরেছিল, সে বলল, "তোমাকে তার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না ভগত। তুমি কেবল সামনের দিকে দেখে যে স্পীডে চালিয়ে যাচ্ছ, তাই যাও। পেছনে কোনো গাড়ির ইশারা পেলে নওরংসাহেব পর্দা ফাঁক করে দেখে নেবে।"

সামনে থেকে শোনা গেল, "ঠিক আছে।"

গোগোল বুঝতে পারল, ও একটা মোটর-গাড়ির পিছনের সীটে রয়েছে, আর গাড়িটা চলেছে ঝড়ের বেগে। এরা কারা? গোগোলকে মোটরে করে নিয়ে কোথায় চলেছে? মা কি তাহলে রাজধানী এক্সপ্রেসে রয়ে গিয়েছেন? অশোকদা কি রাজধানী এক্সপ্রেসেই আছে? গোগোলকে যে এভাবে নিয়ে আসা হয়েছে, তা কি কেউ জানে? এসব কথা মনে হতেই গোগোলের মনটা ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় ছটফট করে উঠল, অথচ এই চলন্ত মোটরগাড়িতে, ওর কী করা উচিত, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। ও চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখছে, গাড়ির ভিতরে-বাইরে অন্ধকার। ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। চিৎকার করলে কেউ শুনতে পাবে না। লাফ দিয়ে নামাও যাবে না। আরও একটা কথা বিশেষভাবে মনে হচ্ছে। এখন যে-লোকটা ওর ঘাড় আর মাথা তার কোলের ওপর ধরে রেখেছে, তার গলার স্বরটা কেমন চেনা-চেনা লাগছে। অথচ কোথায় শুনেছে, গোগোল এ মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

পিছনের সীটের নওরং সাহেব নামে লোকটা নিচু করে টর্চলাইট জ্বালল, তারপরে গোগোলের মুখের ওপর ফেলল। গোগোল চোখ বন্ধ করেই রেখেছিল, কিন্তু জোরালো আলো চোখের ওপর পড়তেই ওর চোখের পাতা কুঁচকে উঠল। নওরং সাহেব বলল, "বিক্রম সিং, ছেলেটার—"

"আঃ নওরংজী, তুমি আবার আমার আসল নামটা ধরে ডাকছ কেন?" যার কোলের ওপর গোগোলের মাথাটা ধরে রাখা ছিল, সে বিরক্ত হয়ে ইংরেজিতে বলে উঠল, "আমি কি একবারও তোমার আসল নাম ধরে ডেকেছি?"

নওরং সাহেব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "মাফ করে দাও কারলা সাহেব, আমার একদম খেয়াল ছিল না। তুমি নিশ্চয় জানো আমি ইচ্ছে করে এ-রকম একটা কাণ্ড করতে পারিনে। তবে তোমার ভয় নেই, ছেলেটার জ্ঞান ফিরে এলেও, এখনো ও ঘুমোচ্ছে। এবার ওর চোখে-মুখে জলের ছিটে দিলে ঘুমটা ভেঙে যাবে।"

বিক্রম সিং ওরফে কারলা সাহেব ইংরেজিতেই নিচু স্বরে বলল, "আমি কেবল ছেলেটার কথাই ভাবিনি। তোমার মনে রাখা উচিত, গাড়ির মধ্যে আর একজন আছে সেও আমার আসল নাম জানে না।"

গোগোল চোখ না খুললেও বুঝতে পারল, গাড়ির মধ্যে আর একজন বলতে নিশ্চয়ই ড্রাইভারকে বোঝাচ্ছে।

আর বিক্রম সিং ওরফে কারলা সাহেব ইংরেজিতে কথা বলতেই গোগোলের মনে পড়ে গেল, এই গলার স্বরটা ও রাজধানী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসে অশোকদার কামরায় শুনেছিল। লোকটার চেহারাও মনে পড়ে গেল, মাথায় টাক আর দোহারা চেহারা। সেই লোকটাই তা হলে গোগোলকে নিয়ে মোটরে করে ছুটেছে? ব্যাপারটার রহস্য ও কিছুই বুঝতে পারছে না।

নওরং সাহেব বলল, "আমি খুবই দুঃখিত কারলা সাহেব। তুমি টর্চলাইটটা ধরো, আমি জলের বোতল থেকে ছেলেটার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিই।"

গোগোলের চোখের পাতার ওপর দিয়ে আলোটা এমনভাবে সরে গেল, ও বুঝতে পারল, বিক্রম সিংয়ের হাতে টর্চলাইট তুলে দেওয়া হল। তারপরেই নওরং সাহেব গোগোলের চোখে জলের ছিটে দিতেই, গোগোল ইচ্ছে করেই মুখটা কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করল, যেন ওরা বুঝতে না পারে, ও মোটেই ঘুমোচ্ছিল না। কয়েকবার জলের ছিটে খেয়ে উঃ-আঃ শব্দ করে গোগোল চোখ মেলে তাকাল, আর উঠে বসবার চেষ্টা করল।

বিক্রম সিং গোগোলকে সীটের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। টর্চলাইটের আলো ফেলল ওর মুখের ওপর। গোগোল হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে, যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে বাঙলায় বলল, "আঃ, কে তুমি, কেন আমার চোখের ওপর আলো ফেলছ?"

বিক্রম সিং টর্চলাইটের আলোটা সরিয়ে, নিজের মুখের পাশে ফেলে, ইংরেজিতে বলল, "দ্যাখো তো গোগোল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ কি না?"

গোগোল খুব অবাক হল না লোকটার মুখে ওর নাম শুনে। কেননা, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটে গিয়েছে, লোকটা ওর নাম জেনে নিয়েছে। ও চোখ পিটপিট করে বিক্রম সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ইংরেজিতে বলল, "না, আপনাকে আমি চিনতে পারছি না। কিন্তু আপনি আমাকে এই মোটরগাড়িতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমি তো রাজধানী এক্সপ্রেসে আমার মায়ের কাছে ছিলাম।"

বিক্রম সিং একবার তার সঙ্গে নওরংয়ের দিকে দেখল। গাড়ির ভিতর টর্চলাইটের আলোয়, গোগোল প্রায় সবই দেখতে পাচ্ছিল। এমনকী ড্রাইভারের পিছন দিকটাও। বিক্রম সিং বলল, "আমি তোমাকে সব কথাই বলব, যদি তুমি আমাকে সব কথার জবাব দাও। আগে বল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ কি না? তুমি আমাকে রাজধানী এক্সপ্রেসে দেখেছিলে?"

গোগোল আবার চোখ পিটপিট করে বিক্রম সিংয়ের দিকে তাকাল। বিক্রম সিংও টর্চের আলো নিজের মুখের ওপর ঘুরিয়ে দেখাল। এই সময়ে লোকটাকে কেমন বোকা-বোকা লাগল। গোগোল মনে মনে স্বীকার করাটাই ঠিক করে, বলে উঠল, "ও হো, আপনি তো সেই রাজধানী এক্সপ্রেসে ফার্স্ট ক্লাসে ছিলেন?"

বিক্রম সিং হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, যখন তুমি অশোক ঠাকুরকে খুঁজতে গেছলে।"

গোগোল তৎক্ষণাৎ মনে মনে সাবধান হয়ে গেল। অবাক হয়ে বলল, "অশোক ঠাকুর? কে অশোক ঠাকুর? আমি তো আমার এক ডাক্তার দাদাকে খুঁজতে গেছলাম।"

বিক্রম সিং হেসে উঠে বলল, "গোগোল, তুমি নিজেকে খুবই চালাক ভাবছ, কিন্তু আমি জানি, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি লাগানো অশোক ঠাকুরের সঙ্গে তুমি কথা বলেছ। এও জানি, অশোক

ঠাকুরের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি জাল, আর সে তোমার দাদা ডঃ বিমল ব্যানার্জি নয়।"

বিক্রম সিং এমনভাবে টর্চের আলোটা গোগোলের কপালের ওপর ফেলেছে, ওর মুখের সবটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গোগোল মনে মনে চমকালেও কেবল ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার দাদা দিল্লিতে সফদরজং হসপিটালের ডাক্তার, আমি তার খোঁজ করতেই ফার্স্ট ক্লাসে গেছলাম। আমার দাদার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও নেই।"

এই সময়ে নওরংয়ের হাতে কিছু চকচক্ করে উঠল। বিক্রমের টর্চের আলো নওরংয়ের হাতে পড়ল। একটা লম্বাচওড়া ধারালো ছুরি, আর একটা রিভলবার তার দুই হাতে। বিক্রম সিং আবার গোগোলের কপালের ওপর টর্চের আলো ফেলে বলল, "শোনো গোগোল, হতে পারে, তোমার দাদা ডঃ বিমল ব্যানার্জিকে তুমি খুঁজছিলে, কিন্তু অশোক ঠাকুরের সঙ্গে তুমি কথা বলেছ, এ খবর আমি পেয়েছি।"

গোগোল যেন এবার একটু রেগেই বলল, "কে অশোক ঠাকুর, কেন আমি তার সঙ্গে কথা বলব, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এবার নওরং নামে লোকটি বলে উঠল, "দেখতে ছেলেমানুষ হলেও এ বাচ্চা সহজে মুখ খুলবে না।"

বিক্রম বলল, "তাই দেখছি। আচ্ছা, এটা গেল এক নম্বর। দু নম্বর প্রশ্নটা করা যাক। শোনো গোগোল, আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই না। ঠিক ঠিক সব জবাব পেয়ে গেলে, তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের কাছে পোঁছে দেব, নয়তো বাবা-মায়ের দেখা তুমি কোনোদিনই আর পাবে না।"

গোগোল কোনো জবাব দিল না, যদিও ওর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। বিক্রমের গলাটা চাপা গর্জনের মতো শোনাল। বিক্রম আবার বলল, "তুমি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ?"

গোগোল বলল, "না। তবে আমার মনে হচ্ছে আপনারা খারাপ লোক।"

বিক্রম আর নওরং নিজেদের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করল। বিক্রম বলল, "তোমার খুব সাহস আছে দেখছি। আমরা কী-রকম লোক, সেটা তুমি পরে আরও ভাল বুঝতে পারবে। অশোক ঠাকুরের কথাটা না বলে তুমি ভাল করলে না। এবার যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাবটা দাও তো। ট্রেনে আমার সঙ্গে কথা বলে তুমি কি ফার্স্ট ক্লাসের তিন নম্বর বগিতে গেছলে?"

গোগোল গোপন না করে বলল, "গেছলাম, আমার দাদাকে খুঁজতে।"

বিক্রম সিং মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার দাদাকে খুঁজতে, সেটা বলতে হবে না। সেখানে তোমার সামনে কোনো ঘটনা ঘটেছিল?"

গোগোল যেন বুঝতেই পারছিল, বিক্রম তাকে এ কথাই জিজ্ঞেস করবে। কথাটার মধ্যে গোপনীয়তার কিছু আছে বলে ওর মনে হল না। বলল, "হ্যাঁ। আমার সামনেই একজন রিভলবার দিয়ে একজনকে গুলি করেছিল।"

বিক্রম আর নওরং দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি করল। গোগোলের তা চোখ এড়াল না। বিক্রম বলল, "ব্যাপারটা ঠিক কী-রকম ঘটেছিল, তুমি একটু বুঝিয়ে বলতে পারো?"

গোগোল বলল, "কী-রকম আবার? আমি দাদাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় একজন ধুতিপাঞ্জাবি-পরা লোক আমার সামনে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর পেছন থেকে খট করে একটা শব্দ হল। আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, টুপি মাথায় একটা লোক, তার হাতে একটা রিভলবার। কিন্তু গুলির ও-রকম শব্দ হতে পারে, আমি জানতাম না। ধুতিপাঞ্জাবি-পরা লোকটা আমার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম ওর বুকের জামায় রক্ত, সে ধুপ করে পড়ে গেল। দেখেই আমি দৌড়ে মায়ের কাছে চলে গেছলাম।"

বিক্রম আর নওরং আবার চোখাচোখি করে ঘাড় ঝাঁকাল। বিক্রম বলল, "একথাগুলো তুমি ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, মনে করে দ্যাখো তো, যে লোকটাকে গুলি করেছিল, সে কি কিছু বলেছিল?"

গোগোল কিছু না ভেবেই বলে ফেলল, "হ্যাঁ, লোকটা বলেছিল, কৃপা জওহর সিং, মুঝে মারো মৎ।"

গোগোল টর্চের আলোয় দেখল, বিক্রম যেন চমকে উঠল, আর নওরংয়ের দিকে একবার দেখে নিল। এবার নওরং জিজ্ঞেস করল, "এ কথা থেকে তুমি কী বুঝলে?"

গোগোল বলল, "এতে আবার বোঝাবুঝির কী আছে? জওহর সিংকে লোকটা মারতে বারণ করেছিল, তবু সে মেরেছিল।"

গোগোল দেখল, বিক্রম আর নওরং নিজেদের চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। গোগোলের কথা যেন তারা ভুলেই গিয়েছে। গোগোলের চোখে পড়ল, নওরং নামে লোকটার মুখ যেন কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ছুরিটা হাতে তুলে নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু বিক্রম সিং হঠাৎ হেসে উঠে বলল, "গোগোল, তুমি এ ব্যাপারে একটাও মিথ্যে কথা বলোনি, সব সত্যি বলেছ, কেবল একটা ভুল নাম বলেছ।"

গোগোল অবাক হয়ে বলল, "ভুল নাম?"

বিক্রম বলল, "হ্যাঁ, জওহর সিং নামটা তুমি শোনোনি। ওটা তোমার ঘুলিয়ে গেছে। আসলে তুমি শুনেছিলে দিলদার সিং।"

গোগোল অবাক হয়ে ভাবতে আরম্ভ করল। কিন্তু সে-রকম ভুল ও কখনো শুনতে পারে না। এখনও ওর কানে সেই লোকটার কথা বাজছে। ও মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলল, "না, দিলদার নয়, আমি স্পষ্ট শুনেছি জওহর সিং।"

বিক্রম বলল, "না, দিলদার সিং। জওহরলাল তো আসলে এ দেশের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, সেইজন্য ওই নামটা তোমার মনে আসছে। আসলে তুমি শুনেছ দিলদার সিং।"

গোগোল হঠাৎ কিছু বলল না। এতক্ষণে ওর মনে হল, জওহর নাম নিয়ে কোথাও একটা গোলমাল আছে। তা নইলে বিক্রম সিং বারেবারে দিলদার সিং বলছে কেন? অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে, গুলি খাবার আগে লোকটা জওহর সিং নাম ধরে ডেকেছিল। বিক্রম সিং জিজ্ঞেস করল, "কী গোগোল, এখন মনে করতে পারছ তো, লোকটার নাম শুনেছিলে দিলদার সিং?"

গোগোল এবার সরাসরি অস্বীকার করল না, "হতে পারে, আমি মনে করতে পারছি না।"

বিক্রম তাকাল নওরংয়ের দিকে। নওরং মাথা নেড়ে হিন্দিতে বলল, "তোমার দু নম্বরেও কোনো ভরসা নেই। বাচ্চা খুব সেয়ানা আছে। এবার তিন নম্বরটা জিজ্ঞেস করো। তারপর বাকি ফয়সালা আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

গোগোল দেখল, নওরং কখনো ছুরি, কখনো রিভলবারটা হাতে তুলে নিচ্ছে, আর ওর দিকে তাকাচ্ছে। এখন চোখে পড়ল, লোকটার মুখে কয়েকদিনের দাড়িগোঁফ। আর চোখের পাতা লাল। লাল কাজল পরলে যেরকম দেখায়। আসলে বোধহয় ঘা। গোগোলের বুকে ভয়ের ছটফটানি বাড়ছে। 'বাকি ফয়সালা' বলতে নওরং লোকটা কী বোঝাতে চাইছে?

বিক্রম টর্চলাইটের আলোয় গোগোলের সারা গা-হাত-পা দেখে, কপালের ওপর আলো রেখে বলল, "আচ্ছা, লোকটা গুলি খেয়ে পড়ে গেল, তখন তার হাতে লাল চৌকো একটা টর্চলাইট দেখতে পেয়েছিলে?"

গোগোল এবার আর সত্যবাদী হতে সাহস পেল না। বলল, "না তো।"

নওরং জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটার হাতে রিভলবার ছিল, সে কি ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা লোকটার পকেটে হাত দিয়েছিল?"

গোগোল বলল, "আমি সে-সব কিছুই দেখিনি। আমি লোকটাকে পড়ে যেতে দেখেই, দৌড়ে চলে গেছলাম।"

নওরং আর বিক্রম আবার চোখাচোখি করল। নওরং হিন্দিতে বলল, "কানোয়ারলালের পকেটেই সেই টর্চলাইট ছিল, আমি বাজি রেখে বলতে পারি। দুভাবে ওটা বেহাত হতে পারে। এক নম্বর, কানোয়ারলাল টর্চটা অশোক ঠাকুরের হাতে তুলে দিতে পেরেছে। নয় তো, আসল লোক কানোয়ারকে মারার পরে, বাথরুমে যখন ঢুকিয়েছিল, তখনই সেটা হাপিস্ করেছে। মনে রেখো, লাল টর্চটার মধ্যে আট লাখ টাকার মাল আছে। লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস।"

বিক্রম অবাক হয়ে বলল, "মানে তুমি-ইয়ে—ওই দিলদারের কথা বলছ? সে কানোয়ারের পকেট থেকে টর্চটা সরিয়েছে? কিন্তু সে তো বলেই দিয়েছে, কানোয়ারের সারা জামাকাপড় সার্চ করে সে কিছুই পায়নি। ভুলে যেও না, সে আমাদের খুবই বিশ্বাসী লোক।"

গোগোল সব কথা শুনে যাচ্ছিল, আর অবাক হয়ে ভাবছিল, ওইটুকু একটা টর্চের মধ্যে আট লক্ষ টাকার মাল কী করে থাকতে পারে? সেটা তো গোগোল মায়ের ব্যাগে চাদর-চাপা দিয়ে রেখেছিল। মা খুলে ফেলে সেটা কারোকে দেখাননি তো? অশোকদা কি মায়ের সঙ্গে দেখা করেছে?

নওরং হেসে উঠে বলল, "বিশ্বাসী? টাকার লোভে কত বিশ্বাসীকে বেইমানি করতে দেখলাম।"

বিক্রম সিং কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

রাক্ষসের দরজায় খোক্কসের হানা

ভগত হঠাৎ গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে ব্রেক কষল। গোগোল হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বিক্রম সিং আর নওরং দুজনেই চমকে সামনে তাকাল। দেখা গেল, রাস্তার অন্ধকার ধার থেকে জোরালো হেডলাইট জ্বালিয়ে আচমকা একটা গাড়ি রাস্তার ওপর এসে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিক্রম সিংদের ভক্স্ ওয়াগনের রাস্তা আটকে গেল। নওরং হিন্দিতে বলল, "কী ব্যাপার?"

ভগত জবাব দিল, "সাব, আমরা একটা ব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তার আগেই হঠাৎ এ গাড়িটা সাইড থেকে এসে রাস্তা আটকে দিল।"

বিক্রম বলে উঠল, "আরে এটা তো মালব্য ব্রিজ। এর পরেই মোগলসরাই। এ এলাকাটা খারাপ, বিহার ইউ পি-র বর্ডারের কাছে। রাস্তার ওপরের গাড়িটা নিশ্চয়ই ডাকাতের গাড়ি।"

নওরং হাতে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে বলল, "ভগত, তুমি আর সামনে এগিও না। যত তাড়াতাড়ি পারো, গাড়ি পিছে হটিয়ে নিয়ে ব্যাক করে যাও।"

ভগত হুকুম পাওয়া মাত্র, ব্যাক গিয়ার দিয়ে, গাড়ি ব্রিজের ওপর দিয়ে পিছনে চালিয়ে দিল। সামান্য একটু না যেতেই, ভক্স্ ওয়াগনটা যেন লাফিয়ে উঠে, একটা চক্কর দিয়ে, ব্রিজের ধারে গিয়ে আস্তে ধাক্কা মারল।

ভগত বলে উঠল, "হায় রাম, ডাকু লোক টায়ারে গুলি করেছে।"

ভগতের কথা শেষ হতে না-হতেই, ডাকাতদের গাড়িটা মুখ ফিরিয়ে সোজা এগিয়ে এল। নওরং দরজা খুলে নেমেই, ডাকাত-গাড়ির সামনের উইন্ডো স্ক্রীনের কাচে গুলি করল ঝনঝন শব্দে কাচ ভেঙে পড়ল, আর একটা আর্তনাদের শব্দ ভেসে এল। পালটা ভক্স্ ওয়াগনের সামনের কাচেও গুলি লাগল, আর কাচ ভেঙে পড়ল। ভগত 'হায় রাম' বলে শুয়ে পড়ল। পিছনের সীটে গোগোলের ঘাড় ধরে বিক্রম সিং একেবারে সীটের নীচে মুখ গুঁজে দিল। বাইরে আবার গুলির শব্দ হল। বাইরে ডাকাত-গাড়িটার দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। গোগোল মাথাটা একটু তুলে দেখল, সামনের মুখোমুখি গাড়িটার হেডলাইট নিভে গিয়েছে। নওরংয়ের গলা শোনা গেল, "কারলাসাহেব, তুমি ছুরিটা নিয়ে নেমে এসো। আমি ওদের হেডলাইট গুলি করে ভেঙে দিয়েছি।"

কারলাসাহেব ওরফে বিক্রম বলল, "গোগোল, তুমি সীটের নীচেই মাথা গুঁজে থাকো, নড়াচড়া কোরো না। আমি নীচে নামছি।"

টর্চলাইট আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিক্রম এক হাতে টর্চ অন্য হাতে ছুরিটা নিয়ে নেমে গেল। এই সময় আর একটা গুলির শব্দ হল। আর নওরংয়ের হিন্দি ভাষায় চিৎকার শোনা গেল, "তোমরা যত বড় ডাকাতই হও, কিন্তু জানো না, কার সঙ্গে তোমরা লড়তে এসেছ।"

নওরংয়ের কথা শেষ হবার আগেই আবার একটা গুলির শব্দ হল। গোগোল খুব সামনে থেকেই নওরংয়ের চাপা আর্তনাদ শুনতে পেল। বিক্রমের গলা শোনা গেল, "কী হল নওরং?"

নওরংয়ের যন্ত্রণাকাতর চাপা গলা শোনা গেল, "আমার হাতে গুলি লেগেছে, আর রিভলবারটা ছিটকে পড়েছে কোথায়, দেখতে পাচ্ছিনে। আমার মনে হচ্ছে, ওদের একটাকে আমি প্রথমেই খতম করেছি। তুমি দ্যাখো, রিভলবারটা খুঁজে পাও কি না।"

বিক্রম বলল, "তার দরকার কী? আমার অ্যাটাচিতে একটা প্লাস্টিক বোমা আছে, সেটাই ছুঁড়ি।"

নওরংয়ের যন্ত্রণাকাতর স্বরে যেন নতুন আশা শোনা গেল, "নিশ্চয়, তাড়াতাড়ি কর। আমার মনে হয়, ও গাড়িতেও দুজন ছিল। একজন খতম হয়েছে, নয়তো ঘায়েল। আর একজন আমাদের ওপর হামলা করার আগে আড়াল থেকে দেখে নিচ্ছে, আমরা ক'জন আছি। ওদের ধারণা আমাদের সঙ্গে মহিলা বাচ্চারা আছে।"

বিক্রম ইতিমধ্যে গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে, তার অ্যাটাচিটা টেনে নিয়ে খুলে, হাতড়ে বোমাটা বের করে নিল। গোগোল সবই দেখতে পাচ্ছে। সামনের সীট থেকে বাঁ দিকের দরজা খুলে, ভগত নেমে গিয়েছে, এটা ও টের পেয়েছে। ব্রিজটার মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলার রাস্তা, দুপাশে লোকজনদের পায়ে-চলা রাস্তা। গাড়ি আর পায়ে-চলা রাস্তার মাঝখানে বড় বড় লোহার রেলিং রয়েছে। গোগোল দেখেছে, ভগত গাড়ি থেকে নেমে, একটা রেলিঙের আড়ালে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই গুলিগোলার ভয়ে, সে-রকম বুঝলে, অন্ধকারে পালাতেও পারে।

গোগোল নিজে কী করবে, কিছু ভেবে পাচ্ছে না। জায়গাটা কোথায়, কোন্ রাস্তাঘাট, কিছুই বুঝতে পারছে না। বিক্রম সিং বলছিল, মালব্য ব্রিজ। গোগোল মনে করতে পারছে না, মালব্য ব্রিজটা কোথায়। কিন্তু ওকে যদি বিক্রম সিংদের হাত থেকে পালাতে হয়, এই হচ্ছে তার সুবর্ণ সুযোগ।

গোগোলের এসব চিন্তার মধ্যেই, প্রথমে একটা গুলি ছুটে এল, আর ভক্স্ ওয়াগনের একটা হেডলাইট নিভে গেল, গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি খেল। তারপরেই উল্টো দিকের গাড়িটার পাশ ঘেঁষে প্রচণ্ড শব্দে আগুনের শিখা জ্বলে উঠল, আর একটা মরণ-চিৎকার ভেসে এল। বিক্রম বলে উঠল, "নওরংসাহেব, আর একটা দুশমন খতম।"

নওরংয়ের যন্ত্রণাকাতর স্বর শোনা গেল, "বুঝেছি, এবার তুমি টর্চলাইট জেবলে রিভলবারটা কোথায় পড়েছে খুঁজে দেখ।"

নওরংয়ের কথা শেষ হবার আগেই, পিছন থেকে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়ল। বিক্রম সিং বলে উঠল, "আবার কারা আসছে, কে জানে।"

নওরং বলল, "কারা আবার? এত রাত্রে কোনো প্রাইভেট গাড়ি আসবে না, নিশ্চয় লরি ট্রাক হবে। তুমি তাড়াতাড়ি রিভলবারটা খুঁজে দেখ, আর ভগতকে বলো, আমাকে গাড়িতে তুলে নিতে।"

গোগোল পিছনের পর্দা সরিয়ে কাচের ভিতর দিয়ে উঁকি দিল। দেখল একজোড়া হেডলাইট খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। বিক্রম সিং টর্চের আলোয় রিভলবার খুঁজতে খুঁজতে হেঁকে বলল, "ভগত, নেমে এসে সাহেবকে গাড়িতে তোলো। আর তাড়াতাড়ি স্টেপ্‌নি লাগিয়ে নাও।"

গোগোল দেখল, ভগতের গায়ের ওপর পিছনের গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়েছে। সে পিছন ফিরে পিছনের গাড়িটা দেখছে। তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। অথচ সে যখন খুব স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল, তাকে খুবই সাহসী মনে হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিক্রম সিংয়ের রিভলবার খুঁজতে খুঁজতেই পিছনের গাড়িটা খুব জোর শব্দ করে ব্রেক কষে বিক্রমের গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিক্রম লাফিয়ে সরে গেল, আর গালাগালি দিয়ে উঠল, "আরে, কীরকম ড্রাইভার? চাপা দেবার মতলব নাকি?"

গোগোল অবাক হয়ে দেখল, সদ্য এসে দাঁড়ানো গাড়িটার বাঁ দিকের দরজা খুলে, হাতে রিভলবার নিয়ে অশোকদা নেমে বলল, "হাত উঠাও বিক্রম সিং, ছুরিটা ফেলে দাও।"

গোগোল আর থাকতে পারল না। দরজা খুলে নেমে চিৎকার করে উঠল, "অশোকদা আপনি!"

"গোগোল তুমি! তোমার জন্যই আমরা ছুটে এসেছি।" অশোক বলে উঠল।

এ সময়েই অশোকদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল, নওরং হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। গোগোল দেখে চিৎকার করে উঠল, "অশোকদা, এ বিক্রম সিংয়ের দলের লোক, হাতে গুলি লেগেছে।"

ফটিক নেমে এসেই হেডলাইটের আলোয়, তাদের গাড়ির সামনে থেকেই রাস্তার ওপরে পড়ে থাকা রিভলবারটা তুলে নিল। গোগোল অবাক হয়ে সেই মাদ্রাজি লোকটিকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ফটিক বলল, "গোগোল, এখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার সময় নয়। ব্যাপারটা কী ঘটছে তাই বলো।"

বিক্রম সিং তখন ছুরি ফেলে দিয়ে দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ফটিক রিভলবারটা নওরংয়ের দিকে তাগ্ করে রয়েছে। গোগোল সামনের গাড়িটা দেখিয়ে বলল, "ওই গাড়িটা এদের রাস্তা আটকে গুলি করে টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছে, আর এরা বোমা মেরে, গুলি করে বোধহয় ওদের মেরে ফেলেছে।"

অশোক বলল, "বুঝেছি। লোকে বলে কাকের মাংস কাকে খায় না। আর এখানে দাঁড়কাক আর পাতিকাকে লড়াই লেগে গেছল। পাতিকাকগুলো বুঝতে পারেনি, কাদের মোকাবিলা করতে যাচ্ছে, তাই মরেছে। কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই। বিক্রম সিং, তোমার বন্ধুর হাত ধরে আমার গাড়ির পেছনের সীটে উঠে যাও তো। কোনোরকম গোলমালের চেষ্টা কোরো না। দিল্লিতে তোমাকে ধরতে পারিনি, এখন বেয়াদপি করলে, স্রেফ মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

ফটিক নওরংয়ের মাথা লক্ষ করে পা তুলল। নওরং তাড়াতাড়ি দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর অবাক হয়ে বলল, "এটা তো সেই অ্যামব্যাসাডর, যেটাতে কানপুর থেকে আমাদের আসার কথা ছিল?"

অশোক আর ফটিক চোখাচোখি করে হাসল। ফটিক রিভলবার তুলে, বিক্রম আর নওরংকে অ্যামব্যাসাডরের পিছনের সীটে তুলে দিল। অশোক বলল, "গোগোল, তুমি সামনের সীটে উঠে বসে পড়ো।"

গোগোল বলল, "এদের ড্রাইভার ভগত ওখানে লুকিয়ে আছে।"

অশোক সাবধান হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওর হাতে রিভলবার বা ছুরি-টুরি নেই তো?"

গোগোল বলল, "না। আমার মনে হয় সে অন্ধকারে পালিয়েছে।"

অশোক বলল, "পালাক। তুমি বসো।"

অশোক গোগোলকে নিয়ে সামনের সীটে উঠলেও, দু পা তুলে পিছন ফিরে, রিভলবার তাগ করে বসে বলল, "শোনো বিক্রম, তুমি আর তোমার বন্ধু দরজা খোলবার চেষ্টা কোরো না।"

ফটিক ড্রাইভারের জায়গায় বসে, হাতের রিভলবারটা অশোককে এগিয়ে দিল। অশোক রিভলবারটা বাঁ হাতে নিয়ে, মুখ না ফিরিয়ে বলল, "ফটিক, মোগলসরাই এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার, আমি রাস্তার পোস্টে দেখেছি। একটা চান্স নিয়ে দেখা যাক, রাজধানী এক্সপ্রেসটা ধরা যায় কি না।"

ফটিক গাড়ি স্টার্ট করেই হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "তিনটে পঞ্চাশ।"

অশোক বলল, "তার মানে, রাজধানী করেক্‌ট্ টাইমে এলে, প্রায় এক ঘন্টা আগে এসে যাবার কথা। চান্স নিয়ে দেখা যাক।"

গোগোল চোখ বড় করে বলল, "মোগলসরাইয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরবেন?"

অশোক বলল, "দেখা যাক। রাজধানী ধরতে পারলে সেখানে তোমার সব কথা শুনব, নয় তো এ গাড়িতে কলকাতা যেতে যেতে শুনব।"

গোগোল ঘাড় বাঁকিয়ে, বিক্রম আর নওরংয়ের করুণ অবস্থা দেখার থেকেও, অশোক আর তার বন্ধু ফটিককেই ঝকঝকে চোখে দেখতে লাগল। ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না, অশোকদা এখানে কেমন করে চলে এল, আর হাতেনাতে বিক্রমকে ধরল।

আবার রাজধানী এক্সপ্রেস

ফটিক মোগলসরাই স্টেশনের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাতেই দেখা গেল, একটা গাড়ি এক নম্বর প্ল্যাটফরমে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল। বিক্রম দরজা খোলবার চেষ্টা করছিল। অশোক রিভলবার তুলে গর্জন করে উঠল, "খবরদার বিক্রম সিং।"

বিক্রম থেমে গেল। একজন কুলি ছুটে এল অশোকদের গাড়ির কাছে। ফটিক হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "এটা কোন্ গাড়ি এল?"

কুলি জবাব দিল, "রাজধানী এক্সপ্রেস। বহুত লেটে এসেছে। সাবদের কি সামান আছে তো?"

ফটিক গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে দরজা খুলে নেমেই পিছনের একটা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বলল, "হাঁ, সামান আছে, কিন্তু ভাই, তুমি নিয়ে যেতে পারবে না।" বলেই সে নওরংকে হাত ধরে এমন মোচড় দিয়ে নামাল, সে ব্যথায় কাতরে উঠল।

অশোক দুটো রিভলবার দুজনের দিকে তাগ্ করে বলল "জলদি নামো বিক্রম সিং।"

গোগোল নেমে অশোকের পাশে দাঁড়িয়েছিল। শেষ রাতে স্টেশনে ভিড় নেই। রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে কিছু যাত্রীর ওঠানামা, আর কয়েকজন কুলির ছোটাছুটি। তার মধ্যেই, কেউ কেউ অশোকদের দলটাকে অবাক চোখে দেখছিল। গেটে কোনো টিকেট কালেকটর ছিল না। সামনেই একজন বন্দুকধারী রেল পুলিস প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। অশোক তাকে

হিন্দিতে বলল, "জলদি অফিসারকে খবর দিন, কানপুরের ডাকু ধরা পড়েছে।"

বন্দুকধারী কী বুঝল, সে ছুটল। ফটিক নওরংকে ধরেই রেখেছিল। অশোক বিক্রমের পিছনে রিভলবার ঠেকিয়ে, দুজনকেই একটা ফার্স্ট ক্লাসে তুলতে যেতেই দরজায় একজন বন্দুকধারী সেপাই পথ আটকাল। অশোক হিন্দিতে বলল, "জলদি ঢুকতে দিন, অফিসারদের খবর দিন, হারানো বাচ্চা ফিরে পাওয়া গেছে, আর বাদবাকি ডাকুরাও ধরা পড়েছে।"

বন্দুকধারী এবার সরে দাঁড়িয়ে অশোকদের ঢুকতে দিল। একজন রিভলবারধারী ইনসপেকটর এগিয়ে এল। অশোক ইংরেজিতে বলল, "এ দুজনকে এখুনি অ্যারেস্ট করুন, দুজনেই দিল্লির উধম সিং খুনের আর পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের আড়াই কোটি টাকার জালিয়াতির আসামি। রাজধানী এক্সপ্রেসে যে খুন হয়েছে, তার সঙ্গে এদের যোগ আছে, আর এরাই গোগোলকে গাড়ি থেকে লোপাট করেছিল।"

ইনসপেকটরের পিছনে আরও কয়েকজন অফিসার এগিয়ে এল। ইনসপেকটর অশোককে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে তা জানতে পারি?"

অশোক ওর কোটের ইনসাইড পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ ইনসপেকটরের দিকে এগিয়ে দিল। ইনসপেকটর সেটা পড়েই, অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, "আমার কী সৌভাগ্য! আপনিই মিঃ ঠাকুর? আপনি এদের কোথা থেকে ধরলেন, আর গোগোলকেই বা পেলেন কী করে?"

অশোক হেসে বলল, "সবই আপনাদের বলব। তবে আমার মনে হয়, সব ব্যাপারটা এখন আপনারা চুপচাপ সারুন, বেশি হল্লা যেন না হয়। গোগোলের কথা আমাদের আগে শুনতে হবে। তার আগে ওকে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি।"

ইনসপেকটর এবং আরও কয়েকজন রিভলবার দিয়ে বিক্রম আর নওরংকে ঘিরে, পাশেই একটা চার বার্থের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় ঢুকিয়ে দিল। অশোক ফটিককে পরিচয় করিয়ে দিল। ফটিক রয়ে গেল পুলিস দলের সঙ্গে। আসলে অশোক ইচ্ছে করেই ফটিককে নিজের লোক হিসেবে রেখে গেল। তারপরে চেয়ারকারে গোগোলের মায়ের কাছে গেল গোগোলকে নিয়ে। ইতিমধ্যে রাজধানী এক্সপ্রেস মোগলসরাই স্টেশন ছেড়ে চলতে আরম্ভ করেছে।

অশোকের আগে আগে গোগোল নিজেদের চেয়ার-কারের কামরায় ঢুকে অল্প আলোয় দেখল, মা দু হাতে কপাল রেখে, মাথা নিচু করে বসে আছেন। গোগোল আস্তে আস্তে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, "মা!"

মা চমকে দু হাত সরিয়ে তাকালেন। প্রথমে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপরেই দু হাত বাড়িয়ে গোগোলকে বুকে টেনে বলে উঠলেন, "সত্যি তুই? কোথায় ছিলি? কোথা থেকে এলি?"

গোগোল মায়ের আদরে যেন লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, "এই যে দেখছ, অশোকদা—অশোকদাই তো আমাকে নিয়ে এল মোটরে করে।"

মা অবাক চোখে তাকালেন অশোকের দিকে। অশোক দু হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "আপনাকে পরে সবই বলব। আপাতত জেনে রাখুন, ওকে আমি জি টি রোডে একটা গাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি, আর যারা ওকে নিয়ে গেছল, তাদেরও ধরে এনেছি।"

গোগোল দেখল মায়ের মুখে হাসি, কিন্তু চোখে জল এসে পড়েছে। কিন্তু ও আগেই নিচু হয়ে মায়ের পায়ের কাছে ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখল টর্চলাইটটা আছে কি-না! আছে। সেটা

তুলেই ও অশোককে দেখিয়ে বলল, "অশোকদা, এই টর্চলাইটটার মধ্যে নাকি আট লাখ টাকার মাল আছে, বিক্রম সিংয়ের বন্ধু নওরংসাহেব বলছিল।"

অশোক বলল, "সবই শুনব গোগোল, ওটা এখন তুমি পকেটে রাখো।"

গোগোল লাল চৌকো টর্চটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। অশোক মাকে বলল, "আপনি আর ভয় পাবেন না। গোগোলকে নিয়ে আমি একটু ফার্স্ট ক্লাসে একটা কামরায় যাচ্ছি, সেখানে সব অফিসাররা বসে আছেন। ওর মুখ থেকে আমাদের কিছু শোনা দরকার।"

মা তবু যেন ভরসা করে গোগোলের হাত ছাড়তে পারলেন না। অশোক আবার বলল, "আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন।"

ইতিমধ্যে আশপাশের যাত্রীরা জেগে উঠে গোগোলকে হাঁ করে দেখছিল। মা এবার যেন একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, "আপনাকে ছাড়া এখানে আমি আর কাকে ভরসা করতে পারি? আপনিই তো গোগোলকে ফিরিয়ে এনেছেন।"

গোগোল অশোকের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস বগিতে এল। পুলিস অফিসার আর ইনসপেকটররা যে-কামরায় বসে ছিলেন, সেখানে বিক্রম আর নওরং ছিল। অশোক প্রস্তাব করল, গোগোলকে নিয়ে সবাই অন্য কামরায় বসবে। বিক্রম আর নওরংকে পাহারা দিয়ে সেই কামরাতেই রাখা হোক।

সেই ব্যবস্থাই হল। কিন্তু ফটিক থেকে গেল বিক্রম আর নওরংয়ের সঙ্গে। তা ছাড়া কয়েকজন বন্দুকধারী। অন্য একটি দুই বার্থের খালি কামরায় অশোক এবং অন্যান্য অফিসার ইনসপেকটররা এলেন। অশোক ইংরেজিতে বলল, "গোগোল, তুমি এ গাড়িতে যা যা ঘটেছে, তারপর বাইরে বিক্রম সিংরা তোমাকে কীভাবে মোটরে করে নিয়ে যাচ্ছিল, কী কথা হয়েছিল, সব কথা আমাদের বলো।"

অশোকদাকে ইংরেজিতে কথা বলতে শুনে গোগোল বুঝল, ওরও ইংরেজিতেই সব কথা বলা উচিত। ও রাজধানী এক্সপ্রেসে অশোকদার সঙ্গে পরিচয় হওয়া থেকে, মনে করে প্রত্যেকটি ঘটনাই বলল। কানোয়ারলালের খুন, লাল চৌকো টর্চলাইট, ওকে লোপাট আর মোটরে করে নিয়ে যাওয়া, জিজ্ঞাসাবাদ, জওহর সিংকে দিলদার সিং প্রমাণের চেষ্টা, মালব্য ব্রিজের কাছে ডাকাত-গাড়ির আক্রমণ, অশোকদাদের দ্বারা উদ্ধার—সবই বলল। আর লাল চৌকো টর্চলাইটটা পকেট থেকে বের করে অশোকদার হাতে তুলে দিল।

গোগোলের কথা শুনে সবাই খুব অবাক আর প্রশংসার চোখে অশোকদার দিকে তাকালেন, এবং জানতে চাইলেন, এমন অসম্ভব ঘটনা কেমন করে তিনি ঘটালেন। অশোকদার চোখমুখের ভাব তখন বদলে গিয়েছে। সে বলল, "রাজধানী এক্সপ্রেস কানপুরে লেট না করলে আমি মোগলসরাইয়ে ট্রেন ধরতে পারতাম না, আর মালব্য ব্রিজে ডাকাতরা বিক্রমসিংদের গাড়ি অ্যাটাক না করলে, কিছুই সম্ভব হত না। যাই হোক, গোগোলের কথা শুনে, আমি দিল্লির যে জালিয়াতি আর খুনের তদন্ত করছিলাম, মনে হচ্ছে তার আসল আসামিদের সবাইকেই আমি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। কানোয়ারলালকে আপনারা নিজেরাই শনাক্ত করেছেন, সে ছিল দিল্লির একজন চোরা হীরে-স্মাগলার। আমার মনে হচ্ছে, এ লাল টর্চটার খোলের মধ্যে দামি হীরে আছে, আপনারা খুলে দেখুন।" সে একজন অফিসারের দিকে টর্চটা বাড়িয়ে দিল, "মিঃ মুরারকা, আপনিই টর্চটা খুলুন।"

সবাই সায় দিলেন। মিঃ মুরারকার বয়স সকলের থেকে বেশি, মাথার চুল কাঁচাপাকা আর তাঁর খুব ফরসা রঙ। দেখে মনে হচ্ছে, পুলিসের বড় পোস্টে আছেন। তিনি টর্চলাইটটা হাতে নিয়ে, নীচে যেখানে ঢাকনা খুলে ব্যাটারি ভরে, সেখান থেকে লিউকো প্লাস্টার আগে টেনে খুললেন, তারপরে ঢাকনাটা টেনে খোলবার পরে দেখা গেল, সাদা তুলোর আস্তরণ। তুলো ধরে সাবধানে টান দিতেই, একটি বেশ বড় হীরের টুকরো মিঃ মুরারকার হাতের তালুতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, "স্ট্রেঞ্জ! মিঃ ঠাকুর দেখছি ঠিকই বলেছেন।" বলে তিনি টর্চটা আর একটু কাত করতেই, আরও কয়েকটি হীরের টুকরো ওঁর হাতে পড়ল।

সকলেই মিঃ মুরারকার হাতের তালুতে হীরের টুকরো-গুলো হীরের মতো জ্বলজ্বলে চোখেই দেখছিলেন, তারপরে অশোকদার দিকে তাকালেন। গোগোলও অশোকদাকেই দেখছিল। অশোকদা বলল, "আপনারা ভালই জানেন, কানোয়ারলাল লোক খুব সুবিধের ছিল না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ চোরাই হীরে বিক্রম সিংদের কাছ থেকেই কানোয়ারলাল হাতড়েছিল, আর সেটা নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিচ্ছিল। ভাবতে পারেনি, বিক্রম সিং আমার জন্য সদলবলে এই ট্রেনেই যাচ্ছে। চলন্ত ট্রেনে যখন জানতে পারল, তার দুশমনরা এ গাড়িতেই আছে, তখনই সে এই টর্চটা ভাল মানুষ সেজে আমার হাতে তুলে দেবার কথা ভেবেছিল। বিক্রম সিং মোটরে এ কথা গোগোলের সামনে বলেছে। যাই হোক, কানোয়ারলাল টাকের ওপর টেক্কা দিতে গিয়ে মারা পড়েছে, আর সেটা পড়েছে গোগোলের সামনেই। আর সেটাই এখন আমার
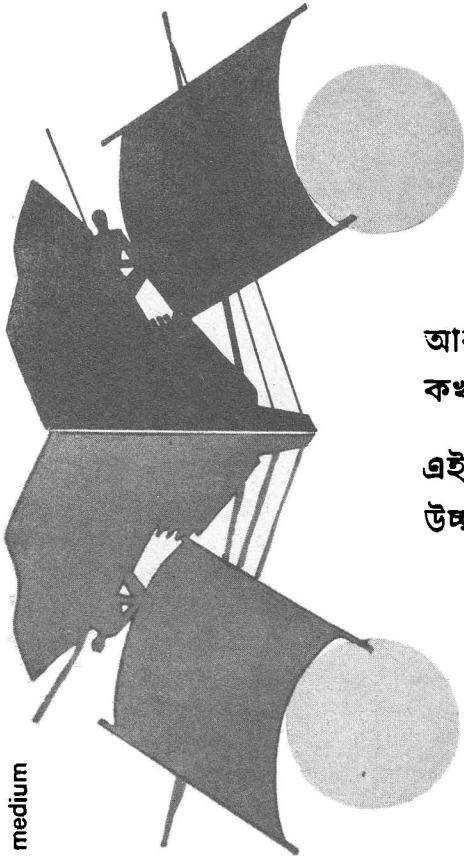
তদন্তের ব্যাপারে সব থেকে বড় সাহায্যের কাজ হয়েছে।"

সবাই গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল কিছুই বুঝতে পারল না। মিঃ মুরারকা বললেন, "মিঃ ঠাকুর, আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন।"

অশোক বলল, "আপনারা জানেন, আমি আড়াই কোটির মধ্যে দু কোটি টাকা উদ্ধার করেছি, আর যে পাঁচজনের কাছে টাকা পাওয়া গেছল, তারা সবাই অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু দিল্লির ডিটেকটিভ মিঃ উধম সিং, যিনি আমাকে সাহায্য করছিলেন, তিনি হঠাৎ খুন হয়ে গেলেন। এই খুনের তদন্ত করতে গিয়ে আমি বিক্রম সিংকে আবিষ্কার করি, কিন্তু সে গভীর জলের মাছ। দিল্লির অনেক বড় বড় হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে তার ওঠা-বসা। তাকে হাতেনাতে ধরতে পারছিলাম না। আজ গোগোলের ব্যাপারে তাকে আমি হাতেনাতে ধরেছি। তার সঙ্গী নওরং লোকটি কে, এখনও জানতে পারিনি, তবে জানতে পারব। গোগোলের কথা থেকে বুঝেছি, নওরং নামটা আসল নয়। যেমন বিক্রম সিং এই এক্সপ্রেসে এ কে কারলা নামে ট্র্যাভেল করছিল। কিন্তু সব থেকে বড় কথা, জওহর সিংকে পাওয়া! এই জওহর সিং কেবল কানোয়ারকে খুন করেনি, উধমসিংকেও করেছে। এই জওহর সিং বিক্রমেরই হাতের লোক, তাকে বাঁচাবার জন্যই সে গোগোলকে বারবার তার নাম দিলদার সিং বলে চালাতে চেয়েছিল।"

মিঃ মুরারকা বলে উঠলেন, "জওহর সিং নাম আমার শোনা, কিন্তু তাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি।"

অশোক বলল, "আমার মনে হচ্ছে, সে এই রাজধানী এক্সপ্রেসেই আছে, আর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।"

একজন অফিসার অবাক হয়ে বললেন, "নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, কী করে জানলেন?"

অশোক হেসে বলল, "কারণ সে জানে, তাকে কেউ চেনে না। আমি চিনি না। আপনারা কেউ চেনেন কি?"

সকলেই হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। অশোক বলল, "তা হলে জওহর সিংয়ের পক্ষে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে অসুবিধে কোথায়?"

সকলেই হতাশ চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অশোক হেসে, গোগোলের কাঁধে হাত রেখে বলল, "একমাত্র গোগোলই জওহর সিংকে চেনে, তার চোখের সামনেই জওহর সিং কানোয়ারকে রিভলবার দিয়ে গুলি করেছে।"

তৎক্ষণাৎ সব অফিসার ইনসপেকটদের চোখগুলো অবাক খুশিতে ঝলকে উঠল, আর সবাই গোগোলের দিকে তাকিয়ে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন, "ঠিক ঠিক! আমরা তো আসল কথাটাই ভাবিনি।"

গোগোল লজ্জা পেয়ে অশোকদার দিকে তাকিয়ে হাসল। অশোক বলল, "জওহর সিং জানে, কানপুরে গোগোলকে এ গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং সে খুবই নিশ্চিন্তে ঘুমোবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।"

একজন অফিসার বলে উঠলেন, "তা হলে গোগোলকে নিয়ে এখনই আমরা জওহর সিংকে অ্যারেস্ট করতে পারি?"

অশোক বলল, "কিন্তু গোগোলও জানে না, জওহর সিং কোন্ কম্পার্টমেন্টে আছে। তবে এটা অনুমান করা যায়, যে-কোনো ফার্স্ট ক্লাস বগির কোনো কামরায় আছে। চেয়ারকারে সে যাবে না। বিক্রম আর নওরং নিশ্চয়ই জানে, জওহর সিং কোথায় আছে। কিন্তু তারা আমাদের কাছে কিছুতেই স্বীকার করবে না। সে চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই।"

একজন ইনসপেকটর বললেন, "আমরা তিনটে ফার্স্ট ক্লাস বগির প্রত্যেক কামরার দরজায় এখনই গিয়ে নক করতে পারি।"

অশোক বলল, "নিশ্চয়ই পারেন, যদিও যাত্রীদের ঘুম ভাঙানো হবে। এক নম্বর, দু নম্বর হচ্ছে, জওহর সিং শেয়ালের থেকেও চালাক। একবার যদি কোনোরকমে টের পায়, ফার্স্ট ক্লাসে কারোকে খোঁজা হচ্ছে, সে নির্ঘাত পালিয়ে যাবে। কারণ আমরা তো তিনটে ফার্স্ট ক্লাস বগির সবগুলো কমপার্টমেন্টে একসঙ্গে হানা দিতে পারছি না। দিয়ে কোনো লাভও নেই। গোগোল ছাড়া আমরা কেউ তাকে চিনিনে।"

মিঃ মুরারকা বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ ঠাকুর। এখন আপনিই বলুন, আমাদের তা হলে কী করা উচিত।"

অশোক কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, "আমার মনে হয়, দিনের আলোর জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। রাজধানী এক্সপ্রেসের পরের স্টপেজ ধানবাদ, সকাল সাড়ে আটটার আগে পৌঁছোবে না। একটা বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। বিক্রম আর নওরংকে কোনোরকমেই কামরার বাইরে আসতে দেওয়া হবে না। আমিও বাইরে যাব না, কারণ, জওহরসিং আমাকে চেনে। দিনের আলো ফুটতে এখনো একটু সময় বাকি। দিনের আলো ফুটলে, আপনারা স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করবেন। গোগোল ফার্স্ট ক্লাসের তিনটে বগিতেই ঘুরে বেড়াবে। ব্যাপারটা অবশ্য খুবই রিস্কি। জওহর তার কামরা থেকে বেরিয়ে গোগোলকে দেখতে পেলেই পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুলি করবে।"

মিঃ মুরারকা সভয়ে বললেন, "তবু আপনি গোগোলকে তিনটে বগিতে ঘুরে বেড়াতে দেবেন?"

অশোক বলল, "দেব। গোগোলকে কাছাকাছি থেকে চোখে চোখে রাখবে একজন, আমার এক বন্ধু, মিঃ এ রায়। যাকে আপনারা দেখেছেন, বিক্রম আর নওরংয়ের সঙ্গে বসে আছে। তাকে জওহর চেনে না।"

সকলেই গোগোলের দিকে তাকালেন। অশোক জিজ্ঞেস করল, "কী গোগোল, ভয় পাচ্ছ?"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "ভয় পাব কেন?"

মিঃ মুরারকা বললেন, "কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছি। ওরকম একটা দুর্দান্ত শয়তানের রিভলবারের মুখে এইটুকু ছেলেকে ছেড়ে দেওয়াটা আমি মেনে নিতে পারছি না।"

দেখা গেল অন্যান্য অফিসার এবং ইনসপেকটরদেরও মনোভাব মিঃ মুরারকার মতো। অশোক বলল, "শোনো গোগোল, আমার মনে হয়, জওহর সিং তিন নম্বর বগিতেই বোধ হয় আছে। যাই হোক, যে-বগির যে-কোনো কামরা থেকে সে বেরোলেই, তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে, তাকে ডেকে বলা, 'হ্যালো মিঃ জওহর সিং, গুড়মর্নিং।' ব্যস, আর কিছু নয়। পারবে তো?"

গোগোল ঘাড় কাত করে বলল, "খুব।"

ভয়ঙ্কর খুনীর মুখোমুখি

দিনের আলো ফুটে উঠেছে। চলন্ত রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রীরা জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে পুবের আলো দেখছে। চেয়ারকার কামরাগুলোর করিডরে যত ব্যস্ততা, ফার্স্ট ক্লাসের করিডরে সে-রকম নেই। ফার্স্ট ক্লাসের করিডরে জানালার পর্দাও কিছু কিছু সরিয়ে দেওয়ায় দিনের আলো ঢুকেছে। গোগোল তিনটি বগিতে কয়েকবার পাক খেতে খেতেই, বিহারের আকাশে রোদ উঠে পড়েছে। ওর থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে লুঙ্গির মতো ভাঁজ করে ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা ফটিকও ঘুরে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে দু-একটা ফার্স্ট ক্লাসের কামরা খুলে, যাত্রীরা বাথরুমে যাতায়াত করছে। দু-একজন অফিসার ইনসপেকটর মাঝে-মধ্যে করিডর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। যাত্রীরা তাঁদের জিজ্ঞেস করছেন, খুনী ধরা পড়েছে কি-না, কিংবা গোগোল নামে

সেই ছেলেটিকে পাওয়া গিয়েছে কি-না? অফিসার ও ইনসপেকটররা কেবল 'না' বলেই কর্তব্য সারছেন।

গোগোলের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হাসবার উপায় ছিল না। ও কেবল ফটিকের দিকে নজর রাখছিল, আর দরজা খুলে বেরোলেই নতুন যাত্রীর দিকে।

গোগোল আর-এক দফা ঘুরে, ফার্স্ট ক্লাসের তিন নম্বর বগিতে এল। ওর থেকে পাঁচ-সাত হাত দূরে ফটিক। গোগোল হঠাৎ দেখল, তিন নম্বর আর দু' নম্বর বগির মাঝখানের বাথরুম থেকে জওহর সিং বেরোল। গোগোলকে সে প্রথমে দেখতে পায় নি। সেই মাথায় নেপালি টুপি, গায়ে লম্বা ঝুলের গলাবন্ধ কালো কোট আর ট্রাউজার তার পরনে। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে, গোগোলের উলটো দিকে করিডরে এগিয়ে গেল। তার সামনে ফটিক। গোগোল বলে উঠল, "হ্যালো মিঃ জওহর সিং, গুডমর্নিং!"

জওহর সিং সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরে দাঁড়িয়েই, পকেটে হাত দিল, আর চোখের পলকে রিভলবার তুলে নিল। গোগোলের চোখ দুটো ভয়ে গোল হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ কী ঘটে গেল. দেখা গেল, জওহরের হাতের রিভলবারের কাছে উঁচুতে সাপের ফণার মতো ফটিকের একটা পা উঠল, আর রিভলবারটা ছিটকে পিছনে চলে গেল। ফটিক সেটা লুফে নিল।

জওহর সিং খ্যাপা মোষের মতো পিছন ফিরে ফটিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। ফটিকের বাঁ হাতটা ছুরির ফলার মতো ঝলকে উঠল। জওহরের মাথাটা নীচে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপরেই ফটিকের বাঁ হাত আর একবার উঠল। নিমেষের মধ্যে জওহর করিডরে মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ফটিকের ডান হাতের রিভলবার যেমন ছিল, তেমনই আছে।

অশোক দুজন অফিসারকে নিয়ে রিভলবারসহ এগিয়ে এসে বলল, "থাক্ ফটিক, আর কিছু করতে হবে না, জওহর সেন্সলেস হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে আসতে এখন মিনিমাম ঘণ্টা-খানেক।"

মিঃ মুরারকা করিডরের শেষ প্রান্তে একজন বন্দুকধারীকে হাত তুলে ডেকে জওহর সিংকে দেখিয়ে বললেন, "একে পয়লা ফার্স্ট ক্লাস বগির পুলিস-কামরায় নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে ফ্যালো।"

বন্দুকধারী জওহরকে তোলবার চেষ্টা করল। না পেরে. চিনির বস্তার মতো ঘাড়ে করে নিয়ে চলে গেল। ফার্স্ট ক্লাসের তিন নম্বর বগির দুদিকেই তখন ভিড়ে ঠাসাঠাসি। অশোক দেখল, গোগোল তখনও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গোগোলের হাত টেনে ধরে বলল, "আজ পয়লা নম্বরের হিরো তুমি, তারপরেই ফটিক। তোমরা দুজনে হাত মিলাও।"

গোগোল ফটিকের সঙ্গে করমর্দন করল। তারপরে মিঃ মুরারকা গোগোলের গাল টিপে দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। অন্যান্য অফিসার আর ইনসপেকটররাও গোগোলের কাছে আসবার জন্য ভিড় ঠেলছেন আর বলছেন, "আপনারা ভিড় কমান। সব খবরই খবরের কাগজে পাবেন।"

কেবল একজন মহিলা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চোখে জল। তিনি গোগোলের মা। অশোক তাঁকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি ডাকল, "এ কী, আপনি ওখানে? আসুন।"

গোগোল দেখল মা এগিয়ে আসছেন। ও সকলের বেষ্টনী ছাড়িয়ে মায়ের দিকে ছুটে গেল।

সমাপ্ত

পুকুর চুরি

সরল দে

দিন-দুপুরে পুকুর চুরি!
চোর নাকি ভো-কাট্টা?
বাপ রে, এ কে? পুলিস কুকুর!
যায় সরে ভিড়-ভাট্টা।
কিন্তু কুকুর গন্ধ শুঁকে
লাফ দিলে তিন হস্ত।
আকাশ ছুঁতে চাইল কেন?
হাঁ কেন ওর মস্ত?
'পাকড়ো' বলে রামখেলাওন
হঠাৎ ওঠে গর্জে,
মেঘের ফাঁকে চালাও গুলি—
উড়ে পালায় চোর যে!
দিন-দুপুরে পুকুর চুরি!
চোর বটে এক পাক্কা।
আকাশ চুরি করলে রাতে
সামলাবে কে ধাক্কা?

ছবি দেবাশিস দেব

প্রতাপগড়ের মানুষখেকো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগে জানলে এ বুড়োর পাল্লায় কিছুতেই পড়তুম না। ঢের ঢের বুড়ো মানুষ দেখেছি, গ্রীষ্মকালে তাঁরা নাতির হাত ধরে পার্কে গিয়ে বসে থাকেন এবং শীতের সময় ঘরের কোণে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে কাগজ পড়েন। দু-চারজন বুড়ো-মানুষ অবশ্যি নেতা হয়ে দেশ শাসনও করেন। খবরের কাগজের খবর যোগাড় করতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে চেনাজানাও হয়েছে অল্পস্বল্প। কিন্তু তাঁরা কেউ এঁর মতো পাহাড়-জঙ্গলে বুনো ঘোড়ার দাপটে ছোটাছুটি করে বেড়ান না—স্রেফ দুখানা ঠ্যাঙের জোরেই! কিংবা প্রজাপতি বা পাখির পেছনে বাচ্চা ছেলের মতো হন্যে হয়ে ঘোরেন না তাঁরা।

এ-বুড়োর কাণ্ডকারখানাই অদ্ভুত। নইলে এই জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীতে কেউ প্রতাপগড়ের জঙ্গলে ক্যামেরা নিয়ে রাতবিরেতে টো-টো করে ঘুরবে কোন্ সাহসে? বিশেষ করে যে-জঙ্গলে সম্প্রতি একটা মানুষখেকো বাঘের দৌরাত্ম্য চলছে!

জঙ্গলে রাতবিরেতে ক্যামেরার কথা শুনে কেউ যদি ভাবে, নিশ্চয় ফ্লাশ বাল্‌বের সাহায্যে জন্তুজানোয়ারের ছবি তোলা হচ্ছে—তাহলে সে মস্ত ভুল করবে। ক্যামেরাটাও বিষম বিদঘুটে। ভুতুড়েও বলতেও আমার আপত্তি নেই। কারণ, ওতে ফ্লাশ বাল্‌বের দরকার হয় না। অথচ অন্ধকারে লেন্সের সামনে কম পক্ষে বিশ-পঁচিশ মিটার দূরত্বে ১৮০ ডিগ্রির মধ্যে যা কিছু থাকে, সবেরই ছবি উঠে যায়। শাটার টেপার জন্যে কারও বসে থাকার দরকার নেই। ওটার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম আর স্পর্শকাতর যে, শুধু দরকার লেন্সের সামনে ওই দূরত্বের মধ্যে মাটিতে একটুখানি কাঁপন। কোনো জন্তু মাটিতে হাঁটলেই কিছু-না-কিছু কাঁপন জাগে। সেই যথেষ্ট। শাটার ক্লিক করবে।

প্রতাপগড় জঙ্গলের বাংলোয় রাত দশটায় উনি যখন ফিরে এলেন ক্যামেরার ফাঁদ পেতে, আমি তখন ফায়ার প্লেসের সামনে ইজিচেয়ারে বসে কড়া কফি খাচ্ছি আর পরদিন সকালে কেটে-পড়ার মতলব ভাঁজছি। কী শীত, কী শীত! বিহারের শীতের নামডাক আছে জানতুম। কিন্তু প্রতাপগড় এলাকা যে উত্তর মেরুরই ছোট ভাই, সেটা জানতে বাকি ছিল।

"হ্যালো ডার্লিং!" যথারীতি সম্ভাষণ করে উনি টুপি ও ওভারকোট খুললেন এবং আমার পাশে বসে মৃদু হেসে বললেন "জয়ন্ত কি আমার ওপর রাগ করেছ?"

ফ্লাস্ক থেকে এক মগ কফি ঢেলে ও'র হাতে দিয়ে গম্ভীর-মুখে বললুম, "আর কদিন থাকবেন ভাবছেন?"

আমার কাঁধে একটা হাত রেখে অন্য হাতে কফির মগ ধরে উনি হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন, "ডার্লিং! আশা করছি, কাল সকালের মধ্যে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠার মতো এক অত্যাদ্ভুত ছবি তোমায় দেখাতে পারব। অতএব, ধৈর্যসহকারে অন্তত আর একটা দিন অপেক্ষা করো। এবং জয়ন্ত, এমনও হতে পারে, তুমি এবার প্রতাপগড় থেকে তোমার দৈনিক সত্যসেবকের জন্য একটি রোমাঞ্চকর সংবাদও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।"

ও'র লোভ-দেখানো কথায় একটুও না গলে বললুম, "কিসের ছবি দেখাবেন আর? গত রাতে তো ঝর্নার জল খেতে আসা এক পাল হরিণের ছবি উঠেছিল আপনার ক্যামেরায়। কাল বড় জোর দেখব হয়তো একটা রোগা বাঘ!"

"ঠিক বলেছ ডার্লিং!" বুড়ো সাদা দাড়ি খামচে ধরে হাসলেন। তারপর অভ্যাসমতো টাকে সেই হাতটা বুলিয়ে কী একটা ফেলে দিলেন। দেখলুম লাল রঙের একটা পোকা। অনেক সময় টাকে মাকড়সার জাল বা পাখির বিষ্ঠাও দেখেছি। বুড়ো পোকাটার গতিবিধিতে নজর রেখে বললেন, "বাঘের ছবিই দেখাব। তবে এটা যে-সে বাঘ নয়, সেই কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘ। সরকার যাকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "ধরুন তাই না হয় হল। মানুষখেকো বাঘটার ছবি আপনার ক্যামেরায় উঠল। কিন্তু সেটা অত্যাদ্ভুতই বা হবে কেন এবং দৈনিক সত্যসেবকই বা ও খবর ছাপবে কেন? তাছাড়া ওটাই মানুষখেকো তার প্রমাণ কী?"

রহস্যময় হেসে বুড়ো বললেন, "ধৈর্য ধরো বৎস! এ-বৃদ্ধের প্রতি কিঞ্চিৎ বিশ্বাস রাখো। কেমন?"

এবার একটু চমক জাগল। বললুম, "যদি জেনেই বসে আছেন যে, সেই মানুষখেকো বাঘটাই আপনার ক্যামেরার সামনে এসে হাজির হবে, তাহলে ওই শিকারি ভদ্রলোকদের বললেন না কেন? ও'রা তো বাঘটাকে মারার জন্য হন্যে হচ্ছেন। আজ বিকেলে আপনার সামনেই ও'রা দুজনে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় মোষের বাচ্চা বেঁধে রেখে গাছের ওপর মাচান করে বসে থাকবেন সারা রাত। খামোকা ও'রা কষ্ট পাবেন ঠান্ডায়!"

আমার কথার জবাব দেবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, এমন সময় চৌকিদার দরজায় উঁকি মেরে একটু কেসে বলল, "হুজুর কর্নেলসাব! খানা তৈয়ার হ্যায়। হুকুম হোগা তো অভি লাবে গা।"

"জরুর।" বলে হুজুর কর্নেলসাব অর্থাৎ আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ওরফে 'বুড়ো ঘুঘু' অভ্যাসমতো বুকে ক্রস্ এ'কে যথার্থ ধার্মিকের মতো খাদ্য গ্রহণে প্রস্তুত হলেন।

বাংলোটা একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। তাই সতর্কতার জন্য বারান্দা জুড়ে গ্রিল এবং এই শীতে গোটাটা তেরপলে ঢাকা রয়েছে। বারান্দার একদিকে কিচেন। চৌকিদার কিচেনের সামনে খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। সম্প্রতি মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হওয়াতে সে আরও সতর্কতার দরুন পাশে একটা টর্চ আর বল্লমও রাখে। কর্নেলবুড়ো মানুষখেকোর ভয় তুচ্ছ করে এত রাত অব্দি জঙ্গলে ঘোরেন এবং নিরাপদে ফিরে আসেন। বারান্দার গ্রিলের একটা অংশ খুলে সে হুজুর কর্নেলসাবকে ভেতরে আসতে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফের সেই ফাঁকটা অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে তালা এ'টে সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আমার ধারণা, সে ভূত দেখছে, না মানুষ, তার দৃষ্টিতে এরকম একটা চাঞ্চল্য থাকে। কর্নেলের ওপর তার ভক্তি ক্রমশ বেড়ে গেছে।

জেলিমাখানো মোটা মোটা চাপাটির সঙ্গে বুনো মুর্গির মাংস বেশ জমিয়ে খাওয়া গেল। খেতে খেতে কর্নেল আমার সেই কথাটার জবাব দিলেন। "ঠিকই জয়ন্ত! মিঃ সেন এবং মিঃ দত্তকে আমার বলা উচিত ছিল, আপনারা ঝর্নার ভাটিতে টোপ না বেঁধে আরও একটু উজানে এসে বাঁধুন। কারণ আমার ধারণা, বাঘটা ওখানেই টিলার ওপর একটা গুহায় থাকে। তার পায়ের দাগও খু'টিয়ে দেখেছি। জঙ্গলবিদ্যায় আমারও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি আছে।"

"তাহলে বললেন না কেন?"

কর্নেল হাসলেন। "যেচে পড়ে বলাটা সঙ্গত মনে করিনি তাছাড়া লক্ষ করেছ নিশ্চয়, বিশেষ করে মিঃ দত্ত কেমন যেন অভদ্র প্রকৃতির লোক। এসেই আমাদের এখানে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন না? মিঃ সেনও কেমন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, দু-দুটো মানুষ-টোপ থাকতে আর মোষের বাচ্চা কিনতে খামোকা পয়সা খরচ কেন? ব্যাপারটা আমার গায়ে লেগেছে জয়ন্ত!"

ও'র দুঃখ দেখে ঠাট্টা করে বললুম, "আহা! ও'রা তো কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নামক প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘুকে' চেনেন না! চিনলে নিশ্চয় সমীহ করে কথা বলতেন। তাছাড়া যে জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘ রয়েছে, সেখানে যারা বেড়াতে এসেছে শখের বশে, তারা নিছক টোপ হতেই এসেছে বৈ-কী!"

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গোমড়ামুখে গেলাসের কনকনে ঠান্ডা জলটা পুরো গিলে ফেললেন।

শেষ রাতে কী একটা গন্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে কর্নেল ব্যস্তভাবে ডাকছেন, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!" বাইরে চৌকিদার দুর্বোধ ভাষায় চেঁচামেচি করছে আর কেউ হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।

কম্বল ছেড়ে বেরুনো সহজ কথা নয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সহজাত বোধ কাজ করে। হুড়মুড় করে উঠে পড়লুম। তারপর দেখি, কর্নেল লণ্ঠন হাতে এগিয়ে দরজা খুললেন। তাঁর পিছন-পিছন দৌড়ে গেলুম। বারান্দায় বেরিয়ে এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখে পড়ল। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে আছেন সেই শিকারি মিঃ দত্ত এবং দু-হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছেন। তাঁর পোশাকে চাপ-চাপ টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে। পাশে দুটো রাইফেল পড়ে রয়েছে। আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চৌকিদার বেচারা জড়ানো গলায় ক্রমাগত কী বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

কর্নেল মিঃ দত্তের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "মিঃ দত্ত, কী হয়েছে?"

বারকতক ঝাঁকুনি দেওয়ার পর মিঃ দত্ত শান্ত হলেন। তারপর ফ্যাচ করে নাক ঝেড়ে বললেন, "ও হো হো হো! আমি কী করব? কী করব আমি? আমার সারা জীবনের সঙ্গী আমার প্রাণের বন্ধু অমল......ওঃ!"

কর্নেল বললেন, "প্লীজ মিঃ দত্ত! শান্ত হোন, শান্ত হোন। কী হয়েছে বলুন তো?"

মেজাজি মিঃ দত্ত বিকৃত মুখে বললেন, "বুঝতে পারছেন না মশাই কী হয়েছে? অমলকে বাঘে মেরে ফেলেছে। ও হো হো! কেমন করে ওর স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সামনে এ-মুখ দেখাব?"

এটাই অনুমান করেছি ততক্ষণে। কর্নেল ও'র কাঁধ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "সর্বনাশ! মিঃ সেনকে মানুষখেকো বাঘটা মেরে ফেলেছে! কিন্তু কীভাবে ব্যাপারটা ঘটল বলুন তো মিঃ দত্ত? আপনারা কি একই মাচানে ছিলেন না?"

দত্তসায়েব রুমালে চোখনাক মুছে বললেন, "একই মাচানে তো ছিলুম। কখন বাঘটা চুপিচুপি গাছে উঠেছিল টের পাইনি। আমার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ অমলের আর্তনাদে জেগে গেলুম। টর্চ জ্বালতেই দেখি, ওঃ! সে এক বীভৎস দৃশ্য। বাঘটা অমলের গলা কামড়ে ধরে ঝাঁপ দিল।"

কর্নেল বললেন, "আপনি নিশ্চয় গুলি করেননি? ওঁর রাইফেলটাও তো নিয়ে এসেছেন দেখছি।"

দত্তসায়েব শ্বাস টেনে বললেন, "আমার গায়ে ধাক্কা লেগেছিল। টর্চ আর রাইফেল নীচে পড়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। ওঃ! ও হো হো হো! অমল!"

"তারপর? তারপর?" আমি দম-আটকানো গলায় প্রশ্ন করলুম।

মিঃ দত্ত বললেন, "তারপর কীভাবে যে পালিয়ে এসেছি আমিই জানি। এই দেখুন, কত জায়গায় ছড়ে গেছে। আর এই দেখুন কত রক্ত! অমলের রক্ত! ও হো হো হো!"

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বাঘটা শিকার নিয়ে সরে পড়েছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।......"

বাকি রাত আর ঘুমোনো গেল না। পাশের ঘরে দত্তসায়েব সমানে বিড়বিড় করে শোকপ্রকাশ করছেন শোনা যাচ্ছিল। কর্নেল ও আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে রইলুম। কর্নেল-বুড়ো একেবারে চুপচাপ। কোনো প্রশ্ন করেও জবাব পেলুম না। অভ্যাসমত দাড়ি বা টাকে হাত বুলোচ্ছেন, কখনও চোখ বুজে বুকে ক্রস আঁকছেন।

জঙ্গল ও পাহাড় জুড়ে ঘন কুয়াশা। রোদ বাড়লে সেটা কাটল। তখন কর্নেল আমাকে নিয়ে বেরুলেন। দত্তসায়েবকে দেখলুম লনে রোদে বসে আছেন। হাতে রাইফেল। হিংস্র চেহারা। লাল চোখ। কর্নেল ডাকলেন, "আসুন মিঃ দত্ত। দেখি, আপনার বন্ধুর ডেডবডি খুঁজে পাই নাকি।"

দত্তসায়েব উঠলেন। "ওই শয়তানটাকে খতম না করে আর আমি কলকাতা ফিরছি না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

যেতে যেতে কর্নেল বললেন, "প্রথমে আমাদের মাচানের ওখানে যাওয়াই উচিত।"

মিঃ দত্ত শুধু বললেন, "হুঁ।"

বাংলো থেকে ঝোপজঙ্গলে ভরা ঢাল বেয়ে নেমে আমরা ছোট্ট একটা সোঁতার ধারে পৌঁছলুম, যেটা একটু দূরে ঝর্না থেকে বয়ে এসেছে। পাথরের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল বইছে। ধারে ধারে কিছুটা যাওয়ার পর মিঃ দত্ত বললেন, "ওই যে ওখানে।"

চারপাশে ঘন গাছপালা, মধ্যিখানে এক টুকরো ফাঁকা ঘাস-জমি। একটা বাচ্চা মোষ মনের সুখে এখন ঘাস খাচ্ছে। বুঝলুম, ওটাই টোপ। জমিটায় পৌঁছেই আমরা থমকে দাঁড়ালুম। মাচানের ঠিক নীচেই একটা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তারপর বিকট চিৎকার করে মিঃ দত্ত ছুটে গিয়ে মৃতদেহটার কাছে হাঁটু মুড়ে বসলেন এবং রাতের মতোই বুক-ফাটা কান্না জুড়ে দিলেন।

কর্নেল ও আমি এগিয়ে গেলুম। শিকারি মিঃ সেনের গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন এবং বুকের ওপরটা তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ফালা-ফালা। পুরু পুলওভার ফেঁড়েফুঁড়ে গেছে। জমাট কালচে রক্তের ছোপ সবখানে। কর্নেল মুখ তুলে মাচানের দিকে তাকালেন। তারপর বেমক্কা গাছে চড়তে শুরু করলেন। গাছটার গুঁড়ি ও ডালে রক্তের ছোপ দেখতে পাচ্ছিলুম।

একটু পরে কর্নেল মাচান থেকে নেমে এসে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ দত্ত। বাঘটা ওঁকে আচমকা মাচানের ওপরেই আক্রমণ করেছিল। উনি আত্মরক্ষার ফুরসত পাননি। তো ইয়ে ডেডবডিটা......"

দত্তসায়েব শান্তভাবে বললেন, "চৌকিদারকে বলেছি কজন লোক ডেকে আনতে। জীপে করে কলকাতা নিয়ে যাব। কিন্তু জানি না, অমলের স্ত্রীর সামনে দাঁড়াব কোন মুখে। ওঃ।"

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে মাচানের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন, "দেখুন মিঃ দত্ত, আমার মনে হচ্ছে, আপনার বন্ধু মিঃ সেনকে যে বাঘটা মেরে ফেলেছে, সেটা মানুষখেকোটা নয়।"

মিঃ দত্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনি কি শিকারি? কীভাবে বুঝলেন যে মানুষখেকোটা নয়? মানুষখেকো না হলে ওভাবে কোনো বাঘ চুপিচুপি গাছে উঠে শিকারির ওপর হামলা করে না।"

কর্নেল বললেন, "তা ঠিক। তবে এ-জঙ্গলে আরও বাঘ থাকাও তো সম্ভব।"

ধমকের সুরে দত্তসায়েব বললেন, "যা জানেন না, তা নিয়ে বাজে বকবেন না।"

কর্নেল ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে সরে এলেন। "চলো জয়ন্ত, ডেডবডি তো পাওয়া গেছে। আমরা নিজের কাজে যাই।"

ঝর্নার ধারে এসে বললুম, "লোকটা অভদ্র। গোঁয়ার। একটা হামবাগ!"

কর্নেল হেসে বললেন, "শিকারিদের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। যাক্ গে, জয়ন্ত। তুমি বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করো গে। এ-বুড়োর পিছনে ছোটাছুটি করা তোমার পোষায় না জানি।"

"সে আর বলতে? কিন্তু আপনি যাবেনটা কোথায়?"

"আপাতত ক্যামেরাটা নিয়ে আসি।" বলে কর্নেল হনহন করে এগিয়ে গেলেন। আমি বাংলোয় ফিরলুম।......

কর্নেল ফিরলেন একেবারে দুপুর গড়িয়ে। তারপর খেয়ে-দেয়ে ফিল্ম ডেভলাপ করতে বাথরুমে ঢুকলেন। ওটাই ওঁর ডার্করুম। রাতে ঘুম হয়নি। তাই আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকাডাকিতে। "জয়ন্ত, জয়ন্ত! শিগগির সব গুছিয়ে নাও। আমরা এক্ষুনি রওনা দেব। জীপ এসে গেছে।"

বললুম, "সে কী! অরণ্যপিপাসা এরই মধ্যে মিটে গেল? না কি মানুষখেকো বাঘের আতঙ্কে? আর জীপ কোথায় পেলেন? আমরা এই অবেলায় যাবই বা কোন্ চুলোয়?"

বুড়ো ঘুঘু রহস্যময় হেসে বললেন, "ওয়েট, ওয়েট ডার্লিং! সব প্রশ্নের জবাবে আপাতত আমার রাতের ফসল তোমাকে উপহার দিতে চাই। নাও।"

হাত বাড়িয়ে যা পেলুম, তা একটা ছোট্ট ফোটোগ্রাফ। কিন্তু দেখামাত্র চমকে উঠলুম। এ কী! এ যে দেখছি, মিঃ দত্ত হাঁটু দুমড়ে পাথরের খাঁজে হাত পুরে কী একটা করছেন! অবাক হয়ে বললুম, "এর মানে? কাল রাতে তো ওঁরা দুজনে মাচানে ছিলেন!—মানে মিঃ দত্ত এবং মিঃ সেন! অথচ মিঃ দত্ত দেখছি একা এখানে কী যেন করছেন।"

কর্নেল বিদঘুটে ভঙ্গিতে ফের হাসলেন। "রেডি হয়ে নাও ঝটপট। তোমায় যা দেখাব বলেছিলুম, তা দেখালুম। বাকিটা প্রতাপগড় টাউনশিপে গিয়ে দেখাব।"

"কিন্তু আপনি মানুষখেকো বাঘটা দেখাবেন বলেছিলেন!"

"তাই তো দেখালুম।" বলে বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর নিজেই আমার কম্বল বেডিংপত্তর গোছাতে শুরু করলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরে জীপে ওঠার সময় কর্নেল

দুই পাখি
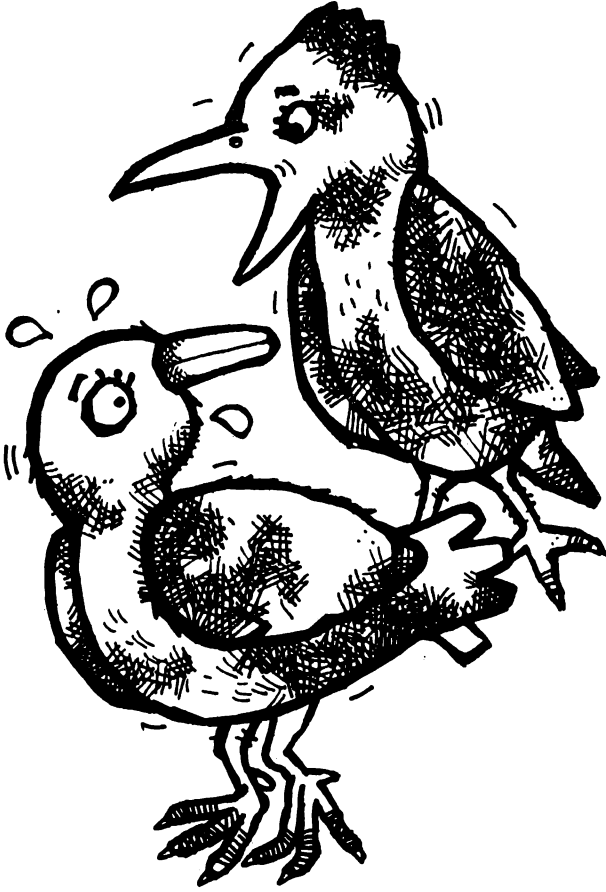
সাধনা মুখোপাধ্যায়

কাঠ্‌ঠোকরা বলল ডেকে,
"ওরে কাদাখোঁচা,
বলতে পারিস্ কোন্ কারণে
নাকখানা তোর বোঁচা।"
তাই না শুনে দুঃখে প্রবল
কাদাখোঁচার দু'চোখে জল
কাঠ্‌ঠোকরা এখন তা তোর
পালক দিয়ে মোছা।

"ওরে ওরে কাঠ্‌ঠোকরা,
এই সেদিনের তুই ছোকরা,
কাঠের জন্য ঠোঁট সুড়সুড়
সবচেয়ে তুই ওঁচা।"
কান্না চেপে ফুঁপিয়ে বলে
উঠল কাদাখোঁচা।

ছবি দেবাশিস দেব

বললেন, "আসলে যে বুড়ো এবং রোগা বাঘটা তল্লাটে পাঁচটা মানুষ মেরে খেয়েছে, সে তার পাহাড়ি গুহায় স্বাভাবিকভাবে মরে পড়ে আছে। তাকে গতকাল আবিষ্কার করে এসেছিলুম। কবে কোন শিকারির গুলি খেয়ে বাঘটার অবস্থা এমনিতে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। যাক গে, উঠে পড়ো বৎস, যথাস্থানে পৌঁছে সব টের পাবে।"

প্রতাপগড় টাউনশিপে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হল। অবাক হয়ে দেখি, জীপ থানায় ঢুকছে। বুক কাঁপল। তাহলে কি মিঃ সেন বাঘের হাতে মারা পড়েননি ? নিছক খুনখারাপির ঘটনা?

হুঁ, ঠিক তাই। লাল চোখে হিংস্র মুখভঙ্গিতে বসে আছেন মিঃ দত্ত। তাঁর হাতে হাতকড়া। টেবিলের চারপাশ ঘিরে কয়েকজন পুলিস অফিসার রয়েছেন। আমাদের দেখে একজন পুলিস অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাল্লো কর্নেল!"

কর্নেল কোটের পকেট থেকে এক গাদা ছবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার অত্যদ্ভুত ক্যামেরার রাতের ফসল মিঃ শর্মা। একটা ছবিতে দেখবেন দত্তসায়েব দুটো বাঘনখ লুকিয়ে রাখছেন। সময়ও ফিল্মে সাংকেতিকভাবে লেখা হয়ে যায়। রাত দুটো তেত্রিশ মিনিট। এই দেখুন!"

মিঃ শর্মা একগাল হেসে বললেন, "আপনার নির্দেশমতো জায়গায় মার্ডার উইপন দুটো উদ্ধার করা হয়েছে। ডেডবডি মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসতে দেরি নেই।" বলে উনি ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া দুটো বাঘের থাবার মতো নখওলা সাংঘাতিক অস্ত্র বের করলেন। রক্তের ছোপ কালো হয়ে আছে।

মিঃ দত্ত মুখ নিচু করে বসে আছেন পাথরের মতো।

অনেক রাতে সার্কিট হাউসের একটা ঘরে কর্নেলের মুখোমুখি হলুম। বললুম, "দত্তসায়েব বন্ধুকে খুন করলেন কেন?"

কর্নেল জবাব দিলেন, "কলকাতার প্রখ্যাত হোসিয়ারি দত্ত অ্যান্ড সেনের নাম শোনোনি জয়ন্ত? সেই যে বাঘমার্কা গেঞ্জি ইত্যাদি যাদের। যেটুকু অনুমান করছি, তাতে মনে হয় দত্তসায়েব ভেতর ভেতর পার্টনার বন্ধু সেনসায়েবকে ঠকিয়ে এক মালিক হবার চক্রান্ত করছিলেন। কারণ ওঁদের চাপা গলায় আগের রাতে কী সব তর্ক করতে শুনেছিলুম। যাই হোক, সেই চক্রান্তের চরম অবস্থা এই হত্যাকাণ্ড। বুঝে দ্যাখো জয়ন্ত, কী চমৎকার ফন্দি এঁটেছিলেন মিঃ দত্ত! মানুষখেকো বাঘ শিকার করতে এসে তার পাল্লায় একজনের মারা পড়াটা কত স্বাভাবিক দেখাত! শুধু বাদ সাধল এই বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ এবং তার অত্যাশ্চর্য ক্যামেরা। তবে ডার্লিং জয়ন্ত, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—যদি তুমি এই বৃদ্ধকে নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ না করে যাও, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে তোমায় সত্যিকার বাঘ দেখাবই দেখাব।"

দাড়ি ও টাকওয়ালা 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিজের বিশাল বুকে খাঁটি পাদ্রীর মতো একবার ক্রস আঁকলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে আওড়ালেন, "আমেন! আমেন!"

বীরুর কুসংস্কার নেই

হিমানীশ গোস্বামী

কুকুরের লেজে লাল রুমাল বাঁধা হয়ে গেছে। ওটা করতে খুব যে কষ্ট পেতে হয়েছে তা নয়। রাস্তার মোড়ের মিষ্টির দোকানের সামনেই ওকে দিনের মধ্যে অন্তত কুড়ি ঘন্টা পাওয়া যায়। কুকুরটার নাম কেলো। তা নাম সার্থক বটে। সমস্ত গায়ের আধ ইঞ্চি জায়গাও বাকি নেই, তার সবটাই কালো। সাধারণত এমন দেখা যায় না। কালো কুকুর অনেক দেখা যায়। আপাত-দৃষ্টে। একটু কাছে গিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখতে গেলেই খুঁত বেরিয়ে পড়ে। এই তো সেদিন হাজরা পার্কের কাছে একটা ছোট্ট কালো কুকুরকে দেখেছিল বীরু—একটা শালপাতা চিবোচ্ছিল।

বীরু সেই কুকুরটাকে ধরে ফেলেছিল. কেননা সব সময় কেলোকে পাওয়া যাবেই এমন কথা কেউ কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে? তা ছাড়া কেলো তো রাস্তায় থাকে—এই রাস্তাটা তার সব সময় ভাল লাগবে এমন কী কথা আছে। হয়তো একদিন কেলো নিউ আলিপুরে কিংবা ওল্ড বালিগঞ্জে উঠে চলে যাবে, তখন? তখন ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিন সম্পূর্ণ কালো কুকুর কোথায় পাওয়া যাবে? এই ভেবে বীরু হাজরা পার্কের সেই কুকুরটাকে যেমনি চু-চু করে ডেকেছে, আর কুকুরটি খুবই খুশি হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে তার দিকে যখন আসছে, তখন বীরু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করল কুকুরটার সবটাই কালো, কেবল লেজের ডগায় একটুখানি সাদার ছিট রয়েছে। না, ওতে হবে না। ইস্টবেঙ্গলকে জেতাতে হলে নিখুঁত কালো কুকুর চাই, আর খেলার দিন সকাল ন'টার মধ্যে সেই কালো কুকুরের লেজে লাল রুমাল বাঁধা চাই। আরও দু' একটা তুকতাক করতে হয়। নইলে একটা দলকে জেতানো কি সহজ কথা? একটু ভুল হয়ে গেলেই মুশকিল। এই তো সেবার কেলোকে খুঁজে বার করার পর তার লেজে রুমাল বেঁধে দিতেই কেলো ছুটে কোথায় গেল, আর রুমালটা ভাল

করে বাঁধা হয়নি বলে সেটা রাস্তায় পড়ে রইল। ব্যস! সেদিন ইস্টবেঙ্গল ক' গোলে হেরেছিল? তিন তিনটে গোলে!

সবই নিখুঁত করা চাই। নইলে কিছু করারই দরকার নেই। সেজন্য কুকুরের শতকরা প্রায় নিরানব্বুই ভাগ কালো হলেও ঐ একটুখানি খুঁতের জন্য বীরু কুকুরটাকে দুঃখের সঙ্গে হাজরা পার্কেই ছেড়ে এল। পরে তার বন্ধু গোপাল বলেছিল, ওরে বোকা, ঐ কুকুরটার লেজের ডগা দায়ের এক কোপে ঘ্যাঁচ করে দিলেই তো কুকুরটা সম্পূর্ণ কালো হয়ে যেত! ঠিকই। কিন্তু সেটা ঠিক তখন খেয়াল না হওয়ায় কিছুই হল না।

তা সেদিন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলা ছিল কালীঘাটের। সেদিন কালো কুকুরের লেজে লাল রুমাল বাঁধলেই চমৎকার হত। অন্য কোনো কিছুর দরকারই হত না। যেমন একটা খোলা জায়গায়—যেখানে ঘাস আছে, সেখানে সম্পূর্ণ নতুন একটা পেনসিল পোঁতা। কুকুরের লেজে লাল রুমাল বাঁধার পরে এই পেনসিল পুঁতলে সেদিন ইস্টবেঙ্গলকে কেউ হারাতে পারবে না।

তা বীরুর কুসংস্কার-টংস্কার কিচ্ছু নেই। সে ওসব একেবারেই কেয়ার করে না। সূর্যগ্রহণের সময় সে টপাটপ দই, সন্দেশ, জল—যা ইচ্ছে খায়। সে জানে, যারা বলে ঐ সময় সূর্যের আলো থাকে না বলে খাদ্যে পোকা বা জীবাণুর আবির্ভাব হয় তারা এক নম্বরের বোকা। কেননা, সূর্যগ্রহণ অর্থ হচ্ছে পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে চাঁদের অবস্থান, যার ফলে পৃথিবীর বহু জায়গা থেকে সূর্যটাকে আর দেখা যায় না। চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে এসে পড়ে। অতএব তখন খেলে ক্ষতি কী? আর তা ছাড়া জীবাণু তো সমস্ত পৃথিবীর আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, জলে, গাছের পাতায়, মানুষের দেহে সর্বত্র এমনিতেই রয়েছে।

বীরুর তাই কুসংস্কার একেবারেই নেই। তবে কিনা ইস্টবেঙ্গলকে জেতানোর জন্য দু' চারটে তুকতাক করা তো আর কুসংস্কার নয়। দুটো তুকতাকের কথা আগেই বলেছি। তৃতীয় তুকতাক হল ছাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটা ইটের উপর একখানা পাঁচ টাকার কিংবা দশ টাকার নোট আর একটা ইট চাপা দিয়ে রাখতে হয়—ঠিক খেলা শুরু হওয়ার সময় সেটা করতে হবে। খেলা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ নোটটা যেন ইট-চাপা থাকে। তবে এটা করতে গেলে খেলার মাঠে যাওয়া চলে না। রেডিওয় ধারা-বিবরণী শুনতে শুনতে এটা করাই সঙ্গত।

তবে সবচেয়ে অসুবিধে হল খেলা শুরু হওয়ার আগে একবার মেঝেতে বা মাটিতে বা মাঠে কিংবা টেবিলে (খাটে নয়) একেবারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হয়। এবং পুরো দু' মিনিট সেভাবে থাকতে হয়। ইস্টবেঙ্গলকে জেতাতে হলে এর মতো আর কোনো দাওয়াই নেই।

সুবিমল জানে বীরুর এই দুর্বলতা। ইস্টবেঙ্গলের জন্য বোধহয় বীরু প্রাণও দিতে পারে দরকার হলে। সুবিমল জানে বীরুকে যদি বলা যায়, এই বীরু, তুই এই সব করিস? তখন বীরু তাকে অম্লান বদনে উত্তর দেবে, কই, না তো? বীরু বলবে, জানিস, আমার কোনো রকম কুসংস্কার নেই। সরস্বতী পুজোর আগে আমি দমাদম কুল খাই, অঞ্জলি দিই না, পুজো-টুজো আমার অর্থহীন বলে মনে হয়। তবে হ্যাঁ, পুজোর পেসাদের জন্য পুজোর ঠিক বিরোধী আমি নই। তা ছাড়া হৈ-হল্লা, হুল্লোড় এসবও পুজো উপলক্ষে হয়। সেটার জন্য পুজোর সবটাই আমি উড়িয়ে দিই না। সুবিমলও তাকে সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ, তুই একটা কথার মতো কথা বলেছিস। আমারও ঐ একই মত। বলে মনে মনে হাসে। আজ সুবিমল ঠিক করে রেখেছে, বীরুকে জব্দ করবেই করবে। সে সব সময় বীরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, যদি বীরু উপুড় হয় তাকে তুলে দেবে। বীরুকে সে উপুড় হবার সুযোগই দেবে না।

বীরুর দুটো কাজ হয়ে গেছে। কালো কুকুরের লেজে লাল রুমাল বাঁধা, আর তাদের ছোট্ট বাগানের এক কোণে একটা নতুন পেনসিল পোঁতা। আর দুটো কাজ বাকি: একটা কাজ হল ছাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটা ইটের উপর পাঁচ টাকার একখানা নোট রেখে অন্য একটা ইট দিয়ে সেটিকে চাপা দেওয়া। এবং মাটির উপর বা টেবিলের উপর (খাট নয়) উপুড় হয়ে দু' মিনিট থাকা। এটা করতে হবে খেলা শুরু হওয়ার দু' ঘন্টার ভেতর।

কিন্তু সুবিমল এসে সব মাটি করে দিল। সুবিমলকে সে বরাবরই বলে এসেছে, তার কোনো কুসংস্কার নেই। তা ছাড়া তার ধারণা, সুবিমল মোহনবাগানের সাপোর্টার। যদিও সুবিমল বলে, সে খেলা-টেলা বোঝে না, সে কোনো দলকেই সমর্থন করে না, সে নির্দল। কিন্তু সে যে মোহনবাগানের সাপোর্টার সেটা সে বুঝতে পারে। মোহনবাগান হারলে সুবিমল কীরকম গম্ভীর হয়ে থাকে। অঙ্ক-টঙ্ক কষে। হালকা কথাবার্তায় একেবারে যোগ দেয় না। একবার সুবিমল কাকে যেন রসিকতা করে বলেছিল, সেদিন দেখি রাস্তায় খুব রিলে হচ্ছে রেডিওতে। ধারা-বিবরণী চলছে। বলছেন পুষ্পেন সরকার, চমৎকার তাঁর বলার ভঙ্গি। শ্রোতাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, খেলা কেমন হচ্ছে? তার উত্তরে সে কী বলল জানিস? বলল, "খেলাডা খুবই ভাল হইতাছে।" ব্যস! বুঝে গেলাম কে জিতছে কে হারছে ঐ এক কথাতেই! বলে সুবিমলের সে কী হাসি! ও যদি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হত তাহলে কি আর অমন করে হাসতে পারত? অথচ সুবিমলের আসলে ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হওয়া দরকার ছিল। সুবিমলের চার মামা—সকলেই যশুরে। তা হয়—এক মামা যশুরে হলে অন্যগুলোও যশুরে হয়। তা ছাড়া সুবিমলের বাবার বাড়ি উত্তরবঙ্গে। এখন অবশ্য সকলেই কলকাতায় থাকে। কিন্তু কলকাতায় থাকলে তো হবে না, দেখতে হবে আসলে কোথাকার লোক? আসলে ঘটিরাই বেশির ভাগ মোহনবাগানের সাপোর্টার, কেন কে জানে? তা সুবিমল নিজেও ঘটি নয়, বাবাও নয়, মাও নয়। তাহলে? তাহলে কেন সে মোহনবাগানের সাপোর্টার হয়ে গেল? ওকে ধরে এইসা এইসা ছটা গাঁট্টা দেওয়া উচিত বলে বীরুর ধারণা। তাহলে ব্যাটা ঠিট হবে। কিন্তু সুবিমলের মাসলের জোরও বেশি, স্বাস্থ্যও তার দুর্দান্ত, সে জন্য সুবিমলকে মারার কথা মনে হলেও আসলে সেটা কখনই হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া, একজন মোহনবাগানের সাপোর্টারকে মেরেধরে ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার করারও মানে হয় না। হয়তো মার খেয়ে চিঁ চিঁ করে বলবে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ থেকে আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হলুম, কিন্তু একটু পরেই সে যে নিজমূর্তি ধরবে না তার কী গ্যারান্টি আছে?

ঘটি কথাটাও বীরুর খুব মনঃপুত নয়। ঘটি কেন? কলকাতার লোক কলকাতাইয়া, বা ইংরেজিতে ক্যালকাটান হতে পারে, ঘটি কেন হবে? যাক সে কথা। কিন্তু সুবিমল তার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরছে কেন আজ? ওর মতলবখানা কী? বেলা বারোটার সময়েও যখন সুবিমল বীরুর বৈঠকখানায় বসে রইল একটু দাবা নিয়ে বোর্ডে সাজিয়ে কী সব দেখল, একাই খানিক খেলল, যাবার নামটি করল না, তখন বীরু বলল, বাড়িতে যাবি না খেতে-টেতে? সুবিমল তখন বলল, আজ সাড়ে নটায় সময় ভাত খেয়েছি খুব, বাবার সঙ্গে। এখন তেমন খিদে নেই। খিদে পেলে রাস্তা থেকে শিঙাড়া-টিঙাড়া কিছু খেয়ে নেব। এই সময় আবার বীরুর মা এসে বললেন, "এই বীরু, খাবি আয়। ও

সুবিমল, তুমি আছ এখনও। তুমিও দুটি খেয়ে নাও, কেমন?''

সুবিমল হাঁ-না করে রাজি হয়ে গেল। বীরু খুব কষ্ট পেল। এমনিতে সুবিমল এসে তার বাড়িতে খাবে সেটা তেমন কিছু নয়। কতবার তো খেয়েছে। বীরুও সুবিমলের বাড়িতে খেয়েছে পরীক্ষার আগে যখন একসঙ্গে তারা পড়াশুনা করেছে। সেটা কিছু নয়, কিন্তু আজ? আজ যে তাকে খেলা দেখার আগে মাটির উপর উপুড় হতে হবে? সেটা তো সুবিমলকে দেখানো চলবে না, কেননা সুবিমল তাহলে ব্যাপারটা কেবল ক্লাসে নয়, পাড়ায়, ক্লাবে সর্বত্র চাউর করে দেবে। না, সে খুব খারাপ হবে।

বীরু বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল। সুবিমল বুঝতে পেরেছে বীরুর গম্ভীর হওয়ার কারণ। তার খুবই মজা লেগেছে। সুবিমল তখন মজার মজার কথা বলে বীরুকে হাসাতে চেষ্টা করল। বলল দাদাঠাকুরের কথা। তাঁর আটখানা লুচির দরকার হলে একটু জোরে জোরে বলতেন, আল্লাদে আটখানা, আল্লাদে আটখানা! তার মানে, কথাটা একটু অন্যরকম করে লিখলে হয় আল্লা, দে আটখানা! অর্থাৎ কিনা, আল্লা আমাকে আটখানা দাও। আটখানা লুচিই সুবিমল চেয়েছিল, এবং বলেওছিল, কিন্তু বীরুর মনে হল সে যেন আসলে বলতে চাইছে, আল্লা, ইস্টবেঙ্গলকে আটখানা গোল দে!

বীরু তাই হাসতে পারল না। কী করেই বা হাসবে। আর ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা পরই তো গড়ের মাঠে খেলা শুরু হয়ে যাবে। আর ইস্টবেঙ্গল যতক্ষণ না জিতছে ততক্ষণ উত্তেজনায় তার হাসি-কান্না সবই লোপ পেয়ে সে কেমন যেন হয়ে যায়। কিন্তু তার কেবলই দুশ্চিন্তা, কেমন করে মেঝের উপর উপুড় হওয়া যায়।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুবিমল বলল, ''আয় একটু দাবা খেলি।''

বীরু বলল, ''দাবা? দাবা তো আলসেদের খেলা!'' বলে এমন তাচ্ছিল্যের ভাব করল যেন সে কখনো দাবা-টাবা খেলেনি, কিন্তু সকলেই জানে বীরু রোজই সন্ধেবেলা দু' একবার দাবা খেলে, কখনো মিহির কখনো পরাশরের সঙ্গে।

''তাহলে ক্যারম?''

বীরু বলল, ''আয়, কষে ঘুম লাগাই মেঝেতে। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর মাঠের দিকে যাওয়া যাবে। আজ তেমন ভিড়-টিড় হবে না।'' বীরু ভাবল, এতে এক ঢিলে দু পাখি মারা যাবে। ঘুমনোও যাবে আর মেঝেতে উপুড় হওয়াও যাবে, তা সে দু মিনিট কেন, আরও যতখানি ইচ্ছে!

কিন্তু সুবিমল বলল, ''না, তার চাইতে আমরা চেয়ারে বসে গপ্পো-টপ্পো করি। তা তুই এত গম্ভীর হয়ে রয়েছিস কেন রে? তোর হয়েছে কী? শরীর-টরীর ভাল আছে তো?''

বীরু বলল, ''ফার্স্ট ক্লাস! শরীর খুব ভাল। আর আমি গম্ভীর কোথায়?'' বলে খানিক হা-হা করে হাসল। কিন্তু সে হাসি যে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, জোর করে হাসা সেটা সে নিজে শুনেও বুঝতে পারল।

বীরু ভাবল, এবারে কী করা যায়? সে ড্রয়ার থেকে চার-পাঁচটা খুচরো মুদ্রা বার করে, যেন হঠাৎ পড়ে গেছে এমনভাবে ঝম ঝম করে সব ফেলে দিল মেঝেতে। দু-একটা আবার গড়িয়ে গড়িয়ে আলমারির তলায়ও ঢুকে গেল। বীরু ঝট করে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে যাবার আগেই—সুবিমল তো প্রস্তুত হয়েই ছিল, সে দুমদাম আলমারির তলায় হাত ঢুকিয়ে দুটো সিকি বার করে ফেলল, আর বাকিগুলো তো মেঝের উপরই পড়েছিল, তাই সে কটাকে তুলতে অসুবিধে হল না।

বীরু খুবই চটে গেল সুবিমলের উপর। কিন্তু কী আর করা যায়। তাকে তো আর বলা যায় না, আমি এখন মেঝেতে মেঝে থাকব উপুড় হয়ে! তাহলেই তো সুবিমল টের পেয়ে যাবে। আর সুবিমল যা খেপাতে পারে। ওরে বাবা!

হঠাৎ বীরুর মনে একটা আইডিয়া এল। সে বলল, ''সেই যে তুই আমার কাছ থেকে হেমেন রায়ের 'আবার যকের ধন' বইটা নিয়েছিলি সেটা আজই ফেরত দিতে হবে। তুই ঝট করে বাড়ি থেকে বইটা নিয়ে আয় তো!''

সুবিমল মনে মনে বলল, হুঁ, আমি বাড়িতে যাই আর তুমি সেই ফাঁকে মেঝেতে উপুড় হয়ে থাকো! সেটি আমি হতে দিচ্ছিনে! সুবিমল খুবই বোকার মতো মুখ করে বলল, ''ও সেই বইটা তো? সেটা তো কবেই পড়া হয়ে গেছে। তা আগে বলিসনি তো আজই ফেরত দিতে হবে? তা এক কাজ করা যাবে, আমরা যখন খেলা দেখতে বেরুব তখন টুক করে আমার বাড়ি থেকে নিয়ে আসব। দু' মিনিটের ব্যাপার।''

বীরু বলল, ''বই নিয়ে খেলার মাঠে যাব নাকি?''

সুবিমল বলল, ''যদি তা না চাস নিতে তারও উপায় আছে। ফেরার সময় নিয়ে নিবি। সাড়ে ছটায় খেলা শেষ হলে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে সাড়ে সাত। বেশি দেরি হবে না।''

নাঃ, সুবিমল যা বলেছে তাতে তার কথাই মানতে হয়। বীরু ভাবছে, আমি কি এতই বোকা যে সামান্য দু'মিনিটের জন্যও এই হতভাগাটার চোখের আড়ালে নিজেকে সরাতে পারব না? এ তো মহা সমস্যার ব্যাপার হল! বীরু খুবই মনমরা হয়ে পড়ল। বলল, ''তুই যদি শুতে না চাস তো আমার কিছু করার নেই, আমাকে শুতেই হবে। আমার বেজায় মাথা ধরেছে। তুই তাহলে চেয়ারে বোস, আমি একটু শুয়ে নিই।'' বলে বীরু মেঝেতে শুয়েই পড়ল। কিন্তু এখনই উপুড় হওয়া নয়। দু মিনিট চুপ করে থাকতে হবে। আর সুবিমল যেভাবে কথা বলে চলে, চুপ করার অবকাশ কই? হুঁ-হাঁ একটা কিছু তো করতেই হবে, আর তাহলেই তো তুক-এর গুণ চলে যাবে।

কিন্তু সুবিমলও কম নাছোড়বান্দা নয়। সেও বীরুর পাশেই শুয়ে পড়ল। আর একটু উপুড় হতেই সুবিমল বলল, ''অত ছটফট করছিস কেন রে?''

ব্যাস, হয়ে গেল। একটু নিশ্চিন্তে উপুড় হওয়া আর কী করে যায়। সুবিমল অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বীরুকেও হুঁ-হাঁ একটা কিছু উত্তর দিতে হচ্ছে। খুব মজার মজার গল্পও জানে সুবিমল।

তিনটে প্রায় বাজে। এবারে বেরুতে হয়। বীরু ভাবল, এবারে বেরিয়ে গিয়ে একটা কিছু করা যায় কি না দেখা যাক। দুজনে একসঙ্গে অনেকটা পথ হাঁটল। কিন্তু বাড়িতেই উপুড় হওয়ার সুযোগ পায়নি তো রাস্তায় পাবে কেমন করে? বীরু ভাবল, তুকতাক যখন সব করা গেলই না, তখন খেলাই সে দেখবে না।

সেই ভাল।

বাড়িতে ফিরে এল। সঙ্গে সুবিমল। তখন সাড়ে চারটে প্রায় বাজে। রেডিও চালিয়ে দিল। পুষ্পেন সরকার বলছেন, আজ চমৎকার আবহাওয়া খেলার পক্ষে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আছে। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই খেলা শুরু হয়ে যাবে মনে হয়। কিন্তু কিছু বলাও যাচ্ছে না ঠিক করে। এতক্ষণ খেলা শুরু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোনো দলের খেলোয়াড়ই আগে মাঠে নামতে চাইছেন না বলে দেরি হচ্ছে। এরকম কুসংস্কার থাকলে কী করে খেলা হতে পারে? এ এক ছেলেমানুষি ব্যাপার!

বীরু আর সুবিমল রেডিও শুনছে। একটু আগেই বীরু অবশ্য ছাতে দুটো ইটের ভেতর একটা পাঁচ টাকার নোট রেখে বেশ খুশি। এটা সুবিমল টের পায়নি যদিও সে সঙ্গে সঙ্গেই ছিল।

রেডিওর ধারা-বিবরণী শুনে সুবিমল বলল, ''এদেশ থেকে কুসংস্কার না উঠে গেলে কিচ্ছু হবে না, বুঝলি?''

বীরু বলল, ''যা বলেছিস ভাই!''

নতুন ফুল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দেখে এলাম 'নতুন ফুল'। দেশী ভাষায় নাম যার 'আদিস আবাবা'। ইথিওপিয়ার রাজধানী। 'আদিস' হল 'নতুন' আর 'আবাবা' বলতে ফুল।

পুরনো নাম ছিল 'ফিনফিনি'। ফিনকি দেওয়া গরম জলের ফোয়ারার জন্যেই এই নাম। চারদিকে পাহাড়ঘেরা উঁচু মালভূমির ওপর এই জায়গাটা খুব মনে ধরায় আজ থেকে শতখানেক বছর আগে এখানে রাজধানীর পত্তন করেন ইথিওপিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলিক। ফিনফিনির বদলে শহরের নতুন নাম হল আদিস আবাবা।

এশিয়া থেকে যেতে আফ্রিকায় ঢোকার দরজা ইথিওপিয়া। আমাদের দেশ থেকে খুব একটা দূরে নয়। মাঝখানে আরব সাগরের একটা ফালি। বোম্বাই থেকে হাওয়াই জাহাজে এক লাফে আদিস আবাবা। কিংবা জাহাজে জলপথে জিবুতি বন্দর। সেখান থেকে সটান রেলপথে আদিস আবাবা।

পাকিস্তানের ডক্টর মল্লিক পূর্ব আফ্রিকায় জাতিসঙ্ঘের একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। কথায় কথায় একদিন বললেন, 'পৃথিবীতে এরকমের ভাল জায়গা খুব কম আছে। মার্চ থেকে মে দিনমানে একটু গরম। গরম না বলে বলা উচিত, তেমন ঠান্ডা নয়। রাত্তিরে গায়ে দিতে হবে কাঁথা-কম্বল। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এক নাগাড়ে বৃষ্টি।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার কি খুব হাঁফ ধরছে? আর খুব ঘুম-ঘুম ভাব হচ্ছে?'

মল্লিক যে মেডিকেল-পড়া ডাক্তার নন, সেটা আমি বিলক্ষণ
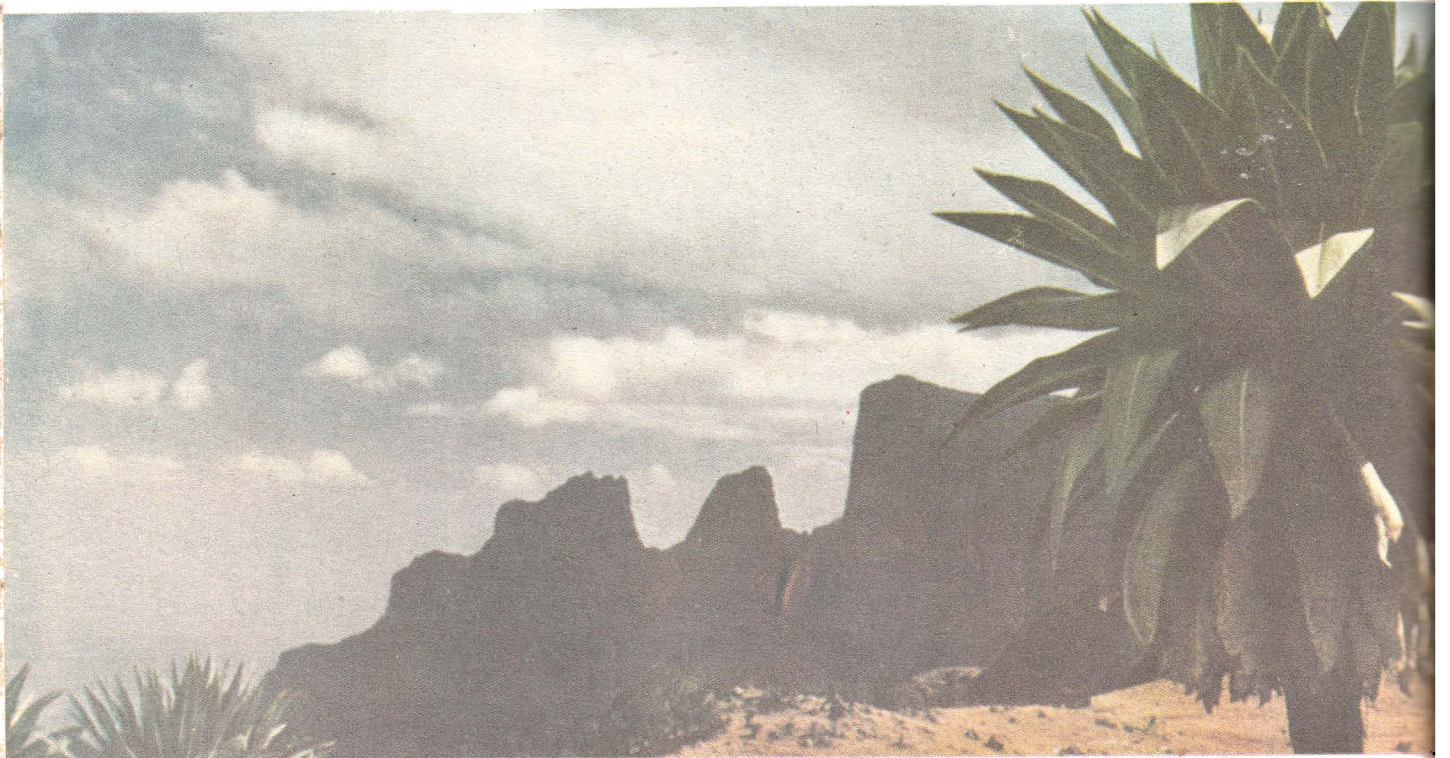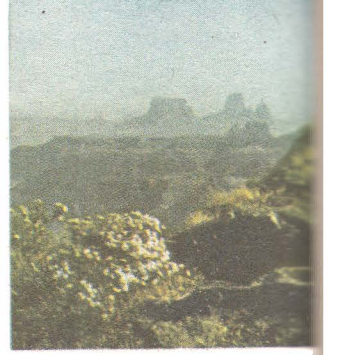
জানতাম। কিন্তু আমার উপসর্গগুলো উনি ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছেন দেখে একটু আশ্চর্যই হলাম।

উনি বললেন, 'শুধু আপনি বলে নয়, এখানে যে আসে তারই প্রথম প্রথম খুব অস্বস্তি হয়। ধাতস্থ হতে সপ্তাহ দুই লাগে। হবে না? আদিস আবাবা যে খুব উঁচুতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা হল আট হাজার দুশো ফুট।'

ক'দিন থেকে আমার ভয় হচ্ছিল আমার বোধহয় শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ডক্টর মল্লিক আমার সেই ভুলটা ভেঙে দিতেই আমি যেন পরক্ষণেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। পরে সহযাত্রী অন্য বন্ধুদের জিগ্যেস করে জানলাম তাদেরও আমারই মতন এক অবস্থা।

উচ্চতার বহর শুনে বুঝলাম আদিস আবাবা আমাদের দার্জিলিঙেরও এক কাঠি ওপরে।

'যদি হয় দূরের দেশ, মিথ্যে বলা যায় বেশ', এটা ইথিওপিয়ারই একটা প্রবাদ।

কাছ থেকে দেখা আর দূর থেকে শোনা—দুইয়ের মধ্যে তফাত না হয়েই পারে না।

ইথিওপিয়ার পুরনো নাম আবিসিনিয়া। 'হাবেশ' শব্দ তার মূলে। সেকালে আমরা 'হাবসি' বলতে বুঝতাম আবিসিনিয়ার লোক।

'চলন্তিকা' আর 'সংসদ'—এই দুই অভিধানে 'হাবসি'র প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে কাফ্রি, নিগ্রো। 'কাফ্রি' এসেছে 'কাফির' থেকে। দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকার বান্টুভাষী এক উপজাতি হল কাফির। আর 'নিগ্রো' হল আফ্রিকার কালো-মানুষ। ছাপার হরফে যা লেখা হয় তার সবই তাই বলে সত্যি নয়।

আদিস আবাবার রাস্তাঘাটে একটু হাঁটলেই দেখা যাবে রকমারি মুখচোখ, রকমারি গায়ের রং, রকমারি মাথার চুল। কেউ মাথায় লম্বা, কারো খাড়া টিকোলো নাক, কারো পাতলা বা মাঝারি মোটা ঠোঁট, কারো কুচো-কুচো কোঁকড়া চুল।

এক কথায়, নানা জাতিবর্ণের মানুষ ইথিওপিয়ার মাটিতে

মিলেমিশে একাকার হয়েছে। অনেকটা আমাদেরই দেশের মতন।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। বড় রাস্তার দুপাশে আলোয় ঝলমল করছে দোকানপাট। ফুটপাথে গিজগিজ করছে লোক। সবাই ট্রাউজার পরা। মেয়েদের পরনে গাউন।

হোটেলের লাউঞ্জে যাদের বসে থাকতে দেখলাম, মনে হল তাদের খরচ করার পয়সা আছে।

পরদিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। এক জায়গায় দেখলাম গান্ধীজীর নামে এক মাতৃসদন। একটু এগিয়ে স্টেডিয়াম। রাস্তাঘাট বেশ ভাল। দুপাশে সারবাঁধা গাছ। এঁকেবেঁকে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে রাস্তা। দুধারে বাগান-ঘেরা বাংলোবাড়ি। পাহাড়ের গায়ে সম্রাটের প্রাসাদ।

সম্রাট বলতে হাইলে সেলাসি। বুড়ো বয়সে তাঁকে রাজ্য হারাতে হয়েছে। তবে তাঁর ভাগ্য ভাল, তারপর আর বেশিদিন তিনি বাঁচেননি। দেশের লোকে তাঁকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে খোদ রাজতন্ত্রেরই পাট তুলে দিয়েছে।

ইথিওপিয়ার এই একজনকে সারা দুনিয়ার লোকে একডাকে চেনে। তার কারণও আছে। আফ্রিকার এই একমাত্র দেশ, আবহমানকাল যা স্বাধীন ছিল। শুধু মধ্যে বছর কয়েক মুসোলিনির ইতালি গায়ের জোরে এই দেশটাকে দখল করে নিয়েছিল।

লোকজনদের জিগ্যেস করে দেখেছি, হাইলে সেলাসির ওপর তাদের খুব একটা রাগ নেই। দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে না দিয়ে মুসোলিনির বিরুদ্ধে সাধ্যমত তিনি লড়েছিলেন। এমন অনেক কিছু তিনি গড়েছেন যা সারা দেশের গর্ব।

ভাল হোন আর খারাপ হোন রাজা তো বটে। কাজেই তাঁর ধনদৌলত মণিরত্ন সোনাদানা ছিল অঢেল। শুধু কি তাঁর? লতায় পাতায় তাঁর যে যেখানে আছে, সকলেরই ছিল বিস্তর জমিজায়গা। যারা তাঁর প্রিয়পাত্র আর যারা ধর্ম ভাঙিয়ে খায়— তারাই সব কিছুর মাথায়। এমনি করে জনকয়েক লোক মুঠোয় পুরে রেখেছিল সারা দেশটা। এদের যা কিছু সম্পদ, সমস্তই প্রজাদের রক্ত নিংড়ে পাওয়া।

অথচ কতদিনের পুরনো মানুষের কী সুন্দর বাসভূমি এই ইথিওপিয়া।

ইথিওপিয়ায় এমন এক আস্তানার খোঁজ পাওয়া গেছে যেখানে পনেরো লক্ষ বছর আগে মানুষ বাস করত। অন্য এক এলাকায় পাওয়া গেছে চল্লিশ লক্ষ বছর আগেকার প্রাচীন মানুষের নিদর্শন।

এক কথায়, পুরো দেশটাই যেন এক জীবন্ত জাদুঘর।

রাস্তা দিয়ে হয়তো চলেছে ছোটখাটো চেহারার একদল যাযাবর জাতের মানুষ। তাদের চলার মধ্যে রয়েছে একটা দুলুনির ভাব। জিগ্যেস করলে বলবে ওরা মরুভূমিতে-থাকা সোমালি কিংবা দানাকিল।

কিংবা একদল যাচ্ছে, তাদের বেশ কাটা-কাটা নাক-মুখ-চোখ। মেয়েদের পরনে খুব উজ্জ্বল রঙের আঁটো পাজামা আর পাতলা জ্যালজেলে ঘোমটা। এরা আসছে হারার থেকে।

একদল ভারী সুদর্শন লোক যাচ্ছে। এসেছে গ্রাম থেকে। হয়তো তারা ওরোসো কিংবা গালা সম্প্রদায়ের। মেয়েদের দুই কানের পেছনে দুটি খোঁপা। কপালে অর্ধচন্দ্রাকার মালা— রুপোর পাতা কিংবা ফুলের।

ইথিওপিয়ার মেয়েদের জাতীয় পোশাক বলতে 'শাম্মা'— তাঁতে বোনা একরকমের পাতলা জ্যালজেলে সাদা কাপড়। এই পোশাক আগে ছিল শুধু আমহারার মেয়েদের। আল বাঁধার মতো করে এরা কুচো-কুচো কোঁকড়া চুলের কেয়ারি করে। তিগ্রের মেয়েদের সারা মাথা আঁকড়ে থাকে অসংখ্য বিনুনি।

নানা জাতের, নানা বর্ণের, নানা ধর্মের মানুষ এইভাবে মিলেমিশে এক হয়ে আছে ইথিওপিয়ায়।

ইথিওপিয়ায় এখন লোকসংখ্যা তিন কোটির মতো। কিন্তু দেশ তাই বলে আকারে ছোট নয়। এর আয়তনের মধ্যে ফ্রান্সের মাপের দুটো দেশ ঢুকিয়ে দিলেও বেশ খানিকটা জায়গা খালি থেকে যাবে।

ম্যাপের দিকে তাকালে ইথিওপিয়াকে মনে হবে : ঘোমটা পরা এক মা যেন ছেলে কোলে করে লোহিত সাগরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। তাঁর ডান কনুইয়ের কাছে জিবুতি আর ডান হাঁটুর নীচে সোমালিয়া। পিঠ রেখেছেন সুদানে আর যার ওপর ভর দিয়ে বসেছেন সে দেশ হল কেনিয়া।

এডেন থেকে জলের রাজ্য পেরিয়ে প্লেন যখন বেলাবেলি ইথিওপিয়ায় ঢুকে পড়ল, নীচে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলাম শুধু পাহাড় আর পাহাড়। উঁচু-উঁচু মালভূমির গায়ে চিকচিক করছে রেশমী সুতোর মতো সব নদী। ওপরে ঠেকতে ঠেকতে চোখের নজর হঠাৎ হঠাৎ ধপ করে যেন রসাতলে তলিয়ে যায়। কোথাও ধু ধু-করা মরুভূমি, কোথাও বা বাটির মতো হ্রদ। যেমনি আকাশছোঁয়া উঁচু, তেমনি পাতালস্পর্শী নিচু—একমাত্র ইথিওপিয়ার ভূখন্ড সম্বন্ধেই বোধহয় এ-কথা খাটে।

আদিস আবাবায় পৌঁছে পরের দিনই আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম একটি লেক দেখতে। ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা। মাঝে মাঝে দুপাশে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছিল গ্রামগঞ্জ। অনেকটা আমাদেরই দেশের মতন। ছিটেবেড়ার দেয়াল, মাথায় গোল খড়ের ছাউনি। মাঠে চরছে কোথাও গরু, কোথাও ভেড়া। মাঝে রাস্তায় উটের পিঠে সওয়ারি।

রবিবার বলেই বোধহয় লেকে সেদিন লোকের খুব ভিড়। বেশির ভাগই বিদেশী ট্যুরিস্ট আর দূতাবাসের লোক। বাইরে কাতার-দেওয়া গাড়ি। ইথিওপিয়ার বাসিন্দা খুবই কম। নিজেদের গাড়ি না থাকলে এবং খরচ করবার মতো বিস্তর পয়সা না থাকলে লোকে অত দূরে যাবেই বা কেন?

বেড়ার ধার থেকে তাকিয়ে দেখলাম লেকের চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। অনেকখানি নীচে নেমে গেলে তবে লেকের পাড়। জায়গাটা ঠিক ছবির মতো।

পরের দিন সন্ধেবেলায় ভারতীয় দূতাবাসে ছিল হোলির উৎসব। ভয়ে ভয়েই গিয়েছিলাম। গায়ে যদি রং দেয়? সকলের পোশাকের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও-রকম সাজসজ্জায় আবির সইবে না। কাঠকুটোয় আগুন দিয়ে অলক্ষ্মী তাড়িয়ে, নেচে গেয়ে উৎসব শেষ হল। যারা এসেছিল তারা প্রায় সবাই ইথিওপিয়ার প্রবাসী ভারতীয়। সবাই প্রায় ব্যবসায়ী। গাড়ির ভিড় দেখে মনে হল বেশ পয়সাওয়ালা লোক। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু এদের খুব সুনজরে দেখে না।

একজন বললেন, সারা ইথিওপিয়ায় ছড়িয়ে আছে প্রায় হাজার তিরিশেক ভারতীয়। তাদের বেশির ভাগই ছোট ছোট দোকানদার কিংবা কারিগর শ্রেণীর মানুষ। কারো আছে দর্জির দোকান, কারো চুলছাঁটার সেলুন। কেউবা করে ছুতোরমিস্ত্রির কাজ। এরা সবাই থাকে শহরের গরিব পাড়ায়। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এরা একরকম মিশে গেছে।

ইথিওপিয়ায় যে ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি খাতির, তাঁরা হলেন ইস্কুলের মাস্টার। শুনেছি, কী শহরে কী গ্রামে স্থানীয় লোকজনেরা তাঁদের মাথায় করে রাখে।

আরেকজনের নাম আদিস আবাবার লোকের মুখে-মুখে শোনা যায়। তিনি একজন দক্ষিণ ভারতীয়। বিয়ে করেননি। একা মানুষ। এসেছিলেন কাগজের সংবাদদাতা হয়ে। তারপর স্থানীয় মাটির টানে বরাবরের মতো বাঁধা পড়ে গেছেন।

ইথিওপিয়ায় কেউই তাঁকে আর প্রবাসী বলে মনে করেন না। তিনি নিজেও এখন ইথিওপিয়ার লোক বলেই নিজেকে মনে করেন। এখন তিনি কাজ করেন ইথিওপিয়ার সরকারি তথ্য দপ্তরে।

ইথিওপিয়ার লোকে এমনিতেই খুব অতিথিবৎসল। গরমের কষ্ট নেই। বৃষ্টির দিনগুলো বাদ দিলে আকাশ সব সময় পরিষ্কার। বাজারে জিনিসপত্রের দাম আক্রা নয়। সব রকমের মশলাপাতি পাওয়া যায়। ট্যাক্সি-ভাড়া এখনও অবিশ্বাস্যরকমের কম। মিটার নেই। কিন্তু এখনও ওদের পঁচিশ পয়সায় (আমাদের এক টাকার সমান) ট্যাক্সিতে শহর এলাকার মধ্যে যে-কোনো জায়গায় যাওয়া যায়। কাজেই এ-জায়গা ভারতীয়দের খুব পছন্দ।

দেশটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এর আবহাওয়া। উঁচু জায়গাগুলোতে বারো মাসই ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব। যেসব জায়গা বেশ খানিকটা নিচুতে, সেখানে বছরে দশ মাস দিনমানে পাওয়া যায় রোদের আলো। বাতাসে জলীয় ভাব নেই।

ঠান্ডা-গরমের এই হিসেবটা অবশ্য গড়পড়তা। নইলে খুব নিচুতে এমন জায়গাও আছে যেখানে গরমের হলকায় গায়ে ফোশকা পড়িয়ে দেয়।

ইথিওপিয়ায় বৃষ্টির মরশুম দুটো। একবার ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল—থেকে থেকে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি। কিন্তু জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর—একটানা মুষলধারে বৃষ্টি।

ফলে, ওদেশে গাছপালার খুব বাড়বাড়ন্ত। মরুভূমির মতো জায়গাগুলোও একেবারে নিঃসবুজ নয়। পঞ্চাশ বছর আগেও ইথিওপিয়ার পাঁচ ভাগের দুভাগ ছিল বন। এখন তার দশগুণ কম। জমিদার আর ব্যবসাদাররা তো রাজারই আত্মীয় কুটুম। তারা বন কেটে চাষের জমি বাড়িয়েছে আর কাঠ বেচে লাখ লাখ টাকা করেছে। তার ফলে, অনাবৃষ্টি হয়ে বছর পাঁচেক আগে ইথিওপিয়ায় যে সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাতে শুধু একটা এলাকাতেই দু লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরে।

স্বার্থপর লোকেরা যেমন গাছ কেটেছে, তেমনি মাংস আর চামড়ার লোভে নির্বিচারে মেরেছে পশুপাখি।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এখনও ইথিওপিয়ার আছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে আছে সিংহ, চিতা, নেকড়ে, জলহস্তী, জিরাফ, জেব্রা, গন্ডার, হাতি, নীল বাঁদর বেবুন কৃষ্ণসার গজলা হরিণ, হায়েনা, শেয়াল, বনবেড়াল, বনশুয়োর, বুনো কুকুর, বুনো গাধা, প্যাঙ্গোলিন আর পিঁপড়েভুক্ রকমারি প্রাণী।

বনে জঙ্গলে আর জলা জায়গায় রঙচঙে কত যে পাখি আছে তার ইয়ত্তা নেই। বনহংস ছাড়াও আছে রকমারি বক, সারস, কাদাখোঁচা। সেইসঙ্গে পেলিকান, ঈগল আর বাজপাখি। ইথিওপিয়ায় মেলে আটশো তিরিশ জাতের পাখি। তার মধ্যে বিশ জাতের পাখি একেবারেই এদেশী।

পাহাড়ে পাহাড়ে আছে বড় বড় ঝরনা আর খরস্রোতা নদী।

রাজাদের আমলে শুধু বড়লোকদের থলি ভরবার জন্যেই দেশের সম্পদ কাজে লাগানো হয়েছে। ভারী শিল্প হয়নি। নদী বেঁধে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবস্থা হয়নি। বিদেশী মুদ্রা এসেছে প্রধানত কফি, চামড়া, তৈলবীজ, গরু ছাগল আর সব্জি বেচে।

সারা আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশি গরু-মোষ ইথিওপিয়ায়। সংখ্যায় আড়াই কোটি। ভেড়ার সংখ্যাও প্রায় তার কাছাকাছি। ঘোড়া, খচ্চর, গাধা মিলিয়ে মোট আছে ষাট লক্ষ। উট আছে দশ লক্ষ।
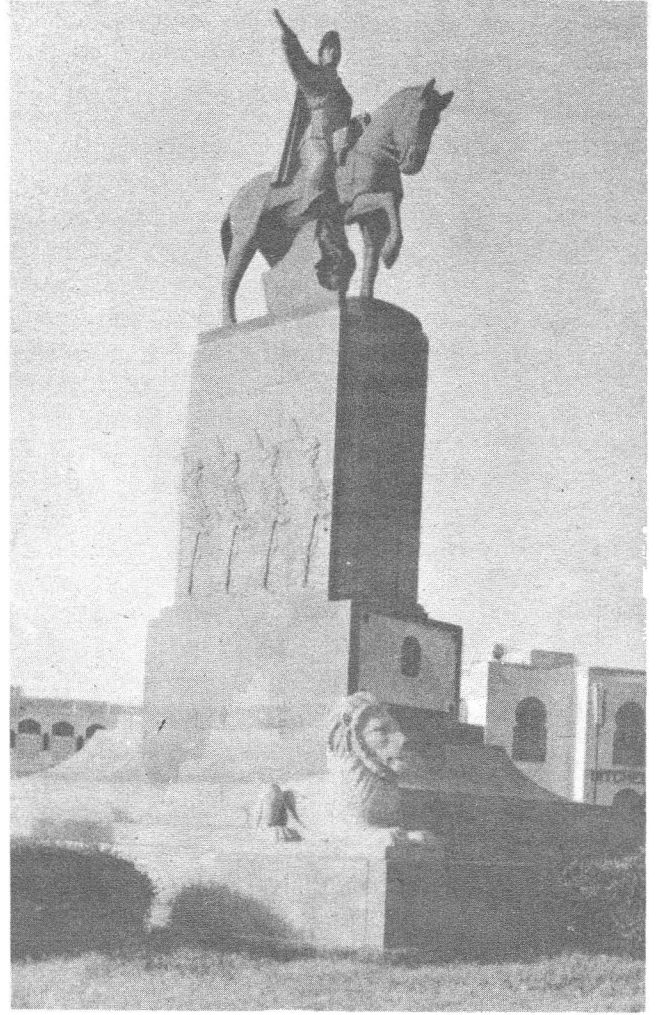
কৃষিপ্রধান দেশ ইথিওপিয়ার মানুষের একটি বড় জীবিকা হল পশুপালন।

শিল্পোৎপাদন বলতে তেমন বড় গোছের কিছু নয়। কাপড়-চোপড়, কাঁচের জিনিস, সিগারেট, ঠান্ডা পানীয়, সিমেন্ট, রাসায়নিক, চামড়া আর জুতো।

খনিজ সম্পদকে ভালভাবে কাজে লাগাবার এতদিন কোনো চেষ্টাই ছিল না। হাল আমলে প্ল্যাটিনাম, সোনা আর তামা ওঠানো হচ্ছে। মাটির নীচে তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা চুরাশিভাগ চাষের কাজে বাঁধা পড়ে আছে। এর একটা বড় অংশকে যন্ত্রশিল্পে কাজে লাগাতে না পারলে দেশের মানুষ কখনও সুদিনের মুখ দেখতে পাবে না। চাষ করতে হবে যন্ত্রের সাহায্যে আর আধুনিক কায়দায়। মাঠে তাহলে সোনা ফলবে। যে চাষ করবে জমিটা যেন তার হয়।

রাজার আমলে এসব কিছুই হয়নি।

ইথিওপিয়ার সরকারি ভাষা হল আমহারিক। এর যে নিজস্ব লিপি, তা বাঁদিক থেকে ডানদিকে লেখা হয়। মূল অক্ষর তেত্রিশটি, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ যুক্ত করে আলাদা আলাদা অক্ষর লেখা হয় বলে তার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দুশো একত্রিশটি। লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে এখন আবার অক্ষরের সংখ্যা কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

আমহারিক ছাড়াও এলাকায় এলাকায় আছে আঞ্চলিক

ভাষা। তার সংখ্যা সত্তরের কম নয়। তাছাড়াও আছে নানা রকমের উপভাষা। ক্রমশ সারা ইথিওপিয়ায় যোগাযোগের ভাষা হয়ে উঠছে আমহারিক।

যাদের বয়েস দশ বছরের ওপর, তাদের মধ্যে লিখতে পড়তে পারে পারে শতকরা মাত্র ১২ জন। শহরবাসীদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৬০ আর গ্রামে শতকরা ৯২।

আদিস আবাবায় যখনই ঘরের বাইরে বেরোতাম, লোকের দারিদ্র্য দেখে মন খারাপ হয়ে যেত। রাস্তাঘাটে ভিখিরির ছড়াছড়ি। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ে, না-খেতে পাওয়া শীর্ণ চেহারা। রক্তহীন ফ্যাকাসে। শতচ্ছিন্ন জামা-কাপড়। বস্তিগুলো যেন শুয়োরের খোঁয়াড়। কাদায় প্যাচ-প্যাচ করছে উঠোনগুলো। তিন হাজার বছর ধরে স্বাধীন থেকেও দেশের লোকের এমন হাঁড়ির হাল হল কেন? এই প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতন অনবরত বিঁধছিল।

কলকাতায় ধ্রুব গুপ্তর কাছে একজন বাঙালির নাম-ঠিকানা পেয়েছিলাম, যিনি আদিস আবাবায় থাকেন। যে ডায়রিতে লিখে রেখেছিলাম, সেটা নিয়ে যেতে মনে ছিল না। ফলে, অচিন্ত্য সাহার আর খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

শহরের ওপর হাইলে সেলাসির দ্বিতীয় যে প্রাসাদ, সেখানে এখন আদিস আবাবার বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পুরনো পুঁথি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আর হাতের কাজের সংগ্রহশালাটি দেখবার মতন। কাছেই তৈরি হচ্ছে ইথিওপিয়ার জাতীয় মিউজিয়াম।

দিল্লির দুজন অধ্যাপক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছরের জন্যে এসেছেন ইংরিজি পড়াতে। দুজনেই সিনহা। একজন রমেশ-কুমার, একজন অজয়কুমার। রমেশ পাঞ্জাবের লোক। চমৎকার বাংলা বলেন। আদিস আবাবায় যে ভারতীয় সমিতি আছে, রমেশ এবার তার সম্পাদক হয়েছেন।
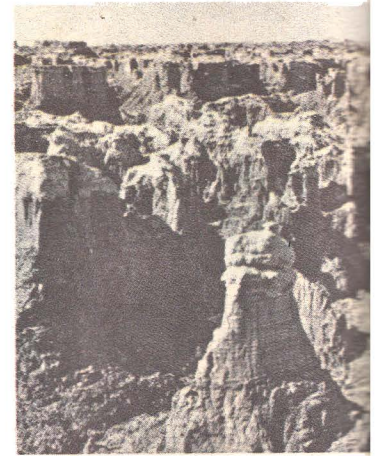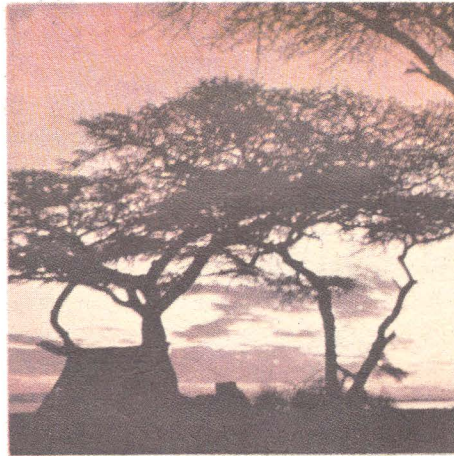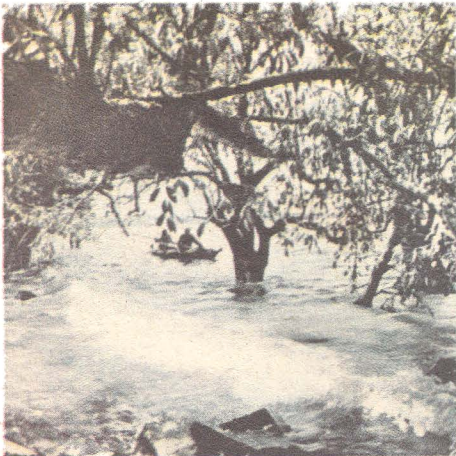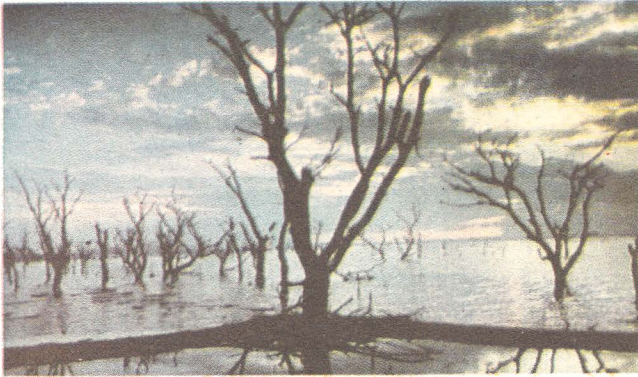
রমেশের বাড়িতেই আদিস আবাবায় প্রথম যে বাঙালি দম্পতির দেখা পেলাম, তাঁরা বাংলাদেশের। মনজুর রহমান ইউনিসেফের প্রতিনিধি হয়ে আদিস আবাবায় এসেছেন সম্প্রতি। তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা, ডাকনাম খুকু। ও'রা একদিন আমাদের নিয়ে গেলেন শহরের একমাত্র ভারতীয় রেস্তোরাঁ 'সঙ্গমে' খাওয়াতে। আমার সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহম্মদ ফয়েজ আর দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাসিত লেখক আলেক্স লা গুমা। বিদেশে বাঙালির দেখা পেলে বাংলায় কথা বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

খাওয়ার ব্যাপারটাও তাই। ভাতমাছ না হলেও চলে যদি মেলে ঝালমশলা দেওয়া ভারতীয় খাবার। এমন-কী, নিরামিষেও তেমন আপত্তি হয় না।

আমাদের এক ইথিওপিয়ান লেখক বন্ধু আসফাও তেফেরা একদিন সদলবলে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর শালির রেস্তোরাঁ 'লালিবেলা'য়। মাঝখানে একটা করে ঝাঁপি ঢাকা দেওয়া ডালা। ওপরে বাহারে রংচঙে কাপড়। চারদিকে গোল হয়ে বসবার মোড়া। ঝাঁপিটা তুলে ফেলতেই দেখা গেল, ডালার মধ্যে জওয়ারের তৈরি প্রকান্ড প্রকান্ড রুমালি রুটি। নাম তার ইনজেরা। তার সঙ্গে ঝালমশলায় গরগরে করে রাঁধা মুরগির মাংসের ঝোল। ওদের ভাষায় এই মাখো-মাখো ঝোলের নাম 'ওয়াত'। আর থাকে পোস্তর চাটনির মতো একটা জিনিস। তবে টক নয়।

আসফাও বেশ বড় একটা ছাপাখানার মালিক। তাঁর স্ত্রীর আছে শহরে স্টেশনারির দোকান। ছেলেরা ইস্কুল-কলেজে পড়লেও বাবার ছাপাখানায় অবসর সময়ে নিজে হাতে কাজ করে। ছাপাখানার পাশেই আসফাওয়ের নিজের বাড়ি। সামনের জমিতে বাড়ির প্রয়োজনে পোলট্রি আর ডেয়ারি। কিছুই পিতৃ-দত্ত নয়। গ্রামের বাড়ি থেকে শহরে এসে আসফাও তাঁর ভাগ্য ফিরিয়েছেন নিজের চেষ্টায়।

নিজের গাড়িতে করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আস্‌ফাও আমাকে শহর দেখালেন। শহর জুড়ে জাতির মহাপুরুষ, বীর আর শহীদদের মূর্তি। আফ্রিকা-ভবনের বিশাল বাড়ি। জাতীয় থিয়েটার। বিপ্লব-বার্ষিকীতে যেখানে প্যারেড হয়, শহরের কেন্দ্রস্থলের সেই 'বিপ্লবী চক'। বেড়াবারও আছে সুন্দর-সুন্দর জায়গা।

আদিস আবাবা থেকে চলে আসার দিন দুপুরে হোটেলের রিসেপশন থেকে হঠাৎ টেলিফোন। 'দুজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমার নাম অচিন্ত্য সাহা।' শুনে আমি অবাক। গত আট দিন ধরে ও'কে খুঁজেছি। শেষকালে দেখা পেলাম একেবারে চলে যাওয়ার মুখে। ও'র সঙ্গে এসেছিলেন অসীম রায়। আসলে
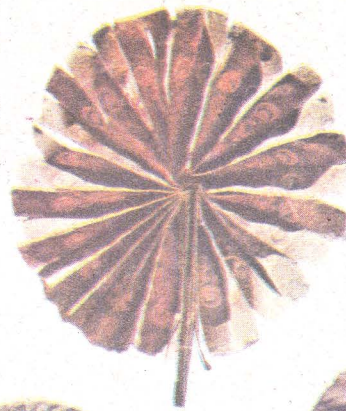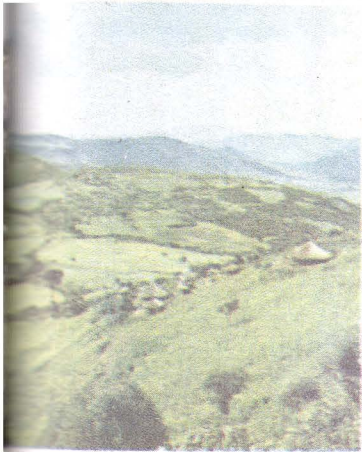
ঠিক সেইদিনই কাগজে আমার কথা বেরিয়েছিল। তারপর হোটেলে-হোটেলে সারা সকাল ফোন ক'রে করে শেষ পর্যন্ত ও'রা আমাকে খ'জে বার করেছেন।

অচিন্ত্যর দাদাকে আমি চিনি। তেরো বছর ধরে অচিন্ত্য আছে ইথিওপিয়ায়। নাম-করা ইস্কুলে পড়ায়। অসীমও স্কুল-মাস্টার বেশ কয়েক বছর ধরে ইথিওপিয়ায়। গোলমালের আগে পর্যন্ত অসীম ছিল ইরিট্রিয়ার আস্মারায়।

ইথিওপিয়ার প্রশংসায় দুজনেই দেখলাম পঞ্চমুখ। হাইলে সেলাসির রাজত্ব যাওয়া থেকে বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, সোমালি সৈন্যদের হটানো, ইরিট্রিয়ার গোলমাল— সবই তারা নিজের চোখে দেখেছে।

ওদের দেখাশোনা, আর আমার দেখাশোনা, দুটোকে মেলালে মোটের ওপর আজকের ইথিওপিয়ার যে ছবিটা ফুটে ওঠে, সংক্ষেপে তা এই :

ইথিওপিয়ার শতকরা নব্বই জন লোকের জীবিকা চাষবাস। তাদের শতকরা আশি জনেরই নিজের বলতে কোনো জমি ছিল না। পরের জমিতে চাষ করে যা ফসল ফলাত, তার বারো আনা পেত জমির মালিক। শুধু কি তাই? বাপে-ছেলেতে বেগার খাটতে হত—জমির মালিকের ঘর ছাওয়া, বেড়া লাগানো, গরু ছাগল আগলানো, নদী বা ইঁদারা থেকে জল বয়ে আনা, এমনি যাবতীয় কাজ তাদের বিনা পয়সায় করতে হত। মা-মেয়েকে করতে হত জমির মালিকের বাড়িতে বিনা পয়সায় ঝি-গিরি। আপত্তি করলে সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছেদ। সেই সঙ্গে তারা দেনায় ডুবে থাকত।

রাজার আত্মীয়-পরিজন, বড় বড় জমিদার-বংশ আর গির্জার পাদ্রিদের ওপরওয়ালা—এরাই ছিল ইথিওপিয়ার প্রায় সমস্ত জমিরই মালিক।

মজুরদের অবস্থাও ছিল খুব শোচনীয়। মজুরি ছিল নামমাত্র। ছুটি বলে কিছু ছিল না। অসুখে কামাই হলে রোজ কাটা যেত। মালিক যখন খুশি ছাঁটাই করতে পারত।

যারা ছিল রাজার সেপাই, তাদের অবস্থাও মেটেই ভাল ছিল না। বড়-বড় অফিসাররা তাদের দিয়ে চাকরবাকরের মতো বাড়ির কাজ করিয়ে নিত।

দেশী বড়লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদেশী সাহেবরা এখানে এসে ছোট-ছোট কলকারখানা আর খেত-খামারের পত্তন করেছিল। এত শস্তার মজুর তারা আর কোথায় পাবে? উপরন্তু রাজা তাদের কর রেহাই দিয়ে নিজেদের দেশে টাকা পাঠাবার অবাধ সুযোগ দিয়েছিলেন।

মানুষ যে সব সময় মুখ বুজে এই অন্যায় মেনে নিয়েছে তা নয় মাঝে মাঝে খেপে উঠে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু হয় তাদের দাবানো হয়েছে মেরে-ধরে, নয় তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে।

কী চাষী কী মজুর—কাজে কারো উৎসাহ ছিল না। ফলে রাজা আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের যত ঐশ্বর্যই থাক, ইথিওপিয়া দেশ হিসেবে ছিল চূড়ান্ত রকমের দরিদ্র। যারা হাতের কাজ করত, তাদের স্থান ছিল সমাজের নিচুতলায়। ছাত্র, শিক্ষক, লেখাপড়া-জানা মানুষ—সকলেই ছিল শাসক-শ্রেণীর ওপর চটা। মানুষের মতো বাঁচবার দাবিতে শ্রমিকেরা গড়ে তুলল তাদের ইউনিয়ন। গোড়ায় একদল মতলববাজ লোক ইউনিয়নগুলোকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। শ্রমিকেরা পরে তাদের হটিয়ে দেয়।

রাজার সেপাইরাও আস্তে-আস্তে খেপে উঠছিল। বাজার দর আগুন হয়ে ওঠায় মজুররা প্রতিবাদের ঝড় তুলল। শিক্ষক আর ছাত্ররা বেরিয়ে এল রাস্তায়। পেট্রোলের দাম আকাশ-ছোঁয়া হওয়ায় ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ধর্মঘট শুরু করে দিল। দীর্ঘ দিনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইথিওপিয়ার সমস্ত অংশের সাধারণ মানুষ সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়াল।

প্রধানমন্ত্রী পাল্টে, শাসনতন্ত্রের কলি ফিরিয়ে, ওপরসা কিছু-কিছু বদলের কথা বলে গোড়ায় লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা হল। ভেদনীতি খাটিয়ে জনশক্তিকে দুর্বল করবার চেষ্টা শেষ অবধি ধোপে টিকল না। সৈন্যবাহিনী, পুলিস আর দেহরক্ষী ফৌজ একটা সংযোগকারী কমিটি গড়ে তুলল। তদন্তে ফাঁস হয়ে গেল, স্বয়ং হাইলে সেলাসি শুধু বাস কোম্পানি আর ব্যাঙ্ক থেকেই কীভাবে কোটি-কোটি টাকা মেরেছেন। গোলমাল শুরু হওয়ার আট মাসের মধ্যেই হাইলে সেলাসিকে তাঁর সিংহাসন হারাতে হল।

ইথিওপিয়ায় এই বিপ্লব ঘটেছে বিনা রক্তপাতে।

কিন্তু ক্ষমতা হারাল যে দেশী বিদেশী শোষক-শ্রেণী তারা সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। কোথাও ধর্ম, কোথাও জাতীয়তাবাদ—এমনি নানা রকমের মুখোশ এঁটে একদলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে কখনও ভেতর থেকে কখনও বাইরে থেকে সমানে ওস্কাচ্ছে। তাদের এই নিষ্ঠুর চক্রান্তে কত নিরপরাধ লোক যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

অচিন্ত্য বলল এক বছর আগেও সকালে উঠে দেখা যেত কয়েক পা অন্তর চোরাগোপ্তা খুনের দৃশ্য। বিপ্লবী সরকার কড়া হাতে সাজা দেওয়ায় খুনীর দল এখন মাথা তুলতে ভয় পায়। যাদের ওরা ভুল বুঝিয়ে দলে টেনেছিল, নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা এখন বিপ্লবী সরকারের অনুগত।

ইরিট্রিয়ার লড়াইয়ের সময় অসীম ছিল আস্মারায়। সর্বস্ব ফেলে রেখে গোলাগুলির ভেতর দিয়ে সপরিবারে তাকে পালিয়ে আসতে হয়। স্থানীয় মানুষেরা তাদের কতভাবে যে সাহায্য করেছে তা বলার নয়।

ইথিওপিয়া আজ বিপ্লবের আঁচে টগবগ করে ফুটছে। যার চাষের জমি ছিল না জীবনে সে এই প্রথম পেয়েছে চাষের জমি। খেটে-খাওয়া মানুষেরই আজ দেশ জুড়ে সবচেয়ে বেশি খাতির। নতুন নতুন শিল্প তৈরি করে বেকারদের কাজ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। জমি, কারখানা, ব্যাঙ্ক সমস্তই এখন জাতীয় সম্পত্তি।

শহরের সব জমিই আগে ছিল রাজার, রাজ-পরিবারের আর দু-চারজন পয়সাওয়ালা লোকের। সরকারের কাছ থেকে জমি নিয়ে এখন যে-কেউ তার মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করতে পারে। নিজে না থেকে ভাড়া খাটাবার জন্যে কেউ বাড়ি রাখতে পারবে না।

আদিস আবাবায় 'কাবালে' বলতে বোঝায় পাড়া। প্রত্যেক কাবালে থেকে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে তৈরি হয়েছে পুরসভা। শহরবাসীর যাবতীয় সুখ-সুবিধে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, মেয়েদের কুটিরশিল্প শেখানো, আমোদ-প্রমোদ—শহরবাসীর শরীর মন স্বাস্থ্যের সব দিকেই কাবালের নজর।

একদিন আমরা শহরের একটা গরিবপাড়া দেখতে গিয়েছিলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে হাইলে সেলাসির এক বোনের বাগানবাড়ি ছিল। এখন সেখানে কাবালের কর্মকেন্দ্র। বাচ্চাদের ইস্কুল, মেয়েদের তাঁত আর পোলট্রি, বড় ছেলেদের ভলিবল আর পিং-পং, বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা, লাইব্রেরি আর রীডিং রুম। কারো বাড়ি তৈরির দরকার হলে, পাড়াপড়শিরা সবাই গতরে খেটে তাকে সাহায্য করে।

জামা-কাপড়ে এখনও দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু মুখগুলো হাসি-হাসি। এই প্রথম তারা মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচবার কথা ভাবতে পারছে। খাটতে এখন আর তারা নারাজ নয়।

অচিন্ত্য বলল, সারা ইথিওপিয়াতেই আজ জীবনের জোয়ার জেগেছে। দশ বছর পরে এলে ইথিওপিয়াকে চিনতেই পারবেন না।

আদিস আবাবা মানে নতুন ফুল। কিন্তু সে তো ছিল রাজা-রাজড়াদের কাছে।

সাধারণ মানুষের কাছে আজ সারা ইথিওপিয়াই সেই নতুন ফুল। এই ফুল ফুটিয়ে তুলেছে তাদের অসামান্য বিপ্লব। ছেড়ে চলে এসেও তার গন্ধ যেন আজও আমার নাকে লেগে আছে।

গুপ্তধনের সন্ধানে

বিপদ! বিপদ! 'জলপোকা' থেকে বলছি!'
'জলপোকা', গবেষণা-জাহাজ 'সোনার ভোঁদড়' বলছি। কী বিপদ?

'জলপোকা' বলছি ; ডুবুরির শরীরে খিল ধরেছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ, মৃতপ্রায়...
বলো, আমরা যাচ্ছি।

আমাদের ডাক্তার, যন্ত্রপাতি—সবই আছে। লোকটা কোথায় এখন?

'জলপোকা', সোনার ভোঁদড় বলছি... ভয় নেই, হেলিকপটার যাচ্ছে...

ঠিক কোথায় আছ তোমরা?
বুমেরাং দ্বীপ, উত্তরে...

রস, আর-একটা কথা বললেই গুলি...

ক্যাপ্টেন সাহায্য চাইছে ; ডুবুরির খিল ধরেছে, শ্বাস বন্ধ,....
তবে তো দেখতে হয় টিম্। আছে কোথায় তারা?

হঠাৎ কেটে গেল। বলছিল 'বুমেরাং দ্বীপ, উত্তরে...'
চলো ম্যাপ দেখি

কই, ও নামে তো কিছু....
নিজের কানে শুনলাম তো!

না, লিস্টে বুমেরাং দ্বীপ নেই।
আমার তো মনে হল মরণ-বাঁচন সমস্যা।

কিন্তু ম্যাপে ও নামে কিছু নেই যে, টিম।
খুদে দ্বীপগুলোর অনেক নাম থাকে।
'বুমেরাং দ্বীপ' ডাকনাম নয় তো?
পেয়েছি! একেবারে বুমেরাং-এরই মতো।
হেলিকপ্টার যেতে পারবে?
খুব, খুব! ডাঃ ক্রুসবিকে সব তৈরি করতে বলো।
হেলিকপটার আগে, জাহাজ পেছনে, অসুস্থ ডুবুরিকে বাঁচাতে চলেছে...
বুমেরাং দ্বীপ পর্যন্ত খোলা শান্ত সমুদ্র...
হঠাৎ খবর পাঠানো বন্ধ করল কেন ওরা?
ঐ তো বুমেরাং দ্বীপ .
ধারে-কাছে কিছুই তো নেই!
বলছিল 'বুমেরাং দ্বীপ, উত্তরে'...
চলো, দক্ষিণে খুঁজে দেখি —এ তো শুনসান দরিয়া— 'জলপোকা' কই?
আরে, ওটা কী হে টিম?
নিশ্চয়ই 'জলপোকা' ডুবে গেছে— এরা ভাসছে...
মেকন বাঁচে কি না দেখুন—
কোনো চিন্তা নেই
আর কেউ ভাসছে কি?
না, ডাক্তার কই?

জাহাজে নামছি এবার!
দুজন বেঁচেছে, তবে একজন শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না...
ওকে আনছি ডাঃ ক্রসবি।
দুজনকেই আনো; সব জেনে নিতে হবে...
ডুবুরিরা ওখানে কী করছিল? ডুবুরি নৌকো জলপোকা'রই বা কী হল? ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে একটু।
একজন ডুবুরিকে ডাক্তার রিকম্প্রেশন চেম্বারে ঢুকিয়েছে, আরেকজনকে টিম জেরা করছে—
রস, 'জলপোকা' ডুবল কী করে?
ডুবেছে কে বলেছে?
কিন্তু খবর তো ওটা থেকেই পাঠাচ্ছিলে!
হ্যাঁ তো!
আরে বুঝছ না—মেকন আর আমি ছিলাম বন্দী, নিজেদেরই বোটে।
?
তোমাদের বন্দী করলে কে? নৌকোয় তো আর কেউ ছিল না!
আমি বলছি 'জলপোকা'র কথা—
আমাদেরই বোট সেটা, ভাড়া দিয়েছিলাম গেরসল আর স্নেলকে।
ডুবোতে গিয়ে মেকনের খিল ধরল। আমি বিপদ-সংকেত পাঠাচ্ছিলাম গেরসল ধরে ফেলল—
ভাবল বহু জাহাজ খবরটা শুনেছে, তাইতে ঘাবড়ে গেল—
একটা লোক মারা যাচ্ছে, আর খবরটাও দিতে দেবে না?
না তো! উদ্ধার করতে এসে কেউ যদি দেখে ফেলে ও কোথায় ডুবুরি নামাচ্ছে!
তাই ও পালাল, তার আগে আমাদের ঐ ডিঙিতে নামিয়ে দিল।
ভেবেছিল কেউ ছুটে এলে ওর জাহাজই আগে দেখবে—
তখন ও বলবে ও-ই অসুস্থ ডুবুরি, এখন সেরে উঠেছে।

আমাদের বাঁচাতে চায়নি ও। চেয়েছিল ওর ডুবুরি নামানোর জায়গাটা গোপন থাক—

পরে লোকজন দিয়ে আবার ফিরে আসবে, ডুবুরি নামাবে।

তোমরা ডুবে খুঁজছিলেটা কী? গলদা চিংড়ি?
ঐ প্রবালদুর্গে চিংড়ি! পাগল!

প্রবালদুর্গ!
জন্মে এমন প্রবাল-পাহাড় দেখোনি।

গলদাচিংড়ি নয় তো! খুঁজছিলে কী?
সে এক ইতিহাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে...

জাপান বোমার ভয়ে একদল বড়লোক পালাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়,

বাক্স-বাক্স রুপোর 'পেসো'তে ট্রলার বোঝাই করে...

কিন্তু মাঝপথে একটা জাপানি গান বোট গোলা ছুঁড়ল, ট্রলার ডুবতে বসল...
এই প্রবাল দুর্গের কাছে, তাই না?

জাপানিরা ভেবেছিল এটা মাছ ধরার ট্রলার, তাই গুলি ছুঁড়েই চলে যায়!

ধনীরা তখন রুপোর টাকার বাক্সগুলো লাইফবোটে নামাল।

সমস্ত ধন ঐ প্রবাল-পাহাড়ে জলের তলায় লুকিয়ে রাখল!

এটা গালগল্প নয় তো হে?
পাগল! দ্যাখো ডুবে কী পেয়েছি! অনেক।

গেরসলকে এগুলো দেখানোই কাল হল। তখন মেকনের খিল ধরেছে...

ও বুঝল, আমাদের দিয়ে আর কাজ হবে না ওর।

তাই আমাদের অকূলে ফেলে পালাল। আবার আসবে নতুন ডুবুরি নিয়ে।

ওদের আগে যদি আমরাই পৌঁছে যাই?
জীবনে তার বেশি আর কিছু চাই না টিম।

রস, ডুবোবার এমন স্কুবা আছে আমাদের...
শুধু এইটে দ্যাখো, গেরসলদের আশায় যেন ছাই পড়ে।
যে জন্মে তা চোখে দ্যাখোনি। এখন সমস্যা হল ক্যাপ্টেন—
'পেসো' কটা দেখে গল্পটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।
হ্যাঁ, হতেও পারে সত্যি।

দেখি উনি রাজি হন কি না

ক্যাপ্টেন, হঠাৎ বেশ কিছু টাকাকড়ি পেলে আপনার খারাপ লাগবে কি?
ঠাট্টা করছ টিম? টাকার অভাবে কত প্ল্যান আটকে আছে জানো?

খোলা সাগরে প্রবাল পাহাড়। তার গুপ্তধন যে পাবে, হক তারই।

কিন্তু এরকম গুজব শুনে যাওয়া কি ঠিক হবে?
দেখি না একবার ক্যাপ্টেন।

আচ্ছা, রসকে ডাকো, দু-একটা খবর নিই আরো।

ক্যাপ্টেন, ওরা বোধহয় ডুবো পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাক্স লুকোবার সময় পায়নি।

ওদের সঙ্গে ডুবুরি ছিল না হয়তো।

লক্ষ করেছি, ডুবো প্রবাল-পাহাড়ে অনেক বড়-বড় কুয়োর মতো রয়েছে।
ওই কুয়োর মধ্যে বাক্সগুলো ফেলে দিয়েছিল বলছ?

ঠিক। ভেবেছিল যুদ্ধের পর ডুবুরি নিয়ে এসে তুলে নেবে।
আর আসেনি।

কী করে বাক্সগুলো প্রবালদুর্গে লুকোনো হয়েছিল সে সম্বন্ধে রস তার ধারণা খুলে বলছে...
কিন্তু রস, কেউ ফিরে এল না কেন ওগুলো নিতে?
কে জানে? যুদ্ধের মধ্যে কিছু ঘটেছিল হয়তো।

টিকে গেল শুধু পেসোর বাক্স আর গল্পটা।

ঠিক আছে। দিন দুয়েক আমরা প্রবাল-পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে যাব। তোমরা তৈরি হও।

রস, কোনো নিশানা নেই—পথ চিনে জায়গাটায় যেতে পারবে তো?
না পারার কী আছে—জলের তলায় মস্ত পাহাড় এলাকা।
কিন্তু ঠিক যে-জায়গাটায় পেসো পেয়েছিলাম সেটা খুঁজে—
ক্যাপ্টেন বলছে সময় কিন্তু তিনটি দিন—তারই মধ্যে যা হোক করতে হবে।
বাব্বাবা! আবার সময় বেঁধে কাজ! এই করেই তো মেকনের খিল ধরল!
ডুবোবার জায়গাটাতে নোঙর করা মুশকিল হবে টিম।
জাহাজ থেকে বেশি দূরে যেয়ো না তোমরা।
দেখা যাক কী হয়। কাল ডুব শুরু হবে, মনে রেখো।
হেলিকপ্টার বলছে, জলের তলায় পাহাড়ের উপত্যকাও আছে। হেলিকপটার থেকে আগে একটু নজর করি।
স্কুবা, লঞ্চ, ডুবুরি—সব রেডি।
রস আর আমি আগে ডুবোচ্ছি স্পাড। একটু লক্ষ রেখো।
নিশ্চয়ই, তবে ডুব আর গুপ্তধন— দুয়েরই ভাগ দিয়ো।
টিম, এই একটা নীল কুয়ো।
আর চেনা কিছু চোখে পড়ছে রস?
না, দাঁড়াও, একটু ছকে দেখি মনে-মনে...
হ্যাঁ, ঐখানটায় পেসোগুলো পেয়েছিলাম—বাক্সগুলো ওখানেই কোথাও আছে।

খেলা জমেছে। এ সেই জায়গা না হয়ে যায় না।

এবার ঐ নীল কুয়োগুলোয় ঢুকে দেখতে হবে।

বাক্সগুলো তারই একটায় ফেলে গিয়েছিল ওরা।

বালু হাতড়ে টিমও রুপোর পেসো পেয়েছে
বোধহয় একটা বাক্স ফেলতে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিল।

মুশকিল হল নীল কুয়ো অনেকগুলো, আর বাক্সগুলো আছে শুধু একটায়। সেটা কোনটা?

বরাদ্দ তিন দিনে সেটা বার করা যাবে তো?

ট্রলারটা ঝড়ে ডুবলে বাক্স ফেলার সময় থাকত না তত।

গোলায় ডুবছিল, তাই তাড়াহুড়ো করতে হয়নি।

সেদিনও নিশ্চয়ই শান্ত ছিল সমুদ্র। এমন জায়গায় ফেলেছে যেটা সহজেই আবার খুঁজে পাওয়া যায়।

আমি হলে এমন একটা কুয়ো খুঁজব ধরো ১০০ ফুট গভীর, আর তলাটা একটু বেঁকে গেছে...
ফোটো তুলেছি, চলো তাতে কী আসে দেখি।

ফোটো দিব্যি এসেছে। আগে এ দুটো কুয়োতে ডুবিয়ে দেখব।

তলায় অন্ধকার হবে।
আলো নেব 'খন —চলো চলো!

এবার একটু বেশি সময় ডুব দেব —ঘড়ি দেখো

আস্তে স্পাড, কাছাকাছি পৌঁছে গেছি,
কী হে টিম, জলের তলায় উঁকি দিলেই কাজ চলবে?
টিম আমরা প্রথমে ডুব-সাঁতরে প্রবালদুর্গের 'দরজায়' যাব। স্পাড লঞ্চ নিয়ে...
তোমাদের পেছন পেছন যাব তো!
শান্ত সমুদ্র, জলও ঠান্ডা নয়। ডুবুরিদের স্বর্গ!
দারুণ তো!
দুর্গের 'দরজা' পেয়ে গেছি
উঠে পড়ো!
এলাকাটা ঠিক ধরে ফেলেছি। চলো এবার পেসোর জায়গাটায় যাই।
চেনা এলাকা দিয়ে রস টিমকে পথ দেখিয়ে চলল...
হঠাৎ রস হাত দিয়ে বালু খোঁড়ে...
উত্তেজিত টিমও পেসো খোঁজে

এ কুয়োটা তো ৫০ ফুটের বেশি হবে না। তবে এর তলাটা বেঁকে গুহার মতো হয়েছে।
গুহার ভেতরে বেশি এগিয়ো না। থাকলে বাক্সগুলো গুহার মুখের কাছেই থাকবে।
রস ভেতরে যেতে বলছে!
গর্তের বাঁকটা তত খাড়াই নয়, বাক্স পড়ে মুখের কাছেই থাকবে—
বাপ রে, রস ওর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কোথায়?
পাথুরে মাটি, বালু নেই।
বাক্স থাকলে চোখে পড়ত। রস, পালিয়ে চলো দাদা!
লাখ কথার এক কথা বলেছ!
৫০০ পাউন্ড হবে—দুজনকেই আস্ত গিলত!
কিন্তু পাহারাদার থাক আর না থাক, বাক্সগুলো কোথায় গেল?
এ গর্তে কিস্যু নেই।
আরেকটায় চলো। এবার স্পাড নামুক একটু।

এটাও আগেরটার মতোই স্পাড—কুয়োর তলাটা বেঁকে গেছে।
তবে এটার তলায় ঘন বালুর স্তূপ
বাক্সের কোনা! এই সেই স্থান,
খোঁড়ো!
আরো দুটো!
ওঠো!
মহাখুশি টিম আর স্পাড তিনটে বাক্স খুঁজে পেল।
রস, মার দিয়া কেল্লা! তিন-তিনটে!
আরো আছে, বালু খুঁড়ে যাও!
তোমার কথাই ফলল রস,—গর্ত বেঁকে গুহা, তার মুখেই বাক্স।
আরো থাকার কথা—এবার আমি দেখছি।
বালু গভীর বেশ, লোহার শিক দিয়ে খুঁজবে।
কিন্তু বাক্সের কাঠ পচে যায়নি তো? ভাঙলে টাকা উদ্ধার করতে বছরখানেক লাগবে।

টিম শিক দিয়ে খোঁজে, রস বাক্সের অবস্থা দেখে।
ইশ! পচে একেবারে ঝরঝরে—
তুলতে গেলেই ভেঙে সব পেসো ছড়িয়ে পড়বে।
রস, আমি আরো চারটে বাক্স পেয়েছি।
কিন্তু এদিকে তো ঝামেলা হল টিম।
তোলার সময় বাক্স ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে—
ভেবেছিলাম একটা পেসোও জলে পড়তে দেব না।
একটা পথ আছে নিশ্চয়ই।
ক্যাপ্টেনকে বলি—
বাক্স পচা ক্যাপ্টেন, তুলতে গেলেই চুরমার হয়ে...
আমার একটা বন্ধু এসেছে...
জাহাজের কপিকল থেকে শক্ত জাল ঝুলিয়ে...
জাহাজটা কুয়োর ওপরে নিয়ে গিয়ে
মাথা খারাপ, ওখানে যেতে জাহাজ ঠেকে যাবে।
তাহলে? আচ্ছা হেলিকপটার থেকে যদি জাল নামাই?
সেটা দেখতে পারো
হেলিকপটার সে-ভর সইবে।
ঠিক আছে টিম, তোমার দু নম্বর বন্ধুটা আমার পছন্দ।
ট্যাঙ্কে তেল ভরেই উড়ছি আমরা—

লঞ্চ নিয়ে আবার নীল কুয়োর ধারে টিম, স্পাড আর রস নোঙর ফেলল।

একটু পরেই কাঁপকল থেকে ঝোলানো জাল ধরে ডুব দিল তারা

অতি যত্নে প্রথম বাক্সটাকে বসাল।

একটা বাক্স বাঁধা হল। টিম ইশারা করে—

উঠুক, উঠুক। ব্যস!

ঐশ্বর্য নিয়ে হেলিকপটার উড়ে চলল জাহাজে—

কী কান্ড! সোনার বাঁট ভর্তি! বাক্স ভাঙবে তাতে আশ্চর্য কী!

ঐ শেষ বাক্স নিয়ে আসছে।

ঐশ্বর্যের পাহাড় যে হে!
এবার যত খুশি প্ল্যান করুন ক্যাপ্টেন।

রস, দারুণ। তোমার চৌদ্দপুরুষ ফেলে-ছড়িয়ে খাবে তোমার ভাগ।

আর মেকন চিকিৎসায় সেরে উঠছে।

আরো সুখবর, আমার তার পেয়ে গেরসল আর স্নেলকে বন্দরের পুলিস গ্রেফতার করেছে।

তাহলে ডুবুরি নৌকো 'জলপোকা' উদ্ধার হল
তোমাকে একদিন মস্ত একটা গলদা চিংড়ি খাওয়াতে হবে টিম!

সাধের গাড়োয়াল

বুদ্ধদেব গুহ

সাধের গাড়োয়াল।

তবে শুরু থেকেই বলি।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের কথা। কলকাতার আশেপাশে তখন অনেক জলা জমি, বাদা, আবাদ ও জঙ্গল ছিল। কলকাতা তখন এমন বহুধা-বিস্তৃত মানুষ-কলবিল-করা হতকুৎসিত জায়গা মোটেই ছিল না।

সাইকেলে চড়ে বেহালা, টালিগঞ্জ বা গ্যালিফ স্ট্রীট ট্রাম ডিপো থেকে একটু গেলেই বাঁশঝাড়, ডোবা, পুকুর, পাখি দেখতে পাওয়া যেত। অনেক সুন্দর ছিল তখন কলকাতা। এত মানুষও ছিল না, এমন অশান্তিও ছিল না।

ডাঃ বিধান রায় যখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন সোনারপুরের বিরাট জলা অঞ্চলকে শুকিয়ে ফেলা হয়। তার আগে ঐ আদিগন্ত জলাতে পাখি শিকারের বড় সুবিধে ছিল। কতরকম হাঁস যে উড়ে আসত ওখানে শীতকালে দেশ-বিদেশ থেকে তা বলার নয়। গাডওয়াল, পিন্-টেইল, পোচার্ড, অনেক রকমের টীল, নাকটা, রাজহাঁস, আরও কত কী জলের পাখি।

স্কুলে পড়ি। শীতকালে প্রতি রবিবারে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম বন্দুক আর গুলির থলে, জলের বোতল, সামান্য কিছু কমলালেবু, কাজুবাদাম ইত্যাদি নিয়ে। এখন ক্যানিংয়ের রাস্তায় যেখানে মালঞ্চ ফাঁড়ি আছে পুলিসের, তার উলটো দিকে একটা কাঁচা পথ ছিল একেবারে জলার মুখ অবধি। এক চেনা ভদ্রলোকের বাড়ির পাশে বাবা গাড়িটা রাখতেন। সেই বাড়ির বাইরের ঘরে একজন ভদ্রলোক টেবিল চেয়ারে বসে ফুলসক্যাপ কাগজে পাতার পর পাতা অঙ্ক কষতেন। প্রত্যেক রবিবারেই ওঁকে দেখতাম আর ভদ্রলোকের উপর ভক্তি বেড়ে যেত। পরে বাবার কাছে শুনেছিলাম যে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পরীক্ষায় বসতে হলে নাকি ঐরকম রিম্ রিম্ পাতায়, মাথা-ঝিমঝিম অঙ্ক কষতে হয় সামনে টাইমপিস রেখে। ঘড়ির কাঁটার উপরে এক চোখ সেঁটে।

যাই হোক, বাবার এক বন্ধু, মনোরঞ্জন- কাকু শনিবার বিকেলে ফোন করে বাবাকে বললেন, "দাদা, খবর পেলাম যে গাড়োয়াল পড়েছে। আপনার সোনারপুরে। সাধের গাড়োয়াল। আমি কোনোদিনও সোনারপুরে যাইনি। আমাকে নিয়ে চলুন, শিকার করে আসি।"

বাবা বললেন, "সকালে ফেনাভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়া যাবে। তুমিও চলে এসো আমাদের এখানেই। একসঙ্গে বেরোব।"

আমার মাসতুতো ভাই গজেন বেড়াতে এসেছিল শনিবারে পাইকপাড়া থেকে। গাড়োয়াল শিকারের কথা শুনে ও বলল,

আমিও যাব। আমি বাবাকে ওর হয়ে ভয়ে ভয়ে রিকোয়েস্ট করলাম। বাবা রাজি হয়ে গেলেন।

সেই রবিবার সকাল থেকে মায়ের প্রচুর টেনশান্। সকাল সকাল ফেনাভাত ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, ডালসেদ্ধ সবকিছু বন্দোবস্ত করা। তার উপর বর্মনকাকুও খেয়ে যাবেন।

সকালে আমরা যখন খাওয়ার টেবিলে ফেনাভাত খাচ্ছি, মা বললেন বর্মনকাকুকে, "কী যে আপনারা নিরপরাধ পাখিগুলোকে মারেন।"

বর্মনকাকু রাইট-ইনে ফুটবল খেলতেন। চট করে রাইট-আউটে বাবাকে বলটা পাস করে দিয়ে বললেন, "দাদার যত হুজুগ। আমি ও বৌদি এসব পছন্দ করি না।"

বাবার মুখে ডিমসেদ্ধ থাকায় বাবা প্রতিবাদও করতে পারলেন না।

গজেন বলল, "তুমি এসব বুঝবে না মাসি। শিকার, সে পাখি শিকারই হোক আর বাঘ শিকারই হোক, কী যে উত্তেজনা তোমাকে কী বলব।"

মা বললেন, "তুই চুপ কর তো! তুই বন্দুক ছুঁড়েছিস কখনও। দাঁড়া, তোর মাকে ফোন করছি।"

গজেন পাইকপাড়ার ছেলে। সহজে দমবার পাত্র নয়।

সে বলল, "আমি কখনও ছুঁড়িনি কিন্তু আজই প্রথম ছুঁড়ব।"

মা বললেন, "কখনও ছুঁড়িসনি তো যাওয়ার দরকার কী। জলে পড়ে-টড়ে গেলে কী হবে?"

গজেন বলল, "হেদোতে সাঁতার কাটি না আমি? ঠিক পাড়ে আসব। তাছাড়া আমি তো চামচা—শিকারি তো ঐ বসে।" বলেই, আমাকে দেখাল।

গজেনটা একেবারে বকে গেছে। মা-বাবা বর্মনকাকুর সামনেই এমন করে কথা বলছে! কোনো মান্যিগন্যিই নেই।

বাবা একবার মায়ের দিকে তাকালেন; মা বাবার দিকে। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম—পাছে গজেনের বকামির অপরাধে আমার শাস্তি হয়।

এমন সময় ফোনটা বাজল।

মা ফোন ধরে কথা বলতে লাগলেন মাসির সঙ্গে। তারপর "আচ্ছা" বলে রেখে দিলেন। ফোন ছাড়ার আগে বললেন, "না, না, তোমার কোনো ভয় নেই দিদি। তোমার ভগ্নীপতি সঙ্গে থাকবেন। আবারও বললেন, না, না নৌকোয় তো যাবেই না।"

তারপর ফোন রেখেই বাবাকে বললেন, "দিদি বিশেষ করে মানা করেছেন গজেনকে যেন নৌকোয় না নেওয়া হয়।"

বাবা বললেন, "তাহলে গজেন গিয়ে কী করবে?"

গজেন বলল, "মেসোমশায়, নৌকোয় যেতে যদি মা মানা করে থাকেন তাহলে ড্যাঙা থেকেই শিকার দেখব। ড্যাঙায় বসে ফড়িং দেখব, পাখি-ওড়া দেখব—তোমার বাইনাকুলারটা আমাকে দিয়ে যাবে।"

বাবা বললেন, "তা মন্দ বলিসনি। তারপর মাকে বললেন, শুনছ, ও সারাদিন ডাঙায় থাকবে, ওর জন্যে বেশি করে খাবার-টাবার দিয়ে দাও।"

মা বললেন, "বুঝেছি। দোষ হল আমার বোনপোর আর খাবে সকলে। অনেক খাবারই দিয়েছি। ডালমুট, সন্দেশ, স্যান্ডউইচ, পাটিসাপটা আর কাজুবাদাম। কমলালেবুও আছে। ফ্লাস্কে তোমাদের জন্যে চা আর ওদের জন্যে দুধ।"

বাবা বললেন, "ও মা! কাল যে ফ্লুরি থেকে অত কেক আনলাম।"

মা বললেন, "তাও দিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে।"

বর্মনকাকু ঠাকুরকে ডেকে গাড়োয়ালের রোস্টটা কেমন করে করবে তার ডিরেকশান দিচ্ছিলেন। বাবা কটা গাড়োয়াল পাওয়া যাবে শিকারে তার এস্টিমেট আগেই করে ফেলেছিলেন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁদের গাড়োয়ালের রোস্ট খেতে নেমন্তন্ন করবেন তাঁদেরও ফোনে বলে দিচ্ছিলেন। প্রত্যেককে বলছিলেন আসিস কিন্তু নিশ্চয়ই।

মা বললেন, "অতজনকে খেতে বলবে যখন তখন ঠাকুর কেন, আমি নিজেই করব এখন রোস্ট। তোমরা কটা নাগাদ ফিরবে বলো?"

বর্মনকাকু বললেন, "দেরি কিসের। মেরেছি আর ফিরেছি।"

বাবা বললেন, "না না। এখানে ফিরতে ফিরতে ধরো সন্ধে সাতটা হয়ে যাবে।"

মা বললেন, "অত অল্প সময়ের মধ্যে কাটাকুটি, ছাল ছাড়ানো, তোমার বন্ধুদের কাল বলো না?"

বর্মনকাকু বললেন, "কিছু ভয় পাবেন না বৌদি। মশলাটশলা রেডি রাখুন, আমি নিজে তৈরি করে দেব—কাটাকুটির জন্যে ভাববেন না একটুও। খাওয়া-দাওয়া কি সোমবারে ভাল জমে? আজই ভাল। আমার দাদার তো জানেনই, উঠল বাই তো কটক যাই।"

॥ ২ ॥

আমরা যখন সোনারপুরে গিয়ে পৌঁছলাম তখন যথারীতি সি-এ পরীক্ষার ছাত্র ভদ্রলোক মুখ গুঁজে অঙ্ক কষছিলেন। হঠাৎ আমার খেয়াল হল ওঁকে অনেক বছর ধরে ঐরকম দেখছি প্রতি শীতে।

বর্মনকাকুকে জিজ্ঞেস করতে বাবা বললেন, "এ পরীক্ষা দিয়ে যাওয়াটাই ছাত্রদের কর্তব্য।" পাস করা ফেল করা নাকি তাদের নিজেদের ইচ্ছাধীন বা হাতের নয়।

গাড়ি পার্ক করিয়ে রাইফেল বন্দুক কাঁধে হেঁটে এলাম আমরা জলের ধার অবধি। গজেন উত্তেজিত। আমার কাঁধে ঝোলানো পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটার বাটে কেবলই হাত ছোঁয়াচ্ছে আর বলে, "আমাকে ছুঁড়তে দিবি বলেছিস, দিবি তো? না দিলে কিন্তু পাইকপাড়ায় ঢুকতে পারবি না।"

আমি যতই ইশারা করে ওকে চুপ করে থাকতে বলি ততই ও গ্রাহ্য করে না।

জলের ধারে এসে দেখা গেল মাত্র একটা তালের ডোঙা জলের কিনারায় বাঁধা আছে। তালের ডোঙা কাকে বলে তোমরা অনেকে হয়তো জানো না। তালগাছের শরীর কুরে নিয়ে তার আধখানা খোল দিয়ে ক্যানোর মতো নৌকো। এই নৌকোগুলো ছোট ছোট হয় এবং এতে চড়তে আর সার্কাসে ছাতা হাতে তারের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে প্রায় একই রকম ব্যালান্স্ লাগে। একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ।

বাবা ও বর্মনকাকু দুজনে মিলে এক কুইন্টল নব্বই কেজি। আমার ওজন চল্লিশ কেজি। গজেন যাবে না। কিন্তু নৌকো যে বাইবে তারও ওজন আছে। সবসুদ্ধ চারজন।

তালের ডোঙাতে মাত্র একজন শিকারি ওঠেন আর যে চালায়, সে। কিন্তু একটার বেশি ডোঙা নেই। যে চালাবে সেও নেই।

এমন সময় বর্মনকাকু দূরবিন থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, "দাদা দেখুন! গাড়োয়াল!"

দূরে আমি দেখলাম এক ঝাঁক হাঁস পূব থেকে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে জলার উপর দিয়ে। যে-কোনো পাখির মেলে-দেওয়া ডানা ও উড্ডীন ঝাঁকের ফরমেশান এবং ওড়ার ছন্দ থেকে সহজেই বোঝা যায় কী পাখি, বহু দূর থেকেই।

বাবা খুশি হয়ে বললেন, গাড়োয়ালের ঝাঁকটা দূরবিনে দেখার পর, "বর্মন, এই প্রথম তুমি আমাকে লেট-ডাউন করোনি!"

বর্মনকাকু হাসছিলেন। হঠাৎ বললেন, "আমার বড় ভয় করছে।"

"কেন? কিসের ভয়?" বাবা শুধোলেন।

"না। যা হাই-ভোল্টেজ রেজিস্টেন্স।"

"কী ব্যাপার?" বাবা অবাক হয়ে শুধোলেন আবার।

বর্মনকাকু বললেন, "বৌদি বাড়িতে।"

বলেই, দুজনে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

এমন সময় ঘাটের কাছেই একটা পানকৌড়ি উড়ে এসে বসল একটা বাঁশের খোঁটার উপর। গজেন তখন একটা কাটা তালগাছের গুঁড়িতে বসে ছিল পায়ের উপর পা তুলে বিজ্ঞর মতো। যেন জ্যাঠামশাই।

পানকৌড়িটাকে বসতে দেখেই ও আমার দিকে তাকাল। তাকানোটা বাবার চোখে পড়ল। বাবা বললেন, "কী রে, গুলি ছুঁড়বি?"

গজেন নালিশের গলায় বলল, "দেখ না মেসো, কখন থেকে বলছি।"

বাবা বললেন, "মার দেখি পানকৌড়িটাকে।"

আমি বললাম, "শব্দে জলার ভিতরের হাঁস উড়বে না?"

বর্মনকাকু বললেন, "আজ রবিবার কত শিকারি নেমে গেছে। দুমদাম শব্দ হচ্ছেই। তাছাড়া এত দূরের শব্দে কিছুই হবে না।"

আমি পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা গজেনকে এগিয়ে দিচ্ছিলাম।

বাবা বললেন, "না, না, বন্দুকই ছুঁড়তে দে ওকে। টুয়েল্ভ বোর।"

আমি বললাম, "ধাক্কা?"

গজেন বলল, "ইয়ার্কি মারিসনি। তুই ছুঁড়তে পারিস আর আমি পারি না? আমি হেদোয় ব্যায়ামও করি।"

বাঁ ব্যারেলে একটা চার নম্বর ছররা পুরে বাবার বত্রিশ-ইঞ্চি ব্যারেলের গ্রীনার বন্দুকটা গজেনের হাতে তুলে দিলাম।

ওকে ডিরেকশান দেবার আগেই ঐ পায়ের উপর পা-তুলে বসে থাকা অবস্থাতেই আসীন থেকে, আমরা কেউ কিছু বোঝার আগেই গজেনবাবু বন্দুকটা তুলেই দুম করে মেরে দিল।

একটুর জন্যে আমার কান মিস করে ঝর ঝর করে ছররাগুলো গিয়ে দূরে জলে পড়ল। পানকৌড়িটা ভীষণ ভয় পেয়ে খোঁটা হড়কে জলে ডিগবাজি খেয়ে পড়তে পড়তে মনে মনে গজেন ঘোষের শ্রাদ্ধ করতে করতে উড়ে চলে গেল। শব্দে ভয় পেয়ে একদল জলপিপি আর ডুবডুবা জল ছড়া দিয়ে এদিকে ওদিকে চলে গেল। দূরের হুইসলিং টিলের ঝাঁক শিস দিতে দিতে গুলির শব্দে কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করে আবার স্থির হয়ে বসল।

এসব ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এবং পরমুহূর্তেই গজেন প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল, "মরে গেলাম, রুদ্র একেবারে মরে গেলাম...ও বাঁবাঁ গো—মাঁ রে..."

আমি পানকৌড়ি ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি বন্দুকটার নল মাটিতে, হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে যাবে এক্ষুনি।

বাবা ও বর্মনকাকুও দৌড়ে গেলেন ওর দিকে। বললেন, "কী হল, হল কী?"

গজেন বলল, "ন্যাজ খসে গেছে, ন্যাজ খসে গেছে...।"

বর্মনকাকু হতভম্ব হয়ে বললেন, "বলিস কী? তোর ন্যাজ?"

গজেন মুখবিকৃতি করে বলল, "আমার পায়ের শিরায় টান লেগেছে; পাখির ন্যাজ খসেছে।"

ততক্ষণে আমি কাছে গেছি ওর। ও পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছিল। বন্দুকের ট্রিগার তো আর পা দিয়ে টানেনি, কিন্তু টান পড়েছে পায়ের শিরায়।

বন্দুকটা ওর হাত থেকে নিতেই ও এক পায়ে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, "ন্যাজ খসে গেছে, টান লেগে গেছে: টান লেগে গেছে; ন্যাজ খসে গেছে।"

তখন ওকে সামলাবেন না শিকারযাত্রা করবেন বাবা এবং বর্মনকাকু তাই নিয়েই সমস্যা দেখা গেল।

ইতিমধ্যে দূর থেকে পনেরো কেজি ওজনের ছিপছিপে চকচকে বাঁশের মতো চেহারার পলান, হাতে লগি নিয়ে এসে হাজির।

বলল, "চলুন বাবু, পাখিরা সব বিলি মেরে রইয়েছেন। আজ খাদ্যখাদক কিছু করা যেতে পারে। দেরি করলি ওদিকের শিকারিরা সব সাবড়ে দিবে।"

বলেই, বর্মনকাকুর দিকে তাকাল পলান। মনে হল বর্মনকাকুর সিগার-মুখে চেহারাটা বিশেষ পছন্দ হল না পলানের।

পরক্ষণে পলান গজেনের দিকে চেয়ে বলল, "খোকার হলটা কী?"

পাইকপাড়ার মস্তানকে খোকা বলায় গজেন বিস্তর চটল। বলল, "শির টান-টান।"

পলান থুক করে শ্লেষ্মা-শ্লেষ্মা মেশানো একতাল থুথু ফেলে বলল, "নিশীথকুয়ারি লতার সঙ্গে হেড়োভাঙ্গা নদীর জল মিশিয়ে একরত্তি গরান ফুলের মধু দে খল-নোড়ায় মেড়ে খেয়ে লাও দিকিন্ খোকা—তোমার টান-টান শির পলক ফেলার আগেই বে-টান হইয়ে যাবে।"

গজেনের তখন শরীরের দুঃখ গিয়ে শিকারের দুঃখ চেগে উঠেছে।

বলল, "ন্যাজ খসে গেছে।"

পলান বলল, "বলো কী গো খোকা? তুমি বাঁদর নাকি?"

গজেন কথা ঘুরিয়ে বলল, "তোমরা যাও মেসোমশাই—আমি গাছতলায় শতরঞ্জি পেতে থাকব—। দূরবিন নিয়ে।"

আমাকে গজগজ করে বলল নিচু গলায়, যাতে বাবা শুনতে না পান, "এর চেয়ে টারজানের ছবি দেখতে গেলে অনেক ভাল হত।"

পলান নৌকোয় গিয়ে উঠেছে। ধুতিটাকে ভাল করে মালকোঁচা মেরে বেঁধেছে। চোখ কুঁচকে পলান বলল, "যাবে কে?"

বাবা বললেন, "সকলেই।"

গজেন বলল, "আমি ছাড়া।"

পলান বলল, "আম্মো নাই ই সাংঘাতিক কম্মে।"

বাবা বললেন, "কী পলান, হবে না?"

পলান বলল, "হবে না কোন কথা? একবার এই ডোঙাতে একটো ল্যাংড়া মোষকে নিয়ে গেছিনু না। মাঝ বাদায় ডোঙা উলটিলে? সাঁতার জানেন সবাই?"

বাবা ও বর্মনকাকু নিশ্চয় জানেন। আমাকে সাঁতার ক্লাবের মেম্বার করে দিয়েছিলেন বাবা। কিন্তু যে পরিমাণ জল তোলপাড় করে যে হাঁকুপাঁকু প্রক্রিয়ায় যতটুকু এগোতাম আমি তার নাম সাঁতার নয়। কিন্তু বাবা জানেন যে, আমি সকালে সাঁতার যাই। আসলে একা একা লেকের বেঞ্চে বসে প্রায়ই ফুচকা কি আলুর দম খাই। কিন্তু প্রাণ গেলেও এখন বলা যাবে না যে, সাঁতার জানি না।

বাবা বললেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, সকলেই জানে। ভালই জানে।"

আমি দেখলাম পলানের চোখের কোনায় এক অনুকম্পার ঝিলিক্ চমকে উঠল।

বাবা বললেন, "কী করবি রুদ্র? তুই থেকে যা গজেনের সঙ্গে।"

বর্মনকাকু বললেন, "আহা ছেলেমানুষ। কাল বিকেল থেকে গাডোয়াল গাডোয়াল করে নাচছে—আসলে আমার ফোনটা তো ও-ই ধরেছিল।"

আসলে সেটা কোনো ব্যাপার নয়। মনে মনে আমি ভাবছিলাম। হাত দিয়ে বন্দুক ছুঁড়ে যে পায়ের শিরায় টান ধরায় তার মতো অনপড়্ আদমির সঙ্গে এক শতরঞ্জিতে বসে থাকতে আমি আসিনি। তাছাড়া আমি চেয়েছিলাম, গজেন জানুক, দেখুক, আমার হাতের নিশানা, শিকারে আমার অভিজ্ঞতা। ও সঙ্গে গেলে আরও ভাল হত।

তবু, আমি মুখে কিছু না বলে, মুখটা ব্যাজার করে রইলাম।

স্নেহপ্রবণ বাবা, আমার মুখের দিকে তাকালেন একবার দেখলাম।

তারপর বললেন, "চল্ পলান। এগোই।"

আমরা একে একে তিনজনে সাবধানে সেই টল-টলায়মান ডোঙায় উঠে বসলাম।

গজেন ততক্ষণে ফ্লুরির প্যাকেট খুলে মনোযোগ দিয়ে কেক খেতে লেগেছে। এমন সময় মাথার উপর দিয়ে একটা কাঁক উড়ে গেল কাঁক, কাঁওয়াক করে ডাকতে ডাকতে, লম্বা ঠ্যাং দুটো দোলাতে দোলাতে।

আমি আমার বিদ্যা জাহির করার জন্যে বললাম, "দ্যাখ গজেন কাঁক্, কাঁক্।"

আর অমনি পক্-পক্ আওয়াজ করে ডোঙাটা দুলে উঠেই ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল। আমি যেই গজেনের দিকে ফিরেছি হাত তুলে ওকে কাঁক দেখাতে গেছি, তাতেই এই বিপত্তি।

বাবা বললেন, "খুব সাবধানে বসো। একদম নড়াচড়া নয়।"

গজেনকে নিঃশব্দে বাঁ হাত তুলে টা-টা করলাম। আমি সবচেয়ে পিছনে বসেছি। আমার সামনে বাবা, তাঁর সামনে বর্মনকাকু। আর একেবারে সামনে পলান, দাঁড়িয়ে ডোঙা বাইছে। আমরা প্রায় গায়ে গায়ে লেগেই বসেছি। বাবা ও বর্মনকাকুর হাতে ডাবল ব্যারেল বন্দুক। আমার হাতে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল—। চেকোস্লোভাকিয়ান্—। ব্যারেলের নীচে লম্বা ম্যাগাজিন—আরেকটা ব্যারেলের মতো। বাবার ফুরিয়ে-যাওয়া সিগারেটের টিনে রাইফেলের গুলি। ভাল চান্স পেলে বড়রা সিটিং পজিশনে মারবেন ঝাঁক দেখে। তারপর হাঁস উড়লে, তখন অন্য ব্যারেলের গুলি দিয়ে তাঁরা ফ্লাইং মারবেন। তখন আমিও পটাপট্ রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি করব উড়ো হাঁসের উদ্দেশে। উড়ন্ত হাঁসের সঙ্গে আমার রাইফেলের গুলির যোগাযোগ যদি ঘটে যায় তবে তা নেহাতই দুর্ঘটনা বলতে হবে।

আমি না পারলেও বাবা খুব ভাল ফ্লাইং মারতেন। বর্মনকাকুর কথা জানি না। কারণ এর আগে ওঁর সঙ্গে শিকারে যাইনি আমি কখনও।

জলের একটা আলাদা গন্ধ আছে। গন্ধ আছে এই বাদার। মাঝে মাঝে হোগলা, শর, নানা ধরনের লতাপাতা জলের উপর। উড়ে-যাওয়া পাখির খসে-যাওয়া পালক ভাসছে। দূরে জলের উপর সাঁতরে যাচ্ছে সাপ, লম্বা একটা সরল চিকন রেখার মতো। জলের মসৃণ নিস্তরঙ্গ আয়নাকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতো কেটে দুফালা করছে যেন। স্নাইপ্, স্নিপেট লেজ নাচিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াচ্ছে অথবা ছোট্ট ছোট্ট তীরের মতো উড়ে যাচ্ছে দল বেঁধে।

দ্রুত ধাবমান পাখির ঝাঁক যখন উড়তে উড়তে দিক অথবা উচ্চতা পরিবর্তন করে তখন মনে হয় একদল ছোট ছোট মেয়ে যেন যুগযুগান্ত ধরে রিহার্শাল দিয়ে কোনো নাচ দেখিয়ে গেল। এমনি অনবধানের, অবহেলার নাচ চারদিকে, গান। এমনকী ব্যাক ড্রপ পর্যন্ত। কত যে ছবি, কত যে গান, যারই চোখ আছে সেই-ই দেখতে পায়। যারই কান আছে, সেও পায় শুনতে।

আমরা র‍্যাপট্ অ্যাটেনশানে বসে আছি। ডানদিকে বাঁদিকে হুইসলিং টীলস, কটন টীলস, কমন টীলসের ঝাঁক পেয়েছিলাম আমরা। শীতের ভর-দুপুরের সূর্য মাথার উপরে। তবে চোখে লাগছে না; টুপি আছে। বাদার উপর দিয়ে উত্তরে হাওয়া বইছে। শীত করছে ছায়ায় গেলেই।

কচুরিপানার মধ্যে মধ্যে লম্বা-লম্বা পা নিয়ে দারুণ ময়ূরপঙ্খী নীল শরীর আর লাল ঠোঁটের কাম পাখিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ক্, ক্ওক করে ডাকছে। কচুরিপানার গন্ধ, ওদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে এই জলজ আবহাওয়াকে এক বাস্তির দিয়েছে।

একজোড়া রাজহাঁস সোঁ-সোঁ করে হঠাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে গেল বন্দুকের পাল্লার মধ্যে দিয়েই, কিন্তু আমাদের একেবারে চমকে দিয়ে। কেউই বন্দুক তোলেনি। আচমকা মুখ তুলে একসঙ্গে যে ওদের দিকে তাকিয়েছি তাতেই ডোঙাটা টলমল করে উঠেছে।

আজ আমাদের কোনো দিকে তাকাবার অবসর, ইচ্ছা বা সময় নেই। আমরা গাডোয়ালের ঝাঁকটার দিকে এগিয়ে চলেছি। সাধের গাডোয়াল। এবার হাঁসগুলোকে দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার। পশ্চিমে কিছুটা জঙ্গল আছে জলে।

বাবা বললেন, "পলান, ঐ জঙ্গলের আড়ালে ডোঙা নিয়ে ভেড়াও বাবা। বাঁদিকে গুলি করব—তাই নৌকোটা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে দিবি—যাতে পশ্চিমে গুলি করতে পারি সহজে। যতখানি পারিস স্থির রাখিস—শেষবার দাঁড় বেয়ে তুই বসে পড়বি। ডোঙা যখন আস্তে এগোবে তখন গুলি করব আমরা, যাতে গুলি উপরে-নীচে না চলে যায়।"

পলানও খুব উত্তেজিত আজ। প্রথমত আড়াই কুইন টাল ওজন নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে রাখা সহজ কথা নয়, দ্বিতীয়ত গাডোয়ালের নেশা।

বাবা বলেছিলেন, এক-একটা গাডোয়ালের জন্যে ওকে এক এক টাকা বকশিশ দেবেন।

পলান একটা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিতে লাগল। আমি সূর্যের দিকে চেয়ে ভাবলাম যে, এতক্ষণে মা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে উঠে ঠাকুরকে দিয়ে মশলাটশলা বাটিয়ে রাখছেন। আরও ভাবলাম, গজেনের চোখে-মুখে আমার প্রতি ভক্তি কীরকম উপছে পড়বে যখন গাডোয়াল ও অন্যান্য হাঁসগুলো নিয়ে ডোঙা থেকে নামব আমরা। গাডোয়াল শিকারের পরে, বাবা বলেছেন, আর কোনোই রেস্ট্রিকশান্ নেই। ফেরার পথে অন্য সব পাখিই মারব আমরা।

পলান বিড়িটা শেষ করে, জলে ছুঁড়ে ফেলে, নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ঐ জঙ্গলের দিকে করল।

আমরা সকলে টেন্স। আস্তে আস্তে এক লগি দু লগি করে আমরা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছি। এক-একটা মিনিটকে মনে হচ্ছে এক-এক ঘণ্টা! অবশেষে শেষ মুহূর্ত এল।

ঝাঁকের মধ্যের কিছু কিছু হাঁস উড়ে উড়ে বসছে—। তাদের জল ছেড়ে ওঠার সময় যে জলবিন্দু ওদের ডানা আর গা থেকে ঝরছে তাতে সূর্যের আলো পড়ে লক্ষ লক্ষ হীরের মতো ঝকমক করছে।

বাবা বললেন, "ওয়ান, টু, থ্রী।"

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে বাঁদিকে রাইফেল ও বন্দুক একসঙ্গে সুইং করলাম। আমাদের গাডোয়াল-স্বপ্নাতুর চোখে শেষবারের মতো হাজার খানেক গাডোয়ালের ঘনসন্নিবিষ্ট ছবি ঝিলিক মেরে গেল।

পরমুহূর্তেই একটা বিচ্ছিরি ও অতর্কিত আওয়াজ হল : পকাত।

তারপর ডেঞ্জারাস ডোঙা, ডেয়ার-ডেভিল তিন শিকারি এবং অত্যন্ত অনিচ্ছুক পলান বাদার গা-চুলকোনো, সাপ-বিছুটি পাঁক এবং ঝাঁঝি ভরা অথৈ জলে সমাধিস্থ হল।

জলে ডোবার আগে প্রথমেই আমার মায়ের মুখটা ভেসে উঠল; তারপরই গজেনের।

জলের নীচেটা কী সুন্দর। নীলচে সবুজ আলোয় ভরে গেছে জলজ অন্ধকার। লতাপাতার শিকড় ঝুলছে উড়ন্ত পাখির পায়ের মতো চারদিকে। নীচের সবুজ ঝাঁঝি কী নরম কার্পেটের মতো। পা পড়তেই স্প্রিংয়ের মতো পা উপরে উঠে এল। আরও অনেকক্ষণ নীচে থাকতে পারলে খুশি হতাম। থাকলে হয়তো জলপরী আর পাতালপুরীর রাজকন্যার সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু দম বন্ধ হয়ে এল। প্রাণপণ চেষ্টায় হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে অক্সিজেনের আকুতিতে যখন জলের উপর মাথা তুললাম মাটিতে পা রেখে তখন ভাগ্যক্রমে দেখলাম যে, আমি মরিনি। সেখানে ডুবজল ছিল না ভগবানের দয়ায়। জল আমার কানের নীচে ছিল।

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাশেই বাবা। জল, বাবার কাঁধ অবধি। বাবা ছ' ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু সেই জোলো নাটকের আর দুজন অ্যানিমেট এবং একজন ইন-অ্যানিমেট পাত্র মঞ্চে অনুপস্থিত ছিল। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যে, গুলির কৌটো হারিয়ে গেলেও, রাইফেলটা হাত-ছাড়া করিনি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পলানের মাথাটা আমার পাশে ভিজে পানকৌড়ির মতো জল থেকে উঠেই এক ঝাঁকুনিতে জল ছিটিয়ে আবার দ্বিগুণ বেগে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পলানের ডুবে মরার কোনো কথাই ছিল না কিন্তু পলানই কি শেষে ডুবে মরবে?

এমন সময় আমাদের সামনে জলের নীচে তোলপাড় শুরু হল।

এখানে কুমির আছে বলে শুনিনি—। থাকলে, আগে অনেক বার কোমর-জলে সামনে কচুরিপানার বাণ্ডিল রেখে তার উপর বন্দুক রেখে হেঁটে হেঁটে এখানে হাঁস মারতাম না। জলহস্তী ভারতবর্ষে নেই বলেই জানতাম। তবে এ কোন্ জানোয়ার এমন জলে তুফান তুলে ঝাঁঝি ও কাদায় হাঁচোর-পাচোর করছে?

কিছুক্ষণ পর পলানের মাথা আবার উঠে এল। মাথা তুলেই পলান দোখ্‌নো ভাষায় অশ্রাব্য গালাগালি করতে লাগল।

বাবা বললেন, "হল কী?''

পলান বলল, "আপনার বন্ধু। আমাকে এমন জাপটিয়ে ধরল যে, আমিসুদ্ধু জলে ডুবে মরতাম। কিছুতেই যখন ছাড়ে না তখন তার নাকে লাথি মেরে উপরে আসতে বাধ্য হলাম। আমার দম ফুরিয়ে যেতেছিল।"

বাবা আতঙ্কিত গলায় বললেন, "বন্ধু কি মরে গেছে?"

পলান বলল, "মরলে বাঁচি।''

তখন বাবা আমাকে বন্দুকটা ধরতে বলে ডুব দিলেন। বাবা আর ওঠেন না। আমার যে কী ভয় করতে লাগল কী বলব। বাবা ডুবে গেলে?

অনেকক্ষণ পরে বাবা বর্মনকাকুকে ধরে উঠলেন। দেখলাম বর্মনকাকুর মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাঁর নাক ফেটে গেছে। রক্তে জল লাল হয়ে উঠল।

এখন ডোঙা উঠোনো যায় কী করে? চারজনের অনেকক্ষণের চেষ্টায় তো ডোঙাটাকে উপরে তোলা হল। হাত দিয়ে তারপর সকলে মিলে ডোঙার জল ছেঁচা হল।

যখন আমরা জল ছেঁচে বের করছি তখন গাডোয়ালের ঝাঁকটা আস্তে আস্তে উড়তে উড়তে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। খুব নিচু দিয়ে। যেন মজা দেখার জন্যেই।

ডোঙাটাকে জলমুক্ত করার পরে আসল সমস্যা দেখা দিল। বুক-সমান ডোঙায় জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাতে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। বাবা প্রথমে উঠতে যেতেই ডোঙাটা আবার ডুবে গেল। আবারও তাকে তোলা হল।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ডিসেম্বর মাস। হু হু করে উত্তর থেকে হাওয়া আসছে। হাড়ের মধ্যে কনকনানি তুলে। এতক্ষণ জলের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো হয়ে গেছি।

শেষে পলান আগে উঠল। মানে, তাকে ঠেলে-ঠুলে ওঠানো হল। তারপর আমাকে। আমরা দুজনে উঠে ডোঙার দুদিক ব্যালান্স করে বসলাম। বাবা ও বর্মনকাকু আরও আধঘণ্টা সার্কাস করার পর উঠলেন। সকলে নৌকোবোঝাই হয়ে দেখা গেল ততক্ষণে লগি ভেসে গেছে। সকলে মিলে হাত দিয়ে জল কেটে অভিমানী লগির কাছে গিয়ে তাকে উদ্ধার করা হল। তারপর পাছে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয় সেই ভয়ে সকলেই হাত দিয়ে জল কেটে কেটে গা গরম করতে লাগলাম।

পাড়ের দিকে ফিরে আসছি, ফিরে এসেছি প্রায়, এমন সময় বর্মনকাকু বললেন, "দাদা, ওয়াইল্ড ডাকস্।"

আমি পড়ন্ত রোদে হোগলা বাদার কাছে তাকিয়ে দেখলাম, কালো ও ছাইরঙ একদল পাতিহাঁস।

বাবা বললেন, "যাঃ! পোষা।"

বর্মনকাকু কাঁপছিলেন। রেগে বললেন, "কাশ্মীরে, ভরতপুরে কত শিকার করেছি আমি। আমাকে শেখাচ্ছেন আপনি? পোষা না, ওয়াইল্ড।''

পলান বলল, "আলো নাই, ঠাহর হয় না ভাল। দাঁড়ান, ঠাহর করি।''

কিন্তু গাডোয়ালের শোকে কাণ্ডজ্ঞানহীন অধৈর্য অবস্থায় পলান ঠাহর করার আগেই বাবা ও বর্মনকাকু যুগপৎ বন্দুক দেগে দিলেন পনেরো-কুড়ি হাত দূর থেকে। চার-পাঁচটা হাঁস উলটে গেল।

আমরা ডাঙার কাছে এসে গেছিলাম। পাড় থেকে কে যেন বলল, "অ কালীদাসী, তোর হাঁসীগুলোকে গুলিতে যে ভেনে দিল।''

কালীদাসী নাম্নী অদৃশ্য মহিলা বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "সুধীর, নেতাই, হরবিলাস, লাঠি নে আয়, শড়কি নে আয়; আজ ব্যাটাদের ছেরাদ্দ করব।''

বর্মনকাকু ও বাবা ততক্ষণে ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

আমরা দেখলাম, পাড়ে লাঠি-সোঁটা নিয়ে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। আর অফ অল পার্সনস গজেন, যে শিকারের 'শ' জানে না, সেই-ই দূরবিন দিয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করছে।

বিপদ দেখে পলান ডোঙা নিয়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় যাবে বলে ডোঙার মুখ ঘোরাচ্ছিল। সেই সময় আমরা অবাক হয়ে দেখলাম গজেন ফ্লুরির প্যাকেট থেকে মারমুখী সকলকে কেক বিতরণ করছে, খাওয়াচ্ছে।

ও একটু পরই চিৎকার করে বলল, "মে SSO-ম SSAই ফিরে ESSO, আমি আছি; এরা কিছু বলবে না। রুদ্দ্ ফিরে আয়, ফিরে আ.........য়।''

এরকম বার বার ডাকতে লাগল গজেন।

সাহসে ভর করে ফিরে আসবার সময় পাতিহাঁসগুলোকেও তুলে নিয়ে এলাম আমরা। ড্যাঙার কাছে আসতেই দেখি, গজেন কালীদাসীর সঙ্গে মরা হাঁসদের দর কষাকষি করছে, ক্যাজুয়ালি। যেন কিছুই হয়নি। পাঁচ টাকা করে এক-একটার রফা করল ও। মাইনাস ধোলাই।

গজেন বাবার দিকে চেয়ে বলল, "ফেয়ার এনাফ। কী মেসো?''

বাবা বললেন, "হাঁসগুলো ফেলে দে রুদ্র।"

গজেন বলল, "মে SSO, মাসির কথা একবার ভাবো; আর তোমার বন্ধুরা.........; নেমন্তন্ন.........।"

অলৌকিক ঘটনার গোপন কথা

পি সি সরকার (জুনিয়ার)

পুনা শহর থেকে খানিকটা দক্ষিণে, এক ছোট্ট গ্রাম। সেখানে এক সিদ্ধপুরুষের সমাধির পাশে ছোট্ট একটি উপাসনালয় আছে। গ্রাম ছোট হলে কী হবে, অনেকেই সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন। গ্রামের দৃশ্য মোটেই আহামরি কিছু নয়, কিন্তু তবুও এত লোক ওখানে যাতায়াত করছেন কেন? কারণটা হচ্ছে আজকাল তো আর সত্যিকারের ম্যাজিক যেখানে-সেখানে দেখা যায় না। অনেক সাধুবাবা টুকটাক ম্যাজিক দেখিয়ে চটপট মানুষের মন জয় করেছিলেন; কিন্তু পরে দেখা গেছে ঐ সমস্ত ম্যাজিক খুবই নিচু শ্রেণীর কৌশলের ভিত্তিতে করা। সুতরাং আজকাল অনেকেই ঐ সমস্ত নকল ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে নতুন একটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঐ গ্রামে নাকি একটা সত্যিকারের অদ্ভুত অলৌকিক জিনিস লুকিয়ে আছে, আর সেটা দেখবার জন্যই বহুলোক পুনায় গেলে একটু কষ্ট করে ঐ গ্রামটা ঘুরে আসেন।

উপাসনালয়ের সামনে ঘাসে ঢাকা জমিতে একটা বেশ বড়সড় গ্র্যানাইট পাথরের টুকরো আছে। ওজন হবে পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলো। এগারোজন লোক মিলে যদি তাঁদের কড়ে আঙুলটা ঐ পাথরের ধারে চেপে ধরে সিদ্ধপুরুষের নামটা একটা বিশেষ সুরে বলেন, তাহলে নাকি একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যায়। গ্র্যানাইট পাথরটা কেমন যেন নড়তে-চড়তে শুরু করে, আর তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে একদম হাল্কা হয়ে যায়। সবাই মিলে কড়ে আঙুল দিয়েই ঐ ভারী পাথরটাকে মাটি থেকে প্রায় ছ' ফুট তোলা যায়। সামান্য কিছুক্ষণ ওপরে থেকে তারপর আবার ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। সাবধানে না
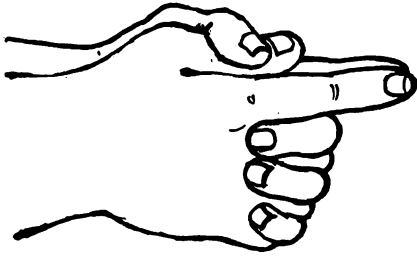
থাকলেই সর্বনাশ। যদি কারুর পায়ের ওপর পড়ে তো আর দেখতে হবে না। পা একেবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। পাথরের ওজনটা তো আর কম নয়।

এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করবার জন্য অনেক বড় বড় লোকেরা মাথা ঘামাচ্ছেন। অনেকে আবার আজগুবি বানানো গল্প বলে উড়িয়েও দিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, ঘটনাটা এরকম অদ্ভুতভাবে ঘটে যে, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করা যায় না। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এটা নাকি ধর্মীয় ব্যাপার। এগারোজন লোকের সদিচ্ছাতেই নাকি পাথরটা হাল্কা হয়ে যায়। বিশ্বাসীরা বলেন, এটা ধর্মের জোরে হয়।

ধর্ম আমি মানি; মোটেই নাস্তিক নই। ভগবানকে ভক্তি করি বলেই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ছোটখাটো কৌশল নিয়ে টানাটানি করি না। আমার ধারণা, ঐ পাথর তোলার ব্যাপার একটা সাধারণ ম্যাজিক, এবং যে-কোনও সময়ে মন্ত্র-টন্ত্র না পড়েও এটা করা সম্ভব। আজ তোমাদের আমি যে ম্যাজিকটা শেখাব, সেটা ঐ জাদু-পাথরটার মতোই অদ্ভুত। ঘরে বসে বন্ধু-বান্ধবদের সামনেও তুমি এটা দেখাতে পারো—এবং তখন যদি তুমি একটু ধর্মের ছোঁয়া লাগাও অর্থাৎ চারদিকে ধূপ-ধুনো জেবলে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে দেখাও তাহলে দেখবে অনেকেই এটাকে দৈব ঘটনা বলে ভাবতে শুরু করেছেন।

আচ্ছা, প্রথম থেকেই বলছি। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য থেকে যে-কোনও চার বন্ধুকে বেছে নিয়ে তাদের প্রত্যেককে ছবি অনুযায়ী যে যার নিজের ডান হাত আর বাঁ হাত ধরতে বলো। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে কীভাবে ধরতে হবে। হাত দুটো ধরা থাকলেও প্রথম আঙুল দুটো অর্থাৎ নির্দেশক আঙুলটা মেলা থাকবে। চার বন্ধুই এভাবে নির্দেশক আঙুল বের করে হাত ধরবার পর অন্য একজন বন্ধুকে ডেকে একটা চেয়ারে বসাও। এবার সেই আগের চার বন্ধুকে বলো, "এই নির্দেশক আঙুলগুলো দিয়ে চারজনে মিলে এই চেয়ারে-বসা বন্ধুকে শূন্যে তুলতে পারবে? সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখো সম্ভব কি না।" বুঝতেই পারছ—আঙুল দিয়ে একটা মানুষকে তোলা অসম্ভব ব্যাপার। সবাই বলবে, সম্ভব নয়। এবার শুরু হবে তোমার ম্যাজিক দেখাবার পালা। চেয়ারে বসা বন্ধুটির দিকে একটু গভীর ভাবে তাকিয়ে সম্মোহন করবার অভিনয় করো। তাকে বলো চেয়ারে সে যেন ঠিকমতো বসে থাকে। এবার সেই বাকি চার বন্ধুকে বলো চেয়ারটাকে ঘিরে দাঁড়াতে। দুজনকে বলো তাদের নির্দেশক আঙুলগুলো মেলা অবস্থায় চেয়ারে বসা বন্ধুর হাঁটু দুটোর পেছন দিকে রাখতে; আর অন্য দুই বন্ধুকে বলো তাদের নির্দেশক আঙুলগুলো পেছন দিক থেকে দুই বগলে রাখতে। অর্থাৎ চারজনই তাদের নির্দেশক আঙুল দিয়ে ঐ চেয়ারে-বসা বন্ধুকে চার জায়গায় ধরে আছে। এবার আবার সম্মোহন করবার মতো অভিনয় করে চার বন্ধুকেই বলো, "আমি ওয়ান-টু-থ্রী বলার সাথে সাথেই তোমরা সবাই মিলে—নির্দেশক আঙুল দিয়েই চেয়ার থেকে ওকে ওপরে তোলবার চেষ্টা করবে।"

ওয়ান-টু-থ্রী!! অবাক ব্যাপার! দেখো, তোমার চেয়ারে বসা বন্ধু কেমন হাল্কা হয়ে গেছে। চার বন্ধুর নির্দেশক আঙুলের সামান্য চাপেই সে কেমন শূন্যে উঠে আছে। ছবিটার মতো মাটি থেকে বেশ কয়েক ফুট ওপরে ওকে তোলা সম্ভব। এবার চার বন্ধুকেই আস্তে আস্তে করে হাত নামাতে বলো। চেয়ারে আবার নামিয়ে দেবার পর বন্ধুদের জিজ্ঞেস করো ভারী লাগছিল কি না। দেখবে সবাই বলছে, মোটেই না, একদম হাল্কা।

আসলে ব্যাপারটা কী জানো? চেয়ারে বসা বন্ধুর ওজন মোটেই হাল্কা হয়নি; তবে হাল্কা লেগেছিল, কারণ, চারজনের মধ্যে সেটা ভাগ হয়ে গেছে। একটা সাধারণ মানুষের ওজনের চার ভাগের একভাগ অনায়াসে তোলার মতো ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। আমাদের হাত দুটোকে একজায়গায় করে শক্তি প্রয়োগ করলে সেটা যে কতটা জোরালো হয় তা আমরা কখনই খেয়াল করে দেখিনি। পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক; চোখে দেখে বা মনে মনে ভাবলে ভারী মনে হবে—আসলে কিন্তু ওজনটা অত ভারী নয়।

সেই পঞ্চাশ কিলো পাথরটা এগারোজন লোক মিলে এক আঙুল দিয়ে তুলবে—এতে চমক থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই।

টেনশন! টেনশন!

চুনী গোস্বামী

বনের বাঘ গ্রামে ঢুকলে আর্তনাদ ওঠে 'বাঘ! বাঘ!' ঠিক সেই রকম একটা চিৎকার কলকাতায় ওঠে বড় ম্যাচ এগিয়ে এলেই : 'টেনশন! টেনশন!'

ব্যাপারটা কী? রকমসকম দেখে মনে হতে পারে, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফুটবল-ম্যাচ ছাড়া আর সব কিছু খুব সহজ সরল ব্যাপার। এই ম্যাচটাতেই যত টেনশন!

টেনশন কোথায় নেই? পরীক্ষার আগের দিন জ্বর হয়ে গেল। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হল। স্কুলের বার্ষিক উৎসবে নাটকের ঠিক আগেই গলা ভেঙে গেল। সব টেনশনেরই রকমফের।

আর খেলার দুনিয়ায় টেনশন আছে সর্বত্র। ধরো তিন রানে নট আউট আছেন সুনীল গাভাসকার। দ্বিতীয় ইনিংসে চারশো রান করলে ভারত হার বাঁচানোর স্বপ্ন দেখতে পারে। পরদিন সকালে তাঁকে খেলতে হবে ইমরান খান বা রডনি হগের মতো দুর্দান্ত কোনো পেস বোলারের প্রায়-নতুন বলকে। তিনি অল্প রানে আউট হওয়া মানে, টীমের হার অনিবার্য। পরদিন সকালে শুধু টীম নয়, গোটা দেশই তাকিয়ে থাকবে গাভাসকারের দিকে। এই অবস্থায়, তাঁর টেনশন হয় না?

নিশ্চয় হয়। কিন্তু বড় খেলোয়াড় তিনিই, যিনি এই টেনশন কাটিয়ে ভাল খেলতে পারেন। গ্যারি সোবার্স এমনিতে ছিলেন আমুদে খোলামেলা মানুষ। কিন্তু ব্যাট করতে নামার সময়ে দেখেছি ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবেন। আসলে, প্রাথমিক টেনশনটুকু কাটিয়ে নিজেকে তৈরি করে নেন।

কেউ-কেউ বলতে পারেন, "টেনশন? সেটা আবার কী জিনিস? খায়, না মাথায় দেয়?" আসলে, টেনশন ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যই এই ঠাট্টা। কিন্তু, এটা কাজের কথা নয়। টেনশন বা এই ধরনের দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনা গুরুত্বপূর্ণ খেলার আগে হওয়া স্বাভাবিক। কথা হচ্ছে, কীভাবে এই টেনশন কাটানো যায়।

আমার সৌভাগ্য, ফুটবল-জীবনের শুরুতেই এমন একজন খেলোয়াড়ের দেখা পেয়েছিলাম, যিনি জানতেন কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ১৯৫৫ সালে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে মোহনবাগান টীমের সঙ্গে বোম্বেতে রোভার্স কাপ খেলতে গেছি। সেই প্রথম মোহনবাগান রোভার্স পেল।

ফাইনালের আগের দিন কিছুটা নার্ভাস বোধ করছিলাম। টীমের প্রবীণতম ফুটবলার পদ্মোত্তম বেঙ্কটেশ সেদিন যা বলেছিলেন, তা সারা জীবনে ভুলিনি : "দ্যাখো, বড় কোনো ম্যাচের আগে টেনশন হবেই। কিন্তু বেশি ভাবলেই মুশকিল। তাই ম্যাচের কথা না ভেবে অন্য কিছুতে মনোযোগ দেওয়া দরকার। যে-কোনো মজার বই খুলে বসে যাও। ভূতের গল্পও পড়তে পারো!"

টেনশন এড়ানোর ব্যাপারে ওস্তাদ ছিলেন কেম্পিয়া। যে-কোনো বড় ম্যাচের আগে তাঁকে দেখেছি নিশ্চিন্ত। তাঁর কাছে যে-কোনো ম্যাচই ছিল 'আর একটি ম্যাচ'। চুপচাপ থাকতেন। খেলার কথা মোটেই বলতেন না। মাঠে নামলে কিন্তু বোঝা যেত, বড় ম্যাচের জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তাছাড়া আমার তো মনে হয়, অন্য অনেক খেলার তুলনায় ফুটবলে স্নায়ুর চাপে জর্জরিত হবার সম্ভাবনা অনেক কম। ক্রিকেটে এর আশঙ্কা অনেক বেশি।

জ্যাক নিকোলাসের কথাটাই ধরো। গলফের রাজা। একটা স্ট্রোকে এক চুল এদিক-ওদিক হলে হারাবেন কয়েক লক্ষ ডলার। তাঁর স্নায়ুর ওপর কতখানি চাপ পড়তে পারে, ভাবা যায়?

অনেকে আবার উপদেশ দেন, বড় ম্যাচের আগে সব পত্র-পত্রিকা পড়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। খবরের কাগজ আর রেডিও-টেলিভিশন মিলে যে চিল-চিৎকার ওঠে, তা থেকে দূরে থাকাই নাকি টেনশন কাটানোর সরল রাস্তা। এটাও ঠিক নয়। অস্বাভাবিক কিছু করতে যাওয়াটাই ভুল। এবার তোমরা প্রশ্ন করবে, তাহলে কী করা উচিত?

আমার উত্তর : খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করা উচিত। বড় ম্যাচের আগে এই কথাগুলো ভাবা দরকার : গত এক সপ্তাহ আমি কি আদর্শ খেলোয়াড়ের মতো সংযমী জীবন যাপন করেছি? আমি কি নিয়মিত অনুশীলনে নিজেকে প্রস্তুত করেছি? আমার শরীর কি সম্পূর্ণ সুস্থ? বড় ম্যাচের জন্য যথেষ্ট মনোবল কি আমার আছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে টেনশন কাটিয়ে ভাল না-খেলার কোনো কারণ নেই। গাভাসকার জানেন উইকেটমুখী একটা বল ফসকালেই ইনিংস খতম। কিন্তু ফুটবলে একটা মিস করলেও ক্ষতি নেই। দশ মিনিট খারাপ খেললেও ক্ষতি নেই। টেনশন কাটিয়ে নিজের ফর্মে আসার জন্য থাকে সত্তর বা নব্বুই মিনিট সময়।

সব-কিছুর পরেও একটা কথা থেকে যায়। লড়াই করার ইচ্ছা। ঘুরে দাঁড়ানোর দুর্বার ইচ্ছায় সব দুর্বলতা আর টেনশনকে চুরমার করে ফেলা যায়। তাই, বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে জ্বলে ওঠার ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ।

একটা ছোট্ট গল্প বলি। ছোটবেলায় আমি ছিলাম লিকলিকে রোগা। স্বভাবতই মুখচোরা। স্কুলে অন্য ছেলেরা টুকটাক চড়চাপড় মারত, বিরক্ত করত। ব্যাপারটা ক্রমশই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। একদিন মনে-মনে ঠিক করলাম, 'আর নয়, যা হয় হবে, আজ কিছু একটা করি!' এলোপাথাড়ি কিল-চড় চালালাম, আছড়ে দিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, সেই থেকে সব অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হয়, যে-কোনো ধরনের দুর্বলতা বা টেনশন কাটানোর ক্ষেত্রেও এই হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা অনেক সময় সাফল্য এনে দেয়।

মেঘ আসে রোদ হাসে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রুকু বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছে। সুকু বিছানার মাথার কাছে টেবিলে আলো রেখে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। বইটার নাম, টমসয়েব, লেখক, মার্কটোয়েন। পড়ছে বটে কিন্তু তেমন মন বসছে না। মনটা সন্ধে থেকেই খুব খারাপ। ভাবলে ফেয়ারি টেলস পড়ি। যদি ভাল লাগে!

সুকু কোনো দিন অনুমতি না নিয়ে বাবার জিনিসে হাত দেয় না। কী যে দুর্মতি হল আজ! বাবার টেবিলের ড্রয়ার খুলেই দেখল ঝকঝকে সুন্দর নতুন একটা কলম। কলমটা হাতে নিয়ে বারকতক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। ছোট্ট ছোট্ট খুদি খুদি অক্ষরে সোনালি কাপের গায়ে গোল করে লেখা—পার্কার। কলমটা খুলে বাবার ডাক্তারি প্যাডে খ্যাঁসর খ্যাঁসর করে গোটাকতক আঁচড় কেটে ভেবেছিল লোভটা সামলাতে পারবে। রেখে দিয়েছিল যথাস্থানে। ড্রয়ার বন্ধ করে চলেও যাচ্ছিল। দরজার কাছাকাছি গিয়ে মন বললে—কলমটা নিয়ে

আজ স্কুলে যা সুকু। টেরিফিক হবে। সবাই ট্যারা হয়ে যাবে। কী আছে! বাবা হসপিট্যাল থেকে ফিরে আসার অনেক আগেই তুমি ফিরে আসবে। যেখানকার কলম সেখানেই রেখে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না, কেউ ধরতেও পারবে না।

সুকু চুপি-চুপি কলমটা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলে সুকুর খুব সুনাম। ফাদার হপকিনস নাম রেখেছেন, নটি গুড বয়। ক্লাস চলছে। সুকুর দুরন্তপনাও চলছে। শুধু কলম নয়, আর একটা জিনিসও সুকু পকেটে করে সযত্নে নিয়ে গিয়েছিল। কৌটোর ভেতর একটা গুবরে পোকা। সুকুর ভয়ডর নেই। নিজের শোবার ঘরে একটা কাঁচের জারে বেশ কিছুদিন একটা ইঞ্চি ছয়েক মাপের তেঁতুলে বিছে ধরে রেখেছিল। লাল টকটকে। দেখলেই ভয় করে। কী করে, কী কায়দায় ধরেছিল সুকুই জানে। কেন ধরেছিল সুকুই বলতে পারে। রুকু ভয়ে ঘরে ঢুকতে পারে না। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ও আপদটাকে জোটালি কোথা থেকে?"

সুকু বলেছিল, ''বাগান থেকে। তোমরা তো বাগানে কেবল ফুল আর গাছই দেখ। আরও কত কী আছে জানো? এটা তার একটা।''

"আমার জেনে কাজ নেই। টেবিলে রেখেছিস কী জন্যে? যদি বেরিয়ে আসে!''

"জুলজি হচ্ছে মা। এরপর দেখবে সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়াবিছে, কেন্নো, ঘুরঘুরে সব ধরে আনব। কাচের জারে পাশাপাশি সাজানো থাকবে। তোমাদের ধারণা ওরা শুধু কামড়াবার জন্যেই জন্মায়। না মা, ভুল ধারণা। ওরাও পোষ মানে।"

রুকু মাকে বলেছিল, "মা, আমার শোবার ঘরটা আলাদা করে দাও। চিড়িয়াখানায় শোবার সাহস আমার নেই।"

ঘর আলাদা করতে হল না। বিছে কী খেয়ে বেঁচে থাকে

জানা না থাকায় সুকু সেটাকে আবার বাগানে ছেড়ে দিয়ে এল। রুকু বলল, "ভগবান বাঁচিয়েছেন।"

সুকু বলেছিল, "ভগবান বেশি দিন তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না দাদা। না খেয়ে মরে যাবে, তাই ছেড়ে দিয়েছি। ফাদার ডাইসন বিছের খাদ্যতালিকা তৈরি করছেন। সেটা হাতে এলেই এ ঘরে আমি বিছেদের প্যারাডাইস বানাব। অ্যাকোয়া-রিয়ামের মতো বিছেরিয়াম। এই এতবড় একটা কাচের বাক্স তলায় পুরু বালি বিছোন। তার ওপর তেতুঁল বিছে, সরস্বতী বিছে, কাঁকড়া বিছে, থাউজ্যান্ড অ্যান্ড ওয়ান টাইপ অব বিছে। বিছেদের চেহারা দেখেছ, ভয়ঙ্কর সুন্দর! দেখলে যেমন ভয় করে, ভালবাসতেও ইচ্ছে করে।''

রুকু জানে সুকুটা যা বলে তাই করে। ভয়ে দুবার ঢোঁক গিলে আর কথা বেশি বাড়তে দেয়নি। খেয়াল কাটলে ভাল, না কাটলে মাথার কাছে বিছেরিয়াম নিয়ে আতঙ্কে জেগে রাত কাটাতে হবে। বাবাকে বললে, হাতে হাত ধরে বলবেন, "বি ব্রেভ মাই বয়।'' সুকুর পিঠে দুবার চাপড় মেরে বলবেন, "বি কেয়ার-ফুল ইউ ডাকু। দে আর ডেঞ্জারাস।"

সুকু গুবরে পোকাটা বাগানের একটা বড় গাছের ফোকর থেকে সংগ্রহ করেছিল অতি কষ্টে। স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল, ক্লাসে কারুর গায়ে ছেড়ে দিয়ে কোনোরকম অসভ্যতা করার জন্য নয়। বাড়িতে রেখে গেলে পাছে মা কোথাও পাচার করে দেন সেই ভয়ে। পোকাটা যাতে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে এই রকমেরই একটা কৌটো সে সংগ্রহ করেছিল বাবার ওষুধের আলমারি থেকে। ভিটামিন বিসকুটের চ্যাপটা রঙচঙে কৌটো। ক্লাসে কৌটোটা সে বইয়ের ব্যাগ থেকে বের করে বেঞ্চের ওপর রেখেছিল। রেখে মন দিয়ে পড়া শুনছিল। মাঝেমাঝে অবশ্য একটু অন্যমনস্ক হচ্ছিল। না হয়ে উপায় ছিল না। অতবড় শক্তিশালী একটা গুবরে পোকা শরীরের আকারের তুলনায় আধারটা তেমন বড় নয়। তার ওপর ছিল বাগানে, এখন বন্দী। বন্দী হয়ে থাকতে কার ভাল লাগে। সকলেই মুক্তি খোঁজে। কৌটোর ঢাকনাটা মাঝে মাঝে ওপর দিকে অল্প অল্প লাফিয়ে উঠছে। সুকু হাত দিয়ে চেপে চেপে দিচ্ছে।

পাশেই বসে ছিল মেরি আলভা। ব্যাপারটা সে লক্ষ করছিল। কৌতূহল চাপতে না পেরে সে একসময় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "মাস্ট বি ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড লিভিং ভিটামিন বিসকিটস।"

সুকু ফিসফিস করে বললে, "ইয়েস, স্পেশ্যালি প্রিপেয়ার্ড ফর মি।"

ফাদার হপকিনস ডায়াস থেকে মৃদু একটু ধমক দিলেন, "বি অ্যাটেনটিভ মাই বয়েজ। আই রেসপেক্ট ইউ অল অ্যান্ড বি রেসপেকটেবল।" ফিসফিস বন্ধ হয়ে গেল।

সুকু খাতায় নোট নিচ্ছিল বাবার পার্কার কলম দিয়ে। হাতের লেখাটা যেন কলমের গুণে ভীষণ খুলছে! কলমটাকে মোটেই টানতে হচ্ছে না, কলমই হাত টেনে নিয়ে চলেছে।

আলভা আড়চোখে কলমটাও দেখে নিয়েছে। ফাদার ব্ল্যাক-বোর্ডের দিকে পিছন ফিরতেই আলভার মাথাটা সুকুর দিকে কাত হল, "অ্যা নিউ পেন!"

"ইয়েস, পার্কার ফিফটি ওয়ান।''

"মাই গড। ভেরি, ভেরি কস্টলি।''

ফাদার ক্লাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "ইয়েস, দিস ইজ ইওর আর্থ, এই হল তোমাদের পৃথিবী, অ্যান্ড দেয়ার ইজ ইওর মুন। এইবার তোমরা বলো, পৃথিবী থেকে চাঁদে একটা রকেট পাঠাতে হলে তার স্পীড...''

ফাদার তাঁর প্রশ্ন শেষ করার সময় পেলেন না। সুকুর বেঞ্চি
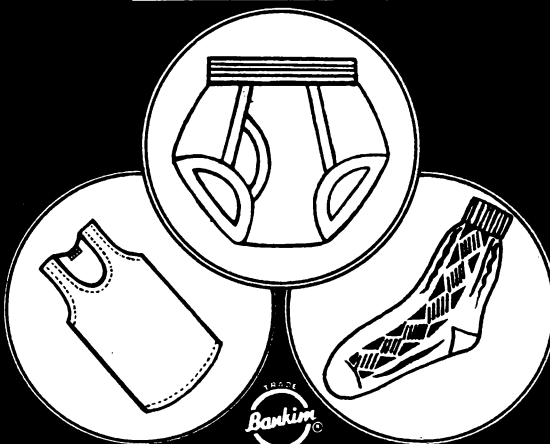
থেকে রকেটের বেগে গুবরে পোকাটা সোজা উড়ে গেল ব্ল্যাক-বোর্ডের দিকে। যাবার সময় ফাদার হপকিনসের কানের পাশ দিয়ে একটা পথ করে নিল। ফাদার ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। ভয় পাননি তবে চমকে উঠে কানের পাশে একটা চাপড় মারতেই গোল্ড ফ্রেমের শৌখিন চশমাটা নাক থেকে সামনের টেবিলের ওপর ছিটকে পড়ল। গুবরে পোকাটাও বোর্ডে মোক্ষম একটা ঢুঁ মেরে তার যা স্বভাব, চিত হয়ে উল্টে রইল প্ল্যাটফর্মে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ।

ফাদার চশমাটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে নেড়েচেড়ে চোখে দিয়ে বললেন, "ফরচুনেটলি সেভড। তোমাদের পাঠানো রকেট টার্গেট মিস করেছে। বাট হোয়াট ইজ দি মিসাইল !লেট মি সী।"

ফাদার হেঁট হয়ে বস্তুটিকে দেখলেন। "ও মাই গড! অ্যান ইন্টারেস্টিং ইনসেক্ট। আমার মনে হয়, ও ফাদার ডাইসনের ক্লাস ভেবে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল।" ফাদার পা দিয়ে পোকাটাকে সোজা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুকু রেগে গেছে। আলভার কাজ। সুকু যখন চাঁদে যাবার রকেটের স্পীড ঠিক করছিল, ঠিক সেই সময় আলভা নিশ্চয়ই কৌটোর ঢাকনাটা খুলেছিল। মেয়েলি কৌতূহল। ফাদার ডায়াস থেকে রিলে করছেন, "চিত হয়েই হাত-পা ছুঁড়ছে, তোমরা ফাদার ডাইসনকে বলবে, আই হ্যাভ অবজার্ভড ইটস নেচার, দিস কাইন্ড অব ফিউরিয়াস ইনসেক্ট নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভীষণ অপছন্দ করে। একটু আয়েসি আছে। এ লিটল বিট অব লেথার্জিক। শুয়ে শুয়ে চলাফেরা করতেই ভালবাসে।"

হঠাৎ পোকাটা ভোঁ করে টেবিলের পাশ দিয়ে ক্লাসের দিকে উড়ে এল। মনে হয়, ফাদারের অনেকক্ষণের চেষ্টায় হঠাৎ সোজা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভয়ই বেশি। সবাই হাঁউ-মাঁউ করে এমন একটা কান্ড করল, বেনচ, ডেস্ক উলটে পালটে লন্ডভন্ড কান্ড। ফাদার বলছেন, "ইয়েস, টেল ফাদার ডাইসন, ইট হ্যাজ অল দি কোয়ালিটিজ অব এ জেট প্লেন. জেট প্লেনের মতো উড়তে পারে।"

আলভা ভয়ে সুকুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুকু রেগে গেছে, "ইট ইজ ইউ। তোমার জন্যে, তোমার জন্যে আমার ওই মহামূল্য সংগ্রহ জানলা গলে বেরিয়ে গেল। আই ডোন্ট নো। তুমি আমার পোকা ফিরিয়ে এনে দাও। আই ডোন্ট নো।"

শেষের 'আই ডোণ্ট নো'-টা সুকু এত জোরে বলেছে ফাদার শুনে ফেলেছেন। সুকু রাগের চোটে আলভার মাথার চুল ধরেও টেনেছে। আলভা দু-হাতে সুকুকে ধরে আছে জাপটে, অথচ অভিমানে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কান্না জড়ানো গলায় বলছে, "হাও ক্যান আই গিভ ইউ ব্যাক অ্যান আগলি ইনসেক্ট? তুমি তার বদলে আমার ব্যাগ থেকে অন্য যা খুশি নিয়ে নাও।"

ফাদার ডায়াস থেকে বললেন, "হ্যালো বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, অল ক্লিয়ার। আর এয়ার রেডের চানস নেই। সুকু, তুমি অত উত্তেজিত কেন? আলভা, তোমার অত দুঃখ কেন?"

সুকু উঠে দাঁড়িয়েছে, "ফাদার, আমি বাইরে যেতে চাই। প্লিজ অ্যালাও মি। ওই পোকাটা আমার।"

পোকা! ডোন্ট সে পোকা। বলো বম্বার। ওটা তোমার পোকা! হাও ফানি!"

"ইয়েস ফাদার, সকালে অনেক চেষ্টা করে বাগান থেকে ধরে কৌটোয় ভরেছিলুম, এই আলভা ওকে ছেড়ে দিয়েছে।"

"আলভা, তুমি প্রিজনারকে মুক্তি দিয়েছ কেন?"

আলভা উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখে জল। ফাদার জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াই? ইউ আর ক্রাইং, মাই ল্যাস!"

"ফাদার, ওকে আমি কত ভালবাসি! তবু ও আমার চুল ধরে টেনেছে।"

"আগে টেনেছে না পরে টেনেছে?"

"পরে, এই মাত্র।"

"তুমি কী ভাবে এটা সম্ভব করলে?"

"ফাদার, ভিটামিন বিসকুটের টিনে পোকাটা ছিল। ঢাকনাটা মাঝে মাঝে লাফাচ্ছিল, সো আই আস্কড, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট সুকু? হি সেড, পাওয়ারফুল ভিটামিন বিসকিটস। হোয়েন হি ওয়াজ বিজি উইথ ইউ, আমি আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুলতেই, ইট জাম্পড আউট অ্যান্ড হিট দি ব্ল্যাক বোর্ড।"

"হিট দি ব্ল্যাক বোর্ড।" আলভার গলা নকল করে সুকু ভেঙচি কাটল।

ফাদার সুকুকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, "সুকু, সুকু, তুমি অত্যান্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করছ। তোমার সহপাঠিনী ভীষণ ভয় পেয়েছে। তুমি ক্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখো, যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ওই দেখো, রঞ্জন এখনও ডেস্কের তলায় চাপা পড়ে আছে। লেট আস রেসকিউ হিম।"

ক্লাসটাকে সকলে মিলে মেরামত করতে করতেই পিরিয়ড শেষ হয়ে গেল।

সুকু যথাসময়ে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এল না দামী কলমটা। সারাদিনের উত্তেজনায় কলমের কথা সুকু ভুলেও গিয়েছিল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সুকুর বাবা লেখার টেবিলে বসে আবিষ্কার করলেন, কলমটা নেই। প্রথমে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। না, তিনি জানেন না। বই পড়ছিলেন। উঠে এসে, টেবিলের ড্রয়ার, টেবিলের ওপর, জামার পকেট, ডাক্তারি ব্যাগ সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কলম পাওয়া গেল না।

"রুকু, তুমি জান?"

রুকু জানে না। সত্যিই সে জানে না। না বলে বাবার কোনো জিনিসে সে হাত দেয় না। সুকুকে ডাকা হল। সন্ধে থেকেই সে ভয়ে ভয়ে ছিল। সুকু বলল, জীবনে সে ওইরকম কলম দেখেইনি। হাত দেওয়া তো দূরের কথা।

ডক্টর মুখার্জি হাসিহাসি মুখে বললেন, "কলমটা বড় কথা নয়, বড় কথা, দুঃখের কথা হল তোমাদের দুজনের মধ্যে যে-কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছ।"

সুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, "তা হলে দাদা। ও সকালে মাকে বলছিল ওর কলমের নিবটা ভেঙে গেছে।"

রুকুর কলমের নিব সত্যিই ভেঙে গিয়েছিল।

রুকু প্রতিবাদ করল, "আমার কলমের নিব ভেঙে যাওয়ার মানেই কি বাবার কলম নেওয়া, নিয়ে অস্বীকার করা! অপূর্ব তোর যুক্তি সুকু!"

"ঠিক আছে রুকু, তুমি যদি নিয়েই থাকো, প্লীজ সত্যি কথা বলো। আমি কলম চাই না, আমি সত্যি কথা চাই।"

"তুমি জানো বাবা, আমি মিথ্যে কথা বলি না। সেবার তোমার দামী অ্যাশট্রেটা ভেঙে ফেলেছিলুম, কই আমি তো অস্বীকার করিনি!"

"দ্যাটস ট্রু।"

সুকু বললে, "সেটা সকলের চোখের সামনে হয়েছিল, অস্বীকার করার উপায় ছিল না!"

রুকু বললে, "তা হলে আর একটা ঘটনার কথা বলি, বাবার বিলিতি গ্যাসলাইটারটা আমি একবার খারাপ করে ফেলেছিলুম। কেউ দেখেনি। আমি চেপে যেতেও পারতুম। চাপিনি। বাবা আসতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছিলুম।"

ডঃ মুখার্জি বললেন, "ইয়েস দ্যাটস ট্রু। তাহলে আজকের ঘটনায় কে মিথ্যে কথা বলছ? কে দুর্বল হয়ে পড়েছ? কার মর‍্যাল সিঙ্ক করেছে? সত্য নিয়ে বুক ফুলিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছ?"

রুকু সহজেই বলতে পারত সুকু। কিন্তু বলল না। কারুর

NOVA

বাঃ
আর কি
না
বলা যায় ?

ঘাড়ে সে দোষ চাপাতে চায় না। যদিও সকুর ব্যবহারে সে খুব দুঃখ পেয়েছে।

শোবার ঘরে সকু কয়েকবার দাদার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে। রকু একটাও জবাব দেয়নি। শুধু একটা কথাই বলেছে, "আমার সঙ্গে তুই কোনোদিন কথা বলবি না। আমি তোকে ডিসলাইক করি।"

সেই থেকে সকু বারবার একটা সুবকই পড়ছে। কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। লাইনের পর লাইন চোখের সামনে অর্থহীন কালো কালো শব্দ!

Far over the misty mountains grim
To dungeons deep and caverns dim
We must away, ere break of day
To win our harps and gold from him.

সকুর মনে হল সে নিজেই গল্পের বামনদের মতো ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে! মনে কোন সুখ নেই।

বাগানের দিকের খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুর করে পশ্চিমের হাওয়া আসছে। পাতার শব্দ। দূরে পালামৌ হিলসের বনে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ঢেউ খেলানো আলোর রেখা আকাশের গায়ে। চার্চের চুড়ো, তার মাথার উপর উজ্জ্বল একটা তারা।

জানালার বাইরে থেকে কে যেন মিষ্টি ভারী গলায় ডাকলেন, "রকু, সকু, মাই সানস।"

সকু চমকে উঠেছিল। জানালায় একটি মুখ। বুকের ওপর সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। ফাদার ডাইসন। সকু ধড়মড় করে উঠে বসল, "ফাদার আপনি?"

"ইয়েস মাই সান। তুমি কী পড়ছিলে?"

"অ্যান আনএকসপেকটেড পার্টি।"

"ওঃ হো। রকু ঘুম।"

সকু ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ফেলল।

"হোয়াট ইজ দিস! তুমি কাঁদছ কেন?"

"ফাদার। আমি মিথ্যেবাদী। আই অ্যাম এ লায়ার।"

"নো নো মাই সান। চিলড্রেন অব গড কান্ট বি লায়ারস।"

সকু কান্না জড়ানো গলায় বলল, "হ্যাঁ ফাদার, আমি মিথ্যেবাদী! আমি মিথ্যে কথা বলেছি।"

ফাদার জানালার বাইরে থেকে সকুর মাথায় একটা হাত রাখলেন, "গডস ব্লেসিংস।"

সকু ফাদারের হাত স্পর্শ করে বলল, "ফাদার, আমি খারাপ হয়ে গেছি। আমার মর‍্যাল ভেঙে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছে।"

"ইউ টেল মি দি হোল ফ্যাক্ট। আমি সবটা শুনতে চাই। আমি পোকামাকড় ধরতে বেরিয়েছিলুম, ভাবলুম, তোমাদের দুজনকে জানালা দিয়ে গুডনাইট করে যাই, বলে যাই হ্যাপি ড্রীমস। বাট ইউ আর সো আনহ্যাপি।"

সকু কাঁদো-কাঁদো গলায় সারাদিনের ঘটনা ফাদারকে বলে গেল। বাবার পেন হারানো, অস্বীকার করা।

ফাদার বললেন, "তোমার পেন নিশ্চয়ই ক্লাসরুমে পড়ে আছে, কোনো ডেস্কের তলায়।"

"ফাদার। আলভা নেয়নি তো!"

"ও, নো নো। তা হতেই পারে না। শি ইজ এ গুড গার্ল। তোমাকে একটা কথা বলি, অপরকে সন্দেহ করার আগে নিজেকে সন্দেহ করবে। লুক অ্যাট দোজ হিলস, ট্রিজ, ভাস্ট স্কাই, পৃথিবী যত বড় তার চেয়েও অনেক অনেক বড় করবে তোমার মনকে। ক্ষুদ্র মন আমাদের সব অসুখ, সব যন্ত্রণার জন্যে দায়ী। ইউ উইল সী। কাল সকালেই তোমার বাবার কলম বেরোবে কোনও ডেস্কের তলা থেকে।"

সকু পাহাড়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এল ফাদারের মুখের ওপর। সোনালি ফ্রেমের চশমা আলো পড়ে চকচক করছে সাদা ধবধবে মুখে। সাদা পোশাক।

ফাদার বললেন, "রকুকে ডাকো। ওর ঘুম এখনও তেমন গভীর হয়নি। রকু রকু।"

রকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। প্রথমে বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল ভোর হয়েছে। ঘরে টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলো, বাইরে কালো আকাশ, জানালায় সাদা মূর্তি।

"কাম হিয়ার রকু। তোমার ভাইয়ের খুব দুঃখ হয়েছে। তুমি ভাব করে নাও।

"বাট ফাদার, ও মিথ্যেবাদী।"

"নো, নো, রকু ও সেই সময়টায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখন ওর আমিটা সবল হয়েছে। নাও হি উইল কনফেস হিজ গিল্ট। সকু, তুমি এখনই তোমার বাবার কাছে গিয়ে সত্য কথা বলে ক্ষমা চাইবে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তোমাদের সুখী দেখে তবেই ওই দূর জঙ্গলে যাব আমার নকটারন্যাল ভিজিটে।"

রকু বললে, "হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম ইন ফাদার ফর এ হোয়াইল।"

"পাগল ছেলে, দি হাউস ইজ নট প্রিপেয়ারড ফর এ ভিজিটার অ্যাট দিস টাইম অব দি নাইট। গো মাই বয়েজ।"

বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। খুব মৃদু সুরে বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন। বড় করুণ সুর। সকুর চোখে আবার জল এসে গেল। রকু সকুর পিঠে হাত রেখে বললে, "কাঁদছিস কেন পাগল ছেলে!"

সকু ধীরে ধীরে দরজায় কয়েকবার টোকা মারল। বেহালা থেমে গেল। দরজা ভেজানো ছিল, হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল, "বাবা, আমি সকু।"

"বাবা, আমি রকু।"

"আরে এসো এসো, টু গ্রেট ফাইটার্স। তোমরা এখনও ঘুমোওনি।"

সকু সোজা বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, "বাবা, আমি তোমার কলমটা নিয়েছিলুম।"

সকু কথা শেষ করতে পারল না, বুক ঠেলে কান্না আসছে।

"আমি জানতুম, আমি জানতুম, মাই সানস আর গ্রেট। দে আর নট ক্রিপলড।"

সকুর মাথাটা বিশাল বুকে চেপে ধরলেন।

"কলমটা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি বাবা।"

ওরা লক্ষ করেনি। ফাদার ডাইসন পায়ে পায়ে এ ঘরের জানালার বাইরে চলে এসেছেন। ফাদার বললেন, "কান্ট সে, হারিয়ে গেছে। আমার ধারণা ক্লাসরুমেই পড়ে আছে।"

"ফাদার।" ডক্টর মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন।

"ডক্টর, আই কান্ট মিস সাচ এ পিস অব সুইট ড্রামা।"

রকু, সকু ও তাদের বাবার অনুরোধে ফাদার ডাইসনকে ভেতরে আসতে হল। শুধু আসা নয়, বসতে হল। কফি এসে গেল। ফাদার বললেন, "লেট আস সেলিব্রেট দিস ভিকট্রি ওভার মিউজিক। সকুকে, রকুকে কে হারাবে! লেখাপড়ায়, চরিত্রে ওরা হবে গ্রেট, ভেরি ভেরি গ্রেট। ছোটখাট পরাজয় সব যুদ্ধেই হয়। কী বল মাই সানস।" ফাদার হাসতে থাকলেন। ফাদার হাতে তুলে নিলেন বেহালা। হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন, সুরে সুর মিলিয়ে,

The Sun was shining on the sea
Shining with all his might.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিকেল শেষ হয়ে গেছে, এখনো সন্ধে নামেনি। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত কাজলা-দিঘিতে নেমে কানের ফুটো দুটো আঙুল দিয়ে চেপে পরপর কয়েকটা ডুব দিলেন। তারপর উঠে এলেন তাড়াতাড়ি। অন্যদিন বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত সাঁতার কেটে একবার দিঘিটা এপার-ওপার করেন। কিন্তু আজ বেশ শীত, বেশিক্ষণ জলে থাকা যায় না।

ঘাটে উঠে এসে তিনি আকাশের দিকে দু'হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন। আকাশের পশ্চিম দিকে যেন আগুন ছড়িয়ে গেছে, মহা সমারোহে অস্ত যাচ্ছেন সূর্যদেব। পাখিরা ঝাঁক

ছবি সমীর সরকার

বেঁধে ফিরছে, দূরের কোনো-কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসছে শাঁখের আওয়াজ।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ভিজে কাপড়েই ঘাটের পৈঠায় বসে পৈতেটি ডান হাতে ধরে চোখ বুজে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বসলেন। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত খুব সুপুরুষ, ঘিয়ের মতন গায়ের রং, ছ' ফুটের বেশি লম্বা। দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথার চুলও নেই, মাথার মাঝখানে শুধু এক গোছা চুলের টিকি। তাঁর বয়েস সাতাশ বছর।

আহ্নিক শেষ হবার পর বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত শুনতে পেলেন গ্রামের একদিক থেকে কিসের যেন একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে। তিনি সেইদিকে তাকিয়ে কান পেতে আওয়াজটা বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না, কারা যেন চ্যাঁচামেচি করছে খুব। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ভাবলেন, আবার হয়তো একটা বাঘ ঢুকে পড়েছে গ্রামে। সুন্দরবন থেকে প্রায়ই দুটো-একটা বাঘ ছিটকে চলে আসে এদিকে।

বাঘের কথা ভেবে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত একটু চঞ্চল বোধ করলেন। বাঘ মারায় তাঁর খুব উৎসাহ। বামুন পণ্ডিতের ঘরের ছেলে হলেও তিনি ছেলেবেলা থেকেই কুস্তি আর লাঠি খেলায় খুব ওস্তাদ। বর্শা ছুঁড়ে হরিণ শিকার করায় তিনি ওস্তাদ। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে তিনি দু'বার দুটি বাঘ মেরেছেন।

কিন্তু এখন তাঁর যাওয়া চলবে না। এখন তাঁর অন্য কাজ আছে।

তিনি ভিজে কাপড় বদলে একটি গরদের কাপড় পরে নিলেন। তারপর পৈতেটা চিপড়োতে লাগলেন। মাথা মোছার কোনো ব্যাপার নেই, গায়েও জল লেগে রইল। এই শীতের মধ্যেও তাঁর খালি গা। ভিজে কাপড়টা পুকুরের জলে ধুয়ে এনে তিনি মেলে দিলেন ঘাটের ওপর, দু'দিকে দুটি গাছের ডাল চাপা দেওয়া রইল। তারপর তিনি এগোলেন মন্দিরের দিকে।

শিবমন্দিরটি গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। গ্রামের নামও শিবতলা। কয়েক পুরুষ ধরে বিশ্বেশ্বররাই এই মন্দিরের পূজারী। ছেলেবেলায় বিশ্বেশ্বরের দুরন্তপনা দেখে অনেকে ভেবেছিল, এ ছেলে বড় হয়ে নিশ্চয়ই পুরুতের কাজ করবে না। কিন্তু কয়েক বছর আগে বিশ্বেশ্বরের বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। এ গ্রামে আর একজনও ব্রাহ্মণ নেই, তাই বিশ্বেশ্বরকে বাধ্য হয়েই পুজো করার ভার নিতে হল। ঠাকুরের পুজো তো বন্ধ থাকতে পারে না! গ্রামের লোকেরা এখন তাঁকে বিশু ঠাকুর বলে ডাকে।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত মন্দিরের সামনে এসে একটু অবাক হলেন। মন্দিরের দ্বার খোলা, ভিতরে প্রদীপ জ্বালা হয়নি। সেখানে কেউ নেই।

তিনি ডাকলেন, ''কুড়ানি! কুড়ানি!''

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

তিনি গলা চড়িয়ে আরও কয়েকবার ডাকলেন কুড়ানিকে তবু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

এ রকম তো কখনো হয় না। কুড়ানি নামের মেয়েটি প্রতিদিন এই সময় মন্দিরের দরজা খুলে সামনেটা ধোয়া-মোছা করে, প্রদীপ জ্বালে, চন্দন ঘষে রাখে, ফুল তুলে আনে। এই মেয়েটি নদীতে ভাসতে-ভাসতে একদিন এই গ্রামের কাছে এসে লেগেছিল। বিশু ঠাকুরই তখন ওকে বাঁচান। মেয়েটি বোবা। তখন ওর বয়েস ছিল ছ-সাত বছর, এখন দশ এগারো। মেয়েটি কারুর বাড়িতে থাকতে চায় না। গ্রামের কয়েকজন গৃহস্থ ওকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে দিঘির পাড়ে একলা বসে-বসে অদ্ভুত শব্দ করে কাঁদে।

লোকে ওর নাম দিয়েছে কুড়ানি। এই মন্দিরের কাছেই ও এখন থাকে. পুজোর প্রসাদ খায়।

বিশ্বেশ্বর মন্দিরের এদিক-ওদিক ঘুরে কুড়ানির নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। হঠাৎ যেন একটু দূরের একটা ঝোপ থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে এল।

মন্দিরটি বহু দিনের পুরনো, চারপাশে অনেক আগাছার জঙ্গল। কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর নেই। অন্ধকার হয়ে এসেছে, দূরের কিছু দেখা যায় না। বিশ্বেশ্বরের মনে হল, শব্দটা আসছে শিউলি গাছগুলোর কাছ থেকে। এক সময় ওখানে একটা বাগান ছিল বোধহয়, এখন সবই জঙ্গল। তার মধ্যে কয়েকটি শিউলি আর স্থলপদ্ম আর একটি লঙ্কা-জবার গাছ এখনো রয়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বর চট করে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে চকমকি পাথর ঠুকে প্রদীপ জ্বালালেন। তারপর সেই প্রদীপটি নিয়ে চলে এলেন শিউলি গাছগুলোর দিকে।

সেখানে এসে প্রদীপের কাঁপাকাঁপা আলোয় দেখলেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে কুড়ানি। বেতের ডালিতে সে ফুল তুলেছিল, সেই ফুল তার মাথার কাছে ছড়ানো। বিশ্বেশ্বরের প্রথমেই মনে হল, কুড়ানি মরে গেছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, হায় হতভাগী!

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে কুড়ানির একটা হাত তুলে নিলেন। এখনও গরম আছে। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলেন, একটু-একটু নিশ্বাস পড়ছে। তারপরই তিনি আর একটা বড় নিশ্বাস শুনলেন। কে যেন পাশ থেকে ফোঁস করে উঠল।

বিশ্বেশ্বর চট করে প্রদীপটা তুলেই দেখলেন, কুড়ানির পায়ের কাছেই একটা বেশ বড় গোখরো সাপ পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ বিশ্বেশ্বর ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। কুড়ানিকে কামড়ে বিষ ঢালার পর নিস্তেজ হয়ে এসেছে সাপটাও। বিশ্বেশ্বরকে দেখে একবার ফণা তুলে ফোঁস করে আবার নেতিয়ে পড়ল।

বিশ্বেশ্বর ভাবলেন, এখনো কুড়ানিকে বাঁচাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু কুড়ানিকে তুলতে গেলে যদি সাপটা আবার তাঁকে কামড়ায়? সাপকে কিছু বিশ্বাস নেই। এই ফুলগাছটার কাছে সাপটাকে তিনি আগেও দেখেছেন দু' একবার। যেখানে সুন্দর জিনিস থাকে, সেখানেও এত ভয়ঙ্করের ঘোরাফেরা। কুড়ানি নিশ্চয়ই অন্ধকারে সাপটার গায়ে পা দিয়ে ফেলেছিল।

হাতের কাছে লাঠি নেই। অথচ দেরি করবারও উপায় নেই। বিশ্বেশ্বর দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাপটার লেজটা ধরে ফেলেই উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন। বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। সাপটা আর বাঁচবে না। বিশ্বেশ্বর নিজে আগে কখনো এভাবে সাপ মারেননি। কিন্তু নদীর ধারে জেলেদের দেখেছেন এইভাবে সাপ ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে। সামান্য একটু দেরি হলেই সাপটা তাঁকে কামড়ে দিতে পারত। শীতের মধ্যেও বিশ্বেশ্বরের গায়ে ঘাম এসে গেল।

এর পর বিশ্বেশ্বর কুড়ানিকে কোলে তুলে এনে মন্দিরের পরিষ্কার চাতালে শুইয়ে দিলেন। সাপটা কতক্ষণ আগে কুড়ানিকে কামড়েছে কে জানে! তবু এক্ষুনি দড়ির বাঁধন দেওয়া দরকার। দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দ্রুত চিন্তা করে বিশ্বেশ্বর ছুটে গেলেন দিঘির ধারে। তাঁর যে ভিজে কাপড়টা মেলে দিয়েছিলেন, সেটাই তুলে নিয়ে ছিঁড়তে লাগলেন ফালা ফালা করে।

সেই সময় গ্রামের ভেতরের গোলমালটা অনেক বেশি বেড়েছে, কারা যেন কাঁদছে, কারা দৌড়াদৌড়ি করছে। সূর্য ডুবে গেলেও পশ্চিমের আকাশ আগুনের মতন লাল।

কিন্তু সেইদিকে মন বা কান দেবার সময় নেই বিশ্বেশ্বরের। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বাঁধন দিতে লাগলেন কুড়ানিকে।

ওর ডান পায়ে কামড়েছে সাপটা। পর পরে কয়েকটা বাঁধন খুব কষে দেওয়ায় কুড়ানি একবার গোঙানি দিয়ে উঠল। এই সময় কুড়ানিকে জাগিয়ে রাখা দরকার বলে তিনি চাপড় মারতে লাগলেন কুড়ানির গালে।

কয়েকজন লোক দুদ্দাড় করে ছুটে এল মন্দিরের সামনে। অসম্ভব ভয় পাওয়া গলায় তারা চিৎকার করে উঠল, "বিশু ঠাকুর, পালাও! পালাও! হার্মাদ এসেছে!"

তারা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না! হুড়মুড় করে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে।

হার্মাদ শুনে বিষম চমকে উঠলেন বিশ্বেশ্বর। হার্মাদের কথা তিনি শুনেছেন, সবাই শুনেছে, কিন্তু এদিকে তো কখনো হার্মাদ আসেনি। এই হার্মাদ জলদস্যুরা অসম্ভব নিষ্ঠুর, অসম্ভব হিংস্র, সামান্যতম দয়ামায়াও এদের নেই। এরা মা-বাবার সামনে সন্তানকে এক কোপে কেটে ফেলতে পারে। তার পরও আবার হা-হা করে হাসে।

আরও কিছু লোক ছুটে এল এদিকে, তারাও ঐ এক কথা বলল, "পালাও! পালাও। বিশু ঠাকুর, পালাও।"

প্রাণ বাঁচাতে গেলে বিশ্বেশ্বরের এখন পালানোই দরকার। কিন্তু কুড়ানিকে নিয়ে কী করবেন? কুড়ানি এখনো বেঁচে আছে, তাকে কি এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যায়? এক্ষুনি কুড়ানির ক্ষতস্থানটা চিরে দিয়ে আগুনে সেখানটা পোড়ানো দরকার, নইলে কুড়ানি বাঁচবে না। কুড়ানিকে ফেলে দিয়েই বা তিনি কতদূর পালাতে পারবেন?

বিশ্বেশ্বর কুড়ানিকে পাঁজাকোলা করে তুলে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে এলেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। হার্মাদ আসুক বা যে-ই আসুক একজনের প্রাণ বাঁচানোই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। ঠাকুরের পুজোরও দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা দেরি হোক. তার থেকেও বড় কুড়ানিকে বাঁচিয়ে তোলা।

তিনি ফলমূল কাটার ছোট ছুরিটা দিয়ে চিরে দিলেন কুড়ানির পায়ের ক্ষতটা। তারপর প্রদীপের আগুনে আর-একটা সলতে ধরিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে ছেঁকা দিতে লাগলেন সেই ক্ষতস্থানে। এরকম কয়েকবার করার পর কুড়ানি একবার যন্ত্রণায় গুমরে উঠল। তাতে আশা হল বিশ্বেশ্বরের। তিনি কুড়ানির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগলেন, "এই কুড়ানি! কুড়ানি! আর ভয় নেই! ওঠ্! চোখ মেলে দ্যাখ!"

সাপে-কাটা মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে বা অজ্ঞান হয়ে গেলে তাদের শরীরে বিষ আরও ছড়িয়ে যায়। সেইজন্য বিশ্বেশ্বর খুব চেষ্টা করতে লাগলেন ওকে জাগিয়ে তোলার। কুড়ানি বোবা হলেও কানে শুনতে পায়। কথাবার্তাও অনেক বুঝতে পারে।

এইভাবে কিছু সময় কাটল। মাঝে-মাঝে বিশ্বেশ্বর বাইরে কিছু লোকের ছোটাছুটির আওয়াজ পেলেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বর কুড়ানিকে নিয়েই ব্যস্ত।

একসময় দুমদাম করে মন্দিরের দরজায় ধাক্কা পড়ল। বিশ্বেশ্বর ভাবলেন. নিশ্চয়ই গ্রামবাসীরা কেউ কেউ এই মন্দিরে আশ্রয় নিতে চাইছে। হার্মাদরা লুটপাট করতে আসে, এই পুরনো ভাঙা শিবমন্দিরে তারা কিছুই পাবে না। ফিরিঙ্গি হলেও হার্মাদরা জানে কোন্ মন্দিরে কী পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

বাইরে থেকে কিছু দুর্বোধ চিৎকার ভেসে এল।

বিশ্বেশ্বর বললেন, "দরজা খোলা হবে না! এখানে কেউ আসতে পারবে না!"

এবার দরজায় আরও জোরে ধাক্কা পড়ল। মনে হয়, কারা যেন বাইরে থেকে দরজাটা ভেঙে ফেলতে চাইছে!

মন্দিরের মধ্যে আর লুকোবার জায়গা নেই. অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবারও পথ নেই। শিবলিঙ্গের পিছনে একটা ত্রিশূল গোঁজা আছে, বিশ্বেশ্বর এক টানে তুলে নিলেন সেটা। বামুন পণ্ডিত হলেও তিনি সাহসী সবল পুরুষ, লড়াই না দিয়ে মন্দিরের অধিকার ছাড়বেন না।

পুরনো দরজা, মড়মড়াত করে সেটা ভেঙে পড়ল একটু-ক্ষণের মধ্যেই। বিশ্বেশ্বর ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন, "সাবধান!"

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি ত্রিশূলটা ফেলে দিলেন পায়ের কাছে।

তিনি দেখলেন প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ফিরিঙ্গি দস্যু দাউ দাউ করে জ্বলা মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একেবারে সামনে যে, সে-ই নিশ্চয়ই ওদের দলপতি, সে প্রায় তিনজন মানুষের সমান মোটা আর তেমনি লম্বা। মুখ-ভর্তি লালচে রঙের দাড়ি, মাথায় একটা মস্ত গোল টুপি, গায়ে একটা চামড়ার কোট। দস্যুদের সকলের হাতে খোলা তলোয়ার, শুধু ওদের দলপতির হাতে লম্বা পিস্তল। সেই পিস্তল সে তাক করেছিল বিশ্বেশ্বরকে মারবার জন্য।

এদের সঙ্গে লড়াই করে কোনো লাভ নেই বুঝেই বিশ্বেশ্বর ত্রিশূলটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। কয়েকজন দস্যু ঢুকে এল মন্দিরের মধ্যে, ওদের সর্দার বিশ্বেশ্বরের গালে এক চড় মেরে বলল, "দরজা বন্ধ রেখেছিলি কেন রে কুক্কুরীর বাচ্চা?"

দস্যুসর্দারের হাতের এমনই জোর যে, সেই চড়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের ফর্সা মুখে পাঁচটা আঙুলের লাল দাগ দেখা দিল। রাগে অপমানে বিশ্বেশ্বরের সারা শরীর জ্বলে গেল। অথচ এখন রাগ দেখিয়েও কোনো লাভ নেই। তিনি বিনীতভাবে বললেন, "সাহেব. আমি একজন পুরুত বামুন, এই মন্দিরে কিছুই নেই—"

'চোপ' বলে দস্যুসর্দার পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে মারল বিশ্বেশ্বরের নাকে। সঙ্গে সঙ্গে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। বিশ্বেশ্বর চুপ করে গেলেন। এরা অকারণে নিষ্ঠুরতা দেখাতে ভালবাসে। বিশ্বেশ্বরের দারুণ ইচ্ছে হল, ঐ দস্যু-সর্দারের গালে একখানা প্রকাণ্ড চড় ও নাকে একখানা ঘুঁষি মারতে। কিন্তু তাহলে এখুনি ওরা তাঁকে খুন করবে। এত তাড়াতাড়ি মরে লাভ কী? বিশ্বেশ্বর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, বেঁচে থাকলে ঠিক এর শোধ নেবেন।

দস্যুরা মন্দিরের মধ্যে তছনছ করতে লাগল। দামি জিনিস কিছুই নেই। শুধু রয়েছে কয়েকটা বড় বড় পেতল-কাঁসার বাসন। সেগুলোই ঝনঝন করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বাইরে।

মাটিতে পড়ে থাকা কুড়ানিকে দেখে দস্যুসর্দার বলল, "এটা কী?"

বিশ্বেশ্বর বললেন, "সাহেব, ও অসুস্থ!"

দস্যুসর্দার পা দিয়ে জোরে ঠেলে দিল কুড়ানিকে। কুড়ানি কয়েক পাক গড়িয়ে গেল। সর্দার মশাল নিয়ে কুড়ানির মুখের কাছে ঝুঁকে দেখে বলল, "মেয়ে! চল্, একেও নিয়ে চল!"

দস্যুরা ঠেলাঠেলি করে বাইরে নিয়ে এল বিশ্বেশ্বরকে। কয়েকজন তাঁকে জাপটে ধরে হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর দাঁড় করিয়ে দিল এক পাশে। বিশ্বেশ্বর দেখলেন, সেখানে আরও কুড়ি-পঁচিশজন নারী-পুরুষ, তাঁরই মতন হাত-বাঁধা, বন্দী।

দস্যুরা কুড়ানিকেও চ্যাংদোলা করে এনে একটা বাঁশের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে দিল। তারপর সেই বাঁশটা বিশ্বেশ্বর ও আর একজন বন্দীর কাঁধে তুলে দিয়ে বলল, "চল্, কুত্তির বাচ্চারা সব চল এবার!"

সার বেঁধে বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দস্যুরা। এই অবস্থাতেও বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে ভাবলেন, দস্যুরা তাঁদের নিয়ে চলেছে কোথায়? দস্যুরা সাধারণত লুটপাট করেই চলে

ধায়, কয়েকজনকে খুনও করে, কিন্তু এক সঙ্গে এত লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের কী লাভ?

কয়েক পা যাবার পর পেছনের বন্দীটি বলল, "বিশু ঠাকুর, তুমিও পালাতে পারলে না?"

বিশ্বেশ্বর চমকে মুখ ঘোরালেন। পিছনের বন্দীটির সারা মুখ রক্তাক্ত, বুকের ওপর আড়াআড়ি তলোয়ারের কোপ পড়েছে মনে হয়। মুখ দেখে চেনা যায় না, কিন্তু গলার আওয়াজে চিনলেন। এর সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক খেলা করেছেন বিশ্বেশ্বর। এ-গ্রামের সবচেয়ে জোয়ান, ও খালি হাতে একবার একটা বুনো শুয়োর মেরেছিল।

বিশ্বেশ্বর বললেন, "নিতাই, তোর এই অবস্থা!"

নিতাই বলল, "ঠাকুর, আমার ডান কাঁধে বড় ব্যথা। সে কাঁধেই বাঁশটা চাপিয়েছে। একটু দাঁড়াও কাঁধটা বদলে নিই!"

বিশ্বেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুজনেরই হাত বাঁধা, বাঁশটা সরাবেন কী করে? নিতাই চেষ্টা করল, বাঁশটাকে কামড়ে ধরবার। অমানুষিক শক্তিতে সে কোনোক্রমে বাঁশটাকে দাঁতে চেপে সেই অবস্থাতেই বাঁশটাকে নিয়ে এল বাঁ কাঁধে। এর মধ্যে আবার পেছনের লোক ঠেলা মারছে।

যন্ত্রণায় হাঁফাতে হাঁফাতে নিতাই বলল, "ঠিক আছে, চলো ঠাকুর।"

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, জানিস?"

নিতাই বলল, "তাও জানো না? আমাদের বিক্রি করবে। তুমি বামুন, শেষ পর্যন্ত তুমিও ক্রীতদাস হবে! এর চেয়ে তুমি মরে গেলে না কেন?"

এই সময় একজন দস্যু তাদের দুজনের পিঠে চাবুক কষিয়ে বললো, "চোপ্, কোনো কথা নয়!"

যে সময়কার কথা বলছি, তখন দিল্লিতে রাজত্ব করছেন মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব। বাংলার তখন খুবই অরাজক অবস্থা। শাসন করবার কেউ নেই। অথচ বাংলা তখন সোনার বাংলা, মাঠে-মাঠে সোনার ফসল ফলে, পুকুর-নদীগুলোয় ভরা ভাল ভাল মাছ। বাঙালি তাঁতিরা খুব সুন্দর সুন্দর কাপড় বানায়। বাংলার গরুর দুধের স্বাদ যেমন মিষ্টি, তেমনি এই দুধ থেকে তৈরিও হয় অনেক রকম চমৎকার চমৎকার মিষ্টান্ন।

দূর-দূর দেশের লোকেরা বাংলাকে একটা সোনার দেশ বলে জানে, অনেকে নিজের চোখে দেখতে আসে। আবার বাংলার ধনরত্ন, সিল্কের কাপড় ও খাবার-দাবারের লোভে ছুটে এসেছে অনেক চোর-ডাকাত। স্থলপথে তবু মাঝে-মাঝে মোগল

সৈন্যের পাহারা থাকে, কিন্তু জলপথে ডাকাতদের কেউ আটকাতে পারে না। মোগল সৈন্যরা খুব বীর ছিল বটে, কিন্তু নদী বা সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যুদ্ধ করার বিদ্যে তারা ভাল জানত না। আর ইওরোপ থেকে যে-সব জাতি ব্যবসা করার জন্য বাংলায় এসেছিল, তারা সবাই জাহাজি-যুদ্ধে ওস্তাদ।

ইংরেজ, ফরাসি, স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগীজ, ডাচ (অর্থাৎ হল্যান্ডের লোক, বাংলায় তাদের বলা হত ওলন্দাজ) সবাই ব্যবসা করার জন্য এদেশে এসেছে, আবার তাদের মধ্যে কিছু-কিছু লোক ডাকাতিতেও নেমেছে। এই ডাকাতরা আর কিছুদিন বাদে আলাদা হয়ে রইল না, মিলেমিশে এক হয়ে গেল, তখন তাদের নাম হল ফিরিঙ্গি। একদল ফিরিঙ্গি ডাকাত বোম্বাইয়ের দিক থেকে পালিয়ে বাংলায় এসেছিল বলে তাদের নাম হল বোম্বেটে। স্পেনের বিখ্যাত জাহাজ-বাহিনীর নাম ছিল আর্মাডা, সেই নামটাও কী ভাবে যেন বদলাতে-বদলাতে বাংলায় হয়ে গেল হার্মাদ। এই হার্মাদ বললেও ফিরিঙ্গি জলদস্যু বোঝায়।

আমাদের গল্পের যখন শুরু, সেই সময় সবচেয়ে বড় ফিরিঙ্গি জলদস্যুর নাম ছিল সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও। এই লোকটি যেমন সাহসী, তেমন নিষ্ঠুর। দয়ামায়া বলে কিছু নেই এর প্রাণে। তলোয়ারের এক কোপে কোনো লোকের মাথা কেটে ফেলেও এই গঞ্জালেস হো-হো করে হাসতে পারে। সোনাদানার চেয়েও রক্ত দেখলে এর কম আনন্দ হয় না। এর ভাই অ্যান্টনিও ডি রেগোও নিষ্ঠুরতায় প্রায় দাদারই সমান-সমান। ওদের জাহাজগুলি ঝড়ের বেগে চলে, কখন কোথায় আক্রমণ করবে ঠিক নেই। হুগলি, সুন্দরবন, ঢাকা, চট্টগ্রামের লোকেরা এই গঞ্জালেস আর তার ভাইয়ের নামে ভয়ে কাঁপে।

আমাদের এই বাংলার পাশেই আর একটা ছিল ডাকাতের দেশ। সে দেশের নাম আরাকান। এই আরাকান নামে কোনো দেশ এখন আর নেই, এখন সেটা বার্মার সঙ্গে মিশে গেছে। তখন চট্টগ্রাম জেলার পাশেই ছিল এই আরাকান রাজ্য, সেখানকার লোকদের বলা হত মগ্। লুটপাট, ডাকাতি ও হিংস্রতার জন্য এরাও ছিল খুব কুখ্যাত। এখনো কোনো জায়গায় ন্যায়বিচার না থাকলে লোকে বলে, 'মগের মুল্লুক নাকি?'

ডাকাতে-ডাকাতে এক রকমের বোঝাপড়া থাকে। ফিরিঙ্গি বোম্বেটে আর মগ্ ডাকাতেরা নিজেদের মধ্যে জায়গা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে মগরা একটা জিনিস শিখেছিল, ক্রীতদাস বিক্রি করা। বাংলা থেকে নিরীহ মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা তুলে দিত ফিরিঙ্গিদের হাতে, তারপর সেইসব মানুষরা চালান হয়ে যেত বিদেশে। মগদের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের এত ভাব হয়ে গিয়েছিল যে, আরাকানের রাজা তার বোনের বিয়ে দিয়েছিল ঐ জলদস্যু-সর্দার গঞ্জালেসের সঙ্গে। তবে যাদের স্বভাবই নিষ্ঠুর, তারা বেশিদিন অন্যদের সঙ্গে ভাব রাখতে পারে না। বন্ধুর সঙ্গেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে। মগ আর ফিরিঙ্গিদের মধ্যেও সাংঘাতিক ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল এক সময়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আরও তিন ভাই ছিল। ইতিহাসে আমরা সবাই পড়েছি যে, ঔরঙ্গজেব তাঁর বাবাকে বন্দী করে এবং তিন ভাইকে মেরে-ধরে তাড়িয়ে নিজে দিল্লির বাদশাহ হয়ে বসেন। তাঁর এক ভাই সুজা ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পালিয়েছিলেন এই বাংলাদেশ দিয়েই। সুজার সঙ্গে ছিলেন তাঁর
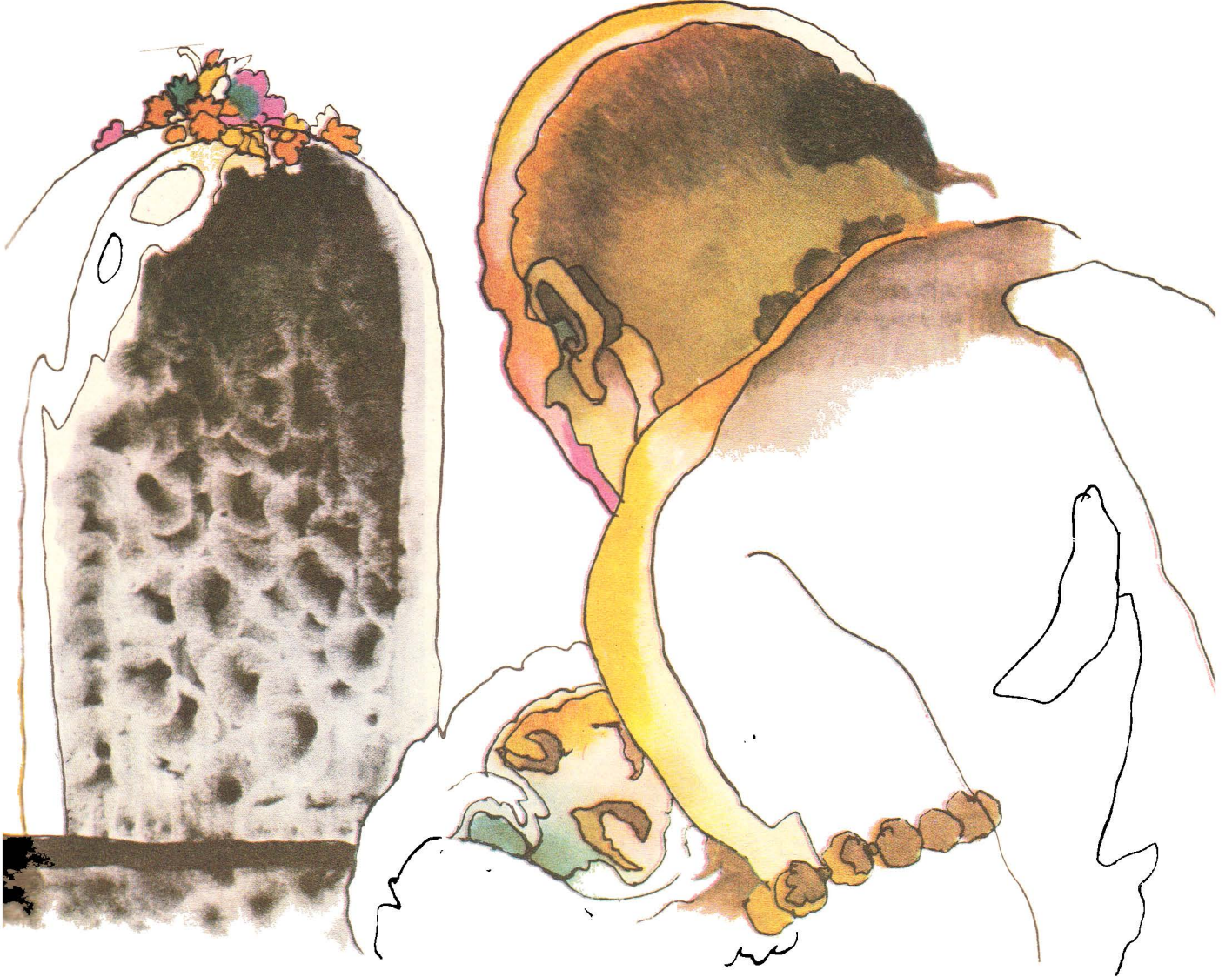
স্ত্রী, তিনটি ছেলে, তিনটি মেয়ে আর প্রচুর ধনরত্ন। সম্রাট শাজাহানের পুত্র সুলতান সুজার তখন খুবই দুরবস্থা, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়। আর ধরা পড়লে কী হবে, তা তো জানা কথা। তাঁর দাদা দারা শিকোর মুণ্ডুটা কেটে ঔরংগজেব ভেট পাঠিয়েছিলেন শাজাহানের কাছে।

বাংলায় তখন জলদস্যুদের দোর্দণ্ড প্রতাপ, সেইজন্য সুলতান সুজা সাহায্য চাইলেন জলদস্যুদের কাছেই। বোম্বেটেরা মোগল সম্রাটের ভাইকে নিজেরা খুন করার সাহস পেল না, তবে অনেক টাকাপয়সার বিনিময়ে তাঁকে সপরিবারে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। নিরাপদ জায়গা মানে আরাকান, সেই মগের মুল্লুক। সেখানে মগেরা যথাসময়ে সুলতান সুজার সব সম্পত্তি লুটপাট করে এক সময় প্রাণেও মেরে ফেলবে।

ফিরিঙ্গিরা শুধু যে সুলতান সুজার কাছ থেকে কথামতন টাকাপয়সা আদায় করল তাই-ই নয়, শেষের দিকে আর লোভ সামলাতে না পেরে আরাকানের কাছাকাছি গিয়ে সুজার কয়েকটি ধনরত্নের সিন্দুকও কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।

যথাসময়ে এই খবর পৌঁছল ঔরংগজেবের কানে। বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর জলদস্যুরা যে অত্যাচার করছে, সে-ব্যাপারে মোগল সম্রাট মাথা ঘামাননি। কিন্তু সুজাকে তারা ধরিয়ে না দিয়ে যে আরাকান পর্যন্ত পার করে দিয়ে এল, এজন্য তিনি ফিরিঙ্গিদের ওপর চটে রইলেন।

এর পর ঘটল আর-একটা ঘটনা।

বাংলাদেশে তখন খুচরো পয়সার কোনো প্রচলন ছিল না। ছিল বাদশাহি টাকা আর খুচরো কেনাবেচার জন্য ব্যবহার হত কড়ির। সেই জন্য এখনো আমরা বলি টাকাকড়ি। এই কড়ি অনেক পাওয়া যেত আরব্য সাগরের মালদ্বীপের কাছে সমুদ্রে। সেখান থেকে কড়ি তুলে মোগলরা নিয়ে আসত বাংলায়।

একবার এক জাহাজ-ভর্তি কড়ি আসছিল বাংলাদেশে, এমন সময় ফিরিঙ্গিরা ঘিরে ধরল সেই জাহাজ। মোগল সৈন্যরা লড়াইয়ের চেষ্টা করল একটুক্ষণ, কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী জলদস্যুরা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের মধ্যে। মোগল সৈন্যরা তলোয়ার তোলারও সময় পেল না, তার আগেই কচুকাটা হতে লাগল। জাহাজের ডেকে গড়াতে লাগল রক্তের স্রোত।

জলদস্যুরা যে-জাহাজ আক্রমণ করে, সে-জাহাজের সব লোককেই তারা মেরে ফেলে, কারুকে ছাড়ে না। সেইজন্যই প্রাণে বাঁচবার জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেন আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন। হাতজোড় করে তিনি দস্যুসর্দারকে বললেন, "এ-জাহাজে শুধু কড়ি আছে, এ নিয়ে তো আপনাদের কোনো লাভ নেই, এর বদলে যদি টাকা দিই, তাহলে আমাদের ছেড়ে দেবেন?"

দস্যুরা ভেবে দেখল, সত্যিই অত কড়ি নিয়ে তাদের লাভ হবে না। এই কড়ি বদলে টাকা করে নিতে অনেক সময় লাগবে, দস্যুরা সবকিছুই চটপট সেরে ফেলতে চায়। তাদের দরকার সোনার টাকা, সেই টাকা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। তারা বলল, একমাত্র স্বর্ণমুদ্রা পেলেই তারা বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারে।

মোগল সৈন্যরা তাতেই রাজি।

কিন্তু কথা হল, টাকাটা কোথা থেকে নেওয়া হবে। জলদস্যুরা তো আর রাজধানী থেকে টাকা আনতে যাবে না। আর বিশ্বাস করে জাহাজটা ছেড়ে দেওয়াও যাবে না। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল টাকাটা নেওয়া হবে মক্কা থেকে। মক্কায় কোনো সৈন্যসামন্ত থাকে না, সুতরাং সেখানে জলদস্যুদের ধরা পড়ার কোনো ভয় নেই।

বন্দী জাহাজখানা নিয়ে জলদস্যুরা সত্যিই চলে গেল মক্কায়। সেখানে তাদের চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।

মোগল সৈন্যরা জলদস্যুদের হাতে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেবার উপায় খুঁজছিল। মক্কায় এসে তারা দেখল, সম্রাট-পরিবারের অনেক পুরুষ ও মহিলা তীর্থ করতে এসেছেন সেখানে। তাঁরা এনেছেন প্রায় আট দশটি জাহাজ। সেই সব জাহাজে কিছু কিছু সৈন্যও আছে। এতগুলো জাহাজ দিয়ে ঘিরে ধরলে জলদস্যুরা নিশ্চয়ই কুপোকাত হবে।

দস্যু-সর্দার সিবাসটিয়ান গঞ্জালেস প্রথমে মোগলদের ফন্দিটা ধরতে পারেনি। হঠাৎ সে দেখল, টাকা আনবার নাম করে মোগল জাহাজের ক্যাপ্টেন আট-দশখানা জাহাজ নিয়ে আসছে তার জাহাজের দিকে। তখন সেও একটা ফন্দি করল।

গঞ্জালেস প্রথমে ভাব দেখাল যেন সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাতে মোগলাই জাহাজগুলো খুব উৎসাহ পেয়ে তাড়া করে এল তার জাহাজ। এইভাবে গঞ্জালেস ওদের টেনে আনল গভীর সমুদ্রে। সমুদ্রের মাঝখানের লড়াইয়ে জলদস্যুরাই বেশি ওস্তাদ। মোগলাই জাহাজগুলো ঢাউস ঢাউস, সহজে এদিক ওদিক ঘুরতে পারে না। আর গঞ্জালেসের জাহাজটি ছোট হলেও সুদৃঢ়, যখন খুশি যেদিকে ইচ্ছে যায়। গঞ্জালেসের জাহাজ ঘুরে-ঘুরে একসংগে সব কটি মোগলাই জাহাজের ওপর কামানের গোলা বর্ষণ করতে লাগল।

মোগল জাহাজে ছোট কামান নেই। সেগুলোর মুখ ঘোরাবার আগেই জলদস্যুদের জাহাজ চটপট সরে পড়ে। মোগলরা একটু বাদেই ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। গঞ্জালেস একখানা জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল মক্কা ছেড়ে।

কিন্তু তার মাথার মধ্যে রাগ জ্বলছে দাউ-দাউ করে। তাছাড়া এত দূর এসেও তারা টাকা পেল না। এর শোধ নিতেই হবে।

গঞ্জালেস তার জাহাজ নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল সুরাট বন্দরের কাছাকাছি সমুদ্রে। মক্কায় তীর্থ সেরে মোগলাই জাহাজগুলো এই দিকেই ফিরবে।

কিছুদিন পর যখন জাহাজগুলো একটা একটা করে ফিরতে লাগল, তখন গঞ্জালেস ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল সেগুলোর ওপরে। সম্রাট-পরিবারের লোকজনদের কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিল জলে। সোনাদানা সব লুঠ করে, জাহাজগুলো তছনছ করে গঞ্জালেস তার দলবল নিয়ে পালিয়ে গেল বাংলার দিকে।

এই ঘটনা শুনে ঔরংগজেব একেবারে রেগে আগুন হয়ে গেলেন। ফিরিঙ্গি দস্যুরা মুসলমান তীর্থযাত্রীদের ওপর অত্যাচার করেছে, তাঁর পরিবারের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে খুন করেছে। এ আর সহ্য করা যায় না।

এবার ঔরংগজেব ঠিক করলেন জলপথে যুদ্ধের জন্য মোগল বাহিনীকে তৈরি করতেই হবে। অবিলম্বে তৈরি হল অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ। তার কয়েকটি জাহাজ সংগে দিয়ে তিনি তাঁর এক সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ কে পাঠিয়ে দিলেন বাংলার জলদস্যুদের দমন করবার জন্য।

শায়েস্তা খাঁ খুব জবরদস্ত সেনাপতি। তিনি ফিরিঙ্গি বোম্বেটে আর মগ দস্যুদের একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসতে লাগলেন বাংলার দিকে।

বন্দীদের চাবুক মারতে মারতে জলদস্যুরা নিয়ে এল নদীর ধারে। নদীর নাম ঠাকুরানী, বর্ষাকালে এত জল থাকে যে এপার-ওপার দেখা যায় না। এই নদী দিয়েই চলে যাওয়া যায় সমুদ্রে। এখন শীতকাল, খুব বেশি জল নেই, কিন্তু যখন জোয়ার আসে তখন নদী ভরে যায়।

বিশু ঠাকুর দেখলেন, সেখানে প্রায় দেড়শো জন বন্দীকে

এসেছে জলদস্যুরা। গ্রামের বুড়োবুড়ি আর খুব ছোট ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে আর সবাইকে ধরে এনেছে। গ্রামের অনেক বাড়ি এখনো পুড়ছে আগুনে। দূরে শোনা যাচ্ছে কান্নার আওয়াজ। বিশু ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই। হয়তো তিনিও কাঁদছেন। কিংবা তাঁকে দস্যুরা মেরে ফেলেছে কি না, তাই বা কে জানে!

দস্যুরা মাত্র কুড়ি-বাইশ জন। মাত্র এই ক'জন লোক একটা গোটা গ্রাম ছারখার করে দিল। অথচ গ্রামে তো জোয়ান ছেলে কম নেই। কিন্তু দস্যুদের সঙ্গে আছে সাঙ্ঘাতিক সব অস্ত্র-শস্ত্র আর গ্রামের মানুষের কাছে লাঠি আর বর্শা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তা ছাড়া শিবতলা নামের এই নিরিবিলি শান্ত গ্রামের লোকেরা কখনো ভাবেইনি যে, তাদের গ্রামে কোনোদিন ফিরিঙ্গি ডাকাত আসবে। এ-গ্রামে জমিদার নেই বা তেমন কোনো বড়লোকও নেই, সাধারণ নিরীহ সব চাষী আর জেলে। কোথায় গেলে বেশি টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে, ডাকাতরা আগে থেকে সে-খবর জেনেই লুঠপাট করতে আসে!

কিন্তু কিছুদিন ধরে ফিরিঙ্গি দস্যুরা একটা নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। লুঠপাটের চেয়েও তাতে বেশি লাভ। তারা মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। সাধারণ নিরীহ গ্রামের মানুষদের ধরে নিয়ে যাওয়াই বেশি সুবিধে।

এখন ভাটার সময়। নদীর পারে থকথক করছে কাদা। দস্যুদের জাহাজটা বেশ খানিকটা দূরে। বন্দীরা সার বেঁধে সেই কাদার মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল জাহাজটার দিকে। এখানকার কাদা একেবারে আঠার মতন, পা টেনে ধরে। কেউ-কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে লাগল। হাত পেছন দিকে বাঁধা বলে পড়ে গেলে সহজে ওঠা যায় না, সারা গায়ে কাদা মাখা-মাখি হয়ে যায়। তখন দস্যুরা এসে ঘাড় ধরে টেনে তোলে আর পিঠে চাবুক কষায়। যার পিঠে চাবুক পড়ে সে অমনি কেঁদে ওঠে।

বিশু ঠাকুর বললেন, "নিতাই, সাবধান! দেখিস, যেন পা পিছলে না যায়।''

নিতাই বলল, "আমি ঠিক আছি, ঠাকুর।''

নিতাই কিংবা বিশু ঠাকুর পড়ে গেলে তাদের কাঁধে ঝোলানো বাঁশে বাঁধা কুড়ানিও পড়ে যাবে। কুড়ানি অজ্ঞান, কাদা লেগে যাবে তার চোখে-মুখে। এমনিতে মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে কি না কে জানে!

নিতাই আবার জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটার এ অবস্থা হল কী করে?''

বিশু ঠাকুর বললেন, "ওকে সাপে কামড়েছে!''

নিতাই তেতো গলায় বলল, "সাপের কামড়েও মরল না, অভাগির বেটি! বেঁচে থেকে কী হবে, জাত-মান সব খোয়াবে।''

বিশু ঠাকুর বললেন, "ও কথা বলতে নেই। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মরে গেলে তো সব ফুরিয়েই গেল!"

অতি সাবধানে ওরা এসে পৌঁছল জাহাজের কাছে।

জাহাজের পেটের কাছে খানিকটা জায়গা খুলে দেওয়া হয়েছে। সেখান দিয়ে ওরা ঢুকে গেল জাহাজের খোলের মধ্যে। ভেতরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেখানে গিয়ে আর কেউ তাল সামলাতে পারল না, এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। কুড়ানি কোথায় ছিটকে চলে গেল, বিশু ঠাকুর নিজেও পড়লেন হুমড়ি খেয়ে। সব মিলিয়ে যেন একটা মানুষের তাল। প্রায় সবাই ভয়ে চিৎকার করছে। বিশু ঠাকুরের মনে হল, নরক জায়গাটা বুঝি এরকমই হয়। জীবন্ত অবস্থায় তিনি নরকে চলে এসেছেন।

একটু পরে দেখা গেল মশালের আলো। ওপরের ডেক থেকে সিঁড়ি বেয়ে এক হাতে মশাল, আর-এক হাতে চাবুক নিয়ে নেমে এল চার-পাঁচজন প্রহরী। শূন্যে চাবুকের সপাসপ শব্দ করে তারা বলতে লাগল, "এই. সব সিধা হও! খাড়া হও! এই কুত্তার বাচ্চারা, ওঠ্!''

তারা নিজেরাই সেই মানুষের তালের ওপর থেকে কয়েক-জনকে ঘাড় ধরে টেনে টেনে তুলল। তারপর অন্যরা অনেকে নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াতে পারল। সকলের সারা গায়ে কাদা মাখা। মেয়েরা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউ কেউ বৃথা জেনেও অনুনয় করে বলছে, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও! বাড়িতে আমার ছোট ছেলে আছে! ওগো, পায়ে পড়ি!''

প্রহরীরা হুকুম দিল, "মাঝখান খালি করো! সব দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও! মাথা গুনতি হবে!''

হুকুম দেবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা এলোপাথাড়ি চাবুক চালায়। তাতেই কাজ হয় সঙ্গে-সঙ্গে। সবাই হুড়োহুড়ি করে সরে গিয়ে চারদিকের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে যায়।

বিশু ঠাকুর দেখলেন সেই ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে আছে কুড়ানি। তাঁর যেন মনে হল, কুড়ানি নড়ে উঠল একবার।

একজন প্রহরী ওর কাছে এসে বলল, "এটার আবার কী হল? মরে গেছে?''

অন্য একজন পা দিয়ে তাকে উল্টে দিয়ে বলল "এঃ, এর মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে গেছে, একে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না।''

প্রথম জন বলল, "এটাকে জলে ফেলে দে। শুধু-শুধু এখানে রাখলে গন্ধ হবে।''

বিশু ঠাকুর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "না! ও বেঁচে আছে।"

একজন প্রহরী বলল, "চোপ্! কোনো কথা নয়। শোন্ কুত্তার বাচ্চারা, কাপ্তান সাহাব সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাওয়ের হুকুম, কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। এখানে কোনো গোলমাল চলবে না। কেউ কথা বললেই দশ ঘা চাবুক! মনে থাকে যেন।''

যে-বাঁশটায় কুড়ানিকে বাঁধা, দু'জন প্রহরী সেই বাঁশটা তুলে ধরল, আর একজন বলল, "ওকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দে!''

বিশু ঠাকুর বললেন, "না, ওকে ফেলবেন না! আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, ওকে একটু জল খাওয়াতে হবে।''

একজন প্রহরী গর্জে উঠল, "কে কথা বলল? কোন্ কুত্তার বাচ্চা?''

বিশু ঠাকুর এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "আমি। ভাল করে দেখে নাও, আমি কুত্তার বাচ্চা নই।''

প্রহরীদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সে নিষ্ঠুরের মতন হাসল। তারপর অন্যদের বলল, "তোরা এই মুর্দাটাকে ফেলে দে, আমি এর ব্যবস্থা করছি!''

বিশু ঠাকুর "না'' বলে ছুটে এলেন এবং যে-প্রহরী দুজন কুড়ানিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর হাত বাঁধা বলে তিনি ওদের ধরতে পারলেন না, কিন্তু মাথা দিয়ে ঢুঁ মারলেন একজনের পেটে। তিনজনেই পড়ে গেল এক সঙ্গে। এই সময় কুড়ানি একটু জ্ঞান ফিরে পেয়ে আস্তে-আস্তে বলে উঠল, "মা, মাগো!''

বিশু ঠাকুর উঠতে পারলেন না, কিন্তু প্রহরীরা চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পাঁচজন প্রহরী একসঙ্গে চাবুক চালাতে লাগল তাঁর ওপর। বিশু ঠাকুর মুখ দিয়ে একটাও শব্দ করলেন না, কিন্তু তাঁর শরীরটা কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠতে লাগল।

একটু পরেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

বিশু ঠাকুর কতক্ষণ বা কতদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, তা তিনি জানেন না। একবার চোখ মেলে মনে হল, সব দিকে অন্ধকার, আর কোনো মানুষজন নেই। তাঁর সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। তিনি আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ বাদে আবার চোখ মেলতে গিয়ে দেখলেন ভীষণ আলো, তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, তিনি তাকাতে পারছেন না। তার চেয়ে ঘুমিয়ে পড়াই ভাল। ঘুমিয়ে পড়লেন আবার।

তারপর এক সময় মনে হল, তিনি ছেলেবেলায় ফিরে গেছেন, তাঁর বয়েস সাত কিংবা আট। তিনি শুয়ে আছেন মায়ের কোলে, মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর মাথায়।

চোখ মেলে দেখলেন, মায়ের কোলে নয়, তিনি শুয়ে আছেন সেই জাহাজেরই খোলে, তবে কে যেন সত্যিই হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তাঁর মাথায়।

তিনি উঠে বসতে গেলেন, অমনি নিতাই ফিসফিস করে বলল, "ঠাকুর, উঠো না, উঠো না!"

বিশু ঠাকুরের সারা গায়ে চাবুকের দাগ। চামড়ার চাবুক তাঁর শরীরে কেটে-কেটে বসেছে। তিনি একটা চোখ খুলতে পারছেন না, অন্য চোখটি দিয়ে দেখলেন, সব বন্দীরা দেয়ালে হেলান দিয়ে নিঃস্পন্দ হয়ে বসে আছে। হঠাৎ মনে হয়, তাদের একজনও বেঁচে নেই। এখন মনে হয় দিনের বেলা, কারণ কোনো মশাল জ্বলছে না। জাহাজটা মাঝে-মাঝে দুলে উঠছে, তার মানে চলন্ত।

হঠাৎ একটা কথা তাঁর মনে ঝলক দিয়ে উঠল। নিতাই তাঁর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল কী করে?

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "নিতাই, তোর হাত খোলা?"

নিতাই বলল, "হ্যাঁ, ঠাকুর, আমাদের সকলেরই হাত খুলে পাগুলো শেকলে বেঁধে দিয়েছে।"

বিশু ঠাকুর নিজের পায়ে হাত দিলেন। তাঁর পা শিকলে বাঁধা নেই।

নিতাই বলল, "তুমি অজ্ঞান হয়ে ছিলে তো, তাই তোমায় বাঁধেনি। একটু পরে এসেই বাঁধবে। বাবাঃ, যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে! অমন গোঁয়ারের মতন ডাকাতগুলোর দিকে তেড়ে গেলে, ওরা তো তোমায় খুনই করে ফেলত!"

"আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম রে?"

"তা ঠিক বলতে পারি না। একদিন একরাত তো হবেই!"

"কুড়ানিকে ওরা জলে ফেলে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত?"

"কী জানি! ওপরে তো নিয়ে গেল দেখলাম!"

"কুড়ানি বেঁচে ছিল তখনও। একটা জ্যান্ত মেয়েকে ওরা জলে ফেলে দেবে?"

"ঠাকুর, এদের কি মায়া-দয়া আছে? বাঘ-সিংহেরও মায়া-দয়া থাকতে পারে, কিন্তু বোম্বেটেদের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না।"

"বোম্বেটেরাও তো মানুষ। তাদের কি মন বলে কিছু নেই?"

"তা জানি না। কিন্তু ওরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। দেখছ না, গোরু-ছাগলের মতন ওরা আমাদের বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে!"

বিশু ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করতে লাগলেন। কুড়ানিকে যদি ঠিক ঐ সন্ধের সময় সাপে না কামড়াত, তা হলে তিনি অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারতেন। তাদের গ্রামের পেছন দিকে একটা জলা আছে, সেখানে এমন ঘন নলখাগড়ার ঝোপ যে, কেউ লুকোলে খুঁজে বার করা অসম্ভব। কিন্তু কুড়ানির জন্য তিনিও পালাতে পারলেন না, আর কুড়ানিকেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো গেল না।

বিশু ঠাকুরের বুক ঠেলে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

একটু পরে নিতাই আবার বলল, "ঠাকুর, তুমি খাবে না? দেখো, তোমার সামনে দু'খানা রুটি আর একদলা গুড় পড়ে আছে। আমাদের দু'বেলা ঐ খেতে দেয়!"

বিশু ঠাকুর ঘেন্নার সঙ্গে বললেন, "ঐ ম্লেচ্ছের হাতের খাবার আমি খাব? থুঃ!"

নিতাই বলল, "কিন্তু ঠাকুর, এর পর আমরা কোথায় কার হাতে পড়ব, তার কি কিছু ঠিক আছে? বেঁচে থাকতে গেলে খেতে তো হবেই।"

"দু'খানা রুটিতে তোর কী করে পেট ভরবে? আমার খাবার তুই খেয়ে নে!"

"না, না, তা কখনো হয়! তুমি দু'দিন কিছু খাওনি, একটু গুড় অন্তত মুখে দাও! গুড় খেলে দোষ নেই!"

বিশু ঠাকুর সে-কথার উত্তর না দিয়ে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, দুর্বলতার জন্য মাথা ঘুরছে। এক্ষুনি বুঝি টলে পড়ে যাবেন। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি মনের জোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এক পা এক পা করে এগোলেন সিঁড়ির দিকে।

বন্দীরা কেউ কোনো কথা বলছে না। ড্যাব-ড্যাব করে অবাক চোখ মেলে দেখছে তাঁকে। কথা বলার জন্য কেউ-কেউ নিশ্চয়ই এর মধ্যে চাবুক খেয়েছে কয়েকবার।

এই সময় ওপরের ডেকে পায়ের শব্দ হল, কারা যেন এল সিঁড়ির দিকে।

বিশু ঠাকুর দৌড়ে ফিরে এলেন নিজের জায়গায়, আবার অজ্ঞানের ভান করে চোখ বুজে রইলেন।

দু'জন প্রহরী নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। একজনের হাতে গনগনে আগুন ভর্তি একটি মাটির মালসা, আর একজনের হাতে একটা লোহার পাঞ্জা। তারা ঐ পাঞ্জা গুঁড়িয়ে প্রত্যেক বন্দীর বাহুতে ছাপ দিয়ে দেবে। ঐ ছাপ হচ্ছে ক্রীতদাসদের চিহ্ন।

প্রহরীরা এক-একজন বন্দীর গায়ে সেই গরম পাঞ্জার ছাপ দিতে লাগল, আর সে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল যন্ত্রণায়। সমস্ত জায়গাটা বিকট চ্যাঁচামেচি আর কান্নায় ভরে গেল।

বিশু ঠাকুর নিজের ঠোঁট কামড়ে রইলেন, একটু পরেই ওরা এসে যাবে তাঁর কাছে। চাবুকের ঘা সহ্য করা যায়, কিন্তু গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিলে শরীর কেঁপে উঠবেই, মুখ দিয়েও শব্দ বেরিয়ে যেতে পারে। তাঁর যে জ্ঞান ফিরেছে, তা প্রহরীরা বুঝে ফেলবে। এবার তারা শেকল বেঁধে দেবে তাঁর পায়ে। আর কোনো মুক্তির উপায় থাকবে না। তিনি শিবের পূজারী, তিনি হবেন ফিরিঙ্গির ক্রীতদাস?

এই চিন্তাতেই তাঁর গায়ে যেন অসুরের শক্তি এল। তিনি চোখ মেলে দেখলেন চার পাশ। প্রহরী দু'জন তাঁর খুব কাছে এসে গেছে, এর পরই তারা নিতাইকে ছাপ দেবে।

যে-প্রহরীটির হাতে আগুনের মালসা সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। বিশু ঠাকুর লাফিয়ে উঠে তার হাতে কষালেন এক লাথি। মালসাটা ছিটকে গিয়ে চারদিকে ঝরে পড়তে লাগল জ্বলন্ত কাঠকয়লা। প্রহরীটা ভয় পেয়ে 'হোলি মেরি, হোলি যীশাস' বলে চেঁচিয়ে মাথা বাঁচাবার জন্য দু' হাতে মাথা চাপা দিল। অন্য প্রহরীটি গরম পাঞ্জাটা তুলে বিশু ঠাকুরকে মারতে আসতেই তিনি নিচু হয়ে দমাস করে এক ঘুঁষি কষালেন তার বুকে। প্রহরীটির গায়েও দারুণ জোর, সেই ঘুঁষি খেয়েও সে টলল না, গোরিলার মতন দু' হাত বাড়িয়ে সে বিশু ঠাকুরকে জাপটে ধরতে এল। অন্য প্রহরীটিও ততক্ষণে সামলে নিয়ে কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করার চেষ্টা করছে।

বিশু ঠাকুর দু'জনকেই কোনোরকমে এড়িয়ে ছুটে গেলেন

সিঁড়ির দিকে। তাঁকে বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে। আর বাঁচার একমাত্র উপায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

প্রহরী দুটো তাঁকে তেড়ে আসার আগেই তিনি উঠে গেলেন সিঁড়ির ওপরে। সেখানে দেখলেন একটা চাবুক পড়ে আছে। সেটা মুহূর্তের মধ্যে তুলে নিয়ে তিনি প্রহরী দু'জনের উপরে কয়েকবার চালালেন সপাং সপাং করে। প্রহরীরা পিছিয়ে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় দারুণ চিৎকার করতে লাগল। বিশু ঠাকুর চাবুকটা হাতে নিয়ে উঠে এলেন ডেকের ওপরে।

প্রথমে মনে হল ডেকটা ফাঁকা। জাহাজটা বেশ জোরে চলছে, দু'পাশেই ছলাত ছলাত করছে ঢেউয়ের শব্দ। বিশু ঠাকুর দৌড়ে রেলিংয়ের কাছে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন এমন সময় শুনলেন, সরু গলায় কে ডেকে উঠল, "ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!"

বিশু ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন একটা মাস্তুল-দণ্ডের কাছে শুয়ে আছে কুড়ানি। বিশু ঠাকুরের বুকটা ধক্ করে উঠল। কুড়ানি তা হলে এখনো বেঁচে আছে! গোখরো সাপ কামড়ালে প্রায় কেউই বাঁচে না, আর এত কষ্টের পরও কুড়ানি মরেনি। বিশু ঠাকুরই তাকে বাঁচিয়েছেন। একজন কারুর প্রাণ বাঁচাবার দারুণ আনন্দ আছে। এত বিপদের মধ্যেও বিশু ঠাকুর সেই আনন্দ বোধ করলেন।

কিন্তু কুড়ানিকে নিয়ে এখন কী করা যাবে? ওকে সঙ্গে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলে দুজনেরই বাঁচার আশা কম। কুড়ানি সাঁতার জানে কি না তিনি জানেন না। এই নদীতে প্রচুর কুমির থাকে।

আর চিন্তা করার সময় নেই, বিশু ঠাকুর বললেন, "কুড়ানি, তুই থাক, আমি চললাম!"

বিশু ঠাকুর রেলিং পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না। তলা থেকে প্রহরী দুজন ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে, অন্য দিক থেকে আরও চার-পাঁচজন দস্যু এসে গেল। বিশু ঠাকুর চার দিক ঘুরে ঘুরে চাবুক চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। কয়েকজন দস্যু তলোয়ার বার করেছে, কয়েকজনের হাতে চাবুক। বিশু ঠাকুর একা যুঝতে লাগলেন। কোনোক্রমে ডেকের এক ধারে আসতে পারলেই তিনি জলে ঝাঁপ দেবেন।

কিন্তু সব-কিছুর মতন, চাবুক নিয়ে লড়াই করারও একটা বিশেষ কায়দা আছে। বিশু ঠাকুর আনাড়ির মতন চাবুক চালাচ্ছিলেন, কিন্তু জলদস্যুরা চাবুকের লড়াইতে অভ্যস্ত। একজন দস্যু নিজের চাবুকটা বিশু ঠাকুরের চাবুকের সঙ্গে একবার জড়িয়ে ফেলে হ্যাঁচকা টান দিতেই বিশু ঠাকুরের হাত থেকে চাবুকটা খসে গেল। তখন দস্যুরা ঘিরে ফেলল তাঁকে।

আর লড়াইয়ের চেষ্টা করে লাভ নেই বুঝে বিশু ঠাকুর হার স্বীকার করলেন। দুজন দস্যু তাঁর টুঁটি টিপে ধরল। একজন দস্যু খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, "এই কুত্তাটা অনেক ঝঞ্ঝাট করেছে, এর মুণ্ডুটা কেটে কাপ্তানের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

বিশু ঠাকুর মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে চোখ বুজলেন।

সেই সময় উঁচু থেকে বাজখাঁই গলায় একটা হুকুম শোনা গেল, "হল্ট!"

জাহাজটি দোতলা, কিন্তু তিনতলাতেও একটি ঘর ও বারান্দা আছে। সেখানেই থাকে জলদস্যুদের সর্দার সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে এতক্ষণ লড়াইটা দেখছিল, তার হাতে লম্বা পিস্তল। বিশু ঠাকুর যদি অন্যদের হারিয়ে দিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করত, তা হলে তখনই গুলি চালাত সে।

এবার গঞ্জালেস সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বলল, "ওকে আমার সামনে নিয়ে আয়!"

আগেই বলেছি, গঞ্জালেসের চেহারা প্রায় তিনজন মানুষের সমান। যেমন মোটা, তেমনি লম্বা। যে-কোনো সাধারণ মানুষকে সে এক হাতে চিপে মেরে ফেলতে পারে। তার গায়ে চামড়ার কোট, শীত-গ্রীষ্মে কখনো সে এই কোট খোলে না। মাথায় ঝালর-লাগানো গোল টুপি। তার চোখ দুটো সব সময় টকটকে লাল থাকে। মুখ-ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। মানুষ না বলে তাকে দৈত্য বললেই মানায়।

দুজন দস্যু বিশু ঠাকুরের হাত আর গলা চেপে ধরে আছে। গঞ্জালেস কাছে এগিয়ে এসে বলল, "ছেড়ে দে!"

তারপর বিশু ঠাকুরের কাঁধে এক চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করল, "খুব জোয়ান, তাই না? দেখি হাতের গুলি? দেখি, দাঁত দেখি! হুঁ!"

হাটে গিয়ে গোরু কিংবা ছাগল কেনার সময় লোকে যেমন নানান জায়গা টিপে-টিপে দেখে, সেইরকমভাবে দেখে গঞ্জালেস বেশ সন্তুষ্টভাবে বলল, "ভাল বেশ ভাল জিনিস! হতভাগা বাঙালিদের মধ্যে এমন চেহারা বেশি দেখা যায় না! তোরা এমন একটা ভাল জিনিসকে কেটে ফেলছিলি? অনেক দাম পাওয়া যাবে!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে তোমরা কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছ? ব্রাহ্মণ কখনো প্রাণ থাকতে ক্রীতদাস হয় না!"

গঞ্জালেস সেকথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠল। খুব আমোদের সঙ্গে বলতে লাগল, "বামুন, অ্যাঁ, বামুন! ডার্টি হীদেন, তোরা তো সব শ্লেভ হবার জন্যই জন্মেছিস! তোকে একটা কশাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেব, রোজ গোরু কাটবি, আর গোরুর মাংস খাবি, সেই ঠিক হবে, অ্যাঁ?"

তারপর হঠাৎ গলার আওয়াজ পাল্টে ফেলে খুব স্নেহের সঙ্গে নরম গলায় বলল, "না, না, বামুন ঠাকুরের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। তোরা বামুনকে একটু খাতির করতেও জানিস না? এতবড় একজন মানী লোককে তোরা আর সবার সঙ্গে একসঙ্গে রেখেছিস?"

তারপর বিশু ঠাকুরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, "বামুন মশাই, এবার মাটিতে শুয়ে পড়ো। তোমার জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি!"

দস্যু-সর্দারের মতলব কী, তা বুঝতে পারলেন না বিশু ঠাকুর। হঠাৎ তাঁকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলল কেন? তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

গঞ্জালেস বলল, "এই, এর হাত-পা বাঁধ! ছোট দড়ি দিয়ে হাত বাঁধবি, আর পায়ে বাঁধ লম্বা দড়ি!"

বিশু ঠাকুর কোনোরকম বাধা দেবার চেষ্টা করার আগেই চার-পাঁচজন দস্যু তাঁকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। দারুণ শক্ত জাহাজি দড়ি দিয়ে বাঁধল তাঁর হাত আর পা। তারপর গঞ্জালেসের নির্দেশে তাঁকে সেই অবস্থায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল, খোলের দিকে।

খোলের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা নেমে গঞ্জালেস বলল, "দে, এবার ওকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দে!"

ডেকের নীচের দিকে একটা লোহার হুকে বিশু ঠাকুরের পায়ের দড়ি বেঁধে দেওয়া হল। তাঁর মাথাটা ঝুলতে লাগল নীচের দিকে।

নীচের বন্দীরা সেই অবস্থায় বিশু ঠাকুরকে দেখে একবার ভয়ের শব্দ করেই চুপ করে গেল।

গঞ্জালেস তাদের উদ্দেশ্যে হেঁকে বলল, "এই দ্যাখ এই তোদের বামুন ঠাকুর। আর কেউ যদি পালাবার চেষ্টা করে, তবে তারও এই দশা হবে। এই বামুন যদি এখানে শুকিয়ে মরে ভূতও হয়ে থাকে, তবু তাকে আর নামানো হবে না।''

তারপর বিজয়ীর মতন হুংকার দিতে-দিতে দস্যুরা ওপরে উঠে গেল। বিশু ঠাকুর সব বন্দীর ঠিক মাঝখানে ঝুলে রইলেন। বন্দীদের সকলের পা বাঁধা, ইচ্ছে থাকলেও কেউ এসে তাঁর কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

একটু পরেই বিশু ঠাকুরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল টপ-টপ করে। সেই অবস্থাতেই তিনি ভাবলেন, যদি বেঁচে থাকি, এর প্রতিশোধ নেবই, যদি বেঁচে থাকি এর প্রতিশোধ নেবই। যদি বেঁচে থাকি—

আবার তিনি ভাবলেন, যদি বেঁচে থাকি মানে? বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে। প্রতিশোধ নিতেই হবে।

৪

এক সময় জাহাজের গতি কমে এল।

পালতোলা জাহাজ, ছোট, বড় নানান রকমের পাল আছে, যখন যেটা দরকার, সেটা তুলে দেওয়া হয়। আর যখন বাতাস থাকে না, তখন পনেরো-কুড়ি জন দাঁড় টানে। হালকা, মজবুত জাহাজ, তরতরিয়ে চলে। এ জাহাজের নাম সী হক। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাওয়ের আর সাতখানা জাহাজ আছে, তবে সী হকই তার সবচেয়ে প্রিয়।

এখন ইচ্ছে করেই জাহাজটার গতি কমিয়ে আনা হতে লাগল তীরের দিকে। জায়গাটা মোহনার কাছাকাছি। নদী এখানে এত চওড়া যে কোন্‌টা নদী, কোন্‌টা সমুদ্র বোঝাই যায় না।

তীরের দিকে ঘন জঙ্গল। এদিকে অনেক দূরের মধ্যে মানুষের বসবাস নেই। এই জঙ্গলে সাংঘাতিক বাঘের উৎপাত। কিছু-কিছু এক-খড়্গওয়ালা ছোট-আকারের গণ্ডারও আছে। সেই গণ্ডারগুলোও দারুণ হিংস্র।

তীরের কাছাকাছি এসে জাহাজ থেকে কামান গর্জে উঠল। আগুনের গোলা গিয়ে পড়তে লাগল জঙ্গলের মধ্যে। পরপর পাঁচ বার। কিছু গাছপালায় জ্বলে উঠল আগুন, সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল, কয়েকটি বাঘের হুংকার।

বাঘ তাড়াবার জন্যই কামান দাগা হল এখানে। এবার দস্যুরা তীরে নামবে। কামানের গর্জন শুনে বাঘেরা আর সারাদিনে এ তল্লাটে আসবে না।

কামান দাগবার সময় সমস্ত জাহাজটা কেঁপে ওঠে প্রচণ্ডভাবে। খোপের মধ্যে বন্দীরা এক-একজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল আচমকা। কেন কামান দাগা হচ্ছে তারা কিছুই বুঝতে পারল না।

বিশু ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তিনি শুনতে পেলেন না কিছুই। তাঁর ঝোলানো শরীরটা খুব জোরে-জোরে দুলতে লাগল। একবার তাঁর শরীরটা চলে নিতাইয়ের কাছাকাছি, নিতাই হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েও পারল না। কামান দাগা থেমে যেতেই বিশু ঠাকুরের শরীরের দোলানিও থেমে এল আস্তে-আস্তে, আর নিতাইয়ের কাছে এল না।

একটু পরে ডেকের ওপর থেকে দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল নীচে। কয়েকজন দস্যু নেমে গেল তীরে। জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ঘুরে দেখে এসে তারা হুইসল বাজাল। অর্থাৎ কাছাকাছি আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই। তখন অন্যরাও নামতে শুরু করল।

এবার জাহাজের খোলের কাছের দরজাটা খুলে দিয়ে বার করা হল বন্দীদের। তার আগে তাদের পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ক'দিন তাদের পা বাঁধা ছিল বলে পা যেন অসাড় হয়ে গেছে, হাঁটতে গিয়েও পড়ে যেতে লাগল অনেকে। প্রহরীরা তাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল।

তীরের কাছে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গঞ্জালেস দেখছে বন্দীদের। হঠাৎ একজন বন্দীর ঘাড় খামচে ধরে তাকে সে টেনে আনল আলাদা করে। লোকটির পরনে শুধু একটা লুঙ্গি আর খালি গা। গঞ্জালেস তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই, তোর নাম কী?"

লোকটির মুখ শুকিয়ে গেছে। সে হাত জোড় করে বলল,

"ছায়েব, আমি আপনার গোলাম, আমার নাম কাল্লু মিঞা।"

গঞ্জালেস হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আগে আমায় সালাম করিসনি কেন? সালাম না করে কথা?"

সঙ্গে সঙ্গে সে ঠাস ঠাস করে দুটি চড় কষাল কাল্লু মিঞার দুই গালে। শুধু তাই নয়, তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। কাল্লু মিঞা পড়ে গেল চিত হয়ে, গঞ্জালেস তাকে আবার পা দিয়ে ঠেলে তাকে উপুড় করে দিল, তারপর সে তার বিশাল চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কাল্লু মিঞার পিঠে।

কাল্লু মিঞা আঁক করে শব্দ করে উঠল। অন্য বন্দীরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

গঞ্জালেস সেই অবস্থায় লাফাতে লাগল কাল্লু মিঞার পিঠে। ঠিক যেন নাচছে।

তারপর নেমে দাঁড়িয়ে একজন অনুচরকে জিজ্ঞেস করল, "দ্যাখ তো, এ ব্যাটা বেঁচে আছে কি না।"

অনুচরটি কাল্লু মিঞাকে গড়িয়ে দিল কয়েক পাক। কাল্লু

মিঞার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু তার চোখ দুটি খোলা। দেখেই বোঝা যায়, তার জ্ঞান আছে।

অনুচরটি ধমকে বলল, "এই, ওঠ!"

কাল্লু মিঞা অমনি উঠে দাঁড়াল!

"কাপ্তানকে সালাম কর!"

কাল্লু মিঞা সেলাম ঠুকল সঙ্গে সঙ্গে।

গঞ্জালেস এবার খুশি হয়ে বলল, "ঠিক আছে। এ-রকম তাগতওয়ালা লোকই আমার দরকার!"

তারপর আবার সে তীক্ষ্ম চোখে দেখতে লাগল বন্দীদের মুখগুলো। আবার আর একজনের কাঁধ খামচে ধরে টেনে নিয়ে এল। লোকটি বৃদ্ধ, তার মুখে সাদা রঙের দাড়ি। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, "ছালাম ছায়েব, ছালাম! পেন্নাম ছায়েব, পেন্নাম! মুই বুধুরাম।"

গঞ্জালেস তার অনুচরকে জিজ্ঞেস করল, "এই বুড়াটাকে এনেছিস কেন? এই মড়াটাকে কে কিনবে? শুধু শুধু দানাপানি দিয়ে এটাকে পুষে লাভ কী?"

অনুচরটি তলোয়ারের বাঁটে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাপ্তান একে শেষ করে দিই?"

বুধুরাম হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "আমায় মারবেন না ছায়েব, মারবেন না। বুড়া হলেও আমার গায়ে তাগদ আছে। মুই মাথায় দশ কাঁদি ডাব বইতে পারি, দুই বস্তা ধান নিতে পারি—"

গঞ্জালেস তার অনুচরকে বলল, "এর পিঠে চাপ!"

সে অমনি বুড়োটির পিঠে লাফিয়ে উঠে তার গলা চেপে ধরল।

গঞ্জালেস বলল, "দৌড়ো!"

অতবড় চেহারার একজন জলদস্যুকে পিঠে নিয়ে বুড়োটি একেবারে বেঁকে গেছে, তবু সেই অবস্থায় সে দৌড়োল। কোনোরকমে পড়ি-মরি করে দৌড়োতে দৌড়োতে সে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

গঞ্জালেস তখন অন্য বন্দীদের বলল, "তোরাও সব দৌড়ো ওদিকে!"

জঙ্গলের মধ্যে একটু ঢুকেই বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা সেখানকার গাছ সব কেটে ফেলা হয়েছে। একটা পুকুরও কাটা হয়েছে সেখানে, তার পাশেই একটা ইঁটের ভাটি। ঐ পুকুরের মাটি দিয়েই ইঁট বানানো হচ্ছে।

এখানে শুরু হয়েছে একটা গম্বুজ বানাবার কাজ। জলদস্যুরা এখানে একটা আস্তানা বানাবে। বোম্বেটের প্রধান আড্ডা চট্টগ্রামের কাছে সন্দ্বীপ নামে একটা দ্বীপে। তার পাশেই আরাকান। কিন্তু কিছুদিন হল, মগদের সঙ্গে ফিরিঙ্গি দস্যুদের ভেতরে ভেতরে একটা গোলমাল চলছে, তাই ফিরিঙ্গিরা দূরে আর এক জায়গায় তাদের একটা ঘাঁটি করে রাখতে চায়।

গ্রাম থেকে ধরে আনা মানুষগুলোকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেবার আগে কয়েকদিন তাদের এখানে গম্বুজ বানাবার কাজে লাগিয়ে দেয়।

বন্দীরা সবাই মাটি কাটার কাজে লেগে গেল, তাদের ঘিরে রইল প্রহরীরা। অবশ্য বন্দীরা কেউ পালাতে সাহস করবে না কারণ সুন্দরবনের মানুষ জানে, এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে একা একা পালাতে গেলে নির্ঘাত বাঘের খপ্পরে পড়বে। আর নদী সাঁতরে যাওয়ারও উপায় নেই, নদীতে থিকথিক করছে কুমির।

বন্দীদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে গঞ্জালেস কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল হরিণ কিংবা শুয়োর শিকার করতে। গঞ্জালেস দারুণ সাহসী, বাঘের মুখোমুখি হলেও সে ভয় পায় না, একবার সে শুধু ছুরি হাতে একটা বাঘের সঙ্গে

...হয়েছিল। তার পিঠে বাঘের থাবার দাগ আছে।

এদিকে জাহাজের শূন্য খোলটার মধ্যে শুধু দুলতে লাগল বিশু ঠাকুরের দেহটা। ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কুড়ানি। জলদস্যুরা সবাই মিলে পারে নামবার সময় কুড়ানির কথা ভুলেই গিয়েছিল। ডেকের ওপর বিশু ঠাকুরকে যখন মারধোর করা হয় তখন ভয়ে কুঁকড়ে মাস্তুলের ডান্ডার আড়ালে সে বসে ছিল। ওরা আর তাকে খেয়ালই করেনি। জাহাজে এখন আর কেউ নেই।

এবার সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ফিসফিস করে ডাকতে লাগল, "ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!"

কোনো সাড়া নেই। সাড়া পাবেই বা কী করে, বিশু ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরেই অজ্ঞান। মানুষ কখনো নীচের দিকে মাথা করে ঝুলে থাকতে পারে? সব রক্ত এসে মাথায় জমে। বেশিক্ষণ এমনিভাবে থাকলে মানুষ মরেই যায়।

কয়েকবার ডেকে ডেকেও সাড়া না পেয়ে কুড়ানি বেশ ঘাবড়ে গেল। এখন সে কী করবে? ঠাকুর মশাইকে বাঁচাতেই হবে।

সে আবার উঠে এল ওপরে। সমস্ত জাহাজটা খুঁজে দেখতে লাগল। দস্যুরা জাহাজে কোনো পাহারা রেখে যায়নি। এখানে তো মানুষজন আসবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

খুঁজতে খুঁজতে কুড়ানি দেখল, একটা ঘরের মধ্যে অনেক তলোয়ার বর্শা রাখা আছে। কুড়ানি প্রথমে একটা তলোয়ার নেবার চেষ্টা করল। এদের তলোয়ার বেশ ভারী হয়, কুড়ানি এইটুকু মেয়ে, সে দু'হাতে একটা তলোয়ার তুলেও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না। তখন সে তলোয়ার রেখে একটা বর্শা তুলে নিল, এটাও বেশ ভারী, তবে সে উঁচু করে রাখতে পারে।

বর্শাটা নিয়ে সে চলে এল জাহাজের খোলে। তারপর সিঁড়ি থেকে ঝুঁকে সে বর্শার ফলা দিয়ে কাটার চেষ্টা করল দড়িটা। ভীষণ শক্ত জাহাজি দড়ি, তা কাটা সহজ নয়। তবু তলোয়ার দিয়ে কাটা যেতে পারত, কিন্তু বর্শা দিয়ে খোঁচা মারলেই বিশু ঠাকুরের শরীরটা বেশি দুলে ওঠে।

ভয়ে কুড়ানির বুক দুপ-দুপ করছে। যে-কোনো মুহূর্তে ডাকাতরা ফিরে আসতে পারে। তার আগে ঠাকুর মশাইয়ের দড়ি কাটতেই হবে। সে প্রাণপণে লক্ষ্য ঠিক রেখে বর্শার ফলাটা দিয়ে দড়ির ওপর পোঁচ লাগাতে লাগল। মনে হচ্ছে যেন এক যুগ কেটে যাচ্ছে। তারপর এক সময় হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেলেন বিশু ঠাকুর। কাঠের মেঝেতে তাঁর মাথাটা ঠকে গেল ঠকাং করে। আর অমনি এক পাশ কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

কুড়ানি এবার দৌড়ে নেমে গিয়ে বিশু ঠাকুরের পাশে বসে পড়ে মাথাটা তুলে নিল নিজের কোলে। কাছাকাছি কোনো জিনিসও নেই যে রক্ত মুছবে। সে কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে রেখে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগল, "ঠাকুর মশাই ঠাকুর মশাই!"

বিশু ঠাকুরের শরীরে একটুও স্পন্দন নেই।

কুড়ানি ভাবল, চোখে-মুখে জল ছেটালে বোধহয় কাজ হবে। সে আবার ছুটে গেল ওপরে। সে দেখেছে, দস্যুরা একরকম চামড়ার থলি থেকে প্রায়ই চুমুক দিয়ে জল খায়। অনেক সময় ঐ চামড়ার থলি তাদের কোমরে বাঁধা থাকে। সে দেখেছে, একটা ঘরে ঐরকম অনেকগুলো থলি রাখা আছে।

কুড়ানি যে-জিনিসটাকে জল ভাবছে, তা আসলে জল নয়। ওর নাম বুলেপঞ্জ। ওগুলো একরকমের নেশার জিনিস। ডাকাতরা সারাদিনই ঐ বুলেপঞ্জ মাঝে মাঝে এক চুমুক করে খায়, তাতে শরীর চাঙ্গা হয়।

সেই এক থলি বুলেপঞ্জ নিয়ে এসে কুড়ানি প্রথমে বিশু ঠাকুরের হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তারপর জল ভেবে সেই বুলেপঞ্জ ছেটাতে লাগল তাঁর চোখে-মুখে। মাথার কাটা জায়গাটাও ধুয়ে দিল। জোর করে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে খানিকটা ঢেলে দিল গলায়।

তারপর ধাক্কা দিতে দিতে সে ডাকতে লাগল, "ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই, উঠুন! শিগগির উঠুন!"

তবু বিশু ঠাকুর চোখ মেললেন না।

কুড়ানি ভাবছে যে, বিশু ঠাকুর এখন জ্ঞান ফিরে পেলে তারা দু'জনে পালাতে পারবে। সারা পৃথিবীতে কুড়ানির আর কেউ নেই। এই বিশু ঠাকুরই তার সঙ্গে নিজের বড় ভাইয়ের ব্যবহার করেছেন, উনি তাকে সাপে কামড়াবার পরও বাঁচিয়েছেন।

হঠাৎ কুড়ানির সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। একটা কথা ভেবেই দারুণ ভয় পেয়ে গেল সে। তার মনে হল, বিশু ঠাকুর যদি মরে গিয়ে থাকেন? নিশ্চয়ই মরে গেছেন। এত ডাকেও সাড়া দিচ্ছেন না কেন? তা হলে এখন তাঁর কী হবে?

আর কিছু ভাবতে না পেরে কুড়ানি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

৫

শায়েস্তা খাঁ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন ঢাকায়। বাংলার সুবেদার হয়ে তিনি চারদিকে প্রচার করে দিলেন যে, মোগল শাসন যে অমান্য করবে, তাকে তিনি একেবারে শায়েস্তা করে দেবেন। আসলে বাংলায় তার আগে শায়েস্তা বলে কোনো কথাই ছিল না! শায়েস্তা খাঁ আসার পরই কথাটা চালু হল।

বাংলায় তখন ছোট ছোট জমিদাররা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তারা নিজেদের স্বাধীন মনে করত। তাদের অনেকেরই পেশা ছিল ডাকাতি করা। দিনের বেলা তারা রাজা, রাত্তিরবেলা ডাকাত। শায়েস্তা খাঁ সৈন্য পাঠিয়ে এক এক করে এই সব ডাকাত-জমিদারদের ঠাণ্ডা করতে লাগলেন।

এই সব জমিদারদের দমন করা তেমন শক্ত নয়, কারণ এদের একটা করে নির্দিষ্ট জায়গা আছে, সেখানে আক্রমণ করা যায়। কিন্তু জলদস্যুদের ধরা তত সহজ কাজ নয়, তাদের খোঁজ পাওয়াই তো কঠিন। তারা ঝড়ের বেগে এসে কোনো জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর খুব তাড়াতাড়ি লুঠপাট করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। বাংলা দেশে অসংখ্য নদী-নালা, তার মধ্যে কোথায় যে তারা ঘাপটি মেরে থাকে, তা জানবার উপায় নেই। আর কখনো বা তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করলে একেবারে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায়।

শায়েস্তা খাঁর এক সেনাপতির নাম তকী খাঁ। এই তকী খাঁ সুবেদার শায়েস্তা খাঁর একেবারে ডান হাতের মতন। শায়েস্তা খাঁ মোটাসোটা, ভারী চেহারার মানুষ আর এই তকী খাঁ ছিপছিপে লম্বা, চিবুকে একটুখানি নুর চোখ দুটি ঝকঝকে। যেমন সে লড়াইতে দক্ষ, তেমন তার বুদ্ধি।

স্বয়ং সম্রাট ঔরঙ্গজেব হুকুম দিয়েছেন যে, যেমন করেই হোক বাংলা থেকে ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের একেবারে নিকেশ করতেই হবে। সেইজন্য শায়েস্তা খাঁ প্রথম কিছুদিন ঢাকায় বসে রাজ্যশাসনে মন দিয়ে তকী খাঁর ওপর ভার দিলেন জলদস্যুদের দমন করার।

তকী খাঁ জাহাজ নিয়ে জলপথে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোথাও জলদস্যুদের দেখা পায় না। অথচ তাদের অত্যাচার ঠিকই চলছে।

দু'মাস বাদে শায়েস্তা খাঁ তকী খাঁকে ডেকে খোঁজখবর নিলেন।

তকী খাঁ লম্বা সেলাম ঠুকে লজ্জিতভাবে বলল, "মালেক, আজ পর্যন্ত তাদের দেখাই পেলাম না তো লড়াই করব কী? এমন দুশমনের কথা আমি আগে শুনিনি!"

শায়েস্তা খাঁ বললেন, "তামাম বাংলায় জলদস্যুদের অত্যাচারে হাহাকার পড়ে গেছে। সব জায়গায় তাদের অত্যাচার চলছে। আর তুমি তাদের দেখাই পেলে না? এ কী আজব কথা!"

তকী খাঁ বলল, "মালেক, আমার ধারণা, ওদের গুপ্তচর আছে। আমরা যখন যেখানে যাই, ওরা আগে থেকেই তার সন্ধান পেয়ে যায়। আর অমনি সরে পড়ে।"

শায়েস্তা খাঁ বললেন, "গুপ্তচর কারা তাদের খুঁজে বার করো। আর ধরে ধরে কোতল করো।"

তকী খাঁ বলল, "আমরা এখানে পরদেশি, ওদের গুপ্তচর-দের আমাদের পক্ষে চেনা শক্ত। আমাদেরও কিছু গুপ্তচর রাখা দরকার। এখানকার কিছু লোকদেরই শিখিয়ে-পড়িয়ে কাজে লাগাতে হবে।"

শায়েস্তা খাঁ বললেন, "তবে আর দেরি না করে তাই করো! এ বছরের মধ্যেই জাঁহাপনা আলমগিরের কাছে আমাদের জয়ের খবর পাঠাতে চাই।"

পাঁচশো লোককে গুপ্তচরের কাজ শিখিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল সুবে-বাংলায়। তারা ফকির, দরবেশ, ভিখারি সেজে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

সেই গুপ্তচররা একবার খবর আনল যে, সুন্দরবনের রায়-মঙ্গল নদীর ধারে মোল্লাখালি নামে একটা জায়গায় জলদস্যুদের একটা ঘাঁটি আছে। সেখানকার তিন-চারখানি গ্রাম দস্যুরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দিয়েছে, মানুষজন সব পালিয়েছে। নানান জায়গায় ডাকাতি করার পর জলদস্যুরা সেখানে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে আসে।

তকী খাঁ চারখানি জাহাজে সৈন্য সাজিয়ে বেরিয়ে পড়ল অভিযানে।

রায়মঙ্গল নদীতে মোল্লাখালির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে জাহাজগুলো। কামান সাজানো আছে, সৈন্যরা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে তৈরি। তকী খাঁর খুব ইচ্ছে, একবার ডাঙায় নেমে দস্যুগুলোকে সামনে পেলে হয়। মুখোমুখি যুদ্ধে মোগলদের সঙ্গে কেউ পারবে না। জলের ওপর যুদ্ধ করার অভ্যেস নেই তকী খাঁর। তবে জাহাজে শক্তিশালী কামান আছে, দস্যুরা কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

বিকেল হয়ে গেছে বলে তকী খাঁ নদীর বাঁকের আড়ালে নোঙর ফেলার হুকুম দিল। অচেনা জায়গায় সন্ধের পর যুদ্ধ শুরু না করাই ভাল। গুপ্তচরের মুখে তকী খাঁ আগেই খবর জেনেছে যে যদি পালাবার চেষ্টা করে তাহলে জলদস্যুদের এই দিক দিয়েই পালাতে হবে। কেননা, অন্যদিক দিয়ে পালাতে গেলে তারা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়বে, সেদিক দিয়ে আর সমুদ্রে বেরুবার পথ নেই।

তকী খাঁ প্রত্যেক জাহাজে সৈন্যদের সজাগ হয়ে পাহারায় থাকতে বলে দিল।

মাঝরাত্রে একটা জাহাজে দারুণ শোরগোল শোনা গেল। দুটো বাঘ কখন সাঁতরে এসে সেই জাহাজে উঠে পড়েছে। সুন্দরবনের বাঘ এমন সাহসী যে, মোগল সৈন্যদেরও পরোয়া করে না। বাঘের হুংকার আর লোকজনের ভয়ার্ত চিৎকারে খানখান হয়ে যেতে লাগল রাত্রির নিস্তব্ধতা।

বাঘের সঙ্গে লড়াই করার শিক্ষা তো মোগল সৈন্যরা পায়নি। তারা প্রথমে ভাবল, জলদস্যুরা বুঝি জাহাজে বাঘ পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেকে ভয়ে জাহাজের খোলের মধ্যে লুকোল। ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন শুনলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কয়েকজন সৈন্য বুদ্ধি করে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারতে লাগল বাঘ দুটির ওপর। তকী খাঁ নিজে অন্য জাহাজ থেকে লাফিয়ে চলে এল বাঘের সঙ্গে লড়তে।

শেষ পর্যন্ত একটা বাঘকে মারা গেল কোনোরকমে, অন্য বাঘটি জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পালাল। সাতজন মোগল সৈন্য মারা গেল আর আহত হল পনেরো-কুড়ি জন।

বাঘের কথা ভেবেই জাহাজগুলো তীরের কাছে না ভিড়িয়ে রাখা হয়েছিল মাঝ-নদীতে। সুন্দরবনের বাঘ যে সাঁতরে আসে, তা মোগল সৈন্যরা জানত না।

পরদিন সকালে মোগলবাহিনী মোল্লাখালিতে নেমে দেখল সেখানে একটিও ডাকাত নেই। কয়েকটি চালাঘর ও কিছু কিছু বাসনপত্র দেখে বোঝা যায়, সেখানে মাঝে মাঝেই মানুষজন আসে। আর রয়েছে দু-তিনটি গোরু আর শ' খানেক মুরগি। এই বাঘের দেশে তো কেউ এমনভাবে গোরু ফেলে রেখে যায় না!

গুপ্তচরদের মুখে তকী খাঁ পাকা খবর পেয়েছিল যে, মাত্র তিনদিন আগেই সেখানে একদল জলদস্যু এসেছে, তাদের তিনখানা জাহাজও দেখা গেছে। সাধারণত তারা আট-দশ দিন বিশ্রাম নেয়। তবে কি ডাকাতরাও আগে থেকে খবর পেয়ে পালিয়েছে? কিন্তু পালাল কোন্ পথ দিয়ে? এই ডাকাতগুলো কি জাদু জানে?

জাহাজ নিয়ে কাছাকাছি নদীগুলোতে ঘুরে দেখে এল তকী খাঁ। কোথাও জলদস্যুদের কোনো চিহ্ন নেই। এবারের অভিযানও ব্যর্থ হল। রাগের চোটে তকী খাঁ মোল্লাখালিতে ডাকাতদের যতগুলো চালাঘর ছিল সব-কটিতে আগুন ধরিয়ে দিল। আর গোরু ও মুরগিগুলোকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলল সৈন্যরা।

তিন দিন মোল্লাখালিতে অপেক্ষা করার পর তকী খাঁ ফিরে যাওয়াই ঠিক করল। রাত্রে বাঘের গর্জন শুনে কিছুতেই ঘুম আসে না। এ-রকম জায়গায় আর পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

মোগলদের জাহাজগুলো মোল্লাখালি ছেড়ে কিছুদূর মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় ঝড় উঠল। সকালবেলাও আকাশ ছিল নীল, অথচ কোথা থেকে ধেয়ে এল রাশি রাশি মেঘ। আর সে কী তুমুল ঝড়! নদীতেও ঢেউ উঠল সমুদ্রের মতন। বড় বড় জাহাজগুলো হেলে পড়তে লাগল; একটা জাহাজ উলটেই গেল।

অধিকাংশ মোগল সৈন্যই সাঁতার জানে না। আর রায়-মঙ্গল নদী অতি বিশাল, প্রবল স্রোতের মধ্যে সাঁতার জানলেও বিশেষ সুবিধে হয় না। তার ওপর আছে কুমির আর কামঠের উপদ্রব। মোগল সৈন্যরা হাত-পা ছুঁড়ে ডুবে যেতে লাগল। অন্য জাহাজের লোকেরা তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে কী, তারা তাদের নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি, চতুর্দিক ঝাপসা হয়ে এল, কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ ধুড়ুম করে এক কামানের গোলা এসে পড়ল তকী খাঁর জাহাজে। কোথা থেকে, কে কামান দাগল? ভাবতে না ভাবতেই আরও কয়েকটি কামানের গর্জন ভেসে এল। তকী খাঁর জাহাজ ফুটো হয়ে জল ঢুকতে লাগল হুড়হুড়িয়ে।

আসলে হয়েছিল কী, সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য খাঁড়ি আছে, সেখানে শুধু নৌকো যায়, বোম্বেটেরা তাদের ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে লুকিয়ে ছিল সে-রকম একটা খাঁড়িতে। চার পাশে এমন জঙ্গল যে, একটু দূর থেকেও কিছু দেখা যায় না। আর মোগলরা এদিককার নদীপথ চেনে না, তাদের পক্ষে তো সন্ধান পাবার উপায়ই নেই। ঝড়বৃষ্টি শুরু হবার পর ফিরিঙ্গি দস্যুরা মোগল জাহাজগুলোর দিকে ধেয়ে এসেছে।

জলদস্যুরা বারো মাসই প্রায় নদী বা সমুদ্রের ওপর কাটায়, সুতরাং ঝড়বৃষ্টিকে তারা গ্রাহ্য করে না। মোগলদের অনেক বেশি সৈন্য ও বড় বড় কামান থাকলেও তারা লড়াইতে সুবিধে করতে পারল না। তারা দেখতেই পাচ্ছে না যে, বোম্বেটেরা কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করছে! তারাও এলোমেলো ভাবে কামান দাগতে শুরু করল।

মোগলদের একটি জাহাজ আগেই ডুবে গিয়েছিল, তকী খাঁর জাহাজটাও ডুবতে শুরু করল। অন্য দুটি জাহাজ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। তকী খাঁ-ও সাঁতার জানে না, জলে ডুবে মরার ভয়ে সন্ধি করার জন্য তার জাহাজে উড়িয়ে দিল সাদা পতাকা।

জলদস্যুরা সন্ধি-টন্ধি গ্রাহ্য করে না। সেই ডুবন্ত জাহাজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে গোলা চালাতে লাগল তারা। মোগল সৈন্যরা প্রাণভয়ে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। শুধু তকী খাঁ একা বীরের মতন খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডেকের ওপর।

একসময় তাকে নিয়েই গোটা জাহাজটা ভুস করে ডুবে গেল রায়মঙ্গল নদীতে।

জলদস্যুদের সঙ্গে প্রথম লড়াইতে হার হল মোগল বাহিনীর।

এই লড়াইতে জলদস্যুদের নেতা ছিল গঞ্জালেসের ভাই। সে এই দারুণ সংবাদ শোনাবার জন্য সমুদ্রমোহনার দিকে ছুটল।

যথাসময়ে এই খবর শুনে শায়েস্তা খাঁ একই সঙ্গে রাগ ও দুঃখে অধীর হয়ে পড়লেন। তকী খাঁ ছিল তাঁর অতি প্রিয় সেনাপতি। এমন ভাবে, প্রায় বিনা যুদ্ধে হেরে গিয়ে তকী খাঁকে প্রাণ হারাতে হল, এর চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে! তাছাড়া, জলদস্যুদের কাছে এমনভাবে হেরে যাবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাংলার মানুষের কাছে মোগলদের মান থাকবে না।

শায়েস্তা খাঁ ঠিক করলেন. আলাদা আলাদা ভাবে জলদস্যুদের দলগুলির সঙ্গে লড়াই করে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। একই সঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের দমন করতে হলে তাদের মূল ঘাঁটিটাই ভেঙে দেওয়া দরকার। এজন্য চট্টগ্রাম দখল করতে হবে। চট্টগ্রাম এবং তার আশপাশের দ্বীপগুলিতেই ওদের পরিবারের লোকজন থাকে। তাদের ধরতে পারলেই অনেকখানি কাজ হবে।

স্থলপথে পঁচিশ হাজার সৈন্য এবং জলপথে এগারোখানি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে শায়েস্তা খাঁ নিজে চললেন চট্টগ্রাম জয় করতে।

৬

এদিকে বিশু ঠাকুরের এক সময় জ্ঞান ফিরল। তখনো কুড়ানি তাঁর পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। মাথায় অসহ্য ব্যথা। সমস্ত শরীরের তুলনায় মাথাটা অসম্ভব রকম ভারী হয়ে গেছে, কিন্তু খুব চেষ্টা করেও তুলতে পারলেন না মাথা। চোখের পাতা খুললেই যেন মনে হচ্ছে চোখের মধ্যে ফুটে যাচ্ছে হাজার হাজার সুঁচ।

যন্ত্রণা আর সইতে না পেরে তিনি বলে উঠলেন, ''উফ্! মাগো!''

কুড়ানির কান্না থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে বুঝতে পারল, ঠাকুর মশাই বেঁচে আছেন! সে অমনি বিশু ঠাকুরের বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বলতে লাগল, ''ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই! উঠুন!''

বিশু ঠাকুরের মনে হল যেন বহু দূর থেকে কেউ তাঁকে ডাকছে।

তিনি অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন, "জল! একটু জল!"

কুড়ানি অমনি জল ভেবে চামড়ার থলে থেকে আরও খানিকটা বুলেপঞ্জ ঢেলে দিল বিশু ঠাকুরের গলায়। যে-হেতু বুলেপঞ্জ খুব কড়া ধরনের আরক, তাই সেটাতে বিশু ঠাকুরের গলা জ্বালা করতে লাগল। এবং তার ফলেই তাঁর শরীরে খানিকটা জোর এল।

এবার তিনি কুড়ানির 'ঠাকুরমশাই' 'ঠাকুরমশাই' ডাক অনেকটা স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তিনি জোর করে চোখ খুললেন। কিন্তু দেখলেন শুধু মিশমিশে অন্ধকার। যদিও তখন বিকেল-বেলা, জাহাজের খোলের মধ্যেও আলো আছে।

তিনি কুড়ানিকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''কে?''

''ঠাকুরমশাই. আমি কুড়ানি!''

বিশু ঠাকুরের মনেই পড়ল না যে, তিনি কোথায় আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''এত রাত্তিরে তুই কী করছিস?''

কুড়ানি বলল, ''ঠাকুরমশাই, এখন রাত্তির কোথায়. এখন বিকেল। শিগগির উঠুন, এখন ডাকাতরা কেউ নেই, পালাতে হবে।''

বিকেল কথাটা শুনে বিশু ঠাকুর একটু চমকে উঠলেন। তিনি উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

তিনি বললেন, ''কুড়ানি, আমার মাথাটা তুলে ধর!''

কুড়ানির গায়ে কতটুকুই বা জোর। তবু সে অতিকষ্টে বিশু ঠাকুরের মাথাটা টেনে তুলল। বিশু ঠাকুর উঠে বসেও আবার পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোরকমে কুড়ানিকে ধরে রইলেন। শরীরে এত কষ্ট হচ্ছে যে, আর যেন সহ্য করতেই পারবেন না, এক্ষুনি প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তিনি যন্ত্রণায় 'ওফ্' 'ওফ্' করতে লাগলেন।

একটু বাদে খানিকটা দম নিয়ে তিনি বললেন, ''কুড়ানি. তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমি কি অন্ধ হয়ে গেলুম!''

কুড়ানি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, ''না, ঠাকুরমশাই, না না, আপনি অন্ধ হবেন না। আপনাকে ওরা উলটো করে ঝুলিয়ে রেখেছিল। আমি দড়ি কেটে দিয়েছি। ওরা ফিরে এসে আপনাকে দেখলে মেরে ফেলবে। আমাকেও মেরে ফেলবে।''

বিশু ঠাকুরের মনে হল, তাঁর এখন মরে যাওয়াই ভাল। মরলেই তো সব যন্ত্রণা কমে যাবে।

পরমুহূর্তেই তিনি আবার মাথা ঝাঁকালেন। না. বাঁচতেই হবে, যে-রকম ভাবেই হোক, বাঁচতেই হবে।

তিনি বললেন, ''জল বলে কী খাওয়ালি? আমাকে আবার একটু দে তো!''

কুড়ানি চামড়ার থলিটা এগিয়ে দিল। বিশু ঠাকুর ঢকঢক করে সবটা বুলেপঞ্জ খেয়ে ফেললেন। তাতে যেন তাঁর শরীরে অনেকটা শক্তি ফিরে এল। চোখের অন্ধকারটা একটু-একটু করে ঝাপসা হতে-হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন কুড়ানিকে।

কুড়ানি ব্যাকুলভাবে ফিসফিস করে বলল, ''ঠাকুরমশাই, ডাকাতরা সবাই নীচে নেমে গেছে চলুন, এই বেলা আমরা পালাই!''

বিশু ঠাকুর বললেন, ''আমার মাথায় বড্ড ব্যথা রে, কুড়ানি, আমি মাথা তুলে রাখতে পারছি না! আমার আবার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে!''

''ডাকাতরা আবার যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে!''

বিশু ঠাকুর আস্তে আস্তে অতি কষ্টে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন। কুড়ানি বর্শাটা তুলে এনে বলল, ''এই যে, এটা নিন!''

বিশু ঠাকুর বর্শাটাকে লাঠির মতন করে ধরলেন। তারপর খানিকটা দম নেবার পর জিজ্ঞেস করলেন, ''বাকি লোকরা কোথায় গেল?''

''তাদের পারে নিয়ে গেছে। সেখানে খুব জঙ্গল!''

''তোকে নিয়ে গেল না কেন?''

''আমায় দেখতে পায়নি!''

'' চল দেখি যাওয়া যায় কি না।''

বুড়ো মানুষের মতন বর্শাটাকে লাঠির মতন ভর দিয়ে তিনি টলতে-টলতে এগোলেন সিঁড়ির দিকে। পা যেন আর চলছেই না!

সিঁড়ির কাছে গিয়ে তিনি এক পা উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন হুড়মুড়িয়ে। কুড়ানি তাঁকে ধরতে গিয়েও পারল না।

বিশু ঠাকুর আবার আস্তে-আস্তে উঠলেন। এবার শান্ত-ভাবে বললেন, ''চল কুড়ানি, যেতে তো হবেই! প্রাণ থাকতে আমি ক্রীতদাস হব না!''

ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে তিনি উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে। ওপরে এসেই তিনি শুয়ে পড়লেন আবার। বহুক্ষণ তাঁকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বলে, সব রক্ত এসে গেছে মাথায়, তাঁর শরীরে আর একটুও জোর নেই। কুড়ানি এসে দড়ি কেটে না নামালে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মরে যেতেন।

কুড়ানি আবার তাঁকে ঠেলতে লাগল।

''ঠাকুরমশাই, উঠুন, উঠুন!''

''আমি আর পারছি না রে!''

কুড়ানি ছুটে গিয়ে জাহাজের ভাঁড়ার-ঘর থেকে আর-একটি বুলেপঞ্জের থলি এনে বলল, ''ঠাকুরমশাই, আর একটু জল খাবেন?''

বিশু ঠাকুর বললেন, ''নাঃ!''

অসম্ভব মনের জোর দিয়ে তিনি উঠে বসলেন। কুড়ানিকে বললেন, ''গোখরো সাপ কামড়ালে কেউ বাঁচে না। তুই বাঁচলি কী করে রে?''

''ঠাকুরমশাই, আপনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমি জানি!''

''কে জানে, আমি বাঁচিয়েছি না ভগবান বাঁচিয়েছেন! কিন্তু বাঁচিয়েই বা কী লাভ হল, এবার তো ক্রীতদাসী হবি!''

''আমরা পালাতে পারব না?''

''ওরে, আমি হাঁটতেই পারছি না, পালাব কী করে? আচ্ছা দেখি শেষ চেষ্টা করে।''

দাঁড়িয়ে উঠে লাঠি ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন আবার। জাহাজের যে দিকটাকে পোর্ট সাইড বলে, তিনি এগোলেন সেই দিকে, খুব আস্তে-আস্তে, দুলতে দুলতে।

কুড়ানি বলল, ''ঠাকুরমশাই, ডাকাতরা ঐদিকেই নেমেছে!''

''দাঁড়া, আগে দেখে নিই, ওরা কতদূরে আছে!''

বিশু ঠাকুর ডেকের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই ওদিক থেকে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একজন জলদস্যু। সে এসেছে জাহাজ থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য। সে প্রথমে বিশু ঠাকুরকে দেখতেই পায়নি। শিস দিতে দিতে উঠে আসছিল। ডেকের ওপরে মুখ বাড়িয়ে বিশু ঠাকুরকে দেখেই সে হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, ''হোয়া হো! এ গোস্ট!''

বিশু ঠাকুর এক মুহূর্তও চিন্তা করার সময় পেলেন না। তাঁর শরীরে যেন অসুরের শক্তি এসে গেল, তিনি এক লাফে এগিয়ে গিয়ে হাতের বর্শাটা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারলেন দস্যুটার মাথায়। সে ঝুপ করে নীচে জলে পড়ে গেল।

বিশু ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কুড়ানি, তুই অজ্ঞানের ভান করে পড়ে থাক। আমি চললাম!''
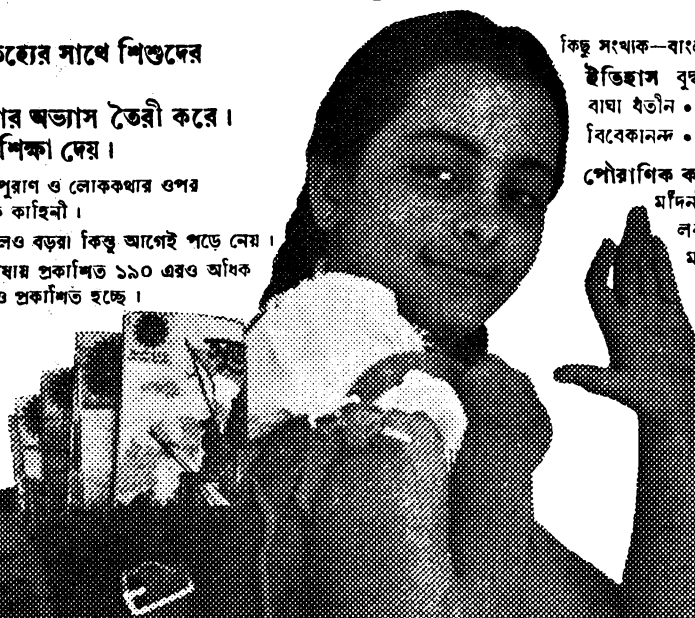
তিনি দৌড়োলেন উল্টোদিকের ডেকে, স্টার বোর্ডের দিকে।

বিশু ঠাকুরের দুর্ভাগ্য এই যে, জলদস্যু মোটে একজন আসেনি। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে আরও তিনজন দস্যু উঠছিল। একজনকে পড়ে যেতে দেখে বাকি দুজন একটু থমকে গেল, তারপরই তরতর করে উঠে এল ওপরে।

বিশু ঠাকুর স্টারবোর্ডের রেলিং পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলেন না। দস্যুরা পেছন থেকে তাঁকে কচুকাটা করবে বুঝতে পেরে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। একটু আগে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না, আর এখন তিনি ঘুরে-ঘুরে লাফিয়ে-লাফিয়ে সেই বর্শা হাতে নিয়ে লড়তে লাগলেন তিনজন দস্যুর সঙ্গে। এরই মধ্যে একটা চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরছে। যে-কোনো উপায়েই হোক, এই তিনজন বোম্বেটেকে হারাতেই হবে। তা হলে তিনি উল্টো দিকে জলে লাফিয়ে পড়তে পারবেন।

প্রথম যে দস্যুটি মাথায় আঘাত খেয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিল, সে মরেনি। সে জল-কাদার মধ্যে পড়ে থেকেই চিৎকার করতে লাগল, ''এ গোস্ট! এ গোস্ট! এ গোস্ট অন বোর্ড, জাহাজের ওপরে একটা ভূত!''

সেই চিৎকার শুনে আরও কয়েকজন দস্যু ধেয়ে এল জাহাজের দিকে।

বিশু ঠাকুর লড়াই করে তিনজনের মধ্যে দু'জনকে যখন মাটিতে শুইয়ে ফেলেছেন, ঠিক সেই সময় জাহাজের ওপরে উঠে এল আরও আট-দশজন দস্যু।

বিশু ঠাকুর হাতের বর্শাটা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে শেষ চেষ্টা করলেন রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়বার, তার আগেই তিন-চারজন লাফিয়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ের ওপর।

বিশু ঠাকুর যে-ই বুঝলেন যে, এবারও তাঁর পালানো হ'ল না, অমনি তাঁর শরীর থেকে সব শক্তি চলে গেল। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

দস্যুরা তাঁর অচেতন শরীরটার ওপরেই লাথি কষাতে লাগল সবাই মিলে।

একজন তলোয়ার তুলে তাঁর মুন্ডুটা কেটে ফেলতে গেলে অন্য একজন দস্যু বাধা দিল। কারণ কাপ্তান গঞ্জালেসকে আগে সব ঘটনাটা জানানো দরকার।

খবর পেয়েই একটু পরে কাপ্তান সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস নিজে দেখতে এল জাহাজে। বিস্ময়ে তার ভুরু কুঁচকে গেল। এই লোকটাকে প্রায় ১৪ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মাথা উল্টো করে। তারপরও এ বেঁচে আছে! শুধু তাই নয়, তারপরও এই লোকটা শুধু একটা বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করে তিনজন দস্যুকে ঘায়েল করেছে! ভীরু, দুর্বল বাঙালির এত শক্তি!

গঞ্জালেস বলল "নাঃ, এ লোকটাকে মারবার দরকার নেই এক্ষুনি। দেখা যাক, ও আরও কতদিন এমন ভাবে বেঁচে থাকতে পারে! বিক্রি করলে ওর জন্য ভাল দাম পেতে পারি, কিংবা ওকে আমাদের দলেও নিয়ে নিতে পারি। তোরা এক কাজ কর, ওকে এই একটা মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে রাখ। খাবার কিংবা জল কিছুই দিবি না! ওর যদি জ্ঞান ফেরে, ওকে জিজ্ঞেস করবি, কী রে বাঙালি, আমাদের দলে যোগ দিবি? যদি 'হ্যাঁ' বলে, তা হলে খবর দিবি আমাকে। আর যদি 'না' বলে, তা হলে দশ ঘা করে চাবুক কষাবি! যতবার 'না' বলবে, ততবার দশ ঘা করে চাবুক!"

তাই হল। দস্যুরা বিশু ঠাকুরের অচেতন দেহটা তুলে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখল একটা মাস্তুল-দন্ডের সঙ্গে। দড়ির বদলে বাঁধল লোহার শিকল দিয়ে, যাতে আর কিছুতেই খোলা না যায়। দু'জন দস্যুকে পাহারায় রাখা হল সেখানে।

কুড়ানি এর মধ্যে জাহাজের এক কোণে দৌড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল অজ্ঞানের ভান করে। ডাকাতরা কেউ তার দিকে নজর করল না।

একবার, দুবার, তিনবার বিশু ঠাকুর চেষ্টা করেছিলেন দস্যুদের কবল থেকে পালাবার। তিনবারই তিনি ব্যর্থ হলেন। ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাতে একবার ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই।

সন্ধের পর সব বন্দীদের ফিরিয়ে আনা হল জাহাজে। হঠাৎ দারুণ মেঘ করে বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টি চলল, সারা রাত এবং পরের দিনও।

এই বৃষ্টির মধ্যে গম্বুজ তৈরির কাজ চলে না। তা ছাড়া বৃষ্টির সময় জঙ্গলের বড়-বড় জোঁক বেরোয়। গাছের ডাল থেকে টুপ-টুপ করে জোঁক খসে পড়ে। জোঁক যখন গায়ে লাগে তখন কিছুই বোঝা যায় না, এক সময় দেখা যায়, তারা রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। দস্যুরা বাঘের চেয়েও এই জোঁকগুলোকে বেশি ভয় পায়।

আগের দিন গঞ্জালেস তার দলবল নিয়ে তিনটি হরিণ শিকার করেছিল। বৃষ্টির মধ্যে কিছুই করবার নেই বলে তারা সেই হরিণগুলোকে পুড়িয়ে মাংস খেল আর বুলেপঞ্জ পান করতে করতে বিকট গলায় দারুণ হৈ-হল্লা করে গান গাইতে লাগল।

জাহাজের খোলের বন্দীরা কিন্তু এক টুকরো মাংসও পেল না। তাদের জন্য শুধু শুকনো রুটি।

সেই দিন এবং রাতেও টানা বৃষ্টি হওয়ায় বিরক্ত হয়ে উঠল কাপ্তেন গঞ্জালেস। কোনো কাজ ছাড়া চুপচাপ এক জায়গায় থেমে থাকা তার একদম পছন্দ নয়। এই সময় আর একটা গ্রাম লুঠ করলে বরং কাজে দিত। কিন্তু এই জাহাজে আর বন্দী নেবার জায়গা নেই। এই বন্দীগুলোকেও আর বেশি দিন বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবার কোনো মানে হয় না।

পরদিন সকালেও বৃষ্টি কমল না দেখে গঞ্জালেস হুকুম দিল জাহাজ ছাড়ার।

এর মধ্যে বিশু ঠাকুরের একবারও জ্ঞান ফেরেনি। দস্যুরা বিনা কারণেই যাওয়া-আসার পথে তার গায়ে দু' এক ঘা করে চাবুক কষিয়েছে, কিন্তু তাতে বিশু ঠাকুর একটু কেঁপেও ওঠেননি।

জাহাজ মোহনা ছেড়ে পড়ল সমুদ্রে। তারপর চলল চট্টগ্রামের দিকে।

কিছুদূর যাবার পরই দূরে দেখা গেল আর-একটা জাহাজ।

দস্যুদের জাহাজের মাস্তুলের ডগায় সব সময় একজন করে লোক চড়ে বসে থাকে। তারা চতুর্দিকে লক্ষ রাখে। সেই লোকটি দূরের অন্য জাহাজটি দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "হাই হো! হাই হো! স্টার বোর্ডের দিকে জাহাজ!"

কাপ্তান গঞ্জালেস তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। একজন গিয়ে তাকে ডেকে তুলতেই সে ক্যাবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে চোখে দূরবিন লাগিয়ে দেখতে লাগল দূরের জাহাজটিকে।

চিহ্ন দেখে মনে হল, সেটা মগদের জাহাজ। মগদের সঙ্গে বোম্বেটেদের আঁতাত আছে। কিন্তু জলদস্যুরা কারুকেই পুরো-পুরি বিশ্বাস করে না। তারা কামান সাজিয়ে তৈরি হয়ে রইল, দস্যুরা ডেকের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে।

একটু কাছে আসবার পর অন্য জাহাজটি উড়িয়ে দিল সাদা পতাকা। এটা বন্ধুত্বের চিহ্ন। শুধু তাই নয়, গঞ্জালেস দূরবিনে দেখতে পেল যে, অন্য জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে আরাকানের মগ রাজার এক ভাই আনাপুরাম। এই আনাপুরামের সঙ্গেই বোম্বেটেদের ক্রীতদাস-ব্যবসা চলে। কিন্তু আনাপুরাম তো চট্টগ্রাম ছেড়ে এতদূর কখনো আসে না।

দুই জাহাজ এসে লাগল পাশাপাশি। মাঝখানে একটা কাঠের পাটাতন ফেলে দেওয়া হ'ল। তার ওপর দিয়ে আনাপুরাম দস্যুদের জাহাজে চলে আসতেই গঞ্জালেস তাকে সাদরে

আলিঙ্গন করে বলল, "ওয়েল কাম, রাজকুমার!"

আনাপুরামও বলল, "তোমায় দেখে খুব খুশি হলাম, প্রিয়-বন্ধু, কাপ্তান সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও!"

গঞ্জালেসের চেহারা যেমন বিশাল, তেমনি আনাপুরামের চেহারাটি রোগা, পাতলা। কিন্তু তার মাথায় নানারকম মণি-মুক্তো বসানো একটা লম্বা ধাঁচের মুকুট, আর গায়ের লম্বা ঢিলে মখমলের আলখাল্লাটিতে সোনার চুমকি বসানো।

গঞ্জালেস জিজ্ঞেস করল, "রাজকুমার, কী ব্যাপার? আপনি চট্টগ্রাম ছেড়ে এতদূরে এসেছেন যে?"

আনাপুরাম বলল, "আপনি অনেকদিন ক্রীতদাস সরবরাহ করেননি। তাই আপনার খবর নিতে এলাম!"

গঞ্জালেস হো-হো করে হেসে বলল, "আমার জাহাজ ভর্তি দাস-দাসী। আমি নিজেই তো আপনাকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম!"

আনাপুরাম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি ভাবছি, এবার দাস-দাসীগুলোকে সিংহলের বাজারে বিক্রি করব। ওখানে ভাল দাম পাওয়া যায়!"

গঞ্জালেস একটু অবাক হল। আরাকান রাজ্যেই প্রচুর ক্রীত-দাসের চাহিদা আছে। আরাকানের রাজা সব সময়ই বোম্বেটেদের বলেন, আরও দাস-দাসী পাঠাও। আর এখন আনাপুরাম চাইছে সিংহলে দাস-দাসী বিক্রি করতে!

আনাপুরাম বলল, "চলুন, আগে দাস-দাসীদের দেখে আসি। তারপর আপনার সঙ্গে আমার অন্য একটা জরুরি কথা আছে। আপনি অনেকবার আমাকে অনেক বিপদে সাহায্য করেছেন, আপনাকে আর-একবার সাহায্য করতে হবে!"

গঞ্জালেস বলল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!"

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল জাহাজের খোলে। সঙ্গে এল দু' পক্ষের আরও কয়েকজন। শেকলে বন্দীরা সব সার দিয়ে বসে আছে। তাদের কারুর শোওয়ার উপায় নেই, তাই বসে বসেই ঘুমোচ্ছে অনেকে।

যদিও দুপুরবেলা, খোলের মধ্যে যথেষ্ট আলো আছে, তবু দু'জন দস্যু মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এল। এই লোকগুলোর মধ্যে কেউ কানা-খোঁড়া কি না দেখতে হবে।

গঞ্জালেসের হুকুমে উঠে দাঁড়াল সব বন্দীরা। আনাপুরামের একজন সহচর প্রত্যেকের গা-হাত-পা টিপে টিপে দেখতে লাগল। আর বিড়-বিড় করে বলতে লাগল, "বেশির ভাগেরই স্বাস্থ্য ভাল না, বাজে মাল, বাজারে ভাল দাম পাওয়া যাবে না!"

অর্থাৎ দাম কমাবার চেষ্টা। এখুনি দরাদরি শুরু হবে।

দু'জন মাত্র বন্দীকে পছন্দ হল না আনাপুরামের। ওদের বয়েস বড্ড বেশি, কোনো খদ্দের ওদের নেবে না।

গঞ্জালেস তার এক অনুচরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ একটু পরে ঐ বুড়ো দু'জনকে মেরে জলে ফেলে দিলেই হবে!

দরদাম হল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, যারা বেশ জোয়ান পুরুষ ও যুবতী মেয়ে, তাদের প্রত্যেকের দাম ৩৫ স্বর্ণমুদ্রা, একটু বেশি-বয়সীদের দাম ২৫ আর ছোটদের দাম ২০। কুড়ানি বুদ্ধি করে এক ফাঁকে এই বন্দীদের মধ্যে এসে মিশে ছিল, তাই সে-ও বিক্রি হয়ে গেল ২০টি স্বর্ণমুদ্রায়।

এবার আনাপুরাম উঠে এল ওপরে। হঠাৎ মাস্তুলে বাঁধা বিশু ঠাকুরের দিকে তার চোখ পড়ল।

গঞ্জালেসকে সে জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটা এখানে কেন?"

গঞ্জালেস হাসতে-হাসতে বলল, "এ এক বিচিত্র জীব! এর ওপর যা অত্যাচার করা হয়েছে, তাতে এর অন্তত তিনবার মরে যাবার কথা! কিন্তু এমন কড়া জান, এখনো বেঁচে আছে। দ্যাখো, প্রায় দু' দিন ধরে ওকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে, খাবার কিংবা জল কিছুই দেওয়া হয়নি, তবু এখনো বেঁচে আছে। জ্ঞান নেই, কিন্তু নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে!"

আনাপুরাম বলল, "আশ্চর্য! তবে শুনেছি, অনেক ভারতীয় যোগী এরকম পারে! দিনের পর দিন না খেয়ে বেঁচে থাকে!"

গঞ্জালেস বলল, "লোকটা একটা মন্দিরে পুজো করত। হতেও পারে কোনো যোগী! ভাবছি, ওকে আমার দলে নিয়ে নেব! তবে রাজি হবে কি না সন্দেহ! এক-একটা বাঙালি থাকে এমন গোঁয়ার, যে কিছুতেই কথা শোনে না!"

আনাপুরাম বলল, "ওদের বশ করা খুব সোজা! মন্দিরে যখন পুজো করত, তখন নিশ্চয়ই ও লোকটা ব্রাহ্মণ! ওর জ্ঞান ফিরলে, ওর মুখে এক টুকরো গরুর মাংস গুঁজে দেবে জোর করে। তাতেই ওর জাত যাবে। জাত চলে যাবার পর, তুমি যা বলবে, তাই শুনবে। আমরা তো সব ক্রীতদাসদের নিয়ে প্রথমে তাই করি।"

গঞ্জালেস বলল, "তাই নাকি! ঠিক আছে, ওর জ্ঞান ফিরলে চেষ্টা করা যাবে।"

গঞ্জালেস ঠাঁই করে বিশু ঠাকুরের ঝুলে পড়া মুখে একটা চড় কষাল। সে দেখতে চাইল, বিশু ঠাকুরের জ্ঞান ফিরেছে কিনা। কিন্তু বিশু ঠাকুরের শরীর একটুও কাঁপল না।

আনাপুরাম বলল, "এ-রকম শক্তিশালী লোকদের নিয়ে আমাদের এখন দল ভারী করা দরকার। কাপ্তান গঞ্জালেস, আপনি শুনেছেন কি যে, মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ বিরাট সৈন্যবাহিনী এনেছেন? তিনি এবার চট্টগ্রাম জয় করতে চলেছেন।"

গঞ্জালেস চমকে উঠে বললেন, "শায়েস্তা খাঁ? তার নাম শুনেছি। সে এখন এদিকে?"

আনাপুরাম বলল, "হ্যাঁ! এর মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম জয় করে ফেলেছেন কি না কে জানে! আপনাদের সন্দ্বীপও তিনি দখল করবেন! তারপর হানা দেবেন আরাকান রাজ্যে! এ একেবারে পাকা খবর!"

গঞ্জালেস চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল। বেশির ভাগ দস্যু-দেরই বৌ-ছেলে-মেয়ে আছে সন্দ্বীপে। মোগলরা একবার সন্দ্বীপ দখল করলে তাদের ওপর নিশ্চয়ই দারুণ অত্যাচার চালাবে! এ খবর শুনলে তার সঙ্গীদের অনেকেরই মন ভেঙে পড়বে, সুতরাং এ-সব খবর এখন গোপন রাখা দরকার।

গঞ্জালেস মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "মোগলরা জলে যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। সন্দ্বীপ দখল করতে হলে জলপথে যেতে হবে।"

আনাপুরাম বলল, "মোগলরা এবার শক্তিশালী যুদ্ধ-জাহাজ এনেছে। যাই হোক, এ-সব বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরে আলোচনা করব। ক্রীতদাসদের আমার জাহাজে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আর এই লোকটাকেও আমার চাই।"

আনাপুরাম বিশু ঠাকুরের দিকে আঙুল তুলে দেখাতেই গঞ্জালেস বলল, "নাঃ, এ লোকটাকে আমি বিক্রি করব না। আমি ওকে শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই!"

আনাপুরাম বলল, "এমন স্বাস্থ্য বাঙালিদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়, তা ছাড়া ওর কথা যা শুনলাম, তাতে ওরকম একটি তেজী লোক আমার খুব দরকার।"

গঞ্জালেস বলল, "বললাম তো, ওকে আমি বিক্রি করব না!"

আলখাল্লার পকেট থেকে একটা টাকা-ভর্তি থলে বার করে আনাপুরাম বলল, "ওর জন্য আমি একশো স্বর্ণমুদ্রা দেব!"

গঞ্জালেসের মুখখানা একেবারে হাঁ হয়ে গেল। লোকটা বলে কী? এ পর্যন্ত পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রার বেশি কোনো দাসের দাম ওঠেনি, আর এই অজ্ঞান মানুষটা, বেশিক্ষণ আর বাঁচবে কিনা

...দেহ, তার জন্য দাম দিতে চায় এক শো স্বর্ণমুদ্রা!

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গঞ্জালেস বলল, "ঠিক আছে। নিন তবে, ...ই যখন আপনার ইচ্ছে!"

কাপ্তানের ইঙ্গিতে একজন দস্যু বিশু ঠাকুরের হাত-পায়ের ...কল খুলে দিল। বিশু ঠাকুর লম্বা হয়ে ঠিক একটা আলগা ...রের মূর্তির মতন পড়ে গেলেন ডেকের ওপর।

পর মুহূর্তেই একটা দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার হল। ঠিক যেন ...লৌকিক কান্ড!

এই দু'দিনে বিশু ঠাকুরের একটুও জ্ঞান ফেরেনি, এক-...ও চোখের পলক পড়েনি। খাদ্য-পানীয় কিছুই দেওয়া হয়নি ...কে। তিনি ঠিক মড়ার মতন বাঁধা অবস্থায় ঝুলে ছিলেন।

এখন শিকল খুলে দেবার পর মেঝেতে পড়ে যাবার ঠিক ...সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তড়াক করে আবার দাঁড়িয়ে উঠলেন। কেউ ...ছু বোঝবার আগেই তিনি সামনের দু'জন দস্যুকে ধাক্কা দিয়ে ...কে ফেলে দিয়ে ছুটে গেলেন পোর্ট সাইডের রেলিংয়ের ...কে।

সবাই এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, প্রথমটায় কেউ ...-মতন ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি। তারপর অনেকেই ভয় ...রে মাটিতে বসে পড়ে 'ভূত ভূত' বলতে-বলতে বুকে-কপালে ...-চিহ্ন আঁকতে লাগল। আনাপুরাম দৌড়ে গিয়ে লুকোল ...টা থামের আড়ালে। গঞ্জালেস আর কয়েকজন দস্যু তাড়া ...রে গেল বিশু ঠাকুরকে।

বিশু ঠাকুর ততক্ষণে রেলিংয়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। ...বার পেছন ফিরে দস্যুদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ...নি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সমুদ্রে।

গঞ্জালেস তার পিস্তল দিয়ে গুলি করবার চেষ্টা করল. ...কজন দস্যু বর্শা ছুঁড়ে মারবার চেষ্টা করল বিশু ঠাকুরকে। ...ন্তু তাঁকে আর দেখা গেল না, লাফাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ...লের নীচে তলিয়ে গেছেন!

গঞ্জালেস মুখ বাঁকিয়ে বলল, "বোকা গোঁয়ারটা মরুক! ...লে ডুবেই মরুক! হাঙর-কুমিরে ওকে ছিঁড়ে খাক! এখান ...কে শুকে বাঁচানো ওদের তেত্রিশ কোটি দেবতারও অসাধ্য।"

৭

এই ঘটনার পর আনাপুরামের সঙ্গে গঞ্জালেসের সামান্য ...-কাটাকাটি হল।

প্রশ্ন উঠল—বিশু ঠাকুরের দাম নিয়ে। আনাপুরাম বলল ..., গঞ্জালেস তাকে একটা দানোয়-পাওয়া মড়া-মানুষ গছিয়ে ...বার চেষ্টা করছিল, সুতরাং ওর জন্য দাম সে দেবে না!

আর গঞ্জালেস বলল, আনাপুরামের কথাতেই ওর হাত-...য়ের শিকল খুলে দেওয়া হল, নইলে ও পালাতে পারত না। ...তরাং ওর দাম দিতে হবে ঐ আনাপুরামকেই। এবং এক শো ...র্ণমুদ্রা, তার চেয়ে এক কানাকড়ি কম হলে চলবে না।

দু'জনেই যখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে, তখন আনাপুরাম ...াৎ স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটা থলে গঞ্জালেসের কোলের ওপর ...ড়ে দিয়ে বলল, "আরে বন্ধু, এই সামান্য টাকার জন্য আমরা ...বাদ করছি! বললাম না, আপনার কাছে আমার অনেক ...হায্যের দরকার হবে! যা হয়েছে, ভুলে যান!"

দু'জনে আবার করমর্দন করল।

এবার ভোজের পালা।

নিয়ম হল, দাস-দাসী বিক্রির দিনে যারা কিনবে, তাদের ...রাট ভোজ খাওয়াতে হবে। ক্রেতারা এত টাকা খরচ করছে, ...র বিনিময়ে তারা কিছু খাতির-যত্ন পাবে না?

সুতরাং আনাপুরামের জাহাজের সমস্ত লোকের আজ

নেমন্তন্ন গঞ্জালেসের জাহাজে।

ডেকের ওপর কয়েকটা টেবিল পাতা হল। একটি টেবিলে শুধু গঞ্জালেস আর আনাপুরাম। আর-একটা টেবিলে বসবে আনাপুরামের ছ'জন খুব বিশ্বাসী অনুচর আর গঞ্জালেসের ছ'জন অনুচর। আর একটা খুব বড় টেবিলে খাবার সাজানো থাকবে, তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে দু' জাহাজের লোকেরা খাবার তুলে-তুলে নিয়ে খাবে!

জলদস্যুদের জাহাজে সব সময় প্রচুর খাবার মজুত থাকে। কতদিন তাদের জলে ভেসে থাকতে হবে, তার তো ঠিক নেই. সেইজন্য খাবারের ব্যবস্থা তারা আগেই করে রাখে। সুতরাং হঠাৎ দু'-এক শো লোককে নেমন্তন্ন খাওয়াতেও তাদের অসুবিধে হয় না। আনাপুরামের জাহাজে লোকজনের সংখ্যা মাত্র এক শো দশ।

মাঝখানে দু' ঘণ্টা সময় নেওয়া হল খাবার-দাবার তৈরি করার জন্য। জলদস্যুদের খাবার সময়েরও কোনো ঠিক নেই। সূর্য যখন সমুদ্রের এক দিকে অস্ত যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় সকলে বসল দুপুরের ভোজ খেতে।

দুটি পাত্রে খানিকটা করে সিরাজি ঢেলে একটি আনাপুরামের দিকে এগিয়ে দিয়ে গঞ্জালেস বলল, "আসুন.

আপনার সৌভাগ্য-কামনায় আমরা এই সিরাজি পান করি।''

সিরাজি অতি উগ্র পানীয়। এ শুধু হিন্দুস্থানেই পাওয়া যায়, আরাকানে পাওয়া যায় না। অতিথিদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যই গঞ্জালেস এই সিরাজি পরিবেশন করেছে।

আনাপুরাম নিজের পাত্রে একটা চুমুক দিয়ে বলল, ''আর আমার সৌভাগ্য! আমার সৌভাগ্য তো সব এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে!''

গঞ্জালেস বলল, ''কেন, কেন? আপনি আরাকানের যুবরাজ! আপনার দাদার পরে আপনিই হবেন আরাকানের রাজা! আপনার তুলনায় আমি তো অতি সামান্য লোক!"

আনাপুরাম গলার আওয়াজ নিচু করে বলল, ''বন্ধু, আরাকানে আমার ফেরার পথ বন্ধ! সেইজন্যই তো আপনার সাহায্য চাই!''

গঞ্জালেস চমকে গিয়ে বলল, ''কেন? ফেরার পথ বন্ধ কেন?''

আনাপুরাম বলল, "আমি আমার দাদার ছেলেকে খুন করেছি। সে অতি অবাধ্য, বদমাশ, পাজি, অসভ্য ছেলে ছিল। সে সব সময় গর্ব করে বলত যে, আমার দাদার পরে সে-ই রাজা হবে! তাই আমি আর সহ্য করতে পারিনি। একদিন তার খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম!''

গঞ্জালেস এক গাল হেসে বলল, ''বাঃ, বেশ করেছেন! সে অতি বদমাশ তো বটেই! তাকে খুন করাই উচিত!"

আনাপুরাম বলল, ''কিন্তু আমার দাদা টের পেয়ে গেছেন। তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে আমাকে হত্যা করার জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দিয়েছেন। আমি তাই ধনরত্ন যা পেয়েছি, সব নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন আপনার কাছে আমার আরজি এই যে, আপনি এদিকে কোথাও, সুন্দরবনের মধ্যে আমার থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার কাছে ধনরত্ন যা আছে, তা দিয়ে আমি একটা নতুন নগর পত্তন করতে পারব। কিন্তু সেজন্য আপনার সাহায্য দরকার। এখন থেকে আমি সিংহলের বাজারে দাস-ব্যবসা চালাব।''

গঞ্জালেস বলল, ''বাঃ, বেশ ভাল কথা। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করব!''

আনাপুরাম বলল, ''আসলে আমরা দু'জনেই দু'জনকে সাহায্য করব।''

''তার মানে?''

''আমি শুনেছি, শায়েস্তা খাঁ হুকুম দিয়েছে যে সমস্ত জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁর কাছে, তাহলে তিনি তাদের ক্ষমা করতে পারেন। আপনি কি আত্মসমর্পণ করতে চান?''

''সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও কখনো কারুর কাছে মাথা নিচু করে না। দেহের শেষ বিন্দু রক্ত থাকতে আমি কখনো ধরা দেব না!''

''তা হলে? এবার মোগলরা যত সৈন্য এবং যত জাহাজ এনেছে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য আপনাদের নেই। হয়তো এর মধ্যে চট্টগ্রামের পতন হয়ে গেছে। সন্দ্বীপও মোগলের দখলে যাবেই। সুতরাং ওদিকে আপনাদের ফেরার পথ একেবারে বন্ধ। মোগলরা আরাকানও আক্রমণ করবে। তবে, আমার দাদা যদি মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন, তা হলে তিনি বেঁচে যেতে পারেন। দাদার সঙ্গে ঝগড়া না করলে আমিও বেঁচে যেতাম আর আরাকানে থাকতেও পারতাম। সেইজন্যই বলছি, আপনাকেও লুকিয়ে থাকতে হবে। সুতরাং আমাদের দু'জনের মিলিত শক্তি নিয়ে এক জায়গায় থাকাই ভাল নয় কি? আমি শুনেছি, সুন্দরবন অঞ্চল লুকিয়ে থাকবার পক্ষে খুব ভাল জায়গা!''

গঞ্জালেস চুপ করে রইল।

আনাপুরাম একটু বাঁকা হেসে বলল, ''কী কাপ্তানসাহেব, সন্দ্বীপে আর ফিরতে পারবেন না শুনে মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?''

গঞ্জালেস গম্ভীর ভাবে বলল, ''এসব কথা আমার লোকজনদের কাছে এখন কিছু বলবার দরকার নেই। তারা যেন কিছু না শুনতে পায়।''

"তাদের বৌ-ছেলেমেয়ে মোগলদের হাতে ধরা পড়েছে শুনলে তাদের মন খারাপ হয়ে যাবে! আপনার স্ত্রীও তো সন্দ্বীপে আছেন?"

''হ্যাঁ!''

''আপনিও কি আপনার স্ত্রীর জন্য মন খারাপ করছেন নাকি? আপনাকে যদি আমি আরও একটি সুন্দরী স্ত্রী জুটিয়ে দিই? আমার জাহাজে আছে আমার ছোট বোন, সে-ও আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। আমি প্রস্তাব দিতে চাই, আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। আপনি তাকে দেখেননি, সে অতি সুন্দরী!''

গঞ্জালেস শুকনো ভাবে হেসে বলল, ''আপনার বোন একজন রাজকুমারী, তাঁকে বিয়ে করা তো আমার পক্ষে অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার! কিন্তু তিনি কি আমায় বিয়ে করতে রাজি হবেন?''

আনাপুরাম টেবিলে এক চাপড় মেরে বলল, ''আমি বললেই সে রাজি হবে! তা ছাড়া আপনার মতন একজন বীরপুরুষকে কোন্ মেয়ে না বিয়ে করতে চাইবে!''

এমন সময় কথাবার্তায় বাধা পড়ল। জাহাজের সব লোক ভোজে যোগ দিলেও মাস্তুলের ডগায় একজন ঠিক পাহারা দেবার জন্য বসে থাকেই। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ''হেই হো! হেই হো! জাহাজ! স্টারবোর্ডের দিকে জাহাজ! একটা নয়, দুটো!''

আনাপুরামের মুখখানা ভয়ে চুপসে গেল। সে বলল, ''সর্বনাশ! নিশ্চয়ই মোগলদের জাহাজ! আর রক্ষে নেই!''

গঞ্জালেস দৌড়ে নিজের ক্যাবিন থেকে দূরবিনটা নিয়ে এল। সন্ধে হয়ে এসেছে। বেশি দূরের কিছু দেখা যায় না।

আনাপুরাম বলল, "আমাদের এখন সিংহলের দিকে পালাতে হবে! যে-কোনো উপায়েই হোক!''

ঠিক তক্ষুনি দূরের জাহাজ থেকে একটা কামানের গর্জন শোনা গেল।

আনাপুরাম ব্যস্ত হয়ে বলল, ''সব পাল তুলে দিতে বলুন! ভোজ এখন বন্ধ রাখতে বলুন!''

গঞ্জালেস বিরক্ত হয়ে বলল, "চুপ করুন! একটু চুপ করুন!"

আবার দূরের জাহাজ থেকে পর পর দু'বার কামানের আওয়াজ শোনা গেল। একটু থেমে আবার পর পর তিনবার!

এবার গঞ্জালেসের সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে আবার খাবার টেবিলে বসে পড়ে বলল, "আসুন, সিরাজি পান করা যাক। এমন ভোজ নষ্ট করার তো কোনো মানে হয় না!"

আনাপুরাম ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "সে কী! আপনি তা বলে মোগলদের হাতে সত্যিই ধরা দিতে চান?"

গঞ্জালেস সগর্বে উত্তর দিল, "তোমাকে একটু আগেই বললাম না, আমি মৃত্যুবরণ করব, তবু কখনো ধরা দেব না! ভয়ের কিছু নেই, ঐ জাহাজ নিয়ে আসছে আমার ভাই!"

"কী করে বুঝলে?"

"বোঝার উপায় আছে!"

গঞ্জালেসের জাহাজের যেদিকে আনাপুরামের জাহাজ লেগেছিল, তার উল্টোদিকে এসে ভিড়ল ওর ভাইয়ের জাহাজ। গঞ্জালেসের টেবিলে আর-একটা চেয়ার দেওয়া হল, তার ভাই ডিয়েগো সেখানে এসে ভোজে যোগ দেবে।

ডিয়েগো সদলবলে লাফিয়ে এল এই জাহাজে। ডিয়েগো তার দাদাকে আলিঙ্গন করল। আনাপুরামের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল অনেকবার। টেবিল থেকে সিরাজির বোতলটা তুলে এক চুমুকে

সবটা শেষ করে ফেলল সে। তারপর বলল, "তোমরা খানাপিনা চালাও. আমি একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসি!"

যাবার সময় সে দাদার দিকে চোখ টিপে কিছু একটা ইশারা করে গেল!

গঞ্জালেস আনাপুরামকে বলল. "দেখলেন তো, ছেলেটা সব সিরাজি শেষ করে গেল! দাঁড়ান. আর-একটা বোতল নিয়ে আসি।"

গঞ্জালেস নিজের ক্যাবিনে এসে দেখল. "সেখানে ডিয়েগো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।"

গঞ্জালেস তাকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে. খবর কী?"

ডিয়েগো উৎফুল্ল মুখে বলল, "দুটো মোগল জাহাজকে খতম করে এসেছি!"

"তার মানে? কখন? কোথায়?"

ডিয়েগো রায়মঙ্গল নদীর সব ঘটনাটা খুলে বলল।

শুনতে শুনতে গঞ্জালেসের মুখখানা উৎকট গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর চাপা রাগে হিসহিস করে বলল, "নির্বোধ, গোঁয়ার! করেছিস কী? সাধ করে কেউ বাঘের গুহায় আঘাত হানতে যায়?"

মোগলদের কাছ থেকে যখন পালিয়ে আসার সুযোগ ছিল, তখন বিনা কারণে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে কেন ডিয়েগো? জলদস্যুদের নিয়মই এই যে, একেবারে মুখোমুখি ধরা না পড়লে তারা রাজশক্তির সঙ্গে কক্ষনো লড়াই করতে যায় না। মোগলদের দুটি জাহাজ ডুবেছে. একজন মোগল সেনাপতি মারা গেছে, এবার তো মোগলরা প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে!

গঞ্জালেস দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপের দিকে ফেরা যাবে না। এখানকার নদীপথেও আর বেশিদিন থাকবার উপায় নেই, চট্টগ্রাম জয় করার পর এদিকে এসে মোগলরা তাদের খুঁজে বার করবেই। একমাত্র উপায় কয়েকটি দিন একেবারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা। একেবারে চুপচাপ। তারপর গোয়ার দিকে পালিয়ে যেতে হবে। গোয়ায় পর্তুগীজ রাজত্ব চলছে. সেখানে পৌঁছতে পারলে আর বিপদ নেই।

লুকিয়ে থাকার পক্ষে সব চেয়ে ভাল জায়গা হল, নদীর মোহনায় যেখানে গম্বুজটা তৈরি হচ্ছে. সেই অঞ্চলটা। কাছে সমুদ্র. মোগলরা তাড়া করলেই সমুদ্রে ভেসে পড়া যাবে। তবে, একসঙ্গে বেশি লোকজন নিয়ে লুকিয়ে থাকার অনেক ঝামেলা আছে।

অতি কষ্টে রাগ দমন করে গঞ্জালেস ডিয়েগোর পিঠে কয়েকটা চাপড় দিয়ে স্নেহের সুরে বলল. "যা করেছিস, বেশ করেছিস! তোর বড্ড বেশি সাহস. একদিন এর জন্য বিপদে পড়বি! এবার কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোন!"

ডিয়েগোর কানে-কানে ফিসফিস করে গঞ্জালেস কিছু বলল। তারপর একটা সিরাজি-বোতল নিয়ে ফিরে এল খাওয়ার টেবিলে!

হাসি-ঝলমল মুখে সে আনাপুরামকে বলল. "আমার ভাই দারুণ সুসংবাদ এনেছে। আজ বড় আনন্দের দিন। আজ জাহাজসুদ্ধু সকলকে সিরাজি পান করানো হবে।"

আনাপুরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিসের সুসংবাদ? আমি তো কয়েকদিন ধরে অনবরত খারাপ খবর শুনে আসছি!"

"বলব! বলব! আপনাকে সবই বলব! আপনি আমি তো এখন একই সংসারের লোক! আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নেওয়া যাক! এই নিন, গরম-গরম ঝলসানো মাংস!"

"আমি তো মাংস খাই না!"

"সিরাজি পান করেন. অথচ মাংস খান না? হা-হা-হা-হা! আপনারা বড় অদ্ভুত মানুষ! তাহলে ফলমূল খান। বাটাভিয়ার বড়-বড় লেবু আছে, বাংলার ছোট-ছোট মিষ্টি কলা আছে. কাঁচা পেঁপেসেদ্ধ আছে, আরও অনেক কিছু আছে। আপনার যেটা খুশি খান। আর একটু সিরাজি পান করবেন নিশ্চয়ই?"

আনাপুরামের এর মধ্যেই একটু-একটু নেশা হয়েছে। সে জড়ানো গলায় বলল, "হ্যাঁ দিন, সিরাজি দিন, আপনার ভাই সুসংবাদ এনেছে!"

আনাপুরাম যখন নুন দিয়ে কাঁচা পেঁপেসেদ্ধ খাচ্ছে. তখন তার পাত্রে সিরাজি ঢালার সময় গঞ্জালেস খুব গোপনে তার একটা আংটির মধ্যে বসানো মুক্তোটা একটু ঘুরিয়ে দিল। সেই মুক্তোর তলায় আছে একটা ছোট্ট কৌটো, তার মধ্যে থাকে অতি উগ্র বিষ। সেই বিষটুকু গঞ্জালেস মিশিয়ে দিল আনাপুরামের সিরাজির মধ্যে।

তারপর সে উল্লাসের সঙ্গে বলল. "আসুন রাজকুমার, এই পাত্রটা এক চুমুকে শেষ করা যাক্!"

চুমুক শেষ হবার আগেই আনাপুরামের হাত থেকে খসে পড়ল সিরাজির পাত্রটা। মুখখানা তার নীল হয়ে গেছে। দু' হাতে বুক চেপে ধরে সে বলল, "কী হল? বুক জ্বলে যাচ্ছে! আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে!"

গঞ্জালেস হাসিমুখে চেয়ে রইল তার দিকে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও আনাপুরাম ধপাস করে পড়ে গেল টেবিলের ওপর। ছটফট করতে-করতে কোনো রকমে বলল, "গঞ্জালেস... আমায় বাঁচান, আমি মরে যাচ্ছি... আমায় বাঁচান... যত টাকা লাগে দেব!"

গঞ্জালেস বলল. "তলোয়ারের এক কোপেই তোর মুণ্ডুটা আমি কেটে ফেলতাম, নরকের কুকুর! কিন্তু তোর দাদার ছেলেকে তুই যে-ভাবে মেরেছিস, তোর মরণও ঠিক সেইভাবে হওয়াই ভাল।"

আনাপুরাম আর কোনো কথা বলতে পারল না। কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়েই তার প্রাণটা শরীর ছেড়ে চলে গেল।

গঞ্জালেস টেবিলের এদিকে এসে আনাপুরামের মৃতদেহটা দু' হাতে উঁচু করে তুলল মাথার ওপরে। তারপর বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, "আহোয়! আহোয়!"

সবাই চমকে তাকাল সেদিকে। এতক্ষণ সবাই খাদ্য-পানীয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কেউ এদিকে কী হচ্ছে লক্ষই করেনি।

গঞ্জালেস আনাপুরামের মৃতদেহটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুকুম দিল, "মগ্ কুত্তাগুলোকে শেষ করে দে!"

সঙ্গে-সঙ্গে ডিয়েগো তার দস্যুবাহিনী নিয়ে আড়াল থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আনাপুরামের অনুচরদের ওপর। তারা একটুও প্রস্তুত ছিল না, রুখে দাঁড়াবার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে। খাবার-দাবার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। গোটা জাহাজটার ওপর শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ।

গঞ্জালেস নিজেও এগিয়ে এল তলোয়ার নিয়ে। তার সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কারুর নেই। মানুষ মারায় তার দারুণ আনন্দ। এক-এক কোপে সে মাথা কেটে ফেলল এক-একজন মরা সৈন্যের!

প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধে মগ্ সৈন্যরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিছু মগ্ সৈন্য নিজেদের জাহাজে ফিরে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা তাদের একজনকেও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখল না। মৃতদেহগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল জলে। ফিরিঙ্গিদেরও বারোজন দস্যু নিহত হয়েছে, তাদেরও সলিল-সমাধি হল।

যুদ্ধ-জয়ের পর ডিয়েগো আবার এসে আলিঙ্গন করল গঞ্জালেসকে। আজ সত্যিই একটা আনন্দের দিন। ক্রীতদাস-দাসীগুলো হাতে রয়েই গেল, অথচ তাদের জন্য দাম আদায় করে নেওয়া হয়েছে আনাপুরামের কাছ থেকে। ওদের আবার বিক্রি করা যাবে।

তাছাড়া আনাপুরামের জাহাজ-ভর্তি প্রচুর ধনরত্ন, সে-কথা সে নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। সে-সবও ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে।

হাতের রক্ত ধুয়ে-টুয়ে ফেলে দস্যুরা আবার খাবার খেতে বসে গেল। গঞ্জালেস নিজের হাতে করে তার নিজের এবং ডিয়েগোর জাহাজের দস্যুদের প্রত্যেককে একশোটি স্বর্ণমুদ্রা দিল। আনাপুরামের রত্নভাণ্ডারের খানিকটা অংশ সে তুলে দিল ডিয়েগোর হাতে।

আনাপুরামের জাহাজে আটজন সুন্দরী মহিলাও ছিল। তার মধ্যে আনাপুরামের বোন, রাজকুমারী সুবনাকে নিয়ে নিল গঞ্জালেস। আনাপুরাম এর সঙ্গে গঞ্জালেসের বিয়ে দিতে চেয়েছিল, সুতরাং রাজকুমারী সুবনা তো গঞ্জালেসের বৌ প্রায় হয়েই গেছে। সুবনা খুব কান্নাকাটি করায় তার মুখ বেঁধে রাখা হল, আর বাকি মেয়েদের তুলে দেওয়া হল ডিয়েগোর জাহাজে।

এবার গঞ্জালেস তার ভাইকে নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "তুই এক কাজ কর্! এক্ষুনি চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে যা! মোগলরা এখন তোকে মরিয়া হয়ে খুঁজবে, তুই এখন কিছুদিন সন্দ্বীপে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাক! আমি এদিকে মোগলদের সামলাচ্ছি। আমাদের বাড়ির লোকজনও অনেকদিন খবর পায়নি কিছু, তুই গেলে তারা নিশ্চিন্ত হবে।"

শায়েস্তা খাঁ যে বিরাট বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রাম দখল করতে গেছে, সে খবর ডিয়েগো রাখে না। পরপর দুটি যুদ্ধ জয় করে সে দারুণ খুশি, ধনরত্নও অনেক পাওয়া গেছে, এখন কিছুদিন সে বিশ্রাম নিতে চায়। সে খুশি মনেই রাজি হয়ে গেল।

গঞ্জালেস বলল, "তা হলে আর দেরি করিস না, তুই আজ রাত্রেই এগিয়ে যা। আর দেখিস যেন, আনাপুরামের খবর যেন চট্টগ্রামের দিকে না ছড়ায়!"

ডিয়েগো তার দুটি জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে যাবার পর গঞ্জালেস আনন্দে নিজের চিবুকে হাত বুলোতে লাগল। তার প্রত্যেকটা মতলবই সার্থক হয়েছে। আনাপুরামকে খতম করায় তার জাহাজটি পাওয়া গেল, ধনরত্নও প্রচুর। ডিয়েগোকে সে সামান্যই ভাগ দিয়েছে। নিজের ভাই হলেও ডিয়েগোর ওপর গঞ্জালেসের বিশেষ মায়া-দয়া নেই।

ডিয়েগোকে চট্টগ্রামের দিকে পাঠিয়ে লাভ হল এই যে, ডিয়েগো যদি মোগলদের হাতে ধরা পড়ে, তা হলে মোগলরা অনেকটা ঠান্ডা হবে। ডিয়েগোর দলবলই যে তকি খাঁকে মেরেছে, সে-খবর নিশ্চয়ই মোগলদের কানে পৌঁছেছে এতদিনে। ডিয়েগোকে ধরতে পারলে তাদের প্রতিহিংসার ক্ষুধা অনেকখানি মিটবে। তা হলে আর এক্ষুনি তারা গঞ্জালেসের খোঁজে এদিকে আসবে না।

নদীর মোহনায় জঙ্গলের মধ্যে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে প্রচুর খাদ্য ও পানীয় জল মজুত করে গঞ্জালেস আবার সাগরে ভাসবে। সিংহলের বাজারে দাস-দাসীগুলোকে বিক্রি করে তারপর একবার গোয়া পৌঁছতে পারলেই হল! গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তাকে একবার সে চট্টগ্রাম জয় করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন তারা বিশেষ আমল দেয়নি। এবার গিয়ে গঞ্জালেস পর্তুগীজদের আবার সেই কথা বোঝাবে। গঞ্জালেস পথ দেখিয়ে আনলে পর্তুগীজদের যুদ্ধ-জাহাজের সামনে মোগলরা দাঁড়াতে পারবে না। তা হলে আবার চট্টগ্রামে ফেরা হবে।

গঞ্জালেসের জাহাজ আবার ফিরে চলল সুন্দরবনের দিকে।

৮

সুন্দরবনের কাছে বঙ্গোপসাগরে হাঙর বিশেষ দেখা যায় না, কিন্তু বড় কুমিরের উপদ্রব। তা ছাড়া এক ধরনের খয়েরি রঙের মাছ সেই সময় দেখতে পাওয়া যেত, যাদের খয়েরি রঙের শরীরটা অনেকটা মাগুর মাছের মতন, আর মুখটা বেড়ালের মতন। সেইজন্যও ওদের নাম ক্যাটফিশ! এই মাছের কাঁটায় সাঙ্ঘাতিক বিষ, এক ঝাঁক ক্যাটফিশের সামনে পড়ে গেলে কোনো মানুষের আর নিষ্কৃতি নেই। ফরাসি ভ্রমণকারী বার্নিয়ের বঙ্গোপসাগরের উপকূলের কাছে তিমি আর ডলফিনও দেখেছিলেন।

তবু বিশু ঠাকুরের নিয়তিই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। ডুব-সাঁতার দিয়ে তিনি দস্যুদের জাহাজ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে তারপর ভাসতে লাগলেন। তিনি খুব ভাল সাঁতার জানেন, কিন্তু সমুদ্রে সাঁতার কেটে আর কতদূর যাওয়া যায়! জোয়ারের টানে তিনি ভেসে চললেন।

এক সময় তাঁর পায়ের নীচে মাটি লাগল। তিনি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখলেন, বেশ খানিকটা দূরে ঘন জঙ্গল, খুব সম্ভবত সেটা একটা দ্বীপ।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশটা লাল। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে। মনে হয় যেন জলের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন, "হে ঈশ্বর, তোমার কৃপায় আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি। ঘৃণ্য দাসত্ব আমায় মেনে নিতে হয়নি। এখন আমার শরীরে আবার আগেকার শক্তি ফিরিয়ে দাও। এর পর যতদিন বাঁচব, আমি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে যাব।"

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলেই যেন তাঁর শরীরের সব ব্যথা-বেদনা জলে ধুয়ে গেছে। কিন্তু পেটের মধ্যে হু-হু করে জ্বলছে খিদে। এই ক'দিন তাঁর যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধও ছিল না।

তীরের দিকে তিনি খুব সাবধানে এগোলেন। সন্ধের পর অচেনা জঙ্গলে পদে-পদে বিপদ। তবু বিশু ঠাকুরের মনে হল, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাতে বন্দী থাকার চেয়ে হিংস্র কোনো জন্তুর কাছে প্রাণ দেওয়াও ভাল। একটা বাঘ আর একটা বাঘকে কক্ষনো মেরে ফেলে না, সিংহ কক্ষনো অন্য সিংহকে মারে না, কিন্তু মানুষ মানুষকে মারে।

তীরের ওপর এসে বিশু ঠাকুর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর শরীর খুবই দুর্বল। কিন্তু খাবার না পেলে তিনি আর চলাফেরাই করতে পারবেন না। কিন্তু এখন খাবার পাওয়া যাবেই বা কী করে? সন্ধেবেলা জঙ্গলের মধ্যে ঢোকাও যাবে না। বাঘের মুখে পড়ার ভয় তো আছেই, তা ছাড়া আছে বিষাক্ত সাপের ভয়।

একটা পচা গন্ধ তাঁর নাকে আসছিল প্রথম থেকেই। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, খানিকটা দূরে একটা মাছ পড়ে আছে। খুব সম্ভবত দু' তিন দিনের পচা। ভাটার সময় খুব তাড়াতাড়ি জল নেমে গেলে অনেক সময় দু' একটা মাছ এ-রকম পাড়ে থেকে যায়।

বিশু ঠাকুর কাছে গিয়ে মাছটাকে দেখলেন। অচেনা কোনো সামুদ্রিক মাছ। বিকট পচা গন্ধ। খিদের জন্য মানুষ কত কী খায়, কিন্তু বিশু ঠাকুরের সেই পচা মাছ খাওয়ার প্রবৃত্তি হল না।

সেখান থেকে সরে এসে, একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে বিশু ঠাকুর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। সাপ আসুক, বাঘ আসুক, কিংবা জল থেকে কুমির আসুক, কোনো উপায় নেই, সারা রাত এইভাবেই শুয়ে থাকতে হবে। কাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তারপর দেখা যাবে কোনো খাবার পাওয়া যায় কি না!

"এই, তুই কে রে?"

বিশু ঠাকুর দারুণ চমকে উঠলেন। উঠে বসলেন ধড়ফড় করে। কে কথা বলল? তিনি চারদিকে তাকিয়ে কারুকে দেখতে

পেলেন না। তবে কি তিনি ভুল শুনলেন? কিংবা জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছে!

"এই, তুই কে?"

এবার বিশু ঠাকুরের বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। আওয়াজটা আসছে ওপর দিক থেকে। আকাশ থেকে কোনো অশরীরী আত্মা কথা বলছে?

"তুই কে বল্ শিগগির! নইলে এক্ষুনি তোকে শেষ করে দেব!"

বিশু ঠাকুর হাত জোড় করে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "আমি জলে ভেসে এসেছি, আমি একজন সামান্য লোক...... বিপদে পড়ে এসেছি এখানে......আপনি যে-ই হোন, আমার ওপর দয়া করুন! আমি কখনো কারুর কোনো ক্ষতি করিনি!"

তখন একটু দূরে একটা গাছের ওপর ডালপালা সরানোর শব্দ হল। আবার কে যেন বলল, "ও, তুই বাঙালি? এদিকে চলে আয়, এই গাছের কাছে।"

বিশু ঠাকুর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন সেই গাছটার কাছে। এর মধ্যেই এমন অন্ধকার হয়ে গেছে যে, তিনি ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন না!

"তোর কাছে অস্তর-টস্তর কিছু আছে? তুই খুনে-ডাকাত নোস তো?"

বিশু ঠাকুর দু' হাত উঁচু করে বললেন, "এই দেখুন, আমার কাছে কিছুই নেই। পরনের এই ভিজে কাপড়টুকুই সম্বল।"

"তা হলে ওখানে শুয়ে ছিলি কেন, গাধা? প্রাণের ভয় নেই? এই গাছের ওপর উঠে আয়!"

বিশু ঠাকুরের গাছে চড়ার শক্তি নেই। তবু সেই অদেখা লোকটির হুকুম অমান্য করতে সাহস পেলেন না।

তিনি গাছটাকে জড়িয়ে ধরে উঠতে শুরু করলেন। খানিকটা ওঠার পর ওপর থেকে একটা সবল হাত নেমে এসে তাঁকে ধরে টেনে তুলে নিল।

সুন্দরবনের গাছ সাধারণত ছোট-ছোট হয়, সেই তুলনায় এই গাছটি বেশ বড় আর অনেক ডালপালা। সেই গাছের একেবারে ডগার কাছে দু' তিনটি ডাল নিয়ে বেশ একটি শক্ত মাচা বাঁধা। সেই মাচার ওপরে বসে আছে একজন বেশ শক্ত-সমর্থ লোক, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল।

বিশু ঠাকুর খুব আবছা ভাবে দেখতে পেলেন লোকটিকে। একবার তাঁর মনে হল, লোকটি বোধহয় পাগল। কিন্তু তিনি আর কিছু চিন্তা না করে কাঙালির মতন কাতর গলায় বললেন, "আপনার কাছে কিছু খাবার আছে? খিদেতে আমি মরে যাচ্ছি! আপনি আমায় বাঁচান!"

"কাঁচা মাংস খেতে পারবি?"

"পারব!"

লোকটি ছাল-ছাড়ানো একটি আস্ত হরিণের ঠ্যাং বিশু ঠাকুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "প্রথমটায় একটু শক্ত লাগবে। ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খা, এই কাঁচা মাংস কিন্তু হজম হয় তাড়াতাড়ি!"

প্রথম কামড়টা বসিয়েই বিশু ঠাকুরের চোখে জল এসে গেল। এমন ভাবে গাছের ডগায় বসে কাঁচা মাংস খেতে হবে, জীবনে তিনি কল্পনাও করেননি। তবু সেই কাঁচা মাংসই যেন অমৃত মনে হল, তিনি খুব উপভোগ করে চিবিয়ে-চিবিয়ে খেতে লাগলেন।

"তুই কোথা থেকে ভাসতে-ভাসতে এলি?"

"আমি বোম্বেটেদের হাতে ধরা পড়েছিলাম!"

তারপর বিশু ঠাকুর সংক্ষেপে সব ব্যাপারটা জানালেন।

লোকটি সব শুনে বলল, "তোর দেখছি আমারই মতন অবস্থা! হা অদৃষ্ট! অদৃষ্টই তোকে টেনে এনেছে এখানে।"

"আপনিও বোম্বেটেদের হাতে ধরা পড়েছিলেন?"

"ধরা পড়িনি, তবু বাঁচতে পারলাম কই? আমার নিবাস ছিল মামা-ভাগ্নে গ্রামে। মামা-ভাগ্নে গ্রামের নাম শুনেছ? দুর্গাচকের পাশে। এক মামা আর ভাগ্নেকে একই দিনে বাঘে তুলে নিয়ে যায় বলে গ্রামের ঐ নাম। সেই গ্রামে ছিল আমাদের দু' পুরুষের ঘর-বাড়ি। আমার নাম মাধবদাস, জাতিতে জেলে। তা এক রাত্রে ফিরিঙ্গি ডাকাতরা এসে পড়ল গ্রামে, ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। ধরা পড়ার আগেই আমি বাড়ির লোকজনদের নিয়ে নৌকোয় চেপে ভেসে পড়লাম। কিন্তু ভাগ্যে আমার সুখ নেই। নৌকো সমুদ্দুরে পড়তে না পড়তেই ঝড়ের মধ্যে উল্টে গেল, উঃ সে কী ঝড়, বাপের জন্মে অমন তুফান দেখিনি, আর তেমনি বড়-বড় ঢেউ। আমার বউ, দুটি ছেলে, একটা মেয়ে কোথায় চলে গেল জানি না, ডুবেই মরেছে নিশ্চয়, আমি ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছি। সেই থেকে এখানেই আছি। আর লোকালয়ে ফিরে যাওয়ার সাধ নেই।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "বোম্বেটেরা এ-রকম কত পরিবারের সর্বনাশ করেছে, তার ঠিক নেই। দেশের রাজা বসে থাকেন দিল্লিতে, তিনি কোনো খবরই রাখেন না। তবে......এবার বোধহয় একটা উপায় হবে!"

মাধবদাস বলল, "আর উপায়! আমার তো সবই গেছে! তুমি কাঁচা মাংস খেতে পারছ তো? এখানে থাকতে গেলে ঐ মাংসই খেতে হবে। এখানে তো আগুন জ্বালার উপায় নেই।"

"কেন?"

"ঘর ছেড়ে পালাবার সময় তো আর ট্যাঁকে চকমকি পাথর গুঁজে আনার কথা মনে ছিল না! এখানে চকমকি কোথায় পাব? তোমার নাম কী, তা তো বললে না?"

"আমার নাম বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। লোকে আমায় বিশু ঠাকুর বলে ডাকে।"

মাধবদাস চমকে উঠে বলল, "ব্রাহ্মণ! আরে ছি, ছি, এতক্ষণ না জেনে তুই-তুকারি করেছি। তোমার গায়ে আমার পা-ও ঠেকেছে। না জেনে ভুল করেছি, দোষ নিয়ো না ঠাকুর!"

এই বলে সে অন্ধকারের মধ্যে বিশু ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল।

বিশু ঠাকুর মাধবদাসের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "ও কথা বোলো না! দেশের এই দুঃসময়ে বামুন-চাঁড়াল সব সমান। বামুন বলে বোম্বেটেরা কি আমায় রেয়াত করেছে? আর সবার সঙ্গে আমাকেও তো ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া, তুমি আমায় এই বিপদে সাহায্য করেছ। তুমি আমার গুরুর সমান। এসো, আজ থেকে আমরা বন্ধু হই। এইটুকু মাচার ওপর থাকতে গেলে গায়ে তো পা লাগবেই। তুমি যখন ইচ্ছে আমার গায়ে পা তুলে দিও! তা ভাই মাধবদাস, তুমি এই রকম মাচার ওপর থাকো কেন?"

"এখানে বড় বাঘের উপদ্রব। নীচে ঘর বেঁধে থাকলে আর একদিনও টিঁকতে হত না। চোখ মেলে থাকো, ঠাকুর, একটু পরেই এখানে বাঘ আর নেকড়ের আনাগোনা দেখতে পাবে।"

"তুমি এখানে কতদিন আছ?"

"কে জানে? দিনক্ষণের তো হিসেব রাখি না। তবে দু' তিন বছর তো হবেই। চার বছরও হতে পারে!"

বেশ খানিকটা মাংস খাবার পর খিদেটা শান্ত হল। আর অমনি যেন এতদিনের জমানো ক্লান্তি এসে জুড়ে বসল তাঁর চোখের পাতায়। বিশু ঠাকুর আর চোখ মেলে থাকতে পারলেন না, কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়।

মাধবদাস সারা রাত জেগে বসে পাহারা দিল তাঁকে। তার অভ্যেস হয়ে গেছে, সে মাচার ওপরে ঘুমোলেও পড়ে যায় না, কিন্তু বিশু ঠাকুর তো পড়ে যেতে পারেন।

দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল বিশু ঠাকুরের। চোখ মেলে মাধবদাসকে দেখেই তিনি ভাবলেন, তা হলে স্বপ্ন নয়?

এই যে সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে এক জায়গায় এসে ওঠা, তারপর অন্ধকারের মধ্যে গাছের ডগায় এক মাচার ওপর বসে কাঁচা মাংস খাওয়া, এ-সব স্বপ্ন নয়!

বিশু ঠাকুরের মনে হল, এমন একটি সুন্দর সকাল তাঁর সারা জীবনে আসেনি। পর পর কয়েকটি দিন যে অসম্ভব কষ্ট আর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কেটেছে, সেই তুলনায় আজ এই ঘুমের পর জেগে ওঠা কত চমৎকার। রাজভোগ খেয়ে মখমলের বিছানায় শুয়ে থাকলেও এত আনন্দ হয় না।

মাধবদাসের সঙ্গে তিনি গাছ থেকে নেমে এলেন।

মাধবদাসকে দেখলে মনে হয় আদিম জংলি মানুষ। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখখানা প্রায় ঢাকা, অতি ছেঁড়া ঝুলি-ঝুলি একটা কাপড় তার কোমরে জড়ানো। সে সঙ্গে সব সময় তীর-ধনুক রাখে। ধনুকটা ঠিকই আছে, কিন্তু তীরগুলো বড় মজার, তীরের ডগায় লোহার ফলার বদলে বসানো আছে মোটা, ধারালো কাঁচ। মাধবদাসই বলল যে, স্রোতে ভাসতে-ভাসতে তিনটি বোতল এক সময় এখানে এসে উঠেছিল, সেই বোতল ভেঙেই সে অস্ত্র বানিয়েছে। ঐ তীর দিয়েই সে হরিণ শিকার করে।

বিশু ঠাকুর জায়গাটার ভাল-মতন খোঁজ খবর নিলেন। মাধবদাস এই জঙ্গলের মধ্যে বেশি দূর যায় না। সুতরাং সে জানে না এ-জঙ্গল কোথায় শেষ হয়েছে, কিংবা এটা একটা দ্বীপ কি না। এই জায়গাটা ভারতবর্ষের মধ্যে, না অন্য দেশ, তা-ও সে জানে না। তবে, তাকে দু' একদিন অন্তর ডান দিকে কিছুটা দূরে একটা নদীতে যেতে হয় জল আনতে। সমুদ্রের জল এতই লোনা যে, খাওয়া যায় না, নদীর জলও লোনা, তবে ঠিক জোয়ার-ভাটার হিসেব করে গেলে, ভাটার সময় কম লোনা থাকে। তা ছাড়া, সমুদ্রের জল খেলে পেট ব্যথা করে।

নদীর কথা শুনেই বিশু ঠাকুর বুঝলেন, তা হলে এটা কোনো দ্বীপ নয়। কিংবা দ্বীপ হলেও নদী পেরিয়েই তো অন্য জায়গায় যাওয়া যায়।

একটা ঝোপের মধ্যে মাধবদাস রীতিমত ছোটোখাটো একটা সংসার পেতে রেখেছে। সবই প্রায় সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসা জিনিস। আর হরিণের চামড়া। কয়েকটা বড় মাছের কাঁটা, যা দিয়ে ছুঁচ কিংবা ছুরির কাজ চালানো যায়। একটা মাটির মালসাও আছে, কোনো উল্টে যাওয়া নৌকোর জিনিস নিশ্চয়ই। সেটাতেই সে জল রাখে।

বিশু ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়ালে কোনো জাহাজ-টাহাজ দেখা যায় না?"

মাধবদাস বলল, "হ্যাঁ, দেখা যাবে না কেন? বোম্বেটেদের জাহাজও দেখি!"

"আর নৌকো?"

"তাও দেখি। মাছ-ধরা নৌকো। বাঘের ভয়ে কেউ এদিকে ভেড়ে না।"

"সেই মাছ ধরার নৌকোয় কোন্ জাতের লোক থাকে? দেখে বুঝতে পারো?"

"হ্যাঁ। এই আমাদেরই মতন বাঙালি লোক।"

"তা হলে এটা নিশ্চয়ই সুন্দরবনেরই কোনো জায়গা। তুমি জেলেনৌকো দেখলে ডাকতে পারো না? গাছের ডালে একটা কিছু নিশানা বেঁধে নাড়লেই তো তাদের চোখ পড়ে।"

'ঠাকুরমশাই, তোমাকে তো আমি বলেইছি, আমার আর লোকসমাজে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। আমি এখানেই বেশ আছি। দিনের বেলায় এদিক-ওদিক ঘুরি, আর রাতে মাচায় উঠে শুয়ে থাকি। সাবধানে থেকো, এদিকে কিন্তু এক-এক সময় দিনের বেলাতেও বাঘ আসে।"

"বাঘ এসে পড়লে তুমি কী করো?"

"একটা সুবিধে আছে। এই জঙ্গলে প্রচুর বাঁদর, বাঘ দেখলেই তারা হুপ-হাপ শুরু করে দেয়। বাঘ বাঁদরের মাংস খেতে খুব ভালবাসে কিনা! বাঁদরগুলোর চ্যাঁচামেচি শুনলেই আমি মাচায় উঠে পড়ি!"

''নদী থেকে যে জল আনতে যাও, তখন ভয় নেই?''

"ভয় আছে বই-কী! সমুদ্রের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে সাবধানে যাই। একদিন বাঘের পেটেই যাব, তাও জানি।"

সকালেও কাঁচা মাংস খেতে হবে। বিশু ঠাকুর ভাবলেন. মাংসগুলো একটু ঝলসে নিতে পারলে স্বাদ পাল্টে যায়। কিন্তু আগুন কী করে জ্বালবেন। জল-কাদার দেশ, এখানে পাথর পাওয়া যাবে না। বিশু ঠাকুর শুনেছিলেন, শুকনো দুটো কাঠ নিয়ে ঘষলেও আগুনের ফুলকি বেরোয়। বনে-জঙ্গলে আগুন লাগে এইভাবে, যাকে বলে দাবানল।

তিনি কিছু শুকনো পাতা এক জায়গায় জড়ো করে তারপর গাছের দুটো শুকনো ডাল ভেঙে নিলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘষতে লাগলেন ডাল দুটো। কিন্তু একটুও আগুনের ফুলকি বেরুল না। দু' দিন আগেই দারুণ বৃষ্টি হয়ে গেছে. তাই কোনো গাছের ডালই আসলে সে-রকম শুকনো নয়।

বিশু ঠাকুরকে অনেকক্ষণ ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে মাধবদাস বলল, "ঠাকুর, অত কষ্ট করছ কেন? দ্যাখো, বাঘ সিংহী এরা সবাই কাঁচা মাংস খায় আর সেই জন্যই ওদের গায়ে অত জোর। ওদের কখনো পেটের রোগ হয় না, আর বুড়ো বয়েসে কবিরাজি ওষুধও খেতে হয় না। এখানে আসার আগে আমিও এত ষণ্ডা ছিলাম না।''

বিশু ঠাকুর বললেন, "কাল রাতে প্রচণ্ড খিদের মুখে খেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠছে।''

"আমারও প্রথম প্রথম ও-রকম হয়েছিল। তারপর আস্তে-আস্তে নিজেই শিখলাম যে, সমুদ্রের নোনা জলে কাঁচা মাংস অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে মাংস নরম হয়, আর স্বাদও ভাল হয়। তুমিও দু-চারদিন থাকো। থাকতে থাকতে সব অভ্যেস হয়ে যাবে।''

"তার মানে? আমি এখানে থেকেই যাব নাকি!"

"তাহলে কী করবে?''

"এখান থেকে বেরুবার একটা রাস্তা খুঁজে বার করতেই হবে। আমার অনেক কাজ বাকি আছে।"

"তা তুমি যেতে চাও যেও! তোমার নিশ্চয়ই বাড়িতে বৌ ছেলেমেয়ে আছে। আমার তো আর বিশ্ব-সংসারে কেউ নেই, তাই আমি কোথায় যাব!"

"অমন কথা বলে না, মাধবদাস। জীবনে কখনো নিরাশ হতে নেই। তোমার এখনো বয়েস রয়েছে, শরীরে শক্তি রয়েছে, লোকজনের মাঝখানে ফিরে গেলে তুমি এখনো অনেক কাজ করতে পারবে। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে!''

"না, ঠাকুর, আমি আর যাব না!" মানুষের চেয়ে আমার জন্তুজানোয়ারদেরই বেশি ভাল লাগে এখন।"

"বোম্বেটেদের জন্য তোমার ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, তোমার এমন সর্বনাশ হয়েছে, সেজন্য তোমার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না?'

"আমি আর কী করে শোধ নেব! এখান দিয়ে যখন বোম্বেটেদের জাহাজ যায়, তখন আমি ওদের খুব গালিগালাজ করি। ওরা শুনতে পায় না অবশ্য, তবু প্রাণ ভরে ওদের গালা-গালি দিয়ে আমার মেজাজটা একটু শান্ত হয়!"

"এই এক আমাদের বাঙালিদের দোষ! আমরা শুধু গালা-

গালি দিতেই জানি। কাজে কিছু করে দেখাতে পারি না! পাশাপাশি দু-তিনখানা গ্রামের সব লোক একজোট হলে কি আমরা বোম্বেটেদের ঠেকাতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। তা না করে আমরা ভয়ে পালাই কিংবা দূর থেকে গালাগালি দিই। আর ধরা পড়লে কাঁদি।"

বিশু ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই দ্যাখো, মাধবদাস, আমার সারা গায়ে চাবুকের দাগ। সমস্ত শরীর দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেছে। ঘুঁষি মেরে ওরা আমার মুখ দিয়ে রক্ত বার করেছে, আমাকে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমি এর শোধ নিতে যদি না পারি, তা হলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ! এর শোধ আমি নেবই! সেইজন্যেই আমি বেঁচে আছি।"

মাধবদাস বলল, "তুমি একলা ঐ দুর্দান্ত বোম্বেটেদের সঙ্গে কী করে পারবে? ওদের কাছে বন্দুক আছে, তরোয়াল আছে। আমি তো বাপের জন্মে বন্দুক চোখেই দেখিনি, আর কোনোদিন একখানা তরোয়াল ছুঁয়েও দেখিনি!"

"বাঙালি অস্ত্র ধরতে ভুলে গেছে বলেই চতুর্দিক থেকে সবাই তাকে এখন মারছে। ওরা যখন আমায় মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, তখন আমি ওদের দেখলেই দম বন্ধ করে অজ্ঞান হবার ভান করে থাকতাম। কিন্তু শেষের দিকে আমার জ্ঞান ছিল। ওদের কথাবার্তা শুনে আমি বুঝেছি যে, দিল্লি থেকে সম্রাট-বাহাদুর শায়েস্তা খাঁ নামে এক জবরদস্ত সেনাপতি পাঠিয়েছেন ডাকাতদের দমন করবার জন্য। তিনি অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গেছেন চট্টগ্রামে, সেখানে ডাকাতদের ঘাঁটি ভেঙে দেবার জন্য। আমি এখান থেকে যে-ভাবে হোক চট্টগ্রামে যাব। তারপর শায়েস্তা খাঁর সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাব। তারপর অন্তত একজন-না-একজন ডাকাতকে আমি শেষ করবই!"

"তুমি বামুন হয়ে মোগলের সৈন্য হবে?"

"তাকে কী হয়েছে? বামুনরা কি যুদ্ধ করতে জানে না? তুমি শাস্ত্র পড়োনি, মহাভারতে আছে, পরশুরাম ছিলেন সকলের চেয়ে সেরা বীর, কিন্তু তিনি বামুন। তখন বামুনরাই রাজপুত্তুরদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাত!"

এই সময় হঠাৎ কয়েকটা বাঁদরের হুপ-হুপ আওয়াজ হতেই চমকে উঠল মাধবদাস। সে বিশু ঠাকুরের হাত ধরে টান মেরে বলল, "ঠাকুর, শিগগিরই গাছে উঠে পড়ো! যম আসছে!"

দুজনে তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে সেই মাচার ওপর বসে রইলেন। একটু পরেই একদল বাঁদর এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে এল সেদিকে।

মাধবদাস বলল, "একদম চুপটি করে বসে থাকো। কোনো শব্দ কোরো না!"

ওরা যে গাছটায় বসে ছিল, কয়েকটি বাঁদর সেই গাছেও উঠে এল। তারা বার বার চেয়ে দেখতে লাগল বিশু ঠাকুরকে। এখানে একজন লোক ছিল, হঠাৎ কী করে দু'জন হয়ে গেল সেই ভেবে তারা অবাক হচ্ছে।

খানিক পরে একটু দূরে ফেউ-ফেউ ডাক শোনা গেল। বিশু ঠাকুর জানেন, বাঘ দেখলে শেয়ালরা ঐ রকম ভাবে ডাকে। তা হলে এবার বাঘ আসবে।

বাঘটা এল রাজা-মহারাজাদের মতন গম্ভীর চালে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, আর এদিকে-ওদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে গর্জন করে উঠল। সে ডাক শুনলে পিলে পর্যন্ত চমকে যায়। বিশু ঠাকুর এত কাছ থেকে আগে কখনো বাঘের ডাক শোনেননি। তাঁর মতন সাহসী লোকেরও বুকটা দুপ-দুপ করতে লাগল সেই ডাক শুনে।

বাঘটা ক্ষুধার্ত বাঁদরগুলোর একটাকেও সে ধরতে পারেনি বলে খুব রেগে আছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সে আবার চলল সমুদ্রের দিকে।

মাধবদাস ফিসফিস করে বলল, "এ-ব্যাটাকে আমি চিনি। এ ব্যাটা স্বয়ং দক্ষিণরায়। এই বনে যত বাঘ আছে, তার মধ্যে এইটাই সবচেয়ে বড়।"

বিশু ঠাকুর এক দৃষ্টে বাঘটাকে দেখছেন। এই গাছতলা দিয়ে যখন বাঘটা যায়, তখন একটা উৎকট গন্ধ নাকে এসেছিল। তলা থেকে গাছের ওপরের মাচাটা দেখা যায় না ভাগ্যিস। বিশু ঠাকুরের মনে হচ্ছিল, অত বড় বাঘ ইচ্ছে করলেই বোধহয় এক লাফে এই মাচা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে।

বাঘটা সমুদ্রের জলের মধ্যে খানিকটা নেমে চুপ করে বসে রইল। ঠিক যেন স্নান করছে। বিশু ঠাকুর ভাবলেন, কাল যখন তিনি ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছিলেন, তখন যদি ঐ বাঘটা ওখানে বসে থাকত? তা হলে তাঁর কয়েকখানা হাড়-গোড় শুধু পড়ে থাকত ওখানে।

বাঘেদের বোধহয় জলে মাথা ডোবানোর ব্যাপারে কোনো নিষেধ আছে। তাই শুধু গা-টুকু ডুবিয়েই স্নান সেরে বাঘটা উঠে এল। তারপর সে আবার ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে। বাঘটা যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ বাঁদরগুলো অনর্গল চ্যাঁচামেচি করছিল, বাঘটা চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তারাও সেদিকেই গাছের ওপর লাফাতে-লাফাতে যেতে লাগল।

হাঁপ ছেড়ে মাধবদাস বলল, "ঐ বাঁদরগুলোর জন্যই বেঁচে আছি! ঐ বাঁদরগুলোর স্বভাব জানো তো? বাঘ সুযোগ পেলেই বাঁদর ধরে খায়। আবার বাঁদরগুলোও সব সময় বাঘের কাছাকাছি থেকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ওদের বিরক্ত করে মারে। বাঘ আওয়াজ একদম পছন্দ করে না। এমনও দেখেছি, বাঁদরের চ্যাঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে বাঘ দৌড়ে পালাচ্ছে।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "চান-টান করল, অথচ এখনো খাবারের জোগাড় নেই বেচারির!"

"ওর খাবারের অভাব কী? এ-জঙ্গলে প্রচুর হরিণ।"

"কই, হরিণ তো এ পর্যন্ত একটা-ও দেখলাম না।"

"হরিণ যখন আসবে, তখন এক পাল আসবে। একটা দুটো তো নয়! সেই জন্যই হরিণ মারার বড় সুবিধে। চলো নীচে নামি।"

"দূরে বাঁদরদের চ্যাঁচামেচি এখনো শোনা যাচ্ছে। যদি বাঘটা হঠাৎ আবার এদিকে ফিরে আসে?"

মাধবদাস অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, "যদি কপালে বাঘের হাতে মৃত্যু লেখা থাকে, তা হলে কি আর কেউ খণ্ডাতে পারবে? অত ভাবলে চলে না। মরতে তো একদিন হবেই!"

বিশু ঠাকুর গম্ভীর ভাবে বললেন, "মরতে একদিন হবেই তা জানি। তবে মিছিমিছি বাঘের পেটে প্রাণ দেবার আগে আমি ঐ বোম্বেটেদের ওপর প্রতিশোধ নেবই নেব! চট্টগ্রাম কী ভাবে যাওয়া যায়, তুমি বলতে পারো?"

"ঠাকুর, আমি চট্টগ্রাম বলে কোনো দেশের নামই শুনিনি।"

"তুমি তো আগে মাছ ধরতে। নৌকো নিয়ে কখনো সমুদ্রের দিকে আসোনি?"

"অনেকবার এসেছি। ইলিশের মরসুমে অনেক জেলে আসে। খুলনে, ফরিদপুর, হুগলি, চাটগাঁ থেকেও জেলেরা আসে, কিন্তু চট্টগ্রামের কথা শুনিনি কারুর কাছে।"

"ঐ চাটগাঁই তো চট্টগ্রাম।"

"হ্যাঁ, সে-জায়গাও সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে। মাতলা নদী ধরে আরও পুব দিকে যেতে হয়।"

"মাধবদাস, আমরা যদি একটা নৌকো বানাই, তা হলে আমরা দু'জনে মিলে চট্টগ্রামে যেতে পারি না?"

"এখনো তোমার মাথায় শুধু ঐ চিন্তা? ঠাকুর, যেতে হয় তুমি চট্টগ্রামে যেও, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব না! আমি এখানে বেশ আছি। মানুষের মুখ দেখতে হয় না বলে শান্তিতে

আছি। তার চেয়ে বরং চলো, তোমায় একটা নতুন জিনিস খাওয়াই!"

"কী জিনিস?"

"মধু। কাছেই এক জায়গায় একটা মৌচাক আছে। সেখান থেকে আমি মাঝে মাঝে খানিকটা চাক ভেঙে আনি।"

"খালি হাতে? খালি হাতে কেউ মৌচাক ভাঙতে পারে?"

"তুমি মশাল জেবলে ধোঁয়া করার কথা বলছ তো? সে আমি আর আগুন এখানে পাব কোথায়? আমি খানিকটা চাক ভেঙে নিয়েই এক দৌড় মারি। তারপর সেটা কোনো ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে একেবারে সমুদ্দুরে গিয়ে মাথা ডুবিয়ে বসে থাকি। এর মধ্যেই কিছু মৌমাছি কামড়ায় বটে, কিন্তু সেটুকু তো সহ্য করতেই হবে!"

"বেশ ভাল বুদ্ধি করেছ তো! কিন্তু এখন আমার মধু খাবার ইচ্ছে নেই। এখানে গাছের ওপর মাচায় শুয়ে জীবন কাটাতে পারব না। চট্টগ্রাম আমায় যেতেই হবে। তুমি যদি না যাও, আমি একাই যাব। কোনো জেলে-ডিঙি দেখতে পেলে আমায় বলো, আমি যেমন ভাবেই হোক, তাকে ডাকব। দরকার হয়, সমুদ্রে সাঁতরে গিয়ে সেই ডিঙিতে উঠব। তুমি বুঝতে পারছ না, মাধবদাস, যতক্ষণ না প্রতিশোধ নেবার জন্য কিছু একটা করতে পারছি, ততক্ষণ আমার বুকের ভেতরটা জবলছে। কিছু-একটা না করলে আমি শান্তি পাব না!"

বিশু ঠাকুরকে চট্টগ্রাম যেতে হল না, তার আগেই অন্য একটা ব্যাপার ঘটল।

বিশু ঠাকুর মাচার ওপরে ঘুমিয়ে ছিলেন, বিকেলের দিকে মাধবদাস তাঁকে ঠেলে জাগিয়ে তুলল। উত্তেজিত ভাবে বলল, "ঠাকুর, ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো!"

বিশু ঠাকুর উঠে বসে বললেন, "কী?"

"সমুদ্রের দিকে চেয়ে দ্যাখো!"

আকাশে বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাল ঠিক এই রকম সময়েই বিশু ঠাকুর এইখানে পেণছেছিলেন। আজও আকাশের একদিকে আগুন ছড়ানো।

বিশু ঠাকুর চেয়ে দেখলেন, সমুদ্রের বুকে দুটি পালতোলা জাহাজ।

মাধবদাস জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুর, দেখে চিনতে পারো? এগুলোই হল বোম্বেটেদের জাহাজ। হতভাগা, বদমায়েশ, পাজি, ফিরিঙ্গি কুত্তার দল!"

মাধবদাস বিড়বিড় করে আরও খারাপ-খারাপ গালাগালি দিয়ে যেতে লাগল। বিশু ঠাকুরের বুকের মধ্যে দুমদুম শব্দ হচ্ছে। বোম্বেটেদের জাহাজ! যদি এর মধ্যে একটা গঞ্জালেসের জাহাজ হয়! যে জাহাজে তিনি বন্দী ছিলেন!

তিনি আপন মনেই বললেন, "বোম্বেটেরা এদিকে কোথায় যাচ্ছে?"

মাধবদাস বলল, "ভয় নেই, ওরা এখানে আসবে না। ওরা কোথায় যায় আমি জানি!"

বিশু ঠাকুর তার হাত চেপে ধরে বললেন, "তুমি জানো? কী করে জানলে?"

"এদিকে ওদের একটা আখড়া আছে। যে-নদী থেকে আমি জল আনতে যাই, সেই নদীরই মোহনার কাছে ওরা মাঝে-মাঝে আসে। ইণ্ট পুড়িয়ে ওখানে ওরা একটা গম্বুজও বানাচ্ছে! আমি একদিন দূর থেকে দেখেছি!"

"চলো, সেখানে যাব!"

"তুমি কি পাগল হয়েছ, ঠাকুর! সাধ করে কেউ বোম্বেটেদের খপ্পরে যায়? তুমি একলা সেখানে গিয়ে কী করবে? বরং চাটগাঁয় গিয়ে মোগল সেপাই হতে চাও, তাই হও।"

"ঐ জাহাজে আমাদের দেশের লোকদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য দেশে বিক্রি করবে। তাদের ছাড়াবার জন্য কোনো চেষ্টা করব না আমরা?"

"আমরা মানে তুমি আর আমি? ঠাকুর, তোমার দেখছি, সত্যিই মাথার ঠিক নেই। ঐ খুনে বোম্বেটেদের সঙ্গে আমরা দু'জনে খালি হাতে লড়তে যাব?"

"তবে, তুমি থাকো, আমি একাই যাই। কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে শুধু বলে দাও!"

"এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে আসবে। যাবার পথেই তোমায় বাঘে খেয়ে ফেলবে!"

"তুমিই তো সকালে বলেছিলে যে, কপালে যদি লেখা থাকে বাঘের পেটে প্রাণ যাবে, তা হলে তা কেউ খন্ডাতে পারবে না। অন্ধকারে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে আসব। দেখা দরকার, সত্যিই ও দুটো গঞ্জালেসের জাহাজ কি না, আর ঐ জাহাজে বন্দীরা আছে কি না!"

"ঐ বন্দীদের মধ্যে তোমার আপনজন কেউ আছে বুঝি? তোমার ছেলে বা বউ!"

"না, তেমন আপনজন কেউ নেই। আমি বিয়ে করিনি। তবে একটি ছোট মেয়েকে সাপে কামড়েছিল, তাকে আমি বাঁচিয়ে-ছিলাম, সে-ও ঐ জাহাজে বন্দিনী। তাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম কি ফিরিঙ্গিদের কাছে ক্রীতদাসী হবার জন্য? তা ছাড়া, আমার দেশের মানুষ সবাই তো আমার আপনজন।"

"ওখানে গেলে কোনোই লাভ হবে না। শুধু তুমি বেঘোরে প্রাণটা হারাবে।"

"তবু যেতেই হবে আমাকে। তুমি আমাকে পথটা দেখিয়ে দাও!"

বিশু ঠাকুর গাছ থেকে নেমে পড়লেন। মাধবদাসও সঙ্গে নেমে এসে বলল, "ঠাকুর, আবার তোমাকে বলছি, যেও না শুধু-শুধু প্রাণটা দিও না।"

"যেতে আমায় হবেই!"

"তবে এই দিকে সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে চলে যাও। এক-সময় নদীর মোহনা দেখতে পাবে। একটা কথা বলে দিই তোমায় হেঁতাল গাছ চেনো তো, ঐ হেঁতালের ঝোপ দেখলে খুব সাবধান। ঐ হেঁতাল-ঝোপেই বাঘ লুকিয়ে থাকে। জলের একে-বারে ধার ঘেঁষে যেও, বাঘ দেখলে যাতে সমুদ্দুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো।"

বিশু ঠাকুর মাধবদাসকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাই, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। যদি বেঁচে থাকি, তা হলে তোমার কথা কখনো ভুলব না।"

আর দেরি না করে বিশু ঠাকুর হাঁটতে শুরু করলেন। জাহাজ দুটোকে তিনি তখনও কিছু দূরে ঝাপসা ভাবে দেখতে পাচ্ছেন। একটু পরেই পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে।

খানিক পরে তিনি পর পর কয়েকবার কামান দাগার শব্দ শুনতে পেলেন। একটা জবলন্ত কামানের গোলা সমুদ্রের জলে পড়ল। দস্যুরা হঠাৎ কেন কামান দাগছে, তা বিশু ঠাকুর বুঝতে পারলেন না। যদি গায়ে এসে গোলা লাগে, এই ভয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন বালির ওপর। কিছুক্ষণ পরে সব চুপচাপ হয়ে গেলে তিনি হাঁটতে লাগলেন আবার।

কোনো বাঘের মুখোমুখি পড়তে হল না তাঁকে। এক জায়গায় তিনি শুধু দুটি খুব বড় জানোয়ার দেখলেন, অন্ধকারের মধ্যে সেগুলি কী জানোয়ার তিনি চিনতে পারলেন না। সেই সময় তিনি কোমর পর্যন্ত জলে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন। চাঁদ উঠেছে, কিন্তু মেঘলা আকাশ বলে জ্যোৎস্না বিশেষ

নেই। কিছু দূরের জিনিস আবছা-আবছা দেখা যায়।

একটু পরে জন্তু দুটো ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। মোটা-মুটি এক ঘন্টার মতন সময় হেঁটেই বিশু ঠাকুর পেঁৗছে গেলেন নদীর মোহনায়। তিনি দেখতে পেলেন জাহাজি লণ্ঠনের আলো।

বন্দীদের জাহাজ থেকে নামিয়ে গোল করে বসানো হয়েছে। মাঝখানে জ্বলছে দুটো মশাল। কয়েকজন ফিরিঙ্গি খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছে তাদের। আর একটু দূরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে গঞ্জালেস, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে কয়েকজন অনুচর। মনে হয় কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে তারা খুব উত্তেজিত ভাবে আলোচনায় মত্ত।

জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশু ঠাকুর সব দেখলেন। তাঁর ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। রাগে-দুঃখে যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে তাঁর।

তিনি একা, নিরস্ত্র, এতগুলো ডাকাতের সঙ্গে কী করে লড়বেন! প্রাণের ভয় নেই তাঁর, কিন্তু শুধু প্রাণ দিলে তো আর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না!

তবু দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি মনে মনে বললেন, "একটা কিছু করতেই হবে! একটা কিছু করতেই হবে!"

জঙ্গলের মধ্যে তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই জায়গাটা কাদা-কাদা। বোধহয় জোয়ারের সময় জল উঠে এসেছিল। কাদায় পা গেঁথে যাচ্ছে। তবু তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন ঐদিকে চেয়ে।

বন্দীদের মধ্যে দুখানা করে রুটি বিলি করা হল। ঠিক ভিখারির মতন হাত বাড়াল সবাই সেই রুটি নেবার জন্য। এরা সবাই গ্রামের গৃহস্থ মানুষ, দু বেলা পেট ভরে ভাত খেতে পেত ঠিকই, এখন মাত্র দুখানা রুটিতে ওদের কতখানি পেট ভরবে।

গঞ্জালেস আর তার অনুচররা এখন খুব জোরে-জোরে কথা বলছে, মনে হয়, কোনো ব্যাপারে ওদের মধ্যে তর্ক বেধে গেছে।

বিশু ঠাকুর ভাবলেন, আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনবেন। দু-এক পা এগিয়েছেন সবে মাত্র, এমন সময় কে যেন হঠাৎ তাঁর ঘাড় ধরে টানল খুব জোরে। তিনি কিছুই বুঝতে পারার আগে পড়ে গেলেন একটা ঝোপের ওপরে। সে যেন তাঁকে আবার সরসরিয়ে টেনে নিয়ে গেল অনেকখানি।

কোনো জন্তু নয়, মানুষই, একজন কেউ দু হাতে তাঁর গলা টিপে আছে। বিশু ঠাকুর প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে চেষ্টা করলেন উল্টে গিয়ে আততায়ীকে আক্রমণ করবার।

লোকটি তখন বলল, "ঠাকুর, চুপ! শব্দ করো না!"

মাধবদাসের গলা! আনন্দে বিশু ঠাকুরের সারা শরীর কেঁপে উঠল। তিনি ভেবেছিলেন, এবার তাঁর নিশ্চিত মরণ হবে।

মাধবদাস ফিসফিসিয়ে বলল, "ঠাকুর, মরতে বসেছিলে! ঐ দ্যাখো, সামনের গাছের ডালে!"

বিশু ঠাকুর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় চেয়ে দেখলেন, সামনে গাছের ডাল থেকে একটা কী যেন দুলছে! গাছেরই আর একটা ডাল মনে হয়, কিন্তু অন্য কোনো ডাল এমন দুলছে না।

মাধবদাস বলল, "সাপ! আর এক লহমা দেরি হলেই তোমায় কামড়াত!"

বিশু ঠাকুর উঠে এসে বললেন, "তুমি এলে কখন?"

"তোমায় একলা ছেড়ে দিয়ে মনটা কেমন লাগল! তাই পিছু-পিছু চলে এলাম! এখানে ভীষণ সাপ!"

"আবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে!"

"আমি বাঁচাইনি, ভগবান বাঁচিয়েছেন!"

"মাধবদাস, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বোম্বেটেরা সবাই এখন এখানে। এই সময় ওদের জাহাজে কেউ থাকে না। চলো, আমরা সমুদ্রে নেমে সাঁতরে পেছন দিক দিয়ে ওদের একটা জাহাজে উঠি।"
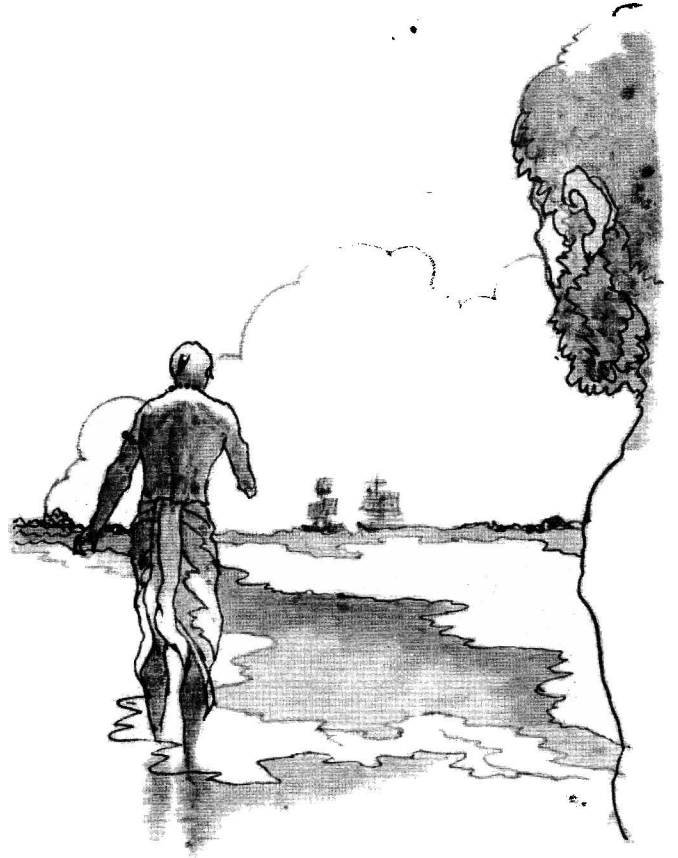
"সাধ করে আমরা রাক্ষসের গুহায় পা দেব?"

"জাহাজে কেউ থাকবে না। আমরা ভাল করে আগে দেখে নেব, যদি কেউ থাকে, আমরা আবার নেমে পড়ব জলে, এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ওরা খুঁজে পাবে না। জাহাজ থেকে যদি চকমকি পাথর আর দু-একটা অস্ত্র পাওয়া যায়, তাতে তোমার সুবিধে হবে না?"

"এই মোহনার মুখটায় কুমির গিসগিস করে। জাহাজে ওঠার আগেই যদি আমরা কুমিরের পেটে যাই?"

"তোমার কপালে কী লেখা আছে, বাঘের পেটে যাওয়া, না কুমিরের পেটে যাওয়া? তুমি তো ভিতু নও, মাধবদাস!"

"ঠাকুর, আমি না গেলে, তুমি একলাই নিশ্চয়ই যাবে?"

"হ্যাঁ!"

"চলো তা হলে। মরতে হয় দুজনেই একসঙ্গে মরি!"

গঞ্জালেসের জাহাজ আর আনাপুরামের জাহাজ পাশাপাশি রাখা। পেছন দিকে আনাপুরামের জাহাজ।

ওরা দুজনে সাঁতরে এসে উল্টোদিক থেকে আনাপুরামের জাহাজের কাছে চলে এল। তারপর নোঙরের কাছি ধরে বিশ্রাম করতে লাগল একটু।

জাহাজের ডেকের ওপর একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলছে। তাতে একটুখানি জায়গায় শুধু আলো হয়েছে। কোনো লোকজনের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশু ঠাকুর মাধবদাসকে খুব নিচু গলায় বললেন, "তুমি এখানে থাকো, আমি আগে দেখে আসি। আমার কোনো বিপদ হলে, তুমি চুপি চুপি পালিয়ে যেও!"

মাধবদাস বলল, "হুঁ!"

দড়ি বেয়ে বিশু ঠাকুর উঠে এলেন ওপরে। খুব সাবধানে

রেলিঙের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলেন। ডেকের ওপর কেউ নেই। তিনি রেলিং টপকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে। একটুক্ষণ পরে যখন বুঝতে পারলেন সত্যিই সেখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে না, তখন তিনি একটা ছায়ামূর্তির মতন শাঁ করে দৌড়ে চলে এলেন ডেকের অন্য পাশে।

সেখানে পাশাপাশি দুটো ক্যাবিন। একটা ক্যাবিনের জানলার একপাশে দেখলেন, সেখানে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে আর খাটের ওপর শুয়ে আছে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে। চক্ষু দুটি বোজা। যেন এক ঘুমন্ত রাজকুমারী।

সত্যিই ইনি আরাকানের রাজকুমারী এবং আনাপুরামের বোন সুবনা। কিন্তু তাঁর হাত দুটো খাটের সঙ্গে বাঁধা। খাটের নীচে দরজার সামনে বসে ঢুলছে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ফিরিঙ্গি বালক। এ গঞ্জালেসের নিজস্ব ভৃত্য, এর নাম ডোমিনিক একে রেখে যাওয়া হয়েছে সুবনাকে পাহারা দেবার জন্য।

বিশু ঠাকুর সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য ক্যাবিনটাতে দেখলেন। সেটা ফাঁকা। তার পাশ দিয়ে তিনি জাহাজের খোলে নেমে যাবার একটা সিঁড়ি দেখতে পেয়ে নেমে গেলেন সেটা দিয়ে।

আনাপুরামের জাহাজ গঞ্জালেসের জাহাজের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আর সাজানো-গোছানো। জাহাজের খোলের মধ্যে ক্রীতদাসদের রাখবার জন্য মস্ত বড় একটা ঘর, সেই ঘরের দেয়ালে সারি-সারি লোহার আংটা, ওগুলোতে ক্রীতদাসদের বেঁধে রাখা হয়। পাশাপাশি আরও দু-তিনটি ঘর রয়েছে।

কিন্তু কোথাও কোনো অস্ত্র খুঁজে পেলেন না বিশু ঠাকুর। আগের দিন লড়াইয়ের পর এ-জাহাজের সব অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে ও-জাহাজটাতে। এখানে কিছুই নেই।

ঘুরতে-ঘুরতে একটা ঘরে ঢুকে বিশু ঠাকুর বুঝলেন, সেটা এ জাহাজের রান্নাঘর। সেখানে তিনি পেলেন কয়েকটা চকমকি পাথর আর দুখানা মাংস-কাটা ছুরি। তাড়াতাড়ি সেই পাথরগুলো কোমরে গুঁজে তিনি ছুরি দুখানা সঙ্গে নিয়ে আবার পা টিপে-টিপে উঠে এলেন ওপরে। তারপর নোঙরের দড়ি বেয়ে ফিরে এলেন মাধবদাসের কাছে।

একখানা ছুরি আর চকমকি পাথরগুলো মাধবদাসকে দিয়ে তিনি বললেন, "এবার তুমি চলে যেতে পারো!"

মাধবদাস বলল, "আর তুমি কী করবে, ঠাকুর?"

"আমি তো শুধু জাহাজ থেকে জিনিস চুরি করতে আসিনি!"

"ঐ একখানা মাংস-কাটা ছুরি দিয়ে তুমি ডাকাতদের সঙ্গে লড়বে?"

"দেখা যাক, কী করা যায়?"

মাধবদাস নোঙরের দড়ি ধরে জাহাজের গায়ের দুটো আংটার ওপর দিব্যি বসে আছে। বিশু ঠাকুরও একটা আংটার ওপর পা দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মাধবদাস, নদীর জলে হঠাৎ একটা কলকল শব্দ হচ্ছে কেন?"

মাধবদাস বলল, "ভাটার টান পড়েছে যে? দেখছ না, জল কমে যাচ্ছে। এই দ্যাখো, আগে এই পর্যন্ত জাহাজে জলের দাগ ছিল।"

"এই ভাটার টান কতক্ষণ থাকবে?"

"তা দু-তিন ঘণ্টা!

"এখন যদি আমরা ছুরি দিয়ে এই জাহাজের নোঙরের দড়ি কেটে দিই, তা হলে কী হবে?"

"তাহলে ভাটার টানে জাহাজ গিয়ে সমুদ্দুরে পড়বে!"

"তারপর?"

"পাল তো তোলাই আছে দেখছি! তারপর বাতাস যেদিকে বইবে, জাহাজ সেইদিকে ছুটবে! কেন, তুমি কি গোটা জাহাজটাই চুরি করতে চাও নাকি?"

যখন ওরা এই সব কথাবার্তা বলছে, তখন নদীর ধারে গম্বুজের পাশে আবার অন্য একটা ব্যাপার চলছে।

গঞ্জালেসের সঙ্গে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের রীতিমতন ঝগড়া বেঁধে গেছে। সুন্দরবনের এই জায়গাটা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়েও তারা আবার কেন এখানে ফিরে এল. তা প্রথমে তারা কেউ বুঝতে পারেনি! তাদের সঙ্গে এখন প্রচুর লুটের মাল। বিশেষত আনাপুরাম আর তার দলবলকে হত্যা করে তারা এত সম্পদ পেয়েছে, যা তারা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি! এখন তারা চায় বাড়ি ফিরে গিয়ে কিছুদিন ফুর্তি করতে। এই রকমই হয় প্রতি বছর। কিন্তু তাদের কাপ্তান তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

আনাপুরামের বোন সুবনার কাছে ডোমিনিক নামে যে ছোকরা চাকরটি থাকে, সে সুবনার কাছ থেকে শুনেছে যে, চট্টগ্রাম মোগলদের দখলে চলে গেছে, আর সন্দ্বীপও মোগলরা নিয়ে নেবে। তারা আর সেখানে ফিরতে পারবে না।

ডোমিনিক এই খবর দিয়ে দিয়েছে অন্য দস্যুদের কাছে। তাই তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে খুব। গঞ্জালেস তার স্ত্রী-পুত্রদের ওপর সব দয়ামায়া ত্যাগ করে তাদের ফেলে পালাতে চায়, কিন্তু সব দস্যু তা চায় না। তাদের ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সন্দ্বীপে ফিরে যাবে, সেখানে যদি মোগলরা আগেই পৌঁছে থাকে, তবে তাদের সঙ্গে লড়াই করে তারা বীরের মতন প্রাণ দেবে। তবে, তাদের এখনো ধারণা, জলযুদ্ধে মোগলরা তাদের সঙ্গে পারবে না।

গঞ্জালেস অনেক ভাবে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। গঞ্জালেসের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সে শায়েস্তা খাঁর নাম আগে থেকেই জানে। মোগল সম্রাট যখন অতবড় একজন সেনাপতিকে পাঠিয়েছেন, তখন ভালমতন ব্যবস্থাও করেছেন নিশ্চয়ই। এতবড় একটা দেশের রাজশক্তির সঙ্গে লড়াই করে জলদস্যুরা কখনো জিততে পারে না। এই রকম সময়ে জলদস্যুদের লুকিয়ে থাকাই নিয়ম। কোনোরকমে একবার গোয়ায় পৌঁছতে পারলে হয়। তারপর পর্তুগীজ সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে আবার চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ উদ্ধার করতে হবে।

গঞ্জালেসের পরেই যে দস্যুদলের মধ্যে প্রধান, তার নাম আন্তোনিও। গঞ্জালেস যেমন বিশাল মোটা, সে তেমনি খুব লম্বা। এই আন্তোনিওই ঝগড়া করছে বেশি, সে এক্ষুনি সন্দ্বীপের দিকে রওনা হতে চায়। অনেক জলদস্যুই আন্তোনিওর পক্ষে।

খুব যখন কথা-কাটাকাটি চলছে, তখন হঠাৎ একজন বোম্বেটে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহ্ গড! আমার কী হল? আমি মরে গেলাম।"

সে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল, আর সবাই দেখল তার পাশে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে মস্ত বড় একটা সাপ।

সাপ দেখে সবাই প্রথমে হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। একমাত্র সাহসী গঞ্জালেস কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার টেনে এক কোপে কেটে ফেলল সাপটাকে।

ঠিক তক্ষুনি ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে একজন আবার চেঁচিয়ে উঠল, "বাপরে! মা রে! সাপ! আমায় সাপে কামড়েছে।"

সে লোকটাও ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

তখন মশালের আলোয় দেখা গেল, সেখানে কিলবিল করছে আরও চার-পাঁচটি সাপ। জোয়ারের সময় জল উঠে এলে এই সাপগুলো গাছের ওপর আশ্রয় নেয়। আবার ভাটার সময় নেমে আসে। দস্যুদের মনে হল, হঠাৎ যেন কোনো সাপের বাহিনী তাদের আক্রমণ করতে আসছে।

ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর দস্যুরাও সাপকে ভয় পায়। সাপ যে কখন কোনদিক দিয়ে কামড়াবে, তার কোনো ঠিক নেই। তারা কেউ আর সেখানে থাকতে চায় না এক মুহূর্ত। যাতে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না হয়, সেই জন্য গঞ্জালেস হুকুম দিল, আগে সব ক্রীতদাসদের জাহাজে তোলা হোক, তারপর অন্যরা উঠবে।

যে-ক্রীতদাসটিকে সাপে কামড়েছিল, তাকে সেখানেই ফেলে গেল ওরা। আর ফিরিঙ্গিটিকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। কিন্তু জাহাজে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই মারা গেল সে-ও।

গঞ্জালেস বলল, "কাল দিনের বেলা আমরা কিছু হরিণ আর শুয়োর শিকার করে আনব। আর জলের জালাগুলোতে ভরে নেব নদীর জল। তারপর জাহাজ আবার চলবে। আমাদের সঙ্গে যা ধনসম্পদ আছে, তাতে প্রত্যেকেই আমরা গোয়াতে গিয়ে রাজার হালে থাকতে পারব!"

আন্তোনিও সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "নাঃ! আমরা গোয়া যাব না! আমরা সন্দ্বীপ যাব!"

অন্য অনেক দস্যু সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, "হ্যাঁ, আমরা সন্দ্বীপ যাব! আমাদের বাড়ির লোকজনদের কী হল, জানতে চাই!"

রাগে জ্বলে উঠল গঞ্জালেসের চোখ। সে গর্জন করে উঠল, "কী, আমার মুখের ওপর কথা। আমি কাপ্তান, আমার মুখের প্রতিটি কথাই আদেশ! আটজন প্রহরী থাকবে, বাকি সবাই শুতে যাও এখন!"

আন্তোনিও বলল, "না, কাপ্তান! আপনার অন্যায় আদেশ আমরা মানব না। আমরা এখন বাড়ি যেতে চাই! আজ রাতেই!"

কয়েকজন দস্যু তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, "আমরা কাপ্তানের আদেশ মানি না!"

গঞ্জালেস ধমক দিয়ে উঠল, "তলোয়ার নামা, গর্দভের দল। নইলে এখুনি তোদের শেষ করব!"

অমনি জাহাজের ডেকের ওপর যুদ্ধ লেগে গেল! কিছু দস্যু গঞ্জালেসের যে-কোনো কথায় প্রাণ দিতে পারে, তারাও তলোয়ার খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্তোনিওর দলের ওপর।

আন্তোনিও একটা লম্বা তলোয়ার নিয়ে ছুটে এল গঞ্জালেসের দিকে।

গঞ্জালেস কিন্তু তলোয়ার বার করল না, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুমের সুরে বলল, "নির্বোধ আন্তোনিও, এখনো বলছি, তলোয়ার ফেলে দে, তাহলে তোকে ক্ষমা করব!"

আন্তোনিও কাছে এসে বলল, "লড়ো আমার সঙ্গে! কাপুরুষ! তুমি লড়তে ভয় পাও! মোগলের সঙ্গে লড়াইয়ের ভয়ে তুমি পালাচ্ছ?"

গঞ্জালেস আর দ্বিধা না করে পিস্তল হাতে নিয়ে সোজা গুলি করল আন্তোনিওর বুকে! আন্তোনিওর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, সেই অবস্থায় সে ঘুরে পড়ে গেল ধপাস করে!

পিস্তলের শব্দে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল এক মুহূর্তের জন্য। আবার শুরু হয়ে গেল। অন্য দস্যুরাও জানে, একবার বিদ্রোহ করলে আর ক্ষমা নেই, এখন জিততে না পারলে গঞ্জালেসের বিশ্বাসী দস্যুদের হাতে সবাইকে মরতে হবে। পিস্তলে একবার গুলি ছোঁড়া হলে আর একবার গুলি ভরতে একটু সময় লাগে। সেইজন্য এক সঙ্গে দশ-বারো জন দস্যু ধেয়ে এল গঞ্জালেসের দিকে।

এবার গঞ্জালেস তলোয়ার ধরল। তার সঙ্গে যুদ্ধে পারার ক্ষমতা এ-জাহাজে কারুর নেই। তার দলেও বেশ কিছু দস্যু আছে। লড়াই জমে উঠল খুব। মাঝে-মাঝেই এক একজন দস্যু পড়ে যেতে লাগল মাটিতে।

লড়তে-লড়তে এগিয়ে এসে গঞ্জালেস নিচু হয়ে মৃত আন্তোনিওর কোমর থেকে আর একটা পিস্তল টেনে নিল। এ-জাহাজে শুধু গঞ্জালেস আর আন্তোনিওর কাছেই দুটি পিস্তল ছিল। আন্তোনিও নিজের পিস্তল বার করেনি। কারণ সে ভেবেছিল, তার কাপ্তান তার সঙ্গে বীরের মতন লড়াই করবে। খুনোখুন না করে শুধু লড়াইয়ের পর হারজিত মেনে নেবে দু পক্ষ। তার কাপ্তান যে খুন করে ফেলবে, সে কল্পনাই করেনি। তার মৃত চোখ দুটিতে সেই বিস্ময় এখনো লেগে আছে।

কাপ্তানের হাতে আর-একটি পিস্তল দেখে বিদ্রোহী দস্যুরা এবার ভয় পেয়ে গেল। তারা যুদ্ধ থামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "কাপ্তান, আমাদের ক্ষমা করো!"

পিস্তল উঁচিয়ে রেখে, গঞ্জালেস বিদ্রোহীদের উদ্দেশে বলল, "সবাই অস্ত্র ফেলে দে!"

বিদ্রোহীরা তাই করল।

গঞ্জালেস তার অন্য অনুচরদের বলল, "দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধ সব কটার।"

ডেকের ওপরেই জড়ো করা ছিল দড়ির স্তূপ। গঞ্জালেসের অনুচরেরা বিদ্রোহী দস্যুদের সকলের হাত-পা বেঁধে ফেলল চটপট করে।

গঞ্জালেস জ্বলন্ত চক্ষে বলল, "বিদ্রোহীদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু আমার মন বড় নরম, নিজের লোকদের আমি সহজে মারতে চাই না! কাল বিকেলে জাহাজ ছাড়ার পর যে-যে এসে আমার পা ধরে ক্ষমা চাইবে, আমি তাদের দোষ ক্ষমা করব!"

অনেক বিদ্রোহী বলে উঠল, "কাপ্তান, আমরা এখুনি ক্ষমা চাইছি। আমরা তোমার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইছি!"

গঞ্জালেস বলল, "আজ রাত্রে সবাই বন্দী থাকবে! এখন ছেড়ে দিলে আবার এক সময় হাঙ্গামা বাঁধাবি তোরা!"

গঞ্জালেসের নির্দেশে সব কজন বিদ্রোহীকে সেই রকম হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় রেখে দেওয়া হল এক জায়গায়। গঞ্জালেসের নিজের দলে রইল মাত্র কুড়ি-পঁচিশ জন। প্রায় পনের-ষোলজন দস্যু মৃত বা সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় পড়ে রইল ডেকের ওপর।

গঞ্জালেস নিজস্ব অনুচরদের নিয়ে এগোল ভাঁড়ার-ঘরের দিকে। কোনো একটা যুদ্ধের পরই বুলেপঞ্চ পান না করলে দস্যুরা ঠিক থাকতে পারে না! নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তারা আরও বেশি অবসন্ন। গল-গল করে তারা বুলেপঞ্চ ঢেলে দিতে লাগল গলায়।

জাহাজের খোলের মধ্যে বন্দীরা ওপরের দাপাদাপি আর তলোয়ারের ঝনঝনানি আর পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে, কিন্তু কী যে হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারল না!

একটু পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল একটি ছায়ামূর্তি। বন্দীদের কাছে গিয়ে ডাকল, "নিতাই! নিতাই!"

নিতাই দারুণ ভয় পেয়ে বলে উঠল, "কে?"

"চুপ! আমি বিশু ঠাকুর!"

প্রায় সব বন্দীই একসঙ্গে ভয়ের শব্দ করে উঠল। নিতাই দম-চাপা গলায় বলল, "ঠাকুর, তুমি ভূত হয়ে এসেছ? তোমায় তো মেরে ফেলেছে শুনেছি!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "না, আমি মরিনি! কেউ কোনো শব্দ কোরো না! আমি যা বলছি, শুধু শুনে যাও! আমি তোমাদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেব। তোমাদের বাঁচার একটা উপায় পাওয়া গেছে। কিন্তু তার জন্য সাহসী হতে হবে। এখানে প্রায় দেড়শো জন মেয়ে-পুরুষ আছে, তার মধ্যে প্রায় সত্তর আশিজন শক্ত, সমর্থ জোয়ান। তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।"

দূরের এক কোণ থেকে কুড়ানি বলে উঠল, "ঠাকুর, তুমি সত্যিই বেঁচে আছ? একবার কাছে এসো তো, ছুঁয়ে দেখি!"

বিশু ঠাকুর সেদিকে এগিয়ে গিয়ে কুড়ানির বাঁধন খুলে দিলেন। তারপর অন্যদেরও বাঁধন একে-একে খুলতে খুলতে বললেন, "তোমরা সবাই তৈরি হয়ে থাকবে। জাহাজ এক সময় দুলে উঠবে। থেমে থাকা জাহাজ চলার সময় যেমন দুলে ওঠে সেই রকম। ঠিক তক্ষুনি জোয়ান পুরুষরা সবাই ওপরে উঠে যাবে! ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে অনেকে মরেছে,

অনেকে বন্দী হয়ে আছে। ওপরে পাহারায় থাকবে মাত্র সাত-আট জন। তোমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর। পারবে না?"

কে একজন বলল, "ওরে বাবা, তাদের হাতে যে বড় বড় সব তলোয়ার। কচুকাটা করবে আমাদের!"

বিশু ঠাকুর বলল, "ওপরে উঠে দেখবে যে-সব দস্যু মরে পড়ে আছে, হাতের তলোয়ারও পড়ে আছে তাদের পাশেই। আজ রাতে আর ওসব কেউ সরাবে না। ঐগুলো তোমরা হাতে তুলে নেবে! কী রে নিতাই, পারবি না?"

নিতাই বলল, "কিন্তু ঠাকুর, আমরা কেউ তলোয়ার চালাতে জানি না। বোম্বেটেদের সঙ্গে আমরা কী করে পারব?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আজ রাতে কেউ আর ভাল করে পাহারা দেবে না। ওরা নেশায় মাতাল হয়ে আছে। পারতেই হবে, তোমাদের যে-কোনোভাবে হোক, পারতেই হবে! আজ রাতেই শেষ সুযোগ। নইলে তোমাদের নিয়ে যাবে অনেক দূরদেশে। কুকুর-বেড়ালের মতন বেঁচে থেকে লাভ কী? লড়াই করে বাঁচার শেষ চেষ্টা করবে না?"

কালু শেখ বলল, "হ্যাঁ ঠাকুর, লড়ব। তুমি বলছ যখন!"

নিতাই বলল, "কিন্তু ঐ ষাঁড়ের মতন চেহারার কাপ্তান? সে একাই তো একশো!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "কাপ্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের ভার রইল আমার ওপর। তোমাদের সবাইকে লড়তে হবে এককাট্টা হয়ে। ওপরে উঠে হাতের কাছে তলোয়ার, বর্শা, ডাণ্ডা যা পাবে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মনে থাকে যেন, জাহাজ যখন নড়ে উঠবে!"

আরও কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে বিশু ঠাকুর উঠে গেলেন ওপরে। বন্দীদের কয়েকজনের হাত-পায়ের বাঁধন তিনি খুলে দিয়েছেন, এবার ওরাই বাকিদের খুলে দেবে।

রাত আর একটু ঘন হলে গঞ্জালেস হেঁড়ে গলায় গান গাইতে-গাইতে চলে এল আনাপুরামের জাহাজে। তার নিজের দলের লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের কয়েকজনকে মেরে ফেলতে হয়েছে, আর কয়েকজনকে বন্দী করতে হয়েছে বলে তার মন খুব ভারাক্রান্ত। সেটা চাপা দেবার জন্যই সে খুব কষে বুলেপঞ্জ খেয়েছে আর গান গাইছে!

যে ক্যাবিনে সুবনা শুয়ে আছে, সেই ক্যাবিনে প্রথমে এসে ঢুকল গঞ্জালেস। ডোমিনিক নামের ছেলেটি তাকে দেখে উঠে বসতেই গঞ্জালেস খুব জোর এক লাথি কষাল তাকে। দাঁত কড়মড় করে বলল, "শয়তানের বাচ্চা, তুই সব খবর দিয়েছিলি আন্তোনিওকে! ভাল করে পাহারা দে!"

সুবনা চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে দেখে গঞ্জালেস বলল, "গোয়ায় নিয়ে গিয়ে আগে তোমায় খ্রীষ্টান করব, তারপর বিয়ে করব তোমায়। তারপর দেখব, তোমার কত তেজ!"

আবার হেঁড়ে গলায় গান গাইতে-গাইতে গঞ্জালেস সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এল পাশের ক্যাবিনে। ধপাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

একটু পরেই জাহাজটা দুলে উঠল বেশ জোরে।

গঞ্জালেসের তন্দ্রা-মতন এসেছিল, তবু জাহাজের দুলুনি সে ঠিক টের পেল। বিছানায় উঠে বসে সে বলল, "এ কী?"

সঙ্গে-সঙ্গে তীরের মতন এক ছায়ামূর্তি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তার হাতে একটা ছুরি। সেটা বসিয়ে দিতে গেল গঞ্জালেসের বুকে। কিন্তু গঞ্জালেসের বুকে, কোটের তলায় একটা লোহার পাত বাঁধা থাকে। ছুরি তার বুকে লাগল না। তখন সেই ছায়ামূর্তি তার বুকের ওপর বসে পড়ে প্রাণপণে টিপে ধরল গলা।

একটুক্ষণের জন্য গঞ্জালেস বেকায়দায় পড়েছিল। কিন্তু তার গায়ে অসুরের শক্তি। সেও প্রচণ্ড এক ঠ্যালা লাগাল আততায়ীকে। বিশু ঠাকুর ছিটকে পড়ে গেলেন দরজার বাইরে। পরক্ষণেই তিনি আবার উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু তিনি আবার আসবার আগেই বিছানায় বসে থাকা অবস্থাতেই গঞ্জালেস পিস্তলের গুলি চালাল। বিশু ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন দড়াম করে।

গঞ্জালেস বিছানা থেকে নেমে এল বাইরে। পা দিয়ে বিশু ঠাকুরের শরীরটা উল্টে দিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "এটা সেই ভূতটা? এ মরেনি?"

বিশু ঠাকুর তখনও মরেননি। তাঁর বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে, তবু সেই অবস্থাতেও মরিয়া হয়ে তিনি আচমকা গঞ্জালেসের পা ধরে এক টান মারলেন! গঞ্জালেসও পড়ে গেল ডেকের ওপর।

বিশু ঠাকুরই আগে উঠে দাঁড়ালেন। গঞ্জালেসও উঠে বসে হিংস্র গলায় হিসহিসিয়ে বলল, "বাঙালি কুকুর! এবার তোর গলা টিপে আমি শেষ করব!"

কিন্তু গঞ্জালেসকে আর উঠতে হল না। আর একটি ছায়ামূর্তি পেছন থেকে এসে গঞ্জালেসের মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এক ঘা কষাল। গঞ্জালেস গড়িয়ে পড়ল অজ্ঞান হয়ে!

ঠিক তখনই গোলমাল শুরু হল পাশের জাহাজে। বিশু ঠাকুর বললেন, "তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ মাধবদাস! নইলে আমি আর পারতুম না। তুমি শক্ত দড়ি দিয়ে একে বেঁধে ফেল। দেখো, খুব সাবধান! আমি যাই পাশের জাহাজে!"

পাশের জাহাজ দখল করতে মোটেই বেগ পেতে হল না। এ জাহাজের অধিকাংশ জলদস্যুই নেশায় একেবারে অজ্ঞান হয়ে ছিল। আজ রাতে আর কোনোরকম ঝঞ্ঝাট তারা আশঙ্কাই করেনি। ক্রীতদাসরা সবাই মিলে ঘিরে ধরায় তারা লড়বার সামান্য চেষ্টা করল, কিন্তু হাত ঠিকমতন চলছে না। এর মধ্যে বিশু ঠাকুর গঞ্জালেসের পিস্তলটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দস্যুদের বললেন, "তোমরা আত্মসমর্পণ করলে সবাই বেঁচে যাবে! তোমাদের কাপ্তান গঞ্জালেস ধরা পড়েছে। আর তোমাদের আশা নেই!"

বিশু ঠাকুরকে দেখে ভয়ে তাদের গলা শুকিয়ে গেল। তারা অস্ত্র ফেলে দিল মাটিতে।

জাহাজ দুটো ততক্ষণে সমুদ্রে এসে পড়েছে। পুব দিকের বাতাস পালে লেগে জাহাজ দুটো ছুটল সেই দিকে। দস্যুদের সবাইকে বেঁধে ফেলার পর নিতাইয়ের দল মাধবদাসের নির্দেশে দাঁড় বাইতে শুরু করল।

পুরো একদিন সমান গতিতে চলার পর জাহাজ দুটি এসে পৌঁছল চট্টগ্রামে। বিশু ঠাকুরের গায়ে যে গুলি লেগেছিল, তাতে বেশি ক্ষত হয়নি, তিনি শায়েস্তা খাঁর শিবিরে গিয়ে খুলে বললেন সব কথা।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শায়েস্তা খাঁ দলবল নিয়ে দেখতে এলেন জাহাজে বন্দী জলদস্যুদের। সর্দার গঞ্জালেসের নাম তিনিও শুনেছেন। বঙ্গোপসাগরের জলদস্যুদের মধ্যে এই গঞ্জালেসই সবচেয়ে কুখ্যাত। সেই গঞ্জালেস যে এমন বন্দী অবস্থায় জাহাজের ডেকে পড়ে আছে, এ দেখে বিস্ময়ে শায়েস্তা খাঁর চোখ কপালে উঠল।

শায়েস্তা খাঁ গঞ্জালেসকে বললেন, "তোমার সাহস আর বীরত্বের কথা আমি শুনেছি। তুমি বহু পাপ করেছ, বহু লোককে খুন করেছ, তবু আমি তোমাকে এবং তোমার দলবলকে একটা সুযোগ দিতে চাই। আরাকান অভিযানে তোমরা যদি আমাদের সাহায্য কর, তাহলে আমি মোগল-সম্রাটের নামে ক্ষমা করব তোমাদের। নৌযুদ্ধে তোমাদের সাহায্য আমাদের কাজে লাগবে।"

গঞ্জালেসের বাঁধন খুলে দেওয়া হলে সে শায়েস্তা খাঁর

সামনে এক হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "সন্দ্বীপে আমাদের সকলের বৌ-ছেলেমেয়েদের যদি আপনি ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমরা সবাই আপনার আনুগত্য মেনে নেব!"

শায়েস্তা খাঁ বললেন, "তাই হবে!"

তারপর তিনি বিশু ঠাকুরের খুব প্রশংসা করার পর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্রাহ্মণ, বলো, তুমি কী পুরস্কার চাও? সোনা-দানা জায়গির, মনসবদারি. পদ, যা তোমার খুশি চাও!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আমার কিছুই চাই না। শুধু আমার একটা শপথ মিটিয়ে নিতে দিন।"

জাহাজের ডেক থেকে একটা চাবুক কুড়িয়ে নিয়ে তিনি শপাং শপাং করে দু ঘা চাবুক কষালেন গঞ্জালেসের গায়ে। তারপর চাবুক ফেলে দিয়ে কাছে এসে গঞ্জালেসের দু গালে লাগালেন দুটি প্রচণ্ড থাপ্পড়!

শায়েস্তা খাঁর দিকে ফিরে বিশু ঠাকুর বললেন, "সেনাপতি. এই আমার পুরস্কার। আমি এইটুকুই চেয়েছিলাম।"

ইতিহাসে বলে দুর্ধর্ষ ফিরিঙ্গি জলদস্যু সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও কয়েকটি শর্তে তার দলবল নিয়ে ধরা দিয়েছিল মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর কাছে। কিন্তু বিশু ঠাকুর নামে একজন বাঙালি যুবক যে তাদের কৌশলে ধরে এনে শায়েস্তা খাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল, সে-কথা লিখতে ঐতিহাসিকরা ভুলে গেছেন। ইতিহাস শুধু রাজা-রাজড়াদের কথাই লেখে, সাধারণ মানুষের বীরত্বের কথা মনে রাখে না।

এর পরেও একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। সেটা ঠিক ইতিহাসের মতো নয়, ঠিক যেন গল্পের মতন। কিন্তু এমন অনেক সত্যি ঘটনা ঘটে, যা গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর!

যারা ক্রীতদাস-দাসী হবার জন্য বন্দী হয়েছিল, তারা সবাই এখন মুক্ত। জাহাজ ছেড়ে যখন তারা মাটিতে নামছে, তখন মুখভর্তি চুলদাড়িওয়ালা একজন লোক হঠাৎ একটি মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "লক্ষ্মীরানী! ওরে, তুই আমার লক্ষ্মীরানী না?"

মেয়েটি হচ্ছে কুড়ানি। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এ-রকম একটা পাগলা-মতন লোককে হঠাৎ জড়িয়ে ধরতে দেখলে ভয় পাবারই কথা!

লোকটি আবার বলল, "ওরে, তুই আমায় চিনতে পারছিস না? তুই জলে ভেসে গিয়েছিলি, নৌকো উল্টে গেল, ওরে আমি যে তোর বাবা, মাধবদাস!"

তখন কুড়ানিও বলে উঠল, "বাবা!"

তারপর কুড়ানি আর মাধবদাস দুজনেই কাঁদতে লাগল। এই কান্না কিন্তু আনন্দের।

সমাপ্ত

ছবির মজা
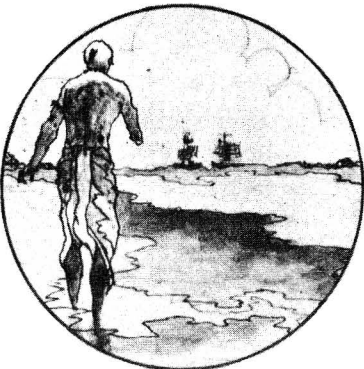
ছবি দেখে বলো, কোন্ পথে এগোলে ওরা একদম নীচের ওই গেটের সামনে এসে পৌঁছতে পারবে?
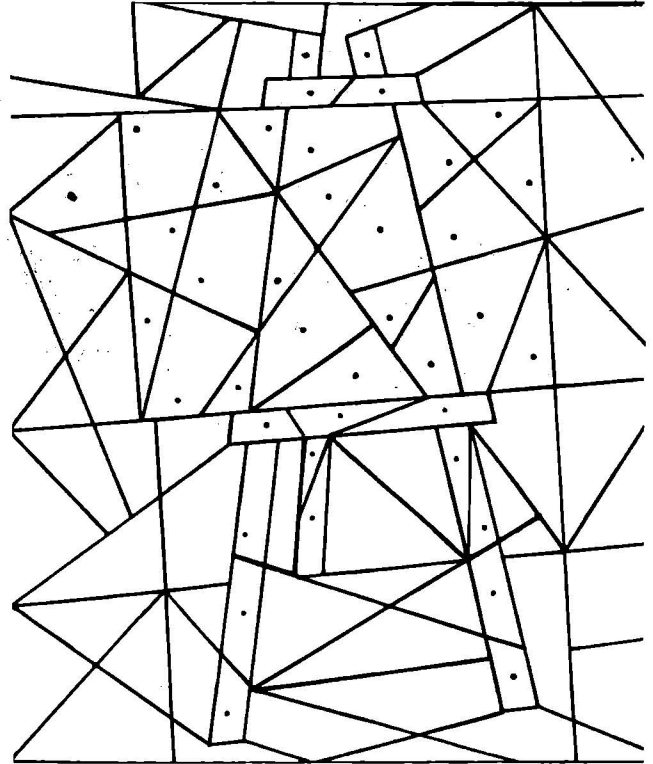
উপরে যে নকশাটি দেখছ, তার ফুটকি-দেওয়া অংশগুলিকে রঙিন পেনসিল দিয়ে ভরাট করো। করেছ? কী পেলে? একটা ব্লাকবোর্ড। তাই না?

রাম শ্যাম আর সার্কাসের জোকার রাজন
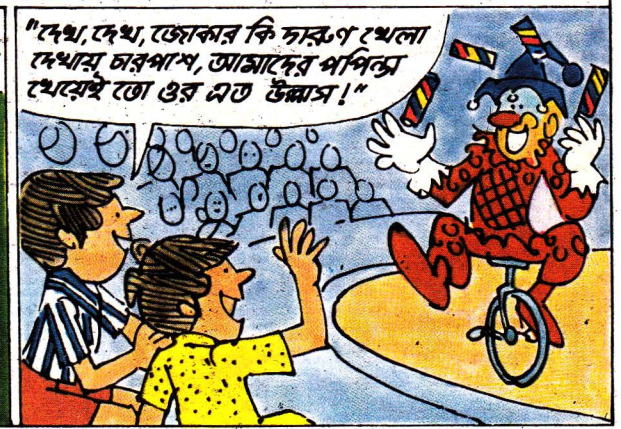
"আরে রাম, শহরেতে যে সার্কাস এসেছে, তার জোকার রাজনের খেলায়— সকলে কি হাসাই না হেসেছে!"

EAT CIRCUS

'দুজনেই চটপট সার্কাসে ছুটলো দ্রুত চরণে

"আরে আরে কি ব্যাপার— রাজন কাঁদছে যে হাপুস-নয়নে!"

"কর্তা বলেছেন, আমি মোটেই আর হাসাতে পারি না, আমার বরাতে যে কি আছে, কিছুই তা' জানি না!"

"এই নাও রাজন, মিষ্টি পপিন্স তো খাও, মজার মজার খেলায় আবার সবাইকে হাসাও!"

"দেখ, দেখ, জোকার কি দারুণ খেলা দেখায় চারপাশ, আমাদের পপিন্স খেয়েই তো ওর এত উল্লাস!"
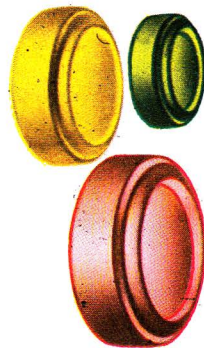
everest/78/PP/184-bn

উপকথা

শংকর

ছবি সমীর সরকার

সাবধান!

আন্তর্জাতিক শিশু বছর চলছে।

ছোটদের বকাবকি এ-বাড়িতে সম্পূর্ণ নিষেধ।

অনেকদিন পরে কলকাতায় মামার বাড়িতে ফিরে এসে বুলবুলের সবচেয়ে ভাল লেগেছে এই নোটিসটা। দাদুর নির্দেশে ছোটমাসিমা নিজে ঝকঝকে কালিতে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় এই বিজ্ঞপ্তিপত্র রান্নাঘরের পাশের দেওয়ালে এঁটে দিয়েছেন। জায়গাটাও খুব ভাল হয়েছে, কারণ রান্নাঘরের পাশে কুটনো কোটার ওই জায়গাতেই মা এবং মাসিরা ভীষণ ব্যস্ত থাকেন কাজকম্মো নিয়ে। ছোটদের ওপর তাঁরা একটুতেই রেগে ওঠেন।

নোটিসটা পড়ে বাড়ির সবাই প্রথমে ভেবেছিল রসিকতা। কেউ যেন দাদুর সঙ্গে কথা না-বলেই স্রেফ মজা করবার জন্যে বিয়ে-বাড়িতে এই বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়েছে। ছোটমাসিমা আর্ট কলেজে চলে গিয়েছেন, আজ তাঁর পরীক্ষা আছে। তখন বাধ্য হয়ে ছোটমামাকেই ছোটরা ধরে বসল মা এবং মাসিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

ছোটমামা বাড়ির প্রত্যেককে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন

"ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। বাবা নিজেই এই অর্ডার দিয়েছেন। ছোটদের কোনোরকম বকাবকি করতে হলে অবশ্যই দোতলায় গিয়ে বাবার অনুমতি নিতে হবে।"

বুলবুল, তিলক এবং শিবাজি ব্যাপারটায় খুব খুশি—কোন্ দূর দূর জায়গা থেকে তারা ছোটমামার বিয়ে অ্যাটেণ্ড করবার জন্যে কলকাতায় এসেছে। এখানে এসে যদি স্বাধীনতা না-থাকে, যদি সব সময় বড়দের বকুনি খেতে হয়, তা হলে কী করে চলে? সুতরাং হিপ হিপ হুররে। থ্রী চীয়ার্স ফর... এখানে বুলবুল বলতে যাচ্ছিল ছোটমাসি, ছোটমামা অ্যাণ্ড দাদু। কিন্তু তিলক ও শিবাজি কিছুটা স্লোগান পাল্টে দিয়ে খুশ-মেজাজে গলা দিল ঃ "থ্রী চীয়ার্স ফর দেবলা সেন, থ্রী চীয়ার্স ফর সুবিমল সেন অ্যাণ্ড থ্রী চীয়ার্স ফর সুনির্মল সেন।"

বুলবুলের মা এবং মাসিরা কিন্তু একটুও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বললেন, "মোটেই ভাল করছ না, সুবিমল। বকুনি ছাড়া এইসব জাঁহাবাজ ভাগ্নে-ভাগ্নিদের কনট্রোলে রাখা অসম্ভব। তোমাদের এই বিজ্ঞপ্তির সুযোগ নিয়ে এরা অরাজকতা বাধিয়ে বসবে।"

মেজমাসিমা তো এমন কথাও বলে বসলেন, "উঃ, ছোট ভায়ের বিয়েটা এই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে না-হলেই ভাল হত। হিসট্রির বালগঙ্গাধর তিলক কত শান্ত ভদ্রলোক ছিলেন আর আমাদের এই তিলক ?

"দোষটা তাহলে ছোটমামারই," চটপট উত্তর দিল তিলক।

"উঃ! দেখো কী দুষ্টু! তুই যে ওর নাম দিয়েছিলি তা ঠিক মনে রেখে দিয়েছে।"

মেজমাসিমা চোখ দুটো বড়-বড় করলেন এবং জানালেন, "এইসব দামাল ছেলেমেয়ের অত্যাচারে বাড়ির জিনিসপত্তর যদি ভেঙে যায়, হৈ-চৈতে যদি কাক-চিল না বসে এবং বিয়েবাড়ির কাজে বাধা পড়ে তা হলে আমাকে অন্তত দোষ দিও না।"

তিলক এতক্ষণ গম্ভীরভাবে কথাগুলো শুনছিল। এবার সে মুখ খুলল। "বকবার এবং মারবার যদি এতই ইচ্ছে তা হলে ওপরে চলে যাও না। দাড়িওলা বাবা তো মেজোমেয়ের কথা শুনবার জন্যেই ইজিচেয়ারে বসে আছেন।"

"কী সব পাজি ছেলে দেখো!" বললেন তিলকের মা। বাবার কাছে গিয়ে নাতিদের নামে অভিযোগ করে যে বিশেষ ফল হবে না তা জেনেই বোধহয় তাঁর গলা একটু নরম হয়ে এল। তিনি বললেন, "খুব বেশি তোমরা যদি দস্যুপনা করো তা হলে অবশ্যই যাব ওপরে।"

ছোটমামা কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন, "বাবার কাছে যাবার সাহস তোমাদের হবে না, দিদি। আর গেলেও খুব কিছু লাভ হবে না। বাবা বলছিলেন, 'সমস্ত জীবন ভুল করে এসেছি—বকাবকি করে কোনো কাজ হয় না'।"

বড়মাসিমা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "নিজের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হয়ে গিয়েছে, তাই বাবা এখন ওসব কথা বলছেন। বকাবকি ছাড়া ছেলে মানুষ করা সম্ভব নয়।"

বুলবুল, তিলক ও শিবাজি অধীর আগ্রহে ছোটমামার দিকে তাকাল। ছোটমামা এবার কী বলেন তার ওপর অনেক-কিছু নির্ভর করছে।

"ছোটমামা, প্লীজ, মাসির কথায় মত পাল্টিও না," মনে-মনে প্রার্থনা করছে বুলবুল।

প্রার্থনাতেই বোধহয় ফল হল। ছোটমামা বললেন, "তোমার তাহলে তো সুইজারল্যাণ্ড যাবার কোনো চান্স রইল না।"

"কেন? আমি কী দোষ করলাম? সুইসরা তো খুবই ভাল লোক, কাউকে দেশ দেখাতে আপত্তি করে না।" বললেন বড়মাসিমা।

"ওপরে বাবার কাছে গিয়েই শোনো।" ছোটমামা আজ ভাগ্নে-ভাগ্নিদের জন্যে খুব ফাইট করছেন।

এবার একখানা বোমা ফাটালেন ছোটমামা। "বাবা বলছিলেন, সুইজারল্যাণ্ডে ছেলেদের মারধোর এবং বকাবকি আইন করে তুলে দেওয়া হল। ছেলেমেয়েদের কিছু বললেই সঙ্গে-সঙ্গে পুলিস এসে..."

আর বলতে হল না, ভাগ্নি ও ভাগ্নেরা আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল। ছোটমামার তিন দিদি গোমড়া মুখে ভাইকে বললেন, "খুব অন্যায় করছ তুমি...এদের সামনে এইসব গোপন খবর ফাঁস করাটা ভাল হচ্ছে না।"

এরপর সেন-বাড়িতে ছোটদের একটানা আনন্দমেলা শুরু হয়ে গেল। তারা যা প্রাণ চায় তাই করে চলেছে; বড়রা কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। অমন যে গম্ভীর দাদু, যিনি কোনোরকম হৈ-হৈ হট্টগোল সহ্য করতে পারেন না, তিনিও বললেন, "কই? এত বড় বাড়ির তুলনায় কোনো গোলমাল তো নেই। হৈ-হৈ না-হলে কি বিয়ে হয়?"

বিয়েবাড়ির এই মজার জন্যেই তো বুলবুল, তিলক ও শিবাজি এতদিন যাকে বলে কিনা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তিলক থাকে জামশেদপুরে, শিবাজি দুর্গাপুরে এবং বুলবুল রাউরকেল্লায়। এদের অত্যাচারে তিতিবিরক্ত হয়ে বুলবুলের মা বলেছেন, "এরই নামই 'তেরোস্পর্শ'—যতসব গোলমাল।"

"তেরোস্পর্শ কী জিনিস ছোটমামা? কাউকে তেরোবার টাচ করা?" জিজ্ঞেস করেছে বুলবুল।

হেসে ফেললেন ছোটমামা। "আনলাকি থার্টিনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মূল কথাটা হচ্ছে ত্র্যহস্পর্শ—বিশেষ একদিনে তিন তিথির মিলন—ত্রি+অহন্+স্পর্শ। যোগটা নাকি তেমন ভাল নয়।"

শিবাজি এবার চোখ দুটো বড় বড় করল। "ও বুঝেছি!"

"কী বুঝেছিস?" খাঁক করে উঠলেন শিবাজির মা।

"ঠিক বুঝেছি—বুলবুল, তিলক ও আমার এই এক-জায়গায় হওয়াটা ভাল নয়—আমরা হলাম কিনা ত্র্যহস্পর্শ!"

এরপর ছোট মামা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। ছোট-মামার ঘরের ভিতরটা যেন কেমন! গাদা গাদা বই এবং খাতা। বিছানার ওপরেও বই। দু-তিনখানা টেপরেকর্ডারও সব সময় ছোটমামার বিছানার ওপর পড়ে থাকে। আর আছে গাদা গাদা ফোটো। এই ঘরে এসে নতুন ছোটমামিমা কোথায় শোবে রে বাবা! বুলবুল ভেবেই পায় না।

বুলবুল শুনেছে, ছোটমামা ক্যামেরা এবং টেকরেকর্ডার হাতে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মায়ের মুখেই সে শুনেছে, "তোর মামার অদ্ভুত এক কাজ। গাঁয়ে গাঁয়ে গপ্পো সংগ্রহ করে বেড়ায়।" লোকের কাছে বসে, তাদের গপ্পো শুনে বাক্সবন্দী করে চলেছেন ছোটমামা, এর নাম নাকি গবেষণা, ফোকলোর রিসার্চ।

বুলবুলের মা নিজেও ব্যাপারটায় তেমন সন্তুষ্ট হননি। বুলবুলের বাবাকে বলেছিলেন, "কী জানি বাবা! বছরের পর বছর গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে গপ্পো জোগাড় করা, এ আবার কী কাজ? এতে কার কী উপকার হবে? গেঁয়ো-চাষীদের বস্তা-পচা গপ্পো কে শুনবে?"

বুলবুলের বাবা বলেছিলেন, "না গো, খুব দরকারি কাজ। সমস্ত বড় বড় দেশে মহা মহা পণ্ডিতরা সমস্ত জীবন ধরে এই সব রূপকথা এবং উপকথা সংগ্রহ করছেন—একটা দেশকে ঠিক মতো জানতে হলে, এই সব গপ্পো ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এইসব গপ্পের মধ্যেই দেশের মানুষদের সুখ-দুঃখের ছায়া ধরা আছে, কী তারা চায়, কী চায় না তাও জানা যায়।''

"রাখো তুমি!'' বকুনি লাগিয়েছিলেন বুলবুলের মা। গাঁয়ে গাঁয়ে মাসের পর মাস এইভাবে ঘোরা কত কষ্টের বলো তো? আর যে-লোক আদাড়ে-বাদাড়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় তাকে কে বিয়ে করবে বলো তো?''

সে সমস্যা অবশ্য মিটেছে। ছোটমামার বিয়ের বাদ্যি বেজেছে। নতুন মামিমাও যে এই গপ্পো খোঁজার কাজে আছেন তা শুনেছে বুলবুল।

ছোটমামা ঘরের দরজা ভেজিয়ে টেপ চালিয়ে কীসব লিখছিলেন। সেই সময় তিন পার্টিকে নিয়ে তিন দিদি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। তিলকের মা বললেন, "ছোটদের এ-বাড়িতে কিছু বলা চলবে না ফতোয়া জারি করে বেশ তো ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছিস। এদিকে আমাদের অবস্থা সঙ্গিন।''

শিবাজির মা বললেন, "সত্যি অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটু আগে দুধের কড়ায় টেনিস বল পড়েছে। সমস্ত দুধটা নষ্ট। এত লোকের চা হবে কী করে?''

বুলবুলের মা বললেন, "দুষ্টুদের পাল্লায় পড়ে বুলবুলের দুষ্টুমিও বেড়েছে। তিনটে নতুন কাপডিশ পায়ের ধাক্কায় ভেঙেছে। বাবাকে বলতে গেলাম। বাবা ওকে কিছুই বললেন না, উপরন্তু আমাকে শুনিয়ে দিলেন : শোন্, একবার এইভাবে দামি কাপডিস্ ভাঙার পরে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছিলেন। কাপডিশ তো ওইভাবেই যাবে—ওরা কী কলেরা বসন্তয় মরবে?''

"কী? তোমরা দুষ্টুমি করেছ?'' ভাগ্নি ও ভাগ্নেদের জিজ্ঞেস করলেন ছোটমামা।

"একটু-একটু,'' তিনজনের মুখপাত্র হয়ে তিলক উত্তর দিল।

"একটু একটু?'' তীব্র প্রতিবাদ জানালেন শিবাজির মা। ''সমস্ত বাড়ি ঘরদোর তছনছ। মনে হবে যেন একটু আগেই বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখানে।''

বুলবুলের মা এবার ছোটমামাকে বললেন, "শোনো সুবিমল, আমি, মেজদি এবং বড়দি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি যা-হয় একটা ব্যবস্থা করো।''

বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য রসিকতা। তিলকের মা বললেন, "আমরা যাচ্ছি তোমার বউয়ের দু-একটা কাপড় কিনতে এবং সেই সঙ্গে লাস্ট কয়েকটা নেমন্তন্ন সারতে। এখন যদি এই তেরোস্পর্শ না-সামলাও তাহলে বিয়ে বন্ধ।''

"এরা থাকুক না আমার কাছে,'' ছোটমামা মোটেই ভয় পাচ্ছেন না।

"বুঝবে মজা! দেখি কেমন বিনা বকুনিতে এই দস্যুদের সামলে রাখতে পারো!'' এই বলে মেজমামিমা এবং অন্য সকলে বিদায় নিলেন।

সুবিমল এবার ভাগ্নে-ভাগ্নি টীমের দিকে তাকালেন। অহিংস উপায়ে এদের সামলানো যে খুব সোজা কাজ নয় তা বোধহয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। জামশেদপুরের তিলক ইতিমধ্যেই ছোটমামার টেপরেকর্ডারটা হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করেছে। সে শুনেছে, প্রত্যেক টেপ রেকর্ডারের মধ্যে একটা লিলিপুট মানুষকে ঢুকিয়ে রাখা হয়।

হাঁ-হাঁ করবার আগেই দেখা গেল তিলক টেপরেকর্ডারের কয়েকটা নাট-বল্টু খুলে ফেলেছে।

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টেপরেকর্ডার ফেরত নিতে নিতে ছোটমামার নজর পড়ে গেল শিবাজির দিকে। সে ততক্ষণে রঙিন ফেল্টপেন নিয়ে নতুন মামিমার ছবিটায় গোঁফ এঁকে ফেলেছে।

"উঃ, কী ফার্স্ট ক্লাস দেখাচ্ছে নতুন মামিমাকে, উইথ গোঁফ।'' বুলবুল ইন্ধন জোগাল।

"ওয়ান মিনিট মামু। আরও ভাল করে দিচ্ছি—মামির কপালে দুটো শিঙ বেরিয়ে যাবে এখনই।'' বলল শিল্পী শিবাজি। দুর্গাপুরে বসে-আঁকো চিত্রপ্রতিযোগিতায় সে সদ্য পুরস্কার পেয়েছে।

এসব দৌরাত্ম্য কী করে বন্ধ করা যাবে ভেবেই পাচ্ছেন না ছোটমামা। শিশুবর্ষ না হলে এতক্ষণে প্রত্যেকেই প্রচণ্ড বকুনি খেত।

ছোটমামা এবার অন্য মতলব ভাঁজলেন। বুলবুলকে জিজ্ঞেস করলেন, "গপ্পো শুনবে?''

তিনজনের মুখচোখ দেখেই তপন বুঝল গপ্পো শুনবার জন্যে সবাই উন্মুখ।

"তোমরা সবাই চুপচাপ বসবে তো? কোনো জিনিসে হাত দেবে না?'' ছোটমামা একবার ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিলেন।

"খুব ভাল গপ্পোগুলো বলবে কিন্তু, ছোটমামা।'' বুলবুল অনুরোধ করল।

"খুব মন দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু।'' ছোটমামা শর্ত আরোপ করলেন।

''কেন?'' তিলকের মনের মধ্যে সন্দেহ জাগছে গল্পের লোভ দেখিয়ে অন্য কোনো ফন্দি আঁটছেন কিনা ছোটমামা।

ছোটমামা বললেন, "গল্পের শেষে প্রশ্ন করা হবে—তার উত্তর চাই। উত্তর অনুযায়ী পুরস্কার—ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড।''

শিবাজি বলল, "মামু, বানানো গপ্পো নয়—সত্যি গপ্পো ছাড়া আমরা শুনব না।''

ছোটমামা পড়লেন ফ্যাসাদে। কিন্তু ত্র্যহস্পর্শ সামলাবার জন্যে বললেন, "এসব গপ্পো তো আমার বানানো নয়—গপ্পের জঙ্গল থেকে এই সব দুর্দান্ত বুনো গপ্পোকে ধরে আনা হয়েছে, এখনও পোষ মানানো হয়নি।''

বুনো হাতির মতো বুনো গপ্পোর ব্যাপারটা বুলবুলের খুব ভাল লাগল। সে বলল, "মামা, গপ্পোকেও পোষ মানাতে হয় বুঝি?''

"অবশ্যই। বুনো গপ্পো শহুরে লেখকদের মনের চিড়িয়াখানায় বন্দী থেকে থেকে অনেক সময় নির্জীব হয়ে যায়—তোমরা চিড়িয়াখানায় দেখোনি, খাঁচায় আটকানো এক একটা পশুর কী প্যাথেটিক অবস্থা।''

শিবাজি আবার ওই সত্যি-মিথ্যের ব্যাপারে ছোটমামার ওপর চাপ দিল। বানানো গল্প থেকে সত্যি গল্পর অনেক ভাল টেস্ট।

ছোটমামা বললেন, "বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে আমরা গপ্পো সংগ্রহ করি—এসব গ্যারান্টি দেওয়া সত্যি গপ্পো! এই সব উপকথা তো কারুর কলম থেকে বেরিয়ে আসেনি, একশো দুশো চারশো পাঁচশো হাজার বছর ধরে বিভিন্ন কাহিনী লোকের মুখে-মুখে ঘুরছে—একদম খাঁটি দুধ না-হলে কিছুতেই এত লম্বা পরমায়ু হত না এই সব উপকথার।''

ছোটমামা লক্ষ করলেন তিন-পার্টিই কোনোরকম ঝামেলা না-পাকিয়ে শান্ত হয়ে তাঁর কথা শুনছে। হৈ-হল্লা টোটাল বন্ধ।

তিনি আবার মাথা চুলকোতে লাগলেন। বললেন, "উপকথা কি একটা! হাজার হাজার লাখ লাখ উপকথা দেশে দেশে ছড়িয়ে রয়েছে—সেকালের বাঘ সিংহ সাপ বাঁদর থেকে আরম্ভ করে রাজা-রাজড়ারা যা-সব কাণ্ড করে গিয়েছেন! ভাবছি তোমাদের কোন গপ্পোটা বলি।''

বুলবুল রিকোয়েস্ট করল, "রাজার গপ্পো বলো, মামা।

রাজাদের আমার খুব ভাল লাগে। আমি একটা মাত্র রাজা দেখেছি।''

"রাজা! কোত্থেকে দেখলি, বুলবুল? রাজা তো উঠে গিয়েছে ইণ্ডিয়া থেকে.'' শিবাজি বেশ জোরের সঙ্গেই বলল।

''বললেই হল উঠে গিয়েছে! আমি নিজের চোখে দেখেছি। রাজা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল, আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী খুকি, কী নাম তোমার?"

"ইমপসিবল!'' চিৎকার করে উঠল তিলক। ''রাজারা কখনও বিড়ি খায় না। তারা গায়ে সন্দেশ মেখে দুধে চান করে। তারপর সোনার বাটি থেকে রাবড়ি খায়।''

গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। কিন্তু বুলবুল জানিয়ে দিল, গতবারের পুজোয় সে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল এবং সেখানেই রাজাকে বিড়ি খেতে দেখেছে সে।

বুলবুলের দুই মাসতুতো ভাই খুব হাসল। বলল, "তুই এখনও বোকা আছিস। যাত্রার রাজা আর আসল রাজা এক নয়।''

বুলবুল একমত নয়। "রাজা ইজ রাজা—সে যেখানকারই হোক।''

"ঠিক আছে, এবারে এক রাজার কাণ্ডকারখানা শোনো। ইনি যাত্রা-থিয়েটারের রাজা নন, জেনুইন সিংহাসনে-বসা সোনার মুকুট পরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা।''

ছোটমামা আরম্ভ করলেন, "এই রাজার গপ্পোটা জোগাড় করেছিলাম তামিলনাড়ুর এক গ্রাম থেকে। প্রথমে ভেবেছিলাম, এও বুঝি মানুষের মনগড়া রাজা, বানানো কোনো গপ্পো। কিন্তু পরের পর দশটা গ্রামে গিয়ে একই রাজার কথা শুনলাম। তখন বুঝলাম, ইনি নিশ্চয় কোনোকালে রাজত্ব করেছিলেন, না-হলে এত লোক এখনও কী করে রাজার কাণ্ডকারখানা মনে রেখে দিয়েছে?''

ছোটমামা বললেন, "দক্ষিণদেশের এই রাজা মস্ত রাজা। তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষে থান ইট-সাইজের থাক-থাক সোনা আর বস্তা-বস্তা হিরে-মানিক মুক্তো।

তিলক বলল, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইয়া বড় রাজা! নিশ্চয় রাজার বিরাট গোঁফ এবং কোমরে ঝকঝকে তলোয়ার।''

"ঠিকই ধরেছ তোমরা,'' ছোটমামা উত্তর দিলেন। ''আগে-কার রাজাদের এই এক সুবিধে। একটু বর্ণনা দিলেই সবাই বুঝে নেয়, কী রকম রাজা।''

"তারপর রাজার কী হল?'' জিজ্ঞেস করল শিবাজি।

''ভীষণ কিছু একটা হবেই। অত ছটফট করিস না, শিবাজি।'' বলে উঠল তিলক।

মামা বললেন, "যা বলছিলাম, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিন্তু রাজার মগজে...''

একটু থেমে মামা প্রশ্ন করলেন, "বোকা হলে মগজে কী থাকে?''

"গোবর,'' তিনজন গল্প-শুনিয়ে একই সঙ্গে উত্তর দিল।

ছোটমামা বললেন, "গাঁয়ে-গাঁয়ে খোঁজখবর নিয়ে আমি জানলাম, সত্যি, মাথা-মোটা এই রাজা। অথচ সমস্ত বোকার মতোই রাজার ধারণা তাঁর থেকে বুদ্ধিমান লোক ত্রিভুবনে নেই।

"আরও এক মুশকিল—রাজার স্তাবকরা প্রতিদিন রাজসভায় বলেন, মহারাজ, আপনার মতো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ নরপতি পৃথিবীতে কখনও জন্মাননি। রাজাও খুশমেজাজে সেসব কথা শোনেন এবং বিশ্বাস করেন তাঁর মতো বুদ্ধি ভগবান কাউকে দেননি।

"কিন্তু বুদ্ধি না-থাকলে এই পৃথিবীতে কাজ চালানো খুব শক্ত। দেশের রাজা বোকা হলে দেশ চলাই শক্ত হয়ে ওঠে।''

''রাজা কী রকম বোকা ছিল, মামা?'' বুলবুল জিজ্ঞেস করল।

ছোটমামা বললেন, "প্রত্যেকদিন রাজার বোকামির নমুনা পেয়ে পেয়ে প্রজাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাদের ভোগান্তি বেড়ে চলেছে। রাজার বোকামি কীরকম ছিল তার একটা নমুনা শোনো।

"ওই রাজত্বে একজন মাদ্রাজী ব্যবসাদার ছিলেন, তাঁর নাম অঙ্গুচেট্টি। এই অঙ্গুচেট্টির অনেক রোজগার ছিল, কিন্তু পয়সা হাতে পেলেই তিনি খরচ করে ফেলতেন। একবার প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে অঙ্গুচেট্টির বাড়ি ভেঙে পড়ল।

"কিছু টাকাকড়ি জোগাড় করে বেচারা অঙ্গুচেট্টি বাড়ির দেওয়াল সারিয়ে নিলেন।''

"অঙ্গুচেট্টির বাড়ি কী রকম মামা?'' জিজ্ঞেস করল বুলবুল।

ছোটমামা বললেন, ''ভাল প্রশ্ন করেছ। বোকা রাজার হুকুম, তাঁর রাজ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ পাকা বাড়িতে থাকতে পারবে না। ফলে রাজপ্রাসাদ ছাড়া সমস্তই মাটির বাড়ি।''

এবার কাহিনী তরতর করে এগিয়ে চলল—অঙ্গুচেট্টি রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে ঝড়ে-ভাঙা বাড়ি তো সারিয়ে নিলেন। কিন্তু তারপরেই আসল বিপদ ঘটল।

এক সিঁদেল চোর ঠিক করল সে অঙ্গুচেট্টির বাড়িতে চুরি করবে। গভীর রাত্রে সিঁদকাঠি নিয়ে অঙ্গুচেট্টির মাটির বাড়ির দেওয়ালে সে মস্ত এক গর্ত করল। ইচ্ছেটা ছিল, ওই গর্তর মধ্য দিয়ে বড়-বড় সিন্দুক পর্যন্ত চুপি চুপি পাচার করে দেবে, অঙ্গুচেট্টি ঘুমের ঘোরে কিছুই বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু চোরের ভাগ্য খারাপ! লোভের মাথায় দেওয়ালে মস্ত গর্ত কাটতে গিয়ে সে নিজের বিপদ ডেকে আনল—হুড়মুড় করে সমস্ত দেওয়ালটাই ভেঙে পড়ল এবং সকাল বেলায় দেখা গেল মাটিতে চাপা পড়ে চোর মরে পড়ে আছে।

পড়শিরা ভাবল, যাক, যেমন পাজি চোর তেমন যোগ্য শাস্তি হয়েছে। অঙ্গুচেট্টিও ভাবলেন, তাঁর কপালের জোর, একটুর জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব রক্ষা পেয়েছে।

ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী ভাবছ? বলো।''

তিলক বলল, "টিট ফর ট্যাট! চুরি করতে গিয়ে চোর নিজেই শাস্তি পেয়েছে।''

শিবাজি বলল, "কত পাজি চোর বোঝা যাচ্ছে না—রাত্রে যারা চুরি করতে বেরোয়, তাদের সঙ্গে ছোরা এবং বোমা থাকে। মিস্টার অঙ্গুচেট্টির ভাগ্য ভাল চোরকে বাধা দিতে গিয়ে নিজেই জখম হননি।"

ছোটমামা বললেন, "অঙ্গুচেট্টির ভাগ্য যে ভাল নয় তা পরের দিনই বোঝা গেল। ওই যে চোর তার এক মাসতুতো ভাই ছিল, সেও চোর। তোমরা তো জানোই চোরে চোরে মাস-তুতো ভাই। মাসতুতো চোর ভাবল ভাইয়ের এমন বেঘোরে মৃত্যু চুপচাপ মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। এর একটা প্রতিবিধান চাই।

"মাসতুতো চোর সেদিন চুরি করতে না-বেরিয়ে নিজের ব্রেন খাটাতে বসল। চোর ভাবল, দেশে যখন বোকা রাজা রয়েছেন তখন একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবার চান্স রয়েছে।''

মাসতুতো চোর আর সময় নষ্ট না-করে ছুটল বোকা রাজার কাছে। নতজানু হয়ে রাজাকে প্রণিপাত করে সে বলল, "মহারাজ, আমার মাসতুতো ভায়ের মাথার ওপর ওই অঙ্গুচেট্টির দেওয়াল ভেঙে পড়ে সর্বনাশ হয়েছে। আমার মাসতুতো দাদা আর এই পৃথিবীতে নেই।'' এই বলে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। "মহারাজ, আপনি যে-দেশের রাজা, সে দেশে এত বড় অন্যায় তো হতে পারে না। আপনি ওই অঙ্গুচেট্টিকে ফাঁসিতে ঝোলান।''

বোকা রাজা খুব রেগে উঠলেন। বললেন, "আমার রাজ্যে চোররাও নিরাপদে থাকবে। এই অপঘাত মৃত্যু আমি সহ্য করব না। এর বিচার হবেই।''

বেচারা অঙ্গুচেট্টি গত রাত্রে চুরির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজার সেপাই তাঁকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। সেপাই বলল, "বড় বাড় বেড়েছ তুমি, অঙ্গুচেট্টি। মহারাজের রাজত্বে লোকের বেঘোরে মৃত্যু! চলো এখনই তুমি রাজার কাছে!''

কাঁপতে-কাঁপতে অঙ্গুচেট্টি রাজার কাছে হাজির হলেন' সেখানে গিয়ে অঙ্গুচেট্টির তো চক্ষু চড়কগাছ। অঙ্গুচেট্টি দেখলেন, রাজার সিংহাসনের অদূরেই রয়েছে ফাঁসিকাঠ। মহারাজ রাজকার্যে কোনোরকম দেরি পছন্দ করেন না। বিচারে ফাঁসির হুকুম হলে সঙ্গে-সঙ্গে তা কার্যকরী করার জন্যেই সিংহাসনের সামনেই ফাঁসিকাঠ খাড়া করে রেখেছেন।

অঙ্গুচেট্টি এবার মহারাজার দিকে তাকালেন এবং দেখলেন, মহারাজ রেগে আগুন হয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখ দুটো তামাকের কল্কেতে টিকের আগুনের মতো জ্বলছে।

মহারাজ অভ্যেসমতো একবার গোঁফে তা দিলেন। তারপর আড়চোখে ফাঁসিকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার দয়ার সুযোগ নিয়ে রাজ্যে অব্যবস্থা, অশান্তি বড্ড বেড়েছে। এবার আমি কঠোর হাতে দেশ শাসন করব। যার যা শাস্তি নগদ-নগদ দিয়ে দেব। আমি দেখছি ছোটখাট শাস্তিতে কোনো ফল হয় না, প্রজারা তাতে কোনো শিক্ষাই পায় না। সুতরাং মাথা খাটিয়ে ঠিক করলাম, যত ফাঁসিতে ঝোলাব তত ফল পাব।''

অঙ্গুচেট্টি বোকা রাজার হাবভাব দেখে ততক্ষণে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন, তুচ্ছ কারণেও মহারাজ তাঁকে ফাঁসিকাঠে না-চড়িয়ে ছাড়বেন না।

মহারাজ এবার অঙ্গুচেট্টির দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে খুবই সিরিয়াস অভিযোগ। ফাঁসি ছাড়া এক্ষেত্রে বোধ হয় অন্য কোনো পথ নেই।"

"মহারাজ, আমি নির্বিরোধী ব্যবসাদার। কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। আমি তো কোনো দোষ করিনি।"

"হুম!" এবার হুঙ্কার ছাড়লেন মহারাজা। ''দোষ করেছ কি না-করেছ তা ঠিক করব আমি। কেন তুমি বাড়ির দেওয়াল ভিজে রেখেছিলে? এই ভিজে দেওয়াল চাপা পড়ে কেন সিঁদেল চোর বেঘোরে মারা গেল? তুমি কি ভেবেছ আমার রাজত্বে এই অনাচার মুখ বুজে সহ্য করা হবে?''

মহারাজের হুঙ্কার শুনে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন অঙ্গুচেট্টি। তিনি বুঝলেন, মহারাজের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। তার থেকে অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে অন্য কোনো ফন্দি আঁটাই ভাল।

অঙ্গুচেট্টি এবার সাষ্টাঙ্গে মহারাজকে প্রণাম করলেন।

ছোটমামা এক মিনিটের জন্যে থামলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এই সাষ্টাঙ্গ ব্যাপারটা তোমরা জানো?"

বুলবুল, তিলক, শিবাজি তিনজনেই মাথা চুলকোতে লাগল। শিবাজি বলল, "খুব সম্ভব মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম করা—একেবারে টপ রেসপেক্ট দেখানো আর কী!"

ছোটমামা বললেন, "কাছাকাছি এসেছ, কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। সাষ্টাঙ্গ মানে, জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য এবং দৃষ্টি—এই অষ্টাঙ্গ দিয়ে এক সঙ্গে প্রণাম।''

"উঃ, ভেরি ডিফিকাল্ট। টপ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছাড়া কেউ সাষ্টাঙ্গ ব্যবহার করতে পারবে না," বলে বলল তিলক।

ছোটমামা আবার অঙ্গুচেট্টির ঘটনায় ফিরে এলেন।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে অঙ্গুচেট্টি রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আপনার হুকুমে ফাঁসিতে যাওয়া, সেও তো আমার মতো অধমের সাতজন্মের সৌভাগ্য! কিন্তু মহারাজ, বিশ্বাস করুন, ভিজে দেওয়ালের ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তা ওই রাজমিস্ত্রির। সে-ই তো খারাপ দেওয়াল

বানিয়ে আমার কাছে কড়ায় গণ্ডায় মজুরি বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছে।”

“যাবে কোথায়! আমার রাজত্বে অন্যায় করে চলে যাওয়া অত সহজ নয়!” হুঙ্কার ছাড়লেন বোকা রাজা। “ধরে নিয়ে এসো ওই রাজমিস্ত্রিকে!” যদি আসতে না চায়, তাহলে মিস্ত্রির মুণ্ডুটা নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন মহারাজা।

রাজমিস্ত্রি অন্য এক বাড়িতে কাজ করছিল। রাজার সেপাই তাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে সরাসরি রাজার সামনে হাজির করল।

মহারাজ বললেন, “খুব অন্যায় কাজ করেছ। ভিজে দেওয়াল তৈরি করে লোকের জান নষ্ট করার ফল তুমি হাতে-হাতে পাবে। ঐ দেখো ওখানে ফাঁসিকাঠ রেডি রয়েছে।”

রাজমিস্ত্রি বেচারার সমস্ত দেহ ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে। সেও বুঝেছে, বোকা রাজার মাথায় যখন একটা মতলব ঢুকেছে, তখন সহজে মুক্তি নেই। পান থেকে চুন খসলেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তাকে।

রাজমিস্ত্রি এবার করজোড়ে বলল, “মহারাজ, পৃথিবীতে আপনার মতো বিজ্ঞ নরপতি আর একটিও নেই। আপনার হুকুমে ফাঁসিতে ঝোলাও আমার মতো সামান্য রাজমিস্ত্রির পক্ষে পরম ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু...”

এইসব প্রশস্তি শুনে বোকা রাজা খুব খুশি হলেন মনে মনে। তবু হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, “আবার কিন্তু কেন?”

বিনয়ে বিগলিত রাজমিস্ত্রি বলল, “মহারাজ, বিশ্বাস করুন। আমার কোনো দোষ নেই। সমস্ত দোষ ওই কুমোরের। সে আমাকে এমন একটা মাটির কলসি দিয়েছিল যার মুখটা বিরাট। নর্মাল সাইজের দেড়া মুখ, মহারাজ।” এই বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল রাজমিস্ত্রি।

রাজমিস্ত্রিকে মুক্তির হুকুম দিয়ে মহারাজ বললেন, “কাঁদো মাত। ওই কুমোরের দুষ্টুমি আমি ভাঙছি। আমার রাজত্বে কোনো অন্যায় হতে দেব না।”

বোকা রাজার হুকুম-মতো কুমোরকে পাকড়াও করে আনতে পেয়াদার মাত্র কিছুক্ষণ লাগল। অপরাধের গুরুত্ব আন্দাজ করে পেয়াদা কুমোরের হাত দুটো পিছন দিকে বেঁধেছে, চোখে পরিয়ে দিয়েছে ঠুলি, যাতে দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসিতে লটকাতে সময় বেশিক্ষণ না-লাগে।

মহারাজ এবার কুমোরকেও একটা চান্স দিলেন। কুমোর সব শুনে প্রথমেই সমস্ত অপরাধ মেনে নিল। তারপর বলল, “মহারাজ, কিন্তু আমার দোষ কী? আমি যখন চাকে ওই কলসি তৈরি করছি সেই সময় পায়ে ঘুঙুর পরে একটি মেয়ে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সেই দিকে তাকাতে গিয়েই এই সর্বনাশ হল, কলসির মুখটা একটু বড় হয়ে গেল। মহারাজ, দোষ ওই ঘুঙুর-পরা মেয়েটির।”

বোকা রাজা মাথা খাটালেন এবং মৃদু হেসে বললেন, “বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমি তো কুমোরের কোনো অপরাধ দেখতে পাচ্ছি না। ফাঁসি দিতে হলে ওই ঘুঙুর-পরা মেয়েটিকেই ফাঁসিতে চড়াও।”

রাজার পেয়াদা আবার ছুটল শহরে এবং মেয়েটিকে পাকড়াও করে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল। রাজা গম্ভীরভাবে অভিযোগ করলেন, “কুমোর যখন কলসি তৈরি করছিল তখন ওই রাস্তা দিয়ে গিয়ে তুমি ঘোরতর অপরাধ করেছ। তোমার ফাঁসির হুকুম দেবার আগে জানতে চাই তোমার কোনো বক্তব্য আছে কিনা।”

মেয়েটি বলল, “মহারাজ, আমার কী দোষ? আমি স্যাকরাকে কিছু সোনা দিয়েছিলাম গলার হার গড়াবার জন্যে। গয়না দেবার দিনে স্যাকরা কথা রাখল না, তাই তাগাদা দেবার জন্যে আবার স্যাকরার দোকানে যেতে হয়েছিল আমাকে। মহারাজ, আপনার জ্ঞানের এবং বিদ্যার সীমা নেই ; আপনি বলুন, দোষ আমার না ওই মিথ্যেবাদী স্যাকরার?”

চোখ বন্ধ করে মহারাজ চিন্তা করলেন। জ্ঞান এবং বিদ্যার প্রশংসা শুনে তিনি বেজায় খুশি। চোখ খুলে মহারাজ বললেন, “মেয়েটিকে সসম্মানে মুক্তি দাও এবং বন্দী করে আনো ওই দুষ্টু স্যাকরাকে।”

ধূর্ত স্যাকরা রাজসভায় এসে বুঝল তার সামনে ভয়ানক বিপদ। রাজা বললেন, “তোমার কপালেই ফাঁসি রয়েছে। কেন তুমি মেয়েটির গয়না সময়মতো দাওনি? কেন তাকে ঘুরিয়েছ?”

স্যাকরার চোখে তো অন্ধকার নেমে এল। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে নিজেকে সামলে নিল। স্যাকরা বুঝল কথাবার্তা সামান্য এদিক-ওদিক হলেই এই বোকা রাজার ফাঁসিকাঠ থেকে তার মুক্তি নেই।

স্যাকরা এবার তাকিয়ে দেখল রাজসভায় একজন নাদুস-নুদুস শ্রেষ্ঠী বসে আছেন। সুযোগ বুঝে স্যাকরা বলে বসল, “মহারাজ, দোষ ওই শ্রেষ্ঠীর। ও'র কাছে আমি সোনা চেয়েছি, কিন্তু উনি দেননি, তাই আমাকে খদ্দের ফেরাতে হয়েছে।”

বোকা রাজা তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। স্যাকরা এবার বলল, “তাছাড়া, মহারাজ, আমার এই রোগা চিমড়ে চেহারা আপনার ওই বিরাট ফাঁসি-কাঠের পক্ষে বেমানান, আমি ঝুললে ফাঁসিকাঠেরই অপমান। অথচ শ্রেষ্ঠীর স্বাস্থ্য কী রকম দেখুন।”

রাজা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, “সত্যি, শ্রেষ্ঠীকেই ওই ফাঁসি-কাঠে মানাবে।”

এবার ছোটমামা একটু থামলেন। বুলবুল, তিলক, শিবাজি তিনজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠল, “তারপর?”

বুলবুল বলল, “উঃ মামা! গল্পের এই সময়ে কেউ থামে?”

ছোটমামা হেসে বললেন, “থামছি না। কিন্তু ওই মোটা শ্রেষ্ঠীর ফাঁসির ব্যবস্থা করতে একটু সময় লাগবে তো?”

ছোটমামা বললেন : এই সব কাণ্ড যখন চলছে তখন রাজসভার কয়েকজন লোক বোকা রাজার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা ফিসফিস করে বললেন, “এমন বোকা রাজার অধীনে দেশ রাখা তো বিপজ্জনক—কোন্ দিন কোথা থেকে কী বিপদ আসবে ঠিক নেই।” এবার নিজেদের মধ্যে তাঁরা গোপনে কী সব পরামর্শ করলেন।

ফাঁসিকাঠের সামনে তখন বেশ ভিড়। দু'জন লোক হঠাৎ হৈ-চৈ করে উঠল। দেখা গেল দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড বচসা চলছে।

রাজা দুজনকেই শান্ত হবার হুকুম দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কেন স্বয়ং রাজার সামনে এমন ঝগড়াঝাটি চলছে?

একজন লোক বলল, “ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। কিন্তু মহারাজ, আপনি নিজে যখন জিজ্ঞেস করেছেন তখন কিছুই চেপে রাখব না। কারণ আপনার মতো বুদ্ধিমান রাজার কাছে কোনো কিছুই চাপা থাকবে না।”

মহারাজ খুব খুশি হয়ে বললেন, “ব্যাপারটা কী?”

লোকটা বলল, “মহারাজ, পাঁজিতে আছে, এই দিনে এই সময়ে এই ফাঁসিকাঠে যে ফাঁসিতে ঝুলবে সে সোজা স্বর্গে যাবে এবং পরের জন্মে সে-ই রাজা হবে। মহারাজ, কেন মিথ্যে বলব, রাজা হবার খুব ইচ্ছে আমার। বন্ধুকে ব্যাপারটা যখন বললাম তখন ও আমাকে আটকে দিচ্ছে, কারণ বন্ধুরও রাজা হবার ইচ্ছে হয়েছে। সেই থেকে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল, কে রাজা হবার সুযোগ নেবে তা ঠিক করা যাচ্ছে না।”

রাজা এবার তড়াং করে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

হুঙ্কার ছাড়লেন, "এত বড় আস্পর্ধা! কোন নরাধম এদেশের রাজা হতে চায়? আমি ছাড়া কেউ রাজা হতে পারবে না, সুতরাং আমিই ফাঁসিতে চড়ব—আর কাউকে চান্স দেব না।" এই বলে বোকা রাজা নিজেই ফাঁসিকাঠে ঝুলে পড়লেন।

"বুঝলে তোমরা?" গল্প শেষ করে ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন।

শিবাজি তবু জিজ্ঞেস করল, "তারপর?"

ছোটমামা বললেন, "তারপর আর কী! একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোককে দেশের প্রজারা রাজা করে সুখে দিন কাটাতে লাগল।"

তিলক বলল, "ঠিক হয়েছে। যেমন বোকা রাজা তেমন শাস্তি হয়েছে।"

বুলবুল কিন্তু একমত হতে পারল না। বোকা রাজার বেঘোরে মৃত্যু হওয়ায় তার খুব দুঃখ হয়েছে। "আহা রে! আমি ওখানে থাকলে বেচারি রাজামশায়কে বলে দিতাম, খুব সাবধান মহারাজ, লোকগুলো আপনাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে।"

শিবাজি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "বুলবুলের সঙ্গে কোনো গপ্পো শোনা যায় না। সব লোকের জন্যে ওর দুঃখু। সবার জন্য চোখের জল।"

"আহা রে! এমনিই তো এত দুঃখু রয়েছে। গপ্পেও আবার কেন দুঃখু? বোকা রাজা বেঁচে থাকলে কী দোষটা হত?" বুলবুল কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল।

ছোটমামা আড়চোখে ঘড়িটা দেখে নিলেন। এই তিন দুষ্টু-পার্টির মায়েদের ফিরতে এখনও দেরি আছে।

"আরও একটা গপ্পো শোনাও ছোটমামা, না-হলে তিলক ও শিবাজি ডাইনিং রুমেই টেনিস বল নিয়ে খেলা শুরু করবে।" বুলবুল বলল।

"মামা। প্লীজ। আর একটা গপ্পো," রিকোয়েস্ট করল তিলক ও শিবাজি।

"গপ্পো নয়, উপকথা," বললেন ছোটমামা, "এবার বানানো নয়—দেশের গ্রামগঞ্জ থেকে জোগাড় করে আনা ঘটনা।"

বুলবুল বলল, "এবার কিন্তু দুঃখের গপ্পো নয়।"

"নো ফাঁসি বিজনেস, বুলবুল বলতে চাইছে," টিপ্পনি কাটল তিলক।

"বেশ, মারামারি কাটাকাটির কোনো ব্যাপারই থাকবে না।" প্রতিশ্রুতি দিলেন ছোটমামা। "তবে তোমাদের একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি। বোকা রাজার বেঘোরে মৃত্যু হল কেন?"

"বোকা বলে," শিবাজি চটপট উত্তর দিল।

ছোটমামা বললেন, "পৃথিবীর সব রাজাই তো প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ছিলেন না। তাঁরা কী করে রাজত্ব করেছেন?"

শিবাজি এবং বুলবুল চুপ করে রইল, কিন্তু তিলক বলল, "মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে।"

"ভেরি গুড," বললেন ছোটমামা। "বোকা রাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রী থাকলে এতটা বিপদ হত না।"

মামা শুরু করলেনঃ এই উপকথা জোগাড় করেছিলাম মহারাষ্ট্র থেকে। মারাঠাদের মধ্যে কত হাজার হাজার রূপকথা এবং উপকথা ছড়িয়ে আছে তোমাদের কী বলব। সমস্ত জীবন ধরে কাজ করলেও এইসব সংগ্রহ শেষ হবে না।

বিজাপুরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম বীরসেনা। বিচক্ষণ এবং দয়ালু রাজা হিসেবে তাঁর সুনাম পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বীরসেনা চারজন দূরদর্শী মন্ত্রী রেখেছিলেন তাঁকে পরামর্শ দিতে। বীরসেনার ভাগ্য খুব ভাল, এই চার মন্ত্রী ছিলেন যেমন সৎ, তেমনি কাজের। প্রয়োজন হলে রাজাকে অপ্রিয় উপদেশ দিতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না।

একবার রাজা বীরসেনার মাথায় খেয়াল চাপল, তিনি নিজের জন্যে বিশাল এক প্রাসাদ বানাবেন। এমন প্রাসাদ যে, ভূভারতে তার কোনো জুড়ি থাকবে না। মন্ত্রীদের পরামর্শ চাইলেন তিনি।

মন্ত্রীরা সব শুনে বললেন, "মহারাজ, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই রাজপ্রাসাদ তৈরির টাকা আসবে কোথা থেকে?"

মহারাজ উত্তর দিলেন, "রাজকোষে যে এত টাকা নেই তা আমি জানি। সুতরাং সমস্ত প্রজার ওপর কর বসিয়ে এই প্রাসাদের খরচ অবশ্যই তুলতে হবে।"

মন্ত্রীরা সবিনয় নিবেদন করলেন, "মহারাজ, প্রজাদের অবস্থা এখন তেমন ভাল নয়। তাঁদের অনেক কষ্ট আছে, ঠিক এই সময় আর একটা বিরাট প্রাসাদ তৈরির বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া সুবিবেচকের কাজ হবে না, আপনি প্রজাদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা হারাবেন।"

এই কথা শুনে মহারাজ খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তাঁরই নুন-খাওয়া মন্ত্রীরা যে রাজপ্রাসাদ তৈরিতে বাধা দিতে পারে তা অকল্পনীয়।

বিরক্ত রাজা চারমন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করলেন এবং হুকুম করলেন তোমরা দেশ থেকে নির্বাসিত হও।

চার বরখাস্ত মন্ত্রী মনের দুঃখে নির্বাসনের পথে রাজধানী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের পরনে এখন সাধারণ তীর্থ-যাত্রীর জামাকাপড়।

"এই তো দুঃখ এসে গেল।" ফোঁস করে উঠল বুলবুল। "তুমি যে বলেছিলে এবার কোনো দুঃখ থাকবে না," ছোটমামাকে সে মনে করিয়ে দিল।

"চিন্তা করিস না, বুলবুল। প্রথমে দুঃখ থাকলে অনেক সময় শেষে আনন্দ থাকে।" আশ্বাস দিল তিলক। "ছোটমামা যখন বলেছেন শেষ পর্যন্ত দুঃখ থাকবে না, তখন নিশ্চয় কথা রাখবেন।"

শিবাজি বলল, "ওয়ান কোশ্চেন। ছাঁটাই মন্ত্রীরা ক'মাসের করে মাইনে পেলেন?"

ছোটমামা হেসে ফেললেন। "তখন ওইসব ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ছিল না—রাজার মর্জির ওপরেই মন্ত্রীদের গদি এবং গর্দান দুই নির্ভর করত। তাই মনের দুঃখে মুখ বুজে রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো পথই ছিল না ওই চার বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীর।"

রাজধানী থেকে তো বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোথায় যাবেন কিছুই জানা নেই এই চারমন্ত্রীর। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা বিরাট এক বটগাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার ওপর তখন প্রচণ্ড সূর্যতাপ; মন্ত্রীদের সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। বিশ্রামের জন্যে ওঁরা গাছের তলায় বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরেই তাঁদের ক্লান্তি দূর হল। এবার তাঁরা চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁরা বুঝলেন, গত রাত্রে এখানে বৃষ্টি হয়েছিল, কেননা মাটি এখনও কাদা-কাদা হয়ে রয়েছে।

চার মন্ত্রী লক্ষ করলেন, নরম মাটিতে উটের পায়ের দাগ রয়েছে। প্রচণ্ড মেধাবী লোক এই চার মন্ত্রী। তাঁরা ভাবলেন, রাজকার্যের ঝামেলা যখন নেই, তখন, এই উটের পায়ের ছাপ থেকে কিছু গবেষণা করা যাক। এতে কিছুটা সময়ও কাটবে।

পায়ের ছাপগুলো ওঁরা যখন মন দিয়ে দেখছেন, তখনই গোলমাল শুরু হল।

মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক উটওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে এল। উটওয়ালা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমার উট

হারিয়ে গিয়েছে। আপনারা কি কোনো উটকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন?''

উটওয়ালার অবস্থা দেখে চার মন্ত্রীর মায়া হল। তা ছাড়া এ'দের নীতিই হল কোনো মানুষ বিপদে পড়লে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করা।

প্রথম মন্ত্রী উটওয়ালার মুখের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "ব্যস্ত হবেন না। নিশ্চয় আপনি উট খুঁজে পাবেন। আচ্ছা, আপনার উটের পিছনের পা কি খোঁড়া?''

উটওয়ালার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। সে উত্তর দিল, "ঠিক বলেছেন। আমার খোঁড়া উটকে কি এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?''

উটওয়ালার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "শুধু খোঁড়া নয়, আপনার উঠের একটা চোখ কানা।''

উটওয়ালা এবার যেন হাতে চাঁদ পেল। ''ঠিক বলেছেন হুজুর, আমার উটের একটা চোখ নেই। আপনি নিজের চোখেই তা দেখেছেন। এখন দয়া করে বলুন, উটটা কোথায় গিয়েছে?''

উটওয়ালার কথায় মন্ত্রীরা একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। তৃতীয় মন্ত্রী এবার মুখ খুললেন। "দেখুন, আমরা আপনার উটকে দেখিনি। কিন্তু আমরা জানি, আপনার উটের লেজ নেই।''

উটওলা বলল, "ঠিক বলেছেন হুজুর। গতবছর এক দুর্ঘটনায় আমার উটের লেজ কাটা যায়। এবার দয়া করে বলুন আমার উট কোথায়?''

চার পথচারী কোনরকম সহযোগিতা করছেন না দেখে এবার উটওয়ালা চটে উঠল। তার মনে এবার নানা সন্দেহ জাগছে। বিরক্ত মুখ করে উটওয়ালা বলল, "আর ল্যাজে খেলাবেন না আমাকে। নিজের চোখে না দেখলে আপনারা বললেন কী করে আমার উট কানা, খোঁড়া এবং তার লেজকাটা।''

উটওয়ালার গলার স্বর এবার চড়া। "আপনারাই নিশ্চয় উট চুরি করেছেন। এখনও সময় আছে, যদি গোলমাল পাকাতে না চান তাহলে বলুন কোথায় আমার উট লুকিয়ে রেখেছেন?''

চতুর্থ মন্ত্রী এবার উটওয়ালাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। "দেখুন, আমরা একটুও মিথ্যে বলছি না, আমরা উট দেখিনি। তবে আমরা এও জানি যে উটের অসুখ হয়েছে, তার শরীর ভাল যাচ্ছে না।''

এবার উটওয়ালার মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে এরা উট দেখেছে। রেগে-মেগে সে বলল, "তোমরাই যে চোর, তা বোঝাতে আর কোনো প্রমাণ লাগবে না। তোমরা দেখেছ আমার উট কানা খোঁড়া লেজকাটা এবং অসুস্থ। ভাল চাও তো আর বাক্যব্যয় না করে আমার উট আমাকে ফেরত দাও। না-হলে তোমাদের কপালে কষ্ট রয়েছে—রাজার কাছে এই চুরির রিপোর্ট করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।''

চারমন্ত্রী উটওয়ালাকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। "আপনি শুধু শুধু আমাদের সন্দেহ করছেন। আমরা আপনার উটকে দেখিনি; এবং আমরা চোর নই। রাজার কাছে আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনি উটের খোঁজ করুন। তাতেই আপনার লাভ হবে।''

"চোপরাও। আর লেকচার দিতে হবে না। তোমরা যে ভদ্রবেশী চোর তা ধরা পড়ে গিয়েছে। যাচ্ছি মহারাজের কাছে: তারপর গুঁতোর চোটে অপরাধ স্বীকার করবে এবং সুড়সুড় করে বলে দেবে চোরাই উট কোথায় লুকিয়ে রেখেছ।''

মাথার পাগড়ি টাইট করে নিয়ে উটওয়ালা এবার ছুটল রাজদর্শনে। যেতে যেতে সে চিৎকার করতে লাগল, "চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, এখন চোরের শাস্তি চাই।''

মহারাজ বীরসেনা সেদিন বিকেলে তাঁর দেহরক্ষীদের নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন একটা পাগড়ি-পরা লোক তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। আভূমি কুর্নিশ করে সে বলল, "মহারাজ, আমি দরিদ্র উটওয়ালা। চারটে দুষ্টুলোক আমার উট চুরি করেছে। এরা স্বীকার করছে আমার উট খোঁড়া কানা লেজকাটা এবং তার শরীর খারাপ। অথচ বোকা সেজে বলছে তারা আমার উটকে দেখেনি। এদের আপনি যোগ্য শাস্তি দিন, চোরকে শূলে না-চড়ালে আপনার রাজ্যে শান্তি থাকবে না, মহারাজ।''

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় সেই চোরের দল?''

একটু দূরেই একটা বটগাছের তলায় তারা বসে আছে শুনে মহারাজ আর সময় নষ্ট না করে দেহরক্ষীদের নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন। চুরির ফয়সালা তিনি এখনই করবেন।

দূর থেকে বটগাছের তলায় তাঁর প্রাক্তন চার মন্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে মহারাজ বীরসেনা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মন্ত্রীরা যে উট চুরি করতে পারেন না এ-সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজার কর্তব্য শুধু সুবিচার করা নয়, এমনভাবে বিচার করা যাতে কারও মনে কোনো সন্দেহ না থাকে।

মহারাজকে দেখে চার মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করলেন। উটওয়ালা গড়গড় করে তার অভিযোগ বলে গেল, "মহারাজ, এরা এত মিথ্যেবাদী যে, এখনও বলছে আমার উট দেখেনি।''

মহারাজ বললেন, ''আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না। কিন্তু চোখে না দেখেও আপনারা কী করে জানলেন উট খোঁড়া?''

প্রথম মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন, সবকিছু তাঁদের চোখে দেখতে হয় না। আমাদের হাতে কোনো কাজ ছিল না। তাই সময় কাটাবার জন্যে আমরা নরম মাটিতে উটের পায়ের চিহ্ন খুঁটিয়ে দেখছিলাম।''

মহারাজ বীরসেনা নিজেও এবার কৌতূহল বোধ করছেন। তিনি প্রথম মন্ত্রীর মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী দেখলেন?''

প্রথম মন্ত্রী গম্ভীরভাবে বললেন, "নিতান্ত সহজ ব্যাপার, মহারাজ। মাটিতে পায়ের ছাপগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছে উটের পিছনের পা দুর্বল—কোথাও ভাল দাগ পড়েনি। এই অস্পষ্ট দাগ থেকেই সহজেই বলা যায় উট খোঁড়া।''

উটওয়ালা এবার দাগগুলো দেখল এবং তাকেও স্বীকার করতে হল মন্ত্রী মিথ্যে কথা বলেননি।

"পায়ের ছাপে না-হয় পায়ের দোষ ধরা পড়ল। কিন্তু উট যে কানা তা জানলেন কেমন করে?'' উটওয়ালা এবার প্রশ্ন তুলল।

দ্বিতীয় মন্ত্রী বললেন, "শুধু কানা নয়, কোন্ চোখটা কানা তাও বলে দিচ্ছি। মহারাজ, আপনি এই জায়গাটা দেখুন। বাঁদিকে বেশি ঘাস থাকা সত্ত্বেও উট কেবল ডানদিকের ঘাস খেয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এই উট বাঁ চোখে দেখতে পায় না।''

রাজা এবং উটওয়ালা দুজনেই দেখলেন বাঁদিকের ঘাস অক্ষত রয়েছে।

তবুও উটওয়ালার মনের সন্দেহ মিটল না। "খোঁড়া এবং কানার ব্যাপারটা না-হয় মেনে নিলাম, কিন্তু চোখে না-দেখলে কী করে এ'রা বললেন, আমার উটের ল্যাজ নেই? মহারাজ, আমি বিচার চাই।''

তৃতীয় মন্ত্রী এবার উত্তর দিলেন, "খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় উটের ল্যাজ নেই। মহারাজ, আমি দেখলাম ঘাসের ওপর কয়েক ডজন মশা বসে রয়েছে। রক্ত চুষে চুষে তারা এত ফুলে উঠেছে যে, নড়তে পারছে না। মহারাজ, উটের যদি ল্যাজ থাকত তাহলে এইভাবে রক্ত খাবার সুযোগ পেত না মশাগুলো।''

ভিজে ছোলার মতো ফুলে-ওঠা মশাগুলোকে রাজা ও উট-ওয়ালা নিজেদের চোখে দেখে ঠোঁট উল্টোলেন। রাজার চোখে এবার বিস্ময় ফুটে উঠছে। মন্ত্রীদের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁকে তাজ্জব করছে।

চতুর্থ মন্ত্রী এবার এগিয়ে এলেন। "মহারাজ, উট যে অসুস্থ তা বোঝাবার জন্যে কোনো ম্যাজিকের প্রয়োজন নেই। উটের যে গোবর পড়ে রয়েছে তা দেখলেই বলা যায় উটের পেট খারাপ হয়েছে।"

উটওয়ালার চোখ দুটো এবার ছানাবড়া! সে বুঝেছে তার ভুল হয়েছিল—এই চারজন নির্দোষ ভদ্রলোককে সে অকারণে সন্দেহ করেছিল।

মহারাজ নিজেও বিস্মিত। তিনি বললেন, "আপনাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং বুদ্ধি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, আমি বুঝেছি এই বুদ্ধি না-থাকলে রাজকার্য চালানো যায় না। আমি আপনাদের ছাড়ছি না, আপনারা আবার আমার মন্ত্রী হোন।" এবার জোর করে চারমন্ত্রীকে মহারাজ তাঁর রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

"উঃ, বাঁচা গেল।" এবার হাঁফ ছাড়ল বুলবুল। সৎ-মন্ত্রীরা যে শেষপর্যন্ত বিপদে পড়েননি তাতে সে খুব খুশি হয়েছে।

তিলক বলল, "এইসব মন্ত্রী, যাকে বলে কিনা এক একখানা জুয়েল! বিলেতে জন্মালে এরা প্রত্যেকেই শার্লক হোমস হতে পারত।"

"আর আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গলে জন্মালে?" প্রশ্ন করলেন ছোটমামা।

"ব্যোমকেশ বক্সী কিংবা কিরীটী রায়।" উত্তর দিল শিবাজি।

বাইরে এবার কলিংবেল বেজে উঠেছে। বেল বাজানোর কায়দা থেকেই ছোটমামা বুঝতে পারছেন ব্রাহস্পর্শের মায়েরা মার্কেট থেকে ফিরে এসেছেন।

তিনজন নাম-করা দুষ্টু যে এইভাবে শান্ত হয়ে এতক্ষণ বসে আছে তা দিদিরা বিশ্বাসই করবে না। কিন্তু ছোটমামা ভাগ্নি ও ভাগ্নেদের সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন।

চেয়ার ছেড়ে ওঠবার আগে ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের এই দুই উপকথা থেকে কী বোঝা গেল?"

তিনজনে একই সঙ্গে বলে উঠল ঃ "বোকাদের উচিত সবসময় বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ নেওয়া।"

বাড়ির দরজা খুলতে যাবার আগে ছোটমামা প্রাইজ অ্যানাউনস করলেন, "তোমরা তিনজনেই ফার্স্ট হয়েছ। তিনজনেই একখানা করে চকোলেট পুরস্কার পাবে উইদিন পনেরো মিনিট।"
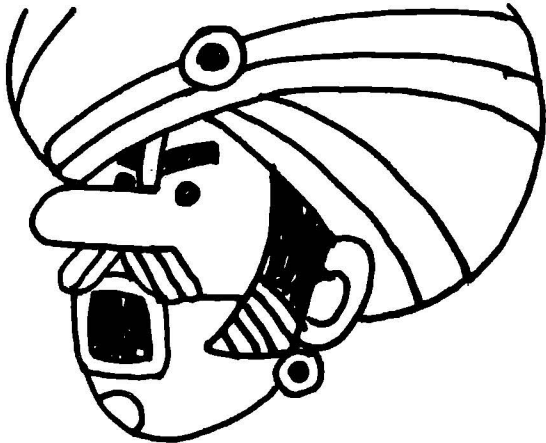
ছড়ার পুজো

সামসুল হক

তিনটে ছড়া ঝগড়া করে একরাশ ভিন্‌ঘাসে—
পুজো পাবে কোন ছড়াটা এই আশ্বিন মাসে।
একটা ছড়া বলল, আমি নীল আকাশের কন্যে,
বাংলা দেশের পুজোটা তাই শুধুই আমার জন্যে।
দ্বিতীয়টা বলল, আমি কন্যে শিউলি-কাশের—
পুজো পাব আমিই, তোরা শোন গান বাতাসের।
শিশির-ভেজা ধানের ফুলের ছোট্ট মেয়ে আমি,
এই পুজোতে আমিই পাব সমস্ত প্রণামী—
তৃতীয়টা বলল। আমি বললুম—মুখ বুজো,
তোরা তিনজন একসঙ্গেই পাবি খুশির পুজো।

বাঘ ভালুক চিল

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ভাগো ভাগো ভাগো!
বন থেকে বেরুল ভালুক
এবং বিশাল বাঘও
ভালুক গেল খুঁজতে শালুক
বাঘটি রাগো-রাগো!

চিল চিল চিল!
কেউ ছুঁড়ো না ঢিল—
এরোপ্লেনের মতন ওড়ে
চক্রাকারে কেবল ঘোরে
দুপুর বেলার আকাশ এখন
মিষ্টি নীলে নীল!

জীবন-বিচিত্রা

পার্থসারথি চক্রবর্তী
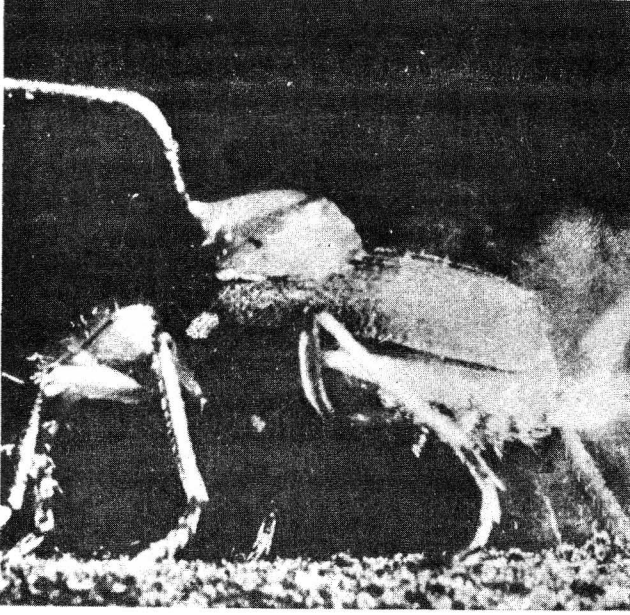
আত্মরক্ষার কসরত

আত্মরক্ষার জন্য যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি নানারকম কসরত করে আসছে। পালিয়ে যাওয়াই বোধহয় সব চাইতে বড় কসরত, কিন্তু পালাতে চাইলেই তো আর পালানো যায় না সবসময়! শত্রুও যে পেছনে তাড়া করে আসে।

কথায় বলে, চোখে ধুলো দিয়ে পালাল। কিন্তু ধুলো তো আর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আগে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটিয়ে পেছনে ধুলোর অন্ধকার করে পালানো সহজ ছিল। এখন তো ঘোড়া, হাতি নিয়ে যুদ্ধ করা উঠে গেছে। এখনকার যুদ্ধ অন্যরকম। কাজেই আত্মরক্ষার কৌশলটাও বদলে গেছে। এখন ধুলোর বদলে চোখে ধোঁয়া কিংবা বাষ্প ছড়ানো হয়ে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি বেলজিয়ামের সৈন্যদের উপর বিষবাষ্প ছড়িয়েছিল। এই বিষবাষ্পের রঙটা ছিল লাল। সম্ভবত ওটা ব্রোমিন-গ্যাসের সঙ্গে ক্লোরিন-গ্যাস মিশিয়ে তৈরি হত। ও দুটো গ্যাসই বিষাক্ত। একবার নাকে গেলেই ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করে ভবলীলা সাঙ্গ! তারপর সালফার-ডাই-অক্সাইড ও আর্সেনিক ক্লোরাইড গ্যাস দিয়ে ওটা তৈরি হত। মুখোশ না পরলে এর থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

এর অনেক পরে আর-এক রকমের গ্যাস তৈরি হল—টিয়ার গ্যাস। এই গ্যাসে অবশ্য কেউ মারা যায় না, কিন্তু একবার চোখে গেলে চোখ চুলকোতে থাকে যাচ্ছেতাইভাবে।

কীটপতঙ্গেরও এ বিদ্যা জানা আছে। বিপদে পড়লে অনেক পোকা অদ্ভুত আচরণ করে থাকে। শরীরের পেছন থেকে কামানের ধোঁয়ার মতো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। পেছনটা উঁচু করে এক রকমের পিঁপড়ে বিষাক্ত রস ছড়ায়। আর-এক রকমের পোকা আছে, কতকটা ঝিঁঝি পোকার মতো দেখতে, কেউ ধরতে এলে এরা পত্‌পত্‌ শব্দ করে পেছন দিক থেকে ধোঁয়ার মতো ঝাঁঝালো গ্যাস ছাড়ে। গ্যাসটা বেশ গরম, উষ্ণতা প্রায় একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। গ্যাসটা মোটা থেকে ক্রমে সরু হয়ে যায়। এর খানিকটা রঙিন, খানিকটা ধোঁয়ার মেঘের মতো।

মাকড়সার পাগলামি

সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর পিটার উইট এমন একটা ওষুধ খুঁজছিলেন যেটা মাকড়সার দেহে ঢোকালে সে আরও বেশি করে জাল বুনতে পারবে। একটা ওষুধ তিনি ক্যাকটাস জাতীয় গাছ থেকে পেয়েও গেলেন। চিনির জলের সঙ্গে মিশিয়ে ওষুধটা মাকড়সার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে দেখা গেল যে, সে বেশি জাল তো ছাড়তে পারছেই না, উপরন্তু পাগলের মতো এলোমেলোভাবে তার জাল বুনে চলেছে।

মাকড়সার জাল বোনার মধ্যে যথেষ্ট এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সে জাল বোনার আগে বাইরের দিকে কতকগুলো টান দিয়ে নেয়। তারপর ওই টানের উপর দিয়ে নিয়মমত আরও কতকগুলো টান সোজাসুজিভাবে টানে। পরে ওই সোজা টানগুলোর ওপর গোল বুনুনি চালায়। সাধারণত এই নিয়মের ব্যতিক্রম মাকড়সার ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায় এই ওষুধ তার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়ায় দেখা গেল যে, সে আর আগের মতো নিয়ম মানছে না। না মেনে নানা ধরনের জাল বুনে চলেছে। একটার সঙ্গে আর একটার কোনও মিল নেই। খুব আশ্চর্যের কথা, তাই না?

ঘুমের ওষুধ খেলে মানুষের যেমন ঝিমুনি আসে, মাকড়-সারও ঠিক সেইরকম কিছু হয় নাকি? মাকড়সার দেহে এক ধরনের ঘুমের ওষুধ ঢুকিয়ে দেখা গেছে যে, সে তখন কেবল বাইরের টানগুলো বুনেই সন্তুষ্ট থাকছে, ভেতরের গোল টান আর দিচ্ছে না। আর, নাইট্রাস অক্সাইড—যাকে আমরা লাফিং-গ্যাস বলে থাকি, সেটা দিলে দেখা যায় যে, মাকড়সা মাতালের মতো অবিশ্রান্তভাবে এলোমেলো জাল বুনে চলেছে।
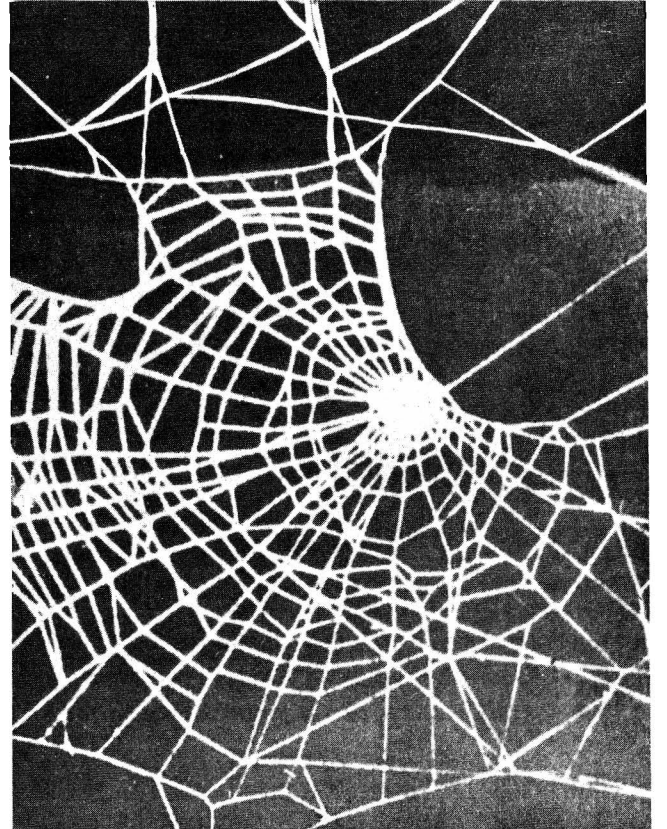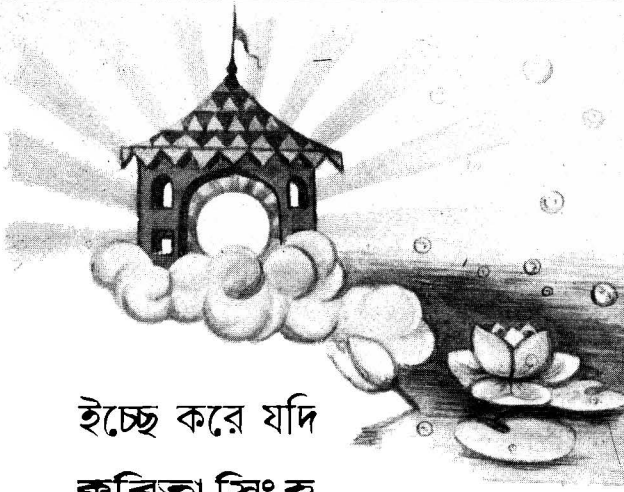
ইচ্ছে করে যদি

কবিতা সিংহ

ঘুচাই পারে
ক্যালেন্ডারে
বইয়ে দিতে নদী!
ঝাঁকিয়ে দিতে
ছবির শিউলি গাছ
আঁকা নদীর জলের থেকে
তুলতে পারে
লাল-সোনালি মাছ।
ইচ্ছে করে যদি!
ঘুচাই পারে
বেড্‌কভারে
ফুটিয়ে দিতে
সকল পদ্ম-কুঁড়ি
রাঙিয়ে দিতে
সব বেরঙা পাতা।
মাথায় দিয়ে
টবে ফোটা
ছোট্ট ব্যাঙের ছাতা
পেরিয়ে যেতে
স্বপ্ন-সবুজ নদী
ইচ্ছে করে যদি!
ঘুচাই পারে
মেঘ-পাহাড়ে
বানিয়ে নিয়ে
সূর্য সোনার ঘর-
ঘুম-সায়রের
ঘোর অতলে
ফুটিয়ে দিতে
পদ্ম-চাকের চর—
চাঁদের বুকে পাড়ি দিতে—
চড়ে মেঘের গদি
ইচ্ছে করে যদি!

কেউ জানে না

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ছাদের নীচে বারান্দা
দাঁড়িয়ে আছেন হারানদা,
হারানদা কি হারাননি
টাকা সিকি দোয়ান্নি!
ভরসা করে বর্ষাতে
বেরুন তিনি যার সাথে
নাম থাকুক তার উহ্য,
তোমরা কিছু বুঝছ?
টাকের উপর টাকা রেখে
বন্ধুটি তার ব্যালান্স শেখে
রোজ সকালে শিয়ালদহে
দোকানিরা কী হাল কহে
শোনেন, এবং থাকেন তাঁরা
সস্তা কেনার ধান্দায়।
কেউ জানে না হারানবাবু
দাঁড়ান কেন বারান্দায়।

বিষ্টুপুরের কেষ্টঠাকুর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বিষ্টুপুরে গিয়ে দেখি
কেষ্টঠাকুর নাচে,
ঘাটেও নয়, বাটেও নয়,
পোড়ামাটির ছাঁচে।

শুধু কী এক কেষ্টঠাকুর
সঙ্গে আছেন রাধা,
বাঁশির টানে এগিয়ে আসেন
পেরিয়ে সকল বাধা।

দামামা, আর ঝাঁঝর কাঁসর
ঝম্‌ঝমিয়ে বাজে,
ঢাকের পিঠে পড়ে কাঠি—
কে মন দেবে কাজে?

কেষ্টঠাকুর, কেষ্টঠাকুর,
থামিও না গো নাচন,
তোমার নাচেই, বিষ্টুপুরে,
সবার মরণ-বাঁচন॥

ছবি দেবাশিস দেব

পুরানো গল্প

পবিত্র সরকার

জন্মের পরে নাম যার হাসি- রাশি হল,
বড় হয়ে সে তো ছোটরানীমার
খাসমহলের দাসী হল।
একদিন সে যে পাত পেতে
রানীমাকে দিলে ভাত খেতে,
লুডো খেলা নিয়ে সেই ভাত ক্রমে বাসি হল।
খেয়েদেয়ে উঠে ছোটরানীমার
খনখনে এক কাসি হল।

সেই অপরাধে দাসীটির শেষে ফাঁসি হল॥

ছবি দেবাশিস দেব

রাতের ভয়

রঞ্জন ভাদুড়ী

পালাই-পালাই আলোর টুঁটি
টিপছে অন্ধকার
গা-ছমছম সন্ধেবেলায়
হাওয়ায় গন্ধ কার ?
যজ্ঞিডুমুর গাছের ডালে
ঝুলছে কালো ঠ্যাং—
যেই যাবে কেউ গাছতলাতে
মারবে বুঝি ল্যাং!
হুতুমপ্যাঁচার ভুতুম আওয়াজ
রক্ত করে হিম—
বুকের মাঝে মাদল বাজে
ডিণ্ডিমা-ডিম-ডিম।
আকাশ জুড়ে তারার মেলা,
উধাও শুধু চাঁদ,
ঝুপসি বটের অন্ধকারে
শুধুই ভয়ের ফাঁদ।
ঝিম-ধরানো ঝিঁঝির ডাকে
কাঁপছে বনের ধার,
অশথগাছে বসত যাদের—
মটকে দেবে ঘাড়—
যে যাবে সেই গাছতলাতে—
জাগছে মনে ভয়—
ভয়গুলোকে উসকে দিতেই
রাত্রি বুঝি হয় !

ছবি দেবাশিস দেব

মামদোবাজি

শ্যামলকান্তি দাশ

নিন্দুকেরা তারস্বরে
চ্যাঁচাক না যে যত,
ভূতের মধ্যে মামদো শ্রেষ্ঠ,
কাঁধকাটা নয় তত।
কাঁধকাটাটা হাড়হাভাতে
উনপাঁজুরে, আর
চৌপর দিন জ্বালিয়ে মারে
সমস্ত সংসার ।
মামদো হলেন সেই তুলনায়
অনেক ভাল লোক,
ভদ্র, কিন্তু একটুখানি
ঝগড়াটে, তা হোক।
উচ্চ গাছের উচ্চ চূড়ায়
উচ্চ চিন্তা নিয়ে
ফি-বচ্ছর থাকেন তিনি
আসরটি জাঁকিয়ে।
ভূতের রাজার সব-ই ভাল
দোষের মধ্যে এই—
সকালসন্ধে ঘুমিয়ে থাকেন
লম্ফঝম্ফ নেই।
রাত্রি হলেই বাড়তে থাকে
মামদোবাজি তাঁর
টুকুস করে মটকে আসেন
বেতোরুগির ঘাড়।

ছবি দেবাশিস দেব

নিষ্ঠুর কাকার আশ্রয় থেকে পালাচ্ছিল কেটি পামার। ট্রেনে আলাপ হল কেটি ব্লেয়ারের সঙ্গে—সে যাচ্ছিল তার বড়লোক কাকা-কাকিমার বাড়িতে থাকতে— তাঁদের সে এই প্রথম দেখবে। ট্রেনে অ্যাকসিডেন্ট হল, দ্বিতীয় কেটি তাতে মারা গেল। প্রথম কেটি জীবনে সুখী হওয়ার এই প্রথম সুযোগ ছাড়ল না, সে ব্লেয়ার সেজে বসল। এখন অতীত তাড়া করছে তাকে...
আসল-নকল
ভিড়ের মধ্যে স্পষ্ট দেখলাম ওর মৃতদেহ। ওর জীবন চুরি করেছি, তাই ও ভূত হয়ে পিছু নেবে আমার?
যাক, বাড়ি এসে গেছি। মা কেটি, শুয়ে নাও একটু। ঘুমোলে ভাল লাগবে।
এত ভাল এরা—কী করে বলি এ'দের যে আমি নকল, এ'দের আপন ভাইঝি নই?
ঘোড়া খুব ভাল লাগত আমার—এ'দের ঘোড়ার খামার আছে শুনেই লোভ হল। এখন এ'দেরও ভাল লেগে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না...
ক্লান্ত কেটি পামার ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শান্তি কোথায় তার—
যাও! চলে যাও! তুমি মরে গেছ। আমি এখন আসল কেটি ব্লেয়ার। পায়ে পড়ি, রেহাই দাও আমায়!
উফ—কী বিচ্ছিরি স্বপ্ন! এভাবে চললে বাঁচব কী করে? যাই, মিডনাইটের পিঠে একটু দৌড়ে আসি।
বেশ ভাল লাগছে। যত সব উদ্ভট ভাবনা —কেটি ব্লেয়ারের ভূত-ফুত সব কোথায়? আর ওসব ভাবব না—

এই বেড়ার ঝোপটা দেখছিস মিডনাইট? ধর এটা শখের ঘোড়দৌড়— লাফিয়ে ডিঙোতে পারবি?
হ্যাঁ, খুব পারবি। দৌড় জিততেই হবে!
ঐ, ঐ. আবার সেই!
মা গো!
আ-হ, এখনও যাচ্ছে না। মানুষের মতো, কিন্তু কিছুতেই মানুষ নয়—
লাগেনি তো? হঠাৎ কি ভয় পেলে আমাকে দেখে?
নাও, হাতটা ধরে ওঠো...
ভূত কি এত জলজ্যান্ত হবে? কিন্তু ওকে তো মরতে দেখলাম আমি। নইলে ওর জায়গা নেব কেন?
সত্যি এভাবে দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না। আসলে তোমার ঘোড়ায়-চড়া দেখছিলাম, আর কী যেন মনে করতে গিয়ে আর পারলাম না...
মনে পড়ল না?

হ্যাঁ, ট্রেনে ধাক্কা লাগল, জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান হলে দেখি কিচ্ছু মনে নেই।
তাহলে মরেনি তো ও!
এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দিয়ে চেনা যায় আমাকে। পকেটে এখানকার টিকিট ছিল, তাই হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে এলাম এখানে— যদি কিছু মনে পড়ে। কই—
ও তো আসেইনি আগে এখানে—আমাকে কে ধরবে? ইচ্ছে করলে সারাজীবন আমি ও হয়ে থাকতে পারি।
আমার নিজের নামই মনে নেই ছাই!
হায়, এ-মেয়ের সুখ কেড়ে নেব আমি? অনাদর আর একা থাকার কষ্ট যে কী, তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে? প্রাণ গেলেও সে পারব না।
শোনো. তোমার নাম কেটি, কেটি ব্রেয়ার। এখানে তোমার কাকা-কাকিমার সঙ্গে থাকতে আসছিলে...
হ্যাঁ, আবছা মনে পড়ছে!...তোমার মুখটাও কেমন চেনা লাগছে...
কেটি ক্রমে সব খুলে বলল—ট্রেনে দেখা, অ্যাকসিডেন্টের পর মৃত ভেবে তার জায়গা নেবার সংকল্প...
হ্যাঁ, সব আস্তে-আস্তে মনে পড়ছে। এসব কেন করলে ভাই?
দেখুন ভুল করেছি আমি জানি, খুবই অনুতপ্ত আমি। আমার নিজের কাকা যদি মানুষের মতো হতেন তাহলে হয়তো—। আপনাদের এখানে স্বর্গসুখে ছিলাম আমি...
সে অনেক কথা। চলো, তোমার কাকা-কাকিমার কাছে সব খুলে বলি—
সবচেয়ে কঠিন হল ঐ খুলে বলা—
চলো, তোমার এই কাকাটিকে একটু দেখে আসি।
যাক, পুলিস ডাকেননি এঁরা। কিন্তু সকলের মুখ গম্ভীর। এঁদের ঠকিয়েছি, নিজের কাছেই আর মুখ দেখাতে পারব না

এই বাড়ি। এখানেই নামিয়ে দিন আমায়—
আমরাও আসছি তোমার সঙ্গে
ওঁরা চলে গেলেন না কেন—কী ভাল এঁরা। এ-জায়গায় ও'দের আসাই ঠিক হয়নি। কাকা তো আমায় দেখলেই হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করবে—
বজ্জাত মেয়ের এই ফিরে আসা হল, অ্যাঁ! রোসো, কাজ ফেলে পালানোর মজা তোমাকে টের পাওয়াচ্ছি
এই শুরু হল!
খবরদার ওর গায়ে হাত তুলবেন না। যা ভেবেছিলাম, আপনি ওর কাকা হওয়ার যোগ্য নন!
এ কী!
আদালতে দরখাস্ত করে আমরা ওকে পুষ্যি নেব।
আপনারা নিয়ে যাবেন আমাকে?
কিন্তু আমি যে-কাজ করেছি, কোর্ট কি জীবনে তা ভুলতে পারবে?
খুব পারব! তোমার দশা তো দেখলাম। তুমি আমার বোন হবে, দারুণ হবে।
ক'সপ্তাহ পরে
এই যে কাগজপত্র সব রেডি কোর্ট—এখন আমিই তোমার আসল কাকা হতে চলেছি।
হুররে—চলো, ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি যাই
বাড়ি—এবার অলীক স্বপ্ন নয়—সত্যি বাড়ি—চিরকালের!

এক যে ছিল বন

শিবশঙ্কর মিত্র

বিরাট বন। গাছ আর ঝোপের শেষ নেই। সে বনে না আছে এমন জীব নেই। এরা কেউ কারও কথা শোনে না, যে যাকে পারে মেরে খায়।

এ-গাছে, সে-গাছে, কত যে মৌচাক তার ইয়ত্তা নেই। চাকের ধারে যেতে কেউ সাহস করে না। তা হলে কী হবে! সকালে মৌমাছিদের মধু আনতে বেরুতেই হয়। তখন ওদের ফুলে ফুলে একা-একা ঘুরে বেড়াতে হয়। পাখির দল তখন ওদের একা পেয়ে ধরে ধরে খেয়ে ফেলে।

একদিন হল কী! মৌমাছিরা সব দল বেঁধে পাখিদের কাছে হাজির। পাখিরা তো ডানা মেলে উড়ে খেতে বেরিয়েছে। এমন সময়ে দেখে,—মৌমাছিরা সব দল বেঁধে আসছে। মৌমাছিতে আকাশ প্রায় কালো। অত মৌমাছি দেখে পাখিরা তো ভয়ই পেল।

মৌমাছিরা এসে বলল, ''গুন-গুন-গুন শুনছ পাখির দল? তোমরা কি আমাদের ফুলে মধু আনতে দেবে না ! এসো না, আমরা মিলে-মিশে থাকি এই বনে। তোমরাও কিছু বলবে না আমাদের, আমরাও কিছু বলব না তোমাদের।''

পাখির দল কিচির-মিচির করে বলল, ''কু-কু-কু, কা-কা-কা; তা বেশ! কিন্তু আমাদের বাচ্চাকে যে সাপের দল এসে খেয়ে যায় ! তাদের কে ঠেকাবে ?''

মৌমাছিরা বলে, ''বেশ ! বেশ ! চলো, আমরা সবাই একবার সাপের কাছে যাই।''

তারপরই মৌমাছি আর পাখিরা গেল সাপের গর্তের মুখে মুখে। মৌমাছি আর পাখির ডাক শুনে গর্তের ভিতর থেকে সাপেরা মুখ বাড়াল। লম্বা-লম্বা জিভ বের করে ফণা তুলে বলল, ''কারা তোমরা ?''

"আমরা এ বনের মৌমাছি আর পাখি।"

"কেন তোমরা দল বেঁধে এসেছ?"

"দেখ, এই বনে আমরাও থাকি, তোমরাও থাক। এসো না; আমরা সবাই একসাথে শান্তিতে বাস করি।"

সাপের দল কাটা-কাটা জিভ বের করে বলল, "তা বেশ! কিন্তু আমাদের ধরে ধরে যে বুনো মুরগির দল খেয়ে ফেলে! তাদের রুখবে কে!"

তখন মৌমাছি আর পাখিরা একসঙ্গে বলে ওঠে, "চলো না, আমরা সবাই মিলে বুনো মুরগির কাছে যাই।"

মৌমাছি, পাখি, আর সাপ—এবার সবাই মিলে বুনো মুরগির কাছে হাজির। সাপের দল ছিল সামনে। সাপ দেখে তো মুরগির দল পাখনা ফুলিয়ে তেড়ে এল।

সাপেরা তো জোরে কথা বলতে পারে না। তাই মৌমাছিরা ভন্ ভন্ করে আর পাখিরা কিচির-মিচির করে বলল, "দেখ, আমরা সবাই এই বনে থাকি। কেন আমরা একে অন্যকে মারি। এসো না, আমরা মিলে-মিশে থাকি!"

বুনো মুরগি বলল, "কক্-কক্-কক, ভাল কথা। আমরা রাজি আছি। কিন্তু শেয়াল এসে যে আমাদের খেয়ে ফেলে!"

মৌমাছি, পাখি, সাপ—সবাই তখন একসঙ্গে বলল, "তা তো ঠিক কথাই বলেছ। চলো না, আমরা সবাই শেয়ালমামার কাছে যাই!"

এবার ওরা সবাই মিলে চলল শেয়ালের কাছে।

শেয়াল ভারী ধূর্ত। ওদের দেখতে পেয়েই এক শেয়াল ডেকে উঠল, "হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া"। আর অমনি সব শেয়ালই ডেকে ওঠে—"হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া"।

ডাক শুনে মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো মুরগি—সবাই মিলে দাঁড়িয়ে পড়ে। ডেকে বলল, "ভয় নেই মামা, আমরা এসেছি একটা কথা বলতে!"

"বলো, তোমাদের মতলব কী?"

সবাই তখন চিৎকার করে জানায়, "দেখ, আমরা সবাই থাকি একই বনে। কেন আমরা ঝগড়া-বিবাদ করি। এসো, আমরা মিলেমিশে একসাথে থাকি!"

শেয়ালের দল বলল, "বেশ, আমরা নিশ্চয় অমত করব না। নেকড়ে বাঘ কি রাজি হবে? তারা যে আমাদের পেলেই খেয়ে নেয়!"

তখন সবাই বলল, "তোমরা ঠিকই বলেছ, মামা। আচ্ছা; চলো না, আমরা দল বেঁধে নেকড়ের কাছে হাজির হই!"

তারপর মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো মুরগি শেয়াল—সবাই একত্রে এল নেকড়ের কাছে। ওদের দেখতে পেয়েই নেকড়ের দল তেড়ে এল—"হাউ, হাউ!"

কিন্তু কাকে ধরবে! কাকে মারবে! ওরা এসেছে আজ দলে দলে। সবাই বলল, "নেকড়ে-দাদু! দেখ, আমরা সকলে মিলে এসেছি। তুমি অমন কোরো না। আমরা সবাই তো এই বনেরই বাসিন্দা। এসো না, আমরা সবাই মিলে বন্ধুর মতো থাকি। কেউ কাউকে কিছু বলব না।"

নেকড়ে বলল, "তোমাদের কথার কী মূল্য? বাঘ কি আমাদের ছেড়ে কথা কইবে? দেখলেই তাড়া করবে। তখন তোমরা কেউ কি থাকবে?"

নেকড়ের কথায় সবাই প্রতিবাদ করে উঠল। বলল, "না—না—না, তা হবে না। চলো, আমরা দল বেঁধে বাঘের কাছে যাই। রাজি?"

নেকড়ে উত্তরে বলল, "বেশ! তোমরা সবাই গেলে, আমরাও যাব!"

মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো মুরগি, শেয়াল, নেকড়ে—সবাই মিলে এবার চলল বাঘের কাছে। বনে শোরগোল পড়ে গেছে। হৈ-হৈ করতে করতে ওরা হাজির বাঘের আড্ডায়।

বাঘ তখন বন কাঁপিয়ে ডাকছে—"হালুম, হালুম!" ডাক শুনে ওরা প্রথমে থমকে যায়। তারপর আবার চলল। দূর থেকে বাঘকে ডেকে বলে, "বিড়াল-পিসি! বিড়াল-পিসি! আমরা সবাই এসেছি তোমার কাছে।"

বাঘ হাঁক দিয়ে উঠল, "হালুম! খবরদার, এগুলেই আক্রমণ করব!"

"না, না, না; আমরা তোমার কাছে একটা কথা বলতে এসেছি। আমাদের কথা আগে শোনো, তারপর যা হয় কোরো।"

"হালুম! বেশ, কী কথা তোমাদের?"

"দেখ, তোমারও এই বনে না থেকে উপায় নেই, আমাদেরও থাকতে হবে। তাই আমরা মিলে-মিশে থাকলে সুখেই থাকব। এসো না, আমরা এই বনে শান্তিতে বাস করি।"

"হ্যাম! ইশ, মিলে-মিশে থাকবে! শিকারি তো আমাকে মারতেই আসবে। তোমরা তখন কে কোথায় ভয়ে পালাবে, তার ঠিক নেই! আসবে তখন তোমরা আমাকে বাঁচাতে?"

"না, বিড়াল-পিসি! এই বন আমাদের সবার। এই বনে আমরা কাউকে ঢুকতে দেব না। এসো, আমরা শান্তিতে বাস করি।"

বাঘ তো চিন্তায় পড়ল। ওদের কথায় বিশ্বাস করতে চায় না। বলল, "বেশ! কাল নিশ্চয় শিকারি আসবে। দেখি, তোমরা তখন কী করো! যদি এসে ঠেকাও, নিশ্চয় মিলে-মিশে থাকব।"

পরদিন। সবাই এসে হাজির। মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো-মুরগি, শেয়াল, নেকড়ে, বাঘ—সবাই জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে বনে ঢুকবার পথে। শিকারি এলে এই পথেই আসবে।

মৌমাছির রাগ শিকারির উপর। সে এসে মধুর চাক ভেঙে নিয়ে যায়।

পাখির রাগ শিকারির উপর। সে এসে ওদের ধরে নিয়ে খাঁচায় পুরে রাখে।

সাপের রাগ শিকারির উপর। সে এসে ওদের হাঁড়িতে পুরে ধরে নিয়ে যায়। সাপুড়ের হাতে দেবার জন্য।

বুনো-মুরগির রাগ শিকারির উপর। ওদের পেলেই সে ধরে নিয়ে যায় খাবার জন্য।

শেয়ালের রাগ শিকারির ওপর, শিকারির একটা কুকুর আছে। তাকে সে লেলিয়ে দেয় ওদের পেছনে।

নেকড়ের রাগ শিকারির ওপর। সে ওদের দেখলেই মারবে। মেরে ওদের গায়ের চামড়া খুলে নেবে।

আর বাঘ! বাঘের রাগের তো অবধি নেই। বাঘ মারতেই শিকারি আসে বনে।

এমন সময়ে শিকারি বনে এল। শিকারি আর আসবে কী! বনে ঢুকতেই সবাই—মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো-মুরগি, শেয়াল, নেকড়ে, বাঘ—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারির ওপর।

মৌমাছির ঝাঁক হুল বেঁধাতে লাগল শিকারির নাকে, মুখে, চোখে। পাখি উড়ে উড়ে ছোঁ মেরে ঠোকরাতে লাগল তার মাথায়। সাপ ছোবল মারবার জন্য ফণা তুলে ধরেছে। বুনো-মুরগি তো জামার নীচে ঢুকে পিঠ আঁচড়াতে লাগে। শেয়াল কাপড় কামড়ে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে আর-কী! নেকড়ে হাউ-হাউ করে তীর-ধনুক কামড়ে ভেঙে ফেলল। আর বাঘ থাবা মেরে শিকারির ঘাড় ভেঙে ফেলবার জন্য দু-পায়ের উপর ভর করেছে!

শিকারি তো অস্থির। ভয়েই আধখানা। দৌড়ে পালিয়ে এ-যাত্রা প্রাণে বাঁচল। এরপর আর কোনও শিকারি এই বনে আসতে চায়নি। আসবেই বা কোন সাহসে!

এবার বনের সকলে মিলে-মিশে বাস করতে থাকে। বনে শান্তি নেমে আসে। শুধু তাই নয়, সে-বনের অধিবাসীদের কেউ আর কাকে মারে না।

দি নেস্ট

নবনীতা দেব সেন

রঞ্জন ঢুকতেই আমি উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কী রে, কেমন বেড়ালি গোমো? বসনমামার বাড়ি?"

"আর বোলো না নবনীতাদি, বসনমামার ব্যাপার!"

আমি উৎসাহিত। এই শুরু হয়ে গেল আরেকখানা বসন-মামার গল্প। রঞ্জন বলতে পারে আমার চেয়ে ঢের ভাল করে তার মামার ব্যাপার-স্যাপার।

একদিন বসন্তমামা এসেই শুরু করলেন, "বাংলো পাইসি, বাংলো! কোয়ার্টার। ও মেজদি, শোনেন, আমাগো দৈন্যদশা ঘুচাইসে রেইল কোম্পানি—আপনের বৌমাগো লইয়া গেসি গোমো। ওঃ, ইলাহী কান্ড, প্রাসাদোপম গৃহ, বোঝলেন মেজদি? ইনডিয়ান কোয়ার্টার খালি নাই, ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার্স দিয়া দিসে। আর চিন্তা নাই। রঞ্জু মঞ্জু সন্টু, যাইস অখন, দেইখ্যা আসিস, কোয়ার্টার্স কারে কয়। পাঠাইয়া দ্যান মেজদি পোলা-পানগুলারে—হেলথডা ফিরাইয়া আসুক—ওঃ, যা চ্যাহারা হইসে এক-একখান—মনে হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর থিক্যা সুভেনির রাখছেন ঘরে—তাকান্ যায় না—কাঠি-কাঠি হাত-পা—ওঃ, দেখবি গিয়া তুতুমিতুর কী স্বাইস্থ্য — দেখিস নাই তো, মামাত ভাইবোন দুইডারে কোনোদিন—বোঝলেন মেজদি, খাইয়া-দাইয়া,

ম্বাইস্থ্যডা ফিরাইয়া আসুক—গায়ে গত্তি লাগাইয়া ফিরবি খনে—তদের মামি রন্দনে দ্রৌপদী. আর ঘরে তো চড়ুইপাখির মতো মুরগির দৌরাত্ম্য! ধর, কাট, খাও। ধর, কাট, খাও। বাস্‌স্‌। যত না মানুষ, তত মুরগি। পালকের পাহাড় হইসে কোয়ার্টার্সের পিছনে। আর যত মুরগি তত ডিম। আর সে কী কোয়ার্টার, পেলেইশিয়াল বিলডিং মেজদি. থাইক্যাও সুখ, দেইখ্যাও সুখ! রঞ্জু মঞ্জু সন্টু! শোন্‌, ডাইরেকশন দিয়া দেই—মন দিয়া শোন্‌। গোমো স্টেশনে নাইম্যা, ধরবি রিকশা। শত শত রিকশা লাইন দিয়া খাড়াইয়া আছে পেসেনজারের লেইগ্যা। বলবি—'বসন্ত মুস্তাফাকা বাংলোমে চলো—দি নেস্ট।' বাস্‌। আর কিসুই কইতে লাগব না। চড়বি রিকশায়। সিধাই লইয়া যাইব। রঞ্জু মঞ্জু সন্টু, কনসেনট্রেইট কইরা শুইন্যা ন্যাও—ইস্টেশন থিক্যা বাইরইয়াই অনন্তবিস্তার রাস্তা লাল সুরকি বিছান, রাঙ্গামাটির পথ—সিইধা চইল্যা যায় দিগন্তের পানে—দুই পাশে ফলের বাগান, ফুলের বাগিচা, ইউকালিপটাসের বনানী। আর শালবীথিকা—আর ক্যাকটাসের জঙ্গল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ফুইট্যা আছে সব বিশাল বিশাল বাংলো-বাড়ি, ধনীলোকের বসতবাটী, রিচম্যানস রেসিডেনশিয়াল কোয়ারটারস। তারই একটা হইল 'দি নেস্ট'। মানে আমাগো বাসস্থান, মানে কোয়ার্টার্স আর কী। সামনেই লোহার আলপনা-দেওয়া গেইট, শ্বেতপাথরের ফলকে নাম ল্যাখা আছে—"

মঞ্জু বলল, "বসন্ত মুস্তাফী?"

বসনমামা চোখ পাকালেন, "না, ল্যাখা আছে 'দি নেস্ট'—গেইটটা ঠেলা দিলেই খুইল্যা যায়, আর গেইট বরাবর গারডেন পাথ—গারডেন পাথ বুঝ? গারডেন পাথে রিকশাসুদ্ধা ঢুকবা না কিন্তু, অল ভিহিক্‌ল্‌স প্রহিবিটেড. সাইকেল বাদ। গারডেন পাথে সাবধানে পা ফ্যালবা, নুড়িপাথরগুলান আনটাইডি হইয়া যায় না য্যান—ইউরোপীয়ান কোয়ারটারস—ভেরি ভেরি কেয়ারফুল! ঢুক্যাই দ্যাখবা ফাউনটেইন। মার্বেল পাথরের ফাউনটেইনে টগবগ টগবগ কইরা জল বাইয়া পড়তাসে পরীর মাথার কলস থিক্যা। জল যেইখান্‌ডায় পড়ে, হেইডা আবার গোল চৌবাচ্চার মত, তাইতে হরেক রঙের বিলায়তি গোল্ড ফিশ খেইল্যা বেড়াইতাসে। গোল্ডফিশ খেলে, আর রোদে-জলে চোখে ঝিলিক মারে—য্যান ইন্দ্রধনু! রেইনবো! হেই ফাউনটেইনের সাইডে দুইডা ফুটফুইট্যা শিশু খেলা করতাসে (আমারই বাচ্চা দুইডা আর কী), হুরীপরীর লেইগ্যা চ্যাহারা (তুতুমিতু আর কী) এট্টা তুলার কুকুর লইয়া। তুলার না কিন্তু! রিয়্যাল, বিলায়তি পেট ডগ—ফোর হানড্রেড রুপিজ! ভয় নাই, কামড় দিব না। ডেন্টিস্ট দিয়া দাঁতগুলি ভোঁতা কইরা দিসি। মেজদি! চিন্তা নাই, চিন্তা নাই! ট্রেইনে বসাইয়া দিবেন, সিইধা গোমো স্টেশনে নাইম্যা রিকশায় বইস্যা ক্যাবল কওনের অপেক্ষা—'দি নেস্ট'! বাস্‌। রঞ্জু মঞ্জু সন্টু, তরা যাইস নিশ্চয়, ছুটি হইলেই।"

বসন্তমামাকে বিশ্বাস করে এমনিতে এতবার ঠকেছে রঞ্জনেরা, সেই যে 'মুলতানী কামধেনু' কেলেঙ্কারি, 'স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার' নিয়ে আরেক কেলেঙ্কারি, 'দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ' নিয়ে কী ঝামেলা পাড়ায়, তারপর 'কোটের' জন্যে প্রায় পুলিসেই তো ধরছিল—রঞ্জনদের তাই সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু কেমন যেন সত্যি-সত্যি মনে হচ্ছিল বাড়ির ব্যাপারটা এবারে। এভাবে কেউ নেমন্তন্ন করতে পারে, সত্যি না হলে?

মঞ্জুটা কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না। কিন্তু রঞ্জন আর সন্টু একদিন ট্রেনে চড়ে বসল। সিধে গোমোয় গিয়ে নামল। সত্যি, গাদা-গাদা রিকশা ছিল স্টেশনে। একটায় উঠে বসে সন্টু

বলল, "বসন্ত মুস্তাফীকা বাংলোমে চলো।"

সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

"বসন্ত মুস্তাফীকা বাংলো নেহি জানতা?"

রিক্সাওয়ালা মাথা নাড়ল, "নাহি জানতা বাবু।"

এবার রঞ্জন বলল, "দি নেস্ট জানতা? দি নেস্ট?"

এতক্ষণে একগাল হেসে প্যাডল করতে শুরু করে দিল রিকশাওলা। 'নতুন বদলি হয়েছেন তো, তাই বসনমামার নামটা এখনো চেনে না এরা' ভেবে নিল রঞ্জু-সন্টু।

সত্যিই অনন্তবিস্তার রাস্তা, রাঙামাটির পথ, দু'পাশে শালবন, ইউক্যালিপটাস-বাগান, বড়লোকদের বাগানবাড়ি, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, ফণিমনসার ঝোপ, ঠিকঠাক মিলে যেতে লাগল বসন্তমামার বর্ণনা। এক সময়ে এসে পড়ল 'দি নেস্ট'। নাঃ, বসন্তমামা এবারে গুল মারেননি। মঞ্জুটা বোকা, সন্দেহ করে করে কিছুতেই এল না। সত্যিই, লোহার আলপনা দেওয়া গেটটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

সত্যি সত্যি শ্বেতপাথরের প্রাসাদের মতো বাড়ি। চারদিকে জাফরি কাটা দালান। চমৎকার কেয়ারি-করা ফুলবাগানের মধ্যিখানে খেলনার মতো বসানো, যেন একটা ছোটখাটো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এই তো। এই বাড়ির কথাই তো বলেছেন বসনমামা। সুরকির পথে দু'পা এগুতেই গোলাপ ফুলের গন্ধে প্রাণ ভরে গেল। আঃ। গারডেন-পাথই বটে।

সামনেই ফোয়ারা। ঐ তো শ্বেতপাথরের পরী মাথায় কলসি ধরে আছে, আর কলসি দিয়ে জল ঠিকরে পড়ছে নীচের গোল চৌবাচ্চায়। রঞ্জু-সন্টু এগিয়ে গেল। গোল্ডফিশ দেখতে। কই, রোদে-জলে রামধনু রঙ ঠিকরে পড়ছে কোন্‌খানে? এমন সময়ে একটা সাদা কুকুর নিয়ে খেলতে খেলতে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা বেরিয়ে এল ফোয়ারার ওপাশ থেকে। কুকুরটা যেন তুলোর তৈরি একটা পুতুল—কুকুর না বেড়াল ঠিক বোঝা যায় না। নেহাত খিউ-খিউ করে ডাকছে, তাই কুকুর বলে বিশ্বাস হয়।

"ফোর হাণ্ড্রেড রুপিজ!" সন্টু বলল রঞ্জুর কানে-কানে। বাচ্চা দুটোও ঠিক পুতুলেরই মতো। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালি চুল গালে মুখে ঝাঁপাঝাঁপি করছে, নীল চোখ—ধবধবে ফর্সা, যেন সাহেব বাচ্চা! এই তাদের বসনমামার তুতু-মিতু? বাঃ। রঞ্জু-সন্টু স্তব্ধ। বসনমামার মেয়েরাই ওদের আগে দেখতে পেল। দেখেই একগাল হেসে দিল। বড়টা হাত নেড়ে ডাকল, "হা-ই!" ঠিক যেন সাহেবের মতো উচ্চারণ।

"আমাদের এক্সপেক্ট করছিল মনে হয়।" রঞ্জন বলল সন্টুকে। তারপর ওরাও হেসে বলল, "হা-ই!"

সন্টু বলল, "বাপ রে। বসনমামার বাচ্চাগুলো নিশ্চয় সাহেবদের ইস্কুলে পড়ে। এইটুকু বয়সে এমন প্রোনান্সিয়েশন?"

রঞ্জন বলল, "মঞ্জুটা আসেনি ভালই করেছে। এখানে কেমন যেন বাঙাল-বাঙাল ঠেকছে নিজেদের।"

সন্টু বলল, "ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার্স কিনা, তাই।"

মিষ্টি বাচ্চা দুটো কুকুর নিয়ে এদিকে আসছে দেখে ওরাও পায়ে পায়ে এগোতে থাকে তাদের দিকে। কেবল মুখের হাসিটা একটু ক্যালেনডারের ছবির মতো ফিক্সড হয়ে থাকে সন্টু-রঞ্জুর ঠোঁটে। ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি দানা বাঁধতে থাকে। এমন সময়ে পিঠের ওপরে এক প্রবল থাবড়া, সঙ্গে বসন্ত মামার হুঙ্কার, "আরে-আরে-আরে! কী আনন্দ-কী আনন্দ-কী আনন্দ! সন্টু-রঞ্জু-আইসা পড়ছস? মঞ্জু কই? সদা-পচা-মেন্তি? অরা আসে নাই? চল চল—"

রঞ্জনদের ধড়ে প্রাণ এল। বাব্বা। একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে, "বাঃ, কী সুন্দর তোমার মেয়েরা বসনমামা?"

"হ্যাঁ, চল, ঐদিকে চল—" বসনমামা তাড়া লাগান।

রঞ্জনরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জুনিয়ারের দিকে এগোতে থাকে। বসন্তমামা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানেন, "আঃ হা, ঐদিকে কই যাও? ঐদিকে না, ঐদিকে না। এইদিকে আসো, এইদিকে—"

কে জানে কোনদিকে এনট্রান্স? গারডেন পাথটা দুভাগ হয়ে একটা রাস্তা বাগানের পিছন দিকে চলে গেছে। ওরা সেইটে নেয়। পেছন দিকে বুঝি এনট্রান্স? হবেও বা। ওরা অন্যদিকে বেঁকে যায়। পরীর বাচ্চা দুটো হাত নেড়ে নেড়ে হাসতে থাকে দূর থেকে ''বাই-বাই'' করে না "আয়-আয়'' করে কে জানে?

রঞ্জন বলে, ''তুতুমিতুরা আসবে না?''

বসনমামা বললেন, "আঃ। তাড়াড়া কিয়ের? অ্যাঁঃ? আইব, আইব। টাইমলি আইব।''

হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদ পার হয়ে যায়।

সন্টু বলে, "এনট্রান্সটা ঠিক কোনদিকে বসনমামা? গোটা বাড়িটাই তো পেরিয়ে গেল।''

"আঃ। আইব, আইব। তাড়াড়া কিয়ের শুনি?"

রঞ্জন বলে, "বাচ্চারা তো কই এল না, বসনমামা?''

বসনমামা এবার বললেন, "কাগো কথা কও? ওই নীল-চক্ষুগুলান? ঐগুলা হইব আমার তুতুমিতু? ওই বিড়ালচক্ষু কটাকেশ? ছোঃ! ওইগুলান আমার মাইয়া নাকি? ম্লেচ্ছ! ম্লেচ্ছ! সব কয়ডাই ম্লেচ্ছ! আমেরিকান ছ্যামড়ির পোলাপান। অন্য বাড়িডায় থাকে।''

সামনেই প্রবল ধোঁয়ার পাঁচিল। রঞ্জু-সন্টু দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বাগানে আগুন লেগে গেছে। সন্টু বলে, ''মালীরা বোধহয় শুকনো পাতা জ্বালাচ্ছে—না বসনমামা?''

বসনমামা অন্যমনস্কভাবে বলেন, "ওই হইবখনে কিসু একটা।''

এমন সময় ঐ ধোঁয়ার পাঁচিল ভেদ করে আস্ত আস্ত পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা বেরিয়ে এল একজোড়া। তাদের নাকে সর্দি, চুলে জট। ছুটে এসে তারা বসনমামার হাঁটু জড়িয়ে ধরে "বাবা বাবা" বলে নাকি সুরে নাচতে থাকে। তাদের পেছু পেছু তালপাতার পাখা হাতে উদিত হন তাদের মা। তোলা উনুনটাকে এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। ঐটুকুনি জিনিসের এমনি ধোঁয়ার জোর? ক্রমশ ওরা ধোঁয়া পেরিয়ে এল। পিছনে 'কোয়ার্টার্স' উদ্ভাসিত হল। লাল ইটের তৈরি মিলিটারি ব্যারাকের মতো পাশাপাশি ছ-সাতখানা ঘর, দালান। প্রত্যেকটির সামনে বাগানে একটা করে উনুন ধরানো হচ্ছে। কয়েকটা খাটিয়া ইতস্তত ছড়ানো। একটি খাটিয়ায় বসে একজন গুঁফো ব্যক্তি খৈনি ডলতে ডলতে মন খুলে 'রামা-হো' গাইছেন। ওপাশে একটি টিনের ছাউনি দেওয়া জালের খাঁচা ভর্তি মুরগি ঠাসা। মুরগির ক্যাচরম্যাচর, ভোজপুরী 'রামা-হো' আর তুতু-মিতুর 'বাঁবা! বাঁবা!' ছাপিয়ে ঝলসে উঠল বসন্তমামির গলা, "তুতুমিতু! এক্কেবারে চুপ! নইলে গলা কেটে ফেলব!" ওদিকে কান না দিয়ে বসন্তমামা রঞ্জনের কনুইটা ঠেলে বললেন, ''মুরগি দ্যাখছস? মুরগি? কই সলাম না, যত মানুষ তত মুরগি? ওই দ্যাখ। ঠিক কিনা?'' তারপর মামিকে বলেন, "শুনছ, চাইয়া দ্যাখো কাগো ধইরা আনসি—আমাগো রঞ্জু-সন্টু গো। তুমি অবশ্যি আগে অগো দ্যাখ নাই—দিদিমণির—''

বসন্তমামি শুধু একজনর তাকিয়ে বললেন, "নাই বা দেখলাম আগে। খুব বুঝেছি। তোমার সেই মরা দিদির জ্যান্ত দেওরপোর দল তো? তা, এঁদের ক'দিন থাকা হবে?"

তার পরদিন সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে যে ট্রেনটাকে বসন-মামা খবরদারি করে হাওড়া নিয়ে এলেন, সেই ট্রেনের গার্ডের কামরাতে রঞ্জু-সন্টুকেও বসে থাকতে দেখা গেল ম্লানমুখে।

সেই থেকে রঞ্জন আর বসনমামার গল্প বলে না।

ছবি অনুপ রায়

হেতমগড়ের গুপ্তধন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাধববাবু রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তা মাধববাবুর রাগ হলেও হতে পারে। এমনিতেই তিনি রাগী মানুষ। তার ওপর সাতসকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি দেখেন, কাচের গ্লাসে জলে-ভেজানো তাঁর বাঁধানো দাঁতজোড়া নেই, ঘরে পরে বেড়ানোর হাওয়াই চটি দুটো হাওয়া, চশমাটাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী, ঘরের কোণে দাঁড়িতে ঝোলানো গামছাখানা পর্যন্ত বেপাত্তা।

পল্টনের পোষা বাঁদরটা ছাড়া এ-কাজ আর কার হবে? দিনরাত খেয়ে-খেয়ে আর আশকারা পেয়ে-পেয়ে সেটার চেহারা হয়েছে জাম্বুবানের মতো। কাউকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। এর আগেও দু-চারবার তার চুরিবিদ্যে ধরা পড়েছে। একেই জাতে বাঁদর, তার ওপর অতিরিক্ত আদরে বদ হয়ে যাওয়ায় তার বাঁদরামির আর লেখাজোখা নেই। ইচ্ছেমতো ঘরে ঢুকে তার রেডিও চালায়, ছোটদের পড়ার টেবিলে গিয়ে খাতা-বই বেগোছ করে, পেনসিলের শিস ভেঙে রেখে আসে, দিনের বেলায় খুটখাট সুইচ টিপে আলো জ্বালায় বা শীতকালে পাখা চালিয়ে দেয়। চৌবাচ্চা থেকে মগ দিয়ে জল তুলে যার-তার গায়ে ঢেলে দিয়ে আসে। বড়বাবুর ইজিচেয়ারে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বসে থাকে। কেউ শাসন করতে গেলে বিশাল চেহারা নিয়ে হুপহাপ করে তেড়ে আসে। বলতে কী, তার ভয়ে বাড়ির সবাই কাঁটা হয়ে থাকে।

একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্তে মাধববাবু বিছানা ছাড়েন। তারপর হরেক কাজ করতে হয় তাঁকে। বারান্দার একশো ত্রিশটা টবে গাছে চাকরদের দিয়ে জল দেওয়ানো। পুরনো আমলের বিশাল জমিদারবাড়ির সেই জৌলুস এখন আর নেই বটে, কিন্তু বিশাল আয়তনটা এখনো আছে। আর আছে কিছু পুরনো প্রথা এবং

অভ্যাস। পিছনের দিকে একটা মস্ত হলঘরে হরেক রকম পাখির খাঁচা। মাধববাবুর সকালে দ্বিতীয় কাজ হল, এইসব পাখিদের খাঁচায় ঠিকমতো দানাপানি দেওয়া হচ্ছে কি না তার তদারক করা। তারপরই শুরু হয় চার-চারটে গরুর দুধ দোয়ানো। সে সময়েও তাঁকেই সামনে থাকতে হয়। এরপর বিশাল বাগানের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মালিদের দিয়ে আগাছা উপড়ে ফেলা, ফুলের বেড তৈরি করা, মৌসুমি ফলের চাষ দেখা ইত্যাদি আছে। ভাল করে আলো ফোটার আগেই বাজারের লম্বা ফর্দ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। সঙ্গে ধামাধরা দু-দুটো চাকর। আজ মাধববাবু কিছুই করেননি। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠেই নিজের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলো না-পেয়ে তেড়ে চেঁচামেচি শুরু করলেন। বলি একটা বাঁদরের এত আস্পদ্দা হয় কোত্থেকে? লেজওলাদের বোধহয় লজ্জাশরমের বালাই নেই? বলি আমার বাঁধানো দাঁত তোর গুষ্টির পিণ্ডি চিবোতে লাগবে রে হতচ্ছাড়া? চশমা দিয়ে কোন্ রামায়ণ মহাভারত পড়বি শুনি? গলায় দেওয়ার দড়ি জুটেছে না বলেই বুঝি গামছাখানা নিয়ে গেছিস? ডান-বাঁ জ্ঞান নেই যে বাঁদরের, সে কোন্ আক্কেলে চটি চুরি করে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই চেঁচামেচি শুনে পল্টন সবার আগে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে এসে হাজির।

"কী হয়েছে কাদামামা?"

মাধববাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "বড় সুখের ব্যাপার ঘটেছে ডিয়ার ভাগ্নে, বড় সুখের ব্যাপার। এমনিতেই একদিন সংসার ত্যাগ করে লোটা-কম্বল নিয়ে সন্নিসি হব ভেবে রেখেছিলুম, তা তোমার জাম্বুবানের জ্বালায় সেটা একটু আগেভাগেই হতে হবে দেখছি। দাঁতের পাটি নেই, গামছা নেই, চটি নেই, চশমা নেই, তাহলে একটা লোকের আর কী থাকে বলো দিকি! লোটা-কম্বল আর নেংটি ছাড়া?"

পল্টন মুখ কাঁচুমাচু করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "কিন্তু ঘটোৎকচ তো এখনো শিকলে বাঁধা রয়েছে দেখে এলাম। কাল রাতে তো তাকে আমি খুলে দিইনি।"

মাধববাবু যাত্রাপালার ঔরঙ্গজেবের মতো হাঃ হাঃ করে হাসলেন খুব কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "শিকল? গলার বকলশে একটা সেফটিপিনের মতো ফঙ্গবেনে হাঁসকল দিয়ে আঁটা তো? তা তুমি কি ভাবছ তোমার ঐ হাড়-বজ্জাত মহাবাঁদর সেটা খুলতে বা আটকাতে পারে না? সে কি হাওয়ায় বড় হচ্ছে? সেয়ানা হচ্ছে না?"

পল্টনও সেটা হাড়ে-হাড়ে জানে বলে বিশেষ তর্ক-টর্ক করল না। বাড়ির সবাই যখন ধরেই নিয়েছে যে, দুষ্কর্মটি ঘটোৎকচেরই, তখন সাতজন ঠিকে-ঝিয়ের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কা এবং বকাবাজ হাঁড়ির মা ঘর মুছতে এসে বলল "কাদাবাবুর ঘরের দোর বন্ধ ছিল, জানালায় এত মোটা মোটা শিক, ঐ গন্ধমাদন তবে ঢুকল কোন ফোকর দিয়ে?"

এ কথায় সকলের চোখ খুলে গেল। বাস্তবিক, এই অতি সত্যি কথাটি তো কেউ এতক্ষণ ভাবেনি! ঘটোৎকচ তো আর ছুঁচো ইঁদুর বা বেড়াল নয় যে, জানালা দিয়ে ঢুকবে! বড়বাবু শুনে বললেন, "মাধবের মাথাটাই গেছে।"

মাধববাবুই শুধু এর প্রত্যুত্তরে বলতে লাগলেন, "ফোকর থাক বা না থাক, এ কাজ ঘটোৎকচ ছাড়া আর কারো হতেই পারে না। যেমন করেই হোক সে রাতে ঘরে ঢুকেছিল।"

বড়বাবু শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু ঢুকল কেমন করে সেটা তো বলবে!"

মাধববাবু মরিয়া হয়ে বললেন, "রাতের বেলা আমার তো তেমন ভাল ঘুম হয় না। চারবার উঠি, পায়চারি করি, তামাক বা জল খাই। তারই কোন ফাঁকে ঢুকেছিল।"

কিন্তু মাধববাবুর কথাটা কেউ তেমন বিশ্বাস করল না। এ-বাড়ির বুড়ো দারোয়ান তায়েবজি সাফ-সাফ বলে দিল, "মাধুবাবু কোনোদিন রাতে ওঠেন না। রাতভর তাঁর নাকের ডাকে পাড়ার লোকের অসুবিধে হয়, চোর ডাকু সব তফাত থাকে।"

মাধববাবু এইসব কথায় অল্পস্বল্প রেগে যাচ্ছিলেন। তবে তখনো একদম রেগে টং হয়ে যাননি। তায়েবজির কথার জবাবে বললেন, "আমার ছেলেবেলা থেকেই ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস আছে। এখন আবছা মনে পড়ছে কাল রাতেও আমি খানিকক্ষণ স্লীপ-ওয়াকিং করেছিলাম যেন। দরজা খুলে বারান্দায় এসেও হাঁটাহাঁটি করেছি।"

এসব কথা বলতে বলতে মাধববাবু টের পাচ্ছিলেন যে, তিনি খুবই রেগে যাচ্ছেন। আর কথা চালাচালি হলে এবার তাঁর ভিতরে রাগের বোমাটা ফাটবে। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর মাথার ভিতরে ঠিক ব্রহ্মতালুতে বোমাটা বসানো রয়েছে। বোমার পলতেয় আগুন দেওয়া হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে পুড়তে পুড়তে পলতেটা ছোট হয়ে এসে বোমার গায়ে প্রায় লাগে-লাগে।

ঠিক এই সময়ে অক্ষয় খাজাঞ্চি এসে বলল, "রহিম শেখ পাতুগড়ের আমবাগানটা কিনবে বলে বায়না দিতে এসেছে।"

ব্যস, বোমাটা ফাটল দড়াম করে। সবাইকে চমকে দিয়ে ধমকে ওঠেন মাধববাবু, "ইয়ার্কি পেয়েছ? মস্করা পেয়েছ সবাই? জানো, মাধব চৌধুরী ভাল থাকলে গঙ্গাজল, আর রাগলে মুচির কুকুর?"

রোগাভোগা অক্ষয় খাজাঞ্চি ভয় পেয়ে তিন হাত পিছিয়ে চৌকাঠের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। তায়েবজি তার মোটা গোঁফ চোমরাচ্ছিল, আঁতকে ওঠায় একদিকের গোঁফ আঙুলের টানে ঝুলে পড়ে চিনেম্যানের গোঁফ হয়ে গেল। হাঁড়ির মা ঘর মোছার ন্যাতা দিয়ে ভুল করে নিজের মুখ মুছে ফেলল। বড়বাবুর ইজিচেয়ারটা হঠাৎ একটা দোল খেয়ে গেল জোরে। পল্টনের মুখ এমনভাবে হাঁ হয়ে ছিল যে, একটা বোলতা ভুল করে ঢুকে পড়ল তার ভিতরে আর পল্টনও ভুলে কোঁত করে গিলে ফেলল সেটাকে। বাড়ির আরো লোকজন সব দৌড়ে এসে ভিড় করল চারধারে।

মাধববাবু চেঁচাতে লাগলেন, "জানো, আমার দু' দুটো দোনলা বন্দুক আছে! সরস্বতীর চরে গায়েব হওয়া বসতবাটী খুঁজে পেলে এখনো আমি চার-পাঁচলাখ মোহরের মালিক, তা মনে আছে তো? হিসেব করে কথা কও না, এত আস্পদ্দা তোমাদের?"

অক্ষয় খাজাঞ্চি বাইরে থেকে মৃদু স্বরে বলে, "আজ্ঞে কথাটা হচ্ছিল পাতুগড়ের আমবাগানটা নিয়ে। বৃকোদরের কথা বলিনি আজ্ঞে।"

অক্ষয় খাজাঞ্চি বহুদিন ধরেই ঘটোৎকচকে ভুল করে বৃকোদর বলে আসছেন। বহুবার তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু মনে রাখতে পারেন না।

মাধববাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন, "চালাকির আর জায়গা পেলে না! তোমাদের সব চালাকি আমি জানি। এই মুহূর্তেই আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চললাম। যেখানে মানুষ আত্মসম্মান নিয়ে থাকতে পারে না সেখানে থাকার চেয়ে জঙ্গলে থাকা ভাল। আর শোনো অক্ষয়, তোমাকে এই শেষবারের মতো বলে যাচ্ছি, দ্বিতীয় পাণ্ডব বৃকোদরের সঙ্গে কখনো ঘটোৎকচকে গুলিয়ে ফেলো না। তাতে বৃকোদরের অপমান। ঘটোৎকচ তাঁর ছেলে ছিল বটে, কিন্তু তার মা ছিল রাক্ষসী। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচকে স্যাক্রিফাইস করতে কারো বাধেনি। তোমাদের ঐ নোংরা, পাজি, চোর, হাড়-হাভাতে ঘটোৎকচকেও তোমরা স্যাক্রিফাইস করে দাও। তাতে সকলেরই মঙ্গল। নইলে আর একটা কুরুক্ষেত্র লাগল বলে।"

এই শেষ কথা উচ্চারণ করে মাধববাবু তাঁর দুটো পুরনো দোনলা বন্দুকের বাক্স, শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা আর একটি টিনের তোরঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এমনকী, নিজের দিদির সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলেন না।

দেউড়িতে বড়বাবু, পল্টন, অক্ষয় খাজাঞ্চি, তায়েবজি সমেত বাড়ির বহুলোক তাঁর গৃহত্যাগ রোধ করতে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত করার লোক তিনি নন। এর আগে না হোক পঞ্চাশবার তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে খুবই দক্ষ বলতে হবে। তাই তাঁকে ফেরানো যাবে না জেনে বড়বাবু একটা মোষের গাড়ির বন্দোবস্ত পর্যন্ত রেখেছেন।

বাইরে বেরিয়ে মাধববাবু তাঁর মালপত্র নিয়ে সোজা গিয়ে গাড়িতে চেপে বসলেন।

সরস্বতী নদীর ধারে লাতনপুরে মাধববাবুর এক খুনখুনে বুড়ি পিসি থাকেন। তিনি চেনা লোককেও চিনতে পারেন না, চোখে দেখতে পান না, কানেও শোনেন না। সারাদিন আপনমনে বকবক করতে করতে ঘরের হাজারো কাজ করে বেড়ান। তাঁর ছেলেপুলে আর নাতি-নাতনি নিয়ে বিশাল সংসার। মাধববাবু রাগ করে ঘর ছাড়লে এঁর বাড়িতেই এসে ওঠেন। আজও উঠলেন।

মাধববাবু যেখানেই যান, সেখানেই একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। তিনি দারুণ গল্প বলতে পারেন, এঁটেল মাটি দিয়ে চমৎকার পুতুল গড়তে পারেন, গানবাজনা করতে পারেন। তাই তাঁকে দেখেই বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের কিছু দৌড়ে এসে গাড়ির গায়ে ঝুলতে শুরু করল, কেউ কোলেপিঠে চড়ে বসল, আবার একটু বড় যারা তারা দৌড়ে গেল মাধববাবুর পিসিকে খবর দিতে।

বাইরের ঘরে মাধববাবু জমিয়ে বসেছেন। বাচ্চারা তাঁর বন্দুকের বাক্স, তোরঙ্গ আর বিছানা টানা-হ্যাঁচড়া করে খোলবার চেষ্টা করছে। বাড়ির এক বউ এসে বাতাস দিচ্ছে, এক বউ জলের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে, পিসতুতো ভাইয়েরা এসে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। এমন সময় কোলকুঁজো হয়ে ঘরে ঢুকে পিসি তাঁকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "অচেনা লোক ঘরে ঢুকতে দিয়েছিস! চোর-ছ্যাঁচড় নয় তো! দেখিস আবার বাসন-কোসন কাপড়-চোপড় পোঁটলা বেঁধে না শটকান দেয়। এর মুখচোখ দেখে তো ভাল লোক মনে হচ্ছে না।"

কাদা ছেনে পুতুল গড়েন বলেই মাধববাবুর ডাকনাম কাদা। পিসির বড় ছেলে গদাই দৌড়ে গিয়ে মায়ের মুখে হাতচাপা দিয়ে কানে কানে বলে, "অচেনা লোক কী গো! কাদাদাদা যে।"

পিসি তা বুঝল না, তবে এক গাল হেসে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, "তুমিও বুঝি ঐ লোকটার সঙ্গে এলে! দেখো বাপু, চুরি-টুরি কোরো না। থাকো, ঘরের কাজকর্ম করো, খাবে দাবে মাইনে পাবে।" বলে পিসি চলে গেল।

নেয়ে-খেয়ে ঘুমিয়ে বিকেলের দিকে একটা বন্দুক বগলদাবা করে মাধববাবু নিজেদের হারানো বসতবাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। রাগ হলেই মাধববাবুর এই বাতিকটা মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, মাধববাবুর পিতৃ-পিতামহের অবস্থা ছিল বিরাট। সরস্বতী নদীর ওধারে হেতমগড়ে প্রায় দেড়শো বিঘা জমি ঘিরে ছিল তাঁদের বাড়ির সীমানা। মাঝখানে প্রাসাদের মতো বাড়ি, ফোয়ারা, আস্তাবল, জুড়িগাড়ি, গোলাপ বাগিচা, পদ্মের পুকুর। সরস্বতীর খাত বদল হওয়ায় নদীর ভাঙনে সব ভেসে গেছে। এখন আর সে বাড়ির চিহ্নও নেই। এমনকী, বাড়িটা কোন্ জায়গায় ছিল তারও হদিস কেউ দিতে পারে না। সরস্বতীর ওপারে এখন বিশাল ঘন জঙ্গল, সাপখোপের আড্ডা, বুনো জন্তুর আস্তানা। তবু মাঝে-মাঝে মাধববাবু সেই বাড়িটা খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন।

নদীর এধারে আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে মাধববাবু নিজের রাগের কথা ভাবছিলেন। আর মাঝে-মাঝে নদীর ওধারে ঘন জঙ্গলের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। মধ্যে-মধ্যে হেসেও ফেলছিলেন আপনমনে। জমিদারি রক্তে রাগ থাকাটা এমনিতেই স্বাভাবিক। কিন্তু রহিম শেখের আমবাগান কেনার কথায় হঠাৎ মাথার মধ্যে বেকায়দায় বোমাটা ফেটে যাওয়াতে এখন তাঁর একটু লজ্জা-লজ্জা করছে। কোথায় ঘটোৎকচ, আর কোথায় রহিম শেখ।

মাধববাবুর বাঁধানো দাঁতের কথা শুনে কেউ তাঁকে বুড়ো ভাবলে ভুল হবে। বলতে কী, মাধববাবু রীতিমত যুবক মানুষ। বয়স বত্রিশ-টত্রিশ হবে। বছর পাঁচ-সাত আগে বিজয়পুরের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু সে বিয়েটাতেই যত ভন্ডুল লেগেছিল। বিয়ের পরদিন সকালে শালীরা আদর করে এক থালা নারকেলনাড়ু এনে দিল। বলল, সব কটা খেতে পারলে বুঝব জামাইবাবু আমাদের বাহাদুর। শালীরা জামাইবাবুকে নানা কায়দায় জব্দ করে জেনেও অকুতোভয় মাধববাবু ঠিক করলেন, এদের কাছে হার মানা চলবে না। প্রথম নাড়ুটায় কামড় দিয়েই দেখলেন ভিতরে গোটা সুপুরি রয়েছে। কিন্তু এখন আর ফেরার উপায় নেই। দাঁতের জোর ছিল খুব। তাই খটাস মটাস শব্দে সুপুরিসুদ্ধু সেই নাড়ু চিবোতে লাগলেন। গোটা পাঁচেক খেতে পেরেছিলেন বোধহয়। কিন্তু তা করতে অর্ধেক দাঁতের চলটা উঠে গেল, কিছু নড়ল, কিছু ভাঙল। রাগ করে সেই যে শ্বশুরবাড়ি থেকে একবস্ত্রে চলে এলেন, আর কোনোদিন ওমুখো হননি। দাঁতগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই তুলে বাঁধিয়ে নিতে হল। কিন্তু যুবক হলেও বাঁধানো দাঁতগুলোর অভাবে ফোকলামুখে এখন তাঁকে রীতিমত বুড়ো দেখাচ্ছে। কিন্তু তিনি যে বুড়ো নন সেইটে লোকের কাছে প্রমাণ করার জন্য বুক চিতিয়ে চওড়া ছাতি ফুলিয়ে খুব দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছিলেন তিনি।

তবে তার দরকার ছিল না। নদীর ধারে একটা লোককে বন্দুক হাতে চলাফেরা করতে দেখে লোকজন ভয়ে এমনিতে তফাত থাকছিল।

বড় বাঁধের ধারে হাইস্কুলের মাঠে আজ ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ। দারুণ ভিড় চারদিকে। সেই ভিড়ে ছুঁচ গলবার উপায় নেই। লাতনপুর হাইস্কুলের সঙ্গে হেতমগড় বিদ্যাপীঠের খেলা। খেলা দেখেই মাধববাবুর রক্তটা ঝাঁ করে গরম হয়ে গেল। নিজে তিনি এক সময়ে দুর্দান্ত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু সেজন্য নয়। আসলে হেতমগড় নামটাই তাঁর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল। সেই হেতমগড় আজ আর নেই। সরস্বতীর বানে পুরনো হেতমগড় ভেসে গিয়ে আবার নতুন করে হেতমগড়ের পত্তন হয়েছে। তবু হেতমগড় নামটাই যথেষ্ট। এই হেতমগড় বিদ্যাপীঠেই তিনি পড়তেন। তাঁর আমলে বিদ্যাপীঠ কখনো হারেনি।

মাধববাবু ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেন এমনই ঠাসা ভিড় যে, লোকগুলোকে যেন আঠা দিয়ে এর-ওর গায়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাধববাবুর ধৈর্য কম। ঝাঁ করে বন্দুকের নলটা ভিড়ের ভিতরে সেঁদিয়ে দিয়ে হুংকার ছাড়লেন, "রাস্তা না দিলে গুলি চালাব কিন্তু।"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই লাতনপুর হেতমগড়কে তিন নম্বর গোলটা দেওয়ায় মাঠে এমন চেঁচামেচি উঠল যে, মাধববাবুর গলার স্বর কারো কানে পৌঁছল না। তবে লোকগুলো উল্লাসের চোটে বেহেড হয়ে নাচতে শুরু করায় মাধববাবুর একটু সুবিধে হয়ে গেল। লোকে যেমন দু হাতে গাছ ফাঁক করে পাটখেতে ঢোকে তিনিও তেমনি নৃত্যরত লোকগুলোকে বন্দুকের কুঁদো আর হাত দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং একেবারে সামনের সারিতে চলে এলেন। মাধববাবু যে বে-আইনিভাবে
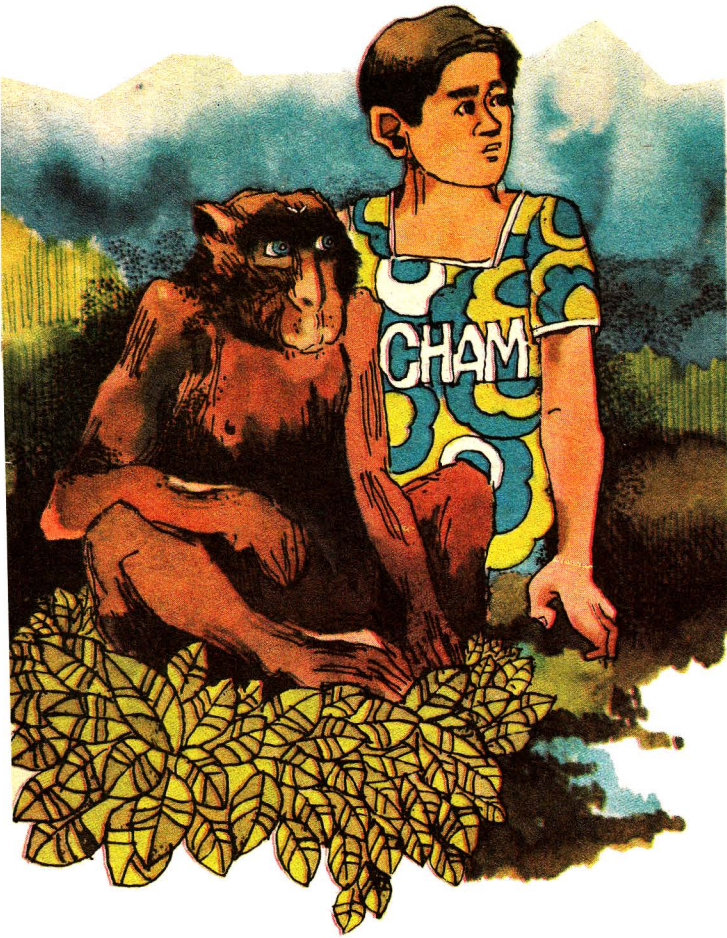
ঢুকছেন সেটা সামনের সারির লোকেরা কতকটা বুঝলেও তাঁর হাতে বন্দুক দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস পেল না।

তিন গোল খেয়ে হাফটাইমের আগেই হেতমগড় হেদিয়ে পড়েছে। প্লেয়াররা যেন সব কোমরসমান জল ভেঙে হাঁটছে এমন করুণ অবস্থা। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে অন্তত আধ ডজন গোল খাবেই। ভবতারিণী স্মৃতি শীল্ড বলতে গেলে লাতনপুরের পকেটে। মাধববাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ইশ ইশ! চুকচুক! ছিঃ ছি! রাম রাম! দূর দূর! ঘেন্না ঘেন্না! লজ্জা লজ্জা! করতে লাগলেন।

হেতমগড় হাফটাইমের আগে আর গোল খেল না ভাগ্যক্রমে। তবে বাঁশি বাজতেই হেতমগড়ের সব প্লেয়ার মাঠের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে ঘাসে মুখ লুকোল।

মাধববাবু আর থাকতে পারলেন না। হেতমগড়ের গৌরব-রবি অস্তে যায় দেখে তিনি বন্দুক বগলে চেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠে নেমে পড়লেন। দৃশ্যটা দেখে চারদিকে একটা বিকট চেঁচামেচি উঠল। কিন্তু মাধববাবু গ্রাহ্য করলেন না।

প্লেয়াররা মাঠের ঘাসে শুয়ে দম নিচ্ছে। সকলেরই চোখ বোজা। খানিক লজ্জায়, খানিক ক্লান্তিতে। তাদের গেম-স্যার প্রিয়ংবদবাবু পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো পায়চারি করতে করতে গাধা, উল্লুক, বেতো ঘোড়া, ম্যালেরিয়া রুগি, বার্লিখোর এই সব বলে বকাবকি করছেন। এই সময়ে মাধববাবু গিয়ে প্রিয়ংবদবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বললেন, "আমাকে চিনতে পারছ প্রিয়?"

প্রিয়ংবদ চিনতে পারলেন, এক সময়ে হেতমগড় বিদ্যাপীঠে একসঙ্গে পড়তেন। প্রিয়ংবদ ছিলেন লেফট আউট আর মাধব ছিলেন রাইট আউট। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রিয়ংবদ বললেন, "তুমি! তা কী খবর? মুখখানা ফোকলা কেন? হাতে বন্দুক কেন?"

মাধবের মাথায় আবার একটা রাগের বোমা ফাটবার জন্য অপেক্ষা করছে। পলতের আগুন বোমার গায়ে লাগে লাগে। তবু যথাসাধ্য অমায়িক হেসে মাধব বললেন, "বন্দুক দেখে ভয় পেলে নাকি প্রিয়? ছ্যাঃ ছ্যাঃ! তোমাকে যে বেশ সাহসী লোক বলে জানতাম।"

তা, বলতে নেই, প্রিয়ংবদ একটু ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই। মাধবের ধাত তিনি ভালই জানেন। মাধবের ঠাকুর্দা রাগ হলে বন্দুক পিস্তল তরোয়াল তো বের করতেনই, তার ওপর আবার নিজের মাথার চুল দু হাতে টেনে ছিঁড়তেন। তাই অল্প বয়সেই মাথায় টাক পড়ে গেল। বলতে কী, সেই রাগ আর টাকই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টাক পড়ার পর একবার রেগে গিয়ে যখন মাথার চুল ছিঁড়তে গিয়ে দেখলেন যে, চুল আর একটাও অবশিষ্ট নেই তখন নিজের টাকের ওপর রেগে গিয়ে দমাস দমাস করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে খুলিটাই ফেটে গেল। মাধবের বাবা ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক। তা বলে রাগ তাঁরও কম ছিল না। রেগে গিয়ে পাছে মানুষ খুন করে বসেন সেই ভয়ে প্রায় সময়েই তিনি রেগে গেলে খুব লম্বা কোনো নারকোল বা তাল গাছে উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। কিন্তু এত ঘন ঘন তাঁর রাগ হত যে, একটা জীবন তাঁর প্রায় গাছের ওপর বসে থেকেই কেটে গেছে। সেই রক্তই মাধবের ধমনীতে বইছে। সুতরাং ভয়েরই কথা। তাই প্রিয়ংবদ কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "সারা বছর ধরে এত করে খেলা শেখালাম, কিন্তু ছেলেগুলো একেবারে শেষ সময়টায় ভরাডুবি ঘটাবে কে জানত?"

মাধব খুব মিষ্টি করে বললেন, "সে তো ঠিকই, কিন্তু তা বলে হেতমগড়ের ইজ্জত তো ভেসে যেতে পারে না। হেতমগড় জায়গাটা ভেসে যেতে পারে, কিন্তু ইজ্জত নয়।" এই বলে মাধব হঠাৎ বিকট হুংকার ছেড়ে বললেন, "বুঝলে?"

প্রিয়ংবদ চমকে তিন হাত শূন্যে উঠে আবার পড়লেন। হেতমগড়ের খেলোয়াড়রা শোয়া অবস্থা থেকে ভিরমি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মাধববাবু নিজের ব্যক্তিত্বের জোর এবং তেজ দেখে একটু খুশিই হলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং প্রাইজ দিতে মাঠে এসেছেন। সুতরাং প্রচুর পুলিস আর পাহারার ব্যবস্থাও মাঠে ছিল। মাধববাবুকে বন্দুক হাতে মাঠে নেমে গুণ্ডামি করতে দেখে সেই সব পুলিস চারদিক থেকে খুব সতর্কভাবে ঘিরে ধরে ক্রমে বৃত্তটা ছোট করে আনছিল। মাধববাবু রাগের মাথায় অতটা লক্ষ করেননি। হঠাৎ তিন-চারটে মুশকো জোয়ান তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ে হাত-পা ধরে ফেলায় তিনি ভারী হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, "এ কী!"

পুলিস ইনস্পেকটর এগিয়ে এসে বললেন, "প্রকাশ্য জায়গায় ফায়ার আর্মস নিয়ে গুণ্ডামি করার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।"

মাধববাবুর মাথার মধ্যে বোমার পলতের আগুনটা হঠাৎ নিভে গেল। বলতে নেই, দুনিয়ায় একমাত্র পুলিসকেই তাঁর যত ভয়। মাথা নিচু করে পুলিসে ঘেরাও মাধববাবু মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন।

মাঠের দক্ষিণ কোণ থেকে পুরো ব্যাপারটাই পল্টন আর ঘটোৎকচ লক্ষ করছিল। ঘটোৎকচের মেজাজ ভালই আছে। গোটা দশেক কলা আর গোটা ত্রিশেক জামরুল খাওয়ার পর সে এখন পোয়াটাক বাদামভাজা নিয়ে খুব ব্যস্ত। বাদামভাজা পল্টনের জামার পকেটে। সুতরাং ঘটোৎকচকে সেটা চুরি করে খেতে হচ্ছে।

কিন্তু মাঠে মাধববাবুর পরিণতি দেখে পল্টন এমন হাঁ হয়ে গেছে যে, পকেটমারের ঘটনাটা টেরই পায়নি। হঠাৎ সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, "কাদামামাকে ধরে নিয়ে গেল যে রে ঘটোৎ!"

হেতমগড় যে কাদামামার কত গর্বের বস্তু সেটা সবাই জানে। হেতমগড় হেরে যাচ্ছিল বলেই উনি মাঠে নেমে হম্বিতম্বি করছিলেন বটে, কিন্তু সেটা যে কাউকে খুন করার জন্য নয় এ তো বাচ্চাদেরও বোঝবার কথা। তবে কিনা মাধববাবুকে চেনেই বা ক'জন? না-চিনলে লোকে বুঝবেও না।

রেফারী বাঁশি বাজাচ্ছে, খেলা আবার শুরু হল বলে, পল্টন নিঃশব্দে ঘটোৎকচের গলার বকলশ থেকে শিকলের আংটা খুলে নিয়ে কানে-কানে কী যেন শিখিয়ে দিল।

এদিকে সেন্টার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই লাতনপুরের ফরোয়ার্ডরা বল ধরে ব্যাঘ্র-বিক্রমে হেতমগড়ের গোলে হানা দিল। রাইট উইং থেকে বল চমৎকারভাবে ব্যাক সেন্টার হয়েছে। রাইট ইন বল ধরেই থ্রু করে বলটা এগিয়ে দিল। একেবারে রসগোল্লার মতো সহজ বল। পা ছোঁয়ালেই গোল। তা পা প্রায় ছুঁইয়ে ফেলেওছিল লাতনপুরের লেফট ইন। কিন্তু মুশকিল হল. বলটার নাগাল না পেয়ে। দিব্যি সুন্দর বলটা একটু ধীরগতিতে গড়িয়ে যাচ্ছিল সামনে, লেফট ইন ছুটে গিয়ে পজিশন নিয়ে শট করতে পা'ও তুলেছে, ঠিক এই সময়ে একটা অতিকায় বানর কোত্থেকে এসে বলটাকে কোলে তুলে এক লাফে গোলপোস্টের ওপরে উঠে গেল। তারপর লেফট ইনকে মুখ ভেংচে বলটা মাঠের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরতর করে নেমে পালিয়ে গেল।

মাঠে কেউ কেউ প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। কেউ রাগে গরগর করতে লাগল। কেউ বলল, 'ধর ওটাকে, ধর।' রেফারী বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে জড়ো করে বললেন, "এটা একটা ন্যাচারাল ডিসটারবেনস। সুতরাং ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু হোক।"

লাতনপুর গোল দিতে না পেরে হতাশ, হেতমগড় চতুর্থ গোলের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ায় বেশ চাঙ্গা। ফলে ড্রপ দেওয়ার পর হেতমগড়ের খেলোয়াড়রা প্রাণপণ চেষ্টায় লাতনপুরের সীমানার মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে পড়ল।

অবশ্য গোল হওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তবু হেতমগড়ের রাইট উইং মরিয়া হয়ে লাতনপুরের গোলে একটা অত্যন্ত দুর্বল শট নিয়েছিল। শট এতই দুর্বল যে গোলের দিকে যাওয়ার আগে দুবার মাটিতে ড্রপ খেল। লাতনপুরের ব্যাকরা ভাবল, গোলকীপারই বলটা ধরুক। তাই নিজেরা আর গা ঘামাল না। গোলকীপার নিশ্চিতমনে বলটা ধরার জন্য এগিয়েও এসেছিল। এই সময়ে হঠাৎ গোলপোস্টের মাথা থেকে ঘটোৎকচ বিকট একটা 'হুপ' দিল, তারপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড অঙ্গভঙ্গি করে নাচ জুড়ে দিল। সেই সঙ্গে 'কুক-কুক' করে বাঁদুরে গান।

গোলকীপার একটা বাচ্চা দুধের ছেলে। বাঁদরের এই বীভৎস নাচ-গান দেখে সে এমনই ঘাবড়ে গেল যে, বলটার কথা তার মনেই রইল না। বলটা তার সামনেই ড্রপ খেয়ে তার হাত ছুঁয়ে প্রায় বগলের তলা দিয়ে খুব অনিচ্ছের সঙ্গে গোলে গিয়ে ঢুকে গেল।

রেফারী গোলের বাঁশি বাজালেন। লাতনপুর প্রতিবাদ জানালে রেফারী বললেন, "বাঁদরটা চেঁচিয়েছে বটে, নাচও

দেখিয়েছে, কিন্তু সে তো দর্শকরাও হামেশাই দেখায়। সুতরাং ওতে আইনভঙ্গ হয় না।”

সুতরাং হাফটাইমের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফল দাঁড়াল ৩—১। মাঠে এমন হইচই পড়ে গেল যে কান পাতা দায়।

গোল খেয়ে যেমন একটু বোমকে গেল লাতনপুর, গোল দিয়ে তেমনি চুমকে উঠল হেতমগড়। সুতরাং খেলাটা আর এক তরফা রইল না। লাতনপুরের বিখ্যাত হাফব্যাক ফটিক বল ধরে হরিণের মতো দৌড়ে লেফট-ইনকে বল বাড়াল একবার। লেফট-ইন নিখুঁত একটা ভলি গোলে মেরে দিল। হেতমগড়ের গোলকীপার মাটিতে পড়ে আছে, বল জালে ঢুকছে, ঠিক এই সময়ে আবার বাঁদরে কান্ড। ঘটোৎকচ ঝুপ করে যেন আকাশ থেকে দৈব বাঁদরের মতো নামল এবং বলটা পট করে ধরে আবার গোলপোস্টে উঠে গেল। লাতনপুর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গোলের দাবি করতে লাগল। কিন্তু রেফারী কঠিন স্বরে বললেন, গোলে বল না ঢুকলে গোল দেওয়ার কোনো আইন নেই। সুতরাং আবার ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু হল। হেতমগড়ের খেলুড়েরা দারুণ উৎসাহের চোটে বল লেনদেন করতে করতে ঢুকে পড়ল লাতনপুরের এলাকায়। লাতনপুরের গোলকীপার থেকে শুরু করে সব খেলুড়েই বাঁদরাতঙ্কে কণ্টকিত। তারা এই সময়ে বাঁদরের হস্তক্ষেপ আশঙ্কা করে চারদিক চাইছে, সকলেরই দোনো-মোনো ভাব, বাঁদরটা কখন কোন্ দিক থেকে হানা দেয়। আর এই দোনো-মোনোর ফলেই হেতমগড়ের রাইট লিংকম্যান ষষ্ঠীচরণ মনের সুখে একখানা ফাঁকা জমি ধরে এগিয়ে গিয়ে গুপ করে জোরালো শটে গোল দিয়ে দিল। ফল ৩—২।

সেকেন্ড হাফের পনেরো মিনিটের মধ্যেই খেলার হাওয়া উল্টো দিকে বইতে থাকে। হেতমগড় বুঝতে পেরেছে স্বয়ং সৌভাগ্যই আজ বাঁদরের রূপ ধরে এসে তাদের পক্ষ নিয়েছে। আর লাতনপুর ভুগছে বাঁদরের আতঙ্কে। সুতরাং দ্বিতীয় গোলটার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ষষ্ঠীচরণ আবার এগোল এবং বল পাস করল রাইট উইংকে। রাইট উইং বল ধরে ধনুকের মতো বাঁকা পথে ছুটতে লাগল হরিণের মতো। ওদিকে গোলপোস্টের মাথায় ঘটোৎকচ উঠে বসে আছে এবং গোলকীপারের নাকের ডগায় নিজের লম্বা লেজটা নামিয়ে দিয়ে খন্ড ত দেখাচ্ছে। লাতনপুরের গেম - স্যার জয়পতাকাবাবু একটা পোলভল্টের বাঁশ নিয়ে বাঁদরটাকে তাড়া করতে দৌড়োচ্ছেন। রাগী ও রাশভারী জয়পতাকা-স্যারকে বাঁশ নিয়ে দৌড়োতে দেখে লাতনপুরের খেলোয়াড়রা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ফাঁকে রাইট উইং খুব সহজেই গোলে বল ঢুকিয়ে ফল ৩—৩ দাঁড় করিয়ে দিল। রেফারী বাঁশি বাজানোর পর লাতনপুরের খেলোয়াড়রা অবাক হয়ে দেখল, তারা আর-একটা গোল খেয়ে গেছে।

জয়পতাকা-স্যার অবশ্য ঘটোৎকচকে বাঁশপেটা করতে ব্যর্থ হলেন। কারণ ঘটোৎকচ হঠাৎ একটা ডিগবাজি খেয়ে নেমে জয়পতাকাবাবুর ধুতির কাছা এক টানে খুলে ফেলে হাতের বাঁশটা কেড়ে নিয়ে দৌড়। চারদিকে প্রচন্ড চেঁচামেচি, হাসাহাসি পড়ে যাওয়ায় রাশভারী ও রাগী জয়পতাকা-স্যার নিজের কাছা আঁটতে-আঁটতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, “ডিসিপ্লিন! ডিসিপ্লিন!”

খেলা আবার শুরু হল বটে, কিন্তু লাতনপুরের ততক্ষণে সব উৎসাহ নিভে গেছে, দমও ফুরিয়ে এসেছে। খেলায় তারা মনোযোগই দিতে পারল না। সুতরাং ঘটোৎকচ আর হানা না দেওয়া সত্ত্বেও হেতমগড় গুনে গুনে আরো দুটো গোল দিল লাতনপুরকে।

হেতমগড়ের ক্যাপটেনের হাতে ভবতারিণী স্মৃতি শীল্ড তুলে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, “পশুপাখি যে মানুষের

কত উপকারে লাগে, তা বলে শেষ করা যায় না। পশুপাখির কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।'' এর পর লাতনপুরের ক্যাপটেনের হাতে রানার্স আপের পুরস্কার তুলে দিয়ে তিনি বললেন, "কিছু কিছু পশুপাখি যে মানুষের কত অপকার সাধন করে তার হিসেব নেই। এইসব অপকারী পশুপাখির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করাটা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে নিতে হবে।''

দুরকম কথাতেই দর্শক ও শ্রোতারা খুব হাততালি দিল।

ওদিকে থানার লক-আপে চারটে চোরের সঙ্গে এক কুঠুরিতে আবদ্ধ মাধববাবু এতসব খবর জানেন না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন আর হেতমগড়ের হেরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। বিকেলে চা খাওয়ার অভ্যাস, কিন্তু লক-আপে চা জোটেনি বলে মাথাটা টিপটিপ করছে। বাঁধানো দাঁত, গামছা ও চটির শোকও উথলে উঠছে বুকের মধ্যে। সেই সঙ্গে পৈতৃক মোহরের কথা ভেবেও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন।

এমন সময়ে চারজন চোরের মধ্যে একজন একটু সাহস করে বলল, "হেতমগড়ের কুমার-বাহাদুর না?''

মাধববাবু চোখ খুললেন। এতক্ষণ লজ্জায় তিনি এই চারটে লোকের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখেননি। এখন দেখলেন, চারজনের মধ্যে যে লোকটা সবচেয়ে বুড়ো সেই পাকা চুল আর পাকা দাড়িওলা লোকটা জুলজুল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। মাধববাবু খানিকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে ম্লান একটু হেসে বলেন, "তুমি বনমালী! তাই বলো।''

বনমালী ছিল হেতমগড়ে মাধবদের বাড়ির মালি। দারুণ সুন্দর সব ফুল ফোটাতে আর ফল ফলাতে তার জুড়ি ছিল না। তবে যাকে বলে ক্লিপটোম্যানিয়াক, বনমালী ছিল তাই। চুরি করা ছিল তার মজ্জাগত কু-অভ্যাস। চুরি করতে না পারলে তার পেট ফাঁপত, আইঢাই হত, রাতে ঘুমোতে পারত না ভাল করে। সোনাদানাই হোক বা সেফটিপিন, নস্যির কৌটো, কাচের চুড়ি যাই হোক, কিছু-না-কিছু তাকে চুরি করতেই হবে। চুরি করে বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কেবল জিনিসগুলি নিয়ে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে দিত। তাই বনমালীর চুরি-বিদ্যের জন্য তাকে কেউ খারাপ চোখে দেখত না। এমনকী, যাতে সে চুরির অভ্যাস বজায় রাখতে পারে তার জন্য বাড়ির এখানে-সেখানে জিনিসপত্র ফেলে রাখা হত। তারপর তার ঘর থেকে একসময়ে গোপনে সেগুলি উদ্ধার করেও আনা হত।

বনমালী অবাক হয়ে বলে, "আপনাকে কয়েদ করেছে এত-বড় সাহস পুলিসের হয় কী করে?''

মাধব ম্লান মুখে বলেন, "সে অনেক কথা। সে সব না তোলাই ভাল। তুমি কেমন আছ বলো!"

বনমালী দুঃখ করে বলল, "হেতমগড় ভেসে যাওয়ার পর আর কাজকর্ম জোটেনি। চেয়েচিন্তে দিন কাটে। গাছপালা ছাড়া থাকতে পারি না বলে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। আর কিছু লোক চুরিবিদ্যে শিখিতে আমার কাছে আসে, তাদের শেখাই। কিন্তু আজকালকার ছ্যাঁচড়াগুলো এত লোভী যে, বিদ্যেটা ভাল করে না-শিখেই হামলে চুরি করতে যায় আর ধরা পড়ে বে-ইজ্জত হয়। এই দেখুন না, এই তিনটে স্যাঙাতকে বিদ্যেটা সবে শেখাতে শুরু করেছিলাম, তা বাবুদের তর সইল না। ভাল করে না-শিখেই থানার পুকুর থেকে মাছ চুরি করতে গিয়ে ধরা-টরা পড়ে একশা। নিজেরা তো ধরা পড়লই, আবার পিঠ বাঁচাতে আমার নামও পুলিসকে বলে দিল। তাই কপালের ফেরে জেলখানায় বসে আছি। কিন্তু ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। হাজতে আটক না থাকলে আপনার সঙ্গে দেখাই হত না।''

মাধব বনমালীকে বহুকাল বাদে দেখে খুশি হলেন। এক সময়ে বনমালীর কোলেপিঠে চড়েই মানুষ হয়েছেন। বললেন, "কথাটা খুব খাঁটি। তবে কিনা হাজতে আসা বা থাকাটা আমার তেমন পছন্দ নয় হে, বনমালী।"

বনমালী এক গাল হেসে বলল, "আপনাকে বেশিক্ষণ হাজতে থাকতে হবে না, কর্তা। সে-ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।''

তারপর এক রোগা-পাতলা চেহারার স্যাঙাতের দিকে চেয়ে বনমালী হুকুম দিল, "বিষ্টু, ওঠ।''

বিষ্টুকে এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেননি মাধব। এবার করলেন এবং একটু অবাক হয়ে গেলেন। বিষ্টুর হাবভাবের মধ্যে বেশ একটা বাঁদুরে ভাবভঙ্গি আছে। দাঁড়ানোর সময় একটু কুঁজো হয়ে থাকে, লম্বা রোগা হাত দুখানা সামনের দিকে ঝুল খায়। মাঝে-মাঝে বাঁদরের মতো গা-চুলকানোর স্বভাবও তার আছে। হুকুম পেয়ে সে হাজতঘরের একটা কোণে গিয়ে সমকোণ দুই দেয়ালের খাঁজে দাঁড়াল। তারপর গুরু বনমালীর দিকে ফিরে একটা নমস্কার জানিয়ে দুদিকের দেয়ালে হাত আর পা চেপে টিকটিকির মতো ওপরে উঠে যেতে লাগল। দৃশ্যটা দেখে মাধব হাঁ। ঘটোৎকচেরও যে এমন এলেম নেই!

অনেক ওপরে, ছাদের কাছ বরাবর একটা গরাদ লাগানো ঘুলঘুলি আছে। তা দিয়ে বাইরে সদর রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়। বিষ্টু ওপরে উঠে সেই ঘুলঘুলি দিয়ে ভাল করে বাইরেটা দেখে নিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল। নাক বাড়িয়ে বাতাসটা বোধহয় শুঁকলও একটু। বনমালী মাধবের দিকে চেয়ে বলল, "এ তেমন কোনো কেরদানি নয়, কর্তা। এ হল টিকটিকি বিদ্যা। ওস্তাদের ওপর ভক্তি আর বিদ্যে শেখার 'হাউস' থাকলে এসব শেখা তেমন কোনো শক্ত কাজ নয়।''

মাধব জবাব দিতে পারলেন না। বিষ্টু খানিকক্ষণ ওপরে থেকে আবার নেমে এল। বলল, "সিপাইরা বেশি নেই। রাস্তা-ঘাট খুব থমথম করছে। তার মানে আজকের খেলায় লাতনপুর জিততে পারেনি। আর-একটা খুব অবাক কাণ্ড দেখলাম। ঘুল-ঘুলির ওপাশে একটা কাঁঠাল গাছের ডালে মস্ত একটা বানর বসে আছে, তার কোলে একটা ফুটবল। আমাকে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পেয়ে হুপ হুপ করে কী যেন বলল। ভাষাটা ঠিক বুঝলাম না।''

মাধব হেসে বললেন, "জাতভাই বলে বাঁদরটা তোমাকে চিনতে পেরেছে যে! চেষ্টা করলে ভাষাটা আয়ত্ত করা তেমন শক্ত হবে না তোমার। বাঁদরের আর সব কিছু শিখতে তো বাকি রাখোনি বাপু, ভাষাটা আর কত কঠিন হবে? বলতে-বলতেই মাধববাবুর কী একটা খেয়াল হয়। তিনি একটু থেমে চেঁচিয়ে ওঠেন, "বাঁদরটা কি খুব বড়?''

"বড়ই।'' বিষ্টু জবাব দেয়।

ঘটোৎ নয় তো? মাধববাবু চিন্তিত মুখে আপনমনে বলতে লাগলেন, "কোলে ফুটবল দেখলে? ব্যাপারটা খুব ঘোরালো ঠেকছে তো! শহরটাই বা থমথম করবে কেন? লাতন-পুর হাফটাইমের আগেই তিন গোল দিয়েছে দেখে এসেছি। হাফটাইমের পর আরো তিনটে দেওয়া তাদের কাছে শক্ত নয় মোটেই।''

ঠিক এই সময়ে রাস্তা দিয়ে বিরাট শোরগোল তুলে একটা মিছিল এল। "...ভবতারিণী স্মৃতি শীল্ড জিতল কে? হেতমগড় আবার কে?...হেরে হয়রান হল কে? লাতনপুর, আবার কে?...''

বিড়বিড় করে মাধববাবু বললেন, "আশ্চর্য! পরমাশ্চর্য! পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য!"

বনমালী তার স্যাঙাতদের নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে

ফিসফিস করে কী পরামর্শ দিচ্ছিল। মাধব মাথায় হাত দিয়ে বসে হাজারো কথা ভাবছিলেন। ভরতারিণী স্মৃতি শীল্ড। বাঁধানো দাঁত। হেতমগড়ের হারানো মোহর। ঘটোৎকচের কোলে ফুটবল। ভাবতে-ভাবতে মাথা ঝিমঝিম করায় একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলেন।

হঠাৎ লোহার গেট খুলবার শব্দ হল। ঘরে এসে দাঁড়ালেন থানার নতুন দারোগা নবতারণ ঘোষ। ছ ফুট লম্বা বিভীষণ চেহারা, দুটো চোখ আলুর মতো গোল আর টর্চবাতির মতো জ্বলজ্বলে, হাত দুটো দেখলে মনে হবে ঐ দুই হাতে একটা মোষের মাথা তার ধড় থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। দারোগা হিসেবে নবতারণের সাঙ্ঘাতিক নামডাক।

নবতারণ মাধবের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার অপরাধ খুবই গুরুতর। পাবলিক প্লেসে আপনি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছেন। সুতরাং কঠিন শাস্তির জন্য তৈরি হোন।"

মাধববাবু বরাবরই পুলিসের ভয়ে আধমরা। দুনিয়ায় আর কোনো-কিছুকে গ্রাহ্য না করলেও কেবল এই পুলিসই তাঁকে কাবু করে রেখেছে। পুলিস দেখলে তাঁর রাতে ঘুম হয় না, খাওয়া কমে যায়, পেটের মধ্যে অনবরত গুড়গুড় করতে থাকে। এখনো করছিল। তাই তিনি ভ্যাবাচ্যাকা মুখে নবতারণের দিকে চেয়ে ছিলেন।

নবতারণ বনমালীর দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার হিস্টরিও আমি সব জানি। এ-অঞ্চলের যত চোর ডাকাত আর বদমাশ সব তোমার কাছে ট্রেনিং নেয়। ট্রেনার হিসেবে তুমি খুবই উঁচু-দরের সন্দেহ নেই। কিন্তু আমিও অতি উঁচুদরের দারোগা, এটা ভুলে যেও না। তুমি হাজত থেকে ইচ্ছে করলেই পালাতে পারো, তাও আমি জানি। সেইজন্য আমি বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছি। সদর থেকে চারটে বাঘা কুকুর আনা হয়েছে, তারা দিনরাত থানা পাহারা দেবে। ভাল ট্রেনিং পাওয়া দু ডজন স্পেশাল সেপাইও আনা হয়েছে তোমাদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার জন্য। তাছাড়া আমি তো আছিই। লোকে বলে, আমার নাকি দশ জোড়া চোখ, দশটা হাত আর দশটা মগজ। কাজেই খুব সাবধান!"

এই বলে নবতারণ চলে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বনমালী কাচুমাচু মুখ করে বলল, "কর্তা, ব্যাপারটা খুব সুবিধের ঠেকছে না। কাল অবধি নবতারণ এ-থানায় ছিল না। আজই বদলি হয়ে এসে কাজ হাতে নিয়েছে। ওর মতো ঘুঘু লোক আর নেই।"

মাধব নেতিয়ে বসে ছিলেন। বললেন, "তাহলে কী হবে?"

"এখন তো চুপচাপ থাকুন। দেখা যাক।"

বাইরে এমন সময় গোটা চারেক কুকুরের গম্ভীর গর্জন শোনা গেল। হাঁকডাকেই বোঝা যায়, এরা যেমন-তেমন কুকুর নয়। সেলের সামনে দিয়ে কয়েকজন বিকটাকার লোক ঘোরা-ফেরা করে গেল। তাদের ছুরির মতো ধারালো চোখ, মুখ খুব গম্ভীর। দেখে-শুনে মাধব আরো ঘাবড়ে গেলেন।

এদিকে পল্টন পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। ফুটবলের মাঠে যখন প্রাইজ ডিসট্রিবিউশন চলছিল তখনই ঘটোৎকচ এক ফাঁকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। লাতনপুরের গেম-স্যার জয়পতাকাবাবু একটা ফুটবল হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘটোৎকচ সুট করে বলটা হাতিয়ে নিয়েই দৌড়।

তাতে পল্টন খুশিই হয়েছিল। ফালতু একটা ফুটবল পেয়ে যাওয়ায় তার তরুণ সঙ্ঘের বেশ সুবিধেই হবে। কিন্তু মুশকিল হল ঘটোৎকচ কিছুতেই বলটা হাতছাড়া করতে নারাজ। মদনমোহনবাড়ির আমবাগানে ঢুকে দুজনে যখন গা-ঢাকা দিয়েছিল, তখন পল্টন অনেক তোতাই-পাতাই করেছে। কিন্তু নতুন জিনিস হাতে পেয়ে ঘটোৎকচ তাকে বেশি পাত্তা দিতে চায়নি।

যাই হোক, কাদামামাকে থানায় নিয়ে গেছে, সুতরাং ফুটবল নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পল্টনের তখন নেই। সুতরাং সে ফুটবলসহই ঘটোৎকচকে নিয়ে আঁশফলের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে থানামুখো রওনা দিল।

কাদামামাকে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে কী ভাবে রেখেছে সেটা জানা দরকার। তাই সে ঘটোৎকচকে যতদূর সম্ভব আকারে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছেড়ে দিল। ফুটবল বগলে নিয়েই ঘটোৎকচ থানার কাছ-বরাবর একটা কদম গাছে উঠে একটা ডাল ধরে ঝুল খেয়ে মস্ত উঁচু দেয়ালের ওপর নামল। তারপর সেখান থেকে এক লাফে উঠল একটা কাঁঠাল গাছে। সেখানে ফুটবল কোলে করে বসে রইল আপন মনে। কোথায় কাদামামার খবর নেবে তা নয়, কেবল কোলের ফুটবলটা ছুঁড়ে দিয়ে ধরে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, শোঁকে।

পল্টন অনেক শিস-টিস দিয়ে ইশারা করল। কোনো কাজ হল না তাতে। এদিকে সন্ধে হয়ে এসেছে। দিনের আলো থাকতে-থাকতে বাড়িতে না ঢুকলে বাবা আস্ত রাখবেন না। বাড়ির নিয়মকানুন ভারী কঠিন।

পল্টন বাইরে থেকেই দেখল, থানার পুলিসের গাড়ি থেকে চার-চারটে ভীষণ চেহারার কুকুর নামানো হল, অনেক নতুন সেপাইও এল আর-একটা গাড়িতে।

খুব ভয়ে-ভয়ে পল্টন গিয়ে থানার ফটকে এক পাহারা-ওলাকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে দারোগাসাহেব?"

পাহারাওলা দারোগাসাহেব সম্বোধনে খুশি হয়ে বলল, "বহু বড়া বড়া চারঠো খুনী ডাকু পকার গয়া।"

কাদামামার জন্য দুশ্চিন্তা আর ঘটোৎকচের মুণ্ডুপাত করতে করতে পল্টন বাড়ি ফিরে গেল।

মাধব পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন শুনে বাড়িতে হুলুস্থুলু পড়ে গেল।

অক্ষয় খাজাঞ্চী বলল, "আমি আগেই জানতাম, মাধববাবু একজন ছদ্মবেশী দাগি আসামি। এ-বাড়ির কুটুম সেজে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।"

তায়েবজি একবার মিলিটারিতে ঢুকতে গিয়েছিল। কিন্তু পারেনি। মিলিটারির ওপর তার দারুণ শ্রদ্ধা। হরবখত তারা বন্দুক-কামান চালায়। কিন্তু এ-বাড়ির লোক তায়েবজিকে একটা বন্দুকও দেয়নি। বন্দুক ছাড়া দারোয়ানের কোনো ইজ্জত থাকে? তায়েবজি গোঁফ চুমড়ে বলে, "ও বাত ঠিক নেহি। আসলে মাধববাবু মিলিটারির আদমি। ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, তাই ধরা পড়ে গেছেন। মিলিটারি ছাড়া আর কেউ দু' দুটো বন্দুক রাখে?"

হাঁড়ির মা অবশ্য ঠোঁট উল্টে বলল, "ও মামলা টিঁকবে না। বন্দুকে গুলিই ছিল না যে!"

পল্টনের মা খবর শুনে কাঁদতে বসলেন। বড়বাবু বারান্দায় দ্রুত পায়ে পায়চারি করতে লাগলেন।

এ-বাড়ির লোককে পুলিসে ধরেছে জেনে পল্টনের বাড়ির মাস্টারমশাই পড়াতে এসে এমন ভয় খেয়ে গেলেন যে, একা বাড়িতে ফিরতে সাহস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত বাড়ির এক চাকর হ্যারিকেন ধরে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এল। অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ির লোকের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। কেবল নানা-রকম শলাপরামর্শ চলতে লাগল। পাড়া-প্রতিবেশীরাও দলে দলে এসে ভিড় জমাল।

পল্টন গিয়ে ঘন ঘন দেখে আসছে ঘটোৎকচ ফিরে এসেছে

কি-না। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্তও তার টিকির হদিশ পাওয়া গেল না।

ঘটোৎকচের অবশ্য ফেরার উপায়ও ছিল না।

হল কী, ঘটোৎকচ তো ফুটবল কোলে নিয়ে মহা উৎসাহে গাছের ডালে বসে বসে লেজ দোলাচ্ছে। এদিকে চারটে বিভীষণ কুকুর থানায় ঢুকে ছাড়া পেয়েই বনবন করে চারদিকটা ঘুরে দেখে নিয়েছে। হঠাৎ চারজনই কাঁঠাল গাছের তলায় জড়ো হয়ে ঊর্ধ্বমুখে প্রবল 'ঘ্যাও ঘ্যাও' আওয়াজ করে চেঁচাতে থাকে।

সেই চিৎকারে থানার যত সেপাই সেখানে এসে জুটল। ব্যাপারটা অদ্ভুত। গাছের ডালে একটা মস্ত বাঁদর বসে আছে, তার কোলে একটা ফুটবল।

জয়পতাকাবাবুর হাত থেকে বল ছিনতাই হওয়ার ঘটনা পুলিস জানে। সেই হারানো বল এত সহজে ফেরত পাওয়া যাবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। এখন কাজ হল, বাঁদরের হাত থেকে বলটা উদ্ধার করা।

নবতারণবাবু শুনেছিলেন, বিলেতে এক টুপিওলা টুপি পাশে রেখে গাছতলায় ঘুমোবার সময় গাছের বাঁদররা তার সব টুপি নিয়ে গাছে উঠে যায়। টুপিওলা ঘুম থেকে উঠে দেখে, বাঁদররা তার সব টুপি মাথায় পরে গাছের ডালে ডালে ঠ্যাং দুলিয়ে বসে আছে। কিছুতেই সেই টুপি বাঁদরদের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পেরে টুপিওলা রাগ করে নিজের মাথার টুপি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমনি বাঁদররাও যে যার মাথার টুপি খুলে দুপদাপ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নবতারণবাবু সেই কৌশলটা খাটালেন। হাতের কাছে বল ছিল না। তাই তিনি বলের অভাবে প্রথমে নিজের গোল টুপিটা মাটিতে আছড়ে ফেললেন। কাজ না হওয়ায় পিস্তলটা ছুঁড়ে দিলেন, নস্যির ডিবে মাটিতে আছড়ালেন।

কোনোটাতেই কাজ না হওয়ায় একজন সিপাইকে হুকুম করলেন, "বাজার থেকে এক কাঁদি পাকা মর্তমান কলা নিয়ে এসো।"

কলা এল। গাছের তলায় রাখাও হল। কিন্তু ঘটোৎকচ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। আপনমনে সে গাছের ডালে বসে বলটা একবার ছুঁড়ছে, লুফছে। ছুঁড়ছে, লুফছে। নীচের দিকে চেয়ে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে, গা চুলকোচ্ছে, নিজের পেটে ডুগডুগি বাজাচ্ছে।

সুবিধে হচ্ছে না দেখে সেপাইরা গুলি চালানোর হুকুম চাইল।

নবতারণের একটা হাবাগোবা ছেলে আছে, তার নাম শঙ্কাহরণ। সারাদিন কেবল খাই-খাই আর নানান বায়না। বুদ্ধি-শুদ্ধি খুবই কম, তার ওপর ঠাকুমা আর দাদুর আদরে আরো জল-ঘট হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। নবতারণ ভাবছিলেন বাঁদরটা নিয়ে শঙ্কাহরণকে পুষতে দিলে কেমন হয়? শঙ্কাহরণের সঙ্গে পাড়া ও ইস্কুলের ছেলেরা মিশতে চায় না, বরং খেপিয়ে মারে। বোকা আর অলস প্রকৃতির হলে যা হয় আর কী। তা এই বুদ্ধিমান বাঁদরটার সঙ্গে মেশামেশি করলে শঙ্কাহরণের মগজ কিছুটা ধারালো হতে পারে। তাই নবতারণ বললেন, "গুলি নয়, গ্রেফতার। এখন তোরা যে যার কাজে যা। কুকুরগুলোকে পাহারায় রেখে যাস, যেন বাঁদরটা পালাতে না পারে।"

তো তাই হল। চারটে কুকুর গাছতলায় থাপ পেতে বসে রইল পাহারায়। সেপাইরা রোঁদে গেল।

এদিকে নবতারণ থানার চার্জ নেওয়ায় হাজতের মধ্যে ভারী হতাশ হয়ে বসে আছেন মাধববাবু। জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছেন বলা যায়। বনমালী তাঁর হাঁটুতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে, "অত হাল ছেড়ে দেবেন না কর্তা, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

মাধববাবু ধরা গলায় বললেন, "শুনেছি পুলিস ধরলে সহজে ছাড়ে না। খুব মারে, খেতে দেয় না, কুটকুটে কম্বলের বিছানায় শুতে দেয়। অত কষ্ট করার অভ্যাস আমার নেই যে। তাছাড়া যদি যাবজ্জীবনের মেয়াদ বা ফাঁসির হুকুম হয়, তখন?"

কথা শুনে বনমালীর স্যাঙাতরা হি-হি করে হাসছে। বনমালী তাদের একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলল, "আস্পদ্দা কম নয়! হেতমগড়ের মেজকর্তার সামনে হাসাহাসি?"

ভয় খেয়ে স্যাঙাতরা চোর-চোর মুখ করে বসে রইল। তখন বনমালী বলল, "মেজকর্তার মন ভাল রাখতে হবে। ওরে, তোরা যে যার ওস্তাদি দেখা। নাচ-গান দিয়েই শুরু হোক।"

সঙ্গে সঙ্গে স্যাঙাতদের একজন নাক দিয়ে নিখুঁত আড়-বাঁশির আওয়াজ ছাড়তে লাগল। আর একজন গাল ফুলিয়ে ফোলানো গালে চাঁটি মেরে তবলার আওয়াজ করতে লাগল। তৃতীয়জন রায়বেঁশে নাচ জুড়ে দিল। বনমালী নিজে গান গাইতে লাগল।

খুবই জমে গেল ব্যাপারটা। মাধব হাঁ হয়ে দেখতে লাগলেন। নাচগান শেষ হলে বনমালীর স্যাঙাতরা নানারকম খেলা দেখাল। স্যাঙাতদের একজন হুবহু নবতারণ আর মাধব চৌধুরীর গলা নকল করে কথা বলে গেল। তারপর নানা জীবজন্তুর ডাক শোনাল। আর একজন দেখাল জিনিসপত্র হাওয়া করে দেওয়ার কায়দা। পয়সা থেকে শুরু করে চাবি কলম ইত্যাদি যা হাতের কাছে পাওয়া গেল তা নিয়ে সে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়, আর সেগুলো যেন পলকে হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়। এত সাফ হাত মাধব কোনো ম্যাজিসিয়ানের দেখেননি। সবশেষে টিকটিকি-বিদ্যে-জানা বিষ্টু মাধবকে তাজ্জব বানিয়ে দিল। সে গিয়ে গরাদের সরু ফোকরের মধ্যে নিজের শরীরকে কাত করে ঢুকিয়ে একটা চাড়ি মেরে মুহূর্তের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর একটু ঘোরাফেরা করে আবার একই কায়দায় ভিতরে ঢুকে এল!

মাধব বললেন, "তা তুমি বাপু, ইচ্ছে করলেই তো এখান থেকে কেটে পড়তে পারো।"

বনমালী হেসে বলে, "তা পারে, তবে আমাদের ফেলে যাবে না। তাছাড়া আলটপকা বেরোলে সেপাইরা হড়াম করে গুলি চালাতে পারে।"

মাধবের মন অনেকটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে গুণী মানুষের সঙ্গে আছেন তা বুঝতে পেরে খুব বেশি ভয়ও আর পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাঁর খুব খিদে পেয়েছে। তাই আমতা-আমতা করে বললেন, "হ্যাঁ হে বনমালী, শুনেছিলাম হাজতে খেতে-টেতে দেয়! লপসি না কী যেন! তা এরা দিচ্ছে না কেন? রাতও তো কম হয়নি! ধারেকাছে কোনো সেপাইকেও তো দেখা যাচ্ছে না।"

কথাটা ঠিক। হাজতের সামনে দিয়ে অনেকক্ষণ কোনো সেপাই রোঁদ দেয়নি। কেউ খোঁজ-খবরও করেনি। খাবার-দাবার দেওয়ার কথাও বুঝি ভুলে গেছে।

বনমালীর ইঙ্গিতে বিষ্টু আবার গিয়ে চারদিক দেখেশুনে শরীরটাকে চ্যাপ্টা করে গরাদের ফাঁকে গলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে সে বলল, "দারুণ খবর আছে। সেই বাঁদরটার সঙ্গে থানার কুকুররা মাঠে ফুটবল খেলছে। খুব জমে গেছে খেলা। সেপাইরা সব ডিউটি ফেলে রেখে মৌজ করে খেলা দেখছে।"

"জয় কালী!" বলে লাফিয়ে ওঠে বনমালী। মাধবকে তাড়া দিয়ে বলে, "উঠে পড়ুন! এমন সুযোগ আর হবে না।"

বনমালী টপ করে তার কানে-গোঁজা বিড়িটা এনে তার ভিতর থেকে ছোট্ট একটা উকোর মতো জিনিস বের করল। গরাদের তালায় সেটা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই দরজা চিচিং ফাঁক।

সামনে একটা দরদালানের মতো। পাঁচজনে চুপিসারে সামনের দিকে এগিয়ে দেখল, সেদিকে নবতারণের অফিসঘর। অফিসঘরে নবতারণ জাঁকিয়ে বসে আছে, দরজায় তটস্থ বন্দুক-ধারী সেপাই। সুতরাং পালানোর পথ নেই। পিছনদিকে এসে দেখে, সেদিকেও বিপদ। সামনেই একটু খোলা মাঠ। সেখানে ইলেকট্রিকের আলোয় ঘটোৎকচ আর চারটে কুকুরের মধ্যে দারুণ বল-খেলা চলেছে। ঘটোৎকচ বল ছুঁড়ে দেয়, চারটে কুকুর বলের পিছনে দৌড়োয়। বল ধরে ঠেলতে ঠেলতে এনে তারা আবার ঘটোৎকচের কাছে হাজির করে। তাদের হাবভাব চাকর-বাকরের মতো। ঘটোৎকচ বসে আছে একটা গাছের গুঁড়ির উঁচুমতো জায়গায়, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে। তার ভাবভঙ্গি রাজা-বাদশার মতো। একটা কুকুর বেয়াদবি করে তার হাঁটুতে একটু মুখ ঘষে দেওয়ায় সে তার কান মলে দিল। আর একটা কুকুরের মাথায় হাত দিয়ে আদর করল একটু। ফলে আর দুটো হিংসেয় ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে। ঘটোৎকচ তাদের এক ধমক মারল 'হুপ' করে। ভয়ে তারা লেজ নামিয়ে ফেলল।

কতক্ষণ খেলা চলত বলা যায় না। কিন্তু এসময়ে মাধববাবু ঘটোৎকচের কাণ্ডকারখানা দেখতে দরদালান থেকে মুখটা একটু বেশিই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর ঘটোৎকচও হঠাৎ মাধববাবুকে দেখতে পেয়ে 'হুপ হুপ' বলে আনন্দের ডাক ছেড়ে তিনটে বড় বড় ডিং মেরে কুকুর এবং সেপাইদের মাথার ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে এসে মাধববাবুর গা বেয়ে উঠে গলা জড়িয়ে কুঁইমুই করে আদর জানাতে লাগল।
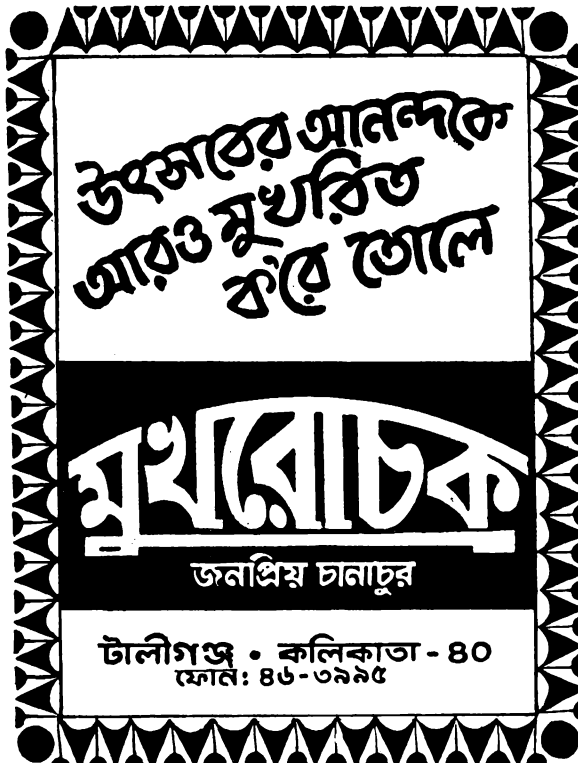
সকালবেলার রাগ মাধববাবুর অনেক আগেই জল হয়ে গেছে। তার ওপর এই দুঃসময়ে ঘটোৎকচের চেনা মুখখানা দেখে মাধববাবুরও আর স্থানকালের জ্ঞান রইল না। 'ওরে আমার ঘটুরে' বলে তিনি ঘটোৎকচের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন।

বনমালী পিছন থেকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, "কর্তা! বিপদ!"

বিপদ বলে বিপদ। চোখের পলকে এক গাদা সেপাই ঘিরে ফেলল তাদের। কারো হাতে বন্দুক, কারো লাঠি, কুকুরগুলোও উর্ধ্বমুখ হয়ে খাপ পেতে বসে আছে, হুকুম পেলেই লাফিয়ে পড়বে। অর্থাৎ মাধববাবুর আর কিছু করার নেই। সবাই ধরা পড়ে গেছেন।

মাধববাবু দুঃখের সঙ্গে ঘটোৎকচকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, "এঃ হেঃ, প্ল্যানটা কেঁচে গেল দেখছি!"

হেড কনস্টেবল মস্ত গোঁফ চুমরে সামনে এসে মাধববাবুকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, "এ বাঁদরটা আপনার?"

মাধববাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "অনেকটা আমারই।"

"বাঁদরটাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। এর এগেইনস্টে একটা ফুটবল চুরির কেস আছে। আজ রাতে একে হাজতেই রাখা হবে। আপনারা বাড়ি চলে যান। কাল সকালে এসে খোঁজ নেবেন।"

এই বলে হেড কনস্টেবল তাঁদের নিয়ে গিয়ে পিছনের ফটক খুলে রাস্তায় বের করে দিল। বলল, "এরপর থেকে নিজের বাঁদরকে ভাল করে বেঁধে রাখবেন।"

"যে আজ্ঞে," বলে মাধববাবু খুব অমায়িকভাবে হাসলেন।

হেড কনস্টেবল ফটক বন্ধ করে দিয়ে অন্য সেপাইদের হাঁক দিয়ে বলল, "বাঁদরটাকে আলাদা সেলে ভরে দে। আর দেখ্ তো,ঐ পাঁচটা বদমাশ কয়েদি কোনো বদ মতলব ভাঁজছে কি না।"

ততক্ষণে পাঁচ কয়েদি চোঁচা দৌড়ে পগার পার হয়েছে। পাতুগড়ে আমবাগানের অন্ধকারে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বনমালী হেসে বলল, "বাঁচা গেল।"

মাধববাবু তেমন খুশি নন। ঘটোৎকচের জন্য মনটা খারাপ। বললেন, "আমাদের জন্যই বেচারা ধরা পড়ে গেল, নইলে ঠিক পালাতে পারত।"

কেউ তাঁর কথায় জবাব করল না। সবাই হাঁফাচ্ছে। তা ছাড়া বিপদ এখনো তো কাটেনি। দৌড়তে-দৌড়তে থানা থেকে খানিক দূর আসতে না আসতেই পাগলাঘণ্টির শব্দ শোনা গেছে। খুব একটা হৈ-চৈ আর হুড়োহুড়ির শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল পিছনে।

পাতুগড়ের আমবাগান বিখ্যাত জায়গা। এখানে একশো দেড়শো বছরের পুরনো বিস্তর বড়-বড় আমগাছ আছে এবং সেগুলো এখনো মাঝে মাঝে ফল দেয়। তা ছাড়া বড়বাবু কলমের বাগানও করেছেন। বিশাল একশো বিঘার মতো বাগানটার পুরোটাই নানা ঝোপঝাড়ে ঘেরা। আম-চুরি ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন গাছে মাচা বাঁধা আছে। মাচায় ফলনের সময় লোকজন থাকে। আগে বড়বাবুর বাবা-ঠাকুর্দা নিজেরাই আম পেড়ে বেচে দিতেন। বড়-বাবু আর সে ঝামেলায় না গিয়ে প্রতি বছর বাগানটা বন্দোবস্তে দিয়ে দেন।

বাগানে ঘোর অন্ধকার। ভুতুড়ে কুয়াশায় চারদিকটা ছেয়ে আছে। ভাঙা বাতাসার মতো একটু চাঁদও উঠেছে আবার। তাতে চারদিকটা আরো গা-ছমছম হয়ে আছে।শীতকাল বলে আম-বাগানে লোকজন নেই।

মাধব ডাকলেন, "বনমালী!"

"আজ্ঞে!"

"এখন কী হবে?"

"কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে থাকতে হবে। তাপটা কেটে যাক তারপর যা হয় করা যাবে।"

"এখানে পুলিস আসবে না তো?"

বনমালী মাথা চুলকে বলে, "তা আসবে। যত চোর-ছ্যাঁচড় ডাকাত পুলিসের চোখে ধুলো দিতে এই আমবাগানেই আসে।

পুলিসও সেটা ভালই জানে।"

মাধব ভয় খেয়ে বলেন, "তাহলে? আমার যে আবার পুলিসের ভয়টাই সবচেয়ে বেশি।"

বনমালী হেসে বলে, "পুলিস এলেই বা কী? এই আম-বাগানের মতো এত ভাল চোর-পুলিস খেলার জায়গা আর কোথায় পাবেন?"

মাধব আবার ডাকলেন, "বনমালী!"

"আজ্ঞে।"

"খিদে পায় যে!"

"একটু চেপে থাকুন। ওধার থেকে টর্চ লাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। পুলিস এল বোধহয়।"

বনমালীর স্যাঙাতরা ওস্তাদ লোক। পুলিসের গন্ধ পেয়েই টপাটপ এক-একটা গাছে চড়ে অন্ধকারে একদম গায়েব হয়ে গেল। বনমালী মাধবকে আর-একটা গাছে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, "একটু ঠাহর করে উঠে যান। এ-গাছের মাচা খুব উঁচুতে নয়। আমি ধারে-কাছেই আর-একটা গাছে থাকব। দেখবেন কর্তা, দয়া করে ডাকাডাকি করবেন না। বিপদে পড়লে লুকোচুরি খেলার টু দেওয়ার মতো আস্তে করে টু দেবেন।"

এই বলে বনমালীও হাওয়া হয়ে গেল।

মাধব পুলিসের আতঙ্কে প্রাণভয়ে গাছে চড়তে লাগলেন। অনেককাল এসব করা অভ্যাস নেই। তাই হাত-পায়ের চামড়া ছড়ে গেল গাছের ঘষটানিতে। চটিজোড়া খসে পড়েছিল পা থেকে, সেটা আর তোলা হল না। অন্ধকারে ঠাহর করে করে মোটা মোটা ডাল বেয়ে খানিকটা উঠে মৃদু জ্যোৎস্নায় একটা বাঁশ আর বাখারির মাচান পেয়ে গেলেন। বিশেষ মজবুত বলে মনে হল না। উঠতেই খচমচ শব্দ করে দুলতে লাগল। গত বর্ষার জলে দড়ির বাঁধন-গুলো পচে গিয়ে থাকবে। মাচানে বসে প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার চিন্তা করতে-করতে মাধববাবু একটা টু দিলেন। কিন্তু দেখলেন, ভয়ে আর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে থাকায় শব্দ হল না, শুধু ফুঃ করে একটা হাওয়া বেরিয়ে গেল।

চারদিকে কী হচ্ছে তা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না মাধব-বাবু, কিন্তু লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কাছেপিঠে একটা জোরালো টর্চের আলো জ্বলে উঠে নিবে গেল। গোটা তিন-চার কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল হঠাৎ। মাধববাবু সিঁটিয়ে বসে রইলেন। গাছের ওপর শীত আরো বেশি। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত-পায়ে সাড় নেই। তার মধ্যে আবার টুপটাপ করে শিশিরের ফোঁটা গায়ে পড়ে ছ্যাঁক করে উঠছে। ঘোলাটে অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু কী একটা লম্বা-মতো মাধববাবুর পায়ের পাতার ওপর দিয়ে সড়াত করে সরে গেল। নীচে থেকে কে হাঁক দিল, "বড় গাছগুলো ঘিরে ফেল।"

মাধববাবু এবার প্রাণপণের চেষ্টায় একটা টু দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছ থেকেই কে যেন পাল্টা টু দিল। কিন্তু চারদিকে চেয়ে মাধববাবু কাউকে দেখতে পেলেন না। আবার টু দিলেন। আবার টু ফেরত এল।তারপরেই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। খুবই কাছে, প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপর শ্বাসটা পড়ল। মাধববাবু চাপা স্বরে বললেন, "কে রে? বনমালী নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, "না, বনমালী নয়।"

"তবে?"

"চিনবেন না। আমি হলাম নন্দকিশোর মুন্সি।"

মাধব লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু এই আলো-আঁধারিতে কিছু ভাল করে দেখাও যায় না। না দেখলেও একটা লোক কাছে আছে জেনে মাধব খুব ভরসা পেয়ে বললেন, "ফেরারি নাকি?''

"তাও ঠিক নয়।''

"তবে?''

"সে অনেক গুহ্য কথা। শুনলে ভয় পাবেন।"

"পুলিস ছাড়া আমি আর কিছুকে ভয় পাই না।''

লোকটা আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, জবাব দিল না।

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, ''বড়-বড় শ্বাস ফেলছেন যে! দুঃখ-টুঃখ পেয়েছেন নাকি?''

"তা দুঃখ আছে বই-কী। বসে বসে ভাবি, মানুষের মতো মিথ্যেবাদী দুনিয়ায় দুটো নেই।''

মাধব এই বিপদের মধ্যেও কথাটা নিয়ে ভাবলেন। ভেবে বললেন, "সে ঠিক। তবে কিনা দুনিয়ায় মানুষ ছাড়া আর তো কেউ কেথা বলতে পারে না, তাই মিথ্যেকথা বলার প্রশ্নও ওঠে না। তা আপনি কোন্ মিথ্যে কথাটা নিয়ে ভাবছেন?"

নন্দকিশোর একটু যেন খিক খিক করে হাসল। তারপর বলল, "ছেলেবেলায় গল্প শুনতুম ভূতেরা নাকি ঘরে বসে লম্বা হাত বাড়িয়ে বাগান থেকে লেবু ছিঁড়ে আনতে পারে। তারা নাকি মাছভাজা খায়। তারা নাকি মানুষের ঘাড়ে ভর করে যাচ্ছেতাই কান্ড ঘটায়।''

মাধবের গা একটু ছমছম করল। তবু সাহসে ভর করে বললেন, "আমিও শুনেছি।''

''দূর দূর! ডাহা মিথ্যে। ভূত হওয়ার পর আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি ভূতেদের কানাকড়ির ক্ষমতাও নেই। বাতাসের মতো ফিনফিনে শরীর নিয়ে কিছু করা যায় মশাই? আপনিই বলুন!''

এতকাল মাধবের ধারণা ছিল, তিনি পুলিস ছাড়া আর কাউকে ভয় পান না। এখন একেবারে কাঠ হয়ে বসে থেকে তিনি টের পেলেন, দুনিয়ায় আরো বিস্তর ভয়ের ব্যাপার রয়ে গেছে। কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "দোহাই মশাই, আমাকে আর ভয় দেখাবেন না। আমি ভূতকেও ভীষণ ভয় পাই।''

নন্দকিশোর গম্ভীর হয়ে বলে, "ভূতকে ভয় পায় মুর্খেরা। বললাম তো, ভূতদের কানাকড়ির ক্ষমতাও নেই। থাকলে এক্ষুনি ঐ পুলিসগুলোকে ডেকে আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম। না হয় তো আপনাকে এই মাচান থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিতাম।"

মাধববাবু সভয়ে মাচার বাঁশ চেপে ধরে বললেন, "ওসব কী কথা? ফেলে দিলে হাড়গোড় ভাঙবে যে!''

"দূর মশাই!'' নন্দকিশোর ধমক দিয়ে বলে, ''বলছি না ফেলবার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা নেই!''

"কিন্তু যদি পুলিসকে ডাকেন?'' মাধব সন্দেহে কাঁটা হয়ে বলেন।

"ডাকব কী? আমার গলার স্বর ওদের কানে যাবে বুঝি? আপনি যেমন! আমার কথা আমি নিজেও শুনতে পাই না।''

"তবে আমি শুনছি কী করে?''

"বিপদে পড়ে আপনার চোখ কান নাক ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ু অত্যন্ত বেশি সজাগ হয়ে ওঠায় অনুভূতির ক্ষমতা খুব বেড়ে গেছে। আমার গলার স্বর বলে কিছুই নেই। আপনি যা শুনতে পাচ্ছেন তা হল একটা চিন্তার তরঙ্গ মাত্র। অন্য কোনো ভোঁতা লোক হলে কিছুই শুনতে পেত না।''

মাধববাবু এই দুঃসময়েও একটু খুশি হলেন। তিনি তাহলে ভোঁতা লোক নন! গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "যথার্থই বলেছেন।''

নন্দকিশোরের আর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে বলে, "এ-বাগানে ফলনের সময় যত চৌকিদার পাহারায় থাকে, আমি তাদের সকলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কাজ হয়নি। যত চোর-ডাকাত এসে এখানে গা-ঢাকা দেয় তাদেরও অনুভূতি বলে কিছু নেই। আজই প্রথম একটা চোরকে দেখলাম যে আমার কথা শুনতে পেল।''

"চোর?''

নন্দকিশোর নির্বিকারভাবে বলে, "চোর বললে যদি রাগ হয় তবে না হয় তস্করই বললাম। কিন্তু আপনার মতো ভিতু লোক যে ডাকাত বা গুন্ডা হতে পারে না তা আমি দেখেই বুঝেছি।''

মাধববাবু একটু রেগে গিয়ে বলেন, "আমি ওসব কিছুই নই। আমি হচ্ছি হেতমগড়ের মেজকুমার। পুলিস আমাকে বিনা দোষে ধরেছিল। আমি পালিয়ে এসেছি।''

নন্দকিশোরের খিক-খিক গা-জ্বালানো হাসি শোনা যায়। সে বলে, ''সে কথা পুলিসকে বলে দেখবেন বরং। ঐ তারা এসে গেছে।''

মাধব নীচের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে যান। আবছা অন্ধকারে দেখতে পান গোটা-দুই কুকুর গাছের তলায় ঘুরঘুর করে কী যেন শুঁকছে। তাঁর চটিজোড়া নয় তো?

এই সময়ে একটা জোরালো টর্চের আলো পড়ল গাছতলায়। নবতারণ বাজখাঁই গলায় বললেন, ''এই গাছে একটা বিটলে আছে। ওরে, তোরা বন্দুক উঁচিয়ে থাক। পাঁচুটিরাম আর ভজহরি গাছে ওঠ।''

মাধববাবুর যখন সাঙ্ঘাতিক বিপদ তখনো নন্দকিশোর পিছন থেকে বলল, ''আপনি দেখছি চোর হিসেবেও নিতান্তই কাঁচা। চটিজোড়া গাছতলায় ছেড়ে এসেছেন! অ্যাঁ? আর আমি ভাবছিলাম আপনি ভোঁতা লোক নন!''

মাধববাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। জমিদারদের রক্ত এখনো তাঁর গায়ে আছে। এই সেদিনও তাঁর ঠাকুর্দা রাগ হলে গাছে চড়ে বসে থাকতেন। তিনি না রেগেই গাছে চড়েছেন বটে, কিন্তু এখন গাছে চড়ার পর তাঁর রাগটাও হল। সারাদিন আজ নানারকম হ্যাপা গেছে, তার ওপর এখন বিপদের মুখে আবার ভূতের অপমান! মাধব গর্জন করে বললেন, ''চটি ছেড়ে আসব না তো কি কোঁচড়ে করে নিয়ে আসব? জানেন, আমাদের বংশে কেউ কখনো নিজের চটি নিজে পরেনি বা নিজে ছাড়েওনি? বাইশজন চটি-বরদার ছিল আমাদের, বিশ্বাস হয়? আমার বাবার পা থেকে জুতো খোলার লোক ছিল না বলে তিনি শ্বশুর-বাড়িতে এক রাত্রি জুতো পায়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। তা হলে বুঝুন আমি কার ছেলে, কোন্ বংশের লোক! আমরা কখনো নিজের চটি নিজের হাতে ছুঁই না। তা জানেন?''

নন্দকিশোর মোলায়েম গলায় বলে, "চটির কথাটায় আপনার খুব লেগেছে দেখছি। আমি কিন্তু আপনাকে চটি নিয়ে খোঁটা দিইনি। বলছিলাম, চুরি-চামারি করতে গেলে অত লপেটা-বাবু সেজে বেরোলে কি হয়? চটি পরে কেউ চুরি করতে যায়? এ হচ্ছে অতিশয় কাঁচা তস্করের কাজ।''

মাধববাবু হুংকার দিয়ে বললেন, ''ফের তস্কর বললে এক থাপ্পড়ে তোমার মুন্ডু ঘুরিয়ে দেব।''

নন্দকিশোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ''দাদারে, সেই সুখের দিন কি আর আছে? আমাকে থাপ্পড় মারা অত সোজা নয়।''

''বটে!'' বলে মাধববাবু গর্জন করে করাল চোখে চারদিকে চেয়ে লোকটাকে খুঁজতে লাগলেন।

"এই তো আমি। এই যে একটু বাঁয়ে ঘেঁষে তাকালেই দেখতে পাবেন।'' বলে নন্দকিশোর নিজের অবস্থানটা জানাতে থাকে মাধবকে।

বাঁয়ে তাকিয়ে মাধব দেখেন, গাছের ফোকর দিয়ে আসা

একমুঠো জ্যোৎস্নায় বিঘতখানেক লম্বা তুলোর আঁশের মতো একটা জিনিস বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাসতে-ভাসতেই তিড়িক করে লাফিয়ে মাধবের নাকের ডগায় এসে নাচতে-নাচতে বলল, "মারবে থাপ্পড়? মারো না দেখি!"

তা মাধব মারলেন। জীবনে কাউকে এত জোরে আর এত রাগের সঙ্গে থাপ্পড় মারেননি। সজোরে হাতটা বাতাস কেটে বাঁই করে ঘুরে এল আর সেই থাপ্পড়ের টানে মাধব নিজেও ঘুরে গেলেন। এক পাক ঘুরলেন, দু পাক ঘুরলেন, তারপর ঘুরতে-ঘুরতেই মাচান থেকে এরোপ্লেনের মতো ভেসে পড়লেন, শূন্যে।

দমাস করে বিরাট এক শব্দ। নবতারণের হাত থেকে টর্চটা ছিটকে গেল। কুকুর দুটো লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে পালাল। পাঁচুরাম আর ভজহরি গাছের মাঝ-বরাবর পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। হঠাৎ আঁতকে ওঠায় তারাও হাত-পা ফস্কে নীচে পড়ল। গাছের তলায় অন্ধকারে সে এক হুলুস্থূলু কাণ্ড। গাছের ওপর ঘুমন্ত পাখিরা ঘুম ভেঙে আতঙ্কে কা-কা ক্যাচর-ম্যাচর করতে লাগল।

নবতারণ মূর্ছা গিয়েছিলেন। পনরো-বিশ ফুট উঁচু থেকে দেড়-দু' মনি জিনিস কারো ঘাড়ে পড়লে তার মূর্ছা যাওয়াটা কোনো কাপুরুষের লক্ষণ নয়। নবতারণ কাপুরুষ ননও। তবে তাঁর মতো শক্ত ধাতের মানুষ মূর্ছা যাওয়ায় সেপাইরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ফলে অন্ধকারে কী যে ঘটে গেল তাদের নাকের ডগায়, তা তারা ভাল করে ঠাহর পেল না। তবে সকলেই কাজ দেখাতে এদিক-সেদিক 'পাকড়ো পাকড়ো' বলে দৌড়তে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদেই অবশ্য নবতারণ চোখ খুললেন। তবে যে নবতারণ চোখ খুললেন, তিনি আর আগের নবতারণ নন। এত কাহিল হয়ে পড়েছেন যে, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। গায়ে-গতরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। খানিক বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘোলাটে মগজটাকে সাফ করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন নবতারণ, এমন সময়ে খুব কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এইসব ননীর পুতুলকে আজকাল দারোগার পোস্টে প্রোমোশন দিচ্ছে নাকি? হুঃ, দারোগা ছিল বটে আমাদের আমলের নিশি দারোগা, একটা আস্ত কাঁঠাল খেয়ে ফেলত। গোটা খাসির মাংস হজম করত। সাত ফুট লম্বা ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি, কিল দিয়ে পাথর ভাঙত।"

নবতারণের ঘোলাটে বুদ্ধি সাফ হয়ে গেল, গায়ের ব্যথাও গেল উবে। অপমানের জ্বালায় এক লাফে উঠে হুংকার ছাড়লেন, "কার রে এত সাহস, সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস?"

খিক করে একটু হাসির শব্দ হল। কে যেন বলল, "বেশি রোয়াব দেখিও না। আমি কত বুদ্ধি খাটিয়ে চোরটাকে গাছ থেকে নীচে ফেললাম, আর তুমি তাকে কোলের মধ্যে পেয়েও ধরে রাখতে পারলে না। মাইনে নাও কোন্ লজ্জায়?"

নবতারণ খাপ থেকে রিভলভার বের করে বললেন, "সাহস থাকে তো সামনে এসে কথা বল্।"

"সাহসের কথা আর বোলো না। তুমি যা বীরপুরুষ, তাতে চামচিকেও তোমাকে ভয় খাবে না। আমি সামনেই আছি, কী করবে করো না।"

নবতারণ মহিষের মতো শ্বাস ফেলে, দাঁতে দাঁত পিষে জাঁতার মতো শব্দ করে বললেন, "কই তুই?"

"এই যে!" বলে বিঘত-খানেক লম্বা সাদাটে নন্দকিশোর মুন্সি একেবারে নবতারণের নাকের ডগায় নাচতে লাগল। সঙ্গে খিক-খিক করে হাসি।

নবতারণ চাঁদের ঘোলাটে আলোয় নিজের নাকের ডগায় এই

অশরীরী কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন প্রথমটায়। তারপর পিছু ফিরে দৌড়োতে-দৌড়োতে চেঁচাতে লাগলেন, "পাঁচুরাম! ভজহরি! ভূত! ভূত!"

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমবাগান সাফ হয়ে গেল।

৪

বিপদ ঘটলে মানুষ তখন-তখন যতটা ভয় পায়, তার চেয়ে আরও বেশি ভয় পায় বিপদ কেটে যাওয়ার পর সেই বিপদের কথা ভেবে।

মাধবেরও হয়েছে তাই। ভূতকে চড় মেরেছেন, গাছ থেকে নবতারণের ঘাড়ে পড়েছেন, তারপর অন্ধকারে অনেকটা পথ দৌড়ে গাছ-গাছালির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে, অতি কষ্টে নদীর ধারে পৌঁছে গেছেন। নদীর ধারে বসে জিরোতে জিরোতে গোটা ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে এখন হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠে কাঠ হয়ে গেলেন। সাক্ষাৎ পুলিস এবং সাক্ষাৎ ভূতের পাল্লা থেকে কপাল-জোরে বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখন

ভয়ে শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর এক পা'ও চলার ক্ষমতা ছিল না।

এমনই গ্রহের ফের যে,কিছুতেই 'রাম'-নামটাও মনে আসছে না। দশরথ, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ভরত, এমনকী মন্থরার নামও মনে পড়ছে, কিন্তু দশরথের বড় ছেলের নামটা জিবে আসছে না। বসে প্রাণপণে বিড়-বিড় করছেন, "আরে ঐ যে দশরথের বড় ছেলেটা...আরে ঐ তো বনবাসে গিয়েছিল...সোনার হরিণের পিছু নিয়েছিল যে ছোকরা...আহা কী যেন নাম...আরে ঐ তো রাবণরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করল...হনুমানের খুব ভক্ত ছিল...না না, হনুমানই সেই ছোকরার খুব ভক্ত ছিল...আরে দ্যাখো কাণ্ড, হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করল যে লোকটা..."

ঠিক এই সময়ে কানে কানে কে যেন বলে দিল, "রামের কথা ভাবছ তো! খিক-খিক! তা ভাল, খুব কষে রাম-নাম করে যাও, কিন্তু তাতে লাভ নেই।"

মাধব হিম হয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখেন, নাকের ডগায় নন্দকিশোর মুনসি।

নন্দকিশোর বলে, "ওসব লোকে রটিয়ে বেড়ায়। ভূতের নামে কত যে মিথ্যে কথা রটায় লোকে, তার লেখাজোখা নেই। বলে, রাম-নাম করলে নাকি ভূতে ভয় খায়! খিক-খিক!"

মাধবের গলায় কথা সরছিল না। তবু কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললেন, "তবে ভূতে কিসে ভয় খায় ?"

নন্দকিশোর খুব খিক-খিক করে হাসে। বলে, "তোমারও যেমন বুদ্ধি! ভূতে কিসে ভয় খায় সেই গুহ্যকথা আমি তোমাকে বলতে যাব কেন হে!"

"আমার যে ভীষণ ভয় করছে!" মাধব বলেন।

"তুমি মূর্খ, তাই ভূতকে ভয় খাও। গাছের ওপর তোমাকে কত করে বোঝালাম যে, ভূতের একরত্তি ক্ষমতা নেই, তাই তাকে ভয় খাওয়ারও কিছু নেই। আবার ভূতকে ভয় খাওয়ানোও ভারী শক্ত। ভূতকে মারা যায় না. তা তো নিজেও দেখলে। ভূতের সাপের ভয় নেই, চোরডাকাত বা পুলিসের ভয় নেই, বন্দুক বা তলোয়ারেও ভয় নেই, এমনকী সবচেয়ে বড় কথা কী জানো ?"

"কী ?"

"সবচেয়ে বড় কথা হল, ভূতের আবার ভূতের ভয়ও নেই। আর রামের মতো ভালমানুষকে আমরা ভয় পেতে যাবই বা কেন ? রাম তো আর ভূতের নিদান দিয়ে যাননি! তাঁর আরও অনেক গুরুতর কাজ ছিল।"

মাধব ভয়ে ভয়ে বললেন, "তাহলে রাম-নাম করে লাভ নেই বলছেন ?"

"লাভ একেবারে নেই তা বলিনি। রাম-নামে পাপ-তাপ কাটে. মনটা উঁচুতে ওঠে, প্রাণটা বড় হয়, ভক্তিভাব আসে, গায়ে শক্তি-বুদ্ধি হয়, মনোবল বাড়ে। কিন্তু তা বলে রাম-নাম করে আমাকে ভয় খাওয়াতে পারবে না।"

শক্ত পাল্লায় পড়েছেন বুঝতে পেরে মাধব কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "আপনাকে চড় মারাটা আমার ভারী অন্যায় হয়েছিল।"

নন্দকিশোর খিক-খিক করে হেসে বলে, "আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! তুমি তো চড় মারতে গিয়েছিলে, নবতারণ দারোগা পিস্তল বের করেছিল। খিক-খিক! সাধে কি তোমাদের মূর্খ বলি ? তোমার চড় আমার লাগলে তো ? আমি কিছু মনে করিনি। তবে তোমার মতো চোর-জোচ্চরদের শাস্তি হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। সেইজন্যই আমি চেয়েছিলাম নবতারণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে তোমাকে ধরিয়ে দেব। কিন্তু দারোগা এমন ভয় খেয়ে গেল যে, পালিয়ে বাঁচে না।"

"আজ্ঞে আমি চোর নই। বিশ্বাস করুন।"
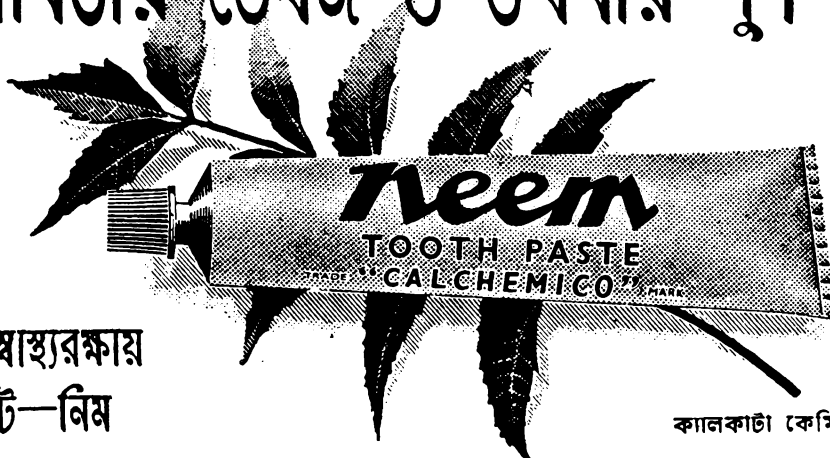
নন্দকিশোর গম্ভীর হয়ে বলল, "কোনো চোরই নিজেকে চোর বলে স্বীকার করে না। তুমি চোর কি না তা জানতে হলে আমাকে তোমার ভিতরে ঢুকতে হবে।"

"অ্যাঁ" বলে আঁতকে ওঠেন মাধব।

নন্দকিশোর বলে, "ভয়ের কিছু নেই। যাব আর আসব। দশ মিনিটও লাগবে না।"

নন্দকিশোর ভূত হলেও বিঘত খানেক লম্বা এবং ভাল সাইজের মর্তমান কলার মতোই পুরুষ্টু। মাধব কঁকিয়ে উঠে বললেন, "ভিতরে গিয়ে দেখবেনটা কী?"

"তোমার মগজ দেখব, বিবেক দেখব, তোমার মনটা কেমন তা বিচার করব, তারপর বুঝব তুমি চোর কি না।"

"কোথা দিয়ে ঢুকবেন?"

"নাক কান মুখ সব পথেই ঢোকা যায়। তবে নাক কান হচ্ছে গলিপথ। আমি গলি দিয়ে যাতায়াত পছন্দ করি না। মুখ হল রাজপথ। আমি রাজপথই পছন্দ করি। তুমি হাঁ করো।"

মাধব ইতস্তত করে বলেন, "গলায় যদি আটকে যায়, তাহলে তো বিষম খেয়ে মরব। আমি বলি কী, পুরোটা একসঙ্গে না ঢুকে আমি বরং আপনাকে একটু-একটু করে চিবিয়ে খেয়ে নিই।"

"দূর দূর! তুমিও যেমন! হাঁ করে থাকো, টেরই পাবে না। আমি এমন কায়দায় ঢুকে যাব।"

অগত্যা মাধবকে হাঁ করতে হল। নন্দকিশোর ডাইভ মেরে ভিতরে ঢুকে গেলেন। মাধব টের পেলেন একটা নরম আইস-ক্রীমের মতো ঠান্ডা জিনিস তার টাগরায় গোঁত্তা মেরে গলা দিয়ে নেমে গেল। বেশ বড় রকমের একটা ঢেঁকুর তুললেন মাধব। তারপর কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

ছেলেবেলায় হাঁ করে কাঁদতে গিয়ে একবার একটা মাছি গিলে ফেলেছিলেন মাধব। দুধ খেতে গিয়ে মাঝে-মাঝে এক-আধটা পিঁপড়েও পেটে গেছে। আহাম্মক মশা অনেক সময় বে-খেয়ালে মানুষের মুখে ঢুকে গিয়ে পেটসই হয়ে যায়, তাই জীবনে বেশ কয়েকটা মশাও হয়তো মনের ভুলে গিলে ফেলেছেন তিনি। তাছাড়া ওষুধের বড়ি, চিরতার জল, তেতো পাঁচন সবই খেয়েছেন। কিন্তু ভূত-গেলা এই তাঁর প্রথম। নন্দকিশোরকে গিলে ফেলার পর তিনি স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ আমি কী করলাম?

ওদিকে নবতারণ হতাশ হয়ে সদলবলে থানায় ফিরেই দেখলেন একজন গোঁফওয়ালা ভারী চেহারার বিশিষ্ট ভদ্রলোক বসে আছেন। গম্ভীর গলায় বললেন, "আমি হচ্ছি বিজয়-পুরের জমিদারের নায়েব। খবর পেয়েছি, জমিদারমশাইয়ের ছোট জামাই মাধব চৌধুরীকে এই থানায় আটক রাখা হয়েছে। খবরটা কি সত্যি?"

বিজয়পুরের জমিদারের জমিদারি এখন আর নেই বটে, কিন্তু তাঁরা তিনটে জাহাজের মালিক, তামাকপাতার মস্ত ব্যবসা আছে, আরো হাজার রকমের কারবারে তাঁদের লাখ-লাখ টাকা খাটছে। তাঁদের ভয়ে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। সুতরাং নবতারণ মাথা চুলকোতে লাগলেন। এই থানার চার্জ নিয়ে এক দিনেই এই বিপত্তি দেখে তিনি অন্য থানায় বদলি হওয়ার কথাও ভাবলেন। তারপর কাচুমাচু মুখে বললেন, 'তাঁকে কি ছেড়ে দেওয়ার হুকুম আছে?"

নায়েবমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, "না। বরং তাঁকে খুব ভাল করে আটক রাখবেন। কারণ, লোকটা খুবই খ্যাপাটে আর রাগী। বিয়ের রাতে তাঁকে শালীরা সুপুরিসুদ্ধ নাড়ু খেতে দিয়েছিল বলে তিনি রাগ করে চলে আসেন, আর কখনো শ্বশুরবাড়িতে যাননি। জমিদারমশাইও ওরকম আহাম্মক জামাইয়ের মুখদর্শন করতে চাননি। কিন্তু এখন মেয়ের কান্না-কাটিতে তাঁর মন নরম হয়েছে। কিন্তু জামাইয়ের হাতে-পায়ে ধরে যেচে সেধে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার মানুষ তিনি নন। তাই জামাইয়ের গ্রেফতারের খবরে তিনি খুশিই হয়েছেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, কাল সকালের মধ্যেই মাধব চৌধুরীকে পুলিসের পাহারায় গ্রেফতার অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে যেন হাজির করা হয়।"

নবতারণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে টাকের ছাল তুলে ফেললেন প্রায়। হেঃ হেঃ করে বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "কিন্তু মুশকিল হল, আমরা যখনই শুনলাম যে, তিনি বিজয়-পুরের ছোট জামাই, তক্ষুনি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি। উনি তো এখন থানায় নেই।"

নায়েব আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, "তাহলে আবার এক্ষুনি তাঁকে গ্রেফতার করে আনুন। কাল সকালে তাঁকে গ্রেফতার অবস্থায় বিজয়পুরে হাজির না করলে কর্তা খুবই রেগে যাবেন। কারণ, তাঁর ছোট মেয়ে বলে দিয়েছে, তার স্বামীকে আর তিন দিনের মধ্যে হাজির না করতে পারলে সে বিষ খাবে বা গলায় দড়ি দেবে। জমিদারেরই মেয়ে তো, ওদের কথার নড়চড় হয় না। আপনি আর দেরি না করে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। ঠিকমতো জামাইকে হাজির করতে পারলে কর্তা প্রচুর পুরস্কার দেবেন।"

এই বলে নায়েবমশাই উঠে পড়লেন।

নবতারণ বসে বসে টাক চুলকোতে লাগলেন। জীবনেও এমন মুশকিলে পড়েননি। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। বিজয়পুরের জমিদারের সঙ্গে হর্তাকর্তাদের খুব খাতির। চটে গেলে নবতারণের চাকরি খেয়ে নিতে পারেন।

ওদিকে থানার গারদে ঘটোৎকচ প্রচণ্ড হম্বিতম্বি করছে। তার খাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে, ঘুমও পেয়েছে। কিন্তু বাঁদরকে খাবার দেওয়ার কথা কারও মনে পড়েনি। তাছাড়া কুটকুটে কম্বলের বিছানায় শুয়ে ঘটোৎকচের অভ্যাস নেই। ফলে সে ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়ছে, গরাদ বেয়ে উঠছে, নামছে। সে একটু মোটাসোটা বলে গরাদের ফাঁক দিয়ে বেরোতেও পারছে না। তবে তার মধ্যেই সে ঠ্যাং বাড়িয়ে একজন সেপাইকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। আর একজনের চুল খামচে আচ্ছা করে মাথাটা ঠুকে দিয়েছে লোহার দরজায়। সেপাইরা রেগে গেলেও কিছু বলেনি, কারণ দারোগাবাবুর ছেলের জন্য বাঁদরটাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাঁদরের হুপহাপ শুনে নবতারণ হঠাৎ গর্জন করে বললেন, "সব দোষ বেয়াদপ বাঁদরটার। নিয়ে আয় তো ওকে, আচ্ছাসে ঘা কতক দিই।"

সঙ্গে-সঙ্গে সেপাইরা ঘটোৎকচকে আচ্ছাসে দড়ি দিয়ে বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এল। ঘটোৎকচ জানে, এই অবস্থায় তোড়-মোড় করা ঠিক নয়। তাই সে খুব লক্ষ্মী ছেলের মতো কোনো গোলমাল করল না। এমনকী, সামনে হাজির হয়ে সে দারোগা-বাবুকে হাতজোড় করে একটা নমস্কারও করল।

নবতারণ একটু নরম হয়ে বললেন, "ব্যাটা সহবত জানে দেখছি!"

শুনে ঘটোৎকচ নবতারণকে একটা সেলামও দিল।

"বাঃ বাঃ!" খুশি হলেন নবতারণ।

উৎসাহ পেয়ে ঘটোৎকচ নিজের কান ধরে জিব বের করে খুব অনুগমনের ভঙ্গি করল।

নবতারণ বহুক্ষণ বাদে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

ঘটোৎকচ তখন কান ধরে ওঠবোস করল, মাটিতে উবু হয়ে নাকে খত দিল, তারপর লজ্জার ভান করে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে রাখল।

নবতারণ এইসব কাণ্ড দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে,

বড়বাবু তায়েবজি আর অক্ষয় খাজাঞ্চি যে কখন ঘরে ঢুকে পড়েছেন তা টের পাননি!

বড়বাবুও জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর তেমন হাঁকডাক নেই। নরম মানুষ বলে তাঁকে কেউই তেমন ভয়ও খায় না। উল্টে তিনিই বরং অনেক কিছুকে ভয় খান। দারোগা-পুলিসকেও তাঁর ভীষণ ভয়।

তাই ভয়ে-ভয়ে থানায় ঢুকে গলা খাঁকারি দিয়ে অনেকবার দারোগাবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। তাতে কাজ হল না দেখে খুব ভয়ে-ভয়ে নবতারণের আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "ইয়ে, আমার শালা মাধব চৌধুরীকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে?"

নবতারণ একটু চমকে উঠে আপাদমস্তক বড়বাবুকে দেখে নিলেন। তারপর ব্যঙ্গ-হাসি হেসে বললেন, "চালাকি করার আর জায়গা পেলেন না? মাধব চৌধুরী আপনার শালা হতে যাবেন কেন? তিনি তো বিজয়পুরের জমিদারের ছোট জামাই।"

বিজয়পুরের জমিদারের জামাই তাঁর শালা হতে পারবে না কোন্ যুক্তিতে তা বুঝতে না-পেরেও বড়বাবু নবতারণকে চটাতে সাহস পেলেন না। বললেন, "সে কথা অবশ্য ঠিক।"

নবতারণ মৃদু হেসে বললেন, "তবেই বুঝুন, চালাকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় কিনা।"

"আজ্ঞে না।" বড়বাবু হতাশ হয়ে বললেন।

অক্ষয় খাজাঞ্চি অবশ্য গলায় একটু সন্দেহ রেখেই বললেন, "তবে কিনা অনেকের এমন জামাইও আছে যারা কিনা আবার অন্য কারো শালাও।"

তায়েবজিও খুব বিনয়ের সঙ্গে অক্ষয় খাজাঞ্চিকে সমর্থন করে বলল, "এই তো আমারই এক শালা আছে যে কিনা ঘুরঘুটি-পুরের ঘুসুরামের জামাই।"

নবতারণ কটমট করে তায়েবজির দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিলেন, "এরকম সব হয় নাকি?"

অক্ষয় খাজাঞ্চি মিনমিন করে বললেন, "কাজটা হয়তো বেআইনি। এরকম হওয়া উচিতও নয়। তবে হচ্ছে, আকছার হচ্ছে।"

কোথাও একটা ভুল হচ্ছে বুঝতে পেরে নবতারণ গর্জন করে বললেন, "দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান! ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই। মাধব চৌধুরী হলেন বিজয়পুরের বড়কর্তার জামাই, তার মানে উনি বড়কর্তার মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তাহলে উনি হলেন বড়-কর্তার ছেলেদের সম্পর্কে শালা।"

বড়বাবু জিব কেটে বললেন, "আজ্ঞে না, উনি সেক্ষেত্রে হবেন ভগ্নীপতি।"

"বললেই হল?" নবতারণ আবার কটমট করে তাকান। তারপর একটু ভেবেচিন্তে বললেন, "না হয় তাই হল। কিন্তু শালাটা তাহলে কী করে হচ্ছেন?"

বড়বাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "ওঁর এক দিদি আবার আমার স্ত্রী কিনা।"

"তাতে কী হল? ওঁর দিদি আপনার স্ত্রী মানে আপনি ওঁর কী হলেন?"

"ভগ্নীপতি।"

"তাহলে শালাটা আসছে কোত্থেকে? এ তো ভারী গোলমেলে ব্যাপার দেখছি।"

"আজ্ঞে, ভগ্নীপতিদের শালা থাকেই।"

নবতারণ টাক চুলকোতে-চুলকোতে ডাক দিলেন, "দরোয়াজা!"

ফটকের সিপাই দৌড়ে এসে সেলাম দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

নবতারণ হুঙ্কার দিলেন, "তুই কার জামাই?"

"জি, আমি সীতারামপুরের দশরথ ওঝার জামাই।"

"তাহলে তুই কার শালা হলি?"

"আমি কারো শালা-উলা নই।"

"তবে?" নবতারণ বড়বাবুর দিকে চাইলেন।

বড়বাবু মাথা চুলকে বললেন, "ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনি নিজের ঘাড়ে ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবেন। মানে ধরুন, আপনি নিশ্চয়ই কারো জামাই, আবার হয়তো কারো শালাও।"

নবতারণ হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন, "নিজের পরিবার নিয়ে ভাবি নাকি? মনে করেন কী আমাকে? দিন-রাত চোর-জোচ্চোর ধরে বেড়াব না সারা দিন বসে কে কার শালা আর কে কার জামাই তাই নিয়ে ভাবব? তাছাড়া পারিবারিক সম্পর্কগুলোও ভারী গোলমেলে। আমার স্ত্রীর এক বোনকে তো আমি আমার ননদ বলে ফেলেছিলাম, তাইতে স্ত্রী আমাকে এই মারে কি সেই মারে।" বলে নবতারণ আবার গর্জন করে সেপাইকে বললেন, "এই দরোয়াজা, তোর বোন আছে?"

"আজ্ঞে।"

"তার বিয়ে দিয়েছিস?"

"আজ্ঞে।"

"বোনের স্বামীর কি তুই শালা হলি তবে?"

সেপাইটা এতক্ষণে ফটকে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছে। সে দারোগাবাবুকে খুশি করতে খুব দৃঢ় স্বরে বলল, "কক্ষনো নয়।"

নবতারণ বিজয়ীর মতো বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তবে?"

বড়বাবু মাথা চুলকে বললেন, "এক্ষেত্রে সম্বন্ধী হবে।"

নবতারণ আবার হাঁক মারলেন, "দরোয়াজা!"

"আজ্ঞে।"

"তুই কি তোর বোনের স্বামীর সম্বন্ধী?"

দরোয়াজা সে কথার জবাব দিল না, শুধু বিকট একটা ডাইভ মেরে দরজার চৌকাঠ বরাবর লম্বা হয়ে মেঝেয় পড়ে চেঁচাতে লাগল, "আহা হা! লেজটা হাতে পেয়েও রাখতে পারলাম না! আঃ হায় রে! একটুর জন্য হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল রে!"

নবতারণ লাফিয়ে উঠলেন, "কী হয়েছে, অ্যাঁ? কী হয়েছে?"

ততক্ষণে থানায় হুলুস্থুল পড়ে গেছে, সেপাইরা দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে, কুকুররা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

শালা সম্বন্ধী জামাই নিয়ে কূটকচালির সময় ফাঁক বুঝে ঘটোৎকচ সুট করে কেটে পড়েছে।

পাতুগড়ের আমবাগান নিঃঝুম হয়ে আসার পর বনমালী গাছ থেকে নেমে এসে চারটে টু দিল। টু শুনে আর তিনটে গাছ থেকে তার তিন স্যাঙাত নেমে এল।

বনমালী জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী রে?"

ফুচুলাল বলল, "আজ্ঞে ঠিক ঠাহর পেলাম না। তবে মনে হল গাছ থেকে মাধববাবু পড়ে গেলেন আর তারপর সেপাইরা ভূত-ভূত বলে চেঁচিয়ে পালাল।"

বনমালী গম্ভীর হয়ে বলল, "এক্ষুনি সব কর্তাকে খুঁজতে লেগে যাও। খুঁজে বের করতেই হবে। হাঁক-ডাক করতে থাকো, শুনতে পেলে কর্তা সাড়া দেবেন।"

সুতরাং বনমালী আর তার স্যাঙাতরা প্রাণপণে মাধবকে ডাকতে-ডাকতে চারদিকে চলে গেল।

কিন্তু নন্দকিশোরকে গিলে ফেলার কিছুক্ষণ বাদেই মাধবের ভীষণ হাই উঠতে লাগল, গায়ে হাতে আড়মোড়া ভাঙতে লাগলেন। তারপর এই প্রচণ্ড শীতেও গাছতলায় শুয়ে ঢলাঢল ঘুমোতে লাগলেন। সে ঘুম ভাঙায় কার সাধ্যি! আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে জায়গায় শুয়ে ছিলেন, সেখানে তাঁকে খুঁজে বের করার সাধ্যিও কারও ছিল না।

ভোরের দিকে আলো যখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে, তখন গাছ থেকে জাম্বুবান ঘটোৎকচ তাঁকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে নামল, এবং প্রচন্ড কিচিরমিচির শব্দ করে আহ্লাদ প্রকাশ করতে লাগল। কখনো চুল টানে, কখনো চিমটি কাটে, কখনো গা ধরে ঝাঁকায়।

মাধব ধীরে-ধীরে চোখ খুললেন। মাধববাবু টের পাচ্ছিলেন, এই পৃথিবীতে তাঁর আপনজন বলে কেউ নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ের রাতে রাগ করে চলে এসেছিলেন। সেই থেকে শ্বশুরবাড়ির কোনো প্রাণীও তাঁর খোঁজ নেয় না। এমনকী, বিয়ে-করা বউও নয়। বড়বাবুর বাড়িতে যত্নেই আছেন বটে, কিন্তু সেও তো ভগ্নীপতির বাড়ি, নিজের বাড়ি তো নয়। নিজের বলতে ছিল হেতমগড়ের প্রাসাদ, তা সেও সরস্বতীর গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এইসব ভেবে মনটা বরাবরই তাঁর একটু বিষণ্ণ থাকে। তার ওপর কাল পুলিসের অত্যাচার এবং ভূতের তাড়নায় আরও কাতর হয়ে পড়েছেন মাধব। এই দুঃসময়ে ঘটোৎকচকে পেয়ে বড় ভাল লাগল। আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ''প্রাণের টান যাবে কোথায়? দুনিয়ায় এখন তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই।''

ঠিক এই সময়ে বনমালী ঝোপঝাড় ভেঙে সামনে হাজির হয়ে এক গাল হেসে বলল, "না, আজ্ঞে, আমরাও আছি।"

মাধব বনমালীকে দেখে অকূলে কূল পেলেন। বললেন, "আঃ, বাঁচালি বাবা বনমালী।"

''বাঁচার এখনো একটু কষ্ট আছে কর্তা। পুলিস বাগান ঘিরে ফেলতে আসছে। আলো ফুটবার আগেই আমাদের নদী পেরিয়ে যেতে হবে। এবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। উঠে পড়ুন।''

পুলিসের নামে মাধব বাধ্য ছেলের মতো উঠে পড়লেন। বললেন, "চল।"

বর্ষাকালে ভয়ঙ্করী হলেও এই শীতে সরস্বতীর জল খুব কম। বড়-বড় বালির চর জেগে উঠেছে। চরের এপাশ-ওপাশ দিয়ে ক্ষীণ জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। হাঁটুর বেশি জল কোথাও নেই। কাজেই নদী পেরোতে কারোই কষ্ট হল না। ঘটোৎকচ বনমালীর কাঁধে চেপে দিব্যি আরামে পেরিয়ে গেল। পুলিস যখন বাগান ঘিরে কুকুর ছেড়েছে ততক্ষণে নদীর ওপারের জঙ্গলে অনেকখানি সেঁধিয়ে গেছেন মাধব আর তাঁর দলবল।

আগের দিন বিকেল থেকে কারো খাওয়া নেই। খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে। এই শীতে আম কাঁঠাল না হলেও জঙ্গলে বিস্তর পুঁতির মতো ছোটো-ছোটো বুনো কুল আর বনকরমচা ফলে আছে। মিষ্টি যেন গুড়। কাঁটাঝোপে সেঁধিয়ে ঘটোৎকচ থোপা থোপা সেইসব ফল ছিঁড়ে আনল। কারোই পেট ভরল না তাতে, তবে পিত্তদমন করা গেল।

বড়-সড় একটা শিমুল গাছের তলায় বসে সবাই জিরিয়ে নিচ্ছে। বনমালী আর তার স্যাঙাতরা জিরিয়ে নিতে গিয়ে ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘটোৎকচ গাছে উঠে চৌকি দিতে লাগল। মাধব একা বসে তাঁর জীবনটার কথা ভাবছিলেন। তাঁর ধারণা, বিষয়সম্পত্তি না থাকাতেই কেউ তাঁকে খাতির করে না। ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আর দীর্ঘশ্বাসটার সঙ্গেই বেরিয়ে এল নন্দকিশোর। সেই বিঘত খানেক ধোঁয়াটে চেহারা। তার মধ্যেই চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "তুমি চোর নও বটে, কিন্তু খুব ভাল লোকও নও বাপু।''

মাধব ধমক দিয়ে বললেন, "এই আপনার দশ মিনিট?"

''তোমাদের দশ মিনিট আর আমাদের দশ মিনিট তো আর এক নয় বাপু। তাছাড়া ভিতরে বেশ নরম-গরম আবহাওয়া, একটু ঝিমুনিও এসে গিয়েছিল।"

"আমি তখন থেকে ভয়ে মরছি।"

নন্দকিশোর গম্ভীর মুখে বলে, "ভিতরে যা দেখলাম তা কহতব্য নয়। তুমি তো মহা পাজি লোক হে! একেই তো ভয়ঙ্কর রাগী, তার ওপর বাতিকগ্রস্ত, বুদ্ধিটাও বেশ ঘোলাটে, ধৈর্য সহ্য ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বলে কিছুই নেই তোমার। উন্নতি করার ইচ্ছেও তো দেখলাম না।"

এই সব গা-জ্বালানো কথায় কার না হাড়পিত্তি জ্বলে ওঠে! তদুপরি মাধবের ওপর দিয়ে একটা ঝড়ই তো যাচ্ছে! তিনি তেড়িয়া হয়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি!"

নন্দকিশোর খিক করে হেসে বলল, "কেন, আবার মারবে নাকি?''

গত রাত্রির কথা ভেবে মাধব কিছু ধাতস্থ হয়ে বললেন, "আমার মায়াদয়া নেই একথা ঠিক নয়।"

নন্দকিশোর আবার খিক করে হাসে। তারপর বলে, "সে কথা থাক। তোমার ভিতরে ঢুকে আর-একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। ফোকলা মুখ দেখে তোমাকে আমি বুড়ো মানুষ ভেবেছিলাম, ভিতরে গিয়ে দেখলাম তুমি মোটেই বুড়ো নও, তরতাজা জোয়ান। তা দাঁতগুলো এই অল্পবয়সে খোয়ালে কী করে? মাজতে না বুঝি! হুঃ, দাঁত ছিল আমার। তোমার মতো বয়সে খাসির মাথা মুড়মুড় করে চিবিয়ে খেয়েছি, ঠিক যেমনভাবে লোকে মুড়ি খায়।"

মাধব বললেন, "আমার মতো আস্ত সুপুরি চিবিয়ে খেতে হলে বুঝতেন। দাঁতের কেরদানি বেরিয়ে যেত।"

"সুপুরি খেলে দাঁত পড়ে যায় এই প্রথম শুনলুম। সে যাকগে. তোমার ভিতরটা আমাকে আরো একটু ভাল করে দেখতে হবে।"

মাধব আঁতকে উঠে বললেন, "আবার ঢুকবেন নাকি?"

"আলবত ঢুকব। তোমার মতো অপদার্থকে মানুষ করতে হলে বিস্তর মেহনত দিতে হয়। তোমার মগজটা তো দেখলাম শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে আছে। বুকের মধ্যে যে থলিটাতে সাহসের গুঁড়ো ভরা থাকে সেই থলিটা দেখলাম চুপসে আছে। অর্থাৎ, যতই তড়পাও, আসলে তুমি অতি কাপুরুষ লোক। চোখের বায়োস্কোপের পর্দাটাও বেশ ময়লা, অর্থাৎ তুমি দিনকানা রাতকানা মানুষ। চোখের সামনের জিনিসটা দেখেও দেখতে পাও না। এত যার অগুণ, তার আবার অত দেমাক কিসের?"

মাধব মিনমিন করে বললেন, "এত সব কথা কেউ আমাকে কোনোদিন বলেনি।"

এইসময় হঠাৎ নন্দকিশোর একটু কেঁপে উঠে বলে, "একটা বিটকেল গন্ধ আসছে কোত্থেকে বলো তো? ভারী বিচ্ছিরি গন্ধ!''

বলতে না-বলতেই হঠাৎ গাছের মগডাল থেকে তরতর করে ঘটোৎকচ নেমে এল আর হুপহাপ করে লাফাতে লাগল।

নন্দকিশোর শিউরে উঠে 'ওরে বাবা' বলে চেঁচিয়ে পলকের মধ্যে মাধবের কানের ভিতরে ঢুকে গেল।

"করেন কী, করেন কী!'' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে মাধব কানে আঙুল ঢুকিয়ে বিস্তর খোঁচাখুঁচি করলেন। কিন্তু নন্দকিশোরের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। ভারী সুড়সুড় করছিল কানটা।

ঘটোৎকচের লাফালাফিতে বনমালী আর তার স্যাঙাতরা উঠে বসেছে। বনমালীর ইঙ্গিতে টিকটিকি-বিদ্যে-জানা লোকটা নিমেষে একটা শিশুগাছ বেয়ে মগডালে উঠে গেল, আবার সরসর করে নেমে এসে বলল, "ভীষণ বিপদ। অন্তত শ-দুই পুলিস নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে এদিকে আসছে।"

বনমালী চোখ কপালে তুলে বলে, "বলিস কী? আমাদের

মতো ছিঁচকে চোর ধরতে এত পুলিস! মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিছু গুরুচরণ।"

মাধব ভয়ে কাঁপছিলেন। কানের মধ্যে নন্দকিশোর, পিছনে নবতারণ। বললেন, "তাহলে?"

বনমালী বলে, "কুছ পরোয়া নেই। এ হল হেতমগড়ের জঙ্গল। এর সব ঝোপঝাড়, গর্ত, খানাখন্দ আমাদের নখদর্পণে। এমন জায়গায় গা ঢাকা দেব যে, দশ বছর খুঁজেও পুলিস আমাদের পাত্তা পাবে না।"

সামনের বেলে জমিতে অনেকখানি কাশবন। তারপর আরো গহিন জঙ্গল। কাশবন বেরিয়ে সবাই সেই গহিন জঙ্গলের ধারে পোঁছে গেল। বনমালী বলল, "কর্তা, একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন।"

বিজয়পুরের রায়বাহাদুর হেরম্ব রায় অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। অপদার্থ মাধব চৌধুরীর সঙ্গে ছোট মেয়ে ফুলির বিয়ে দেওয়ার পর থেকেই তাঁর মেজাজ খাট্টা হয়ে আছে। সত্য বটে হেতমগড়ের জমিদারদের একসময়ে খুব রবরবা ছিল, তাদের বংশও ভাল, বিজয়পুরের পাল্টি ঘর। দশ-বিশ বছর আগেও হেতমগড়ের চৌধুরী-বাড়িতে মেয়ে বা ছেলের বিয়ে দিতে পারলে যে-কেউ ধন্য হয়ে যেত। হেরম্ব রায় অবশ্য ধন্য হওয়ার লোক নন, কিন্তু তিনিও এই বিয়েতে খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর শালীদের ঠাট্টায় জামাইটা যে এমন আহাম্মুকির কাজ করবে তা জানবেন কী করে? শালীরা নাড়ুর মধ্যে সুপুরি দিয়েছিল। তা ওরকম তো শালীরা করেই থাকে। হেরম্ব রায়ের নিজের বিয়ের সময় তাঁর শালীরা পানের মধ্যে ধানী লঙ্কা দিয়েছিল, লুচির মধ্যে ন্যাকড়ার টুকরো ভরে দিয়েছিল, নুন-গোলা শরবত খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল। তিনি কোনো ফাঁদে ধরা দেননি। কিন্তু তাঁর আহাম্মক ছোট জামাই বাহাদুরি দেখাতে আস্ত সুপুরি চিবিয়ে খেতে গিয়ে দাঁতগুলোর বারোটা বাজাল। খবর পেয়েছেন, জামাই এখন বাঁধানো দাঁত পরে থাকে। ছিঃ ছিঃ! একে তো ঐরকম গবেট, তার পর আবার আছে আঠারো আনা তেজ। বিয়ের পরদিনই শ্বশুরবাড়ির সংস্রব ছেড়ে চলে গেছে, আর ওমুখো হয় না।

হেরম্ব রায় ভেবেছিলেন, ওরকম জামাইয়ের মুখদর্শন আর করবেন না। হেতমগড়ের সেই নামডাকও আর নেই। সরস্বতীর বানে বিষয়সম্পত্তি সবই জলে গেছে। জামাইটা তার জমিদার ভগ্নীপতির গলগ্রহ হয়ে আছে। এমন জামাইকে জামাই বলে স্বীকার করতেও লজ্জা হয়।

কিন্তু বাদ সেধেছে ফুলি। এতকাল সে চুপচাপ ছিল বটে, কিন্তু হঠাৎ এক রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে, জামাই হতচ্ছাড়া নাকি একটা গ্যাস-বেলুন ধরে ঝুলে-ঝুলে আকাশ দিয়ে যাচ্ছে। এ-বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় নাকি সে বলে গেছে, "তিব্বতে সন্ন্যাসী হতে চললুম। আর ফিরব না।" সেই থেকে মেয়ে বেঁকে বসেছে, বাপের বাড়িতে আর থাকবে না। পাগল হোক, বোকা হোক, গলগ্রহ হোক, মাধবকে ফিরিয়ে আনতে হবে। দরকার হলে সে গাছতলাতেও থাকতে রাজি।

শুনে প্রথমটায় হেরম্ব ভীষণ চটে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ফুলি হেরম্ব রায়েরই মেয়ে তো। তেজ তারও কিছু কম নয়। সে সোজা গোটা দশেক করবী ফুলের বিচি আর একটা নতুন দড়ি নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে দোর দিয়েছে। দুদিন ধরে দরজা ঠায় বন্ধ। বাইরে থেকে মা পিসি মাসি কাকা ভাই বোনের কাকুতি-মিনতিতেও দরজা এতটুকু ফাঁক হয়নি। ফুলি বলে দিয়েছে, তিনদিনের মধ্যে ছোট জামাইকে সসম্মানে হাজির করা না হলে সে হয় বিষ খাবে, নয়তো গলায় দড়ি দেবে, কিংবা দুটোই একসঙ্গে করবে। সেই থেকে হেরম্ব আর বেশি কিছু বলার সাহস পাননি।

জামাইয়ের খোঁজে গতকাল তার ভগ্নীপতির বাড়িতে লাঠি-য়াল আর বরকন্দাজ পাঠিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসে খবর দিল, জামাই নাকি রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অগত্যা মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে তিনি চতুর্দিকে লোক-লশকর পাঠালেন। অবশেষে লাতনপুর থেকে লোকে এসে খবর দিল, ফুটবল খেলার মাঠে বন্দুক নিয়ে হামলা করার জন্য ছোট জামাইকে পুলিসে গ্রেফতার করেছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মাধবের অন্য যে-কোনো দোষ থাক সে যে এত বড় গুণ্ডা তা হেরম্বর জানা ছিল না। তবু খবরটা শুনে হেরম্ব তেমন দুঃখ পাননি। হাজতের ভাত খেয়ে আহাম্মকটার বুদ্ধিটা একটু খুলতে পারে। তাছাড়া থানায় আটক থাকলে আর যখন-তখন এদিক-সেদিক পালাতেও পারবে না।

কিন্তু কাল রাতে নায়েব এসে খবর দিল, জামাই আরো কয়েকজন আসামীকে নিয়ে হাজত ভেঙে পালিয়েছে। এ-রকম বিপজ্জনক জামাই হেরম্বর আর একটিও নেই। কালে-কালে কত কী-ই যে হচ্ছে!

কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না। তাই তিনি জামাইকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কাল রাত বারোটার মধ্যে জামাইকে হাজির না করতে পারলে মেয়ে ফুলি আত্মঘাতী হবে কাজেই সময়ও আর হাতে নেই।

দশ হাজার টাকার লোভে পুলিস, গেরস্ত, চাষা, সবাই মাধবের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। সুতরাং জামাই ধরা পড়বেই।

হেরম্ব জামাইয়ের খবরের জন্য উদগ্রীব হয়ে দোতলার মস্ত বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। এই সময়ে তাঁর এক চর এসে খবর দিল, "রায়মশাই, আপনার জামাই হেতমগড়ের গভীর জঙ্গলে ঢুকেছেন। উদ্ধারের আশা খুবই কম। কারণ সেখানে চিতাবাঘ ভালুক নেকড়ে বুনো মোষ অজগর, কী নেই! দিনে দুপুরে সেখানে ঘোর অন্ধকার। বিশাল বিশাল গাছ, লতাপাতা, বিছুটিবন, চোরাবালি, দহ সবই সেখানে আছে।"

হেরম্ব বললেন, "কী সর্বনাশ! হেতমগড়ের জঙ্গল যে সর্বনেশে জায়গা! আমি পুরস্কার ডবল করে দিলাম। তোমরা সব বেরিয়ে পড়ো।"

শুনেই চররা বাঁই-বাঁই করে ছুটল।

হেতমগড়ের জঙ্গলে নবতারণ দারোগাও খবরটা শুনলেন। শুনেই কোমরবন্ধটা আরো একটু কষে এঁটে নিয়ে পঞ্চাশটা বৈঠকি আর পঞ্চাশটা বুকডন দিয়ে ফেললেন। সেপাইরা জঙ্গল ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে হেদিয়ে পড়েছিল, খবর শুনে তারাও চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ওদিকে প্রথম চোটে জঙ্গলে ঢুকেই মাধব জায়গাটার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন. এমন বিচ্ছিরি গহন আর অন্ধকার জঙ্গল তিনি দেখেননি জীবনে।

সবার আগে বনমালী, তারপর রেলগাড়ির কামরার মতো এ ওর কোমর ধরে প্রথমে মাধব এবং বনমালীর স্যাঙাতরা। ঘটোৎ মাধবের কাঁধে উঠে বসে আছে।

বেশ যাচ্ছিল সবাই। এর মধ্যেই হঠাৎ পিছন থেকে খাউ-খাউ করে কুকুরগুলো তেড়ে এল। প্রাণের ভয়ে রেলগাড়ি ভেঙে যে যার মতো দৌড়োতে লাগল।

একটু বাদেই মাধব দেখেন, তাঁর সঙ্গীদের চিহ্নও নেই। ঘটোৎকচকে কাঁধে নিয়ে তিনি একা বেকুবের মতো ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। এই জঙ্গলে পুলিস তাঁকে খুঁজে পাবে না ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেও যে নিজেকে খুঁজে পাবেন মনে হচ্ছে না।

এই সময়ে হুপ করে ঘটোৎকচ কাঁধ থেকে নেমে মাধবের
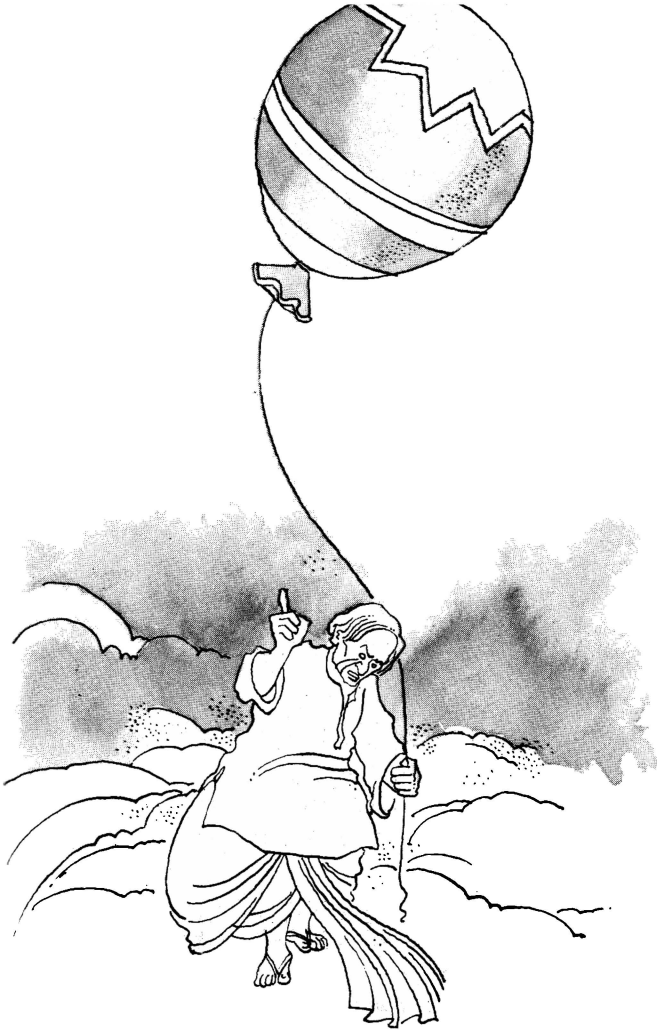
দিকে নিজের লেজটা বাড়িয়ে দিল। ইঙ্গিত বুঝে মাধব লেজটা দুহাতে চেপে ধরলেন।

ঘটোৎকচ শাল, শিশু, সেগুন, জিকা, বাবলা— হাজারো গাছ-গাছালি আর ঘন ঝোপঝাড় এবং লতাপাতার ভিতর দিয়ে মাধবকে নিয়ে চলল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা মাধব বুঝতে পারলেন না, তবে ঘটোৎ যে বুদ্ধি করে ঠিক জায়গাতেই তাকে নিয়ে তুলবে এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। দু-একবার লতায় পা জড়িয়ে আছাড় খেলেন মাধব। তবে ঘন ঝোপঝাড়ে পড়ে যাওয়ায় চোট পেলেন না। কাঁটা-গাছে লেগে গা দু-চার জায়গায় ছড়ে গেল। শুঁয়োপোকার হুল লেগে ঘাড়টা জ্বালা করতে লাগল। তবে এরকম ছোটখাটো বিপদ ছাড়া বড় কোনো অঘটন ঘটল না। জঙ্গলের জীব ঘটোৎকচ খুব সাবধানেই টেনে নিয়ে যেতে লাগল তাঁকে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও-কোথাও হঠাৎ গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদের দেখা পাওয়া যায়। কোথাও ঝিঁঝি ডাকে, দু-একবার হরিণের বিচ্ছিরি কাসির শব্দও পেলেন। কাসি নয়, ওটাই হরিণের ডাক। আশেপাশে বনমোরগেরাও থেকে থেকে ডাক দিয়ে জানান দিচ্ছে যে, এ জঙ্গলটা মানুষের জন্য নয়। পায়ের তলায় মাঝে-মাঝে কাদা জমি টের পাচ্ছেন মাধব, কখনো ভেজা গাছের পাতা জমে গালিচার মতো নরম বস্তুর ওপর আরামে পা ফেলছেন। এক জায়গায় একটা ঝর্নার জল বয়ে যাচ্ছে দেখে দু কোষ ঠান্ডা জল খেয়ে নিলেন। কঁত করে একটা শ্বাস ফেলে ভাবলেন, এই জঙ্গলেরই কোথাও আমাদের বসতবাড়িটা ছিল।

আবার অন্ধকার জঙ্গলে ঢুকে চলেছেন তো চলেছেনই। পথ আর ফুরোয় না। ঘটোৎকচেরও কি ক্লান্তি নেই? মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে লেজটা ছেড়ে দুহাতে জামা তুলে মুখ মুছে নিচ্ছেন। আবার শেষ অবলম্বনের মতো, শিবরাত্রির সলতের মতো লেজটা চেপে ধরছেন।

একসময়ে মাধবের মনে হল, লেজটা যেন কিছু মোটা মনে হচ্ছে! মনের ভুলই হবে। তবু লেজটা একটু হাতিয়ে দেখে নিলেন। সন্দেহটা থেকেই যাচ্ছে। লেজটা কিছু মোটাই।

আস্তে করে ডাকলেন, "ঘটোৎ! এই ঘটোৎ!"

ঘটোৎকচ সাধারণত হুপ বলে জবাব করে।

কিন্তু মাধব কোনো হুপ শুনতে পেলেন না।

ভয়ে-ভয়ে আবার ডাকলেন, "ঘটোৎ রে! বাবা ঘটোৎকচ!"

জবাব দিল না কেউ। কিন্তু দিব্যি সরসর করে টেনে নিয়ে চলল ঠিকই। নিকষ কালো একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছেন মাধব। বাইরে বোধহয় সন্ধেও হয়ে এল। তাই সামনে কিছুই নজরে পড়ছে না। মাধব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কী খেয়ে হঠাৎ এত মোটা হয়ে গেলি বাপ ঘটোৎকচ!"

কেউ জবাব দিল না। তবে গতি অব্যাহত রইল।

হাঁটতে-হাঁটতে হয়রান হয়ে গেলেন মাধব। হঠাৎ টের পেলেন জঙ্গলটা যেন একটু পাতলা হয়ে আসছে। আকাশের দিকে তাকালে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দু-একটা তারার চিকিমিকি, একটু জ্যোৎস্নার মলম দেখা যায় যেন!

বড়-বড় গাছের সারি শেষ হয়ে হঠাৎই বেঁটে-বেঁটে ঝোপ-ঝাড়ে পড়লেন মাধব। বেশ জোরেই যাচ্ছেন। তারপরই দেখেন, জ্যোৎস্নায় সামনে একটা জলা দেখা যাচ্ছে। জলার ধারে ধারে মাঝে-মাঝে দপ-দপ করে মশালের মতো আলেয়ার আলো জ্বলে উঠছে। ঘটোৎকচও বেশ আস্তে চলছে এখন। একবার থেমেও পড়ল। হাঁফ ছেড়ে মাধব এতক্ষণে লেজটার দিকে তাকানোর ফুরসত পেলেন।

যা দেখলেন তাতে বেশ অবাকই হওয়ার কথা। ঘটোৎকচের লেজে কে বা কারা কালো আর হলুদ রঙ দিয়ে চিত্তির-বিচিত্তির করে দিয়েছে। ফলে লেজটা আর আগের মতো বিচ্ছিরি দেখতে নেই। বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে।

"বাঃ! বাঃ!" বলে মাধব লেজটায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোর সারা গা'টা এরকম চিত্তির-বিচিত্তির হলে দেখতে বেশ সুন্দর হয়ে উঠবি রে ঘটোৎ!"

বলতে-বলতে তিনি ঠাহর করে দেখেন, শুধু লেজ নয়, ঘটোৎকচের শরীরেও কালো আর হলুদ ছোপছক্কর দেখা যাচ্ছে। তবে বেঁটে গাছের জঙ্গলে শরীরের বারো আনাই ডুবে আছে বলে শুধু পিঠটাই দেখতে পেলেন মাধব।

মাধব খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ! বাঃ! তোকে যে আর চেনাই যায় না রে ঘটোৎ!"

বলতে না বলতেই বেঁটে ঝোপের আড়াল থেকে জলার ধারের ফাঁকা জমিতে পা দিলেন মাধব। জ্যোৎস্নায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে বিশাল জলাটাকে। চারধারে নিবিড় জঙ্গল। অল্প কুয়াশায় ভারী স্বপ্ন-স্বপ্ন দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড শীত যেন পাথর হয়ে জমে আছে এখানে।

এই শীতের হাঁটাহাঁটির পরিশ্রমে মাধবের কপালে ঘাম জমেছে। ঘটোৎকচের লেজে একটা টান মেরে মাধব বললেন, "একটু থাম বাবা ঘটোৎ। জিরিয়ে নিই।"

লেজে টান পড়ায় ঘটোৎ ঘর-র-র শব্দ করল। মাধব অবাক হলেন। চেহারার সঙ্গে-সঙ্গে কি ঘটোৎকচের স্বভাবটাও পাল্টে গেল! ঘটোৎ এরকম গম্ভীর আওয়াজ কখনো করে না তো!

ঘটোৎকচ একটু রেগেই গেছে। ঘর-র-র শব্দের পর ধীরে-ধীরে মুখটা ফিরিয়ে মাধবের দিকে তাকাল সে।

মাধব হিম হয়ে গেলেন। স্ট্যাচু হয়ে গেলেন। একটা আঙুলও নাড়বার ক্ষমতা রইল না আর।

ঘটোৎকচ ভেবে যার লেজ কষে ধরে আছেন, সেটা এক মস্ত চিতাবাঘ।

লেজটা ছেড়ে দিয়ে যে দৌড় দেবেন তারও উপায় নেই। আঙুলগুলো লেজটাকে যেমন ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে ঠিক সেইভাবেই আড়ষ্ট হয়ে গেল। চেষ্টা করেও আঙুলের সেই বজ্র আঁটুনি খোলার উপায় নেই।

বাঘটা জুলজুল করে চেয়ে আছে। মাধবও চেয়ে আছেন। কেউ কারো চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না। বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধটা এখন বেশ নাকে আসছে মাধবের। কোনো ভুল নেই, সামনের জন্তুটা বাঘই বটে। জঙ্গলের অন্ধকারে কোন্ সময়ে যে লেজ-বদল হয়েছে তা টেরও পাননি মাধব।

কয়েক মিনিট সম্মোহিতের মতো থাকার পর মাধব গলার স্বর ফিরে পেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে অনেকদিনের পুরনো একটা ছড়ার লাইন বিড়-বিড় করে বলতে লাগলেন, "দোহাই দক্ষিণরায়, এই করো বাপা। অন্তিমে না পাই যেন চরণের থাপা॥"

ঠিক এই সময়ে মাধবের ডানদিকের কানটা ভারী সুড়সুড় করে উঠল। নন্দকিশোরের মুণ্ডুটা তাঁর ডান কানের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে বলে উঠল, "যাক বাবা! বাঁদরটা ধারে-কাছে নেই দেখছি। বাঁচালে!"

মাধব কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "বাঁদর না থাক, বাঘ তো আছে!"

নন্দকিশোর এক গাল হেসে বলল, "বাঘকে ভূতের কোনো পরোয়া নেই। বাঘের ব্যাপার তুমি বুঝবে।"

কাঁপতে-কাঁপতেই মাধব দাঁতে-দাঁতে ঠকাঠকের মধ্যে বললেন, "বাদরকেই কি আপনার সবচেয়ে ভয়?"

খিক-খিক করে একপেট হেসে নন্দকিশোর বলে, "গুপ্ত ব্যাপারটা ধরে ফেলেছ দেখছি। কী জানো, ঠিক ভয় নয়। বাঁদরের গায়ের একটা ভুটভুটে গন্ধ আছে, সেইটে আমাদের একদম সহ্য হয় না। তা তুমি দেখছি বেশ বাঘা লোক হে, এমনিতে ভিতু হলেও দিব্যি একটা বড়সড় বাঘকে পাকড়াও করেছ! চিড়িয়া-

খানায় বেচবে নাকি ?''

''আজ্ঞে, ঠিক পাকড়াও করিনি। জঙ্গলে লেজবদল হয়ে গেছে। এখন ছাড়তে পারছি না। আঙুলগুলো জট পাকিয়ে আছে।''

''অ, তাই বলো! ভয়ে তোমার আঙুলে খিল লেগেছে! আমি তো নিজের চোখে ভিতরে ঢুকে দেখে এসেছি, তোমার সাহসের থলি চুপসে আছে। তাই বাঘের লেজ ধরে তোমার দাঁড়ানোর পোজ দেখে ভারী খটকা লাগছিল।''

ঠিক এই সময়ে বাঘটা বলল, ঘর-র-র...ঘ্যাও!

মাধব আপাদমস্তক আর একবার কেঁপে উঠলেন। এত কাছ থেকে এত জোরে বাঘের ডাক তিনি কোনোদিন শোনেননি। নন্দকিশোর তাঁর অবস্থা দেখে একটু নরম করে বলল, ''আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি কী করা যায়।''

এই বলে নন্দকিশোর আবার কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। মাধবের কান সুড়সুড় করে উঠল আবার। কিন্তু আঙুল দিয়ে কানের ফুটো যে একটু চুলকোবেন তার উপায় নেই। হাত দুটো বাঘের লেজে সেঁটে আছে।

একটু বাদে হঠাৎ মাধব যেন একটু সাহস পেতে লাগলেন। আর যেন ততটা ভয় করছিল না। বাঘটা যদিও তাঁকে জলার দিকে ধীরে-ধীরে টেনে নিয়ে যেতে-যেতে মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখছে আর লকলকে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে, তবু মাধবের যেন একটু বেপরোয়া ভাব এল। হাত দুটোও যেন ক্রমে বাঘের লেজ থেকে খসে আসছে।

নন্দকিশোর এবার নাকের ফুটো দিয়ে উঁকি দেওয়ায় মাধব বার-দুই প্রকাণ্ড হ্যাঁচ্চো দিয়ে বললেন, ''কী হল ?''

নন্দকিশোর চোখ পাকিয়ে বলল, ''আচ্ছা অভদ্র তো হে! আমার গায়ের ওপর হেঁচে দিলে ?''

মাধব ক্ষমা চেয়ে বললেন, "নাকে সুড়সুড়ি লাগল কিনা।"

নন্দকিশোর ক্ষমা করে দিয়ে বলল, "কোনো রকমে তোমার সাহসের থলিটাকে ফুঁ দিয়ে বেলুনের মতো ফুলিয়ে একটা শিরা দিয়ে বেঁধে দিয়ে এসেছি। সেটাতে তেমন কোনো স্থায়ী কাজ হবে না বটে, তবে চোপসানো থলির চেয়ে তা অনেক ভাল। আপাতত এইতেই কাজ চালিয়ে নাও। আমি আবার ভিতরে চললুম, সেখানে আমার অনেক কাজ।"

মাধব আর আগের মতো ভিতু নন, তাই গম্ভীর গলায় বললেন, ''কী কাজ ?''

''তোমার শুকনো মগজটাকে জল ছিটিয়ে একটু সরস করে তুলতে হবে। রাগের ঝালগুঁড়োগুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে। মায়া দয়া স্নেহ মমতার কয়েকটা চারাগাছ পুঁতে দিতে হবে। তারপর যদি একটু মানুষের মতো মানুষ হও।''

এই বলে নন্দকিশোর আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

জলার কাদামাটিতে মাধবের হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছিল ভুসভুস করে। আর একটু এগোলেই কোমর পর্যন্ত ডুববে। তাহলে আর কাদার কবর থেকে জীবনেও উঠে আসতে পারবেন না। বাঘের সে ভয় নেই, চারপায়ে দিব্যি হালকা-পলকা চালে চলে যাচ্ছে নরম মাটির ওপর দিয়ে!

মাধব দম বন্ধ করে প্রাণপণে এক ঝটকা মারলেন। হাত দুটো ঝড়াস করে খুলে দুটো লাঠির মতো শরীরের দুধারে ঝুলতে লাগল। একেবারে অবশ।

শিকার পালাচ্ছে বুঝে বাঘটাও থামল এবং আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ঘর-র-র...ঘ্যাও।

মাধবও চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, ''মামদোবাজি পেয়েছ ? কাদায় ডুবিয়ে মারবে! এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দেব!'' বলে চড়ও তুললেন। কিন্তু বাঘটা মুখ সরিয়ে নেওয়ায় চড়টা লাগল না। কিন্তু একটা খুব উপকার হল মাধবের। হাতের অবশ ভাবটা কেটে গেল।

মাধব দেখলেন বাঘটা আর ঝামেলা না বাড়িয়ে জলার দিকে জল খেতে গেল। তিনিও হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ঠাণ্ডা কাদা ভেঙে ডাঙা জমিতে উঠে এসে একটা শুকনো জায়গায় মস্ত একটা গাছ পড়ে আছে দেখে তার ওপর বসলেন। ক্লান্তিতে হাত-পা অবশ করে চোখ জড়িয়ে আসছে। এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে পারে তা মনে করেও কিছুতেই জেগে থাকতে পারছেন না। চোখের পাতা দুটো এত জুড়ে যাচ্ছে যে, আঙুল দিয়ে টেনে খুলে রাখতে হচ্ছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলেন, চিতাবাঘটা জলায় জল খাচ্ছে। তার আশে-পাশে জলার অন্য ধারগুলিতে তিনি আরও কয়েকটি প্রাণীকে দেখতে পেলেন। একজোড়া মোষ, একটা ভালুক, গোটা কয়েক মস্ত শম্বর হরিণ। কিন্তু ঠিক আগের মতো আর ভয় পাচ্ছেন না। নন্দকিশোর সাহসের থলিটা ভালই ফুলিয়েছে বলতে হবে। এখন যদি লিক-টিক না বেরোয় তবেই বাঁচোয়া।

মাধব গাছের গুঁড়িটার পাশেই লম্বা হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল বেলায় সূর্য যখন উঠি-উঠি করছে তখন ঘুম ভাঙল মাধবের। এই শীতে সারা রাত বেশ ওমের মধ্যেই শুয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। গায়ে যেন একটা ভারী কম্বল ছিল! জেগে উঠে পাশ ফিরতে গিয়েই অবাক হয়ে দেখলেন, মস্ত চিতাবাঘটা তাঁকে আঁকড়ে ধরে গা ঘেঁষে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

অন্য সময়ে হলে এই দৃশ্য দেখে মাধবের হার্টফেল হত। এখন হল না। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন মাত্র। কোমর আর গলা থেকে বাঘের দুটো থাবা আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন মাধব। তারপর রোজকার মতো হাই তুলে বললেন, ''দুর্গা দুর্গা।''

দিনের আলোয় দেখলেন, জলার ধারে বিস্তর বড়-বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সাবধানে সেগুলোর ওপর পা ফেলে জলায় গিয়ে মুখ ধুলেন। ফিরে এসে আবার অকুতোভয়ে বাঘটার মাথার কাছে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলেন।

বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, সামনের পাথরের চাঁইগুলো কেমন যেন চৌকো ধরনের। মনে হয় বহু পুরনো কোনো বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ধ্বংসাবশেষ। তারপরেই মাধবের নজর পড়ল গাছের গুঁড়িটার দিকে। ওপরে শ্যাওলা জমে আছে। মাধবের সন্দেহ হওয়াতে নখ দিয়ে খুঁটলেন এবং দেখলেন, এটা মোটেই গাছের গুঁড়ি নয়। একটা প্রাচীন থাম। মাধব একটু চমকে উঠলেন। এ-সবের মানে কী? চারদিকে চেয়ে এ-জায়গাটা তাঁর চেনা-চেনা ঠেকছে। দৈবক্রমে হেতমগড়ের হারানো বাড়িতে ফিরে আসেননি তো?

এই কথা মাত্র ভেবেছেন, হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বাজ-পড়ার মতো 'ঘ্রাম' করে গর্জন ছাড়ল বাঘটা। ঘুম থেকে উঠে কাঁপিশ চোখে সোজা তাকিয়ে আছে মাধবের দিকে।

বুকটা কেঁপে ওঠায় মাধব প্রথমটায় ককিয়ে উঠেছিলেন। হয়তো অজ্ঞানও হয়ে যেতেন। কিন্তু হঠাৎ নাকের ফুটো দিয়ে নন্দকিশোর মুখ বার করে বলল, "বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে হে। একটু ঘুমোতেও দেবে না নাকি? ''

"আমি চেঁচাইনি। চেঁচাল তো ঐ বাঘটা।'' মাধব বললেন।

নন্দকিশোর বাঘটার দিকে বিরক্তির দৃষ্টি হেনে বলল, "লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। পালাও।''

"কোথায় পালাব?''

"সে আমি কী জানি! আমাকে তো আর বাঘে খাবে না। খেলে তোমাকেই খাবে। ঐ যে আসছে!'' বলে নন্দকিশোর আবার নাকের ফুটো বেয়ে সুট করে মাধবের ভিতরে ঢুকে যায়।

বাঘটা সত্যিই পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। খুবই নিশ্চিন্ত ভাব-ভঙ্গি। একবার প্রকাণ্ড একটা হাইও তুলল। মাধব ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, সারা রাত বাগে

পেয়েও যখন বাঘে তাকে খায়নি, তখন এই সাত-সকালেও বোধহয় খাবে না। তাছাড়া চিতাবাঘ সাধারণত মানুষ খায়ও না, কিন্তু বেগরবাঁই দেখলে মারে। এই বাঘটার ব্রেকফাস্ট হয়েছে কিনা তা বুঝতে না-পারায় মাধব খুব নিশ্চিন্তও বোধ করতে পারছেন না।

বাঘটা এসে মাধবের সামনে থাবা গেড়ে বসল এবং খুব মন দিয়ে মাধবের মুখখানা দেখতে লাগল। তাতে খানিকটা ভয় কেটে গিয়ে মাধবের একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল। কারণ, আজ দাড়ি কামানো হয়নি। কাল থেকে নানা ঘটনায় নাকাল হয়ে চেহারাটা হয়েছে ঝোড়ো কাকের মতো। তার ওপর দাঁত নেই। চুলটা ঠিকমতো পাট করা নেই। মাধব বাঘের দৃষ্টির সামনে লজ্জায় অধোবদন হয়ে বসে রইলেন।

বাঘটা এবার একটু মোলায়েম গলায় বলল, ঘ্রাম!

মোলায়েম হলেও এই আওয়াজেও পিলে চমকে যায়। মাধবেরও চমকাল।

বাঘটা একটু ঘুরে বসে আচমকাই লেজটা মাধবের কোলের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ঘর-র!

মাধব আঁতকে উঠলেন। অমনি নন্দকিশোর কানে কানে বলল, "তোমাকে লেজটা ধরতে বলছে।"

"ধরব?" মাধব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"না-ধরেই বা কী করবে?"

"তাই তো!" বলে মাধব খুব সংকোচের সঙ্গে লেজটা ধরলেন। বাঘটা তখন ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে নিয়ে চলল।

পুবধার দিয়ে জলাটা ঘুরে বাঘটা তাঁকে একটা ভারী সুন্দর সাজানো জঙ্গলে নিয়ে এল। মনে হয়, এখানে এককালে মস্ত কোনো বাগান ছিল। হাঁ করে চারদিকে চেয়ে দেখছেন মাধব। বাগানের চারধারে কোনো পাঁচিলের চিহ্নও নেই। তবে একটা জায়গায় একটা মস্ত গোল বাঁধানো চৌবাচ্চার আকৃতি মাটির মধ্যে দেখতে পেলেন। খুবই চেনা-চেনা ঠেকছে।

বাঘটা একটা হ্যাঁচকা টানে লেজ ছাড়িয়ে নিয়েছে। তারপর একটা বেঁটে জামগাছের দিকে এগোচ্ছে দুলকি চালে। মাধব বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে দেখছেন।

জামগাছের নিচু ডালে মস্ত বড় একটা মৌচাক। বিজবিজ করছে মৌমাছি। বাঘটা গিয়ে এক লাফে গাছের ডালে উঠে ধীরে ধীরে চাকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাধব দম বন্ধ করে আছেন। আচমকা নাড়া পড়লে মৌমাছিরা যে কী কাণ্ড ঘটাবে!

কিন্তু বাঘটার বুদ্ধির প্রশংসাই করতে হয়। হুট করে কোনো কাণ্ড ঘটাল না। বরং খুব ধীরে ধীরে সামনের পা দুটো দিয়ে ডালটাকে নাড়াতে লাগল। যেন বাতাসের দোলা। একটি দুটি করে মৌমাছি চাক থেকে উড়ে যেতে লাগল। বাঘটা আস্তে-আস্তে দুলুনি বাড়াতে থাকে। মাঝে মাঝে আচমকা একটু ঝাঁকুনি দেয়। মৌমাছিরা পালাচ্ছে। উড়ছে, ফিরে আসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় চাকটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। মাধব দূর থেকেও দেখতে পেলেন, টসটস করছে মধু।

বাঘটা বলল, ঘ্রাও!

নন্দকিশোর সঙ্গে-সঙ্গে কানে-কানে কথাটা অনুবাদ করে বলল, "তোমাকে খেতে বলছে। শুনলে না, খাও!"

"খাব?"

"না খেয়েই বা করবে কী? বাঘকে চটানো কি ভাল? বাঘটাকে খুব ভাল বাগিয়েছ হে!"

বাঘটা চাকটাকে মৌমাছিশূন্য করে আর দাঁড়াল না। জঙ্গলের মধ্যে বোধহয় হরিণের গন্ধ পেয়েই এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাধব নিশ্চিন্তে এগিয়ে গিয়ে চাকটার নীচে দাঁড়ালেন। হাতের নাগালের মধ্যে একেবারে নাকের ডগায় জিনিসটা ঝুলে আছে। মাধব আর দেরি না করে চাকটার
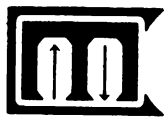
খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুঠোয় চাপ দিয়ে সেরটাক রস বের করে খেয়ে ফেললেন। বহুকাল এরকম ভাল পদ্মমধু খাননি। প্রাণ বুক ঠান্ডা হয়ে গেল। চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তারপর চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

যত দেখেন ততই ধারণা হতে থাকে, এ সেই হেতমগড়ের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ না হয়ে যায় না। এক জায়গায় তিনি বেশ কয়েকটা বড় বড় শ্বেতপাথরের টুকরো দেখতে পেলেন। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা পেতলের কলসির গায়ে দেখলেন নাম খোদাই করা—আর. সি.। সম্ভবত তাঁর বাবার নামের আদ্যক্ষর। বাবার একটাই ছিল শখ। সব কিছুতে নিজের নামের আদ্যক্ষর খোদাই করতেন। সুতরাং মাধবের আর সন্দেহ রইল না, দৈবক্রমে নিজেদের হারানো ভিটের সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

অবশ্য সন্ধান পেয়েও কোনো লাভ নেই। এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে মাটিতে প্রায় মিশে-যাওয়া বাড়ি নিয়ে তিনি করবেনই বা কী? বাড়িতে কিছু গুপ্তধন আছে বলে শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাপ-ঠাকুরদা সেই গুপ্তধনের অনেক খোঁজ করেও সন্ধান পাননি। এখন সেই গুপ্তধনের সন্ধান করার কাজ বরং আরও কঠিন হয়েছে। কেননা, পুরো বাড়িটাই ডেবে গেছে মাটির নীচে।

মাধব তাই আরও সেরটাক মধু খেয়ে গাছ-তলায় ছায়ায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলেন। মধু খাওয়ার আমেজে ঘুমও এসে গেল। তাই ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর রাগী ঠাকুরদা গাছের ওপর বসে আছেন রাগের চোটে। রাগে গরগর করছেন। ঐ ভাবে গাছের ওপর বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ তাঁর লেজ গজিয়ে গেল। রেগে গেলে মুখটা সবসময়ে কুঁচকে আছেন বলে ক্রমে-ক্রমে মুখটা বদলে যেতে লাগল। ক্রমে সেটা হুবহু বাঁদরের মুখের মতো দেখাতে লাগল। গায়ে লোম গজাল। মাধব দেখলেন, ঠাকুর্দার বদলে একটা মহাবানর গাছের ডালে বসে আছে। তারপরই দেখতে পেলেন বাবাকে। মাধবের বাবা রাগের চোটে কাকে যেন হুংকার দিয়ে ডেকে তর্জন-গর্জন করলেন। পারলে তাকে দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফেলেন আর কী! চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে, হাঁ করে থাকায় দাঁতগুলো হিংস্র দেখাচ্ছে। জিবটাও লকলক করছে যেন। নিজের বীভৎস রাগকে বশে আনার জন্য কলকে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছেন নিজের গায়ে। এই করতে-করতে সারা শরীরে ছোপ-ছোপ দাগ হয়ে গেল। চোখ দুটো গোল গোল আর কপিশ রঙের হয়ে গেল। দাঁতগুলো বড় বড় আর ধারালো হয়ে উঠল। ক্রমে দেখা গেল, মাধবের বাবা রাগের চোটে আস্ত একটা বাঘ হয়ে বিকট গর্জন ছাড়লেন, ঘ্রাম!

সে গর্জনে ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন মাধব। দেখলেন, বাঘটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আবেগের চোটে মাধব ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "বাবা!"

বাঘ জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে ছিল বটে, তবে চোখে তেমন হিংস্রতা নেই। ঘপাস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বাঘটা বলে উঠল, গিয়াও।

কানের কাছে নন্দকিশোর ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে উঠে পড়তে বলছে।"

মাধব হাতের পিঠে চোখের জল মুছতে-মুছতে উঠলেন। বাঘটা লেজ বাড়িয়ে ধরল। মাধব সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে হাঁটতে লাগলেন পিছু-পিছু।

জলার উত্তরধারের দুর্ভেদ্য ভয়ংকর কাঁটাঝোপের জঙ্গল, আগাছা ভেদ করে ও পায়ের নীচে ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে বাঘটা তাঁকে একটা মজা পুরনো ইঁদারার ধারে নিয়ে এল। মাধবের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় এই ইঁদারাটাকে তিনি দেখে-ছেন। এর জল পচা ছিল বলে কেউ ব্যবহার করত না। সবাই বলত, ওর মধ্যে ভূত আছে। মাঝে-মাঝে নাকি ভুতুড়ে ইঁদারার ভিতর থেকে নানারকম আওয়াজ উঠে আসত। অনেক সময়ে মানুষের গলায় কান্নার শব্দ পাওয়া যেত। নিশুত রাতে ঘুম ভেঙে বাড়ির দাসী-চাকরেরা শুনতে পেত. ইঁদারার ভিতর থেকে শব্দ আসছে, আয়, আয়, আয় আয়।

বাঘটা ইঁদারার কাছে এসে মাধবের দিকে চেয়ে ডাকল, ঘর-র ঘ্রাও!

ঠিক এইসময়ে একপাল হরিণ পথ ভুলে সামনে এসে পড়েছিল। বাঘ দেখে হাওয়ার গতিতে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মাধবের হাত থেকে লেজটা টেনে নিয়ে বাঘও হাওয়া। মাধব চোখের জল মুছে আপন মনে বললেন, বাবার খিদে পেয়েছে।

"খিদে পেয়েছে না হাতি! বাঘ হচ্ছে এক নম্বরের পেটুক। যখন তখন তাদের খাই-খাই। ও হচ্ছে চোখের খিদে।" বলতে-বলতে নন্দকিশোর মাধবের নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে সাঁতার কাটতে লাগল।

মাধব খেপে গিয়ে বললেন, "খবর্দার! আজে-বাজে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি! ভাল হবে না।"

"এঃ! খুব যে তেজ দেখাচ্ছ! কী করবে-টা শুনি! তোমার মতো অকৃতজ্ঞ লোক দুটো দেখিনি। সারা সকাল ধরে তোমার ফোকলা নাম ঘোচানোর জন্য কত মেহনত করলুম, এই তার প্রতিদান?"

মাধব রাগটা চেপে রেখে বললেন, "কী করেছেন শুনি!"

"তোমার মাড়ির গোড়া সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে দাঁতের বীজ বুনেছি। একটু সার আর জল পেলে দেখ-না-দেখ দাঁতের চারা গজিয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি বাপু মহা অকৃতজ্ঞ।"

মাধব লজ্জিত হয়ে বললেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"না করে আর উপায় কী? যাই, একটু বেরিয়ে আসি। বাঘটা তোমাকে কী বলে গেল বুঝেছ তো!"

"আজ্ঞে না।"

"বাঘটা তোমাকে ওই কুয়োটার মধ্যে নেমে পড়তে বলে গেছে। ভালমন্দ তুমি বোঝো গিয়ে, আমি শুধু অনুবাদটা করে দিলাম।"

এই বলে নন্দকিশোর ফড়ফড় করে বাতাসে ভেসে চলে গেল।

মাধব ইঁদারার মধ্যে ঝুঁকে দেখলেন, একেবারে তলায় একটু জল এখনো চকচক করছে। ইঁদারায় নামবার কোনো সিঁড়ি বা মই নেই। তবে ভিতরে হরেক রকম ভাঙাচোরা থাকায় নানা ধরনের খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শ্যাওলা জমে খাঁজগুলো ভীষণ পিছল। মাধব তাই নামতে সাহস পেলেন না। চুপ করে ইঁদারার ধারে গাছের ছায়ায় বসে রইলেন। বুঝতে পারছেন, ইঁদারার মধ্যে কোনো রহস্য আছে। স্বয়ং বাঘবেশী বাবা নাহলে এখানে তাঁকে টেনে আনতেন না।

ভাবতে-ভাবতে মাধবের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। বেলা ঢলে আসছে। শীতকালে এই জঙ্গলে দুপুর না গড়াতেই রাত্রি এসে যাবে। কী করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না মাধব। ঝিমোতে-ঝিমোতে নানা কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ মাথার ওপর 'হুপ হুপ' করে দুটো শব্দ হল। তারপরই ডালপালা তছনছ করে বিকট উল্লাসের শব্দ করতে করতে ঘটোৎকচ নেমে এল মাধবের কোলের ওপর। আর অমনি জঙ্গলের ভিতর থেকে বনমালীর গলা পাওয়া গেল, "কর্তা ধারেকাছে আছেন নাকি?"

"আছি! আছি!" চেঁচিয়ে উঠলেন মাধব। তারপর ঘটোৎকচকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দাদু! দাদু গো! এ-জন্মেও আমাকে ভোলোনি তাহলে!"

জঙ্গল ফুঁড়ে খিদেয় চিমড়ে-মারা চারটে মূর্তি বেরিয়ে এসে

ধপাস-ধপাস করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মাধবের ভারী মায়া হল। বললেন, "বোসো তোমরা, ব্যবস্থা আছে।"

জায়গাটা এখন চেনা হয়ে গেছে। মাধব গিয়ে জামগাছের ডাল থেকে মৌচাকটা পুরো ভেঙে আনলেন। মধুতে এখনো ভরা-ভর্তি। টপটপ করে মধুর ফোঁটা পড়ে চাকের নীচের মাটি ভিজে গেছে, পিঁপড়ে লেগেছে।

চাক নিয়ে এসে চারজনকে আকণ্ঠ মধু খাওয়ালেন মাধব। সকলের পেট ঠাণ্ডা হল, গায়ে জোর বল এল।

মুখে কথা ফোটার মতো অবস্থা হতেই বনমালী বলে উঠল, "কর্তা! এ জায়গাটা যে বড় চেনা-চেনা ঠেকছে!"

মাধব তখন গোটা ব্যাপারটাই ভেঙে বললেন। সবাই শুনে তাজ্জব হয়ে গেল। বনমালী তার টিকটিকি-বিদ্যে-জানা স্যাঙাতকে হুকুম দিল, "ইঁদারায় নাম।"

লোকটা কালবিলম্ব না করে তরতর করে ইঁদারার ভিতরের খাঁজে পা আর হাতের ভর রেখে শাঁ করে নেমে গেল। ওপর থেকে সবাই ঝুঁকে দেখছে, লোকটা জলের কাছ-বরাবর নেমে চারদিকে গুপ্ত দরজা বা গর্ত খুঁজছে। অনেকক্ষণ খুঁজল। তারপর কিছু না পেয়ে ওপর দিকে চেয়ে বনমালীর উদ্দেশে বলল, "ওস্তাদ, এখানে তো কিছু দেখছি না।"

ঘটোৎকচ কী বুঝল কে জানে। হঠাৎ সে 'হুপ' করে হাঁক ছেড়ে ইঁদারার মধ্যে সাবধানে নামতে লাগল। আধাআধি নেমে একটা পাথরের চাঁই ধরে টানাটানি করতে করতে চেঁচাতে লাগল, হুপ! হুপ!

তখন টিকটিকি-ওস্তাদ নীচে থেকে ঘটোৎকচের কাছ-বরাবর উঠে এসে পাথরটা ভাল করে দেখে-টেখে বলল, "এ পাথরটা একটু অন্যরকম।"

বেলা ফুরিয়ে আসছে। জঙ্গলের প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীতও মালুম দিচ্ছে। বনমালী আর দেরি না করে তার আর-দুই স্যাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে লম্বা-লম্বা কয়েকটা লতানে গাছ ছিঁড়ে আনল। কাছেই একটা মস্ত গাছের গুঁড়িতে লতার এক মাথা বেঁধে অন্য মাথাটা ঝুলিয়ে দিল ইঁদারার মধ্যে। তারপর একে একে বনমালী আর তার এক স্যাঙাত নেমে গেল নীচে।

তিনজন মিলে পাথরটার ওপর কী ক্রিয়া-কৌশল করল, ওপর থেকে মাধব তা ভাল বুঝলেন না। তবে কিছুক্ষণ বাদে দেখতে পেলেন পাথরটা দরজার কপাটের মতো খুলে গেছে। বনমালী চেঁচিয়ে বলল, "কর্তা, ঝুল খেয়ে নেমে আসুন। এখানে একটা সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে।"

উৎসাহের চোটে মাধবের আর ভয়ডর রইল না। লতা বেয়ে নেমে গিয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ হাঁ করে আছে। স্যাঙাতদের একজনের কাছে দেশলাই ছিল। তাই দিয়ে মৌচাকটাতে আগুন দেওয়ায় দিব্যি আলো জ্বলে উঠল। একটা গাছের ডালের আগায় জ্বলন্ত মৌচাকটাকে গেঁথে নিয়ে মাধব সদলে সুড়ঙ্গে ঢুকলেন। এত নিচু আর সরু সুড়ঙ্গ যে হামা-গুড়ি দিয়ে চলতে হয়। ভিতরে বদ্ধ ভ্যাপসা ভাব। চারদিকে নিরেট পাথরের দেয়াল। মশালের আগুন আর ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়।

খানিকদূর গিয়ে সুড়ঙ্গটা কিছু চওড়া হল। ছাদটাও একটু উঁচুতে। সামনে গলিটা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। সেই-খানে সবাই দাঁড়িয়ে জিরিয়ে হাঁফ ছাড়ে। বনমালী বলল, "কর্তা, আমরা ছ্যাঁচড়া হলেও নিমকহারাম নই, চোর হলেও লোভী নই। যদি গুপ্তধন পাওয়া যায় তবে সবটাই আপনার। আপনি আবার হেতমগড় গাঁ তৈরি করুন। আমাদের শুধু সেখানে থাকতে দেবেন। কথা দিচ্ছি, হেতমগড়ে কখনো চুরি-ডাকাতি হবে না।"

মাধব রাজি হলেন। সেখানেই ঠিক হল, মাধব বনমালী আর ঘটোৎকচকে নিয়ে যাবেন ডাইনে, তিন স্যাঙাত যাবে বাঁয়ে। ঘণ্টা দুই পর তারা আবার এখানে ফিরে আসবে। মৌচাক ভেঙে দুটো মশাল তৈরি করে তাঁরা দুদিকে এগোলেন।

মাধব ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোচ্ছেন। সামনে ঘটোৎকচ পিছনে বনমালী। চারদিকে পাথরের দেয়াল চলেছে তো চলেইছে। মাথা নিচু না করে যাওয়ার উপায় নেই। মাধবের ঘাড় টনটন করে ছিঁড়ে পড়ার জোগাড়। তার ওপর এই শীতকালেও সুড়ঙ্গের ভিতরটায় বেজায় ভ্যাপসা গরম। অনেকক্ষণ চলার পর মাধব হঠাৎ বুঝলেন, সুড়ঙ্গটা হচ্ছে আসলে একটা ভুলভুলাইয়া বা গোলকধাঁধা। কোনোখানেই পৌঁছচ্ছেন না, কেবলই যেন একই জায়গায় ঘুরে মরছেন।

খুবই ক্লান্ত হয়ে একসময়ে পাথরে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন মাধব। পাশে বনমালী আর ঘটোৎকচ।

মুখে কথা পর্যন্ত সরছে না কারো। ঠিক এই সময়ে মাধব শুনতে পেলেন, নন্দকিশোর কানে-কানে বলছে, "খুব কানামাছি খেললে বাপু! তা আমাকে যে ফেলে এলে, আমি কি তোমার গুপ্তধনে ভাগ বসাতুম?"

মাধব গম্ভীর মুখে বললেন, "আপনার মতো অপদার্থ ভূত জীবনে দেখিনি।"

"বেশি কচকচ কোরো না ছোকরা। তোমার ঐ বাঁদরটার গায়ের গন্ধ আমার যদি অসহ্য না হত তাহলে আজ তোমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে বিস্তর নাকাল করতুম। যাক গে, এখন হাঁ করো তো, ভিতরে সেঁদিয়ে যাই।"

বনমালী হাঁ করে মাধবের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, "ও কার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি? এখানে তো আমি ছাড়া আর কোনো মনিষ্যি নেই।"

মাধব সেকথার জবাব না দিয়ে নন্দকিশোরকে বললেন, "অপকার সবাই করতে পারে। উপকারটাই করতে পারে না। এই যে গোলকধাঁধায় পড়ে খাবি খাচ্ছি, তার একটা উদ্ধারের পথ আগে বের করে দিন, তারপর বড়-বড় কথা বলবেন। প্রথম থেকেই তো ফাঁড়া কাটছেন, ভূত এটা পারে না, সেটা পারে না। এ কেমনধারা কথা!"

নন্দকিশোর চিড়বিড়িয়ে উঠে বলল, "কভি নেহি! কভি নেহি! মানুষের উপকার আর কক্ষনো নয়। তুমি নিতান্ত হাবা-গঙ্গারাম বলে আর মানুষের মতো মানুষ নও বলে তোমার খানিকটা উপকার করে ফেলেছি। এখন দেখছি তুমিও খুব সেয়ানা। আর উপকারের মধ্যে আমি নেই। বেঁচে থাকতে বিস্তর মানুষের উপকার করেছি। ফলে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়েছিল। ফের উপকার করতে গিয়ে ফেঁসে যাব নাকি! তার ওপর এখন গলায় দড়ি দিয়ে মরবারও উপায় নেই।"

এই বলে নন্দকিশোর গোঁত্তা খেয়ে মাধবের মুখে ঢুকে পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

বনমালী ভাবল, কর্তাকে ভূতে ধরেছে। এই সুড়ঙ্গের ঘোর অন্ধকার পাতালপুরীতে সেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাছাড়া গুপ্তধনের কাছেপিঠে এঁরা থাকেই। বনমালী হঠাৎ ভয় খেয়ে শিউরে উঠে 'ভূত! ভূত!' বলে চেঁচিয়ে দৌড়তে লাগল।

কিন্তু এই পাতালপুরীতে দৌড়ে যাবে কোথায়? দশ কদম যেতে না-যেতেই একটা দেয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়ায় 'উঃ' বলে বসে পড়ল। আর বসেই চেঁচিয়ে উঠল, "কর্তা, এধারে আসুন তো।"

মশাল নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। মৌচাকে আর মোম নেই। সাবধানে মাধব এগিয়ে গেলেন। বনমালী বলল, "এই পাথরটা যেন আমার ধাক্কায় একটু নড়ে উঠল! দেখুন তো।"

কথাটা সত্যি। পাথরটা একটু ঠেলতেই নড়ল। এবং টানতেই কপাটের মতো খুলে গেল।

মাধব মশালের শেষ আলোটুকুতে মুখ ঢুকিয়ে দেখলেন,

ভিতরে একটা ঘর। ঘরে অনেক জিনিস রয়েছে। মাধব ঘরে ঢুকলেন।

সামনেই একটা পিলসুজে মস্ত প্রদীপ রয়েছে। মাধবের বুদ্ধি খেলছে। বুঝলেন, প্রদীপ আছে, তখন খুঁজলে তেলও পাওয়া যাবে।

বেশি খুঁজতে হল না। পুরনো একটা গাড়ুতে বিস্তর রেড়ির তেল পাওয়া গেল। নিবন্ত মশাল দিয়ে প্রদীপটা একেবারে শেষ মুহূর্তে জ্বালাতে পারলেন মাধব। সেই আলোয় চারদিকে চেয়ে একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেললেন। সেই হারানো মোহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর দুঃখের কিছু নেই।

মাধব আস্তে আস্তে গিয়ে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকটার গায়ে হাত বোলালেন। প্রদীপের আলোয় দেখলেন, সিন্দুকের গায়ে খোদাই করে লেখা : এই সম্পদ ভোগের জন্য নহে। ইহার দ্বারা প্রজাপালন, কূপ পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন, সড়ক প্রভৃতি নির্মাণ করিবে। বিদ্যা ও ধর্ম দান করিবে। সতত অপরের মঙ্গল চিন্তা না করিলে এই সম্পদে অধিকার জন্মায় না, ইহা জানিও। সর্বদাই চিন্তা করিবে : আমি অক্রোধী, আমি অনামী, আমি নিরলস, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু......

নবতারণ পথেই খবর পাচ্ছেন, বিজয়পুরের জমিদারমশাই মাধবের সন্ধানের জন্য পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজারে উঠেছেন।

সুতরাং নবতারণ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু হেতমগড়ের পাজি জঙ্গলও কিছু কম যায় না। অত সেপাই লোকলশকর সবই যেন ক্রমে-ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

নবতারণের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিল ভজহরি আর পুঁটিরাম। কিন্তু একসময়ে তারাও তাল রাখতে পারল না। নবতারণ সন্ধের মুখে-মুখে দেখলেন, তিনি ভয়াবহ জঙ্গলটায় একেবারে একা। ওদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পথের চিহ্নও নেই। ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠেছে।

ক্লান্ত নবতারণ একটা জলার ধারে ঘোড়া থামালেন। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে খুব সাবধানে পাথরের চাঁইতে পা রেখে রেখে জলের ধারে গিয়ে দুজনে জল খেলেন। জল খেতে গিয়েই নবতারণ হঠাৎ দেখতে পেলেন কাদায় মানুষ আর বাঘের পায়ের ছাপ। তিনি বোকা লোক নন। বুঝলেন, আশপাশেই আসামীদের ঠিকানা মিলবে। বাঘকে তাঁর বিশেষ ভয় নেই। সঙ্গে গুলিভরা দুটো রিভলভার আছে। আর আছে টর্চ।

নবতারণ ঘোড়ার পিঠে চেপে আস্তে-আস্তে চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এবং হঠাৎই তাঁর নজরে পড়ল, একটা জামগাছে ভাঙা মৌচাকের দগদগে দাগ। তাজা মধুর ফোঁটা পড়ে মাটি ভিজে আছে। মধুর ফোঁটার একটা লাইনও গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। মধুর চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলেন অসম-সাহসী নবতারণ। দু-একবার ভুল পথে গেলেও অবশেষে দেখতে পেলেন, একটা পুরনো ইঁদারার মধ্যে একটা লতা নামানো রয়েছে।

নবতারণ নিঃশব্দে ঘোড়া থেকে নামলেন। লতাটার জোর পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে পড়লেন ইঁদারার মধ্যে। টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গের মুখটা পেতেও তাঁর দেরি হল না।

সুড়ঙ্গে ঢুকে টর্চ ফেলে ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর মোটেই সময় লাগল না। লখনউয়ের ভুলভুলাইয়ায় তিনি বহুবার ঢুকেছেন। এ-সুড়ঙ্গ সে-তুলনায় ছেলেমানুষ।

মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যেই তিনি গুপ্ত কুঠুরির দরজায় পৌঁছে ভিতরে টর্চের আলো ফেললেন এবং রিভলভার তুলে ধরে বললেন, "মাধববাবু! বনমালী! হ্যান্ডস আপ!"

দুই ফেরারী আসামী হাত তুলে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল দেখে নবতারণ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। আমার ফোর্স জায়গাটা ঘিরে ওপরে অপেক্ষা করছে। খুব সাবধানে হাত তুলে বেরিয়ে আসুন।"

ঠিক এই সময়ে মাধবের নাক দিয়ে নন্দকিশোর উঁকি মারে, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এ যে একেবারে কেচ্ছা করলে হে মাধবচন্দ্র। তীরে এসে ভরাডুবি! তা ঐ ভিতুর ডিম দারোগাটাকে ভয় খাওয়ারই বা কী আছে? তুমি তো বাপু গায়েগতরে কিছু কম নও, লাফিয়ে পড়ে জাপটে ধরে পেড়ে ফেল না!"

মাধব ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিন্তু আমার যে দারোগা-পুলিসকে ভীষণ ভয়!"

বিজ্ঞের মতো নন্দকিশোর বলে, "ভয়টা কোনো কাজের কথাই নয়। তোমার সাহসের থলি আমি ফুলিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন যে ভয়টা পাচ্ছ সেটা আসল ভয় নয়, এ হল গিয়ে ভয়ের স্মৃতি।"

মাধব বললেন, "আজ্ঞে ঠিক ভয় নয় বটে। কিন্তু যেন সাহসও পাচ্ছি না। হাতে পিস্তল রয়েছে তো! তা আপনার গায়ে তো গুলি লাগে না শুনেছি, আপনিই কাজটা করে দিন না!"

একথায় রেগে গিয়ে নন্দকিশোর বলে, "সবই যদি আমি করে দেব তাহলে ভগবান তোমাকে হাত-পা-মগজ দিয়েছে কেন শুনি! আচ্ছা অপদার্থ তো! কতবার তো বলেছি, ভূতের ক্ষমতা সম্পর্কে যা শোনো তা সব গাঁজাখুরি গল্প।"

এইসব যখন হচ্ছে তখন বনমালী আর নবতারণ হাঁ করে মাধবকে দেখছে। নবতারণ বললেন, "মাধববাবু, আপনার নাক থেকে সাদামতো ওটা কী ঝুলে আছে? নাকের পোঁটা নাকি?"

লজ্জিত হয়ে মাধব বললেন, "আজ্ঞে না। ইনি হলেন নন্দকিশোর মুন্সি। অতি ভদ্র একজন ভূত। পাতুগড়ের আম-বাগান থেকে আমার পিছু নিয়েছেন।"

"বলেন কী!" বলে চোখ কপালে তোলেন নবতারণ। নন্দকিশোরের পাল্লায় তিনিও পড়েছিলেন। ফলে নবতারণের গায়ে কাঁটা দিল এবং হাত-পা অবশ হয়ে পড়ল। রিভলভারটা ঠকঠক করে কাঁপছিল হাতে।

মাধব তাই এগিয়ে গিয়ে খুব স্নেহের সঙ্গে নবতারণের হাত থেকে এবং খাপ থেকে দুটো রিভলভারই নিয়ে নিলেন। পিস্তল মাধবের হাতে যেতেই নিয়মমতো নবতারণ দুহাত ওপরে তুলে দিলেন। মাধব তাঁর হাত ধরে টেনে মেঝের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু বিশ্রাম করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বরং ওপরে আপনার ফোর্সকে খবর পাঠাচ্ছি।"

করুণ মুখ করে নবতারণ একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "ফোর্স নেই। মিথ্যে কথা বলেছিলুম।"

"তাহলে!" মাধব জিজ্ঞেস করলেন।

নবতারণ বললেন, "আমি সারেন্ডার করছি। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন। আপনার স্ত্রী আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।"

পরদিন সন্ধেবেলা বিজয়পুরের জমিদারবাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। বাড়িভর্তি আত্মীয়-স্বজন। মেয়ে-জামাই ছেলে-পুলে যে যেখানে ছিল সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছে। রায়বাহাদুরের ছোট মেয়ে আর একটু বাদেই বিষ খাবে। মেয়ের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে পড়ে আছেন মা, পিসি, মাসি, দাসীরা। রায়বাহাদুর নিজে বাইরের বারান্দায় খড়ম পায়ে পায়চারি করছেন। একটু আগেই মাধবের জন্য তিনি এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। উকিল, মোক্তার, ডাক্তারে বাড়ি গিজ-গিজ করছে, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। বাইরের মস্ত আঙিনায় প্রজা এবং কর্মচারীরা জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই কাঁচুমাচু মুখ। খবর এসেছে, হেতমগড়ের জঙ্গলে নবতারণের পুলিস-বাহিনীর সবাই গায়েব হয়ে গেছে। কারও কোনো খোঁজ নেই।

পরশুদিন থেকে পায়চারি করতে করতে রায়বাহাদুর এ পর্যন্ত বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ক্রোশ হেঁটে ফেলেছেন। এখন হাপসে পড়ে বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে হাঁক দিয়ে তামাক চাইলেন। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। অপদার্থ জামাইটার জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার খুবই বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাও সেই ব্যাটার টিকির নাগাল পাওয়া গেল না। জামাইটাকে হাতের কাছে পেলে এখন খড়মপেটা করবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। সেই সঙ্গে উজবুক নিষ্কর্মা নবতারণ দারোগাকেও দেশছাড়া করবেন। রাগে দুঃখে দাঁত কড়মড় করছিল তাঁর। তামাকের নলের মুখটা চিবিয়ে প্রায় ছিবড়ে করে ফেললেন। এখনো তাঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, এখনো তিনি হাঁক মারলে মাটি কেঁপে ওঠে, সেই তাঁকেই কিনা ঘোল খাওয়াচ্ছে অপোগণ্ড ভ্যাগাবণ্ড জামাই মাধব!

রাগের চোটে আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ খুব কাছেই বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হল, দ্রাম! আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাঠে 'বাবা রে! মা রে!' বলে খুব একটা শোরগোল তুলে লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল আঙিনা।

রায়বাহাদুর একটু চমকে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভয় খাওয়ার বান্দা তিনি নন। বারান্দার দুধারে দুজন বন্দুকধারী দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন শব্দ শুনে মূর্ছা গেছে। তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে রায়বাহাদুর সিঁড়ির মাথায় বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন।

এইসময়ে ফটক পার হয়ে আঙিনায় একটা জংলি চেহারার লোক এসে ঢুকল। তার দু হাতে দু-দুটো বন্দুক, কাঁধে একটা মস্ত বাঁদর, পাশে একটা বিশাল চিতাবাঘ। লোকটার হাবভাব বেশ বেপরোয়া। গটগট করে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে বলল, "আমার স্ত্রীকে এক্ষুনি ফেরত চাই। সে যদি আত্মঘাতী হয়ে থাকে তবে এ-বাড়ির কাউকে জ্যান্ত রাখব না।"

রায়বাহাদুরের হাত-পা কাঁপছিল। বাঘটা তাঁর গা শুঁকছে। বাঁদরটা মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। বন্দুকটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল যখন দেখলেন, জামাইয়ের কানের লতি ধরে ঝুলে খাচ্ছে বিঘত-খানেক লম্বা সাদামতো একটা ভূত। রায়বাহাদুর হাতজোড় করে বললেন, "না, এখনো আত্মঘাতী হয়নি। এসো বাবাজীবন।"

বলা বাহুল্য, সেই রাতে শ্বশুরবাড়িতে আর মাধবকে কেউ সুপুরি-ভরা নাড়ু দেওয়ার সাহস পেল না। তবে দিলে খুব একটা অসুবিধেও হত না। কারণ নন্দকিশোরের হাতের গুণে মাধবের দিব্যি কচি-কচি দাঁত গজিয়ে গেছে। খুবই শক্ত দাঁত, আর ভারী সুরসুর করে সবসময়ে। শক্ত কিছু চিবোতে ইচ্ছে করে।

পরদিন থেকেই হেতমগড়ের জঙ্গল হাসিল করে পুরনো বাড়ির জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলেন মাধব। অগাধ মোহর আর হীরে জহরত পেয়ে এখন তিনি এ-তল্লাটের সবচেয়ে বড়লোক। তাই বাড়ি তৈরি করেই ক্ষান্ত রইলেন না মাধব। পুরনো হেতমগড় আবার গড়ে তুললেন। সড়ক বানালেন, পুকুর আর দিঘি কাটালেন, ইস্কুল-পাঠশালা খুলে দিলেন। হেতমগড় আবার জমজমাট হয়ে উঠল। হেতমগড়ের দারোগা হয়ে এলেন সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবতারণই। বনমালীর স্যাঙাতরা চাষবাস করে খায়, বনমালী নিজে মাধবের বাগান তদারক করে। সেই চিতাবাঘ, ঘটোৎকচ আর নন্দকিশোরও মাধবের বাড়িতেই আছে। তাদের আর কেউ ভয় খায় না। **(শেষ)**

মাইসন বাইসন

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পিকলু মন দিয়ে ইস্তাহারটা পড়ে নিল। ছোট্কাকে তার অনেক দিন আগে হারিয়ে ফেলা এক ক্লাসফ্রেন্ড এটা পাঠিয়েছেন। বিষয় বন্যপ্রাণী। ইংরিজিতে লেখা। ছোটকা বাংলা করে দিল।

ইস্তাহারে লম্বা লিস্ট দেওয়া হয়েছে। কী কী নেবে এবং নেবে না। লেখা আছে, মার্চ মাসে এ জঙ্গলে হাতিতে বাইসনে, বাঘে বহুরূপীতে ছয়লাপ। জীবজন্তুরা সব ট্যুরিস্ট দেখার জন্যে খেলা মাঠে, জলের ধারে, গাছের তলায় থিকথিক করে। মানুষরা গাছে বা মাচানে, লুকোনো কুঞ্জ থেকে বা জীপে বসে যে যেমন ভাবে চায় তেমন ভাবেই এদের দেখতে পারে। তবে হ্যাঁ, এইসব জন্তুরা ওডিকোলন বা সেন্টের গন্ধ পছন্দ করে না। গন্ধতেলে খুব বিরক্ত হয় আর কেউ সিগারেট খেলে তাকে সন্দেহ করে বসে। তাই বনের পথে অনুরোধ, পুরুষরা সিগারেট খাবেন না। 'ট্যুরিস্ট-অবজারভাররা' ছবিও সাবধানে তুলবেন। ক্যামেরার ক্লিক শব্দে জীবজগতের শান্তি ভঙ্গ হয়। মেয়েরা যেন লাল, কমলা, সাদা, হলদে, নীল জাতীয় কোনো রঙ না পরেন। জন্তুরা ঢুঁ মারতে পারে। সকলে যেন ভোজালি বা নিদেনপক্ষে ছুরি সঙ্গে রাখেন। তারপর আসল কথাটার তলায় ডবল দাগ দেওয়া। দিনে চারবার চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাবারের ব্যবস্থা। বাড়ির খাবারের মতো স্বাদ, কিন্তু হোটেলের মতো কেতা। নিজস্ব লোকজন যত্ন নিয়ে জিনিস বওয়া থেকে সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো পর্যন্ত সব প্রাণ দিয়ে করবে। তারপর আরও মোটা দাগে লেখা আছে—সঙ্গে এক বন্দুকধারী প্রাক্তন শিকারি ও সর্বগুণসম্পন্ন বন্যপ্রাণীপ্রেমিক থাকবেন যাঁর দো-নলা বন্দুক ছাড়া থাকবে, দিশি ছুরি, বাঁকানো ভোজালি আর ওষুধের বাক্স। অবশেষে তারা-চিহ্ন এঁকে লেখা হয়েছে—দলটির মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সঙ্গীতজ্ঞ বাদে যাঁরা সবচেয়ে বেশি করে থাকবেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে আবার অনেকে ডক্টরেট করে "ডঃ'' উপাধি পেয়েছেন।

ছোটকা এই পর্যন্ত পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বলল, "চ' রে পিক্লু যাওয়া যাক। বিশেষ করে ইসটারের ছুটি পড়েছে যখন। আর তোর জীববিজ্ঞানের তো পোয়াবারো। চারধারে থিক্থিক্ করবে। একধারে জীবজন্তু, অন্যধারে অধ্যাপকের দল! ভাবা যায় না। একসঙ্গে অতগুলো 'ডাঃ' দেখার সুযোগ কি আর পাব?''

সব ঠিক হয়ে যেতে দেখা গেল পিক্‌লুদের দলটা বেশ ভারী হয়ে পড়েছে। ছোটকার পিসতুতো বোন গোপা, তার বন্ধু কাবেরী, কাবেরীর বন্ধু মালবিকা, ওদের এক তরুণী পাড়াতুতো বোন বাসবী, নগদ টাকা দিয়ে 'অ-ডঃ' দল হিসেবে 'অবজারভার-ট্যুরিস্ট'দের বাসে সন্ধে সাতটায় উঠে বসল। তুলে দিতে এসেছিল পিক্‌লুর মেজদা। চোখ কপালে তুলে বলল, "করেছ কী ছোটকা? বুড়ো বয়েসে মরবে নাকি এতগুলো মেয়ে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে? 'পথে নারী বিবর্জিতা' কথাটা শোনোনি, না, ভুলে গিয়েছ?" কথাটা বলেছে কি বলেনি, ওরা চারজন মেয়েই হাঁ-হাঁ করে উঠল।

কাবেরীর একে খবরের কাগজে লেখা বেরোয়, তায় বেশির ভাগই মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে। ও একেবারে মার-মার করে উঠল, "হ্যাঁ রে দিলু! কী বোগাস্ সব কথা বলিস মাসিপিসি-দের সম্পর্কে? স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বন্দুক ছোঁড়া শিখেছিলাম, শুনিস্‌নি?" বেগতিক দেখে দিলু কেটে পড়বে পড়বে করছে, ছোটকা মিনমিন করে বলল, "তোর নিকিকাকাকে বলেছিলাম আসতে। তা সে তো টাকা জমা দিল, সব করল। কিন্তু কই, এল না তো!"

নিকিকাকার আসল নাম শান্তনু। কিন্তু সবই সায়েব-দের মতো 'নিক্-অফ্-দি টাইম' করে বলে ওকে 'নিকি' নাম দিয়েছে সবাই।

এমন সময় সেই প্রাক্তন শিকারি ছোটকার প্রাক্তন স্কুলের প্রাক্তন বন্ধু জগন্নাথ দাস, বি এ (ডিসটিংশান উইথ স্পেশাল ডিপ্লোমা) এসে হাজির। খাকি কুর্তা, অনেক পকেটওয়ালা জীনস, বেরে টুপি, ক্যানভাস-বুট পরে জগন্নাথ দাস তাঁর রোগা দেহটিকে একটা সত্যিকারের প্রাক্তন রূপ দিয়েছেন। তবে যেটি সত্যিই চোখে বেশি করে পড়ছে, সেটি হল অনেক বোতামে আঁটা ক্যানভাসের একটা চোঙা ধরনের ঢাকনা যাতে বন্দুক আছে বোঝা যায়। কোমরের ভোজালিটাও চোখে পড়ার মতো।

উনি হেসে বললেন, "তোমার ভাইপো দিলু না? ওকে নিয়ে নাও। এখনও সময় আছে। এ বাসটা আসল বাস নয়। আসলটা কলকাতা বর্ডারে ধরব। ট্যাকসি স্ট্রাইক কিনা তাই আর কি—" বলে ছোটকাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "সব সীট ভরেনি। হাফ্-প্রাইস করে দেব।"

ছোটকা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বলল, "দিলু তো সাবালক, ওর কী করে হাফ প্রাইস হবে? বরং পিক্‌লুরটা—"

"না, না, ওসব কিচ্ছুতে আটকাবে না। তবে তোমাকেই শুধু কন্‌সেশান রেটটা দিচ্ছি। কাউকে বোলো না যেন। হাঃ, হাঃ!"

দিলু তো অবাক! তবু হাফ্-প্রাইস শুনে বলল, "যাব আর আসব। বাড়ি তো কাছেই। বাবা যদি মত দেন আর টাকাটা দেন তবেই। বাড়িতে সঙ্গে নেবার মতো ছুরিটুরি আছে।"

দিলু ফিরে এসে বাসে উঠে বসতেই হুশ করে প্রকান্ড 'লাকসারি' বাসটা ছেড়ে দিল। জগন্নাথবাবু ছোটকার পাশেই ওর সীট করে দিলেন। গোপাপিসি পেছনের সীট থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, "হ্যাঁরে, দাদাভাই মত দিলেন?"

দিলু হেসে উঠে বলল, "বাঙালিরা হাফ-প্রাইস শুনলে ধার করে সুযোগটা নেয়। কথায় বলে, বিনা পয়সায় বিষ পাওয়া যাচ্ছে শুনলে তাই নিয়ে বসে। তাছাড়া আমারও বেশ ইচ্ছে হল কিনা।"

বাগবাজারের কাছে সবে বাস বদল হয়ে, সরু সরু 'আধুনিক' সীটওয়ালা লম্বা বাসটার ছাড়ব ছাড়ব অবস্থা, দরজা খুলে—কে আর ঢুকবে বলো? আমাদের 'নিকি'!

আমাদের দলের সবাই "দারুণ, দারুণ" করে উঠতেই, পিক্‌লু চোখ কুঁচকে বলল, "এই তোমার নিক্-অফ-দি-টাইম?"

নিকি বলল, "তবে? জিজ্ঞেস করো জগন্নাথবাবুকে। মোট-ঘাট সকালেই আপিসে পৌঁছে দিয়েছিলাম। এখন বন্দোবস্ত মতো বাগবাজারের এই স্টপ থেকে নিক্-অফ-দি-টাইম উঠে পড়লাম। তবে বাসটা দু'ঘন্টা লেটে এল, তাই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" বলে ধপ্ করে ওর ঠিক করে রাখা সীট, গোপাপিসির পাশে যেই বসতে গেছে, দেখে দেহের অর্ধেক অংশটা বসতে পারছে কিন্তু অন্য অংশটা ঝুলন্ত থাকছে। গোপাপিসি অনেক চেষ্টা করেও নিজের মোটাসোটা ভাবটা কমাতে পারল না। শেষে ভারী দুঃখিত হয়ে বলল, "পরে তুই জানলার ধারে বসিস, নিকি। আমি তখন ঝুলব'খন।"

নিকি 'ধ্যাৎ!' বলে ব্যাজার মুখে গাড়ির সবাইকে লক্ষ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে আলু পটলের ডালনা আর লুচি খাওয়া হয়েছে। পটলের যে আট টাকা করে কেজি তা জনে জনে শুনেছেন। রাত্তিরে এক বিরাট 'সারপ্রাইজ ডিনার'-এর কথা যাত্রীদের জানানো হল।

পিক্‌লু একখানা বই হাতে খুলে রেখে দেখছিল। মালবিকাদি বাসবীদির ডান পাশে তিনজন অধ্যাপক ওদিককার লম্বা সীটগুলোয় বসে। তাঁদের পেছনে খুব রোগা-রোগা দুটি মহিলার সঙ্গে একজন খুব মোটাসোটা, চকচকে শার্টপরা টাক-ওয়ালা ভদ্রলোক তর্ক জুড়েছেন। সবসুদ্ধু প্রায় পঞ্চাশজন যাত্রী। তার মধ্যে একজন পাঞ্জাবি আর একজন, বাঙালিরা যাদের মাদ্রাজি বলে তাই। ড্রাইভার বেশ স্টেডি চালাচ্ছে। খুব ক্লান্ত বলে প্লেয়ারে বিকট হিন্দি গান বাজিয়ে নিজেকে জাগিয়ে রেখেছে। মালবিকাদি আর বাসবীদি যাচ্ছেতাইরকম হাসছে কী একটা নিয়ে। কাবেরীদি গলা বাড়িয়ে বিষয়টা শুনে নিয়ে হাসতে হাসতে মরে আর কি! একটু পরে গোপাপিসি, ছোটকা, দিলু আর নিকি হাসিতে বড় আকারে যোগ দিল। কেবল পিক্‌লু কিচ্ছু না বুঝে মনে মনে রেগে যেতে লাগল। পরে ফিসফিস করে কাবেরীপিসি পিক্‌লুকে ব্যাপারটা জানাল। টাকওয়ালা ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দিলু নাকি "গুটেন টাক্!" বলেছিল। ভদ্রলোক কটমট করে তাকাতেই দু'জন মহিলা নাকি হেসে ফেলেন। তাতে দিলু হাসি-হাসি চোখে বলে ওঠে, "জার্মান শিখছি কিনা। তাই বলে ফেললাম। গুটেন টাগ মানে হল ইংরিজিতে গুড্ ডে! বাংলায় আমরা ওসব বলি না তো।"

ভদ্রলোকের মুখে হাসি দেখা দিল। তবু যা হোক, টাক নিয়ে কিছু বলেনি। কিন্তু কথাগুলো এত জোরে হচ্ছিল যে, পুরো বাসের লোকজনের বেশ হাসি-হাসি ভাব দেখা দিল।

সাঁ-সাঁ করে বম্বে রোডের ওপর দিয়ে বাস চলেছে। চাঁদের আলোয় চারধার হায় হায় দেখাচ্ছে। পিক্‌লু জানলায় মাথা রেখে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই 'সারপ্রাইজ ডিনার' এখনও খাওয়া হয়নি। তবে হবে। সময় হলেই হবে।

হঠাৎ ক্যাঁক্ করে রেকর্ডারের হিন্দি গান বন্ধ! ধাঁ করে বাসটা বড় হাইওয়ে ছেড়ে খালের দিকে এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর ডানদিকে প্রায় উলটোতে উলটোতে সামলে বাঁদিকে হেলে আবার ডানদিকে বেঁকে গিয়ে খালের ঠিক কিনারায় এসে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাদায় গোঁত্তা মেরে দাঁড়িয়ে গেল। ভেতরে বেশ কিছু মহিলা সিনেমার নায়িকার মতো সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গোপাপিসির, "চেঁচাবেন না, ড্রাই-ভার ঘাবড়ে যাবে।" হাঁকে হল্লা কমল। পিকলুর মনে হল যেন কিছু রাস্তা, কিছু গাছ, কিছু জল ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এবং টলে টলে এগোচ্ছে।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। ড্রাইভার হ্যান্ডেল ধরে বসে রইল যেন স্ট্যাচু। সামনের দিকের সীটে ছিলেন জগন্নাথবাবু আর তাঁর

এক ভগ্নীপতি। তার পাশে ভগ্নীপতির ভাই, ছোট একটি ছেলে আর মেয়ে। কেউ নড়ছে না। জগন্নাথবাবুর পিঠের ওপর থেকে উঁজিয়ে-থাকা বন্দুকের বোতাম-আঁটা খাপটা স্থির।

ছোটকা তড়াক্ করে সব আগে লাফিয়ে উঠে হাঁক ছাড়ল, ''একবার নেমে আসুন কেউ কেউ।'' বলে দরজাটা খুলে নামার আগে থেমে বলল, ''কী হে জগু, একেবারে স্থির হয়ে রইলে যে!''

জগন্নাথবাবু একটু ঘাড়টা ঘুরিয়ে চোখ বুজে রইলেন। হয়তো তখনও বেঁচে আছেন কি নেই তা ঠিক করতে পারেননি।

অন্ধকার ঘুটঘুট্টি। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। বাস ''এই গেল এই গেল'' ভাবে খাল-পারে দাঁড়িয়ে। সকালের আগে ত্রিসীমানায় এক ছিনতাইয়ের দল ছাড়া কেউ মাড়াবে না। যারা বিশ্বান, বুদ্ধিমান আর সংগীতজ্ঞ ছিলেন সব ভয়ে জুজু হয়ে ভেতরে বসে রইলেন। অধ্যাপক এবং 'ডাঃ' জাতীয় যাঁরা ছিলেন, সংখ্যায় কম হলেও বেশ উঁচু গলায় এতক্ষণ জ্ঞানের কথায় বাস ভরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরাও নামলেন না। ফলে খাবারের যিনি হর্তা-কর্তা সেই মনোজবাবু মেতে গেলেন বাসের মাথা থেকে প্রাইমাস স্টোভ আর রান্না করা ''সারপ্রাইজ ডিনার'' নামাতে।

দিলু বলল, ''আরে করছেন কী মশাই। আগে বাসটার গতি হোক। তার ওপর ঠান্ডা হাওয়ায় তো হাড় কেঁপে যাচ্ছে। স্টোভ জ্বালাবেন কী করে?'' মনোজবাবু কেবল হাসলেন। অন্ধকার হলেও সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠল।

সব মিলিয়ে দুটো চার সেলের টর্চ আর কাবেরীপিসির ছ' সেলের বিরাট সিগ্‌নাল আলো, আর ছোটখাট এর-ওর পকেট-টর্চ পাওয়া গেল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছোটকাদের দলটা আর সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক ছ'সেলের আলো ফেলে বড় বড় মিলিটারি বা সাধারণ মালের ট্রাক থামাতে লাগলেন। ট্রাকওয়ালাদের সকলের এক রা—নাঃ, টেনে তোলার চেন নেই। আহত কেউ থাকলে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি ইত্যাদি। শহর মানে জামসেদপুর, রাঁচি এইসব।

এইসব হুজ্জুতি চলেছে, হঠাৎ মালবিকা আর বাসবী পিকলুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, ''চুপ!'' পিকলু তাকিয়ে দেখে কয়েকটা লোক, ''কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, মর গিয়া কেয়া?'' বলে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসছে। ওরা সকলে প্রাণপণে টর্চগুলো ওদের মুখের ওপর ফেলে কথা বলতে লাগল। খুঁজে দেখা গেল কেউ-ই ভোজালি বা ছুরি বাস থেকে নামায়নি। একমাত্র বন্দুকটি একজনের কাঁধে বোতাম-আটকানো অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। গোপাপিসি একেবারে খান্ডালির মতো স্থির-নয়নে চেয়ে রইল মুখগুলোর ওপর চার সেলের টর্চের আলো ফেলে।

হঠাৎ ছোটকার ''হাঃ হাঃ'' হাসিতে সবাই হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। বাস থেকে এমন-কী জগন্নাথবাবুও নেমে পড়েছেন। বন্দুক তেমনি ঢাকনায় বোতাম-আটকানো অবস্থায় রয়েছে। ড্রাইভার, ক্লীনার সবাই যেন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। এমন কী অধ্যাপকরা আর 'ডাঃ'-রা পর্যন্ত মুখ বাড়াচ্ছেন।

''তুই কোত্থেকে রে, হতভাগা পানু?'' বলে একটি আলো-ফেলা-মুখের ওপরের মাথাটা থাবড়ে দিল ছোটকা।

সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে সেই খ্যাঁদা, ফরসা ছেলেটি বলে উঠল, ''বাই জোভ্ রবিকাকা, তোমাকে নর্থ পোলে গেলেও এড়াতে পারব না।'' সবাই পড়ি-মরি করে এল এদের দেখতে। ছিল ছিনতাই পার্টি হয়ে গেল আত্মীয়? ''কী ব্যাপার?'' পানু একগাল হেসে বলল, (তখনও গোপাপিসি ওর মুখে আলো ফেলে রেখেছে) ''যাচ্ছিলাম রাঁচি দল বেঁধে। হঠাৎ আধা-অন্ধকারে দেখি একটা হাফ ওলটানো বাসের পাশে খালের ধারে দুটো পেল্লায় প্রাইমাস স্টোভ জেলে রান্না হচ্ছে। ভেবেছিলাম ভৌতিক কিছু। কিন্তু ডালনার গন্ধ এত রীয়াল—যে—।'' পিকলু আনন্দে ''পানুদা'' বলে লাফিয়ে উঠল।

ব্যস্! তখন চাঁদ তো প্রায় ডুবেছে। তবু পানুদের দল ডালনার ঢাকনা খুলে সেখানে ''চিকেন-কারি'' দেখে, 'তাই বল!' বলে খেতে বসে গেল। ওরা পাঁচজন। আরও দু'জন ধানখেত থেকে উঠে এল।

জগন্নাথবাবু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বললেন, ''এ-ও সেই ছিনতাই-ই হল!''

মনোজবাবু অমায়িক হাসি হেসে পানুদের এক-আধটা পিস বাড়তি দিতে দিতে বললেন, ''সব রকম কাজ করি। পিক্‌নিক, বিয়ে,—সব। দরকার হলে বলবেন।''

পিকলু দেখল কোনো অ্যাডভেঞ্চার হবার উপায় নেই। তার উপর ''সারপ্রাইজ ডিনার'' হল চিকেন কারি। বাসবী হেসে উঠে বলল, ''এবার তাহলে কুমড়ো-ডালনা শুরু হবে রে।'' মনোজবাবু শুনতে পেয়ে আরও বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, ''যদি কুমড়ো-ডালনা করিও, বুঝতে পারবেন না।''

যখন অবশেষে সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের উৎসাহে আর ড্রাইভার আর ক্লীনারদের সহযোগিতায় গাড়িটা একদল লোক চেনে করে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ''হ্যাঁচকা-মারে-বালু'' এই-সব সুর করে বলতে বলতে তুলল, তখন বারো ঘন্টা পার হয়ে গেছে।

পানুদারা খেয়ে দেয়ে, এর-ওর সঙ্গে রসিকতা করে ভোর-বেলায় ''কাঁকেতে দেখা হবে'' বলে কেটে পড়েছে। সেই চাষী দু'জনও। অধ্যাপকরা আর 'ডাঃ'-রা তো আর কুলি-মজুরের মতো চাকার কাদা সরাতে পারেন না। ওঁরা সকাল হতেই চায়ের দোকানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। ছোটকা, দিলু, নিকিরা এগিয়ে গিয়ে পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, মিঃ মাংগাটকে সাহায্য করতে গেলে তিনি অল্প হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ''একে এই বিপদ, তার ওপর আপনাদের কয়েকটা লাশ পড়লেই তো হয়েছে। চা খেতে যান।'' কিন্তু পিকলুকে উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিলেন। আর নিলেন জগন্নাথবাবুর মোমো বলে ছোট একটা ভাগ্নিকে। সাত-আট বছর বয়েস হবে। কিন্তু পিকলুর মাথায় মাথায়। আর ভারী টরটরে। দু'জনে কমপিটিশন করে মিঃ মাংগাটকে সাহায্য করতে লাগল। শেষে দিলুও কাঁধ দিল। মেয়েদের সাহায্য নিলেন না বলে কাবেরীপিসি আর গোপাপিসি সকলকে নিয়ে রসিকতা করে হাসতে লাগল। এতে সবচাইতে রাগলেন ''গুটেন টাক্'' আর নেক-টাই-পরা এক আপিসবাবু আর জগন্নাথবাবু। 'সাধারণ' যাঁরা ছিলেন তাঁরা গল্প করে কাটালেন আর ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল, না, গাড়ি স্কিড করে-ছিল এ নিয়ে গবেষণা করতে করতে বারোটা ঘন্টা কাটিয়ে দিলেন। কেউ কেউ বললেন, ''কী আনন্দ! কোথায় মরে যাবার কথা, তার বদলে চিকেন কারি খেয়ে বেঁচে থাকা! গাড়িতে খুব বৃহস্পতি-দশা-যুক্ত কেউ আছেন।''

গোপাপিসি বলল, ''আমি।'' এই বলে দল বেঁধে ওরা হিহি করে হাসতে লাগল।

গাড়ি চলল ঠিক আগের মতোই। একটুও ক্ষতি হয়নি—আশ্চর্য! ডিজেলের জন্যে রাঁচির পেট্রলপাম্পে আরও চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু ঘটল না। পালামৌয়ের পথ ধরতেই সবাই হায় হায় করে উঠল। বাঁদিকে নিচুতে দূরের পৃথিবী। ডান দিকে খাড়া পাহাড়। ঘুরানো সিঁড়ির মতো পথ। শাল পিয়ালের বন বেশ অন্যরকম। মাটির রঙ লাল। পিকলু মুগ্ধ হয়ে জানালায় নাক লাগিয়ে এসব দেখছিল। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। বাসটা প্রায়ই থামছে, মাল বোঝাই লরিগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেবার পথ করে দিতে। পথে অনেকগুলো ওলটানো বা ছিটকানো গাড়ি, ট্রাক আর জীপ

দেখা গেছে। বাসের ড্রাইভার দু'রাত ঘুমোয়নি। ভীষণ ক্লান্ত আর দুঃখিত হয়ে আছেন ভদ্রলোক। সতেরো বছরের ড্রাইভারির জীবনে এই প্রথম অ্যাকসিডেন্ট।

মড়-মড়-মড়-মড়াত! এ কী! দাঁড়িয়ে থাকা বাসটার দুটো বড় জানালা গুঁড়িয়ে দিয়ে কাঠের গুঁড়ি বোঝাই একটা ট্রাক হুড়-মুড় করে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে গেল পাহাড়ি পথ বেয়ে। পিকলু তাকিয়ে দেখে ডান পাশের প্যাসেঞ্জারদের ঠিক কাঁচের কতগুলো প্রতিমার মতো দেখতে হয়েছে। কুচো কুচো কাঁচের গুঁড়োয় গা-মাথা ভর্তি। ড্রাইভার অসহায়ভাবে ছুটে গেল ট্রাকটাকে ধরতে, কিন্তু কোথায় কে? সবাই কাঁচ ঝেড়ে-ঝুড়ে নেমে পড়তেই দেখা গেল জানলাগুলোর কাঁচ আর পাশের রঙ ছাড়া কিছুই ক্ষতি হয়নি। কারুর হাত-পা পর্যন্ত কাটেনি। ক্লীনার ঝাঁট দিয়ে যখন গাদা গাদা কাঁচ ফেলছে তখন মাল-বিকাদি গলা নামিয়ে কাবেরীপিসিকে বলল, "গুটেন টাকের অবস্থা দেখুন।"

কাঁচের গুঁড়োয় টাকটি রাস্তার আলোয় যেন ভোরবেলার শিশির-ভেজা সূর্য! নিকি একদম না হেসে টাকটি সন্তর্পণে রুমাল দিয়ে ঝাড়তে যেতেই ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে সরে গেলেন। "করছেন কী, করছেন কী?" বলে যেই দূরে সরে গেছেন অমনি পা হড়কে যেতেই ওরা পাঁচ ছ-জন মিলে ওঁকে ধরে ফেলে ধাঁ করে মাথা ঝেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা জায়গা গেল কেটে। উনি হাত দিয়ে দেখলেন। তার-পর ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠলেন 'ব্লাড! এ ট্রিপের আমিই প্রথম ক্যাসুলটি!' কথাটা শুনে কাবেরীপিসি সেই যে রঙ্গরস শুরু করল, সে আর থামল না।

বেশ রাতে পৌঁছনো হল। ফরেস্ট-বাংলোয় লোডশেডিং। বোধহয় চাঁদের আলো আছে বলে। তোলা জলে হাত-পা ধুয়ে সবাই পড়িমরি করে জায়গা দখল করতে লেগে গেল। দেখা গেল পঞ্চাশজনের মধ্যে পঁচিশ-জনের ব্যবস্থা সহজে হচ্ছে, এর মধ্যে প্রায় জনা কুড়ি মেয়ে আর পঁচিশজনের মধ্যে পিকলু, দিলু, নিকি, ছোটকা আর এমন-কী সাধারণরা বাদে কিছু অধ্যাপক গেছেন বিছানা আর ঘর থেকে আউট হয়ে। কিন্তু আউট হলে তো চলবে না। রাতে হাতির পাল, বাঘ, বাইসনের পাল—নিদেন পক্ষে সাপ, যাদের জন্যে ইস্তাহারের নির্দেশমতো কারবলিক সোপ আনা হয়েছে, তাদের কথা ভাবতে হবে।

জগন্নাথবাবু ব্যাপার দেখে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, তিনি একটা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে রইলেন। একটু পরে চোখ খুলে বললেন, "অনেকগুলো বন্ধ ঘর রয়েছে—জবরদখল করুন সবাই মিলে।" শুনে সবাই গেস্ট হাউসের অফিসারের কাছে গিয়ে চাবির জন্যে দরবার করলেন। রফা হল, যাদের রিজার্ভ করা ঘর তারা যদি আসে তাহলে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। সবাই রাজি।

গোপাপিসি একটু পালের গোদা টাইপের হওয়ায় ওদের দলটা একেবারে দঙ্গল বেঁধে রইল। কাবেরীপিসির মজলিশি গল্পের ঠাসবুনুনিতে কোনো খাদ ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল বনে যাওয়া নিয়ে। মালবিকা বলল, "কাবেরীদি, আপনি যত হাসাবেন সম্পাদক মশাই তত অসুস্থ হয়ে পড়বেন কিন্তু। তার চেয়ে চলুন, যতক্ষণ মনোজবাবুর প্রাইমাস স্টোভ জ্বালা হচ্ছে ততক্ষণ দু-চারটে জন্তু-জানোয়ার দেখে আসি।"

"বিশেষত ঐ জন্যেই যখন আসা।" বলে লাফিয়ে উঠে দিলু ছোটকার হাত ধরে তুলে নিল।

বনের পথটা ভারী সুন্দর। একদম বাঙালি নয়। ঝোপঝাড় নেই বললেই হয়। চাঁদের আলোয় শাল গাছগুলো যা দেখাচ্ছে! পিকলু রইল কাবেরীপিসির হাত ধরে 'সইত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দ্যাশ' গপ্পটা কোথা থেকে চালু হল তা শুনতে শুনতে। সেটা সারাপথ নাটক করে বলতে বলতে চলল কাবেরীপিসি। শালপাতা মাড়িয়ে চলার অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে কানে আসতে লাগল প্যাঁচার চিৎকার আর হায়নার ডাক। শুনে হঠাৎ ছোটকা থমকে দাঁড়িয়ে "বাঘ ডাকছে" বলে পেছু হটল।

দিলু ছোটকাকে ধরে ফেলে বলল, "আরে আরে, বাঘ দেখতেই তো আসা।"

"তাই বলে জ্যান্ত, ছাড়া বাঘ?" নিকি মুখটা ব্যাজার করেই ছিল। মাথাটা একটু হেলিয়ে কান খাড়া করে বলল, "হায়না ডাকছে। চিড়িয়াখানাতেও বাঘের ডাক শোনেননি।"

পিকলু হঠাৎ "হাতি হাতি" বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাততালি দিতে যেতেই বাসবী ওর হাতটা চেপে ধরল। হাতি শুনে তো সকলেরই পিলে চমকেছে। এখন তো সর্বনাশ।

ধরবে আর গোদা পায়ের তলায় পিষে মারবে। কী কুক্ষণে বন্দুক, ভোজালি ছাড়াই বেরিয়ে এসেছে যে! কিন্তু পিকলুর দৃষ্টি যেদিকে আটকানো সেদিকে তাকিয়ে দেখা গেল একটা ছোটমতো হাতির বাচ্চা, পায়-বেড়ি-পরা অবস্থায় পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে, এমন-কী বীরপুরুষ নিকিরও 'হাতি' শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এটি পোষা বাচ্চা হাতি। দুটো বাঘের বাচ্চাও আছে। তবে তারা খাঁচায় থাকে। খবরটা দিলেন বনে ঢোকার গেটে বসে থাকা গার্ডসায়েব। এ ছাড়া? একটু হেসে বললেন, "ঢুকে যান, ভয় নেই।

খানিকটা এগিয়েই দেখা গেল সেই অধ্যাপকরাও পা চালিয়ে চলে এসেছেন। তাঁরা কেবলি রাজনীতি সমাজনীতি অর্থ-নীতি কপচাতে কপচাতে একটু ক্লান্ত হয়েছেন বোধহয়।

প্যাঁচার ডাকে লাফিয়ে উঠছেন দু-একজন। এমন সময় দূরে কালো কালো একদল জন্তু—! কী ওগুলো? "বাইসন," চোখ গোল করে প্রফেসর চক্রবর্তী বললেন। "যদি ছুটতে আরম্ভ করে, স্ট্যাম্পিডে সবাই মরব।" বলে সবাই পিছু হটে পা টিপে টিপে ফিরে গেটের কাছে এসে গার্ডকে কথাটা বলতেই তিনি হেসে ফেললেন। "এদিকে বাইসন কোথায় মশাই? সে তো ইন্টিরিয়ারে যেতে হবে। ওগুলো বাফেলো—মোষ। আমাদের কিছু চাষী দুধের ব্যবসা করে। ওদিকটা নিরাপদ বলে রাতে ওখানে রাখে।"

পিকলু ভাবে—কী আপদ! সবই তো নিরাপদ দেখা যাচ্ছে। তাহলে ইস্তাহারে যে লেখা আছে বন্যপ্রাণী থিকথিক করছে তারা গেল কোথায়? এক হায়নার ডাক ছাড়া তো কিছুই শোনা গেল না। হলদে পরবে না, লাল পরবে না বলে কত লেখা হয়েছে ইস্তাহারে। যদিও পিকলু জানে জন্তুরা 'কালার-ব্লাইন্ড' তাদের 'ডবল ভিশান' তবু তো, সে পর্যন্ত যত ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের জামা-প্যান্ট পরেছে। পিসিদের ম্যাড়ম্যাড়ে শাড়ি ধার করে পরতে হয়েছে পাছে বন্যপ্রাণী ঢুঁ মারে। জগন্নাথবাবুকে পিকলু বলেছিল।

তাতে উনি বলেছিলেন, "আমি তো ওদের চোখের মধ্যে ঢুকিনি যে কালার ব্লাইন্ড কি না বলতে পারব।" "কিন্তু আপনি কালারের কথা লিখেছেন কিনা তাই বোধ হয় ও জিজ্ঞেস করছে।" বলে ছোটকা আলোচনাটা ইতি করে দিয়েছিল।

ওরা বাংলোয় ফিরে এসে দেখে বিরাট একটা নতুন বাস দাঁড়িয়ে। তার থেকে বাচ্চাকাচ্চাসহ ষাট জনের মতো লোক নিকিদের ঘরগুলো বেদখল করছে। জগন্নাথবাবুর মাথাধরা কমেছে নিশ্চয়ই। কেননা, উনি উঠে পড়ে হলঘরে সকলের জিনিস জড়ো করবার জন্যে সেই সব আত্মীয়-স্বজনের-মতো বেয়ারা, হেলপারদের ডাকছেন।

নিকির মুখখানা ঠিক কালো বারকোশের মতো দেখাতে লাগল। গলা তুলে বলল, "একে জল নেই, আলো নেই, তায় জিনিসপত্র পর্যন্ত বাইরে? শোব কোথায়?" জগন্নাথবাবু বন্দুকের খাপটা পিঠে লাগিয়ে নিয়ে বললেন, "শুতে হবে না। ড্রাইভারের রেস্ট হয়ে গেছে। এখন ফরেস্টে যাব। শোবার দরকারই হবে না। খেয়ে নিন। স্পটলাইটে ওয়াইল্ড লাইফ দেখাব।"

কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে, হলঘরে জিনিসপত্র রেখে বনের পথে বাসে করে বেরুনো হল। কাবেরীপিসি টিটকিরি কেটে বলল, "নাও বাসবী, মনোজবাবু তোমার মনের কথা ভাগ্যিস জেনে ফেলেছিলেন। তাই এরকম ওরিজিনাল কুমড়োর ঘ্যাঁট খেতে পেলে।" মালবিকা অনেকক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকার পরে স্পটলাইটে কিছু চিতল হরিণ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে বলল, "কত ভাল শাড়ি পরার সুযোগ ছিল। কতগুলো কামোফ্লাজের মতো গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি নিয়ে এলাম। রইলাম বাসে বসে। বন্যপ্রাণীরা দেখলও না। হায় হায়। মাঝখান থেকে ছেলেরা কী সব চকরাবকরা রঙের জামা পরেছে দেখ। লাল, হলদে, নীল, কমলা, বেগুনে—রামধনুর সব চাইতে সুন্দর রঙ—!"

ঘুরে ঘুরে যাকে বলে পথই গেল ফুরিয়ে।

পিকলু রীতিমত অপমানিত বোধ করতে লাগল। কেবলই চিতল হরিণ আর মোষ? তাও চিতল হরিণগুলো স্পটলাইটে ধরা পড়ে কী বিরক্তই না হচ্ছে। সেই সব মাচান, মই, গাছের বাসা, জলের ধারে লুকোনো কুন্ড গেল কোথায়? ছোট্‌কাকে এক হাত নিতে হবে।

বাংলোতে ফিরে পিকলু গেল হলঘরের মেঝেতে শুতে। কতক্ষণই বা রাত আছে? এখন প্রায় দুটো হবে। পিসিরা ও ঘরে কী হুল্লোড়ই না করছে! ওদের আর কী? এসেছে হাসতে। হাসাবার লোকও এসেছে—কাবেরীপিসি। মিনিটে মিনিটে ক্যারিকেচার করতে পারে। আর গল্পের কী স্টক। কিন্তু পিকলুর মতো যারা জীববিজ্ঞানের জন্যে জান লড়িয়ে দিয়েছে, তাদের এ দুঃখু যাবে কোথায়? দিলু চোখ বুঁজে বলল, "অথচ একটু ভেতরে নিয়ে গেলেই হাতি থেকে বাইসন, সবই দেখা যেত।" নিকি হাসল, "ম্যাড্! খরচ হবে না? আবার দেখো, কালও এই একই অবস্থা হবে।" অন্য দিক থেকে রীতিমত একজন অধ্যাপক সায় দিলেন, "তা আর বলতে!"

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পিকলুর আর ঘুম আসে না চোখে। আস্তে আস্তে ও উঠে টুক করে দরজা খুলে, আলতো ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই বাচ্চা হাতির চালাঘরের দিকে। ভোজালি, ছুরি সবই আছে সঙ্গে। জীবজন্তু ও মারবে না। তবু একটা রাখতে হয় তাই। অন্যমনস্ক হয়ে অনেকটা পথ এসে পড়েছে। চাঁদটাকে 'ফলো' করতে গিয়ে এই অবস্থা। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। গা ছম ছম করে উঠল। বনের পথে একটা কালো মোষের মতো কী যেন এগিয়ে আসছে? ওর দিকে ছুটছে যে! পিকলুও পেছন ফিরে ছুটতে আরম্ভ করল। বাইসন। দলছাড়া একটা বাইসন। গুঁতিয়ে না দিলে কিছু হবে না। কিন্তু গুঁতোবে কেন? বাইসন তো সাধারণ বন্যপ্রাণী—হিংস্রদের দলের নয়। ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে দেখে বাইসনটাও ছুটছে বেশ জোরে।

ঐ তো বাংলো দেখা যাচ্ছে। পিকলু চেঁচিয়ে উঠল, "বাইসন, বাইসন! ছোটকা, মেজদা, গোপাপিসি—বাইসন!" নিস্তব্ধ রাতে পিকলুর তীক্ষ্ম গলা হায়নাকে হার মানাচ্ছিল। এদিকে বাইসনটা ওকে প্রায় ধরে ফেলেছে। পাশে এসে পড়েছে। হঠাৎ বাইসনটা বলে উঠল, "মাইসন, আমি বাইসন! বহুরূপী বাইসন।" শুনে পিকলু থমকে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমিভরা চোখে বলল, "বাইসন! বাইসনই থাক!" বলে আবার চেঁচানো শুরু করতেই দেখল সবাই বেরিয়ে আসছে। ছোটকারা হুড়মুড় করে লাঠিসোঁটা নিয়ে এল। ঢাকনাসুদ্ধ বন্দুক হাতে জগন্নাথবাবু সদলে। অধ্যাপকদের কেউ কেউ আর সব মেয়েরা।

নিকি চেচিয়ে উঠল, "বন্দুক, বন্দুক বার করুন, নিক-অফ-দি-টাইম না মারলে পালাবে।" বলামাত্র বাইসন-বহুরূপী জগন্নাথবাবুকে মারল এক ঢুঁ। হাত থেকে বোতাম-আঁটা বন্দুক ধপ করে পড়ে গেল বাইসনের সামনে। জগন্নাথবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন বলে মনে হল। গোপাপিসি ছ সেলের টর্চের আলো ফেলল বাইসনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সে জামার মতো করে তার 'বাইসন ড্রেসটা' খসিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বন্দুকের খাপটা তুলে নিয়ে বোতাম খুলে ফেলে চিৎকার করে বলে উঠল, "অপূর্ব, এয়ার গান। মাইসন, এ দিয়ে বাইসন মারা যায় না।"

তারপর যা হল তা আর বলবার নয়। হৈ-চৈ, হাসাহাসি, দু' দুটো বোঝাই গাড়ির লোকের হল্লা-হুল্লোড়। বাইসন-বহুরূপী শেষে ব্যাপারটা খুলে বললেন, "আমি বাঘ-টাঘ সবই সাজি। ভাল লাগে। মজা লাগে। তবে বেশি দল-টল এসব করলে বন্য প্রাণী কমতে থাকবে আর চুরি বাড়তে থাকবে।"

ছোটকা ভদ্রলোকের পিঠ থাবড়ে বলল, "আপনি আমাদের সব দুঃখু ঘুচিয়ে দিলেন। জগন্নাথবাবুর জ্ঞান হতে ওঁকে এয়ার-গানটা ফেরত দেওয়া হল। মনোজবাবু জানালেন, "আজ স্পেশাল ধোঁকার ডালনা।" শুনে আর একচোট হাসির ঢেউ বইল। পিকলুর মুখখানা কেবল কেমন দুঃখী-দুঃখী হয়ে রইল। বন্যপ্রাণী কি আছে না নেই? ভাঁওতাবাজি হতে পারে। ওর মনের কথা বুঝে বহুরূপী-বাইসন বলল, "মাইসন, আশা ছেড়ো না। বাইসন আছে। খোঁজো। পাবে।"

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

একের সঙ্গে অন্যের কোমরে লাল ফিতে বেঁধে লাইন করে জোরকদমে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকটি শিশু। ওদের মুখে শব্দ, পু-উ ঝিক-ঝিক। বোঝা গেল পুজোর ছুটিতে একটি স্পেশাল ট্রেন যাচ্ছে এবং ট্রেনটি রাজধানী এক্সপ্রেস না হলেও এ গাড়িতে আনন্দ আর কোলাহলের ঘাটতি নেই। আসলে, এটি যে-কোনও রেলগাড়ির সশব্দ চলন-ভঙ্গির নকল। পু-উ-উ করে গার্ড-সাহেবের হুইস্‌ল বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন-সমেত গাড়ি ঝিক ঝিক করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মানব-শিশু যখন প্রথম প্রতিধ্বনি শুনেছিল, তখন তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।
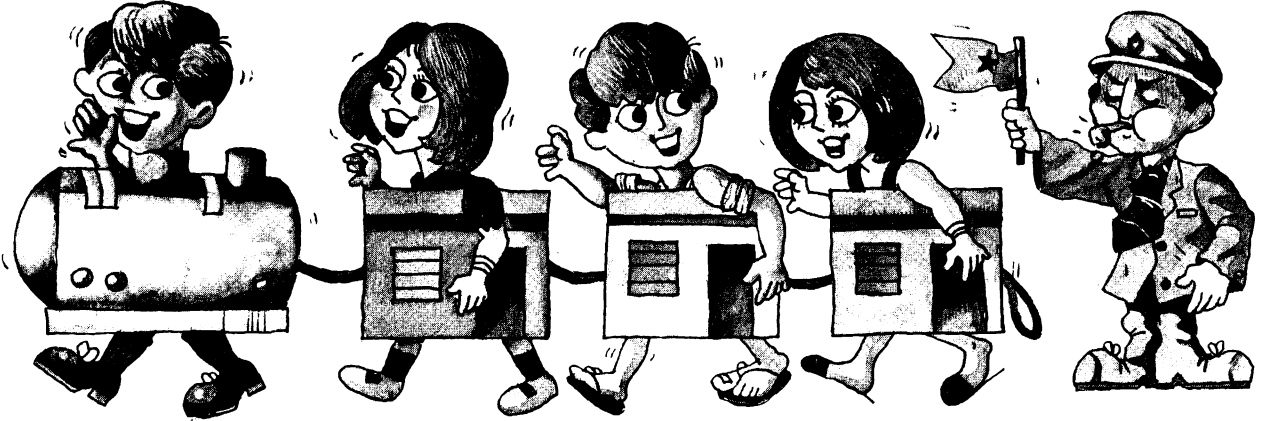
শব্দ নকল করার নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। শিশুকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মেঘ কী বলে, বলো তো? সে অমনি উত্তর দেয়, মেঘ বলে, গুড়্‌গুড়্‌। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের শিশুটি রাতে স্বপ্নের মধ্যে তার কাকাকে যেমনি শোনায়, সে আকাশে উঠে মেঘ হয়ে গেছে, অমনি কড়্‌কড়্‌ রবে বাজ দাঁত মেলে হাসে। গুড়্‌গুড়্‌, কড়কড়, ঝিকঝিক—এগুলো সবই নকল-করা শব্দ। পণ্ডিতেরা এগুলোকেই কঠিন করে বলেন, ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

বেশির ভাগ ধ্বন্যাত্মক শব্দই দেশজ ; অর্থাৎ দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি আদিম জাতির ভাষা থেকে গৃহীত। এই শব্দগুলি হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে এবং এগুলি প্রাণশক্তিতে ভরপুর। 'মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।' দেখা যাচ্ছে, ধ্বনি-বৈচিত্র্যের জন্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ কবিদেরও খুব প্রিয়। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাভাষার এই শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর ধ্বনিবিচার প্রবন্ধে এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। ইংরেজি ভাষাতেও বাস্তব-ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট অনেক শব্দ আছে। যথাঃ ding-dong bang, thud ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ভাষার তুলনায় তা খুবই কম এবং এতটা বৈচিত্র্যপূর্ণও নয়।

ঝাঁ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে ধপ করে বসে পড়ল। মোটা বইটা তাক থেকে নামাতে গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল। ঝাঁ, ধপ, ধপাস প্রভৃতি শব্দ ধ্বন্যাত্মক। আবার, ধ্বন্যাত্মক শব্দ-দ্বৈতের সঙ্গেও আমরা খুব পরিচিত। যথাঃ সোঁ-সোঁ করে হাওয়া দিচ্ছে। মাঝিরা ঝপঝপ করে দাঁড় ফেলছে। এই বাক্য দুটির সোঁ-সোঁ আর ঝপঝপ যুগল ধ্বন্যাত্মক শব্দ। আবার, অন্যরকম অনুকার-মূলক শব্দদ্বৈতও আছে, যার মধ্যে একটি অপরটির অনুকার-ধ্বনি। যেমনঃ সে মুখ কাচুমাচু করে উঠে গেল। লোকটি চেয়ারে বসে উসখুস করতে লাগল। পকেটমারটি ধরা পড়ায় অনেকেরই হাত নিশপিশ করতে লাগল। অন্য আর-এক ধরনের শব্দদ্বৈত আছে যাদের দ্বিরুক্তির মধ্যে একটা আ-স্বর যোগ হয়। যেমনঃ বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম।

বেশির ভাগ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হয়। তবে বিশেষ্যের বিশেষণরূপেও তা ব্যবহার করা চলে। যেমনঃ ফিন-ফিনে ধুতি, ফুরফুরে হাওয়া প্রভৃতি। বিশেষ্যরূপেও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার আছে। সে পাখির ঝটপট শুনতে পেল। ঝটপট শব্দের অর্থ ডানা নাড়ার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে নামধাতু-রূপেও বাক্যে ব্যবহার করা চলে। যথাঃ 'ঝনঝনিল অসি।'

আবার, তাৎপর্যের দিক থেকে তিন রকমের ধ্বন্যাত্মক শব্দ আমরা দেখতে পাই। (১) বাস্তব ধ্বনির অনুকারী। এগুলি নিছক ধ্বনি-দ্যোতক। তাল ঢিপ করে পড়ে। কাকগুলি কা-কা করে। ইত্যাদি। (২) বাস্তব ধ্বনির অনুকারী, কিন্তু ধ্বনি-দ্যোতক নয়। এগুলি ভাবের দ্যোতক। যথাঃ তার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছে। এতে ভয়ের ভাব প্রকাশিত হচ্ছে। 'মাস্টারমশাই রেগে টং হয়ে আছে।' বাক্যটিতে মাস্টারমশাইয়ের মানসিক অবস্থা বোঝাচ্ছে। (৩) বাস্তব ধ্বনির অনুকারী নয়, মনোভাব-ব্যঞ্জক। সারা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। এখানে বাড়ির শূন্যতা ব্যক্ত হচ্ছে। স্তব্ধতা, এমনকী নিঃশব্দতাকেও ধ্বনিদ্বারা প্রকাশ করা যায়। যথাঃ মাঠ ধু-ধু করে। পুকুর থৈ-থৈ করে। শূন্য হৃদয় হু-হু করে ইত্যাদি।

অনুকারমূলক বা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি কিন্তু ভারী মজার। অঙ্ক কষতে গিয়ে যদি কেউ দুই-এর জায়গায় ভুল করে তিন লিখে ফেল, তক্ষুনি অঙ্কের পরীক্ষক তা ঘ্যাঁচ করে কেটে গোল্লা বসিয়ে দেবেন। ওই ঘ্যাঁচ শব্দটার কিন্তু সত্যিকারের অর্থ কিছুই নেই। অথচ রাগ বা বিরক্তি বোঝাতে শব্দটার কী জোর! 'রামের সুমতি' গল্পে নীলমণি ডাক্তার যখন রামের বিরুদ্ধে অন্য রোগীদের সাক্ষি দেওয়ার কথা বলল, তখন বৃদ্ধ রোগীটি বলল, 'কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁ-ভোঁ করতেছে—রামঠাকুর কি যে বলে গেল, তা শুনতেও পেলুম না।' কুইনাইন খেয়ে কী অবস্থা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে ভোঁ-ভোঁ শব্দ-যুগল। অভিধান থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি কিছু কিছু বাদ পড়েছে ঠিকই, কিন্তু বাংলাভাষার ভাঁড়ার থেকে তাদের বাদ দেওয়া যাবে না। বাদ দিলে, বাংলা ভাষার অঙ্গহানি ঘটবে। এমন নিখুঁত বর্ণনা ও ভাবপ্রকাশের শক্তি অর্থযুক্ত শব্দের নেই।

ছবি: দেবাশিস দেব

দু'মিনিটে দু'জন গ্রেফতার

শেখর বসু

চিন্ময় দরজা খুলতেই রামপ্রসাদবাবু কেমন যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত ধরে বললেন, "তুমি আমাকে বাঁচাও চিন্ময়, ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়েছি।"

রামপ্রসাদবাবু যতখানি উত্তেজিত, চিন্ময় ঠিক ততখানি শান্ত। শান্ত গলায় চিন্ময় বলল, "বসুন।"

রামপ্রসাদবাবু প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারলেন না। ধপ্ করে বসে পড়লেন চেয়ারের ওপর। চিন্ময় বাঁকা চোখে দেখতে লাগল ওঁকে। চিন্ময় আগে বাঁকা চোখে তাকাত না, এখন তাকায়। কেননা ও কিছুদিন হল জানতে পেরেছে যে, যারা বেশি বুদ্ধিমান তারা সোজা চোখে তাকায় না।

রামপ্রসাদবাবু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন, "আরে বাবা, আমার দিকে অত তাকাবার কী আছে? আমি চোরও না, ডাকাতও না। আমি হচ্ছি গিয়ে থানার দারোগা। বিপদে পড়ে তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এয়েছি, আর তুমি কিচ্ছুটি না শুনেই আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে দিলে! এ কেমন তোমার গোয়েন্দাগিরি, নাকি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?"

রামপ্রসাদবাবুর গলাটা একটু ভার-ভার হয়ে উঠল।

শখের গোয়েন্দা চিন্ময়ের বয়েস মাত্র সতেরো। মাঝারি মাপের সাধারণ চেহারা। ছেলেমানুষ মুখে জোর করে টেনে আনা বুড়োমানুষি ভাব। কিন্তু তা নিয়ে ঠাট্টা করার সাহস কারও নেই, কেননা চিন্ময় এই বয়েসেই পাঁচটা খুনের কিনারা করেছে, চোর-ডাকাত ধরেছে গোটা পনেরো। চিন্ময় এতক্ষণ ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে রামপ্রসাদবাবুকে দেখছিল, এবার বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে ওঁকে দেখতে দেখতে বলল, "কী ব্যাপার, বলুন তো।"

রামপ্রসাদবাবু অভিমানী গলায় বললেন, "তুমি কি চাও আমি এই বয়েসে চাকরি থেকে বরখাস্ত হই?"

"না।"

"তুমি কি চাও বিশ বছরের এই পুরনো জায়গা ফেলে আমি অজ পাড়াগাঁয়ে বদলি হয়ে যাই?"

"না।"

"তাহলে তুমি আমাকে বাঁচাও।" রামপ্রসাদবাবু রীতিমত ভেঙে পড়লেন। কিন্তু চিন্ময়ের গলার স্বরে একটুও পরিবর্তন দেখা গেল না। ঠিক আগের মতো শান্ত গলায় ও বলল, "পুরো ব্যাপারটা আপনি খুলে বলুন, আমার মনে হয় আমাদের হাতে

খুব বেশি সময় নেই।''

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে রামপ্রসাদবাবু বললেন, ''ঠিক বলেছ, আমাদের হাতে আর মোটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই তোমাকে বলছি। কিছুক্ষণ আগে খোদ বড়সাহেব একটা অয়ারলেস মেসেজ পাঠিয়েছেন আমার কাছে। সেটা হল, এই যে হাওড়া মেলটা আসছে, তাতে দুজন দাগী স্মাগলার আছে। বিরাট একটা ইণ্টারন্যাশনাল র‍্যাকেটের মেম্বার দুজনেই। একজন পাচার করছে অষ্টধাতুর একটা প্রাচীন মূর্তি। আর একজনের সঙ্গে আছে একটা রিসার্চ ফাইণ্ডিং আর দু' লিটার পিওর অ্যালকোহল।''

''ওরা কি এই স্টেশনেই নামবে, না হাওড়ায়? কোনো খবর আছে?''

''না, পরিষ্কার কোনো খবর নেই, এখানে নামতেও পারে, আবার নাও নামতে পারে। তবে দরকার হলে কম্পার্টমেণ্টে তল্লাশি চালিয়ে ওদের ধরার অর্ডার দেওয়া হয়েছে আমাকে।''

''হাওড়াতেও তো রেড হবে?''

''হ্যাঁ, তাও হবে। তবে মিছিল-ফেরত হাজার-হাজার লোকে হাওড়া স্টেশন বোঝাই হয়ে আছে বলে এই স্টেশনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই স্টেশনে হাওড়া মেল মোটে দু' মিনিট দাঁড়াবে। এই দু'মিনিটের মধ্যে কখন আমি সার্চ করব, কখন আমি গ্রেফতার করব—এটা কি সম্ভব! হায় ভগবান, কী যে আমার কপালে নাচছে! বড়সাহেব এমনিতেই আমার ওপর চটা, এবার নির্ঘাত আমাকে পাড়াগাঁয়ের দিকে বদলি করে দেবে।'' রামপ্রসাদবাবুর চওড়া কপালের ওপর মোটা-মোটা ঘামের দানা জমে উঠেছে অনেকগুলো। উনি সম্পূর্ণ অসহায়ের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চিন্ময় এবার আগের চাইতেও বাঁকাভাবে রামপ্রসাদবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''ওরা কোন্ ক্লাসে ট্রাভেল করছে, কিছু জানিয়েছে?''

''জানিয়েছে, ফার্স্ট ক্লাসে।''

''তাহলে তো আপনার কাজের কিছুটা সুবিধে হল।'' চিন্ময় মৃদু হেসে বলতেই রামপ্রসাদবাবু খেপে উঠে বললেন, ''সুবিধে না কচু! আরও খবর আছে। ফার্স্ট ক্লাসে ওই কম্পার্টমেণ্টে আরও পাঁচজন বড়-বড় লোক আসছে। একজন সেণ্ট্রাল মিনিস্টার অব স্টেট, এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের এক ডেপুটি সেক্রেটারি আর তিনজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা। মেসেজে স্পেশাল নোট আছে, আমি যেন কাউকে একটুও হ্যারাস না করি। আরে বাবা, আমি কি হাত গুনতে জানি না কি যে, যাব আর ট্রেন থেকে স্মাগলার দুটোকে নামিয়ে নেব টপাটপ! এসব কাজ দেওয়া মানেই চাকরি খাওয়ার তাল।''

জবরদস্ত দারোগাবাবু দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেলেন। তারপর কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বললেন, ''চিন্ময়, তুমি আমার ছেলের মতো, বন্ধুর মতো, এ-যাত্রা আমায় উদ্ধার করো।''

চিন্ময় দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, ''সত্যিই আর সময় নেই; দাঁড়ান, এক মিনিটের মধ্যে আমি তৈরি হয়ে আসছি।''

ঠিক এক মিনিটের মধ্যেই ও তৈরি হয়ে এল। দরদর করে ঘামতে ঘামতে ঘরের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন দারোগাবাবু। কী যেন বলতে যাবেন চিন্ময়কে, তার আগেই ও বলল, ''এক মিনিট। একটা ফোন করতে হবে।''

''আবার এক মিনিট! এসে ফোন করলে হত না?''

কোনো উত্তর না দিয়ে ভেতরের ঘরে ফোন করতে চলে গেল চিন্ময়। ফিরে এল এক মিনিটের জায়গায় চার মিনিট পরে।

এই চার মিনিটের মধ্যে দারোগাবাবুর খাকি জামার বুকের কাছটা ভিজে গেছে একদম। চিন্ময়কে দেখেই উনি 'চলো' বলেই তিন লাফে রাস্তায় গিয়ে নিজের জীপে উঠে বসলেন। চিন্ময় উঠতেই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি কিছুটা যাওয়ার পরে দারোগাবাবু বললেন, ''আমাকে একবার বাড়ি হয়ে যেতে হবে তো।''

''কেন?''

''বাহ্, পুলিসের পোশাকটা ছেড়ে যেতে হবে না। প্লেন ড্রেসে না গেলে স্মাগলাররা তো অ্যালার্ট হয়ে যাবে।''

দারোগাবাবু ভেবেছিলেন, চিন্ময় ওঁর বুদ্ধির তারিফ করবে, কিন্তু তা হল না। চিন্ময় গম্ভীর গলায় বলল, ''না, সাদা পোশাকে যাওয়ার দরকার নেই। আপনি পুলিস ইউনিফর্মেই চলুন, আর সঙ্গে চারজন আর্মড কনস্টেবল নিয়ে নিন।''

দারোগাবাবু তর্ক তুলতে গিয়েও তুললেন না। চিন্ময়ের কথামতো থানা থেকে চারজন সশস্ত্র কনস্টেবল তুলে নিলেন। জীপ যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন হাওড়া মেল আসতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

উত্তেজনায়, দুশ্চিন্তায় দারোগাবাবুর জামা ভিজে একদম। কী করবেন ভেবে না পেয়ে কনস্টেবল চারজনকে সম্পূর্ণ অকারণে ধমকালেন, সার দিয়ে দাঁড় করালেন, তারপর স্টেশনের প্লাটফর্মে মার্চ করালেন কিছুক্ষণ।

হাওড়া মেল স্টেশনে এসে পৌঁছতে আর মোটে দেড় মিনিট বাকি। চিন্ময় খুব বাঁকা চোখে দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, ''হাওড়া মেল বিরাট লম্বা গাড়ি। ট্রেনের একদিক থেকে আর একদিকে পৌঁছতেই আপনার মিনিট পাঁচেক লেগে যাবে। কখন আপনি গাড়িতে উঠবেন, কখনই বা তল্লাশি চালাবেন। ট্রেন এখানে তো দাঁড়াবে মাত্র দু' মিনিট।''

''তা হলে!'' দারোগাবাবু একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। ''আমাদের এমন জায়গায় দাঁড়াতে হবে, যেখান থেকে ওই
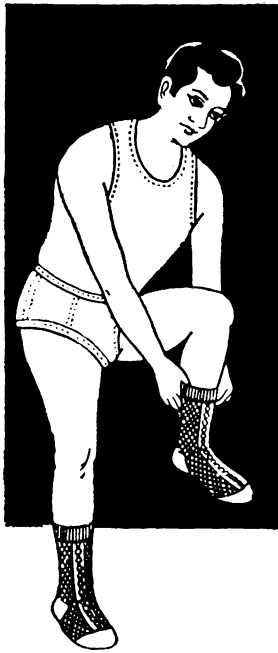
কম্পার্টমেন্টটা খুব কাছাকাছি হয়। তা হলে আমাদের হাতে কিছুটা সময় থাকবে।''

"সেটা কী করে সম্ভব?''

চিন্ময় মনে মনে কী যেন হিসেব করল, তারপর বলল, "চলুন আমরা চায়ের স্টলটার সামনে দাঁড়াই। মনে হয়, ওখানেই ওই কম্পার্টমেন্টটা দাঁড়াবে।''

একটু পরেই ঘণ্টা বাজল। তারপরেই হুশ-হাশ, হুশ-হাশ করতে করতে বিরাট লম্বা হাওড়া মেলটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

দারোগাবাবুর চোখ ঠিকরে বেরুবার জোগাড়, কিন্তু ওঁর দৃষ্টি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, উনি কোনো কিছুর তাল পাচ্ছেন না।

ট্রেনটা দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই প্লাটফর্মে যেন বাজার বসে গেল। চায়ে-এ-এ-এ গরম, কে-এ-এলা চাই কে-এ-এ-লা, পুরি-ই-ই লাড্ডু-উ-উ। ফেরিওলাদের চেঁচামেচির সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত যাত্রী আর কুলিদের ছোটাছুটি।

চিন্ময়দের সামনেই একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল তিনজন সুবেশ যাত্রী। চিন্ময় ওদের দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর চাপা গলায় বলল, "মধ্যিখানের ওই লোকটাকে অ্যারেস্ট করুন।"

"কোন্‌টা, কোন্‌টা?'' দারোগাবাবু বিহ্বল হয়ে উঠলেন।

"ওই যে টেকো লোকটা।''

দারোগাবাবু প্রায় দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরলেন। চারদিক ঘিরে ফেলল চারজন সশস্ত্র কনস্টেবল।

ভদ্রলোকের মাথায় টাক পড়ে গেলে কী হবে, বয়েস খুব একটা বেশি নয়। পরনে ধপধপে সাদা হাওয়াই শার্ট আর ট্রাউজার্স, বাঁ হাতে একটা অফিস-ফাইল। ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী, কী, ব্যাপারটা কী?''

চিন্ময় কথার উত্তর না দিয়ে দুজন কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা একে ধরে রাখো,'' তারপর বাকি তিনজনকে বলল, "আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। বলেই দৌড়ে গিয়ে সামনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ল। ওর পেছন-পেছন দারোগাবাবু আর দু'জন কনস্টেবল।

চিন্ময় কামরার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেল একবার, তারপর ফিরে এসে আপার বার্থে শুয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে বলল, "এক্সকিউজ মি, এই অ্যাটাচি কেসটা কি আপনার?''

"হাঁ, হাঁ, হামার আছে। কেনো?''

"আপনার সঙ্গে কি আর-কিছু মালপত্তর আছে?''

"না, বাট হোয়াই?''

চিন্ময় হঠাৎ ছোঁ মেরে অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে হনহন করে দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনাকে কাইন্ডলি একবার নীচে নামতে হবে।''

ভদ্রলোক হঠাৎ বিকট চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, "হু দ্য হেল আর য়্যু? অ্যাই, উসকো পাকড়ো।'' শেষের কথাটা উনি দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন। বলতেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় দারোগাবাবু দৌড়ে প্লাটফর্মে নেমে গিয়ে চিন্ময়ের হাত চেপে ধরলেন।

ভদ্রলোকও নেমে পড়েছেন ট্রেন থেকে। কাছাকাছি আসতেই চিন্ময় রীতিমত ধমকে উঠে দারোগাবাবুকে বললেন, "লোকটাকে অ্যারেস্ট করুন।''

সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু চিন্ময়ের হাত ছেড়ে দিয়ে ভদ্র-লোকের হাত চেপে ধরলেন। আবার ভদ্রলোক হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আপনি হামার হাথ্ ধরেছেন, এতো বড়ো সাহস! আপনি জানেন, হামি কে আছে?''

ভদ্রলোকের দারুণ রাশভারী চেহারা। পরনে কলার-লাগানো খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সরু পাজামা। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক আবার গর্জন করে উঠলেন, "আপনি হামার হাথ্ ধরেছেন কেনো?''

দারোগাবাবু রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "চিন্ময় বলেছে স্যার।''

ভদ্রলোক এবার বিকট চিৎকার দিয়ে উঠে বললেন, "হু ইজ হি? আই শুড নো হু ইজ দ্য অফিসার; ইউ, অর দিস নাদান বাচ্চা?''

"আই স্যার, নট দিস নলেন বাচ্চা স্যার।'' কাঁপতে কাঁপতে কথাটা শেষ করেই দারোগাবাবু ভদ্রলোকের হাত্ ছেড়ে দিলেন।

ছেড়ে দিতেই ভদ্রলোক অ্যাটাচি কেসটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে চিন্ময়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চিন্ময় বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল, ভদ্রলোক ছিটকে পড়লেন প্লাটফর্মের ওপর। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য, পরের মুহূর্তেই উনি লাফিয়ে উঠে এক হাত দিয়ে চিন্ময়ের জামার কলার চেপে ধরলেন। তারপর কয়েক মুহূর্ত ধরে চলল বিচিত্র এক লড়াই। ভদ্রলোক খোলা হাত দিয়ে অ্যাটাচি কেসটা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, আর চিন্ময় ওটা ওপর-নীচ, ডান দিক-বাঁ দিক করে সামলাচ্ছে ক্রমাগত।

ফাঁক পেলেই চিন্ময় চেঁচাচ্ছিল, "দারোগাবাবু লোকটাকে অ্যারেস্ট করুন।'' কিন্তু তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও একটা কথাও বোধহয় দারোগাবাবুর কানে ঢুকছিল না। ঢুকলেও উনি বোধহয় মানে বুঝতে পারছিলেন না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে-ছিলেন দারোগাবাবু।

ওদিকে, একটু দূরে, প্রথমে অ্যারেস্ট করা ওই ভদ্রলোকও হম্বিতম্বি চালিয়ে যাচ্ছিলেন সমানে, "এ-সবের মানে কী? ইয়ার্কি পেয়েছেন! আমি আপনাদের নামে মামলা আনব, কাউকে ছাড়ব না, সবাইকে দেখে নেব...।''

ওদের সবাইকে ঘিরে কৌতূহলী জনতার ছোটখাট ভিড় জমে গেছে। এমন সময় বাঁশি বাজিয়ে হাওড়া মেল নড়ে উঠল, তারপরেই চলতে শুরু করল ধীরে ধীরে। ট্রেন চলছে দেখেই পাজামা-পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক অ্যাটাচি কেসের আশা ত্যাগ করে দৌড় লাগালেন ট্রেনের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদবাবুর পঁচিশ বছরের পুলিসি অভিজ্ঞতা কাজে লাগল। যে পালায়, সে নির্ঘাত অপরাধী, সুতরাং তাকে ধরা দরকার। অলিম্পিকের কায়দায় ছুটে গিয়ে দারোগাবাবু ট্রেনে ওঠার মুখে ভদ্রলোককে জাপটে ধরলেন। ধরা মানে মোক্ষম ধরা। ভদ্রলোক কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারলেন না দারোগাবাবুর হাত থেকে। চোখের সামনে স্পীড বাড়াতে বাড়াতে ট্রেনটা এক সময় হুশ করে বেরিয়ে গেল প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে।

ট্রেন চোখের বাইরে চলে যাওয়ার পরেও দারোগাবাবু একই-ভাবে ধরে রাখলেন ভদ্রলোককে। চিন্ময় বেশ কয়েকবার বলার পরে কেমন যেন অনিচ্ছুকভাবে ছাড়লেন। ভদ্রলোকের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে, কী যেন বলতে গিয়েও পারলেন না।

চিন্ময় বলল, "চলুন, এবার থানায় যাওয়া যাক।''

স্টেশন থেকে থানা জীপে মিনিট পনেরোর পথ। সারাটা পথ দারোগাবাবু একটা কথাও বললেন না। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, উনি ওঁর মধ্যে নেই। মুখে-চোখে কালির ছাপ ধরে গেছে। ওই দুই ভদ্রলোকও গুম হয়ে বসে আছেন। শুধু চিন্ময়কে কেমন যেন ঝলমলে দেখাচ্ছিল।

থানায় ঢুকেই চিন্ময় তল্লাশি চালাল। অ্যাটাচি কেস থেকে বেরিয়ে এল অষ্টধাতুর প্রাচীন মূর্তি আর অফিস-ফাইলে পাওয়া গেল রিসার্চ ফাইন্ডিং। ফাইলওলা ভদ্রলোকের ট্রাউ-জার্সের নীচে ডান উরুতে সরু টিউব জড়ানো ছিল, তার মধ্যে পাওয়া গেল দু লিটার পিওর অ্যালকোহল। চিন্ময় টিউবটা

খুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল।

তল্লাশি চালাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দারোগাবাবু গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন, চাকরি গেলে খাবেন কী! বড় সংসার, বউ-ছেলেমেয়েদের উপায়ই বা হবে কী? কেননা উনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, ভুল করে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর একজন রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন তল্লাশি চালিয়ে চোরাই জিনিসগুলো বেরিয়ে পড়তেই উনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে চিন্ময়কে জড়িয়ে ধরলেন।

চিন্ময় কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আপনি শিগগির চীফকে জানিয়ে দিন যে লোকদুটো বামাল ধরা পড়েছে। না হলে বেকার আবার হাওড়া স্টেশনে রেড হবে।"

"রাইট! রাইট!" বলে দারোগাবাবু লক-আপে ঢুকিয়ে দিলেন স্মাগলার দুটোকে, তারপর ছুটে পাশের ঘরে চলে গেলেন টেলিফোন করতে। একটু বাদেই ওঁর গলার স্বর ভেসে এল এ-ঘরে। "রামপ্রসাদ বিশোয়াস স্পিকিং স্যার। রেড কনডাকটেড স্যার। বোথ অব দেম অ্যারেস্টেড স্যার। স্মগলড গুড্স সীজড্ স্যার।"

দারোগাবাবু যখন টেলিফোন সেরে এ-ঘরে ফিরলেন, তখন ওঁকে দেখে মনে হল, ওঁর বয়স প্রায় বছর-পনেরো কমে গেছে। চোখমুখ ঝকঝক করছে খুশিতে।

চিন্ময় জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন চীফ?"

"বললেন, অনেক কিছু বললেন। আমার চাকরি-জীবনে আমি নাকি এত বড় কাজ আর একটাও করিনি। আরে মশাই, বলে কি না, ওই পুঁচকে মূর্তি আর হিজিবিজি-আঁকা কাগজগুলোর দাম পঞ্চাশ লাখ টাকা। পঞ্চাশ লাখ! অ্যাঁ!"

গোল গোল চোখ করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে দারোগাবাবু বললেন, "ভাল কথা, ডি ডি-র একটা স্পেশাল টীম এক্ষুনি এখানে এসে হাজির হবে। তুমি এবার বলো তো, কী করে দু' মিনিটের মধ্যে লোক দুটোকে ধরলে, আমার মাথায় তো কিছু ঢুকছে না।"

চিন্ময় একটু হেসে বলল, "আপনার কপাল ভাল, তাই ওরা ধরা পড়েছে।"

দারোগাবাবু দু হাত তুলে প্রতিবাদ করে বললেন, "কপালের ব্যাপার-ট্যাপার নয়। ধরা পড়েছে তোমার বুদ্ধির জোরে। একটু ভেঙে বলো ভাই, না হলে সারা জীবন চেষ্টা করলেও আমি এর কোনো হদিস পাব না।"

চিন্ময় রহস্যময় ভঙ্গিতে হেসে চুপ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, "টেকো লোকটাকে ধরলাম ওর প্যান্টের ইস্তিরি দেখে।"

"ইস্তিরি!"

"হ্যাঁ। লোকটার প্যান্টে খুব কড়া ইস্তিরি ছিল। বাঁ পায়ের ইস্তিরিতে একটুও ভাঁজ পড়েনি, কিন্তু ডান পায়ের উরুতে ইস্তিরি নেই। কেন নেই? নির্ঘাত ডান পায়ের উরুতে গোল করে কিছু জড়ানো আছে। আছে বলেই ডান পায়ের ওই জায়গাটা খুব বেশি মোটা হয়ে প্যান্টের ইস্তিরি নষ্ট করে দিয়েছে। বুঝতে পারলাম, লোকটা সন্দেহজনক, সুতরাং ধরো ওকে। কিন্তু তখন কে জানত যে, এর কাছেই পিওর অ্যালকোহলের টিউবের সঙ্গে-সঙ্গে রিসার্চ ফাইন্ডিংটাও পাওয়া যাবে!"

দারোগাবাবু ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে বললেন, "শাবাশ! আচ্ছা, ওই মন্ত্রী-মার্কা লোকটাকে ধরলে কী করে? সাঙ্ঘাতিক লোক। উফ, যেমন চেহারা তেমনি বোলচাল।"

"ওকে ধরার ব্যাপারে আপনার পুলিস ইউনিফর্ম অনেকখানি সাহায্য করেছে।"

"কী রকম?"

"আপনাকে ওই জন্যেই সাদা পোশাকে যেতে নিষেধ করেছিলাম। আসলে একটা ব্যাপার কী জানেন, অপরাধী যত কুখ্যাতই হোক না কেন, পুলিস দেখলে তার কোনো না কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হবেই। হাতে মাত্তর দু মিনিট সময়, আমি তাই প্রতিক্রিয়া দেখে অপরাধী শনাক্ত করতে চেয়েছিলাম। এবং করলামও।"

"কীভাবে? আমি তো কোনো যাত্রীর কোনো রকম রিঅ্যাকশন দেখিনি।"

"তেমনভাবে লক্ষ করলেই দেখতেন। আপনাকে দেখেই ওই লোকটা একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল।"

চিন্ময়ের কথা শুনে দারোগাবাবু যেন অথৈ জলে পড়লেন। তারপর কপালে এক গাদা ভাঁজ ফেলে বললেন, "ম্যাগাজিন পড়ছিল তো কী হয়েছে! ট্রেনে তো অনেকেই সময় কাটাবার জন্যে ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, বই-টই পড়ে থাকে।"

চিন্ময় একটু হেসে বলল, "ঠিকই বলেছেন, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হয়েছিল।"

"কী রকম?

"লোকটা নির্ঘাত ম্যাগাজিন পড়ার ভান করে আপনাকে আর কনস্টেবল দুজনকে দেখছিল আড়চোখে।"

"কী করে বুঝলে?"

"লোকটা তাড়াহুড়োর মাথায় ম্যাগাজিনটা উলটো করে ধরে রেখেছিল। যাওয়ার সময়ও দেখলাম উলটো, ফেরার সময়ও দেখলাম উলটো। এবার আপনিই বলুন, যে-লোকটা উলটো করে ধরে ম্যাগাজিন পড়ে সে সন্দেহজনক কি না?"

চিন্ময়ের ব্যাখ্যা শুনে দারোগাবাবু এতই অভিভূত হলেন যে, কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে উঠে এসে চিন্ময়ের হাত-দুটো জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তুমি কী করে জানলে যে ফার্স্ট ক্লাসের ওই কম্পার্টমেন্টটা ঠিক চায়ের স্টলের সামনে এসে দাঁড়াবে। হাওড়া মেলে তো আরও কয়েকটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট ছিল।"

"এটা তো খুব সহজ কাজ। ওই কম্পার্টমেন্টে আরও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং কম্পার্টমেন্টের নম্বর জানতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। রেলওয়ে রিজার্ভেশন ডিপার্টমেন্টকে ফোন করতেই জানিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে একটা ফোন করেছিলাম, মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তোমাকে কী বলব ভাই, তুমি হলে একটু অদ্ভুত......নু না আশ্চর্য...যাকে বলে আশ্চর্যতম...!"

চিন্ময় দারোগাবাবুকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "আপনি যেটা আশঙ্কা করছিলেন সেটা কিন্তু ঘটতে পারে।"

"কোন্‌টা! কিসের আশঙ্কা?"

"ওই যে বলছিলেন না, আপনাকে বদলি করে দিতে পারে, তার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। তবে এটা আর শাস্তি হিসেবে নয়। আপনার কাজে খুশি হয়ে চীফ হয়তো আপনাকে হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যেতে পারেন।"

"আমি যাব না।"

"প্রমোশন রিফিউজ করবেন?"

"আলবত করব।"

"কেন?"

"ওখানে একা-একা গিয়ে করবটা কী? ওখানে তো আমি আর বিপদে-আপদে বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর চিন্ময় গুহকে হাতের কাছে পাব না।"

বহুক্ষণ বাদে চিন্ময় এই প্রথম বাঁকা চোখের বদলে সোজা চোখে তাকাল দারোগাবাবুর দিকে। ওর ছেলেমানুষ মুখে জোর করে টেনে আনা বুড়োমানুষি ভাবটা সরে গেল মুহূর্তের জন্যে। লাজুক হয়ে চিন্ময় একটুখানি হাসল।

ছবি: বিমল দাস

বড়মামা জব্দ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

না, বাপ্পার তখন বোধহয় অত তাড়াতাড়ি অতটা খুশি হওয়া উচিত হয়নি। কারণ বড়মামা যে কী ভীষণ লোক, তা তো বাপ্পার অজানা থাকার কথা নয়। এমনিতে যে বড়মামা খারাপ, সেটা বাপ্পা বলতে পারে না। একটু ভাল করে কিছুক্ষণ ধরে ভাবলে বড়মামার কয়েকটা গুণ চোখে পড়তেই পারে। বাপ্পাকে গল্পের বই কিনে দেওয়া; 'জয় বাবা ফেলুনাথ' দেখাতে নিয়ে যাওয়া; এসব ব্যাপারে বাপ্পার স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, বড়মামা খুব ভাল। আরেকটু ভেবে দেখলে মনে পড়ে যায় যে, মায়ের কাছে বকুনি খাওয়ার সময় বড়মামা এসে পড়লে বাপ্পার বেশ ভাল লাগে। এই তো সেদিন অঙ্কের পরীক্ষাতে বাপ্পা দুটো অঙ্ক ভুল করে এসেছিল। এমন অসাধারণ কিছু ব্যাপার নয়, খুঁজে দেখলে দেখা যাবে অনেক মহাপুরুষ একই ধরনের দোষে দোষী। বাপ্পার দোষ নিশ্চয় আছে। সাত নং আটষট্টি করে একটা অংক ভুল করেছিল, আর বাঁদরের অঙ্কটা অতবার করা থাকা সত্ত্বেও ভুল করে বসল। গুবলেট বাপ্পা করেছে, কিন্তু দোষটা পুরো বাপ্পার নয়। বাপ্পাদের অরিন্দম স্যার সেদিন গার্ড দিতে গিয়ে মাঝে মাঝেই নিজের পেটটা খিমচে ধরছিলেন। সেটা দেখে ক্লাসসুদ্ধ ছেলেই হাসছিল, আর তারই ফলে অন্যমনস্ক হয়ে এই ভুল। কিন্তু মাকে তো সে-সব কথা বোঝানো যায় না, তাই মা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বকেই চলেছিলেন, "তোমাদের (বাপ্পা একমাত্র ছেলে তবু বহুবচন কেন, বাপ্পার মনে হয়েছিল তবে জিজ্ঞাসা করেনি) মতন অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেদের জন্য লেখাপড়ায় খরচা করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা। শেষ পর্যন্ত রিকশা চালাবি। তাও পারবি না ওই তালপাতার চেহারা নিয়ে।" এরপরই রুটিন-মাফিক মা শুরু করতেন ছেলেমেয়ে মানুষ করা সম্বন্ধে তাঁর স্বর্গগতা মাতৃদেবীর কী অভিমত ছিল সেই
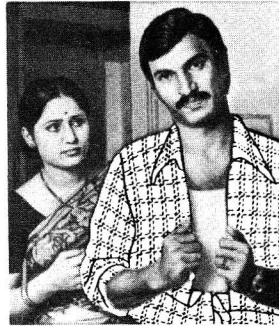
বৃত্তান্ত। কিন্তু বাপ্পার ভাগ্য ভাল, বিশালবপু বড়মামা এসে হাজির হলেন। বড়মামা এসেই বাপ্পার সম্বন্ধে নিশ্চয় একটা খারাপ মন্তব্য করতেন। কারণ বাপ্পা তাই শুনে আসছে। কিন্তু মায়ের চিৎকার করে বিলাপ শুনে বড়মামা একটু থমকে গেলেন, তারপর বললেন, "ছেলেকে বকছিস কেন পাড়া ফাটিয়ে?" বড়দাকে দেখে মার আবার 'সাত নং আটষট্টি' মনে পড়ে গেল আর বড়মামাকে আবার সবিস্তারে সমস্ত শোনালেন, এমনকী 'অকালকুষ্মাণ্ড' পর্যন্ত। বড়মামা বললেন, "এরই জন্য তুই এত চেঁচাচ্ছিস ? তুই তো ক্লাস সিক্সের হাফইয়ারলিতে অঙ্কে তেরো পেয়েছিলি, আমার খুব মনে আছে।" মায়ের মুখটা তখন দেখার মতন। আসলে মা তেরো পেয়েছিলেন কি না বাপ্পা জানে না। কিন্তু বড়মামা বলেন, তাঁর ছোট ভাইবোনেদের ছোটবেলার সব কীর্তিকাহিনী তাঁর মুখস্থ আছে। মামারা, মা-মাসিরা আড়ালে বলে, বড়দা সব বানায়। তবে বাপ্পার ধারণা, পুরোটা বানানো নয়, কারণ এসব কথা উঠলে কেউ প্রতিবাদ করে না, শুধু অন্য কথা পাড়তে চায়।

তবে ওই পর্যন্ত। বড়মামাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, থাকতে পারে না। এই তো বাপ্পার আনন্দের কথা হচ্ছিল। সেই কথাটাই ধরো। বাপ্পার দিদিকে অর্থাৎ ভুবনবিখ্যাত বাজখাঁই গলা যাঁর সেই মধুমিতা, ওরফে গোপাকে তোমাদের মনে থাকতে পারে। তিনি খুব বদলাননি। এখনো লোকে বলে দারুণ গান গায়, আর বাপ্পা জানে, তার চাইতেও দারুণ ঝগড়া করে। কেঁদেকেটে তিনি এখন শাড়ি পরতে শুরু করেছেন। তার ফলে তিনি এখন নিজেকে প্রচণ্ড সুন্দরী বলে মনে করেন। বিশ্বাস কোরো না। গোপার নাকটা একদম থ্যাবড়া। ক্লাস নাইনে পড়ে; তাই ধারণা, বিশ্বের সমস্ত খবর ও জেনে গিয়েছে। মহিলাটি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন বন্ধুর জন্মদিনে। কী খেয়েছিলেন, কতটা খেয়েছিলেন বাপ্পা কিছু জানে না, তবে ভোরবেলা থেকে প্রচণ্ড পেটব্যথা। সঙ্গে বমি, ডাক্তার এলেন, ওষুধ পড়ল, বাবার অফিস যাওয়া বন্ধ হল।

বড়মামা খবর পেয়েই দেখতে এলেন। মাগুর মাছ কিনে দিয়ে গেলেন রাত্রিবেলা খাবে বলে। লোডশেডিংয়ের সময় পাখা বসে হাওয়া করলেন। তারপর গোপার তিন প্রাণের বন্ধু বা বেস্ট ফ্রেন্ডের বাড়ি গিয়ে বলে এলেন যে, গোপা লোভ করে খেয়ে পেটের অসুখ বাধিয়ে বসে আছে। গোপা সেই খবর পেয়ে এত কাঁদল যে, মা পর্যন্ত বললেন, "বড়দা, তুমি যে কী করো তার ঠিক নেই।" গোপা অতটা কান্নাকাটি করে ভাল করেনি। অসুখ থেকে সেরে উঠে যেদিন ও প্রথম স্কুলে গেল, দেখল বড়মামা স্কুলের গেটের কাছে শতরঞ্চি পেতে বসে আছেন হাতে-লেখা একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে। তাতে লেখা "আমি ক্লাস নাইনের মধুমিতার বড়মামা। মধুমিতার পেটের অসুখের কথা শাশ্বতী অনসুয়া এবং অনুরাধাকে বলা আমার উচিত হয়নি। এজন্য আমি দুঃখিত।"

বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? না হবারই কথা। তোমাদের তো আর গোপা-বাপ্পার মতন বড়মামা নেই। তাই ভাবতেই পারো বানিয়ে বলছি। শেষ পর্যন্ত ছন্দাদি এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বড়মামাকে বাড়ি পাঠান। গোপার অবস্থা দেখে বাপ্পার বেশ খুশি-খুশিই লেগেছিল।

আগেই বলেছি, না হলেই পারত। বাপ্পার কপাল কখনোই এত ভাল হতে পারে না। সেদিন সকালে হাসি-হাসি মুখে বড়মামা এসে হাজির। হাজির হবার আগেই অবিশ্যি বড়মামার গলা রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছিল। গোপা বড়মামার কাছ থেকেই ওই গলা পেয়েছে। বড়মামা রাস্তা থেকেই হাঁক দিচ্ছিলেন, "কী রে রানু, আছিস?" তারপর প্রশ্ন করলেন, "বাড়ির সব খবর পাল? তরুণের মেজাজ আবার বিগড়োয়নি তো?" তরুণ গোপা বাপ্পার বাবা। বড়মামার মতে তাঁর নাকি মাথার ঠিক নেই। বাবা একথাটা তেমন পছন্দ করেন না। মা বললেন, "বড়দা বোসো, একটু শরবত করে আনি।" বড়মামা বললেন, "না না, তাড়াতাড়ি আছে, তুই শরবত করতে দেরি করবি, খেতেও ভাল হবে না, (বড়মামার কথার ধারাই ওই), তুই বরং বাপ্পাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিস। আজ মোহনবাগানের খেলা আছে, ওকে দেখাতে নিয়ে যাব।" বলেই যেরকম হুড়মুড় করে এসেছিলেন, তেমনি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন।

বাপ্পা গল্পে পড়েছে, অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলে লোকে নিজেকে চিমটি কেটে দেখে বেঁচে আছে না মরে গেছে। এ ব্যাপারটা ও আগে বুঝতে পারত না। এখন আর বুঝতে কোনো অসুবিধা রইল না। মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাবে ও। ভাবা যায় ? ও স্বচ্ছ দেখছে কি না সেটা বোঝবার জন্য অবশ্য নিজের বদলে গোপাকে একটু জোরেই একটা চিমটি কাটল। ফলে গোপা তার গলা থেকে যা একটা আওয়াজ বার করল, তাতে ও যদি ঘুমিয়েও থাকত তাহলেও ঘুম ভেঙে যেত।

এই কিছুদিন আগে ওর মাসতুতো দাদা বাপন ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে এসে কী আন্দাজ চালবাজি করেছে। আর আজ ও নিজের চোখেই দেখবে গড়ের মাঠে মোহনবাগানের খেলা। দু-একবার ও দূরদর্শনে খেলা দেখেছে। তবে তাতে কি পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় ভাল করে? বাপ্পার ভীষণ আনন্দ হতে লাগল। শ্যাম থাপা, জেভিয়ার পায়াস, সুব্রত ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, মোহনবাগানের সব খেলোয়াড়ের নামই বাপ্পার মুখস্থ। ইস্টবেঙ্গলের সুরজিতের খেলাও ওর ভাল লাগে খুব। তবে দুঃখ লাগে অমন একটা ভাল খেলোয়াড় কিনা মোহনবাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ও শুনেছে, সুরজিৎ নাকি আগে মোহনবাগানেই খেলত। এখন অবিশ্যি ওর চিন্তা ও কী পরে যাবে। বাবা-মা'কে কতদিন বলেছে, একটা মেরুন-সবুজ গেঞ্জি কিনে দাও। সেটা থাকলে তো কোনো ভাবনা থাকত না। তা না থাক, ও ওর স্কুলের পোশাক পরেই যাবে। খেতে বসে ওর খেয়ালই রইল না কী খাচ্ছে। শুধু ভাবতে লাগল মাঠটা কীরকম হয়।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হয়ে গেল। ওরা যখন মাঠে গিয়ে পৌঁছল, তখনো খেলা শুরু হতে এক ঘণ্টা বাকি, বড়মামা তাঁর বিরাট শরীর নিয়ে লাইনে দাঁড়ালেন, বাপ্পাকে আগলাতে লাগলেন। আর ভিড়ে চাপাচাপি হলেই বলতে লাগলেন, আস্তে মশাই আস্তে, সঙ্গে আমার ভাগ্নে রয়েছে, এরা দু'পুরুষের পাগল, হঠাৎ কামড়ে দেয়, একটু জায়গা খালি করে দিন। বাপ্পার তখন রাগ হচ্ছিল, কিন্তু তখনো ওর বাকি ছিল দুঃখের। লাইনটার যেখানে বাপ্পারা ছিল সেটা আস্তে আস্তে গেটের কাছে পৌঁছল, বড়মামা তাঁর সভ্যকার্ড দেখালেন। তারপর যখন বাপ্পাকে নিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন গেটে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, "খোকা তোমার কার্ড?" বাপ্পা কিছু বলবার আগেই বড়মামা বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, "মোহনবাগান কখনো বানরদের সভ্যকার্ড দেয়নি, তাই ওর কার্ডের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। জানেন, এই গড়ের মাঠে গোরু চরার এবং বানরদের গাছে চড়ার স্বাধীনতা রানী রাসমণি দিয়ে গেছেন, সুতরাং ওর কাছে কার্ড চাইবেন না।" ভদ্রলোক খুব হাসলেন, আশপাশের সবাই বলল, ঠিক ঠিক। বাপ্পার মনে হল যুগটা রামায়ণের হলে ও এই সময়ে ধরণীকে দ্বিধা হতে বলত। ও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল, আর কখনো বড়মামার সঙ্গে বেরোবে না। বড়মামা ভেবেছে কী? যখন-তখন শুধু-শুধু লোকের সামনে হেনস্থা করবে?

তবে খেলার মাঠে আর কতক্ষণ রাগ করা যায়? বিশেষ করে বড়মামা দরাজ হাতে কোয়ালিটি আর ফ্যারিনি দুটো খাইয়ে

জিজ্ঞাসা করেন, "কোনটা বেশি ভাল রে?" তারপর খেলোয়াড় চিনিয়ে দেওয়া, মোহনবাগান গোল দিলে বাপ্পাকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচানাচি, সব মিলিয়ে সময়টা ভালই কাটাল। কিন্তু এখন সেই দিনটার কথা মনে পড়লে গেটে ওই হেনস্থার কথাই বাপ্পার মনে পড়ে, আর আইসক্রীমের স্বাদ সত্ত্বেও রাগ ধরে।

বড়মামাকে জব্দ করার অনেক চেষ্টা করেছে বাপ্পা। ক্যারমে নিল গেম দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বড়মামার সঙ্গে ক্যারম খেলার কোনো মানে হয় না। বড়মামা লাইন মানেন না। যে-কোনো জায়গায় স্ট্রাইকার বসিয়ে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে ফট করে মেরে দেন। আর আপত্তি করলে বলেন, "মামাবাড়ির ভাল গুণ কিছুই পেলি না, শুধু আমাদের পরিবারের চোখের দোষটা পেয়েছিস। আমি ঠিক-ঠিক লাইনে বসিয়ে মারছি, আর তুই বলছিস একদম অন্যরকম। বাবাকে বলিস, নিলুদার কাছে নিয়ে যাবে, চোখটা দেখিয়ে আসবি।" গোপা একবার নুনের শরবত দিয়েছিল। বড়মামা নির্বিকার চিত্তে খেয়ে নিয়ে বললেন, "গোপা, বেড়ে বানিয়েছিস তো।" মধ্যে থেকে জানাজানি হতে মা গোপার কান মলে দিলেন।

তবু একদিন-না-একদিন সময় আসে। আর বড়মামার জব্দ হবার দিনও একদিন এল। বড়মামা জব্দ হলেন হিতলালের কাছে। হিতলাল বাপ্পাদের বাড়ির দারোয়ান। সারাদিন বাড়ির সামনে বসে থাকে, আর দুষ্টু ছেলেদের দেখলেই বলে, ভাগো হিঁয়াসে। পান খায় আর প্রচুর হিন্দি শব্দ মেশানো বাংলা বলে। খৈনি খায় প্রচুর, আর ও যে একদিন মুল্লুক চলে যাবে, এই কথা শোনায়। এহেন হিতলারের কাছেই বড়মামা জব্দ হলেন।

সেদিন বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতায়। দারুণ বৃষ্টি। চারিদিকে জল থৈ-থৈ করছে। বড়মামাকে এইসব দিনে বাড়িতে পাওয়া যায় না। বড়মামা তাঁর টোকা মাথায় দিয়ে ভিজতে বেরোন। বড়মামা বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালবাসেন। সেদিন হাতে চটি ঝুলিয়ে বড়মামা এসে হাজির। সঙ্গে বাপন টুকটুকি। এসেই বললেন, "রানু, তোর বৌদি মাংসের কাটলেট আর খিচুড়ি চড়িয়েছে। ফাইন বৃষ্টি হচ্ছে, গোপা বাপ্পা আমার সঙ্গে চলুক। একটু বৃষ্টিতে ভিজে-টিজে খিচুড়ি খেয়ে ফিরবে। আর যদি লেকের জলে ভেসে আসা মাছ পেয়ে যাই, তাহলে মাছভাজা খিচুড়ি দিয়ে জমবে খুব।"

বাড়ির সামনের ছোট ঘরটাতে হিতলাল বসে ছিল। ওদের মিছিলটা বেরোতে যাবে, এমন সময় হিতলাল হাঁক দিল, "ও মামাবাবু, ইধার থোড়া শুনিয়ে যান।" বড়মামা হিতলালের এহেন অনুরোধ শুনে হকচকিয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে তাঁর অনবদ্য হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বোলনে চাতা তুম?" হিতলাল খুব আপ্যায়িতের মতো বলল, "বসেন মামাবাবু, থোড়া জিরিয়ে নেন। আপনি হাথ্ পর জুত্তি লেকে কোথায় চলিয়েছেন?" বড়মামা বললেন, "বৃষ্টি মেরা বহুত ভাল লাগতা, তাই থোড়া পানির মধ্যে চলাফেরা করেগা, ওহি জন্য হাথমে জুত্তি লিয়া হ্যায়।"

মামার যেমন উমদা হিন্দি, হিতলালেরও তেমনি দারুণ বাংলা। কথোপকথন দারুণ জমে উঠেছে।

হিতলাল হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "মামাবাবু, আপনি ইতুনি লিখাপড়া শিখিয়ে কী করলেন? ভগমান মানুষকে জুত্তি কেনো দিয়েছেন আপনি শিখলেন না।" বড়মামা এবার বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, "জুতো ভগবান দিয়েছে, তোমায় এ-কথা কে বলল?" হিতলাল এবার একটু রেগে গিয়ে বলল, "ভগমান দিয়েননি তো কোন দিয়েছে? বাটা কোম্পানি? আপনি কুছু জানেন না মামাবাবু। দুনিয়ার সব জিনিসই ভগমান দিয়েছেন। গাড়ি, হাওয়াই জাহাজ, ইলেকট্রিক, সমচা।"

যদিও বেড়ানোতে বিঘ্ন ঘটছে, তবু বাপ্পা যখন দেখল বড়মামা থই পাচ্ছেন না, তখন ওর বেশ ভাল লাগছিল। হিতলাল বলে চলল, "ভগমান দেখলেন, রাস্তায় জল জমলে ইঁটাপাথর কোথায় আছে আদমি উদমি দেখতে পায় না। তাই তো ভগমান জুত্তি পাঠিয়ে দিলেন। ভগমান ভেবেছিলেন, পানি জমে গেলে আদমি লোগ জুত্তি পরিয়ে হাঁটবে। আর, মামাবাবু, আপনি শুখা জায়গায় জুত্তি পরিয়ে চলেন, আউর পানির মধ্যে জুত্তি হাথ্ পর! বহুত আদমি অ্যাইসা করে। ইয়ে ঠিক নেহি। হামি কভি ওইসা করে না। আউর এক বাত। ভগমান ছাতি দিয়া কাহে? এই বারিসকা টাইম আপনি ভি মাথায় কী চড়িয়েছেন? লেকিন বারিস কি লিয়ে ছাতা নেহি। আপনারা যাকে গাছ বোলেন, হামলোক তাকে পেঁড় বলি। ইসকে তলে বইঠেনে কি সময় পাখি-উখি কামিজ-উমিজ যাতে নষ্ট না করতে পারে, সেইজন্য ভগমান ছাতি দিয়েছেন। রোদ কে টাইম কেয়া বারিসকা টাইম উহ্ চিজ ব্যবহার করা ঠিক নেহি। এই বাচ্চা-লোগকো লেকর বাহির যাচ্ছেন, ইয়ে ঠিক হ্যায়। ভগমান যো পানি দেতা উহ বদন পর লেনা ঠিকই হ্যায়। লেকিন ইদের জুতা পরিয়ে নিন। আউর শুনবেন, ভগমান আগুন কিস্ লিয়ে ভেজা?"

বড়মামার ততক্ষণে হয়ে গেছে। হিতলালের তোড়ের কাছে বড়মামা জব্দ, একদম জব্দ। যিনি সারাক্ষণ অন্যের জীবন অবহ করবার ব্রত নিয়েছেন তিনি এখন একদম চুপ। ম্রিয়মাণ গলায় বললেন, "বাপন গোপা বাপ্পা টুকটুকি, সবাই জুতো পরে নাও।" হিতলাল তার নূতন কোনো ব্যাখ্যা দেবার আগেই বড়মামা প্রায় পালিয়ে গেলেন।

সেই থেকে বাপ্পা হিতলালের 'ভাগো হিঁয়াসে' শুনলেও রাগ করে না।

বিশ্ব-শিশুবর্ষে ডোডো তাতাই

তারাপদ রায়

ডোডোবাবু হাত উঁচু করে দরজার চৌকাঠ ধরে ভাবছিলেন, আর কত লম্বা হতে হবে রে বাবা! তাঁর উচ্চতা ইতিমধ্যেই সোয়া পাঁচ ফুট অতিক্রম করে গেছে। সোয়া পাঁচ ফুট ব্যাপারটার মধ্যে অবশ্য একটু গোলমাল আছে। এখন আর ফুট-ইঞ্চিতে চলছে না, বলতে হবে মিটার-সেণ্টিমিটারে। সেই হিসেবে এখন ডোডোবাবুর উচ্চতা হল এক মিটার আট সেণ্টি-মিটার।

এই নিয়ে অল্প কিছুদিন আগেই একটা বিপাকে পড়েছিলেন ডোডোবাবু, তাই ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করে বলা উচিত। একটা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন ডোডোবাবু, গত মার্চ মাসে, অন্য এলাকার একটা ক্লাবে। সেখানে প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীদের সকলকে একটা করে ফর্ম পূরণ করতে দেওয়া হয়েছিল, তাতে যার-যার নাম, ঠিকানা, বয়েস, উচ্চতা, বিদ্যালয় ইত্যাদি যথাস্থানে লিখে নীচে স্বাক্ষর করতে হবে।

প্রথমেই তো ডোডোবাবু নীচে বড়-বড় করে নাম সই করে ফেললেন, 'সঞ্জীব মিত্র'। তারপর উপর থেকে নাম, ঠিকানা সব ঝপাঝপ পূরণ করে সকলের আগে ফর্ম জমা দিয়ে দিলেন। ফর্ম যে ভলাণ্টিয়ার জমা নিয়েছিল সে একটু পরেই ফিরে এসে 'সঞ্জীব মিত্র' 'সঞ্জীব মিত্র' বলে চেঁচাতে লাগল। ডোডোবাবু গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বলল, "সঞ্জীব মিত্র কার নাম?"

ডোডোবাবু এই খোঁজখবরের প্রকৃত কারণ বুঝতে না পেরে দুরুদুরু বুকে এবং শুকনো মুখে বললেন, "আমার।"

ভলাণ্টিয়ার ছেলেটি ফর্মটি ফেরত দিয়ে উচ্চতার জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই সব ফুট-ইঞ্চি আদ্যিকালের ব্যাপার, এখন আর চলবে না; মিটার-সেণ্টিমিটার করে দিতে হবে।" ডোডোবাবু কী আর করবেন, ফর্মটা ফেরত নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কলম বার করে ফুট কেটে লিখে দিলেন মিটার আর ইঞ্চি কেটে বসিয়ে দিলেন সেণ্টিমিটার।

এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল ভয়াবহ। ডোডোবাবুর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর উচ্চতা দাঁড়াল পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির স্থলে পাঁচ মিটার তিন সেণ্টিমিটার। ফুট-ইঞ্চিতে পাঁচ-তিন আর মিটার-সেণ্টিমিটারে পাঁচ-তিন আকাশ পাতাল পার্থক্য; মিটার ফুটের চেয়ে প্রায় সাড়ে তিন গুণ বড়। তার মানে, সংশোধন করার ফলে ডোডোবাবুর উচ্চতা দাঁড়াল সাড়ে তিন মানুষ, প্রায় দোতলা বাড়ির কার্নিস ছুঁই-ছুঁই দৈত্যের দৈর্ঘ্য।

একটু পরেই শোরগোল পড়ে গেল উদ্যোক্তাদের মধ্যে। এত উচ্চতাসম্পন্ন ব্যক্তিটি কে? সবাই বুঝতে পারল ডোডোবাবুর ভুলটা, এরই মধ্যে ডোডোবাবুকে ডেকে এনে ভুল শুধরানোর ছলে একটু হাসাহাসিও হল। ডোডোবাবু সমস্ত ঘটনায় এত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন যে, স্পোর্টসে মোটেই ভাল করতে পারলেন না। ছয় মাস ধরে হস্টেলের বারান্দায় এক পায়ে দৌড়ের প্র্যাকটিস করেছেন, বিশেষ আশা ছিল তাঁর কিছু না কিছু হবেন, কিন্তু দশ-বারো পা ছুটেই আজ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

তাছাড়া বস্তায় পা বেঁধে ব্যাং-লাফ প্রতিযোগিতা, কিংবা

চোখে রুমাল বেঁধে হাঁড়ি-ফাটানো রেস—কোনোটাতেই সুবিধা করতে পারলেন না ডোডোবাবু।

সুখের বিষয়, ডোডোবাবুর এই কেলেঙ্কারির কোনো সাক্ষী নেই। যারা আছে তারা সবাই নরেন্দ্রপুরের স্কুলের, হস্টেলের বন্ধু, তারা সবাই সঞ্জীব মিত্রকে চেনে, ডোডোবাবুকে চেনে না।

ডোডোবাবু ঠিক করেছিলেন গরমের ছুটির সময় পণ্ডিতিয়ায় ফিরে এসব গল্প কাউকে বলবেন না। কিন্তু তিনি বড় সরল প্রকৃতির লোক, কিছুতেই চেপে রাখতে পারেন না গোপন কথা, আজ সকালেই তাতাইবাবুকে ঘটনাটা একটু হালকা করে বলে ফেলেছেন। তাতাইবাবু শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, ''এখন বয়েস বেড়ে গেছে আমাদের, এখন কি আর এরকম করলে চলবে? প্রেস্টিজ থাকবে আমাদের?''

সত্যিই অনেক বয়েস হয়ে গেল ডোডোবাবু-তাতাইবাবুর। এই আশ্বিনে ষষ্ঠীর দিন ভোর রাতে যখন টাক-ডুমা-ডুম, টাক-ডুমা-ডুম ঢাক বেজে উঠবে কলকাতার আধো-অন্ধকার ভাঙা গলির রঙিন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে, তখন ঘুম থেকে উঠে বসে বাসি মুখে একটা ভগ্নাবশেষ কেকের শেষ টুকরো খাবেন তাতাইবাবু। আগের দিন, মানে পঞ্চমীর সন্ধ্যাবেলায় তাতাইবাবুর জন্মদিন পালিত হয়েছে, চোদ্দ বছর পূর্ণ হল তাঁর, কম কথা নয়। তারপর যখন দেয়ালির সময় তুবড়ি আর মোমবাতির আলোয় সারা শহর ঝলমল করে উঠবে, পণ্ডিতিয়ার রাস্তায় কুকুরেরা বাজির সঙ্গে আর আলোর ঝলসানিতে তাতাইবাবুদের সিঁড়ির নীচে এসে লেজ গুটিয়ে আত্মরক্ষা করবে সেই সময় ডোডোবাবুও চোদ্দয় পা দেবেন।

যা হোক, আজ সকালবেলাতেই তাতাইবাবু যেন কোথায় গিয়েছিলেন মোড়ের দিকে, আজকাল তাতাইবাবু একা-একাই একটু-আধটু ঘোরাফেরা করেন। হনহন করে আসতে আসতে হঠাৎ ডোডোবাবুদের বাড়ির দরজায় ডোডোবাবুকে উর্ধবাহু হয়ে

চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, "কী হল, কীর্তনের দলে নাম লেখালেন নাকি?''

মাত্র কয়েকদিন আগেই ডোডোবাবুদের বাড়ির উলটো দিকে ক্লাবের সামনে তেকোনা জমিটায় ত্রিপল টাঙিয়ে অষ্টপ্রহর খোল সংকীর্তন হয়েছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো অনেকেই সেখানে হাত তুলে 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' করে নেচেছে। ডোডোবাবু, তাতাইবাবুও একদিন মজা করে হাত তুলে নেচে এসেছেন। সুতরাং কীর্তনের দলে নাম লেখানোর কথায় ডোডোবাবু হো-হো করে হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, "গত পুজোর ছুটির সময়ে এই চৌকাঠটা পা উঁচু করেও ছুঁতে পারিনি, আর এখন ঠিকমতো দাঁড়িয়েই হাত দিয়ে ধরতে পারছি। তাই ভাবছিলাম, আর কত লম্বা হব রে বাবা!''

তাতাইবাবু বললেন, "কেন, আপনি তো নিজের উচ্চতার কথা লিখেছিলেন পাঁচ মিটার কত সেন্টিমিটার যেন? আপনি নিজেই তো বললেন সেদিন। এখন তার থেকে কম হলে চলবে কী করে?''

কথা বলতে বলতে ডোডোবাবু সিঁড়ি থেকে নেমে তাতাইবাবুদের বাড়ি পর্যন্ত চলে এলেন। তাতাইবাবুর মাথায় আজ কয়েকদিন হল বয়েস বাড়ার ব্যাপারটা ঢুকেছে। আসতে আসতে তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে বললেন, "দেখুন, শুধু লম্বা হওয়ার ব্যাপার নয়। আমরা এখন বয়েসে অনেক বড় হয়ে গেছি, আর মাত্র দশ বছরের মধ্যে আমাদের আর কোনো পরীক্ষা পাস করা বাকি থাকবে না। ভেবে দেখেছেন, মাত্র দশ বছরের মধ্যে খাতা বইয়ের, কোশ্চেন-পরীক্ষার সমস্ত ঝামেলা আমাদের চুকে যাবে!'' ডোডোবাবু স্বভাবতই একটু কম কথা বলেন, তিনি চুপচাপ তাতাইবাবুর বক্তব্য অনুধাবন করতে লাগলেন।

একা-একা ময়দানে লাইন দিয়ে ফুটবলের টিকিট কেটে খেলা দেখা, কিংবা ট্রামের পাদানিতে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে পয়সা বের করে ভাড়া দেওয়া অথবা রেস্টুরেন্টে গিয়ে নিজের খুশিমতো একটা মোগলাই পরোটা অর্ডার দিয়ে আরও পেঁয়াজ, আরও তরকারি চেয়ে চেয়ে নিয়ে খাওয়া, কোনো অভিভাবক সঙ্গে নেই. বাধা নেই, নিষেধ নেই—সত্যি বড় হওয়ার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। তাতাইবাবুদের বাড়ির বাইরের সিঁড়িতে বসে বসে ডোডোবাবু তাতাইবাবু বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে বললেন, "দেখুন, আমাদের ছেলেবেলায় সেই যে মাধবীলতার গাছটা ছিল সেনবাড়ির সামনে, সেটা মরে গেছে, লক্ষ করেছেন?''

ডোডোবাবু উলটো দিকে সেনবাড়ির সামনে তাকিয়ে বললেন, ''তাই তো, ওখানে একটা ছোট গাছ দেখছি।''

"ওটা একটা নতুন গাছ, অল্প কিছুদিন হল লাগানো হয়েছে।" তাতাইবাবু বললেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, "বিবেকানন্দ পার্কের সামনে বড় বকুলগাছটা, যে গাছটায় পাতার আড়ালে একটা লক্ষ্মীপেঁচা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত, সেই গাছটা ভেঙে পড়ে গেছে দেখেছেন?''

ডোডোবাবু বললেন, "না, তা দেখিনি। আমি তো মাত্র এক সপ্তাহ হস্টেল থেকে ফিরেছি। কিন্তু এই আপনার গাছ মরে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি ঠিক ধরে উঠতে পারছি না।''

তাতাইবাবু ডোডোবাবুর সরলতায় হো-হো করে হেসে ফেললেন। ডোডোবাবু অবাক হয়ে বললেন, ''কী হল? কোনো ভুল কথা বললাম?''

তাতাইবাবু হেসে জবাব দিলেন, ''ভুল আর কী? বয়েসের গাছ-পাথর নেই। এ কথাটা কখনো শোনেননি?''

ডোডোবাবু সুশিক্ষিত লোক, 'বয়েসের গাছ-পাথর নেই' এই জাতীয় একটা বিশিষ্ট বাক্য শোনেননি বা জানেন না, তা মোটেই নয়, কিন্তু তাতাইবাবুর উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারছিলেন না।

এখানে অন্য একটা ব্যাপার একটু আলাদা করে বলে নেওয়া উচিত। তাতাইবাবুর যে বাবা, তাঁর যে বাবা, তাঁর যে পিসি সেই বৃদ্ধা মহিলা, যিনি তাতাইবাবুর প্রপিতামহী, যাঁকে তাতাইবাবু বড়ঠাকুমা বলেন, তিনি এখনো চমৎকার বেঁচে আছেন। বছর কয়েক হল তাঁর বয়েস কত সেটা হিসেব করাও সবাই ছেড়ে দিয়েছে। বছর দুই আগে কে একজন বলেছিল একশো, তাতাই-বাবুর বাবা মৃদু হেসে প্রতিবাদ করেছিলেন, "না, না, সে কী কথা, এই তো সবে আরলি নাইনটিজ।"

এই বয়েসে উপায়ান্তর না থাকায় সেই বড়ঠাকুমার পেটে একটা অপারেশন করতে হয়েছে। অপারেশনের পর তিনি চমৎকার আছেন, তাঁর পেট থেকে প্রায় মুরগির ডিমের আকারের একটা পাথর বেরিয়েছে। ডাক্তারেরা আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন, তাতাইবাবুর বাবা সেটা হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন। বাসায় নিয়ে এসে সবাইকে পাথরটা দেখিয়ে তাতাইবাবুর বাবা বললেন, "যা হোক পাথরটা তবু পাওয়া গেল, এখন গাছটা খুঁজতে হবে।"

আজ যেমন ডোডোবাবু অবাক হয়েছেন, তাতাইবাবুও বাবার কথায় সেই রকম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "গাছ-পাথরের ব্যাপারটা কী হল?"

"গাছ-পাথরের ব্যাপারটা?" তাতাইবাবুর বাবা হো-হো করে হেসে বললেন, "আপনার বড়ঠাকুমার বয়েসের গাছ-পাথর নেই বলেই জানতাম। এখন যখন ওঁর পেট থেকে পাথরটা পাওয়া গেল, তখন গাছটাকেও খুঁজে দেখতে হয়।"

বড়ঠাকুমার গল্পটা তাতাইবাবু ভালভাবে ব্যাখ্যা করে ডোডোবাবুকে বললেন, ডোডোবাবু হাসলেন একচোট। তারপর বললেন, "আমার ঠাকুমার পেট থেকে পাথর বেরিয়েছিল।"

তাতাইবাবু ডোডোবাবুর ঠাকুমার এ ধরনের কৃতিত্বে রীতি-মত সন্দিগ্ধ হলেন, "আপনার ঠাকুমার পেট থেকেও পাথর বেরিয়েছিল? কই, আপনার ঠাকুমার কখনো কোনো অপারেশন হয়েছে বলে তো শুনিনি।"

ডোডোবাবু বললেন, "হয়েছিল দশ-পনেরো বছর আগে।"

তাতাইবাবু চটে গেলেন, "দশ আর পনেরো একসঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলবেন না। দশ বছর আগে আপনি রীতিমত বালক আর পনেরো বছর আগে আপনি জন্মাননি। তখন আপনার আগের জন্ম। হয়তো সাপ কিংবা ব্যাঙ ছিলেন।"

ডোডোবাবু উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, "আমি সাপ ছিলাম? আমি ব্যাঙ ছিলাম?"

তাতাইবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, "কী করে বলব বলুন? হয়তো ইঁদুর ছিলেন, হয়তো মাকড়শা।" তারপর ডোডোবাবুর দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখচোখে একটা প্রবল উত্তেজনা, একটা রণং দেহি ভাব দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিলেন। হাত ধরে ডোডোবাবুকে সিঁড়ির উপরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "আরে শুধু শুধু অত খেপে যাচ্ছেন কেন? রহস্য বোঝেন না? আপনার ঠাকুমার পেটে না হয় পাথর ছিল, আপনার পেটে না হয় পাথর আছে, তাই বলে আপনার মাথার ঘিলুর মধ্যেও পাথর আছে না কি? বয়েস বাড়ছে, কোথায় আপনার বুদ্ধি বাড়বে, তা তো নয়, এ দেখছি আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে।"

ডোডোবাবুকে শান্ত করতে গিয়ে তাতাইবাবু আরও গোল-মাল পাকিয়ে ফেললেন। ডোডোবাবু তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে লাগলেন। তারপর ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

ডোডোবাবুর রাগ কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। বিকেল হতেই তাতাইবাবুদের বাইরের ঘরে এসে পৌঁছলেন আবার। সকাল-বেলার ব্যাপারটায় একটু অনুতপ্ত ছিলেন তাতাইবাবু। তাই খুব সহৃদয়ভাবে তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ডোডোবাবু কিন্তু এখন একটা বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছেন। একটু স্থির হয়ে বসে তিনি তাতাইবাবুকে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "বিশ্ব-শিশুবর্ষের ব্যাপারটা দেখেছেন?"

তাতাইবাবু ডোডোবাবুর এই গম্ভীর প্রশ্নে হেসে ফেললেন, "বিশ্ব-শিশুবর্ষের ব্যাপারটা আবার দেখব কী? আমরা কি শিশু?"

"আমরা শিশু নই? আপনি দেখি কোনো খবরই রাখেন না।" ডোডোবাবু সঙ্গে সঙ্গে উলটো প্রশ্ন ছুঁড়ে জবাব দিলেন।

তাতাইবাবু একটু বিচলিত হয়ে বললেন, "আমরা কি হামা-গুড়ি দিই, ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদি? আমরা যে শিশু নই একথা জানার জন্যে কি খবর রাখতে হবে?"

ডোডোবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, "বিশ্ব-শিশুবর্ষের খবরটা রাখতে হবে।"

তাতাইবাবু বললেন, "মানে?"

"মানে হল," ডোডোবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "এই বছরটা তো বিশ্ব-শিশুবর্ষ। আর এই শিশুবর্ষে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সবাইকে শিশু ধরা হয়েছে। তার মানে আমরা বড় হইনি, আপনিও শিশু রয়েছেন, আমিও শিশু আছি।"

তাতাইবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, এ কী আন্ত-র্জাতিক অভদ্রতা! একটু পরে কী একটা ভেবে তাঁর চোখে একটু বিদ্যুৎ খেলে গেল। ডোডোবাবু তাই দেখে বললেন, "কী হল, শিশু হয়ে খুব খুশি হয়ে পড়লেন যে?"

তাতাইবাবু বললেন, "চোদ্দ বছর তো। ঠিক আছে, আমি এই পুজোর সময় পনেরোয় পা দিচ্ছি। বিশ্ব-শিশুবর্ষের বেড়া পার হয়ে যাব তখন। কিন্তু আপনার কী হবে?"

সত্যিই, ডোডোবাবুর কী হবে? ডোডোবাবু কি শিশু থেকে যাবেন?

আর এ সমস্যা তো শুধু ডোডোবাবু বা তাতাইবাবুর নয়। বারো-তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের কত প্রবীণ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন, শিশুবর্ষে সবাই কি শিশু হয়ে যাবেন? তাঁদের মান-সম্মান তাহলে থাকবে কোথায়? তাঁদের কি এখন হামাগুড়ি দিতে হবে, দোলনায় শুতে হবে রঙিন মশারির নীচে? না, তা হতে পারে না, হতে দেওয়া যায় না।

সারা বিকেল ধরে শলা-পরামর্শ করলেন ডোডোবাবু-তাতাইবাবু। কোথাও খেলতে গেলেন না, ত্রিকোণ পার্কে বেড়াতে গেলেন না, এমনকী সন্ধ্যাবেলা পাশের বাড়িতে টিভি দেখতে গেলেন না। অনেক চিন্তা করে, অনেক পরিশ্রম ও কাটাকুটি করে একটা দরখাস্ত তৈরি করা হল, তারপর জেনারেল নলেজের বই খুলে নাম-ঠিকানা দেখে সম্পূর্ণ করা হল সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদপত্র—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ,
সম্পাদক-সেনাপতি (সেক্রেটারি-জেনারেল),
মাননীয় ওয়াল্ডহাইম সাহেব মহোদয়,
স্যার,

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই বিশ্ব-শিশুবর্ষে শিশুদের বয়স সীমা চৌদ্দ বৎসর করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে গ্রামে-নগরে, পাহাড়ে-জঙ্গলে দশ-বারো-চৌদ্দ এমনকী তাহারও কমবয়স্করা ইহাতে অতীব ক্ষুব্ধ ও অপ-মানিত বোধ করিতেছে। আমাদের কেন শিশু ধরা হইল, আমরা কি বোতলে দুধ খাই, না চুষিকাঠি লইয়া খেলাধুলা করি? আমাদের দাবি, অবিলম্বে বয়স সীমা কমাইয়া তিন, বড়জোর চার, করা হউক। না হইলে জানিবেন, পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে প্রতিবাদের বন্যা বহিয়া যাইবে।

ইতি—
কৃত্তিবাস রায়, সঞ্জীব মিত্র
পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা, ভারত

ছবি অনুপ রায়

মলটোভা
কর্মচঞ্চল জীবনে স্ফূর্তি আনার মতো সুস্বাদু শক্তিদায়ক পানীয়

প্রেমজিত লাল দেব লাল।
খ্যাতনামা পিতা খ্যাতনামা পুত্র।
বংশানুক্রমে এদের টেনিস্ প্রীতি ও কর্মচঞ্চলতার প্রতি আকর্ষণ।
বংশানুক্রমে এরা শক্তি ও স্ফূর্তির জন্য খেয়ে আসছেন সুস্বাদু পানীয় যার নতুন নাম মলটোভা।
আর প্রেমজিৎ এর মতে, দেবও জানেন মলটোভার শক্তিদায়ক প্রোটিন ও স্বাস্থ্যবর্ধক ভিটামিন ও খনিজ উপাদান কতটা কর্মশক্তি যোগায়। সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেবার জন্য বাড়তি শক্তিটুকু নিন। জয় হবেই। বাস্তবিক প্রেমজিতের ১৭ বছরের ডেভিস কাপ রেকর্ড ঈর্ষনীয়। এখন দেবও তো এক উজ্জ্বল আগামী কালের নায়ক।
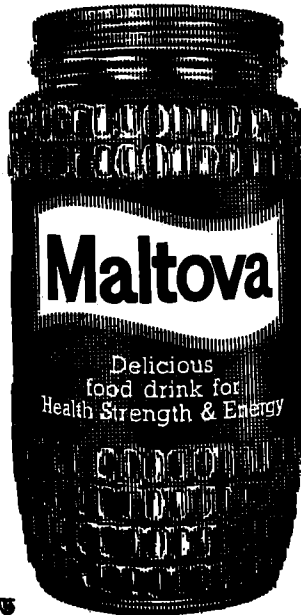
৫০০ গ্রাম
১৩.৯৯ টাকা
স্থানীয় কর
অতিরিক্ত

JiL জগৎজিত ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড

মলটোভা
সাফল্যের সেই বিশেষ স্বাদের জন্য

এক চামচ এক টাকা

রমানাথ রায়
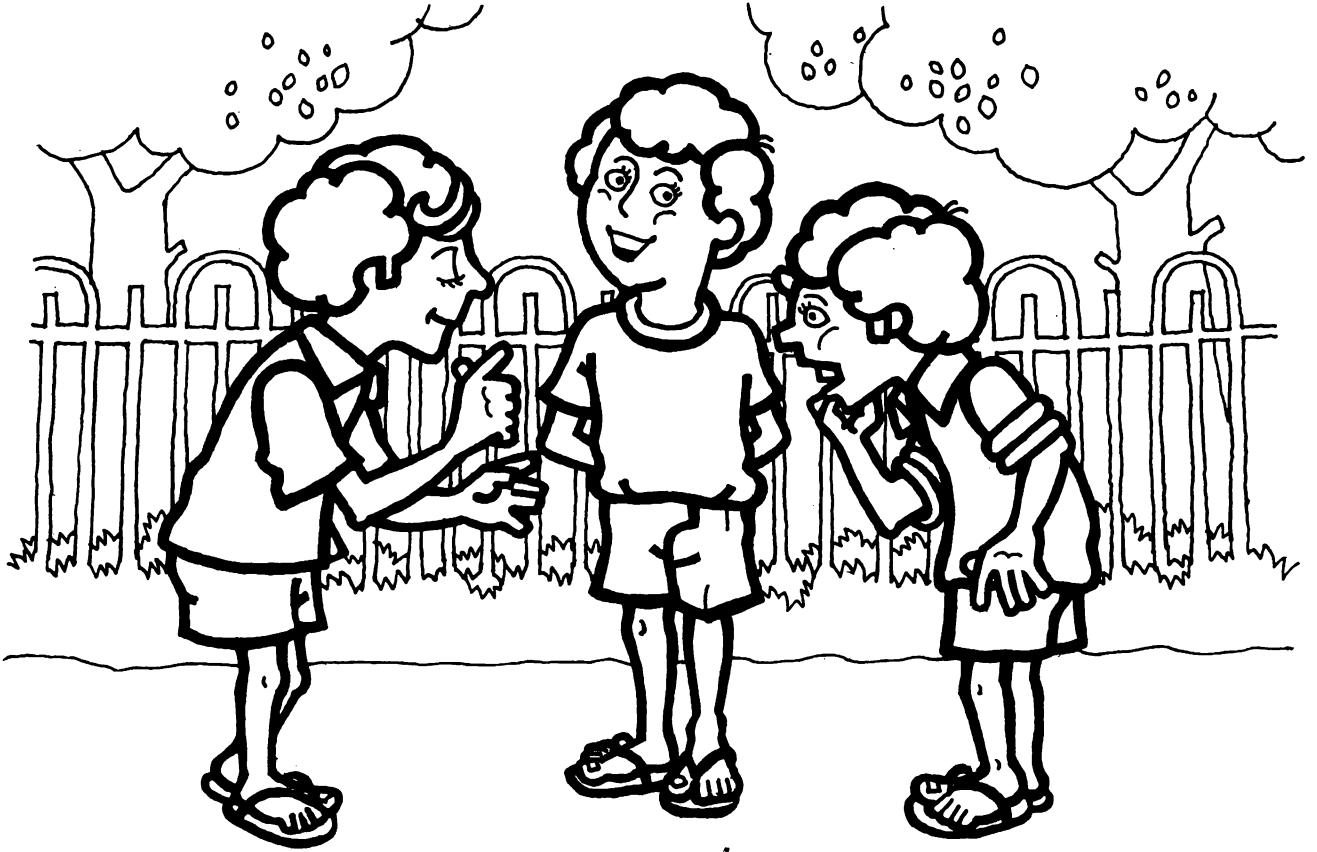
রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনজন গল্প করছিল। তিনজন মানে টাট্টু, বাচ্চু আর তুষার।

কথায় কথায় টাট্টু বলল, ''কলকাতায় টাকা ফেললে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।''

কথাটা শুনে বাচ্চু কিছু বলল না। তুষার শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

টাট্টু বলল, ''হ্যাঁ।''

''কোথায় পাওয়া যায়?''

''কেন? তোর চাই?''

বাচ্চু এবার হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু তাকে চিমটি কেটে চুপ করিয়ে দিল। তুষার কিছু জানতে পারল না।

টাট্টু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, ''তোর কতটা চাই?''

''বেশি না, একটুখানি খেয়ে দেখব একবার।''

''খুব দাম কিন্তু।''

''কত?''

''এক চামচ এক টাকা। দিতে পারবি?''

এক টাকা দিয়ে এক চামচ বাঘের দুধ কেনার ক্ষমতা তুষারের নেই। তবু সে মরিয়া হয়ে বলল, ''পারব।''

''তাহলে একদিন আমার বাড়ি আসিস।''

''কবে যাব? কাল?''

"না, কাল না, যোগাড় করতে হবে তো। একটু দেরি হবে। আজ কী বার?''

''সোমবার।''

টাট্টু তখন একটু ভেবে বলল, ''তাহলে শুক্রবার আসিস।''

''কখন আসব?''

''বিকেলে।''

কিন্তু কথাটা তুষারের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। বুঝতে পারছিল না, কেউ কোনোদিন যা যোগাড় করতে পারেনি তা টাট্টু কীভাবে যোগাড় করবে?

তুষার টাট্টুকে জিজ্ঞেস করল, ''তুই কীভাবে যোগাড় করবি?''

টাট্টু উত্তরে রহস্যের হাসি হেসে বাচ্চুর দিকে তাকাল। মুখে কিছু বলল না।

তুষারের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করল, "বল না, কীভাবে যোগাড় করবি?"

টাট্টু তখন বাচ্চুকে হুকুম করল, ''বাচ্চু! বলে দে তো।''

বাচ্চু বলল, ''টাট্টুর মেসোমশাই ফরেস্টে কাজ করেন। উনি সেখানে তিন বছর হল একটা বাঘিনী পুষছেন। টাট্টু সেই বাঘিনীর দুধই তোকে দেবে।"

তুষারের চোখ দুটো বিস্ময়ে গোল হয়ে উঠল, ''সত্যি!''

টাট্টু এবার প্রায় ধমকের গলায় বলল, ''সত্যি না তো কি

মিথ্যে! তা তোর যদি অবিশ্বাস থাকে তা হলে বাঘের দুধ খাস না। কে তোকে খেতে বলেছে?''

তুষার ভয় পেয়ে গেল। টাট্টু রেগে গেছে। টাট্টু রেগে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। বাঘের দুধ আর খাওয়া হবে না। সে তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ''না না, আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। তুই রাগ করছিস কেন?''

টাট্টুর রাগ এতে অনেকখানি পড়ে গেল। বলল, ''এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম। আর কোনোদিন এ-রকম বেমক্কা প্রশ্ন করবি না।''

তুষার এবার প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্যে বাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, ''তুই বাঘের দুধ খেয়েছিস?''

''কতবার।''

''কেমন খেতে?''

''খুব ভাল।''

''তোরও মেসোমশাই কি—''

''আমার মেসোমশাই নেই। পিসেমশাই আছেন।''

''তিনিও কি—''

''হ্যাঁ, তিনিও ফরেস্টে কাজ করেন। শুধু তাই নয়, বাঘের দুধ খাবেন বলেই একটা বাঘিনী পুষেছেন।''

কথাটা শুনে তুষারের মন খারাপ হয়ে গেল। টাট্টুর মতো বা বাচ্চুর মতো তার কোনো মেসোমশাই বা পিসেমশাই নেই। তার মামা আছে, কাকা আছে, জ্যাঠা আছে। তবে তাঁরা কেউ ফরেস্টে চাকরি করেন না। সবাই কলকাতার অফিসে চাকরি করেন।

টাট্টু এই সময় বলল, ''তবে একটা কথা আছে।''

তুষার উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইল, ''কী কথা?''

''এই ব্যাপারটা যেন কেউ ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে।''

''কেন?''

''কেন দিয়ে কী দরকার? বাঘের দুধ যদি খেতে চাস তা হলে যা বললাম তা শুনতে হবে। রাজি আছিস?''

এটা তুষারের ভাল লাগল না। সে বাঘের দুধ খাবে অথচ তা কাউকে বলতে পারবে না! সে কী করে হয়? কারণ, বাঘের দুধ খাওয়ার চেয়ে বাঘের দুধ খাওয়ার গল্প করার আনন্দ অনেক বেশি। কিন্তু কথাটা টাট্টুকে কী করে বলবে? টাট্টুর যা মেজাজ! অথচ কথাটা না বলেও থাকা যায় না। শেষে টাট্টু যাতে না রেগে যায় এমন ভাবে বলল, ''আমি রাজি আছি। তবে—''

টাট্টু চোখ পাকিয়ে বলল, ''তবে কী?''

''আহা! রাগছিস কেন? আগে কথাটা শোন।''

''বল।''

''তুই জেনে রাখিস আমি কাউকে বলব না। শুধু দিদিকে—''

টাট্টু তুষারের কথা শেষ করতে দিল না। রাগে ফেটে পড়ল, ''শুধু দিদিকে বলবি! তারপর তোর দিদি তার পাঁচ বন্ধুদের বলবে। তারপর সেই বন্ধুরা আরো পাঁচ বন্ধুদের বলবে। তারপর সেই পাঁচ বন্ধুরা...এই করতে করতে কথাটা সরকারের কানে উঠবে। তখন আমার মেসোমশাইয়ের হাতে হাতকড়া। বেশ বলেছিস তুই—শুধু দিদিকে বলব। তোর আর বাঘের দুধ খেতে হবে না। তুই বাড়ি গিয়ে হরিণঘাটার দুধ খা।''

তুষার মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, ''তোর মেসোমশাইয়ের হাতে হাতকড়া পড়বে কেন?''

বাচ্চু একটুক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার টাট্টুর হয়ে উত্তর দিল, ''পড়বে না? বাঘের দুধ সংগ্রহ করা যে বেআইনি।''

''কে বলেছে?''

''লিখিত নিয়ম আছে।''

''তাহলে টাট্টুর মেসোমশাই, তোর পিসেমশাই—''

''অন্যায় কাজ করছেন। ধরা পড়লে চাকরি চলে যাবে।''

তুষার তখন টাট্টুর কাছে ক্ষমা চাইল, ''কিছু মনে করিস না। আমি এত জানতাম না, তাই......''

টাট্টু শান্ত গলায় বলল, ''এবার তো জানলি! এবার যেন কথাটা ভুলেও কাউকে বলিস না।''

''আচ্ছা।''

''তুই তাহলে শুক্রবার বিকেলে বাড়িতে আসিস। সঙ্গে টাকা নিয়ে আসবি কিন্তু। টাকা না আনলে দুধ পাবি না। আমি সাফ বলে দিলাম।''

বাড়িতে ঢুকে দিদিকে দেখেই তার বাঘের দুধ খাওয়ার গল্প করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু উপায় নেই। টাট্টু বারণ করে দিয়েছে। কথাটা খুব গোপনীয়। কথাটা কাউকে বলা যাবে না। ফলে তুষার কদিন একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে রইল। পড়তে বসে পড়ায় মন দিতে পারল না। বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারল না। স্কুলে গিয়ে পড়া বলতে পারল না। এমনকী খেলতে গিয়ে ভাল করে খেলতে পর্যন্ত পারল না। সবসময় এক চিন্তা। তার মাথায় কেবলি পাক খেতে লাগল, না শুক্রবার বিকেলে বাঘের দুধ খাবে, যে দুধ সহজে পাওয়া যায় না, যে দুধ সংগ্রহ করা বেআইনি। ধরা পড়লে হাতে হাতকড়া পড়ে, চাকরি চলে যায়। এতদিন এই বাঘের দুধ শুধু টাট্টুরা খেয়েছে। এবার সেও খাবে। তবে দামটা বড় বেশি। এক চামচ এক টাকা!

দেখতে দেখতে শুক্রবার এল। তুষার মার কাছে গিয়ে বলল, ''একটা টাকা দাও।''

''টাকা কী হবে?''

''দরকার আছে।''

''কী দরকার?''

তুষার দেখল একটা কারণ তাকে বলতেই হবে। তাই মিথ্যে করে বলল, ''চাঁদা দিতে হবে।''

''কোথায়?''

''একটা ছেলের ক'মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেছে। এবার তার নাম কাটা যাবে। তাই সকলে মিলে—''

কথাটা শুনে তুষারের মা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তুষারকে একটা টাকা দিয়ে দিলেন। টাকাটা হাতে পেয়ে তুষার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তুষার তারপর স্কুলে গেল। বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করল না। টাট্টুর বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

টাট্টু বাড়িতেই ছিল। তুষারকে দেখেই বলল, ''আয়।''

তুষার টাট্টুর সঙ্গে পড়ার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে বাচ্চু বসে আছে।

তুষার বাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, ''তুইও খাবি নাকি?''

বাচ্চু বলল, ''না, আমি খাব না।''

এই সময় টাট্টু তুষারকে জিজ্ঞেস করল, ''টাকা এনেছিস?''

''এনেছি।''

''দে।''

তুষার পকেট থেকে টাকাটা বের করে টাট্টুর হাতে দিল। টাট্টু টাকাটা নিয়ে পাশের ঘরে গেল।

একটু পরে টাট্টু ফিরে এল। তার হাতে এক চামচ দুধ।

টাট্টু তুষারকে জিজ্ঞেস করল, ''তুই নিজে খাবি না আমি খাইয়ে দেব?''

''আমি নিজে খাব।''

এই বলে তুষার টাট্টুর হাত থেকে চামচটা নিল। নিয়ে দুধের দিকে তাকাল। দুধটা সাধারণ দুধের মতো নয়। খুব ঘন। মনে মনে বলল: হবে না কেন? বাঘের দুধ যে।

টাটু বলল, ''চেটে চেটে খা, ভাল লাগবে।''

তুষার তখন চামচ ভর্তি দুধটুকু চেটে চেটে খেতে লাগল।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, ''কেমন লাগছে?''

''খুব ভাল। তবে দামটা বড় বেশি।''

''তা তো হবেই। বাঘের দুধ তো।''

তুষার চামচ খালি করে টাটুর হাতে ফিরিয়ে দিল। টাটু জিজ্ঞেস করল, ''আর খাবি?''

''খেতাম। কিন্তু আর তো টাকা নেই।''

''ঠিক আছে। আর একদিন টাকা নিয়ে আসিস।''

''ফুরিয়ে যাবে না তো?''

''না, ফুরোবে না। খুব বলে-কয়ে এক কৌটো এনে রেখেছি।''

কথাটা শুনে খুশি হয়ে তুষার বাড়ি ফিরে এল। তার মুখে বাঘের দুধের স্বাদ লেগে ছিল। তার আর-এক চামচ বাঘের দুধ খেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু টাকা কোথায়? কে এবার টাকা দেবে? মা একবার দিয়েছে। দ্বিতীয়বার দেবে না। এবার বাবার কাছে চাইলে হয়। তবে বাবা যা গম্ভীর! টাকা চাইতে সাহস হয় না। কদিন যাক। সুযোগ বুঝে চাইতে হবে।

কিন্তু চাওয়া আর হয় না। অথচ যত দিন যেতে লাগল তুষারের আর-এক চামচ বাঘের দুধ খাওয়ার ইচ্ছে তত বাড়তে লাগল। শেষে নিরুপায় হয়ে বাবাকে কথাটা না বলে আর পারল না।

তুষারের বাবা টাকার কথা শুনেই চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ''টাকা কী হবে?''

তুষার খুব শান্ত গলায় বলল, ''স্কুলে একটা পুওর ফান্ড হয়েছে। তাতে চাঁদা দিতে হবে।''

তুষারের বাবা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ছেলেকে একটা টাকা দিয়ে দিলেন।

তুষার বাবার কাছ থেকে এত সহজে টাকা পাবে ভাবেনি। তাই টাকাটা হাতে পেয়ে প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তারপর ছুটতে ছুটতে টাটুদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। টাটু আর বাচ্চু তখন বসে বসে ক্যারম খেলছিল।

টাটু তুষারকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, ''বাঘের দুধ খাবি তো?''

''হ্যাঁ।''

''টাকা এনেছিস?''

''এনেছি। তবে দামটা একটু কমা।''

''তা পারব না। এতে খেতে হয় খাও, না খেতে হয় কেটে পড়ো।''

এই সময় বাচ্চু তুষারকে জিজ্ঞেস করল, ''তুই কত দিতে পারবি?''

এই প্রশ্নে তুষার ভারী সমস্যায় পড়ে গেল। কী বলবে সে? পঁচিশ পয়সা দিতে পারলে তার পক্ষে ভাল হয়। কিন্তু কথাটা তো বলা যায় না। বললে বাচ্চু টিটকিরি দেবে। তা হলে পঞ্চাশ পয়সা বলাই ভাল। পঞ্চাশ পয়সা? বাচ্চু রাজি হবে তো! থাক্, এসব ঝুঁকি না নিয়ে পঁচাত্তর পয়সা বলাই ভাল।

বাচ্চু তুষারকে আবার জিজ্ঞেস করল, ''কত দিতে পারবি?''

তুষার বলল, ''পঁচাত্তর পয়সা।''

টাটু এই সময় বাচ্চুকে ধমক দিল, ''বাচ্চু!''

''কী?''

''আমার খদ্দেরকে এভাবে ভাঙিয়ে নিলে আমি বরদাস্ত করব না।''

''কিন্তু ভাল ছেলে পেয়ে তুই যে ওকে দিনের পর দিন ঠকাবি তাও আমি সহ্য করব না।''

''আমি ওকে ঠকাইনি। তুই এবার ওকে ঠকাবি।''

টাটুর এই কথা শুনে বাচ্চু হো-হো করে হেসে উঠল।

টাটু এতে রেগে গিয়ে আরো জোরের সঙ্গে বলল, ''হ্যাঁ, তুই ওকে ঠকাবি। আমি ওর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে খাঁটি বাঘের দুধ খাইয়েছি এবং খাওয়াবও। আর তুই? তুই তো ওকে বাঘের দুধ বলে গোরুর দুধ খাওয়াবি। তোকে চিনি না?''

বাচ্চু এবার হঠাৎ বলে উঠল, ''তুই এর আগের বার টাকার ভাগ দিসনি। বেশি গরম দেখালে আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।''

তুষার এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। থ হয়ে সব শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে সে হঠাৎ শুনল টাটু তাকে বলছে, "বাচ্চু তোকে পঁচাত্তর পয়সায় এক চামচ বাঘের দুধ দেবে বলেছে, আমি তোকে পঞ্চাশ পয়সায় দেব।"

বাচ্চু অমনি বলে উঠল, "আমি পঁচিশ পয়সায় দেব।"

টাটু সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি বিনি পয়সায় দেব।"

বাচ্চু বলল, "ও তোকে বিনি পয়সায় এক চামচ দেবে, আমি তোকে দু' চামচ দেব।"

টাটু বলল, "আমি চার চামচ দেব।"

বাচ্চু বলল, "আমি আট চামচ দেব।"

টাটু বলল, "আমি পুরো কৌটোই দেব। সঙ্গে আগের টাকাটাও ফিরিয়ে দেব।''

এই বলে টাটু আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। পাশের ঘরে ঢুকে একটা কৌটো আর একটা টাকা নিয়ে ফিরে এল। তুষারের হাতে তা তুলে দিয়ে বলল, "যা, এবার চলে যা।"

তুষার আনন্দে কী বলবে, কী করবে বুঝতে পারল না। শুধু বুঝল, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে হবে। নইলে টাটুর মত আবার বদলে যেতে পারে। তখন টাটুর পক্ষে এগুলো আবার ফিরিয়ে নেওয়া বিচিত্র নয়। তুষার তাই আর দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে যতক্ষণ না বাড়ি যেতে পারছে ততক্ষণ তার শান্তি নেই।

তুষার সিঁড়িতে পা দিয়ে দ্রুত নামতে লাগল। কিন্তু কয়েক ধাপ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টাটু পিছন থেকে ডাকল, "তুষার!"

তুষার পিছন ফিরে তাকাল। টাটু এবার কী বলবে? ভয়ে তুষারের বুক কাঁপতে লাগল।

টাটু বলতে লাগল, "বাচ্চু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে বলেছে। তবে সে হাঁড়ি ওকে ভাঙতে হবে না, আমিই ভাঙছি। আমি তোকে বাঘের দুধ খাওয়াইনি, কণ্ডেন্সড মিল্ক খাইয়েছি। আজ তোকে আমি সেই কণ্ডেন্সড মিল্কের কৌটোই দিয়েছি। তোর সঙ্গে একটা মজা করেছি বলে কিছু মনে করিস না—বুঝলি?"

তুষার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়তে চাইল। সে তাহলে বাঘের দুধ খায়নি! কণ্ডেন্সড মিল্ক খেয়েছে। সে আগে কোনোদিন কণ্ডেন্সড মিল্ক খায়নি। শুধু নামটাই শুনেছে। আগে যদি এর স্বাদ তার জানা থাকত তাহলে টাটু তাকে নিয়ে এই বিশ্রী মজাটা করতে পারত না।

এখন তুষার কী করবে? তার ইচ্ছে হল কৌটোটা টাটুর মুখের ওপর ছুঁড়ে দেয়, কিন্তু সে সাহস তার হল না। সে কৌটোটা সিঁড়িতে ঠক করে নামিয়ে রাখল।

টাটু জিজ্ঞেস করল, "কী হল? ওটা নামিয়ে রাখছিস কেন?"

তুষার কোনো উত্তর দিল না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

টাটু পিছন থেকে ডাকল, "তুষার?"

তুষার ফিরে তাকাল না। সদর দরজা খোলা ছিল। ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

ছবি দেবাশিস দেব

স্বপ্নের রঙ সোনালি

শৈলেন ঘোষ

আঃ! কী ভালই না লাগে এখন, এই সকালটা। আর মাত্তর কটা দিন। কদিন পরেই মা-দুগ্গা ঘরে আসবেন। পুজো বসবে। ড্যাম-কুড়-কুড় বাদ্যি বাজবে।

এই দ্যাখো না, কদিন আগেও তো আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে ছিল। কদিন ধরে আকাশ ভেঙে বর্ষার সে কী দাপাদাপি! আর এখন? না, এখন মেঘও নেই, ঝমঝমানি বিষ্টিও নেই। যেমন তারা দল বেঁধে এসেছিল, তেমনি দল বেঁধে কোথায় যে পাড়ি দিয়েছে, আকাশের কোন্ রাজ্যে কে জানে! এখানে এখন তক-তকে আকাশের বুক ভর্তি ঝকঝকে নীল আলো। আঃ! মুঠো মুঠো খুশির মতো ছড়িয়ে পড়েছে, এদিক, ওদিক, চারিদিকে। ওই আলোর মতো খুশি হয়ে দূর আকাশের দোলনায় দুলতে দুলতে দুধ-ধবধব মেঘের দল যখন উড়ে যায়, কিংবা ধরো মেঘের সঙ্গে সাদা-ধবধব বকের পাঁতি উড়তে উড়তে হারিয়ে যায়, তখন স্থির হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে হীরালাল। ভারী ভাল লাগে হীরা-লালের ওই আকাশ আর মেঘ দেখতে। ইচ্ছে করে ওই বকের মতো উড়তে, লুকোচুরি খেলতে, মেঘের সঙ্গে, আলোর সঙ্গে। দেখতে দেখতে হঠাৎ এমন আনমনা হয়ে যায় হীরালাল। হঠাৎ আনমনা ওর মনের কোণে দিদির কথা ভেসে ওঠে। মন বলে, এই সময় যদি দিদি থাকত! দিদিকে হীরালালের মনে নেই। হীরালাল যখন খুব ছোট্ট, হাঁটতে গিয়ে ছোট্ট পা দুটি যখন তার টুল-টুল করে টলে পড়ত, কিংবা হাতের পাতা দুটি তার খুশির আনন্দে দুলে দুলে ঢেউ খেলত, সেই তখন, সেই তখন থেকে দিদি নেই। এখন তবে কেমন করে মনে পড়বে হীরালালের দিদির মুখখানি, চোখ দুটি?

ছবি অলোক ঘর
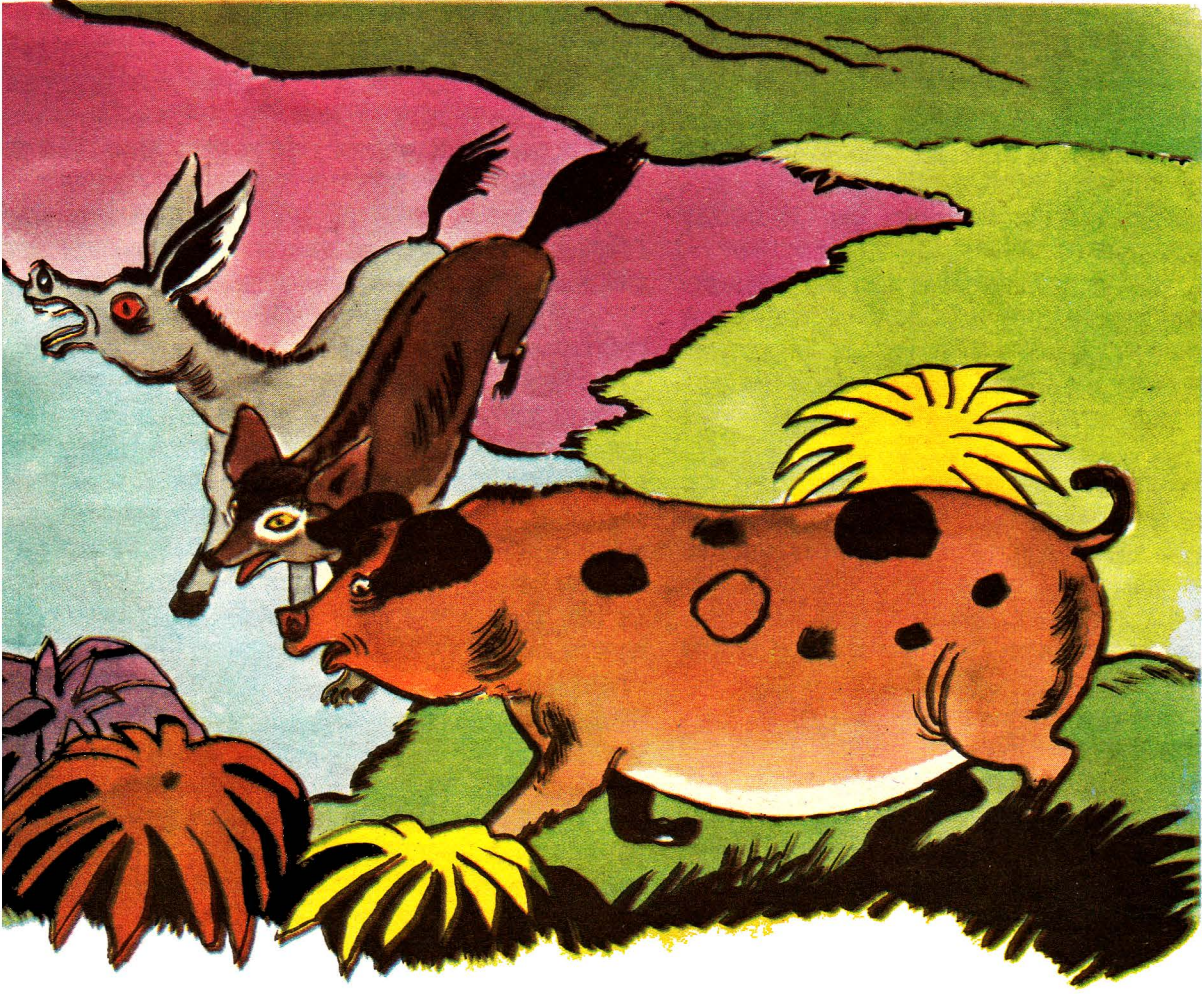
মায়ের কাছে দিদির গল্প কত শুনেছে হীরালাল। এই পুজোর সময় দিদি যখন সাজত, তখন নাকি ভারী সুন্দর লাগত দিদিকে। ডাগর-ডাগর চোখে কাজল পরত। পায়ে আলতা দিত। কপালে কাঁচপোকার টিপ সাজিয়ে, হীরালালকে কোলে নিয়ে ঠাকুর দেখতে যেত। কিন্তু এখন? এখন হীরালাল একা। মা বলেছে, দিদি নাকি মেঘের দেশে চলে গেছে। তাই এই পুজোর সময়, ওই নীল আকাশের মেঘ দেখতে-দেখতে হীরালাল ভাবে, মেঘের দেশ কোন দেশে? সেই দেশে যাবে সে। দিদিকে সে ডেকে আনবে।

হীরালাল তোমার মতো। হয়তো বা তোমার চেয়ে একটু বড়। ভারী মিষ্টি চোখ দুটি তার। দেখলে এত ভাল লাগবে। খুশির বাতাসে চোখের পাতা দুটি সারাক্ষণ দোল খাচ্ছে। কখ্‌নও যদি কান্না-ছোঁয়া দুঃখ এসে ওর বুকের মধ্যে আলতো-হাওয়ায় কেঁপে ওঠে, তবু ও চোখের পাতা দুটি ভিজতে দেবে না। দুঃখ হলে ও মার কাছে ছুটে যাবে। মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবে। মা যখন জিজ্ঞেস করবে, ''কী রে. কী হল?'' তখন হীরালাল আঁচল থেকে মুখ সরিয়ে মায়ের চোখ দুটির দিকে চাইবে। চেয়ে-চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলবে, "কিচ্ছু না।"

মাঝে মাঝে মায়ের জন্যেই থির হয়ে কেঁপে ওঠে হীরালাল। যখন দিদি ছিল, তখন এক-কথা। এখন মা ভারী একা। একা একাই সারাদিন কত কাজ করবে মা। না করলে চলবেই বা কেমন করে। হীরালালের বড় হতে এখনও অনেক দেরি। যতদিন না বড় হচ্ছে হীরালাল, ততদিন দুধের ঘটি নিয়ে মাকে বাড়ি-বাড়ি দুধ বেচে আসতেই হবে। কোন্ সকালে উঠবে মা। সেই গরমের দিনে. তখনও আকাশে ভোরের আলো ফুটবে না, পাখি ডাকবে না। চারদিক নিশ্চুপ। শুধু শোনা যাবে বাড়ির কোল ঘেঁষে ছোট্ট নদীর ছুটে চলার তির-তির শব্দ, তখন মা উঠবে। কিংবা ধরো, এখন, এই শরতে ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় যখন ওই নদীর তীরে তীরে শুধু কাশের হাওয়ায় নাচনের নূপুর বাজে, তখন মা জাগবে। আবার নয়তো কনকনে শীতের ভোরে তুমি যখন লেপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে ঘুম দাও আর জানতে পার না ঘরের বাইরে গাছের পাতায় একটি একটি শিশির-ফোঁটা টুপ-টাপ লাফ দিয়ে খেলা করছে, তখন মায়ের ঘুম ভাঙবে। গোয়ালে যাবে মা। লক্ষ্মীকে খেতে দেবে। লক্ষ্মী ওদের মোষ। কালো কুচকুচ করছে। কেমন নাদুস-নাদুস মোষটা। লক্ষ্মীর একটা বাচ্চাও আছে। ঠিক ওর মায়ের মতো, অমনি কালো, অমনি মোটা। সাংঘাতিক দুষ্টু। তুমি যাও না সামনে, এমন মাথা নেড়ে তেড়ে আসবে যে, পালাতে পথ পাবে না। তবে হীরালালকে দেখলে ভারী আনন্দ ওর। তিড়িংতিড়িং লাফাবে, ছুটবে আর হীরালালের বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে আদর করবে। তখন কী ভালই না লাগে হীরালালের।

মা যখন দুধ বেচে ঘরে ফেরে, তখন আকাশ উপচে রোদ উঠে যায়। বই নিয়ে তখনও পড়বে হীরালাল। তারপর মা এসে পড়া ধরলে, তখন ছুটি। মা এত জানে কী করে? মায়ের মুখে মুখে কত ছড়া। কত গল্প। এমন-কী, হীরালালের বইভর্তি

শক্ত-শক্ত বানানগুলো পর্যন্ত মুখস্থ। অবাক হয়ে যায় হীরালাল। হবেই তো! কেননা, হীরালালকে কত কষ্ট করে বানানগুলো শিখতে হয় বলো! অবিশ্যি এ-কথা বলি না, পড়তে হীরালালের খারাপ লাগে। ও যতই পড়ে, ততই যেন ওই গাছ আর পাখি, ওই নদী আর মাঠ কিংবা ওই ফুল আর ফড়িং আপন হয়ে মনে মনে ওর সঙ্গে কথা বলে। জিজ্ঞেস করো না তুমি যা ইচ্ছে। ভাবছ হীরালালকে হারিয়ে দেবে! তবেই হয়েছে! তুমি নিজেই গো-হারান হয়ে বসে পড়বে।

মা এলে, পড়া শেষ করে এক কোঁচড় মুড়ি নেবে হীরালাল। তারপর লক্ষ্মীর পিঠে চেপে ওই নদীর দিকে পাড়ি দেবে। রোজ রোজ। শীতের দিনে তো ওই নদী ঠিক যেন এক ফালি রুপালি রাঙতা। তখন নদীর জল ডিঙিয়ে এ-পার থেকে ও-পার যেতে লক্ষ্মীর কী মজাই না লাগে! এক-একদিন লক্ষ্মী জল ছেড়ে নড়বেই না।

একদিন হয়েছে কী, হীরালাল লক্ষ্মীর পিঠে বসে, মাঝ নদীতে জলের ওপর কোঁচড় থেকে মুড়ি নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছ আসছে! টুপ্‌স-টুপ্‌স মুড়ি খাচ্ছে আর নেচে নেচে পালিয়ে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে কার না ভাল লাগে! বলো, কে না আনমনা হয়ে যায়! ব্যস! যেই না হীরালাল একটু আন-মনা হয়েছে, লক্ষ্মী অমনি ঝপাং করে জলের মধ্যে বসে পড়েছে। পড়বি তো পড় হীরালালও চিতপটাং। হীরালালের চোখে জল, মুখে জল। জলে জলে নাকানি-চোবানি। ওঃ। সে কী দারুণ মজা। তাই বলে ভাবছ, হীরালাল বুঝি লক্ষ্মীকে খুব একচোট পিটুনি দিয়েছে! মোটেই না। উলটে হীরালাল খিলখিল করে হেসে উঠে নদীর জলে সাঁতার কাটতে শুরু করে দিলে আর টুপ-টাপ ডুব মেরে লক্ষ্মীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল। খেলা শেষ হলে লক্ষ্মীর পিঠে চেপে আবার ঘরে ফেরা।

নদীর গা ঘেঁষে ওই যে বনটা, দ্যাখো কী গভীর! গাছের গায়ে গা হেলিয়ে একটা যেন দানব! অন্ধকারে থেকে-থেকে চোখ মটকাচ্ছে! দানবের মাথায় আলুথালু চুল। তার নখের ডগাগুলো যেন খোঁচা খোঁচা ডালপালা! কেউ সামনে গেলেই তাকে খিমচে দেবার জন্যে আঁকপাঁক করছে। দেহটা তার দূর, কত দূর হয়তো অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে-মড়িয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে!

কী জানি কেন, আজই হঠাৎ হীরালালের চোখ দুটি বনের দিকে তাকিয়ে থমকে যায়! বনের গভীরে ও যায়নি কোনোদিন! এতদিন এই পথে ও লক্ষ্মীর পিঠে চেপে কতবার আনাগোনা করেছে, কিন্তু এমন করে সে তো কোনোদিন বনের দিকে তাকিয়ে দেখেনি! অবাক চোখে দাঁড়িয়ে আজই ও প্রথম ভাবল, কী আছে এই বনের গভীরে! দেখে এলে হয় না!

হঠাৎ এ কী! এমন কেন হল! এক টুকরো কালো মেঘে আকাশের সূর্য কেন ঢেকে যায়! এই তো রোদ-ঝলমল দিন ছিল! কোত্থেকে মেঘ এল! আলোর বুঝি রাগ হয়েছে, তাই মুখ ভার করেছে!

বনের ভেতর যেতে-যেতেও যাওয়া হল না হীরালালের। বলা তো যায় না। শরৎ-মেঘের মন বোঝা ভার! কখন তিনি কোন্‌খানে যে ঝমঝমিয়ে নেমে পড়বেন, কেউ জানে না। না থাক। আজ না, কাল। ঘরের দিকে মুখ ফেরাল হীরালাল।

"হীরালাল!" হঠাৎ কে যেন ভারী আদর করে ডাকল তাকে! এ তো একটি মেয়ের গলার স্বর! এ ডাক তো তার চেনা নয়! দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকাল হীরালাল, এ-পাশে ও-পাশে! না, কাউকে তো সে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কি সে ভুল শুনল! হবেও বা! হীরালাল লক্ষ্মীর পিঠে লাফ দিলে। পিঠের ওপর বসে পড়ল। তারপর হাঁক দিলে, ''হ্যাট-হ্যাট।'' লক্ষ্মী হাঁটা দিলে।

ক'পা-ই বা গেছে লক্ষ্মী, আবার আচমকা তেমনি করে ডাক দিল মেয়েটি, ''হীরালাল!''

চমকে উঠল হীরালাল। অবাক কান্ড! তক্ষুনি এক দমকা হাওয়া শনশনিয়ে ঝাপটা মেরে বয়ে গেল বনের ডালে ডালে। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ! এ কী! ঝড় উঠল যে! ঝড়ের ঝাপটায় ধুলোর ঘূর্ণি ছোটে সাঁই-সাঁই! ছুটতে ছুটতে হীরা-লালের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আবার চেঁচিয়ে উঠল, "হীরালাল।"

হীরালালের মনে হল, সেই ডাক ঝড়ের সঙ্গে বনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। নিমেষের মধ্যে লক্ষ্মীর পিঠ থেকে লাফ দিল মাটিতে। তারপর চিৎকার করে বনের দিকে ছুটল, ''কে—।''

হয়তো দুর্যোগ মাথায় নিয়ে হীরালাল বনের মধ্যেই ছুটে যেত! তারপর যে কী হত কেউ জানে না।

"হীরালাল।" মা ডাকল।

ছোটা হল না। ছুটতে ছুটতে থামল হীরালাল। কান পেতে আবার শুনল, ঝড়ের শব্দে মায়ের ডাক, ''হীরালাল, ঘরে আয়, ঝড় উঠেছে!''

''যাচ্ছি মা।'' হীরালাল চেঁচিয়েই উত্তর দিলে। মায়ের ডাক শুনে বনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই ওর মনে হল, বনটা যেন ঝড়ের ঝাপটায় মাথা ঝাঁকিয়ে হীরালালকে ঠাট্টা করছে। ওই তো, হাজার হাজার গাছের পাতা হীরালালের বিপদ দেখে একসঙ্গে কেমন হাততালি দিচ্ছে দ্যাখো! কিচ্ছু বলার নেই হীরালালের। কাকে বলবে? বনকে, না গাছকে? তাই চটপট লক্ষ্মীর পিঠে বসে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হীরালাল ঘরে ছুটল!

সত্যিই অবাক কথা। কেননা, হীরালাল সকালে ঘুম থেকে যখন উঠল, তখন তো মেঘ ছিল না! কে বুঝবে তখন, একটু পরে ঝড় উঠবে! তখন কেমন মিষ্টি হাওয়া শিউলি গাছে দোল খাচ্ছিল আর ফুলে ফুলে শিউলিতলা ভরে যাচ্ছিল। আর এখন? আকাশের মনের কথা কেউ জানে না, কেউ জানে না। এই বৃষ্টি এল যদি, এই উঠল রোদ। এই ছায়া ভরে গেল, এই ফুটল আলো!

ঝড় থামল বটে, কিন্তু মেঘ কাটল না। আজ আর ঘর থেকে বেরুল না হীরালাল। ভারী ছটফট করছিল তার মনটা। তখন কে তাকে ডাকল? কাউকে তো দেখতে পেল না হীরালাল! ওই বনে কে থাকে, যে তার নাম জানে! যতই ভাবছে, মন তার বার বার ছুটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এখনি যাই, খুঁজে আসি!

মেঘ কাটেনি বলেই আজ আকাশে তারা ফোটেনি। হীরা-লাল কতবার ছুটে ছুটে উঠে এসেছে এই উঠানে। কতবার থেকে থেকে উঁকি মেরেছে দূর আকাশে! কিন্তু দ্যাখো, তারার আকাশ আজ মুখেচোখে অন্ধকারের কালি মেখে চোখ মটকাচ্ছে। হীরা-লাল যতই দেখছে, বুকটা তার কেমন যেন নিরাশ হয়ে কেঁপে উঠছে। মন ভাবছে, কাল যদি মেঘ না কাটে!

মনের ভাবনা মনে নিয়েই হীরালাল রাতের বেলা মায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমুবার আগে শুধু একটিবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "মা, মেঘ কেন করে?"

মা বলেছিল, ''মেঘ না করলে বিষ্টি হবে কেন? বিষ্টি না হলে ফুল ফুটবে কেন? ফুল না ফুটলে পুজো হবে কেমন করে দুর্গাঠাকুরের?''

মায়ের কথা শুনে খানিক চুপ করে ছিল হীরালাল। তারপর আবার বলেছিল, "আচ্ছা মা, দিদি না থাকলেও কেন পুজো হয়?"

মায়ের মুখের কথা হীরালালের এই একটি কথায় আর কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি। অন্ধকার এই ঘুমের রাতে হীরা-লাল দেখতে পায়নি মায়ের চোখ দুটি। দেখেনি চোখ দুটি উছলে গেছে জলে জলে। হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ আর নিথর হয়ে গেল চারিদিক। হীরালালের নিজেরই অবাক লাগছে! কী হল,

মা কেন কথা কয় না! আর তখনই হঠাৎ মায়ের হাতের নরম আঙুলগুলি হীরালালের কপাল ছুঁয়ে কেঁপে উঠল। হীরালাল মায়ের গলাটি জড়িয়ে ধরলে। তখন তার মনে হল, বাইরে ওই ঝিঁঝিগুলো যেন আজ কত জোরে, অনেক জোরে ডাক দিচ্ছে। ওরা একটু থামলে পারে না।

থামল। কেন-না, বাইরে টাপুর-টুপুর বিষ্টি নামল। হীরালালের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। মন ভাবল, এ-বিষ্টি যদি আর না থামে! কাল সকালে উঠে, তাহলে কেমন করে বনে যাবে সে! কেমন করে খুঁজবে তাকে যে ওর নাম ধরে ডেকে ডেকে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল! আহা! কত যেন আদর-মাখা মিষ্টি-সুরের সে-ডাক, ''হীরালাল, হীরালাল!'' এখনও হীরালালের কানে কানে বাজছে সেই সুর। শুনতে শুনতে ঘুমের আবেশ যেন আপনা থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে হীরালালের চোখ দুটিতে। আধো আধো ঘুমে-ঘুমে ও ভাবে, দিদিও কি তাকে ওই নামে ডাকত, ''হীরালাল, হীরালাল।'' ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেল ভাবনা। ঘুমিয়ে পড়ল হীরালাল।

২

আজ খুব সকাল সকাল উঠেছিল হীরালাল। বিষ্টি থেমেছে। আঃ! আলো, আলো, চারিদিকে আলো। আকাশের নীল পোশাকে আলোর রোশনাই চমক দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। আকাশ থেকে মাটিতে। খুশিতে দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল হীরালাল। তারপর ছুট দিল হীরালাল। ছুট দিল বনের দিকে। যেন আলোর পিছনে আর-এক আলো!

আজ ভারী শান্ত বনের গাছপালা। বিষ্টির জলে চান করে ঝলমলিয়ে উঠেছে গাছের পাতারা। এ-পাতার জল এখনও ও-পাতায় টুপ-টাপ লাফ দিয়ে খেলা করছে। যদিও ভিজে মাটি কাদা-কাদা, তবু হীরালাল ছুটতে ছুটতেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

হঠাৎ দাঁড়াল কেন হীরালাল! দ্যাখো, কী ভয়ংকর থমথম করছে এখানটা, বনের সামনেটা। এত অন্ধকার কেন! পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো আলোর ফুলকিটুকু পর্যন্ত উঁকি মারছে না।

ভয় পেল না হীরালাল। সেই অন্ধকার বনের ভেতরে, এ-গাছ ও-গাছ জড়িয়ে ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে সে এগিয়ে চলল। ডাগর-ডাগর চোখে তার অবাক-অবাক চাউনি। অবাক চোখ দুটি তার ইতি-উতি খুঁজছে কাকে? খুঁজছে তাকে, যে ডেকেছে তার নাম ধরে।

খুঁজতে-খুঁজতে আরও একটু ভেতরে যখন চলে গেছে হীরালাল, তখন কী গহন! যে-পথ দিয়ে এসেছে, সে-পথও তো আর দেখা যায় না। গাছে গাছে ঢেকে গেছে। ভারী নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ চারিদিক। গাছে পাখি নেই, কোনো সাড়া নেই। শুধু ভিজে পাতায় হীরালালের পায়ে চলার খসখসানি। নির্জন বনটা চমকে উঠছে।

হঠাৎ শিউরে উঠল হীরালাল। ওখানে গাছের ঝোপটা নড়ে যেন! এই মস্ত গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়ল। লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মারলে। সত্যিই তো! নড়ছে, কী ওটা!

দেখে ফেলেছে হীরালাল। স্পষ্ট দেখল, একটা হরিণ। উরিব্বাস! শিং দুটো দ্যাখো, যেন মাথা ফুঁড়ে ডাল গজিয়েছে! হলদে গায়ে ছাপ-বাহারি। মুখ উঁচিয়ে কেমন কচি কচি পাতা খাচ্ছে! খেতে খেতে কানও নড়ছে পিড়িং-পিড়িং। ল্যাজও নাচছে, তুড়ুক-তুড়ুক।

এই যাঃ। কী হল দ্যাখো!

কী হল?

হরিণটা তো খাচ্ছে, নিশ্চিন্তে আপন মনেই খাচ্ছিল। হীরালাল করেছে কী, হরিণটাকে আরও একটু ভাল করে দেখবে বলে যেই আর একটু উঁকি মেরেছে, বাস! হরিণটা দেখে ফেলেছে! চট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে! হীরালালের চোখের ওপর চোখ রেখে নট নড়ন নট কিচ্ছু! হীরালাল তো তাই দেখে ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে! কী করবে এখন? তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল! আর বলব কী, ঠিক তক্ষুনি, একেবারে বসার সঙ্গে সঙ্গে, আবার সেই ডাক, ''হীরালাল!''

হীরালালের বুকের ভেতর যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কিন্তু সেই ডাকের সুরে সুরে নিস্তব্ধ গহন বন দুলে উঠল। ডাক শুনে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে হীরালাল। যেই না তাই দেখা, হরিণটাও দিয়েছে ছুট! কী জানি কী মনে হল, হীরালালও ছোটা দিলে। ছুটল সে হরিণটার পেছনে পেছনে। ভাবল নাকি, হরিণটাই তাকে ডেকেছে!

ঝোপ আর জঙ্গল, খানা আর খন্দ লাফিয়ে লাফিয়ে তীরের মতো পালায় হরিণটা। আর হীরালাল গাছ ডিঙিয়ে, ঝাড় পেরিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করলে। আরি ব্যস। কী ছুট! কিন্তু যতই ছোট, হরিণের সঙ্গে হীরালাল পারবে কেন! একী! ছুটতে ছুটতে যে হীরালাল বনের আরও গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে! যাক, তবু সে ছুটবে। সে হরিণটাকে ধরবে।

যাঃ! দ্যাখো, ছুটতে ছুটতে হীরালালের পা পিছলে গেল! ধপাস! পড়েছে হীরালাল। লেগেছে খুব? না, একটুও লাগেনি, বুঝতে-না-বুঝতেই ও বাবা, এ যে সারা বন যেন একসঙ্গে হেসে উঠল! হা-হা, হি-হি, হো-হো!

হাসি শুনে আঁতকে উঠেছে হীরালাল। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। চোখে-মুখের কাদা সরিয়ে সামনে চাইতেই হীরালালের চক্ষু ছানাবড়া! ও মা! এ তো একটা হরিণ নয়! অসংখ্য হরিণ গাছের ফাঁকে, ঝোপের ধারে শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হীরালাল পেছনে ফিরল, সেখানে হরিণ। সামনে তাকাল, সেদিকে হরিণ। আশে-পাশে যেদিকে চাও, হরিণ আর হরিণ! এখন কী করবে হীরালাল? ওই দ্যাখো, হরিণগুলো এগিয়ে আসছে! গুঁতিয়ে দেবে নাকি হীরালালকে! আর বলতে! পালাও হীরালাল! কিন্তু কোন্‌দিকে পালাবে! কোথায় পথ? ওই তো এসে পড়ল!

বলতে বলতেই হীরালাল মেরেছে লাফ! লাফিয়েই ওই ঝাঁকড়া গাছটার একটা ডাল ধরে ফেলেছে। গাছের ওপর তরতর করে উঠে পড়েছে। উঃ! খুব রক্ষে। হরিণগুলো শিং উঁচিয়ে আর লাফালাফি করলে কী হবে! ধরতে হচ্ছে না। হীরালাল এ-যাত্রায় বাঁচল হয়তো!

কিন্তু শোনো, ওই তো সেই মেয়েটি আবার ডাকল, ''হীরালাল!''

হীরালাল থমকে গেল।

সে চিৎকার করে উঠল, "হীরালাল, তোমার মাথার কাছে সাপ!"

হীরালাল চকিতে ওপরে তাকিয়েছে। সত্যিই তো একটা ময়াল! হীরালাল প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ''সাপ।'' গাছের ওপর থেকে চক্ষের নিমেষে মারলে লাফ। তারপর দে ছুট।

সাপটাও তো ছাড়বার পাত্তর নয়! সড়াত করে গাছ থেকে গড়িয়ে পড়ে লাগালে তাড়া! উরি বাবা! কী বিরাট সাপটা! আর বলতে, তাই না দেখে কোন্ ফাঁকে যে কোথা দিয়ে হরিণগুলো হারিয়ে গেল, কেউ দেখতেই পেল না!

সাপের ভয়ে হীরালাল তো ছুটছে, কিন্তু বনের ঘোঁতঘাঁত তো সে জানে না! সাফ-সাফ সিধে রাস্তা হলে এক কথা, হীরা-

লাল পাই-পাই ছুটে পালাত। কিন্তু এখানে? ছুটতে গেলেই গাছের ধাক্কা। নয়তো কাঁটা-ঝোপে আটকা। কিন্তু আটকা পড়ুক, কি ধাক্কা লাগুক, ওকে ছুটতেই হবে।
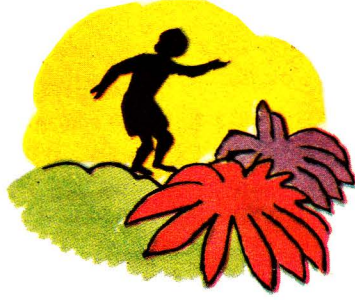
তারপর হাঁপিয়ে পড়েছে!

তারপর পা কেটে রক্ত পড়ছে!

তারপর সাপটা এগিয়ে এসেছে!

এবার ঠিক ধরবে! এই মারল ছোবল!

না, পারল না! কী সব্বনাশ! ওই দ্যাখো সামনে একটা চিতা বাঘ! সাপটা দেখতে না পেলেও হীরালাল দেখে ফেলেছে! ওই তো, ওই ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে তাক কষছে! যাঃ! এবার হীরালালের নির্ঘাত মরণ! এখন কাকে সামলাবে? বনের দুই যম—চিতাকে, না সাপকে?

"হীরালাল, শিগগির গাছে উঠে পড়ো!" এ কী! আবার যে সে হাঁকল!

একটু যে থতমত খায়নি হীরালাল, তা নয়! তবু নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে ঝটপট সামনের গাছটাতেই উঠে পড়ল! আর সঙ্গে সঙ্গে 'হালুম' করে ডাক ছেড়ে চিতাটা দিয়েছে এক লাফ! দেরি করে ফেলল! ততক্ষণে শিকার তার গাছের ডালে! হীরালালকে ধরতে গিয়ে পড়বি তো পড় সাপের ঘাড়ে। তারপর যা লেগে যা নারদ-নারদ! বাঘে-সাপে মারামারি। কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি। বাঘের যত তর্জন-গর্জন, সাপের তত ফোঁসফোঁসানি! এ ওকে আছাড় মারে, তো ও একে কামড়ে ধরে! বনের নির্জনে সে কী তুলকালাম কাণ্ড! কাণ্ড দেখে, শেয়াল হাঁকে, ফেউ ডাকে! ভালুক পালায়, বাঁদর চেঁচায়! আর ভয়ে জুজু হীরালাল, গাছের ডালে বসে বসে তাই দেখে শিউরে ওঠে।

অনেক পরে সব শেষ। বাঘটার ভয়ংকর হুংকার সাপটার প্রচণ্ড ফোঁসফোঁস থেমে নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিক। দুটোই লড়তে লড়তে মরে গেল।

হীরালাল কিন্তু তক্ষুনি-তক্ষুনি গাছ থেকে নামল না। যদিও বাঘটা লটকে পড়েছে, সাপটাও নড়ছে না, তবু কে বলবে তারা সত্যি সত্যি মরেছে কি না! তাই আরও অনেকক্ষণ গাছেই বসে রইল হীরালাল।

কই, না তো! অনেকক্ষণ পরেও তো বাঘের নিশ্বাস পড়ছে না। সাপটাও ধোঁকাচ্ছে না! এখন কি তবে নামা যায় গাছ থেকে?

হ্যাঁ, হীরালালের এতক্ষণে সাহস হল। খুব সাবধানে নামল সে! তারপর অবাক চোখে চেয়ে দেখলে! চোখ তার ঠিকরে পড়ছে! এমন করে, এত কাছ থেকে বাঘের চেহারা হীরালাল আর কোনোদিন দেখেনি! কী সাংঘাতিক পায়ের থাবা আর কী ভীষণ খোঁচা খোঁচা নখ!

হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠল হীরালালের! আবার কিসের শব্দ যেন! পাতার ওপর খসখসানি! চটপট লুকিয়ে পড়ল হীরালাল! উঁকি মারলে। হ্যাঁ, শব্দটা দূর থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে! সঙ্গে সঙ্গে এই গাছ থেকে আর এক গাছে এগিয়ে গেল হীরালাল। এবার তার স্পষ্ট নজরে পড়ল, তিন-জন সৈনিক! এ কী! এরা এ সময়ে বনের ভেতরে কেন? তাদের হাতে বন্দুক, পিঠে ব্যাগ। হাঁটছে, ক্লান্ত। চলতে চলতে সতর্ক দৃষ্টি তাদের এদিক-ওদিক ঘুরছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তারা। মরা বাঘটার দিকে নজর পড়ল। অস্ফুট স্বরে একজন বলে উঠল, "বাঘ!"

আর একজন আঁতকে উঠল, "সাপ!"

আর একজনের চোখ দুটো ঠিকরে পড়ল। ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, "সব্বনাশ!"

তিনজনে বন্দুক উঁচিয়ে তফাতে দাঁড়াল। দেখছে তারা বেবাক হয়ে। চোখের পাতা পড়ছে না। এখন বুঝতে পেরেছে ওরা, বাঘটা মরেছে, সাপটাও জ্যান্ত নেই। আলতো পায়ে এগিয়ে এল তারা। বন্দুক দিয়ে খোঁচা মারলে বাঘের পিঠে, সাপের পেটে। তারপর নিজেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চাপা গলায় হেসে উঠল। হাসতে হাসতে একজন বলে উঠল, "এক বিপদ থেকে আর এক বিপদ। যাও বা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলুম, এখন আবার বাঘ! বনের ভেতর জ্যান্ত বাঘের খপ্পরে না পড়তে হয়!"

আর একজন উত্তর দিলে, "ঠিকই বলেছিস। আমাদের তিন-জনের তিনটে বন্দুক। কিন্তু গুলি মাত্র একটা। সামনে বিপদ এলে সামাল দেব কেমন করে?"

আর একজন বললে, "সুতরাং, আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন ডিঙিয়ে পালাতে হবে।"

বলেই সৈনিক তিনজন হাঁটা দিলে।

হীরালালের কী মনে হল, ওদের পিছু নিলে।

সৈনিক তিনজনের পায়ে শক্ত জুতো। শব্দ যাতে না ওঠে, তাই সামলে সামলে পা ফেলছে। আর খালি পায়ে তার চেয়েও আরও সাবধানে হীরালাল হাঁটছে এ-গাছ থেকে ও-গাছের আড়ালে। এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপের অন্ধকারে। অবাক কথা, এখন হীরালালের বাঘের ভয় নেই। না সাপের ভয়। এখন তার মনেও পড়ছে না সেই মেয়েটির কথা! মনে পড়ছে না সেই মিষ্টি ডাক, 'হীরালাল'। তার চোখের দৃষ্টি এখন ওই সৈনিক তিনজনের ওপর। কোথায় যাচ্ছে ওরা? কোথায় পালাচ্ছে?

না, একথা তো হীরালালের জানার কথা নয় যে, ওই তিনজন সৈনিক যুদ্ধের ভয়ে দল ছেড়ে পালাচ্ছে। মরতে ওরা ভয় পায়। ওরা জানে, সৈনিক হয়েও চোরের মতো পালালে তার কী শাস্তি। ধরা পড়লে, রাইফেলের গুলিতে বুকগুলো ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!

থামল তারা হঠাৎ। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী কথা বলাবলি করল, শুনতে পেল না হীরালাল। কিন্তু দেখতে পেল, তিনজনের চোখ একই সঙ্গে ঘুরছে যেন। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল তাদের চোখ। যেদিকে চাইল তারা, হীরালালও তাকাল সেদিকে। একটা পোড়ো বাড়ি না সামনে? হ্যাঁ তো! কই এতক্ষণ হীরালাল তো বাড়িটা দেখতে পায়নি! দেখবে কেমন করে! জঙ্গলের আড়ালে এমন ঢাকা পড়ে আছে, নজরই যায় না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সৈনিক তিন-জন সেইদিকে। বাড়িটার সামনে একটু দাঁড়াল। উঁকি মারলে। না, হয়তো কেউ নেই। একটু দোনোমনো করল হয়তো! কিন্তু সে তো আর হীরালালের নজর গেল না। তারপর তিনজনেই ভাঙা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

হীরালালও হামাগুড়ি দিলে। কী আছে বাড়িটার ভেতরে! তাই তো! লোক তিনটে বাড়ির ভেতর ঢোকে কেন? দেখতে হবে তো! তাই হীরালালও চুপিসারে এগিয়ে গেল সেইদিকে।

সত্যি, পোড়ো-বাড়ির ভেতরটা এত ঘুপচি, চারিদিকে এত ঝোপ-জঙ্গল আর ঝাঁক-ঝাঁক পাতায় ছেয়ে রয়েছে যে, শত চেষ্টা করেও হীরালাল ভেতরে কী হচ্ছে, না হচ্ছে টের পেল না। হীরালালকে আরও কাছে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আরও কাছে যাওয়া মানেই তো বিপদ! তবে বনের ভেতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকলে কাউকে আর দেখতে হচ্ছে না! তুমি যা ইচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে যত পারো দ্যাখো, ঘুণাক্ষরে কেউ জানতেও পারছে না।

তাই হীরালাল লুকিয়ে-ছাপিয়ে আরও কাছে এগিয়ে চলল। নিমেষের মধ্যে সে বাড়িটার পেছন দিকে চলেও এসেছে। এদিকে দেওয়ালের গায়ে ঢাপ্‌সুস গর্ত। হয়তো এককালে জানলা ছিল। এখন তার চিহ্নটি পর্যন্ত নেই। হ্যাঁ, ওই গর্তে মাথা গলিয়ে হীরালালকে দেখতে হবে।

কিন্তু কাজটা তো সহজ নয়। তবু হীরালাল থাকতে পারল না। গর্তের ভেতর সে উঁকি মারলে। মেরেই হীরালালের চক্ষুস্থির! আরে! আরে! তারা যে সৈনিকের পোশাক খুলে ফেলেছে! পিঠে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে অন্য কাপড় বার করে পরে ফেলেছে! মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে! পায়ে চটি চড়িয়েছে। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, তারা নকল দাড়ি-গোঁফ এঁটে এখন একেবারে অন্য মানুষ। হীরালাল এবার স্পষ্ট দেখতে পেল, এক কোণে বন্দুকের নল দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল তারা। তারপর খুলে-ফেলা পোশাকগুলো আর বন্দুক তিনটে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিলে। তারপর নিজেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে একজন জিজ্ঞেস করলে, "চেনা যাচ্ছে?"

আরও একটু ভাল করে দেখে অন্য দুজন ঘাড় নাড়লে, "না।"

"তবে চ, এবার বেরিয়ে পড়ি।"

"চ।"

তিনজনে পোড়ো-বাড়ির দরজা ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে হীরালাল থ হয়ে গেছে। কেন-না, এমন করে কাউকে কোনোদিন সে দাড়ি-গোঁফ পরে অন্য মানুষ সাজতে দেখেনি। তবে কি লোকগুলি সৈনিক নয়, অন্য কিছু! ভেবেই পায় না—হীরালাল।

কিন্তু এত যে কাণ্ড হচ্ছে, পায়ে পায়ে এমন যে বিপদ ঘুরছে অথচ হীরালালের ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল ওই বন্দুক তিনটে নেড়েচেড়ে দেখতে। এমন নয় যে, সে বন্দুক কোনোদিন দেখেনি। তবে হাত দিয়ে তো ছোঁয়নি কোনোদিন! তাই ভারী লোভ হচ্ছিল তার। আর তাই আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হীরালাল গা ঢাকা দিয়ে পোড়ো-বাড়ির পেছনে। তারপর যখন, লোক তিনটের সাড়া-শব্দ আর শোনা গেল না, তখন নিঃসাড়ে বেরিয়ে এল হীরালাল ঝোপের ভেতর থেকে। খুব সাবধানে এগিয়ে এল পেছন থেকে সামনে। পোড়ো-বাড়ির অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। গা-টা কী রকম ছমছমিয়ে উঠল। কী ভয়ংকর কালো ঘুরঘুট্টি ভেতরটা। এর ভেতরে মানুষ যাবে কেমন করে!

তা হোক। ও তো আর অনেক ভেতরে যাচ্ছে না। ওই তো, ওই সামনেই, ওই কোণে বন্দুক তিনটে পোঁতা আছে। হাত বাড়ালেই তো পাওয়া যায়! ধাঁ করে ছুটে গেল হীরালাল সেই অন্ধকারের দিকে। তারপর পোড়ো-বাড়ির গহ্বরে সে হারিয়ে গেল।

"আঃ—!" চিৎকার করে উঠল হীরালাল আচমকা! হাত বাড়াল। হাত বাড়িয়ে ছুটতে গেল। কিন্তু ওই দ্যাখো, কালো-জমাট অন্ধকারটা নিমেষের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরলে। অন্ধকার, অন্ধকার। চারিদিক অন্ধকার। যেদিকেই তাকায় হীরালাল, সেদিক থেকেই কে যেন মুঠো মুঠো অন্ধকার ওর চোখে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওকে অন্ধ করে দিচ্ছে। হীরালাল কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সামনে হাঁটে, হোঁচট খায়। হাত বাড়িয়ে থমকে যায়। অন্ধকার-দানবটা যেন তার কেলোকিষ্টি মুখখানা ভয়ংকর হাঁ করে হীরালালকে কামড়ে ধরেছে। হীরালালের দম আটকে আসছে। এখানে এখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। এখানে কি হীরালালের সব শেষ হয়ে যাবে?

চমকে উঠল হীরালাল। হঠাৎ তার কানে ভেসে এল ভাঙা বাড়ির দূর অন্দর থেকে সেই ডাক, "হী-রা-লা-ল!"

এবার হীরালাল আর থাকতে পারল না। চিৎকার করে জিগ্যেস করলে, "কোথায় তুমি?"

সে বললে, "এইদিকে।"

হীরালাল বললে, "আমি দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে অন্ধকার।"

সে বললে, "এগিয়ে এসো।"

হীরালাল বুঝতে পারে না কোন্‌দিকে এগিয়ে যাবে সে। ভারী রাগ ধরছে তার। কেন এমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে বার বার ডাকছে সে। না, তাকে হীরালাল খুঁজে বার করবেই। তাকে জিজ্ঞেস করবে এই লুকোচুরি খেলার মানে কী! তাই অন্ধকারেই থমকে-থমকে পা ফেললে সে, আর কানামাছির মতো হাত ছড়িয়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এ কী! আর কতদূরে যাবে সে! যতই এগোয় এ যে শেষ নেই। কত বড় বাড়িটা! এ কি বাড়ি না প্রাসাদ! হয়তো তাই। হয়তো নাম-না-জানা কোনো এক রাজার প্রাসাদ ছিল এককালে এই পোড়ো-বাড়ি! হয়তো—

হুস-স-স্। হীরালালের গায়ের ওপর দিয়ে যেন ঝটকা মেরে এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল! থমকে যায় হীরালাল। এই অন্ধ আর বন্ধ ঘরে হাওয়া কোত্থেকে আসে! হীরালাল চকিতে নিজেকে সামলে নিলে। কিন্তু তারপরেই তার যেন মনে হল, হাওয়ার মতো উড়তে উড়তে আবছা কালো ছায়ারা তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। হীরলাল ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললে।

তবে কি এই ছায়ারাই তাকে ডাকছিল! এ-কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হীরালালের চোখের পাতা দুটি আপনা থেকেই খুলে গেল। চোখ খুলেই হীরালাল ভয়ে আঁতকে ওঠে! এ কী! এ যে চারিদিক থেকে অন্ধকারের ঢেউ যেন পাক খেতে খেতে তার দিকে তেড়ে আসছে! এখন কী করবে হীরালাল! ভয়ে পালাতে গেল হীরালাল। ছুট দিল সে! কিন্তু কোথায় ছুটল, কোন্‌দিকে পালাবে কিছুই ঠাওর করতে পারল না যে! অন্ধকার, অন্ধকার! চারিদিকে শুধু অন্ধকারের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে কুণ্ডুলি পাকাচ্ছে। তারপরেই, ওই তো হীরালালের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! কী ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল হীরালাল! তা সেই চিৎকার পোড়োবাড়ির দেওয়ালে-ছাতে, ঘরে-উঠোনে প্রতিধ্বনিত হয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু কেউ তার সেই চিৎকারে সাড়া দিল না। কেউ তাকে বাঁচাতে এল না। তখন হীরালাল একাই লড়াই শুরু করে দিলে সেই অন্ধকারের সঙ্গে।

কিন্তু কতক্ষণ পারবে হীরালাল একা একা! ও তো ছোট্ট! অন্ধকারের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হীরালাল। ওর মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছিল। নিস্তেজ হয়ে চোখের পাতা দুটি যেন বুজে আসছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে হীরালালের। হ্যাঁ, ওই তো! অন্ধকার পোড়ো-বাড়ির টুটা-ফাটা মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল হীরালাল। তারপর আর কিছু জানে না হীরালাল।

অনেক পরে হঠাৎ চমকে চোখ মেলেছিল হীরালাল। আশ্চর্য!

তখন এতটুকু অন্ধকার ছিল না। রাশি রাশি সোনালি রঙিন আলো ওর চোখের তারা দুটির ওপর উছলে পড়েছে। ঝলসে গেল হীরালালের চোখ দুটি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কই, সেই পোড়োবাড়ি কোথায় গেল? সে তো দেখতে পাচ্ছে না। এ যে এক সুন্দর রঙে রঙে রঙ-ছবি আলোর দেশ। চেয়ে দ্যাখো, চারিদিকে যেন সোনার ঝকমকি গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে। আলোদের টুপ-টাপ রোশনাই। বাজনার টুং টাং ছন্দ। আঃ! কী মিষ্টি লাগছে হীরালালের। ও কী! আলোর স্রোতে ও কাদের গান শোনা যায়? দ্যাখো, দ্যাখো, কত ফুল! না, না, ফুল না। ফুলের পাপড়ি সাজিয়ে তবে ওরা কারা? আহা! ছোট্ট ছোট্ট কত মেয়ে। পাখির পিঠে বসে আছে। পাখিরা উড়ছে আর ওরা কেমন গান গাইতে গাইতে আলোর স্রোতে ভাসছে! সেই আলো দেখতে দেখতে, সেই গান শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেল হীরালাল। ভাবল, এমন গান তো সে কোনোদিন শোনেনি। এমন ফুল-পাপড়ি মেয়ের দলকে তো সে কোনোদিন পাখির পিঠে উড়তে দেখেনি!

দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে গেল হীরালালের। তার মনের ভাবনাগুলি মন থেকে কাথায় যেন সরে গেল ধীরে ধীরে। ভুলে গেল হীরালাল। সব ভুলে গেল। ওই আলোর দোলনায় দোল খেতে খেতে নিজেকে হারিয়ে ফেললে হীরালাল।

"হীরালাল, কেমন লাগছে?"

বুকের ভেতরটা চমকে উঠল হীরালালের। এ কী! এখানেও সেই মেয়েটি! সে আবার ডাকছে! কিন্তু কই সে?

হীরালালকে কথা বলতে না দেখে, সে আবার জিজ্ঞেস করলে, "বলছ না, কেমন লাগছে?"

হীরালাল উত্তর দিলে না।

সে আদর করে বললে, "তোমার ভাল লাগলে, আমারও ভাল লাগবে, হীরালাল।"

এবার হীরালাল থাকতে পারল না। এবার হীরালালও কথা কইল। জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? আমার সঙ্গে তখন থেকে তুমি লুকোচুরি খেলছ?"

সে বলল, "ভাল লাগছে না?"

"না, একটুও না। তুমি আমায় দেখা দিচ্ছ না কেন?"

"এই তো, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে!"

"কই?"

"এই তো!"

হীরালাল চরকি খেয়ে চিৎকার করে উঠল, "কই? কই? কই?"

হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে উঠল। কী জানি, কী ছিল হাসিতে, কী জাদু, সঙ্গে সঙ্গে সেই গান থেমে গেল! সেই পাখি উড়ে গেল। সেই আলো নিবে গেল।

হীরালাল আবার হারিয়ে গেল অন্ধকারে। অন্ধকারে দু হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, "আলো জ্বালাও।"

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। হীরালালের চিৎকারের শব্দটা অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে খেতে নিথর হয়ে হারিয়ে গেল। হীরালাল এবার ছুটতে গেল অন্ধকারে। ঠোক্কর খেল। অন্ধকারে এলোমেলো পা ফেলতে ফেলতে হাঁপিয়ে গেল!

এমন সময়ে,

গুড়ুম-ম-ম!

হঠাৎ বন্দুক ছুঁড়ল কে?

আবার,

গুড়ুম-ম-ম!

লাগেনি। হীরালাল বসে পড়েছে। কিন্তু ব্যাপার কী! সেই তিনজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়েছে নাকি! এই রে! এখন তো তবে হীরালালের আর নিস্তার নেই!

গুড়ুম-ম-ম!

এবার হীরালাল স্পষ্ট দেখতে পেল, বন্দুকের নল থেকে আলোর ফুলকি ছুটতে ছুটতে দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা মেরে হারিয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই খট-মট-খট-খট। একসঙ্গে পায়ে চলার শব্দ।

ওই তারা আসছে। এদিকেই আসছে।

অন্ধকারের গভীরে, আরও গভীরে গা ঢাকা দিলে হীরালাল।

কিন্তু পারল না। ওদের হাতে আলো। হঠাৎ ঝলসে উঠে অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল সেই আলোর রোশনাই। ছড়িয়ে পড়ল একেবারে হীরালালের মুখের ওপর। হীরালাল থতমত খেয়ে গেছে। দেখতে পেয়েছে তারা হীরালালকে। একজন চিৎকার করে উঠল, "উধার কৌন হ্যায়?"

উত্তর না দিয়ে হীরালাল আগু-পিছু কিছু না ভেবে আচমকা পিছনদিকে ছুটতে শুরু করে দিল। পাঁই-পাঁই করে ছুটছে সে সেই পোড়ো-বাড়িটার অন্দরে!

তারা আবার হাঁক পাড়লে, "রোখ যা।"

হীরালাল থামল না।

তখন তারাও ছুটল হীরালালের পেছনে। অন্ধকারে আলো ফেলে, বন্দুক উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "না দাঁড়ালে গুলি মেরে দেব।"

সে-কথা শুনল না হীরালাল। সে ছুটছে। ছুটছে কিন্তু পালাবার পথ পাচ্ছে না। যতই অন্দরে সে ঢুকে পড়ছে, ততই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শেষে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না পাশটা, পেছনটা, সামনেটা। এই রে! গর্তে পা পড়ে গেছে হীরালালের। হীরালাল হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়েছে। উঃ, ভয়ানক লেগেছে। লাগুক। তাকে উঠতেই হবে। না, পারল না। ওই তারা ছুটে এসেছে দুড়দাড়িয়ে। ওঠার আগেই হীরালালকে ওরা পাকড়াও করে ফেললে। হীরালাল ভয়ে কুঁচকে গেল। হীরালাল এখন স্পষ্ট দেখতে পেল, এ-লোকগুলো তারা নয়। এরা আর একদল সৈনিক।

এখনও হাঁপাচ্ছে হীরালাল। এই সৈনিকদের একজন হীরালালের ঘাড় ধরে টেনে তুললে। কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠল, "এই ছেলে, এখানে কী করছিস?"

হীরালাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আবার কড়কে উঠল, "কথা বলছিস না কেন?"

তবু হীরালাল চুপ করে রইল।

একজন জিজ্ঞেস করল, "এদিকে তিনজন সৈনিককে আসতে দেখেছিস?'

হীরালাল চুপচাপ।

"কথা বলবি না? এই, গুলি চালা!" একজন হুকুম করলে।

আঁতকে উঠল হীরালাল। ওর বুকের ওপর বন্দুকের নল!

হীরালাল কথা বললে। বললে, "অন্ধকারে হারিয়ে গেছি।"

"কে তুই?"

"হীরালাল।"

"এই পোড়ো-বাড়ির অন্ধকারে কী করছিস?"

"বললুম তো, হারিয়ে গেছি।"

"এখানে আমাদের মতো তিনজন সৈনিককে আসতে দেখেছিস?"

হীরালাল আবার চুপ করে গেল।

"তারা যুদ্ধের ভয়ে আমাদের দল ছেড়ে পালাচ্ছে।"

হীরালাল এবারও চুপ।

"তাদের সন্ধান বলতে পারলে তোকে মেডেল দেব," একজন লোভ দেখাল হীরালালকে।

তবুও হীরালাল কথা বলল না।

তখন একজন ভীষণ চেঁচিয়ে ধমক মারলে, "বল দেখেছিস কি না?"

হীরালাল কিছুই বলল না।

বলল না বলে তো আর সৈনিক শুনবে না। তারা হীরালালকে ছাড়বে কেন? তারা হীরালালকে হ্যাঁচকা মেরে টান দিলে। হীরালাল টলতে টলতে চলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।"

হীরালালের কথা তারা শুনল না। তারা ছাড়ল না হীরালালকে। ওরা সৈনিক। ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অত সহজ না তো!

সৈনিক-সর্দার হুকুম করলে, "ছেলেটাকে অন্ধকারের বন্ধ-ঘরে আটকে রাখ। না বললে ছাড়ান নেই।"

অন্ধকারে বন্ধ-ঘর কোথায়, তারা খুঁজে পেল না।

তখন সৈনিক-সর্দার বললে, "তবে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে রেখে দে!"

হীরালালের হাত-পা বাঁধা হল। কিন্তু তবুও হীরালালের মুখ দিয়ে একটিও কথা সরল না। হাত-পা বেঁধে, হীরালালকে অন্ধকারে ফেলে রেখে, তারা যেমন করে এসেছিল তেমনি করে চলে গেল। কিন্তু কোথায় যে চলে গেল হীরালাল দেখতে পেল না।

এবার হীরালাল কী করবে? এখন সত্যিই সে এক ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়েছে। এখন, এই অন্ধকারে তাকে না বাঘ-ভালুকের পেটে যেতে হয়! বলা যায় না, বাঘ-ভাল্লুক বাসা বাঁধতেও পারে ঐখানে! কি সাপ-খোপ!

অন্ধকারে ভয়ঙ্কর ভয়টা যখন তার বুকের ওপর চেপে বসছে, তখন হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। উঠে দাঁড়ালও সে। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে! পা টানছে সে। হাঁটবে। বাঁধা পায়ে ঘসটানি লাগছে। ঘসতে ঘসতে হাঁটল। কিন্তু কোনদিকে যাচ্ছে হীরালাল? জানে না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে চারিদিক থেকে যেন জমাট অন্ধকারটা নিশ্বাস ফেলছে। সত্যিই তাই! ওই শুনতে পাচ্ছ না, নিশ্বাস ফেলে কে যেন হাঁসফাঁস করছে।

থমকে গেল হীরালাল। কে ও! ও কার চোখ! অন্ধকারে দপদপ করে জ্বলছে। এগিয়ে আসছে সে ধীরে ধীরে হীরালালের দিকে।

হীরালাল ভয়ে কাঠের মতো স্থির হয়ে গেল। অমনি তার শ্যাওলা-পড়া দাঁতগুলো অন্ধকারে ছরকুট্টে ভেংচি কেটে উঠল। হীরালাল ভয়ে ককিয়ে উঠল, "বাঁচাও।"

হীরালালের সুরে সুর মিলিয়ে কেমন যেন একটা হাসি, কিংবা একটা আর্তনাদ, অথবা একটা কান্না সেই অন্ধকারে কান-ফাটানো শব্দে ঘুরপাক খেতে লাগল। হীরালাল ভয়ে ছুটে পালাতে গেল। ভুলে গেল তার হাত-পা বাঁধা। ছিটকে পড়ল একেবারে মাটির ওপর। তড়িঘড়ি উঠতে যাবে কী, দেখে তার মুখের সামনে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে। দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কে ও! ওই হাত দুটো খামচে ধরলে হীরালালকে। হীরালাল চেঁচাতে গেল, পারল না। ওর গলার স্বর যেন কে কেড়ে নিল! কাঁপতে লাগল হীরালাল ঠক-ঠক করে। ভয়ে নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল!

৪

অনেকক্ষণ পর, ঠিক কতক্ষণ হীরালাল ঠিক মনে করতে পারছে না, হীরালালের কানে কানে সেই মিষ্টি সুরে সে যেন আবার ডাক দিয়েছিল, "হীরালাল, ও হীরালাল, উঠে পড়ো।"

চমকে উঠেছিল হীরালাল। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি হীরালাল! চোখ দুটি চাইতেই অবাক হয়ে গেল সে! এ কী! এ কোথায় এসেছে হীরালাল! কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে! এ তো সেই বন নয়! এখানে কোথায় সে বনের পোড়ো-বাড়ি! অন্ধকার পেরিয়ে ও আলোয় এসেছে কেমন করে! এখানে তো মেলার হুড়োহুড়ি, কত লোকজন! কত দোকান-পসার! দাঁড়াল হীরালাল। ভিড়ের মধ্যে পা চালাল। বেবাক হয়ে এদিক-ওদিক চোখ ফেরাল। না, এ মেলা তো সে কোনোদিন দেখেনি! এ মেলাতে সে তো কোনোদিন আসেনি! কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে! আজব কান্ড! সে কি স্বপ্ন দেখছে!

না, স্বপ্ন না। যা দেখছে সব সত্যি! এই মেলা। মেলার মিষ্টি-খাবার, মুড়কি-মুড়ি, আলুর বড়া, জিবে-গজা, রঙিন জামা, জুতো-মোজা, খেলনা-পুতুল, চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা সব সত্যি! ভিড়ের মাঝ দিয়ে হাঁটে হীরালাল। ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে হাঁটে। কেউ ঠেলা মারে, কেউ পা মাড়ায়। কেউ চেয়ে দেখে, কেউ চোখ টেরায়। হীরালাল দেখছে আর ভাবছে, তাই তো! এই ছিল বন, হয়ে গেল মেলা! কোথায় গেল সেই পোড়ো-বাড়ি!

এখন কী করবে হীরালাল! ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোন্ দিকে যাবে!

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল হীরালাল। কারা যেন ওই-দিকে একসঙ্গে হাততালি দিচ্ছে। মেলার ওইদিকে ওটা কিসের ভিড়! এগিয়ে গেল হীরালাল। ভিড়ের মধ্যে উঁকি মারল। আরে! ম্যাজিক হচ্ছে। একটা লোক ম্যাজিক দেখাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, "লেড়কা-লোক এক দফে তালি লাগাও।"

হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখছে, অনেক ছোট, অনেক বড়, অনেক লোক। তারা যেই হাততালি দিচ্ছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে শূন্য ঝুড়ি থেকে পায়রা বেরুচ্ছে। আবার পায়রা হুস করে উবে যাচ্ছে। ঝুড়ি-চাপা শুকনো মাটিতে গাছ গজাচ্ছে। ছোট্ট গাছে আম ফলছে, সেই আম কেটে কেটে সবাইকে খেতে দিচ্ছে ম্যাজিকঅলা। সবাই খাচ্ছে আর অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

দেখতে দেখতে হীরালালও অবাক হয়ে গেল। ভারী মজার কান্ড তো!

অনেকক্ষণ খেলা চলল। অনেক খেলার পর অনেক পয়সা। যখন ম্যাজিকঅলার থলি ভরে গেল, তখন খেল খতম। খেল খতম মানেই মজা শেষ। মজা শেষ মানে, ভিড়-ভাট্টা হালকা। লোকজন সব একটি একটি কাট্টা। তারপর সেই জম-জমাট জায়গাটা এক্কেবারে ফাঁকা!

হল কী, সব্বাই যখন চলে গেল, ম্যাজিকঅলা পুঁটলি বাঁধল। সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে নিল। ঘর যাবে বলে পা বাড়াল। ঠিক তখুনি হীরালালের দিকে তার নজর পড়ল।

হ্যাঁ, ওই তো হীরালাল একা চুপটি করে বসে আছে, একটু দূরে। এক মনে দেখছে ম্যাজিকঅলাকে। দেখছে, তার মাথায় টুপি। লম্বা। গায়ে জামা। ইয়া ঢাম্পুস। জামার এদিকে পকেট, ওদিকে পকেট। জামার হাতার ভেতর হাতা। লোকটার বুকভর্তি মেডেল। হীরালালের মনে হল, লোকটার চেয়ে জামাতেই যেন বেশি রহস্য! জামাটাই যেন একটা ম্যাজিক। আহা! ওই ম্যাজিক যদি হীরালালের জানা থাকত!

লোকটার চোখে চোখ পড়তেই হীরালাল থতমত খেয়ে গেছে। কেননা, সে যে হীরালালের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে! সত্যি! তার হাসিতেও কেমন যেন ম্যাজিক-ম্যাজিক গন্ধ! হীরালাল চোখ না ফিরিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। লোকটা এগিয়ে এল। হীরালালের সামনে এসে দাঁড়াল। হীরালাল কথাই বলল না। হঠাৎ লোকটাই কথা বললে, "আরে খোঁকা, খেলা তো শেষ হয়ে গেল, ঘোরে যাবে না?"

হীরালাল ও কথার জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলে, "মন্ত্র পড়ে তুমি ম্যাজিক করো?"

লোকটা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, মনতর ভি আছে, কায়দা ভি আছে।"

"তুমি আমায় ম্যাজিকের মন্ত্র শিখিয়ে দেবে?" জিগ্যেস করল হীরালাল।

ম্যাজিকঅলা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, "কেনো? মনতর শিখে তোমহি কী করবে?"

"আমি অদৃশ্য হয়ে যাব। অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানো তুমি?"

ম্যাজিকঅলা এতক্ষণ হাসছিল। হীরালালের কথা শুনে হঠাৎ যেন মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে গেল। হীরালালের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "অদৃশ্য কেনো হোবে?"

হীরালাল উত্তর দিলে, "কারণ আছে।"

"কী কারণ?" জিজ্ঞেস করলে ম্যাজিকঅলা।

হীরালাল ও কথার উত্তর না দিয়ে, বিরক্ত হয়েই বললে, "তুমি অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে দিতে পারবে কিনা তাই বল!"

ম্যাজিকঅলা হীরালালের কথার ওপর আর কোনো কথা বলল না। শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে-সময় ম্যাজিকঅলার চোখ দুটো দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, তার মতলবটা কী! হীরালালকে দেখে তার ঠিক মনে হয়েছে, হয় ছেলেটা ঘর থেকে পালিয়েছে, না-হয় পথ হারিয়েছে। ছেলেটা বাচ্চা, একবার যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে দলে নিতে পারে, তবে ভাল করে ফয়দা ওঠাবে।

"আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কী দেখছ?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল হীরালাল।

ম্যাজিকঅলা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "না, বলছি, তোমহার নাম কী আছে?"

"হীরালাল।"

"ঘর?"

"ঘর আছে, মা আছে। এখন নেই। কে একজন মেয়ে আড়াল থেকে বার বার আমায় ডাক দিচ্ছে। ডাকতে ডাকতে আমায় ঘোরাচ্ছে। কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। তাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি এখানে চলে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে, সে বোধহয় অদৃশ্য। সে-ও বোধহয় ম্যাজিক জানে। কিন্তু জানো, এত মিষ্টি তার গলার স্বর। আমি না, তার ডাক শুনলে থাকতে পারি না। আমিও অদৃশ্য না হলে বোধহয় তাকে দেখতে পাব না। তাই জিজ্ঞেস করছি, তুমিও অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানো কি না!"

ম্যাজিকঅলা হীরালালের কথা শুনে হয়তো অবাক হল। হয়তো বা ভয় পেল। কিন্তু তার মুখ দেখে সে-কথা বোঝার উপায় ছিল না। তবে তার মাথায় যে অন্য একটা মতলব দানা বেঁধেছে, সে তার চোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তাই সে চট করে বলল, "অদৃশ্য কোরার মোনতর তো হামি জানে হীরালাল। লেকিন অদৃশ্য হোবার আগে তোমহাকে তো ট্রেনিং লিতে হোবে।"

"সেটা কী?" জিজ্ঞেস করল হীরালাল।

"ম্যাজিক তো তোমহাকে শিখতে হোবে।"

"সে আর এমন কী কথা!"

ম্যাজিকঅলা এবার মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললে, "কোথা আছে হীরালাল। সাতদিন তোমহাকে ভি হামার সাথে খেলা দেখাতে হোবে।"

"সাতদিন?" ভাবনা হল হীরালালের। জিজ্ঞেস করলে, "বাড়ি যাব না?"

ম্যাজিকঅলা বললে, "সেই তো কোথা। বাড়ি ভি যাবে, আউর অদৃশ্য ভি হোবে, দোনো তো এক সাথে হোবে না। আগে শোচো ভাই, ঘর যাবে, না ম্যাজিক শিখবে।"

হীরালাল এখন সত্যিই খুব দোটানার মধ্যে পড়ল। কিন্তু দোটানার মধ্যে পড়লেও, এখন অদৃশ্য হবার ইচ্ছেটাই তাকে বেশি টানছে। কারণ ও ভাবল অদৃশ্য হলেই বুঝি সে তাকে খুঁজে পাবে। সেই মেয়েটিকে, যে তাকে বার বার ডাকছে অথচ দেখা দিচ্ছে না। তাই আর দোনা-মোনা না করে হীরালাল বললে, "বেশ, আমি তোমার কথায় রাজি।"

হীরালালের কথা শুনে ম্যাজিকঅলার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। তাড়াতাড়ি হীরালালের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, "তোবে চোলো।"

"কোথায়?"

"হামার ঘর।"

"কত দূর?"

"যাদা নেহি।"

"চলো তবে।" হীরালাল ম্যাজিকঅলার সঙ্গে হাঁটা দিলে।

ঈশ্‌, বাবা! ম্যাজিকঅলার ঘরটা একেবারে যা-তা! বিচ্ছিরি নোংরা চিরকুট একটা বিছানা। একপাশে গোটানো। একদিকে হাঁড়ি আর কটা এঁটো বাসন। ম্যাজিকের সাজ-সরঞ্জাম বলতে

কিছু নেই। আর ভেতরটায় একটা গা-ঘিনঘিন বোঁটকাগন্ধ। হীরালাল ঘরে ঢুকেই নাক সিঁটিয়ে বলে উঠল, "এই তোমার ঘর?"

"হ্যাঁ, হামার ঘর।"

"এখানে সাতদিন আমায় থাকতে হবে?"

"থাকতে হোবে, খেলা ভি শিখতে হোবে।"

হঠাৎ হীরালাল চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এখানে আমি থাকতে পারব না। থুঃ!"

"মানে?"

"মানে, তোমার ঘরটা নোংরা। বিচ্ছিরি গন্ধ। ইঁদুরের গর্ত। এখানে মানুষ থাকতে পারে?" চিৎকার করেই কথাটা বলে হীরালাল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

ম্যাজিকঅলা চক্ষের নিমেষে ছুটে গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিলে।

"দরজা বন্ধ করছ কেন?" বেশ ব্যস্ত হয়েই হীরালাল জিজ্ঞেস করলে।

এবার ম্যাজিকঅলা নিজমূর্তি ধরলে। টেরা-চোখে তাকাল হীরালালের দিকে। টেরা-চোখে তাকিয়ে বেঁকা সুরে বললে, "দরোয়াজা হামি আর খুলবে না।" বলে হো-হো-হো করে হেসে উঠল। সে হাসিতে শয়তানির নিশ্বাস ছড়ানো।

হাসি শুনে বুকের ভেতরটা কেমন যেন চমকে উঠল। তবু সাহসে বুক উঁচিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "কেন খুলবে না?"

লোকটা এবার হীরালালের কথার উত্তর না দিয়ে, দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে আগের চেয়েও আরও জোরে হেসে উঠল, হা-হা-হা!

চেঁচিয়ে উঠল হীরালাল, "দরজা খুলে দাও!" বলে লোকটার জামা ধরে টানাটানি লাগিয়ে দিলে।

লোকটা হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে চোখ পাকিয়ে ধমক মারলে, "এ লেড়কা, হল্লাগুল্লা করো মাত। হল্লা কোরলে জিব ছিঁড়ে লিবো। দরোয়াজা আউর নেহি খুলবে। ঘরকা অন্দর মে তুম বন্ধ থাকবে।"

এবার সত্যি সত্যি কান্না পেয়ে গেল হীরালালের। লোকটা যে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরে এনেছে, এবার বুঝতে পেরেছে হীরালাল। তক্ষুনি মায়ের কথা মনে পড়ে গেল হীরালালের। এখন কী করে সে মায়ের কাছে যাবে! কান্না পেলেও হীরালাল সামলে নিল। এখন কাঁদলেও এই লোকটার হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না। কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। বাঁচতে তাকে নিজেকেই হবে। কিন্তু কী করে যে বাঁচবে, সে তো জানে না। কারণ ও ছোট্ট। এই ধুমসো লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা তো সহজ কথা নয়।

তাই কী যে করবে হীরালাল ভেবে পাচ্ছিল না। ভাবতে ভাবতে মনটা যখন তার ভীষণ ছটফট করছিল, তখনই ওই ম্যাজিকঅলা লোকটা একটা কান্ড করে বসল। বলা নেই, কওয়া নেই, করল কী, হীরালালের ঘাড়টা খপাত করে খামচে ধরলে। হীরালাল তো প্রথমটা ভড়কে যাবেই। তারপর চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই দেখি কী, হীরালাল ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠেছে। চিৎকার করে সটান লোকটার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছোটই হোক কি বড়ই হোক আচমকা কেউ যদি কারও ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ধাক্কা মারে, তবে সে যত বড়ই পাট্টা হোক নির্ঘাত চিৎপটাং! হলও তাই। ধাক্কা খেয়ে ম্যাজিকঅলা মেরেছে এক ডিগবাজি! ডিগবাজি মেরেই মেঝের ওপর লটকা-লটকি। তাই দেখে হীরালাল ছুটে গিয়ে দরজার খিলে মেরেছে ধাক্কা। ধাঁই-ই-ই করে খিল ছিটকে খুলে পড়ল। দরজা খুলেই মার ছুট!

না, পারল না হীরালাল। চৌকাঠ ডিঙিয়ে একটা পা বাইরে ফেলেছে মাত্তর, ব্যস! তার আগেই ম্যাজিকঅলা লোকটা উঠে পড়েছে। কিছু না পেয়ে হীরালালের জামাটাই খপ করে ধরে ফেলেছে। ধরেই মেরেছে এক টান। টানের জোরে টাল খেতে খেতে মারল গিয়ে দেওয়ালে এক ধাক্কা। উঃ! কপালে ভীষণ লেগেছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাজিকঅলার চোখের দিকে তাকিয়েই হীরালাল জুজুবুড়ি! কী সাংঘাতিক দেখতে লাগছে ম্যাজিকঅলাকে! কী বীভৎস তার মুখখানা! চোখ দুটো রাগে টকটক করছে! সারা শরীর তার ঠকঠক করে কাঁপছে। তার ঠোঁটটা বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াচ্ছে! হঠাৎ সে তার ডান হাতটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে ফুঁ মারলে। মেরে, বিকট একটা চিৎকার করে, হাতের মুঠি খুলে হীরালালের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলে। হীরালালের গায়ের ওপর যেন বাজ পড়ল। হীরালাল "ও মা" বলে ককিয়ে উঠেই ধপাস করে মাটিতে পড়ে ছটফটাতে লাগল! হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে হীরালালের হাত-পা নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। চোখের পাতা দুটিও বুজে গেছে।

শুনলে অবাক হবে, অনেকক্ষণ পর হীরালাল যখন উঠে বসল, তখন সে একেবারে অন্য মানুষ! সে দেখছে ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক-ওদিক চারপাশ। এই ঘরটা, ওই ম্যাজিকঅলা লোকটা, সব যেন তার কত চেনা! হীরালালের মুখের দিকে তাকাও, তোমার মনে হবে, হীরালাল আর সে হীরালাল নেই! কে যেন ওকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। ভুলিয়ে দিয়েছে তার মাকে, লক্ষ্মী তার মোষকে। আর মনে পড়ে না তার ছোট্ট তাদের ঘরখানির কথা। কিংবা মাঠের গান, নদীর ঢেউ আর ঢেউয়ের সঙ্গে দুলতে দুলতে হারিয়ে যাওয়া।

সত্যি সত্যি হারিয়ে গেল হীরালাল। হবেও-বা, ম্যাজিকঅলার ওই মুঠোর মধ্যে হীরালালকে সব ভোলাবার মন্ত্র ছিল। হয়তো হীরালালকে সম্মোহন করে দিয়েছে লোকটা। তাই হীরালাল সব ভুলেছে!

ম্যাজিকঅলা এতক্ষণ হীরালালের সামনেই ছিল। হীরালাল উঠে বসতেই ম্যাজিকঅলা হাত নেড়ে ইশারা করল। ম্যাজিক-অলার চাউনিটা কেমন শয়তানিতে ভরা দ্যাখো! দেখলেই তোমার বুক দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠবে! হঠাৎ লোকটা গলায় এক ভয়ঙ্কর শব্দ করে হীরালালকে জিজ্ঞেস করলে, "এ খোঁকা, বোলো তো তোমহার নাম কী আছে?"

কে জানে কেন, হীরালাল কোনো উত্তর দিল না। শুধু বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

ম্যাজিকঅলা আবার জিগ্যেস করল, "কী নাম?"

হীরালালের মুখে কথা নেই। থাকবেই বা কেমন করে! হীরালাল নিজেকে যেমন ভুলেছে, নিজের নামটাও তো তেমন ভুলে গেছে।

ম্যাজিকঅলা এবার হীরালালের চোখের ওপর চোখ রাখলে। কী ভয়ঙ্কর সে চাউনি! তারপর খুব চাপা গলায় বললে, "তোমহার নাম কাকাতুয়া!"

তবুও হীরালাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"বোলো, কাকাতুয়া। বোলো!"

এবার হীরালাল ধরা-ধরা গলায় বললে, "কাকাতুয়া।"

"বহুত আচ্ছা।" লোকটা হীরালালের চিবুকটা ধরে আদর করলে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলে, "আউর হামার নাম? হামার নাম, উস্তাদ। বোলো উস্তাদ।"

হীরালাল তেমনি ধরা-গলায় বললে, "উস্তাদ।"

"শাবাশ!"

ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে ম্যাজিকঅলারা থেকে থেকে যেমন করে চেঁচিয়ে ওঠে, এবার তেমনি চিৎকার করে লোকটা

হীরালালকে নতুন নামে ডাক দিল, "এ কাকাতুয়া।"
যেমন করে ম্যাজিকঅলা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ঠিক তেমনি চেঁচিয়ে হীরালাল উত্তর দিলে, "উস্তাদ!"
"তোমহি এখন কী দেখাবে?"
"আমি এখন খেলা দেখাব।"
"কোন্ খেলা দেখাবে?"
"ম্যাজিক খেলা।"
এবার ম্যাজিকঅলা হীরালালের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললে, "বহুত খুব।"

তারপর কটা দিন কেটে গেল। ক'দিনে কটা নতুন খেলা শিখে ফেলল হীরালাল। নতুন খেলা শিখতে শিখতে হীরালালের আর এক নতুন জীবন শুরু হয়ে গেল। এখন সে ম্যাজিকঅলার সাকরেদ। আর আজই প্রথম সাকরেদি করতে গিয়ে হীরালাল আর এক বিপদের হাতছানি দেখতে পেল!

হীরালালকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় খেলা দেখাতে যে ম্যাজিকঅলার দস্তুরমতো ভয় ছিল, সে তো জানা কথা। কেননা, রাস্তা-ঘাটে হীরালালকে কেউ যদি চিনে ফেলে, তা হলে যে কী হবে, সে-কথা কী আর ম্যাজিকঅলাকে বলে দিতে হবে। মারের চোটে বাছাধনের বদন বিগড়ে তো দেবেই, তার ওপর পুলিস ডাকবে, নাকে দড়ি দিয়ে খাটাবে, লোকে ছ্যা-ছ্যা করবে। ম্যাজিক খেলা লাটে উঠবে। তাই ম্যাজিকঅলা আজ আর তেমন কোনো দূরে, অজানা জায়গায় ম্যাজিক দেখাতে গেল না। কাছে-পিঠে একটা ছোট্ট মাঠের ওপর ডুগডুগি বাজিয়ে দিলে। বাজিয়ে বাজিয়ে হাঁকতে লাগল:

"মাদারি কা খেল দেখো,
মাদারি কা খেল।
আজব খোঁকার খেল দেখো,
হরেক মজার খেল।"

রোজ যেমন করে, আজও তেমনি হীরালাল ডুগডুগির তালে তালে ম্যাজিকের মাল-পত্তর বাঁধাই-করা ঝোলাঝুলি খুলে ফেললে। একদিকে একটা মড়ার মাথা সাজিয়ে রাখলে আর একদিকে সাত-সতেরো জিনিস ছড়িয়ে রাখলে। দেখতে দেখতে কত লোক। চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর শুরু হয়ে গেল, খেলার মজা, মজার খেলা! লোকটা ডুগডুগি বাজায়, আর মাঝে মাঝে হাঁক দেয়, "কাকাতুয়া!"

হীরালাল সাড়া দেয়, "উস্তাদ!"
"তুমহার ভুক লেগেছে?"
"হ্যাঁ, উস্তাদ!"
"তো কী খাবে?"
"বাদাম খাব।"
"বাদাম?"
"হ্যাঁ, উস্তাদ!"

সেই কথা শুনে তখন ম্যাজিকঅলা সামনে যারা খেলা দেখছিল, তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভান করলে। বললে, "দেখেন সার, কাকাতুয়া এখোন বাদাম খানে মাংতা। বোলেন তো, আমি এখোন বাদাম কিধার পাব! আচ্ছা, ঠিক হ্যায়। চেষ্টা তো করতে হোবে," বলে ম্যাজিকঅলা একটা খালি কৌটো নিয়ে খুলে-খালে সবাইকে দেখাল। চেঁচালে, "দেখেন বাবুরা, এর ভেতর কুছ না আছে— দেখিয়ে স্যার, আভি আভি বাদাম এসে যাবে।" বলেই ম্যাজিকঅলা কৌটোর ওপরে চাপা দিয়ে কৌটোটা বন্ধ করে দিলে। তারপর হাঁক পাড়লে, "লেড়কালোক, একদফে জোরসে তালি লাগাও!"

অমনি চটপট, চটাপট চারদিক থেকে তালি পড়ল। ম্যাজিক-অলা চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী সব মন্তর আওড়ালে, কেউ শুনতে পেল না। তারপর চোখ খুলে, কৌটোটা নেড়ে দিল। চিৎকার করে কৌটোটা খুলে ফেলতেই, ওই দ্যাখো, কৌটো-ভর্তি বাদাম!

"কাকাতুয়া!" কৌটো খুলে আবার সে হীরালালকে ডাক দিলে।
হীরালাল তেমনি করেই সাড়া দেয়, "উস্তাদ!"
"বাদাম খা লেও!"
"না উস্তাদ, বাবুলোকদের দিয়ে দাও।"
"বহুত আচ্ছা।" বলে, ম্যাজিকঅলা কৌটো থেকে বাদাম বার করে, সেই বাদাম ছেলে-বুড়ো যারা খেলা দেখছিল সবাইকে বিলিয়ে দিলে।

দ্যাখো, দ্যাখো, ওই তিনটে লোককে যেন চেনা লাগছে! তাই তো, লোকগুলোর যে গাল-ভর্তি দাড়ি! কোথায় যেন দেখেছি!

আরে, আরে! এ যে সেই তিনজন সৈনিক। সেই যে, বনের সেই পোড়ো-বাড়িটার ভেতর পালিয়ে এসে, লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের পোশাক ফেলে, ছদ্মবেশে সেজে আছে! হ্যাঁ, তাই তো! তারাও যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখছে। ওই তো! হাত বাড়িয়ে বাদাম নিচ্ছে! কুচমুচ করে চিবুচ্ছে! না, হীরালাল এখন আর তাদের মনে করতে পারবে না। কেননা, হীরালাল তো এখন আর হীরালাল নেই। এখন তো ও সব ভুলে গেছে! ও তো এখন কাকাতুয়া!

"কাকাতুয়া!" আবার লোকটা ডাক দিলে।
"উস্তাদ!"
"এখোন কী খেলা দেখাবে?"

"জ্যোতিষ-খেলা।"

"শাবাশ!" ম্যাজিকঅলা হীরালালের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলে। তারপর চেঁচিয়ে চারপাশের লোকদের বললে, "হাঁ স্যার, এ-খেলাটা বহুত কড়া খেলা। দেখিয়ে বাবু, হামার এই সাকরেদ আভি আভি আপনাদের জ্যোতিষকা খেলা দেখাবে। আপনাদের ভাগ্যমে কী আছে, আভি আভি আপনাদের মালুম হয়ে যাবে।" বলে ম্যাজিকঅলা আবার তেমনি চিৎকার করে উঠল, "কাকাতুয়া!"

"উস্তাদ।"

"ইধার আসো।"

হীরালাল এগিয়ে এল। একেবারে ম্যাজিকঅলার সামনে।

"হামার আঁখ কা উপার নজর রাখো।"

হীরালাল ম্যাজিকঅলার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর যে কী হল, হঠাৎ হীরালাল টলে পড়ল। টলতে টলতে ম্যাজিকঅলার গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ম্যাজিকঅলা ধরে ফেললে হীরালালকে। ধীরে ধীরে মাটির ওপর শুইয়ে দিলে। তারপর একটা কাপড় দিয়ে হীরালালের মুখখানা চাপা দিয়ে ডেকে উঠল, "এ কা-কা-তু-য়া!"

অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে এলে যেমন শুনতে লাগে, হীরালালের গলা থেকেও সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি সাড়া জেগে উঠল, "উ-স-তা-দ!"

"হামি এখন যো বাবুর গায়ে হাত রাখিয়েছি, এ বাবুকা কাম কী আছে?"

"কিচ্ছু না।"

"বাবুকা কাম হোবে?"

"দেরি হবে।"

"দেরি কোতো হোবে?"

"সাত মাস।"

ম্যাজিকঅলা এবার আর একজনের কাছে এল। আবার ডাক দিলে, "কা-কা-তুয়া!"

"উ-স-তা-দ!

"এ বাবুকা ভাগ্য কেমন আছে?"

"খুব খারাপ।"

"খারাপ কেনো?"

"এ-বাবু একজন সৈনিক। এখানে ওঁর দু'জন বন্ধুও আছেন। তাঁরাও সৈনিক। একদিন এ-বাবুদের দাড়ি-গোঁফ খসে পড়বে। তারপর বাবুরা চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটবে!"

"তাজ্জব বাত!"

হ্যাঁ, সত্যিই তো। ম্যাজিকঅলা এবার ওই তো তিনজন ছদ্মবেশী সৈনিকের কাছেই এসেছে! যদিও তারা চার পায়ে হাঁটবে শুনে, রাজ্যের লোক হো-হো করে হেসে উঠল, কিন্তু ওই তিনজন সৈনিকের ভয়ে দফা শেষ। তারাও অবিশ্যি সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হীরালালের মুখে ওই কথা শুনে, তাদের মুখে হাসি ফোটে কী করে! তাদের তো মাথা এখন বাঁই-বাঁই ঘুরছে। ভেবে কিনারাই করতে পারছে না, কী করে বলল এই ছেলেটা, তারা সৈনিক। এ কি সত্যি ম্যাজিক, না অন্য কিছু। তারা ভাবলে, এমনও তো হতে পারে ছেলেটা তাদের চেনে! হয়তো আগে দেখেছে! হয়তো তাদের পালিয়ে আসার খবরটা সে জানে! তাদের দাড়ি-গোঁফ এ যে সব নকল, হয়তো এটাও তার জানা! নইলে বলল কেমন করে দাড়ি-গোঁফ খসে পড়বে। কিন্তু একটা কথার মানে তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না। ওই যে বলল না, চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটবে তারা!

লোক তিনটে আর দাঁড়াল না। নিজেদের মধ্যে চোখের

ইশারায় কথা হয়ে গেল। খেলা চলছে তখনও। ফাঁক বুঝে তিনজন চুপচাপ কেটে পড়ল।

"খুব খারাপ।"

কেটে পড়ল বটে, কিন্তু কী ভয়ানক দুর্ভাবনা তাদের। ভয়ে তিনজনেই এখন জুজু। তিনজনে একটা নিরিবিলি জায়গায় তিন মুণ্ডু এক করে ভাবতে বসল। একজন বললে, "এখান থেকে এক্ষুনি পালানো উচিত।"

আর একজন বললে, "এই ছদ্মবেশটা খুলে ফেলে, আর একটা নতুন ছদ্মবেশ পরতে হবে।"

কিন্তু শেষজন বললে, "না, তাতে আমরা রেহাই পাব না। ওই ম্যাজিক যদি সত্যি হয়, তা হলে ছেলেটার কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। আর যদি সত্যি না-ও হয়, তাহলে বলতে হবে, ছেলেটা আমাদের কথা কোনো-না-কোনোভাবে জেনে ফেলেছে। সুতরাং এখন বাঁচতে হলে আমাদের লক্ষ্য হবে ছেলেটাকে ধরে সরিয়ে ফেলা!

"ধরব কেমন করে?" একজন জিজ্ঞেস করলে।

"গোপনে!"

"ধরা পড়ে গেলে?"

"ধরা পড়তে পারি। কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর ভয় পেলে চলবে না।"

"ওই দ্যাখ, ম্যাজিক ভেঙে গেছে।"

হ্যাঁ, সত্যিই ম্যাজিক ভেঙেছে। লোকের ভিড় কাটছে।

"এখন চ আমরা ম্যাজিকঅলার পিছু নি। চ দেখি, কোথায় ছেলেটা থাকে।"

তারপর সেই নিরিবিলি জায়গা থেকে তিনজনে বেরিয়ে এল। নিঃসাড়ে ম্যাজিকঅলা আর হীরালালের পিছু নিল।

খেলাধুলার
প্রতিযোগিতায়
জেতার পর

তৃষ্ণা যখন বক্ষ জুড়ে
লিম্‌কায় তখন মনটি ভরে!

না, এখন আর হীরালালকে নিয়ে ম্যাজিকঅলার ভয় নেই। হীরালাল যে পালিয়ে যাবে, এমন কথাও আর ম্যাজিকঅলা ভাবে না। ছেলেটার মগজ সে অনেক আগেই সাফ করে দিয়েছে। এখন হীরালাল জানে, এই তার ঘর। ম্যাজিকঅলা তার আপন-জন। আগে হলে কী হত বলতে পারি না, এখন ওই মড়ার খুলিটা দেখলে ওর একটুও ভয় লাগে না। অত কী, রাত্রে যখন শুতে যায় হীরালাল, ওই মড়ার মাথাটা তো ঠিক তার মাথার ওপর, ওই তাকটাতে বসানো থাকে। তার ঘুমুবার সময় ওই খুলিটা হেসে উঠলে, অথবা তুড়ুক-তুড়ুক লাফিয়ে উঠলেও হীরালাল শিউরে উঠবে না।

কিন্তু একদিন হীরালাল শিউরে উঠেছিল। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ তার আচমকা ঘুম ভেঙে গেছল! রাতের আকাশটা জানলায় মুখ ঝুঁকিয়ে উঁকি দিচ্ছে। আকাশ-ভর্তি তারাদের ঝিকিমিকি। বাইরে, গাছের অন্ধকারে জোনাকিরা টুপটাপ আলো জেবলে, উড়ে উড়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। চারিদিক ভারী নিশ্চুপ, থমথমে। ছোট্ট একটি গাছের পাতা মাটিতে পড়ে খসখসিয়ে উঠলে মনে হয়, কী ভয়ঙ্কর তার শব্দ! এমন সময় হঠাৎ মনে হল, কে যেন আলতো পায়ে চুপি-চুপি এদিকেই এগিয়ে আসছে! আর বলব কী, ঠিক তক্ষুনি ওর ঘুম-ভাঙা চোখ দুটির দৃষ্টি কেমন যেন আপনা থেকে ওই মড়ার মাথাটার ওপর গিয়ে পড়ল। উঃ! হঠাৎ যেন মনে হয়, কী বীভৎস সেটা! যেন হীরালালকে দেখে সেটা হেসে উঠেছে! সে তার চোখের খাবলা-খাবলা গর্ত দুটো খুলছে আর বন্ধ করছে! ফোকলা মুখটা হাঁ করছে বার-বার! মনে হচ্ছে, কী যেন গেলার জন্যে খাবি খাচ্ছে আর ঢোক গিলছে! আর কী, ঠিক তক্ষুনি একটা পেঁচা ডেকে উঠল ক্যারকেরে গলায়, "ক্যাঁক-ক-ক, ক্যাঁক-ক।"

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে হীরালাল, ভয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওর কানে বেজে উঠল নূপুরের ঝিনিঝিনি। তারপরেই আবার সে শুনতে পেল সেই মেয়েটির গলা, সেই মিষ্টি ডাক, "হী-রা-লা-ল!"

ওই ডাক শুনে হীরালালের তক্ষুনি তক্ষুনি নিজের ভুলে-যাওয়া নামটা মনে পড়ল কি না জানি না। কিন্তু হীরালাল কেমন হতভম্ব হয়ে গেল! চোখের পাতা দুটি থমকে স্থির! বোবার মতো চুপটি করে ঘরের চারপাশটা দেখতে দেখতে সে নিজের মাথার বালিশটা খামচে ধরলে!

আবার সে ডেকে উঠল, "হী-রা-লা-ল!"

মাথাটা ঝিমঝিম করছে হীরালালের।

"হী-রা-লা-ল!" আবার ডেকেছে।

বাইরে একটা তক্কক "তোক-খোক, তোক-খোক" করে দু বার ডেকে থেমে যেতেই আবছা-আবছা একটা ছবি মনের ভেতর ভেসে উঠছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। কিছুই মনে করতে পারছে না সে। যেটুকু মনে পড়ছে, সেটুকুও ধরে রাখতে পারছে না। আর থাকতে পারল না হীরালাল। বালিশে মুখ গুঁজড়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

অবিশ্যি সে ডাক সে আর শুনতে পায়নি। শুনতে পায়নি সেই নূপুরের রিনিঝিনি। ওই মড়ার মাথাটাও আর হাসছে না। চোখও মটকাচ্ছে না। তবুও হীরালালের চোখে আর ঘুম এল না। বাকি রাতটুকু জেগে জেগে সে ছটফট করতে লাগল! আর ভাবল, এ কোথায় সে এসেছে!

সকাল হয়েছিল যখন, তার অনেক আগেই হীরালাল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। ও যখন উঠেছে তখনও ম্যাজিক-অলার অর্ধেক রাত। লোকটা তেড়ে ঘুম দিচ্ছে আর ফোঁস-ফোঁসিয়ে নাক ডাকাচ্ছে! বিছানা ছেড়ে ওই জানলাটার ধারে একটু দাঁড়াল হীরালাল। এখনও কালো রাতের আবছা ছায়া আকাশের দিকে মুখ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আর বেশি-ক্ষণ থাকতে হবে না। একটু পরেই মানে মানে সরে পড়তে হবে।

আহা! কাল রাতের বেলা ওই নূপুরের রিনিঝিনি কে বাজাল! হাওয়ায় দুলে দুলে কার পায়ের নূপুর এমন করে বাজে! এ কি স্বপ্নের পরী কোনো! না কি আর কেউ!

হীরালাল ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। খুব সাবধানে খিলটা সে খুলে ফেলল। তারপর আলতো পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। ছুটতে গেল, পারল না। তখন আর এক বিপদ! জানতে পারেনি হীরালাল, সেই তিনটে লোক তাকে ধরবে বলে ভোরের আলো-ছায়ার অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তাই যেই হীরালাল ছুটতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছে। তারপর তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে কোথায় যে ছুটল কেউ জানতেও পারল না।

হাঁ, ছুটল তারা এক পাহাড়ের গুহায়। হয়তো তারা হীরালালকে মেরে এই পাহাড়ের গুহায় ফেলে রেখে যাবে। কেউ টেরও পাবে না। কেননা ছেলেটা জেনে ফেলেছে তারা সৈনিক। কথাটা আরও পাঁচ কান হয়ে ছড়িয়ে পড়লে তাদেরই প্রাণ রাখা দায় হয়ে যাবে!

কিন্তু না, তারা প্রথমেই মারল না হীরালালকে। তাকে ভাল করে দেখল তারা। হীরালালও কী বলবে, কিছু ভেবে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাদের মুখের দিকে। কারণ সে চিনতে পেরেছে এই লোক তিনজনকে। এখন বেশ মনে পড়ছে তার, এরাই তো সেই জঙ্গলে পোশাক পালটে ছদ্মবেশ পরেছে!

এই তিনজনের মধ্যে যে পালের গোদা সে-ই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "এই ছেলেটা, তুই কেমন করে জানলি আমরা সৈনিক?"

হীরালাল চুপ করে রইল।

সে ধমক মারলে, "চুপ করে থাকলে ওই পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দেব।"

হীরালাল মুখটা কাচুমাচু করে বললে, "দেখুন, আমি তো কাউকে কিছু বলিনি।"

"বলিসনি মানে!" সে আবার ধমক দিলে।

হীরালাল জিজ্ঞেস করলে, "কবে বলেছি বলুন তো! আমার তো মনে পড়ছে না।"

"আবার মিথ্যে কথা বলছিস!" সে তেমনি তেড়ে কড়কে উঠল। হীরালালের গলাটা টিপে ধরে বললে, "বল, নইলে গলা টিপে মেরে ফেলব।"

হীরালাল কথা বলতে পারল না। ওই লোকটার হাতের চাপে ওর দম আটকে আসছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হীরালাল ছটফটিয়ে উঠল।

হয়তো আর-একটু হলেই ওর সত্যিই দম আটকে যেত। ঠিক সেই সময় আচমকা যেন সেই মেয়েটির গলার স্বর চিৎকার করে উঠল, "শয়তান, তোমরা ওকে মারছ কেন?"

থমকে গিয়ে চমকে উঠেছে সেই তিনটে লোক! এই রে! এই সময়ে এই অন্ধকার গুহার হদিস কে পেল! কে জানল, এখানে ছেলেটাকে ওরা ধরে এনেছে! হীরালালকে মারা তো দূরের কথা, এখন তারা পালাতে পারলে বাঁচে! আর তারা সত্যিই হীরা-লালকে ছেড়ে ভো-কাট্টা!

সে আবার চেঁচিয়ে উঠল, "পালাচ্ছে, তিনটে সৈনিক পালাচ্ছে।"

তার গলার স্বরটা যতই স্পষ্ট হচ্ছে, ততই তাদের বুক কাঁপছে। দৌড়, দৌড়, একেবারে গুহার ভেতরে, অনেক ভেতরে তারা দৌড় মারলে! কিন্তু যতই ছুটছে তারা, সেই মেয়েটির গলার স্বর ততই তাদের কানের ভেতরে ভয়ঙ্কর শব্দে চিৎকার করে উঠছে!

ছুটতে ছুটতে তারা হাঁপাচ্ছে। আর বুঝি তাদের বাঁচার রাস্তা নেই। এবার তাদের নির্ঘাত মরণ!

তমসো মা জ্যোতির্গময়
স্পন্দনে
প্রকাশিত হল
অভিব্যক্তিতে—
মিহির
অভিজাত
হাল ফ্যাশনের
চূড়ায়
মিহির
টেক্সটাইল
IDI
ইণ্ডিয়ান ডাইস্টাফ
ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
টেক্সটাইলে অজস্র
উজ্জ্বল রঙের ডাই
everest/79/MT/346-bn
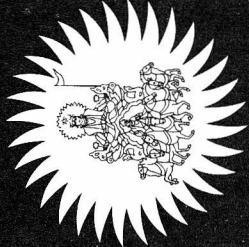
না, হঠাৎ থেমে গেল সেই চিৎকার। ভয়-পাওয়া বুকের কাঁপুনিটা তবু থামতে চায় না তাদের। তবু ছুটছে তারা। তারপর সত্যিই যখন সেই চিৎকার ছুটে ছুটে আর তেড়ে আসছিল না, তখন তারা দাঁড়াল। অন্ধকার গুহার পাথরের মধ্যে চটপট গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

তারা অনেকক্ষণ লুকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পর যখন মনে হয়েছিল, হয়তো আর কেউ নেই এখানে, তখন তারা পাথরের আড়াল থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এসেছিল। অসহ্য কষ্ট এখানে! গুহাটা যেমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ছমছম করছে, কষ্টে ওদের মুখগুলোও তেমনি শুকিয়ে চুপসে গেছে! ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে ওদের। এই সময় কেউ যদি ওদের একটু জল দেয়! একটু খাবার জল। একটু জলের জন্য এই নিস্তব্ধ গুহাটা ওদের দম-ফাটা নিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠছে! একজন হাঁপাতে হাঁপাতেই আর্তনাদ করে উঠল, "একটু জল, একটু জল!"

আর একজন বললে, "বাইরে যেতে হবে।"

কিন্তু বাইরে যাবে কেমন করে! এই গুহার ভেতর থেকে কোন্ পথ দিয়ে তারা বাইরে যাবে। সে পথ তো জানে না তারা! তার ওপর বাইরে গেলে যদি ধরা পড়ে যায়! তাই শেষজন বলল, "না, বাইরে গেলে আরও বিপদ হতে পারে। আমরা ধরা পড়ে যাব।"

"তবে কি আমরা এখানেই মরব!" রেগে উঠল প্রথমজন।

শেষজন বললে, "অত ব্যস্ত হলে চলে না। এই গুহার আরও ভেতরে চ। নিশ্চয়ই পথ খুঁজে পাব। আর একটু কষ্ট করলে হয়তো আমরা বাঁচতে পারি!"

"বেশ, তাই সই।"

তিনজন গুহার আরও ভেতরে পাথর টপকে হাঁটা দিল।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এ কী হল!

কী হল?

এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারটা যেন একটু একটু ফ্যাকাশে হয়ে আসছে! মনে হচ্ছে, অন্ধকার কালোটা একটু একটু বেগুনি-বেগুনি আলো হয়ে উঠছে! সত্যিই তো! তবে কি আর একটু হাঁটলেই বাইরের আলো দেখতে পাবে! তিনজনের মুখেই হাসি ফুটল! আঃ! কী আনন্দ!

না তো! হঠাৎ গুহার সেই বেগুনি আলোর রঙ সবুজ হয়ে উঠল যে! যেদিকে চাও, শুধু সবুজ আর সবুজ। গুহার ভেতরটা সবুজ। পাথরের গায়ে গায়ে সবুজ। ওদের পায়ে পায়ে সবুজ। যেন চলছে, ফিরছে, থমকে থমকে থেমে পড়ছে!

থেমে পড়ল তিনজনা। সবুজ আলোর ধাঁধায়, ওদের চোখ ঝলসে উঠেছে। হঠাৎ ঝরনার মতো টুংটাং শব্দ করে কত বাজনা বেজে উঠল শোনো! এই গুহার সবুজ আলোয় যেন কাদের পায়ে নেচে উঠল সুরের রুনুঝুনু! দ্যাখো, দ্যাখো, সেই সবুজ আলো গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে কত ছবি এঁকে দিয়েছে। সেই ছবিদের কেউ নাচে, কেউ গান গায়, কেউ মৃদঙ্গ বাজায়। অবাক চোখে চেয়ে থাকে তিনজন লোক।

কিন্তু হঠাৎ এ কী দেখল ওরা!

কী দেখল?

এ তো আঁকা ছবি নয়। এ ছবিরা তো জীবন্ত হয়ে ওদের চোখের সামনে দুলছে। ওই তো, ঠান্ডা জলের পাত্র হাতে ওই জীবন্ত ছবিরা যেন ডাকছে ওই তিনটে লোককে! আঃ! ওদের তৃষ্ণা যেন বেড়ে যায়! তিনজনেই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল।

কিন্তু কই জল! ওই দেওয়ালের ছবির মানুষেরা ওই তিনটে লোককে ছুটে আসতে দেখে যেন লুকিয়ে পড়ল!

না, লুকোয়নি। ওই তো তাদের দেখা যাচ্ছে একটু দূরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে!

আবার ছুটে গেল তিনজন সেইদিকে।

এবারও ফুস-মন্তরের মতো তারা হারিয়ে গেল! দেখা দিল আবার আর-একদিকে!

তারপর তিনটে লোক এদিক ছোটে, ওদিক ছোটে! আর দেওয়ালের ছবিরা এ-পাশ আসে, ও-পাশ পালায়! শেষে একটু তৃষ্ণার জলের জন্যে ছোটাছুটি আর লুকোচুরি শুরু হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে প্রাণান্ত তাদের। এবার তারা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আর তাই মাটি থেকে তুলে নিল পাথর। ছুঁড়ে দিল ওই ছবির মানুষের দিকে! পাহাড়ের গায়ে শব্দ উঠল, ঠং! ঠক! ঠকাস!

কিন্তু এ কী! পাথর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবির মানুষেরা কোথায় উবে গেল! সেই ছবির মানুষের জায়গায় তো কটা ছবির জন্তু দেখা যাচ্ছে! কটা গাধা! কটা ছাগল। কটা শুয়োর!

ওই জন্তুগুলোকেই মারবে বলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই তিনজন মানুষ আবার পাথর ছুঁড়ল। অমনি চক্ষের নিমেষে সেই গাধা, ছাগল, শুয়োরের দল পাহাড়ের গায়ে আঁকিবুঁকি ছড়িয়ে দৌড় মারলে। লোক তিনটেও লাগালে তাড়া।

৭

ছুটছে জন্তুরা।

ছুটছে তিনটে লোক।

হঠাৎ সেই ছুটন্ত জন্তুদের তালে তালে বেজে উঠল দামামা. ডিড্ডিম-ডিম-ডিম! ডিড্ডিম-ডিম-ডিম!

বাজনা বাজছে। এখনও বাজছে।

জন্তু ছুটছে। এখনও ছুটছে!

হঠাৎ থেমে গেল বাজনা।

যাঃ! চক্ষের পলকে জন্তুগুলো উধাও! সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, ঝিরি-ঝিরি! ঝিরি-ঝিরি! গুহার পাথরের গা বেয়ে পাহাড়ি ঝরনার জল গড়িয়ে পড়ছে!

ঝিরি-ঝিরি! ঝিরি-ঝিরি!

আঃ! জল! চারিদিকে জল! আর তর সইল না সেই তিনটে লোকের। ছুটে গেল তারা। আঁজলা ভরে জল তুলে নিল। তারপর মুখে দিল। প্রাণ ভরে চুমুক দেয় আর গায়ে ছড়ায়! আঃ! তবু যেন শান্তি নেই। যত পারে খাক!

কিন্তু দ্যাখো, দ্যাখো, জল খেতে খেতে ওরা কেমন যেন পালটে যাচ্ছে! ওদের তো আর মানুষের মতো দেখতে লাগছে না! যেন মনে হচ্ছে, একটা গাধা, একটা ছাগল আর একটা শুয়োর!

হ্যাঁ, ঠিক তাই!

আচ্ছা আজব কাণ্ড তো!

হ্যাঁ, আজবই তো! ওই দ্যাখো-না, নিজেরাই নিজেদের দেখতে দেখতে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠছে! ছাগল, শুয়োর, গাধার ডাকে গুহার গহ্বর গমগম করে উঠল। প্রাণের ভয়ে তারা ছুট দিল অন্ধকারের ভেতর থেকে গুহার বাইরে!

ঝিরি-ঝিরি!

সেই পাহাড়ের গা গড়িয়ে সেই জলের শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে।

তিন জন্তু ছুটছে!

জলের শব্দ তবু শোনা যাচ্ছে, ঝিরি-ঝিরি!

গুহার অন্ধকার হালকা হচ্ছে। আলো আসছে। ওরা বাইরের রাস্তা দেখতে পেল। গুহায় যখন ঢুকেছিল, তখন ওরা ছিল তিনজন মানুষ। আর এখন যখন বাইরে এল,

একটা গাধা, লম্বা কান।
একটা ছাগল, শুকনো দাড়ি।
একটা শুয়োর, ছুঁচলো মুখ।

এ ওর দিকে চায়। কান নাড়ে। ঠ্যাং ছোঁড়ে। ল্যাজ নাচায়। কিন্তু কথা কয় না। ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে!

এখন ঝরনার ঝিরি-ঝিরি শব্দের সুরটা কেমন পালটে গেছে। বাইরে এখন রিনি-ঝিনি রিনি-ঝিনি করে কার যেন পায়ের নূপুর বাজছে।

ওরা বাইরে এসে কান পাতলে। এদিক দেখছে, ওদিক দেখছে। তারপর হাঁটা দিলে। হাঁটতে হাঁটতে ছোটা দিলে। ছোটা দিলে পাহাড়ের ওপরে! গাধা উঠতে গিয়ে ছ বার পড়ে। ছাগল পড়ে ক বার। শুয়োর গড়ায় ন বার। তারপর তিনটে জন্তুই থমকে যায়! চমকে দাঁড়ায়! আরে, সেই ছেলেটা না!

হ্যাঁ, হীরালাল। পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে কাকে যেন খুঁজছে!

সেই তিনটে জন্তু ঝটপট লুকিয়ে পড়ল। উঁকি মেরে দেখতে লাগল হীরালালকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হীরালাল কথা বলল, "আর কতদূরে যেতে হবে? তুমি কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছ?"

কার সঙ্গে যে কথা বলল ছেলেটা, তিনটে জন্তু বুঝতেই পারল না। কিন্তু তারা শুনতে পেল সেই মেয়েটির গলার স্বর। সে জিজ্ঞেস করল হীরালালকে, "কেন, কষ্ট হচ্ছে?"

হীরালাল উত্তর দিল, "না, কষ্ট আমার হচ্ছে না। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছ কেন? তুমি আমায় ডাকছ, কিন্তু দেখা দিচ্ছ না। তোমার ডাক শুনতে শুনতে কোথায় চলে এসেছি বল তো! তুমি দেখা দিচ্ছ না কেন?"

সে বললে, "দেখতে পাবে।"

"কবে?"

"একদিন।"

"কোন্ দিন।"

সে হাসল।

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাসছ যে!"

তবু সে হেসে উঠল খিলখিল করে। তার হাসির রেশটা ওই পাহাড়ের গায়ে গায়ে ভেসে ভেসে হারিয়ে গেল।

অভিমানে গলা ভার হয়ে গেল হীরালালের। সে বললে, "খালি খালি তুমি হাসছ কেন? তুমি যদি দেখা না-ই দেবে, তবে আমায় ওই গুহার ভেতর থেকে কেন বাঁচালে! কেন আমায় ডেকে আনলে! তোমার ডাক শুনে, আমি পথ ভুলে গেছি! হয়তো আমার মা কাঁদছে আমার জন্যে।"

হাসতে হাসতে থামল সে হীরালালের কথা শুনে। তারপর একটুখানি চুপ করে রইল।

হীরালাল জিজ্ঞেস করলে, "চুপ করলে যে!"

তার গলাও ভার হয়ে গেল। সে বললে, "হীরালাল, আমিও যে তোমার জন্যে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার যে ভারী ইচ্ছে করে হীরামন তোমাকে আদর করতে!"

হীরালাল অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "এ কী! তুমি আমার ওই নামটা জানলে কী করে? মা বলেছে, হীরামন বলে দিদি আমায় ডাকত! ডেকে ডেকে আমায় আদর করত!"

হঠাৎ সে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, "আমি জানি, সব জানি।"

হীরালাল অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কে?"

সে বললে, "আমি কেউ না। সামনে দ্যাখো, আমি ওইটা।"

হীরালাল ব্যস্ত হয়ে সামনে চাইল। কাউকে দেখতে পেলে না। জিজ্ঞেস করলে, "কই? কোন্‌টা?"

"ওই পাথরটা।"

"তুমি পাথর?"

সে তখন বললে, "বিশ্বাস করতে পারছ না বুঝি? আচ্ছা, এক কাজ করো, তোমার সামনে ওই যে টুকরো পাথরটা দেখতে পাচ্ছ, ওই পাথরটা দিয়ে একটা মস্ত গোল আঁকো!"

হীরালাল দোনোমোনো করল।

সে আবার বললে, "আঁকছ না?"

হীরালাল জিজ্ঞেস করলে, "কী হবে এঁকে?"

"আমায় দেখতে পাবে।"

হীরালাল বললে, "ধ্যাত! তাই বুঝি আবার হয়!"

"আঁকলেই বুঝতে পারবে।"

"বেশ, তুমি যখন বলছ, আঁকছি!" বলে, হীরালাল পাহাড়ের গায়ে ওই পাথরের টুকরো দিয়ে একটা মস্ত গোল আঁকলে।

কিন্তু কই?

আবার সে খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, "আমি ওই!"

হীরালাল বললে, "কী মিথ্যে কথা বলো তুমি। এটা তো একটা মস্ত বড় শূন্য!"

সে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, আমি শূন্য। ওই দ্যাখো দ্যাখো, তোমার আঁকা গোল শূন্যটা কী হয়ে গেল দ্যাখো!"

বলতে না বলতেই ঠং-ঠং-ঠং করে আওয়াজ তুলে পাহাড়ের পাথরে কী যেন গড়িয়ে গড়িয়ে ঠিকরে পড়ে বেজে উঠল। চমকে ফিরে তাকাল হীরালাল। এ কী কাণ্ড! সেই শূন্যটা যে একটা সোনার মোহর হয়ে গড়িয়ে পড়ল!

ওই দ্যাখো, পাথরের আড়াল থেকে সেই তিনটে জন্তুও এটা দেখে ফেলেছে! তারাও তো থ!

হীরালাল অবাক গলায় বললে, "এ যে সোনা!"

"এই তো আমি। তুমি আরও অনেক শূন্য আঁকো, আরও সোনা হবে। তারপর এই সোনা দিয়ে তোমার স্বপ্ন গড়ে উঠবে।"

''সত্যি?'' খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল হীরালাল।

সে বলল, ''সত্যি?''

তখন হীরালাল আবার একটা গোল আঁকলে। এটাও সোনা হয়ে গেল।

আবার আঁকলে।

আবার সোনা।

আবার আঁকলে।

সোনা—সোনা—সোনা। হাজার হাজার সোনার মোহর ছড়িয়ে পড়ল সেই পাহাড়ের আনাচে-কানাচে।

তাই না দেখে, সেই তিনটে জন্তুর তো চক্ষুস্থির। লোভে চোখগুলো তাদের জ্বলে উঠল। কিন্তু করবে কী! যখন মানুষ ছিল, তখন এক কথা! এখন তো ওরা জন্তু!

হীরালাল মোহরের আড়াল থেকে মুখ উঁচিয়ে বললে, ''বাব্বা! এত সোনা, আমি যে চাপা পড়ে যাচ্ছি।''

''না, চাপা কেন পড়বে। ওই দ্যাখো, পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাও।''

হীরালাল চেয়ে দেখল। তারপরেই চমকে উঠল! এ আশ্চর্য কাণ্ড তো! মস্ত পাহাড়ের আকাশ-ছোঁয়া চূড়াটার ঠিক ওপর, স্বপ্নের রঙ বুলিয়ে, সেই সোনার মোহর সাজিয়ে ছোট্ট একটি প্রাসাদ গড়ে উঠেছে!

জন্তু তিনটে এবারও হাঁ!

হীরালাল মুগ্ধ চোখে সেই প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আঃ! এমন সুন্দর প্রাসাদ! এ কার?"

সে বলল, "সবটা তোমার। একটুখানি আমার।"

হীরালাল জিজ্ঞেস করলে, "এখানে তুমি থাকো?"

সে উত্তর দিলে, "আমার সঙ্গে তুমিও।"

"কিন্তু তোমায় তো এখনও দেখতে পাচ্ছি না!"

সে বললে, "পাবে, পাবে, দেখতে পাবে। দেখতে পাবে পূর্ণিমায়, যেদিন চাঁদ উঠবে।"

অমনি দেখতে দেখতে পাহাড়-চূড়ার রঙিন প্রাসাদের সিংদরজা খুলে গেল।

সে বললে, "ভেতরে এসো।"

হীরালাল দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

হীরালাল ভেতরে ঢুকে যেতেই বেরিয়ে এল সেই গাধাটা ছাগলটা আর শুয়োরটা—পাথরের আড়াল থেকে।

আহা! কী চমৎকার প্রাসাদের ভেতরটা! চারিদিকে ফুল। ফুলে ফুলে মৌ। রঙ-রঙ ছবি। ছবি-ছবি পাখি। আর এখানে ফোয়ারা, ওখানে রঙিন মাছ। অবাক হয়ে দেখছে হীরালাল। দেখতে দেখতে সে বাগান পেরিয়ে দালানে উঠতেই, টুং-টাং করে বাজনা বেজে উঠল। কী মিষ্টি তার সুরটা! থমকে দাঁড়িয়েই পড়ল হীরালাল।

সে জিজ্ঞেস করলে, "দাঁড়ালে যে?"

হীরালাল বললে, "কী মিষ্টি বাজনা বাজছে!"

সে উত্তর দিলে, "জলতরঙ্গ।"

"কোথা বাজছে?"

"জলের নীচে।"

"কী সুন্দর!"

হীরালাল দালান ছেড়ে ঘরে ঢুকল। এ-ঘরটা ছবির ঘর। দেওয়াল-ভর্তি রঙিন ছবি। একটা হাঁস, তো একটা বাঘ। একটা ফড়িং, তো সাতটা ফানুস। একটা নদী, তো পাঁচটা নৌকো। একটা সূর্য, একটা চাঁদ।

সে জিজ্ঞেস করলে, "ভাল লাগল?"

হীরালাল বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

এবার এই ঘরটা খেলার ঘর।

বাঁদর-ছানা নাচ বুলিয়ে দুলছে।

মেম-পুতুল ঘাগরা পরে নাচছে।

মোটরগাড়ি পিম্পি-পিম্পি ছুটছে।

কাঠের ঘোড়া টগবগ টগবগ হাঁটছে।

সে জিজ্ঞেস করলে, "কেমন লাগল?"

হীরালাল বললে, "ভাল লাগল।"

খেলা-ঘরের পরের ঘর পোশাক-ঘর।

এই পোশাকটা নীল।

ওই পোশাকটা লাল।

এই জামাটা আকাশি।

ওইটা দেখতে ফ্যাকাশি।

এটার গায়ে ফুলের ছাপ।

ওটার গায়ে লতার দাগ।

সে জিজ্ঞেস করলে, "কোন্‌টা পরবে?"

হীরালাল বললে, "লালটা পরব।"

এর পরে পাখির ঘর।

ময়নাটা গাইছে।

লালমন চাইছে।

টিয়া ঠোঁট ঠুকছে।

বুলবুলি উড়ছে।

সে জিজ্ঞেস করলে, "ভাল্ না?"

হীরালাল বললে, "খুব ভাল।"

পাখির ঘর ছাড়িয়ে, একটি একটি সিঁড়ি পেরিয়ে, একেবারে ওপরে, ঠিক রূপকথার রাজপুত্রের মতো ঝলমল একটি রঙিন ঘর। সে-ঘরে সোনার পালঙ্ক সাজানো। তাতে মখমলের বিছানা পাতা। রেশমি পর্দা হাওয়ায় উড়ে উড়ে নীল আকাশটা উঁকি দিচ্ছে। এখনই আকাশে তারা ফুটবে। তারপর সোনার পালঙ্কে হীরালাল শুয়ে পড়বে। সে গান গাইবে। আঃ! শোনো, শোনো, কী নরম গলা তার! এ তো গান না। মনে হবে, বুঝি-বা ফুলের পাপড়িতে শিশিরের ফোঁটারা দোল খাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়বে হীরালাল। আহা! ঘুমোক। একটি হালকা পশমি চাদর দিয়ে সে ঢাকা দিয়ে দেবে হীরালালের গা-টি। পাহাড়ের হাওয়ায় ভেসে ভেসে ফুলের গন্ধ এসে সেই চাদরের ওপর লুটোপুটি খাবে!

ঘুমিয়ে পড়েছে হীরালাল। কেন এমন একদৃষ্টে হীরালালের মুখের দিকে চেয়ে আছে সে? সে বুঝি হীরালালের মাথায় হাত রেখেছে। চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে কপালে চুমু খাবে! তারপর হয়তো চোখ দুটি ওর ছলছলিয়ে উঠবে। হ্যাঁ, ওই তো কাঁদছে সে! শুনতে পাচ্ছ না, এই শান্ত, নিস্তব্ধ রাত্রে, এই ঘরে তার কান্নার অস্পষ্ট শব্দ!

হ্যাঁ, আজও কাঁদবে। অঝোর ধারায় চোখের অদৃশ্য জলে ভেসে যাবে তার গাল দুটি। হীরালালকে এমন করে কাছে পেয়ে তার যত আনন্দ, তত ভয়।

ভয় কেন?

কেননা, যেদিন পূর্ণিমা আসবে, পূর্ণিমায় আকাশে চাঁদ উঠবে, সেদিন যে সে শেষবারের মতো হীরালালকে দেখতে পাবে। সেদিনই তো হীরালাল জেনে ফেলবে, সে কে!

সত্যি, সে কে? কে এই অদৃশ্য মেয়েটি? এমন নিছক একটা পাথরে আঁকা শূন্য মোহর হয়ে যায় কার হাতের ছোঁয়ায়? কোন্ মায়াবলে এমন এক সোনা-ঝলমল প্রাসাদ গড়ে তোলে সে এই পাহাড়ের চূড়ায়? কেন, কেন, সে হীরালালকে এমন আদর করে? আদর করে কেন সে ডেকে এনে গান শোনায় হীরালালকে? সে কি জানে না, হীরালালের মা হীরালালের জন্যে কত কাঁদছে?

হ্যাঁ, জানে সে। কিন্তু তবু সে হীরালালকে না দেখে পারে না। কতদিন সে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছে হীরালালকে। কতদিন সে নদীর তীরে তীরে ছুটে ছুটে হীরালালের পিছু নিয়েছে। না-হয়, বনের ছায়া-ঘেরা পথে পথে একা একা ঘুরেছে

একটিবার ওর মুখখানি দেখার জন্যে। আজ সে কাছে পেয়েছে হীরালালকে। আজ প্রাণ ভরে ওকে আদর করবে। ওর যত সাধ ছিল মনে মনে, আজ সব উজাড় করে দেবে হীরালালের জন্যে!

এখন সোনায় গড়া স্বপ্ন-প্রাসাদে হীরালাল ভারী নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। নিঝুঝুম এই পাহাড়-চূড়ায় আজকের রাত নিথর হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। শুধু জেগে রইল সেই ছাগল, সেই শুয়োর আর গাধাটা।

হ্যাঁ, ওরা জেগে আছে। ওই তো কেমন নিঃসাড়ে হামা-গুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে! এখন তারা পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ওপরে উঠবে। ওই চূড়ায়, ওই প্রাসাদে! কেন, কী মতলব তাদের?

আকাশে তারার ঝিলিমিলি। আর নীচে, প্রাসাদের গায়ে গায়ে মণিমুক্তার ঝকমকি! দেখতে দেখতে তিন জন্তুর চোখ ঝলসে গেল! হায় রে, এই প্রাসাদটা যদি তাদের হত! হলই বা তারা জন্তু, এই প্রাসাদে একবার রাজা হয়ে বসতে পারলে মানুষই তাদের সেলাম ঠুকবে! দৌলত যার, শক্তিও তার! সুতরাং এই প্রাসাদ তাদের চাই-ই। এটা পাওয়াও এমন কী আর শক্ত! মালিক তো ওই একটা পুঁচকে ছেলে! ছেলেটাকে মারতে মারতে এই পাহাড়ের ওপর থেকে একবার নীচে ওই খাদে ফেলে দিতে পারলেই হল! হুর-র-র রে! তখন এ প্রাসাদ হবে তাদের!

হ্যাঁ, এই কথা ভাবতে ভাবতে, অনেক কষ্ট করে, পাহাড়ের পাথর ঘসটাতে ঘসটাতে তারা সত্যিই প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আ-হা-হা! সোনা, চারিদিকে শুধুই সোনা। থরে-থরে সাজানো। সারে-সারে ঝকমকি জৌলুস। ওরা পারল না আর দাঁড়িয়ে থাকতে। সামনের ঠ্যাং ওপরে তুলে সেই সোনা কেউ আঁকপাঁকিয়ে আঁকড়ে ধরে। কেউ সোনার ওপর জিব দিয়ে চাটে। কেউ গোঁত্তা মেরে মাথা খোঁড়ে!

আরে! আরে! এ কী! গাধার পিঠের ঠেলা লেগে যে সত্যি-সত্যি প্রাসাদের সিংদরজা হাট হয়ে খুলে গেল! তা বেটপকা দরজাটা অমন খুলে গেলে একটু ভড়কে যেতে হয় বইকী! চাইকি, ভয় পেয়ে একটু ঘাবড়েও যেতে হয়!

কিন্তু না, তিন জন্তু একটু ভড়কাল বটে, তবে ঘাবড়াল না। একটু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে তিন জন্তু চটজলদি প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আঃ! খুশির মতো এক ঝলক আকাশি নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রাসাদের মাথার ওপর। খুব মিঠে হালকা সুরে বাজনা বাজছে। আর মনে হচ্ছে, ফিনফিনে সাদা তুষারের মতো ঝুরুঝুরু কী যেন ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়।

তিন জন্তু এগিয়ে গেল।

সেই সাদা তুষার যেন ধীরে ধীরে জমাট বাঁধছে!

তিন জন্তু চেয়ে দেখলে।

সেই সাদা তুষার যেন ফ্যাকাশে হয়ে ছাইরঙ ধরলে!

হ্যাঁ, জমাট-বাঁধা তুষারের ছাই-রঙ হঠাৎ এবার ভুসোর মতো কালো হয়ে গেল! তারপর সেই কালো ভুসো জমাট বাঁধতে বাঁধতে একটা ইয়া লম্বা দত্যির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সেই তিন জন্তুর সামনে! সেই কালো কুচকুচে দত্যি হাত বার করলে! প্যাট-প্যাট করে চেয়ে দেখলে! দাঁত ছরকুট্টে হেসে উঠল! আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে হালকা সুরের বাজনাটা দামামার মতো দমাদ্দম দমাদ্দম করে গর্জে উঠল! তাই না দেখে, তিন জন্তুর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া! কী করি কী করি ভেবে দে পিটটান!

অমনি, একেবারে চক্ষের নিমেষে সেই কালো ভুসোর মতো দত্যিটা খপাত করে গাধার কানটা ধরে ফেললে! আর এক হাত বাড়িয়ে ছাগলটার একটা ঠ্যাং খামচে ধরলে! শুয়োরের ঘাড়টা পা দিয়ে চেপটে দিলে! তারপর দু হাত দিয়ে গাধাটাকে আর ছাগলটাকে কান-ঝোলা আর ঠ্যাং-ঝোলা করে দোলাতে লাগল। শুয়োরটার ঘাড়ে পায়ের নোখ দিয়ে খামচি মেরে চিমটোতে লাগল!

তারপর কী চেল্লাচেল্লি, "ও বাবা গো, ছেড়ে দাও গো! ও বাবা গো, ঘাট হয়েছে গো! ও বাবা গো, আর কক্ষনো করব না গো!"

এখন আর এ-সব কথা বলে গলা ফাটালে কী হবে! তখন মনে ছিল না! দত্যির শুনতে বয়ে গেছে এ-সব কথা। সে দোলাবে আর খিমচোবে! দোলাতে দোলাতে হল কী, খচাং করে গাধাটার কান ছিঁড়ে গেল। কান ছিঁড়ে, গাধাটা পড়ল গিয়ে পাঁচিলের ওপারে একেবারে প্রাসাদের বাইরে!

খটাং করে ছাগলটার ঠ্যাং ভেঙে গেল। ছাগলটা ছিটকে পড়ল গাধাটার ঘাড়ের ওপর!

ফটাং করে শুয়োরটার পেট ফেটে গেল। ফাটা পেট হাঁস-ফাঁস করতে করতে সে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ছাগলটার পিঠের ওপর। তারপর কী সাংঘাতিক বাজখাঁই গলায় হা-হা-হা করে হেসে উঠল দত্যিটা! ওমা! দ্যাখো, হাসতে হাসতে দত্যিটা কেমন ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে! ঝরতে ঝরতে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে ওই তো, উবে গিয়ে হারিয়ে গেল!

আঃ! আবার খুশির মতো এক ঝলক নীল আলো সেই সোনালি প্রাসাদের মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। দামামার সেই গুরুগুরু গর্জনটা আবার যেন সেই তেমনি হালকা মিষ্টি সুরে বেজে উঠেছে। আহা! রূপসী সোনার প্রাসাদটা আবার শান্ত এখন।

যাই বলো তাই বলো, মারের গুঁতোয় বেচারিদের প্রাণ রাখা দায়! কান-কাটা, ঠ্যাং-ভাঙা, পেট-ফাটা তিন জন্তু যন্ত্রণায়

ছটফটাচ্ছে। একে বলে দুর্দশার একশেষ! ছিল মানুষ, হল জন্তু! কী কুক্ষণেই না তারা পাহাড়ের গুহার মধ্যে পালিয়েছিল! পালিয়েছিল, পালাক। কিন্তু এটা কেমন ভেলকি যে, তেষ্টার জল মুখে দিতেই তারা জন্তু হয়ে গেল! তাও না হয় সই, কিন্তু এখন একটা পুঁচকে ছেলের পাল্লায় পড়ে তাদের যে ঠ্যাং ভাঙল, কান ছিঁড়ল, পেট ফাটল, একে তুমি কী বলবে? না, না, তারা এর বিহিত না করে কিছুতেই ছাড়বে না। কত বড় ছেলে একবার দেখে নেবে তারা! দত্যি দিয়ে অপমান। ছিঃ! ছিঃ! অপমানের শোধ যদি না নিতে পারে তো জন্মই বৃথা!

হ্যাঁ, কান-কাটা গাধা কাঁদতে কাঁদতে পাহাড়ের ওপর থেকে নামতে শুরু করলে। ঠ্যাং-ভাঙা ছাগলটা লেংচে লেংচে পাথরের ওপর থেকে নীচে হাঁটতে শুরু করলে। আর পেট-ফাটা শুয়োরটা পেটে হাত চেপে ওদের পিছু নিলে।

সকাল হবার আগেই তিন জন্তু পাহাড় ডিঙিয়ে নীচে নামল। নীচে নেমে শুয়োরটাই প্রথম কথা বললে, "এখন কী করা?"

গাধা বললে, "লুকিয়ে থাকতে হবে।"

ছাগল বললে, "লুকিয়ে কেন থাকব! আমাদের চিনছে কে! এখন আমাদের সেই ম্যাজিকঅলার কাছে যেতে হবে। তাকে সব খুলে বলতে হবে।"

"তাতে লাভটা কী?"

ছাগল বললে, "লাভ কী, গেলেই বুঝবে।"

ছাগলের কথা শুনে গাধা বললে, "ক্ষতি না হলে. আপত্তি করি না।"

তিন জন্তু ম্যাজিকঅলার খোঁজে চলল।

ম্যাজিকঅলার বাড়ি কোন্‌দিকে, সে তো আর ওদের অজানা নয়। তাই খুঁজতে হল না। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে তিনজনে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারপর তিনজনেই এক-সঙ্গে হাঁক পাড়লে:

"ম্যাজিকঅলা, ম্যাজিকঅলা বাড়িতে আছ কি,
তোমার জন্যে জবর খবর সঙ্গে এনেছি!"

ম্যাজিকঅলা ডাক শুনে সাড়া দিলে, "কৌন ডাকতা?"

"আমরা ডাকি, আমরা ডাকি ছাগল, শুয়োর, গাধা
দয়া করে একটু যদি বাইরে আসেন দাদা!"

ম্যাজিকঅলা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই চক্ষু কপালে! আরে, আরে! সত্যিই তো তার ঘরের দোরে তিনটে জন্তু! "এ তো ভারী তাজ্জব বাত আছে! গাধা কোথা বোলছে!"

ছাগল বললে, "দেখুন ম্যাজিকবাবু, আপনি আমাদের দেখে ভুল বুঝবেন না। দেখুন, আমরা সত্যিকারের ছাগল, গাধা, শুয়োর নই। আমরা মানুষ। আপনার সঙ্গে সেই যে ছেলেটা ম্যাজিক দেখাত, সে আমাদের জন্তু করে দিয়েছে।"

ম্যাজিকঅলা চমকে উঠে ধমকে বললে, "ছেলেটা!"

তিন জন্তু একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে, "আজ্ঞে হুজুর।"

"কিধার আছে ও ছেলেটা?"

শুয়োর বললে, "আজ্ঞে আছে তো অনেকদূর! কিন্তু—"

ম্যাজিকঅলা রেগেমেগে বললে, "কিন্তু-মিন্তু জানতা নেহি, আগে বোলো কিধার হ্যায় ও লেড়কা!"

ছাগল বললে, "দেখুন বাবু, অত বাস্ত হলে সব ভেস্তে যাবে। ব্যাপারটা তো খুবই সাংঘাতিক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে সব বলি কী করে! একটু আড়ালে না গেলে!"

"ও বাত তো ঠিকই আছে। তব ঘরমে আও।" ম্যাজিকঅলা ঘরের ভেতর ডেকে নিলে। তিন জন্তু ঘরে ঢুকতেই দরজায় হুড়কো এঁটে দিল ম্যাজিকঅলা।

ঘরে ঢুকে ছাগল ইনিয়ে-বিনিয়ে সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে-মড়িয়ে বললে, "দেখুন, আপনাকে তো আর সব কথা বলতে বাধা নেই। দেখুন, আমরা হলুম গিয়ে ধনকুবেরের তিন পুত্তুর! আমরা নানান দেশ ভ্রমণ করে এখন নিজের দেশে ফিরছিলুম। আমাদের সঙ্গে ছিল অমূল্য সব হীরে-জহরত, সোনাচাঁদি! তা বলব কী, আপনার ওই ছেলেটি আমাদের ভেলকি মেরে, আমাদের জন্তু বানিয়ে, সর্বস্ব লুঠ করে নিলে। শুনলুম নাকি ওই ছেলেটা আপনার কাছেই ভেলকি শিখেছে। শিখুক, সে তো ভাল কথা। কিন্তু তাই বলে আমাদের এই দশা করে ছাড়বে! শুধু তাই নয়, আমাদের সর্বস্ব নিয়ে সে এখন সোনার প্রাসাদ গড়ে দিব্যি আরামে আছে।" বলে ছাগলটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তাকে দেখে গাধা-শুয়োরও কান্না জুড়ে দিলে।

ম্যাজিকঅলা ছাগলের কথা শুনে আরও রেগে উঠল। জিজ্ঞেস করলে, "ও প্রাসাদ কিধার আছে?"

"আজ্ঞে তাও বলব। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়েও যাব। কিন্তু দেখুন, আমাদের জন্তু করেও তার সাধ মেটেনি। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠ্যাংটাও ভেঙে দিয়েছে।"

গাধা চেঁচিয়ে উঠে বললে, "আমার কানটা ছিঁড়ে দিয়েছে।"

শুয়োর পেট চেপে বললে, "আমার পেটটা ফাটিয়ে দিয়েছে।"

"আজ্ঞে আপনি দয়া করে আবার মন্ত্র পড়ে, আমাদের মানুষ না করে দিলে আমাদের গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে!"

বলতে বলতে তিন জন্তু এবার খুব জোরে কেঁদে উঠল।

আসলে জন্তুকে যে কেমন করে মানুষ করতে হয়, সে তো আর ম্যাজিকঅলা জানে না। তবু মিথ্যে-মিথ্যে তাকে তো একটা কিছু বলতে হয়! তা না হলে, এরা যদি সত্যিই ছেলেটার খোঁজ জানে, বলবেই না। তাই ম্যাজিকঅলা ভান করে বললে, "দেখো ভাই, হামি সব ঠিক করে দেবে। তোমহাদের মানুষ ভি করবে, আর তোমহাদের যো- যো চিজ লুঠ হয়েছে ও ভি ফিরিয়ে দেবে। লেকিন ও ছেলেটাকে তো পয়লে পাকড়াতে হোবে। ও হাজার আদমি কো জানোয়ার বানাবার জাদু লিয়ে ভেগেছে। হামাকে আভি আভি সেখানে লিয়ে চোলো, দের হোনেসে সব গড়বড় হয়ে যাবে।"

ম্যাজিকঅলার কথা শুনে ছাগল কাঁদতে কাঁদতেই জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক তো, আপনি আবার আমাদের মানুষ করে দেবেন তো?"

ম্যাজিকঅলা ছাগলের দাড়িতে হাত বুলিয়ে আদর করে বললে, "ঠিক বলছে, ঠিক বলছে!"

"তবে চলুন আমাদের সঙ্গে।"

আহা! সকালবেলা সোনা রোদের আলোয় হীরালাল ছোট্ট একটি সাদা রঙের টাট্টু ঘোড়ার সওয়ার হয়ে কেমন পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! রেশমি পোশাক পরেছে। মাথায় পালক আঁটা পাগড়ি। পায়ে জরি-বসানো নাগরা। কী মিষ্টি দেখতে লাগছে! আর ওই দ্যাখো, ওর সঙ্গে আরও কত ঘোড়-সওয়ার! ওমা! ঠিক যেন পল্টনের দল! হ্যাঁ, পল্টনই তো। হীরালাল খেলবে আর ওই সোনার প্রাসাদের পল্টনরা তাকে দূর থেকে দূরে, আরও দূরে নিয়ে যাবে। যেখানে এই পাহাড়টা শেষ, সেখানে। সেখানে দূর-পাহাড়ের গা বেয়ে কত উঁচু থেকে নীচে রাশি রাশি জল লাফিয়ে পড়ছে। পড়তে পড়তে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নেচে নেচে ছুটে যায়! আর নয়তো এই পাহাড়ে ওই যেখানে নীল আকাশে মেঘের সঙ্গে আলোর লুকোচুরি খেলা হচ্ছে, কিংবা নানা-রঙ পাখা মেলে ওই যেখানে প্রজাপতি ফুলের সঙ্গে মিতালি পাতাচ্ছে, সেখানে ছুটে যায় হীরালাল। তারপর ছুটতে ছুটতে মেঘের ফাঁকে, নয়তো ফুলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকে, "তোমায় বলে টুকি!"

খিলখিল করে হেসে ওঠে সে। হাসতে হাসতে বলে, "টুকি তো আমি তোমায় দেব। তুমিই তো আমায় দেখতে পাচ্ছ না!"

হীরালাল জিজ্ঞেস করলে, "আমি মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও তুমি দেখতে পাও?"

সে বললে, "হ্যাঁ।"

হঠাৎ কেন হীরালালের ঘোড়াটা ডেকে উঠল, "চিঁ-হিঁ-হিঁ!"

ঘোড়ার পিঠে পল্টনরা সজাগ হয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তাই তো! ঘোড়া কেন ডাকে! দেখা গেল একটা গোদা চিল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল :

শঙ্খচিলের ঘটি বাটি,
গোদা চিলের দাঁতকপাটি!

চিলটা উড়তে উড়তে ওইখানে পাক মারছে কেন? আকাশের ওইখানটায়?

ওইখানে, পাথরের আড়ালে ম্যাজিকঅলা আর সেই তিন জন্তু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে হীরালালকে। দেখছে সেই সোনার প্রাসাদ। যতই দেখছে, ততই বেবাক হয়ে যাচ্ছে।

চিলটা উড়তে উড়তে যখন আকাশ পেরিয়ে চোখের বাইরে চলে গেল, তখন পল্টনরাও হীরালালকে নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর সিংদরজা বন্ধ!

এই সব এলাহি কাণ্ড দেখে ম্যাজিকঅলার আর কি সাহস হয় হীরালালের কাছে যাওয়ার! একবার যদি দেখে ফেলে পল্টনরা তা হলে আর রক্ষে নেই। গুঁতোর চোটে ঠুঁটো করে ছেড়ে দেবে।

হঠাৎ ছাগলটা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "কী করবেন ম্যাজিকবাবু? এইখানে বসে থাকবেন?"

ম্যাজিকঅলা তার গলার স্বর আরও নামিয়ে, একেবারে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললে, "বাত বহুত মুশকিল আছে। এ তো তোমি-হামি পারবে না। ও ব্যাটা পল্টন লোগ তরোয়ালসে কাটকে হামাদের পাহাড়কা উপরসে নীচে ফেলে দিবে।"

"তাহলে?"

"লড়াই কোরতে হোবে। চোলো পাহাড়সে নীচে চোলো। রাজাকা পাশ হামলোগ যাবে। রাজাকে সব বলবে।"

ছাগল, গাধা, শুয়োর তিনজনে বললে, "তা ঠিক। সেই ভাল।"

আজ পূর্ণিমা। আজ খই ফুটবে চাঁদের আলোয়। আজ দূরে আকাশে সোনায় গড়া একটি নিটোল টিপের মতো চাঁদ উঠবে। আর তারপরেই হীরালাল সব জানতে পারবে। জানতে পারবে কে এই মেয়েটি। কেননা, সে বলেছে, যেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, সেদিন সে দেখা দেবে। তাই হীরালাল আজ বার-বার আকাশে চেয়েছে আর ভেবেছে, রাত আসতে কত দেরি! তাই ও ছুটে গেছল পাখির ঘরে। ন্যাজঝোলা পাখি বলেছিল, "রাত আসবে দিন গড়ালে।" ফুলবাগানের ফুল বলেছিল, "রাত আসবে রাতের বেলা।"

হ্যাঁ, রাতের বেলা রাত এসেছিল ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য, চাঁদ তো উঠল না। আজকের রাত এত অন্ধকার কেন? আজ সাদা মেঘের দল ঘুম দেবার জন্যে নেমে আসেনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে! আজ তারা ছাই-ছাই পোশাক পরে কালো মেঘের সঙ্গে দল বেঁধেছে। আকাশে আজ মেঘ করেছে। তবে কি সত্যিই মেঘের আড়ালে আজ লুকিয়ে থাকবে চাঁদ? দেখা দেবে না?

হীরালালের মুখেও আজ খুশি নেই। ও দূরে আকাশের দিকেই চেয়ে ছিল আর দেখছিল, কখন জ্যোৎস্নার আলো ওই কালো মেঘের মুখ রাঙিয়ে এই প্রাসাদের সোনার ওপর গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ নূপুর বেজে উঠল! সেই মেয়েটি আসছে বুঝি! হীরালাল জানে, এই নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে সে আসে তার কাছে। হ্যাঁ, এসেছে সে। হয়তো সে হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে এখন। আজ মুখখানি ভারী শুকিয়ে গেছে হীরালালের। সে জিজ্ঞেস করেছিল হঠাৎ, "কী ভাবছ, হীরালাল?"

হীরালাল একবুক নিশ্বাস নিয়ে হতাশ সুরে বলেছিল, "আজ বোধহয় চাঁদ উঠবে না।"

"মন খারাপ লাগছে?"

হীরালাল উত্তর দিয়েছিল, "আজ পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে তুমি আমায় দেখা দেবে বলেছ। চাঁদ না উঠলে, তোমায় যে জানতে পারব না!"

সে চুপ করে ছিল একটুক্ষণ। তারপর সে কথা বলেছিল। হাওয়ায় ঝুরঝুরু পাতার মতো তার গলাটি কেঁপে উঠেছিল কান্নায় ভিজে। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন, আমায় নাই-বা দেখতে পেলে? আমি তো তোমার কাছে কাছেই আছি হীরালাল?"

হীরালাল বলেছিল, "এ আবার কী থাকা? আমার মা যখন আমার কাছে থাকে, তখন সে তো তোমার মতো হারিয়ে থাকে না! মাকে আমি ছুঁতে পাই। মা আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার দিদির গল্প বলে!"

হয়তো সে এবার ডুকরে কেঁদে ফেলত। সামলে নিয়ে

জিজ্ঞেস করলে, "কী গল্প, হীরালাল?"
"সে অনেক। জানো, দিদি আমায় গান শোনাত!"
"কেন, আমিও তো শোনাই।"
"দিদি আমায় কত আদর করত!"
"কেন, আমি বুঝি করি না?"
"পুজোর সময় নতুন পোশাক পরে দিদি আমায় ঠাকুর দেখতে নিয়ে যেত! মা বলেছে, দিদি যখন নতুন পোশাকে সাজত, কী সুন্দর দেখতে লাগত দিদিকে!"
সে চুপ করে গেল।
"চুপ করলে যে!" হীরালাল জিজ্ঞেস করল।
তবু সে কথা বলল না।
হীরালাল আবার জিজ্ঞেস করলে, "কথা বলবে না? আমার দিদির গল্প শুনে তোমার রাগ হয়েছে বুঝি?"
সে কথা বলল না। শুধু তার নূপুর দুটো হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে ছটফটিয়ে বেজে উঠল। সে বোধহয় চমকে উঠেছে।
চমকেই তো উঠেছে সে। কেননা, আকাশের কালো মেঘ সরে গেছে। ওই প্রাসাদের স্বপ্নরাজ্যের ছোট্ট ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের আলো! এবার তাকে কথা রাখতে হবে! দেখা দিতে হবে হীরালালকে!
হীরালাল আনন্দে হাসিতে চিৎকার করে উঠল, "চাঁদ, চাঁদ!"
গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!
এ কী! এত সৈন্য কখন চুপিসারে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসেছে। অসংখ্য সৈন্য পাহাড়ের গায়ে থিক-থিক করছে। তাদের হাতে বন্দুক। তারা পাহাড়ের মাথায় টেনে তুলেছে কামান!
গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!
সেনারা তিনদিক থেকে প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে! ওই তো ওদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেই ম্যাজিকঅলাকে। ওই তো সেই তিন জন্তু! সেনারা কামান দেগে এগিয়ে চলেছে : গুড়ুম! গুড়ুম!
হীরালাল শিউরে উঠল, "কে? কিসের শব্দ?"
সে শান্ত গলায় বললে, "কিচ্ছু না। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। তুমি এসো আমার সঙ্গে।" তার পায়ে-চলার নূপুর বেজে উঠল।
হীরালাল সেই নূপুরের শব্দ শুনে তার পিছু নিল।
গুড়ুম! গুড়ুম! কামানের গোলা উড়ে এসে ওই অমন সুন্দর সোনা দিয়ে গড়া প্রাসাদের গায়ে ছিটকে পড়ছে।
সে বললে, "হীরালাল, তাড়াতাড়ি এসো!"
তার নূপুরের শব্দ শুনে মনে হল, সে ছুটছে।
হীরালালও ছুটল।
মনে হল মেয়েটি প্রাসাদের পিছনের দ্বার দিয়ে বাইরে চলে এল।
হীরালালও সেই পথে তার পিছু নিলে।
সৈন্যরা স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। সোনার প্রাসাদের মাথার ওপর জ্যোৎস্নার আলো উছলে পড়েছে। সৈন্যরা প্রাসাদের সিংদরজা ভেঙে ফেললে। সোনার ঝলমলানি ঠিকরে ঠিকরে চমকে উঠছে। সেনাদের চোখ ঝলসে যায়! তারা দেখতেই পেল না, তাদের চোখের সামনে দিয়েই একটি ছোট্ট ছেলে ছুটে যাচ্ছে। দেখতে পেল গাধাটা। সে একাই চিৎকার করে উঠল "পালাচ্ছে।"
এত হট্টগোলে কে শুনছে তার কথা! অবিশ্যি শুনতে পেয়েছিল ম্যাজিকঅলা। শুনেও সে চেঁচিয়ে উঠল, "যানে দেও। অন্দর মে সোনে আছে।" বলে সে রাজার সৈন্যদের সঙ্গে হুড়মুড় করে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল।
যুদ্ধ করতে এল সেনারা। যুদ্ধ করে তারা ছেলেটাকে বন্দী করবে। কিন্তু এখন নিজেরাই যুদ্ধ ভুলে সোনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যত পারো এখন সোনা নাও। দু হাত ভরে তুলে নাও। তারা ভাঙতে শুরু করে দিল প্রাসাদের সোনার পাঁচিল। টুকরো টুকরো হয়ে সোনা ছিটকে পড়ছে চারিদিকে। অসংখ্য সৈনিক সেই সোনার টুকরোর ওপর লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করছে আর লুটে নিচ্ছে। তাদের সাধ মিটছে না। তারা চায়। আরও চায়। আরও ভাঙো। আরও কামান দাগো। গুড়ুম! গুড়ুম! প্রাসাদটা ভেঙে চুরমার করে দাও। ধড়-ধড়-ধড়-ধড়াস! দুম-দাম!
হঠাৎ কী ভয়ানক কানফাটা শব্দ শোনা গেল! তারপর আর্তনাদ করে উঠল কারা, "বাঁচাও, বাঁচাও!"
এ কী সর্বনাশ! প্রাসাদটা যে ভেঙে চুর-চুর হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল! প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের তলায় ওই তো সেনার দল চাপা পড়ে আর্তনাদ করছে। ওই তো চিৎকার করছে ম্যাজিকঅলা আর তিন জন্তু। না, এখন কেউ নেই এখানে ওদের বাঁচাবার। কেউ শুনতে পাবে না ওদের কান্না। ওই প্রাসাদের সোনার চাপে একটু পরেই ওদের বুকের ধুকধুকি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। তখন আর এই সোনা লুঠ করার জন্যে ওরা চিৎকার করে লাফাবে না। দু'হাত বাড়িয়ে ছুটবেও না।

দ্যাখো, দ্যাখো! হঠাৎ কেমন চাঁদের আলো ঢেউ খেলছে! দ্যাখো, ঢেউয়ের ওপর দুলতে দুলতে কে যেন তার সাদা পোশাকখানি উড়িয়ে দিয়ে ছুটে যায়। মেঘবরন চুলের রাশি তার মুখখানি ঢেকে দেয়, আবার সরিয়ে নেয়! এই তাকে দেখা যায়, আবার আলোর ঢেউয়ে হারিয়ে যায়! তাকে হীরালাল দেখতে পেয়েছে। হীরালাল কিছু বলার আগেই সে হাত বাড়াল। বললে, "হীরালাল, তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরো।"
হীরালাল তার হাত ধরল। হীরালালের হাত ধরে পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে হাওয়ার মতো ছুটে গেল সে! অনেকদূর চলে এসেছে তারা। পাহাড়ের ওপরে, আরও ওপরে।
ছুটতে ছুটতে সে জিজ্ঞেস করলে, "হীরালাল, আমায় দেখতে পাচ্ছ?"
হীরালাল বললে, "তোমায় ছুঁতে পারছি।"
"আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে আরও ছুটতে হবে, পারবে?"
হীরালাল জিজ্ঞেস করল, "কত দূর?"
"ওই পাহাড়ের ওপারে!"
"ওখানে কী আছে?"
সে বলল, "ওখানে ছোট্ট নদী আছে। নদীর বুকে নৌকো আছে। কাশফুলের ঢেউ আছে। শিউলি ফুলের গন্ধ আছে। ছোট্ট মাটির ঘর আছে। মা আছে আর লক্ষ্মী আছে।"
"আর তুমি?"
এবার তার গলার স্বর কেঁপে উঠল। ছুটতে ছুটতে কাঁপা স্বর হাওয়ায় ভেসে হীরালালের কানে এল, "আমি তো নেই, আমি হারিয়ে গেছি!"
হীরালাল হেসে ফেললে। বললে, "তুমি কী মিথ্যে বলো! কই তুমি হারিয়ে গেছ? এই তো, আমি তোমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটছি। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি!"
জ্যোৎস্নায় আঁকা ওর আঁচলখানি হাওয়ায় উড়ে এসে হীরালালের কপালখানি ছুঁয়ে গেল! হীরালালের চোখের তারা হঠাৎ আলোয় চমকে উঠল। অবাক হয়ে হীরালাল জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কে?"
সে বলল, "আমি পূর্ণিমা।"
"ওমা! আমার দিদির নামও তো ছিল পূর্ণিমা! মা বলেছে

দিদি আমার মেঘের দেশে চলে গেছে। জানো, যেদিন থেকে দিদি চলে গেছে, সেদিন থেকে হীরামন নামটাও আমার হারিয়ে গেছে। আর ও-নামে কেউ ডাকে না আমায়।"

সে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সে ডেকে উঠল, "হী-রা-ম-ন।"

আঃ! কী মিষ্টি সে ডাক। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কার যেন গানের সুর ছড়িয়ে গেল! সেই সুরে সুর মিলিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় একটি পাখি ডেকে উঠল, "হী-রা-ম-ন!"

ছুটতে ছুটতে আনন্দে শিউরে উঠল হীরালাল।

সে আবার ডাকল, "হী-রা-ম-ন!"

চাঁদের আলোর সঙ্গে লুটোপুটি খেতে খেতে বাতাসেরা হেসে উঠল, "হী-রা-ম-ন।"

হীরালাল খুশিতে আরও জোরে তার হাতখানি চেপে ধরল।

সে ছুটে যায়। হীরালালের খুশি দেখে সে আবার ডাক দিল, "হী-রা-ম-ন!"

আর থাকতে পারল না হীরালাল। কী তার মনে হল, সেই সুরে সুর মিলিয়ে হীরালালও ডেকে ফেলল, "দি-দি।"

তবে কি হীরালাল জেনে ফেলেছে এখন, যার হাত ধরে সে ছুটে যায়, সে-ই তার দিদি। হবেও বা।

আনন্দে-খুশিতে হীরালাল এখন দিদির হাত ধরে ছুটবে। ছুটতে ছুটতে হাসবে। না-হয় জ্যোৎস্নার আলোর মতো হাওয়ায় ঢেউ তুলে নেচে উঠবে।

কিন্তু হঠাৎ এ কী হল! হীরালাল হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল যেন! হ্যাঁ, ওই তো হীরালালের পা পিছলে গেল পাথরের ওপর! দিদির হাত ফসকে সে যে ওই অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছে! কী সাংঘাতিক! ও হয়তো খুশিতে ছুটতে ছুটতে দেখতে পায়নি, যেখানে সেই মস্ত উঁচু পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে রাশি-রাশি জল নীচে গড়িয়ে পড়ছে, সেখানে পিছল! পড়তে পড়তে ভয়ে চিৎকার করে উঠল হীরালাল, "দি-দি-ই-ই-ই!"

কই দিদি! যেদিকে চাও শূন্য। দিদি নেই, কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু এক ঝলক দমকা হাওয়া তোলপাড় করে একটি ছোট্ট মেয়ের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল, "হী-রা-ম-ন-ন-ন।"

কাঁদতে কাঁদতে সেই হাওয়া পাথরে পাথরে মাথা কুটতে লাগল। সেই হাওয়া গাছে গাছে ঝড় তুলল! সেই হাওয়া আকুল হয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

পাহাড়ের ওপর থেকে ওই রাশি-রাশি জল কেমন পাথরে পাথরে লাফ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে কেমন একটি ছোট্ট নদীর মতো ঝুমঝুম করে ঝুমঝুমি বাজিয়ে বয়ে যাচ্ছে! ওই দ্যাখো-না পূর্ণিমার চাঁদটি নদীর জলে ছায়া মেলে দোল খায়!

হীরালাল পাহাড়ের ওপর থেকে ওই নদীর বুকে পড়বে বোধহয়! সে পড়ল, কিন্তু আশ্চর্য, সে তো অতল তলে তলিয়ে গেল না। জলের ছায়ায় ওই পূর্ণিমার চাঁদটি যেন কোল পেতে ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। না, চাঁদ ওকে ডুবতে দেবে না। হীরালাল নদীর জলে ভেসে যায়। চাঁদও ভাসতে ভাসতে জলের দোলায় দোল খায়। দুলতে দুলতে ঘুমিয়ে পড়ল হীরালাল। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ দেখতে পেল না।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল হীরালালের। চোখ চেয়ে অবাক হয়ে গেল হীরালাল। আরে! কী সুন্দর ছোট্ট একটি নৌকোতে শুয়ে আছে সে! ধড়ফড় করে উঠে পড়ল হীরালাল। ও মা! এ যে তাদেরই সেই ছোট্ট নদী। তাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। ওই তো দূরে বন! এই তো তাদের ঘরে যাওয়ার রাস্তা!

নৌকো থেকে নদীর ঘাটে নেমে পড়ল হীরালাল। নদীর জলে নিজের মুখখানি একবার দেখে নিল। আকাশে চাইল। নীল আকাশে সোনালি সূর্য সকালের খুশি ছড়িয়ে দিয়েছে। হাঁটা দিল হীরালাল।

আর একটু হাঁটলেই তাদের ছোট্ট ঘরখানি। ছোট্ট ঘরে মা হয়তো কাঁদছে হীরালালের জন্যে। ঘরে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেবে সে। তারপর বলবে, "কেঁদো না মা। আমি তোমার হীরালাল। এই তো তোমার কাছে ফিরে এসেছি।" বলতে বলতে সে-ও হয়তো কেঁদে ফেলবে! তারপর হয়তো লক্ষ্মীর বাচ্চাটা ওর পিঠে মুখ ঠেকিয়ে ওকে আদর করবে। সে হয়তো বলবে, "কেঁদো না, কেঁদো না হীরালাল। আমার সঙ্গে খেলবে এসো।"

হীরালাল বুঝবে কি তার কথা? না সে কাঁদবে, এখনও?

তবু হীরালাল কাঁদবে আর চমকে চমকে ভাববে, ওই যেন তার পায়ের নূপুর বেজে উঠছে! ওই যেন সে হাত দুলিয়ে ডাকছে তাকে! ওই বুঝি তার গলার স্বরে সোনা ঝরছে, হী-রা-ম-ন! হী-রা-ম-ন!

হ্যাঁ, তুমিও শুনতে পাবে। শুনতে পাবে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-নিঝুম রাতে যদি একমনে কান পেতে শোনো। শুনবে, এখনও সে কাঁদছে। ফোঁটা-ফোঁটা কান্নায় যেন বেজে-বেজে উঠছে, হী-রা-ম-ন! হী-রা-ম-ন!

(সমাপ্ত)

হুলোর রাজা

অলোক প্রধান

সকাল থেকেই রেষারেষি
অশান্তি আজ বড্ড বেশি
ইঁদুর বাঁদর ছাইল যে!
মীটিং করো মীটিং করো
গলদ কোথায় পাকড়ে ধরো.
পাঁচ বেড়ালে খাইল যে!
বেড়ালগুলোর বদন কালো
চর্ম কালো, কর্ম কালো,
ধর্মাধর্ম অতল জল।
সাঁতালডিহি না জলঢাকা
কোথায় আছো ওদের কাকা
হুলোর রাজা 'হল্লাহল'।

ছবি দেবাশিস দেব

ডাম্বেলের গপ্পো

কণা বসুমিশ্র

ওই যে ডাম্বেল আসছে। পাঁতির মতো গোল গোল চোখ। চ্যাপটা নাক ঠিক চীনেমানের মতো। মাথায় কদমছাঁট চুল। তিন ফুট মানুষটা। ছোট্ট মানুষ হলে কী হবে, বুদ্ধিতে সে দারুণ সেয়ানা। স্কুলের বাসে ফেরার সময় এই আধ ঘন্টা সময়টাকে কাজে লাগানোর সুন্দর উপায় ডাম্বেলের মতো আর কারো জানা নেই। কোনোদিন কারো রবারটাকে গায়েব করে ও চালান করে দেয় জামার কলারের নীচে। তার পর ফুস্‌মন্তর ম্যাজিক করে সেটা বার করে বগলের তলা থেকে। কুম্ফু মেরে এই গত সোমবার ও সুদীপকে তিন নম্বর থেকে চার নম্বর বেঞ্চে চালান করে দিল। সুদীপ লাট্টুর মতো ছিটকে পড়ল ভিক্টরের কোলে। অরূপের ভার সইতে না পেরে ভিক্টর গড়িয়ে পড়ল মণিদীপার ঘাড়ে। মণিদীপা পড়ল......।

রজনীদা, মানে যিনি ছেলেদের দেখেশুনে গুনে-টুনে রাখেন, উনি তো ড্রাইভারের পাশে বসে প্রায়ই খোশগপ্প করেন। সেই ফাঁকে এতসব কান্ড হতে থাকে। হই-হই গোলমাল কানে যেতেই রজনীদা রক্তচক্ষু নিয়ে তেড়ে আসেন। ও'র হাতে থাকে স্কেল। হয়তো দু-একটা বাড়িও পড়ে এলোমেলো, এদিক-সেদিক। "উহু-হুরে, আমি নই, সুদীপ, সুদীপ।'' সুদীপের পিঠে বাড়ি পড়লে সে লাফিয়ে বলে, "ডাম্বেল, ডাম্বেল, আমি নই, রজনীদা।''

এইসব ঘটনার অত্যাচারে অতিষ্ঠ রজনীদা সেদিন খুব হুমকি দেন, "যে ঝটঝামেলা করবে, তার নাম টুকে সোজা বড়দিমণিকে দিয়ে দেব।" রজনীদা কড়া নজর রাখেন আজকাল। ঠোঁটে আঙুল রেখে উনি বলেন, "স্পীক্‌টি নট।"

কিন্তু স্থির হয়ে বসে এই আধঘন্টা এক ঘন্টা সময় কাটানোও তো মুশকিল। চৈতী চেঁচিয়ে বলে, "রজনীদা, সুদীপ চিমটি কেটেছে।"

সমুদ্র চেঁচিয়ে বলে, "রজনীদা, ভিক্টর আমায় বক দেখাচ্ছে।"

এদের ঠান্ডা করার উপায় খুঁজে না পেয়ে রজনীদা সবাইকে

বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার দেন। সেদিন সবকটাকে গুনে গুনে বাসে তুলে হাসিমুখে বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে-কেউ একজন গল্প বলবে। বাকিরা সব শুনবে। একজনের গল্প শেষ হলে পরের জন শুরু করবে। যে আজ বলার সুযোগ পাবে না, সে কাল বলবে। যার কাল বলা হবে না, সে পরশু বলবে, পরশু যার হবে না, সে তরশু। তরশু না হলে গরশু, গরশু যার হবে না, সে লরশু। এইভাবে চলতে থাকবে।"

আজ ডাম্বেলের গল্প বলার দিন। ডাম্বেল শুরু করে, মাসি আর মেসোর সঙ্গে ও সেদিন জাদুঘরে গেছিল। সঙ্গে ওদের সিধুমামাও ছিলেন। ওরা যখন একতলায় রাখা পাথর-টাথর মমি-টমি দেখে দোতলায় ওষুধপত্তর দিয়ে রাখা মরা বাঘ-সিংহের ছালের মধ্যে অন্য জিনিস পোরা অবিকল জ্যান্ত জন্তুগুলোকে দেখতে গেল, তখন সিধুমামা আর ওদের সঙ্গী হলেন না। ডাম্বেল হাত ধরে অনেক টানাটানি করল, কিন্তু সিধুমামা গোঁ ধরে বসে রইলেন নীচের বেঞ্চিতে। বললেন, তাঁর নাকি শরীর ভাল নেই। খানিক বাদে ওরা ফিরে দেখে, সিধুমামা যেখানে বসে ছিলেন, সেখানে নেই। কী ব্যাপার? প্রচুর খোঁজা-খুঁজি হল। নেই তো নেই। মানুষটা কি হাওয়া হয়ে গেল? অত বড় মানুষটাকে তো আর ছেলেধরা নিয়ে যেতে পারে না? খুঁজতে খুঁজতে ওরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মাসি বললেন, "সিধুদা নিশ্চয় বাড়ি চলে গেছেন। আমরা বোকার মতো না খুঁজে বরং বাড়িই ফিরে যাই।"

আইসক্রীম-টিম খেয়ে তো ওরা ফের গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি চলছে। ডাম্বেলের মনে হল, পেছন থেকে কে যেন কেসে উঠল। ঠিক সিধুমামার কাসির মতো শব্দ না? ওরা সবাই পেছন ফিরে দেখল, কেউ নেই। পরিষ্কার দিনের আলো। এই বিকেল চারটের সময় তো কোনো ভৌতিক ঘটনাও ঘটতে পারে না। এটা স্রেফ মনের ভুল। কিন্তু ভুলটা কি সবারই? এ বিষয়ে কেউ কাউকে কোনো প্রশ্ন না করে একে অন্যের গা ঘেঁষে বসে রইল। ডাম্বেলের বুকের মধ্যে যেন ব্যাঙের লাফানি চলছিল।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে সিধুমামার গলায় কে গান গেয়ে উঠল। আর আওয়াজটা গাড়ির মধ্যে থেকেই ভেসে এল। "সিধুদা, সিধুদা, তুই কোথায়?" ছোটমাসি চেঁচাতে লাগলেন। ডাম্বেল তো ভয় পেয়ে মেসোর হাত ধরেই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সিধুমামা কি মরে ভূত হয়ে গেলেন? কেউ কি মেরে ফেলল সিধুমামাকে? বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেসোও খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিলেন। নেই, সিধুমামা ফেরেননি নাকি। তবে ওঁর গলার গান ভেসে আসে কী করে? মেসোমশাই জোরে একটা লাথি মারলেন গাড়ির গায়ে। ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল পুরনো গাড়ির শরীর। আর তখুনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভোজবাজির মতো সিধুমামা বেরিয়ে এলেন হাসতে হাসতে লাগেজ বুটের ঢাকনা ঠেলে। ভূত নয়, প্রেত নয়, জলজ্যান্ত একটা মানুষের গোটা শরীর।

চৈতী বলল, "লাগেজ বুট মানে কী রে?"

মণিদীপা বলল, "ওই তো গাড়ির পেছনে মালপত্র রাখার যে বাক্সটা থাকে।"

ভিক্টর বলল, "হ্যাঁ রে ডাম্বেল, তোর সিধুমামা নিশ্বাস নিল কী করে! লাগেজ বুটের ঢাকনাটা তো বন্ধ ছিল।"

ডাম্বেল ভারিক্কি চালে বলল, "এত সব প্রশ্ন করলে কি আর গল্প বলা যায়?"

প্রায় দিন দশেক পর আজ আবার এল ডাম্বেলের গল্প বলার পালা। এই দশদিন চৈতী, ভিক্টর, সুদীপ, সমুদ্র ওরা সব গল্প বলেছে। এখন আর বাসে কোনো ঝামেলা হয় না। রজনীদা ড্রাইভারের পাশে বসে গল্পগুজব করেন। সেদিন ছুটির পর লাইন করে বাসে উঠেই সবাই ডাম্বেলকে চেপে ধরল, গল্প বলতে হবে। ডাম্বেল ওর মোটাসোটা দেহটা নিয়ে নড়ে-চড়ে বসল। বেজার মুখে বলল, "ছুটির পর বাড়ি-টাড়ি যেতে কারো ভাল লাগে, বল তোরা? যদি বাবা-মা না থাকেন?"

"কেন, তোর মা-বাবা কোথায়?" সুদীপ বলল।

ডাম্বেল নিজের মাথার ওপরে একটা আঙুল ঘুরিয়ে বলল, "শূন্যে।"

চৈতী বলল, "তবে তুই কার কাছে থাকিস?"

ডাম্বেল বলল, "মাসি-মেসোর কাছে।" ডাম্বেলের পুঁতির মতো চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। ও বলতে আরম্ভ করল, এই গেলবার পুজোর সময় মাসি, মেসো এসেছেন আমাদের বাড়ি অষ্টমীর দিন। মা বললেন, "আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তুই ওদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যা।" মাকে ফেলে ডাম্বেল কিছুতেই যেতে রাজি হয় না। শেষকালে মাসি-মেসোর অনুরোধে ওকে যেতেই হল। তাছাড়া একটা চাবি দেওয়া মিলিটারি জীপ-গাড়ির লোভও তো কম ছিল না। মাসি বলেছিল, "তোকে সেই জীপ-গাড়িটা কিনে দেব ডাম্বেল, সেই চাবি দিলেই যে দু'জন মিলিটারি গুলি করতে করতে যায়।" ডাম্বেল দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে সুড়সুড় করে চলে গেল মাসি-মেসোর সঙ্গে।

সন্ধের পর ওরা যখন বাড়ি ফিরল, তখন দেখে ওদের বাড়ির সামনে প্রচুর ভিড়। এমন কী দমকলের গাড়ি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোতলায় রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া আসছে। সর্বনাশ! কী হল? মাসি তো ডাম্বেলের হাত ধরে ভিড় ঠেলে ঠেলে ছুটলেন। দমকলের লোকেরা আগুন নেভানোয় ব্যস্ত। ওরা কেউ ঢুকতে দিল না ওদের। গ্যাস জেবলে রান্না করছিলেন মা। গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে এই কান্ড। ডাম্বেল তো "মা, মাগো!" বলে কাঁদতে লাগল। আগুন নিভিয়ে দমকলের লোকেরা দেখল, ওখানে একটা বাঁদর মরে পড়ে আছে। তাহলে ডাম্বেলের মা কোথায় গেল? সে রহস্য এখনও অজানা। অনেকে বলেন, মা হয়তো গ্যাস জেবলে রেখে ছাদে-টাদে গেছিলেন। এই সুযোগে বাঁদরটা ঢুকে পড়েছিল রান্নাঘরে। সেই বাঁদরটাকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করত একটা লোক। কদিন ধরে বাঁদরটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদে। দুষ্টু বাঁদরঅলাটাই কি ধরে নিয়ে গেল ওর মাকে? কেউ বলতে পারে না এ-কথা। মায়ের জন্যে ডাম্বেল এখনো কাঁদে। রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে মায়ের স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর মা হারিয়ে যাবার পর থেকে মাসি-মেসো ওদের বাড়িই থেকে গেলেন। বাঁদর-অলাটাকে পুলিস আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"তোর বাবাকে খবর দেওয়া হল না?" সুদীপ বলল।

ডাম্বেল বলল, "হবে না কেন? বাবা তো তখন জাহাজে, সমুদ্রে ভাসছেন।"

চৈতী বলল, "সমুদ্রে কেন?"

ডাম্বেল বলল, "আমার বাবা তো জাহাজের এঞ্জিনীয়ার।"

"ও।" ভিক্টর বলল, "জাহাজের এঞ্জিনীয়ারকে মেরিন এঞ্জিনীয়ার বলে জানিস?"

সমুদ্র বলল, "আর প্লেন-টেন পরীক্ষা করে যে এঞ্জিনীয়ার, তাকে বলে গ্রাউন্ড এঞ্জিনীয়ার।"

সুদীপ বলল, "এখন এ-সব বলে সময় নষ্ট করবি? না ওর গল্প শুনবি?"

ডাম্বেল কোনো কথা বলছে না। ও ছল-ছল চোখে তাকিয়ে আছে।

মণিদীপা বলল, "তোর বাবাকে তো খবর দেওয়া হল?"

ডাম্বেল কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "হ্যাঁ। বাবা তখন আরব সাগরে বম্বের কাছাকাছি ছিলেন। বাবার কাছে খবর গেল যেদিন, তার পর-দিনই সমুদ্রে ঝড় উঠল। সমুদ্রের ঝড় ভীষণ।

ঢেউগুলো সাপের মতো ফণা তুলে তুলে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে ছোবল দিতে লাগল। আমার বাবা ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। তার পর ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাঁতার কেটে কেটে বাবা তো চলতে লাগলেন। এভাবে দুদিন কেটে গেল। জল-তেষ্টায় ওঁর গলা শুকিয়ে কাঠ। সামনে এত জল। কিন্তু বাবা জল খেতে পারছেন না এক ফোঁটা।

ভিক্টর বলল, "কেন?"

চৈতী বলল, "সমুদ্রের জলে যে শুধুই নুন। খাবেন কী করে?"

ডাম্বেল আবার বলতে লাগল, "তীরের কাছাকাছি যখন এসেছেন, তখন ঝড়ও থেমেছে। বাবার জ্যান্ত শরীরটা তখন একটা মরা মানুষের শরীরের মতো ওঠানামা করছে। ভাসতে ভাসতে একটা বয়ার সঙ্গে প্রচন্ড জোরে ধাক্কা খেলেন বাবা।"

"বয়া মানে কী রে?" সুদীপ প্রশ্ন করল।

ভিক্টর বলল, "ওই গোল গোল লোহার থাকে। গঙ্গার ঘাটে দেখিসনি? জলের মধ্যে ভাসে? ওরা চিহ্ন ঠিক করে।"

"তার পর কী হল?" সমুদ্র অধৈর্য ভাবে প্রশ্ন করল।

ডাম্বেল বলল, "আমার বাবা তলিয়ে গেলেন আরব সাগরের জলে। ওটা আসলে বয়া ছিল না। ওটা ছিল একটা প্রকান্ড তিমি। তিমিটা ডিগবাজি খেয়ে ভাসছিল। মনে হচ্ছিল যেন একটা বয়া।"

ডাম্বেল থামল। কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। ওদের সবার চোখই তখন জলে ভরে উঠেছে। খানিক বাদে ভিক্টর বলল, "তোর বাবা তো আরব সাগরে তলিয়ে গেলেন। গল্পটা বলল কে?"

ডাম্বেল উদাস হয়ে বলল, "ডায়েরিটা ভেসে এসেছিল সমুদ্রের জলে। জাহাজের নাবিক সেটা পেয়েছিল।"

"সাঁতার কাটতে কাটতেও তোর বাবা ডায়েরি লিখেছিলেন?" মণিদীপা বলল। ডাম্বেল তখন অন্যমনস্ক। ওর চোখে জল টলটল করছে।

পরদিন ডাম্বেলকে এ ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করে না। ওর মনে তো খুব দুঃখ। ও যদি কেঁদে ফেলে? রাস্তায় কোনো বাঁদরঅলা খেলা দেখাতে এলেই ওরা দৌড়ে গিয়ে হাজির হয়, যদি ডাম্বেলের মাকে দেখা যায় সেখানে?

বন্ধুদের সহানুভূতি বেড়ে গেল ডাম্বেলের ওপর। ভিক্টর ওকে দিয়ে দিল ওর প্রিয় নাইলনের রবারটা। সুদীপ দিল ওর অনেক যত্নের ক্রিকেট-ব্যাটটা, চৈতী ওকে একটা পেন্সিল দিয়ে দিল।

ডাম্বেলের চোখে এখন আর জল নেই। স্কুলের বাসে ফেরার সময় ওরা আবার গল্প করতে করতে যায়। তবে দুঃখের গল্প কেউ করে না। সব মজার গল্প।

সেদিন ছুটির পর ওরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসল। রজনীদা বললেন, "আজ কার গল্প বলার দিন?"

ওরা তাকাল ডাম্বেলের দিকে। ডাম্বেল গম্ভীর হয়ে বসে চিকলেট খেতে লাগল। বলল, "আজ বলব না, তোরা বল।"

ভিক্টর বলল, "তুই তো গল্পের রাজা রে। বল বল।"

ডাম্বেল গম্ভীরভাবে বলল, "বাঁদরঅলাটা ধরা পড়েছে।"

"কোথায়? কোথায়?" সুদীপ চেঁচাল। ওরা সবাই চেঁচাল।

ডাম্বেল বলল, "সে এখন আলিপুর জেলে।"

"আর তোর মা?" ওরা সবাই তাকাল।

ডাম্বেল মাথার ওপর ফের আঙুল ঘুরিয়ে বলল, "শূন্যে।"

ভিক্টর বলল, "তিমি মাছটা ধরা পড়েনি ডাম্বেল!"

ডাম্বেল উদাস ভাবে বলল, "নাহ্।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই ডাম্বেলের বাড়ির কাছে বাস পৌঁছে গেল। ওর বাড়িই প্রথমে পড়ে। তার পর পড়বে চৈতীর

বাড়ি, তার পর ভিক্টরের, তার পর সুদীপের......। ওয়াটার বটল কাঁধে ঝুলিয়ে সুটকেস হাতে নিয়ে নামার জন্যে ডাম্বেল প্রস্তুত হল। বন্ধুরা উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, "বাঁদরঅলাটাকে পুলিস ঠিক গুলি করবে।" কেউ বলল, "ওর ফাঁসি হবে।" কেউ বলল, "ওকে আন্দামানের জেলে পাঠিয়ে দেবে।" ডাম্বেল কোনো কথা বলল না। ওকে খুব গম্ভীর দেখাল।

ওদের বাড়িটা ধবধবে সাদা। সামনে একটা রেলিং-দেওয়া বারান্দা আছে। সেই বারান্দায় একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। বাস এসে থামল ওদের গেটের কাছে। নামবার পূর্বমুহূর্তে ডাম্বেল ওই ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, "ওই দ্যাখ আমার বাবা।"

ওরা তোতলা হয়ে গেল, "তো—তোর বাবা তো......।"

ডাম্বেল হাসতে হাসতে বলল, "আরে ওটা তো গল্প। আমার বাবা, মা দুজনেই আছেন। ওঁরা কোনোদিনই হারিয়ে যাননি। বাবা-মাকে হিরো আর হিরোইন বানিয়ে দেখলাম, কেমন লাগে?"

চৈতী মাথা দুলিয়ে বলল, "মা-বাবাকে নিয়ে এরকম গল্প একদম ভাল না।"

ভিক্টর বলল, "তোর সিধুমামার গল্পটাই চমৎকার।"

ছবি দেবাশিস দেব

কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

হেড এগজামিনার

এ লেখা তাদেরই জন্য যারা নিজেদের লেখাপড়ায় 'ভাল ছেলে' বা ভাল মেয়ে' বলে মনে করে না। এর মধ্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই পড়বে। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে। ভাল ছেলে বা মেয়ে নও বলেই যে তোমরা নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বেগ হয়ে বসে থাকবে, ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে—এ আমি ভাবতে পারছি না। তোমরা নিজেরা নিজেদের যে-নম্বর পাবার যোগ্য মনে করো, তার চেয়ে কিছু বেশি নম্বর তোমরা সব সময়েই পেতে পারো। এতে কোনো ভুল নেই। তার জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করতে হবে, একটু মাথা খাটাতে হবে—সে কথা যেমন ঠিক, তেমনি আরো সার কথা হল—আসলে কতকগুলো কায়দা বা রণকৌশলও জানতে হবে। অনেক 'ভাল' ছেলে বা মেয়ে শুধু ঐ কায়দাকানুনগুলো জানে বলেই 'ভাল' বিশেষণটা পায়। তারা তোমাদের মতো 'অ-ভাল' ছেলেমেয়েদের চাইতে যে বেশি জানে, বা বেশি ভাল তৈরি থাকে—তা সবসময় নয়। এখন মাধ্যমিকের বেশ কয়েক মাস বাকি আছে, এর মধ্যে কেতা-কৌশলগুলো শিখে, অভ্যাস করে এবং যত্ন নিয়ে তৈরি হয়ে যদি পরীক্ষায় বসো তবে পেপার-পিছু ছ-সাত নম্বর বাড়ানো এমন কিছু দুরূহ বা দুঃসাধ্য কাজ নয়।

বাংলার হেড-এগজামিনার বলছেন

আমি কায়দাকানুনগুলির কথাই আগে বলছি, কারণ আমি চাই আগে তোমরা এগুলির গুরুত্ব অনুভব করো। আর এটাও বোঝো যে, পরীক্ষায় ভাল করতে হলে পড়াশোনা যেমন দরকার, তেমনি এই কেতাগুলিও সমান জরুরি। এগুলি না জানলে অতি ভাল ছাত্রের চমৎকার লেখা খাতাও প্রাপ্যের চেয়ে কম নম্বর পায়। আমি আমার পরীক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে-সব নিয়ম বা নীতি তৈরি করতে পেরেছি সেগুলির তালিকা এইরকম :

১। খাতা পেয়েই চারপাশে অন্তত দু-ইঞ্চি মার্জিন রেখে ভাঁজ করে নেবে, এ-ব্যাপারে যেন একদম কার্পণ্য না হয়। কাগজ যত চাইবে তত পাবে, কিন্তু খাতার উপরে নীচে এবং বাঁয়ে মার্জিন রেখে উত্তর সাজানো হলে চোখ খুশি হয়। মনে রাখবে, পরীক্ষকের চোখ খুশি হলেই তোমার প্রাথমিক জিত।

২। দুটি প্রশ্নের মধ্যে হয় কমপক্ষে দু-ইঞ্চি সাদা জায়গা ফাঁক রাখবে, না-হয় পেন্সিল দিয়ে সোজা (স্কেল ব্যবহার করলে ভাল হয়) দাগ কেটে প্রশ্নদুটিকে আলাদা করে দেবে।

৩। হাতের লেখা খারাপ? শোনো, সেটা খুব একটা বড় সমস্যা নয়, বড় সমস্যা আসলে দুর্বোধ হাতের লেখা। দুটো এক কথা নয়। ছবির মতো সুন্দর লেখাও অনেক সময় পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় (ধরো বাংলা পুথির লেখা যেমন), আর পদে-পদে হোঁচট খেতে থাকলে পরীক্ষক বেশ চটে যান। যা লিখবে তা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে কি না দেখবে, যদি তা না যায়—এ ক'মাস এদিকে একটু নজর দাও। লেখাকে সুন্দর করার দরকার নেই, স্বচ্ছ করো। সুন্দর হোক, অসুন্দর হোক, খুদে হোক, বিশাল হোক—হাতের লেখা যেন সহজে পড়া যায়।

৪। হাতের লেখায় অক্ষরের এই জোড়গুলির পরস্পরের তফাত মেনে চলবার চেষ্টা করো—ক্ষ/হ্ম; জ্ঞ/ঞ্জ; রু/রূ; ন/ণ হু/হূ।

৫। প্রত্যেক প্রশ্নের নম্বর স্পষ্ট করে লেখো।

৬। সুন্দর করে প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ সাজাও এবং দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে পরিষ্কার জায়গা রাখো।

কীভাবে তৈরি হবে

এবার পেছুনো যাক বর্তমানে। তোমরা এখনই পরীক্ষার তোড়জোড় শুরু করেছ, এবং এই সময়ে দু-চারটে কাজের কথা খেয়াল রাখা দরকার। প্রথম কাজের কথা হল, পাঠ্যবইটি একেবারে নখদর্পণে রাখতে হবে। ক'বছরের প্রশ্নের ধারা যারা লক্ষ করছ তারা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, মাধ্যমিকের দুটি পেপারে মাত্র চল্লিশ নম্বর যথার্থভাবে বাইরে থেকে আসছে—রচনার কুড়ি, অনুবাদের দশ আর ভাব-সম্প্রসারণ বা সরলীকরণের দশ। যারা এর মধ্যে বাংলাটা গুছিয়ে লিখতে শিখেছ এবং বন্ধুমহলে উদীয়মান কবি বা সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছ তারা যদি ভেবে থাকো যে, পাঠ্যবইটা উপর-উপর পড়া থাকলেই হল, সব 'বানিয়ে' লিখে দেব—তাহলে পরিণতি খুব শোকাবহ হবে সন্দেহ নেই। এখনকার প্রশ্নে 'বানিয়ে লেখার' সুযোগ নেই। পাঠ্যবই থেকে ঐ 'অবজেকটিভ' ধরনের প্রশ্ন কখন কোত্থেকে আসবে ঠিক নেই, কাজেই প্রতিটি পাঠ্য গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ খুব মন দিয়ে পড়তে হবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—সম্ভাব্য অংশগুলি দাগিয়ে নিয়ে।

দ্বিতীয়ত, একটা প্রশ্নে যে ভাগগুলি থাকে সেগুলি কদাচ মিশিয়ে ফেলবে না, লেখার সময় প্যারাগ্রাফ অবশ্যই আলাদা করবে। কোন্ অংশে কী চাওয়া হচ্ছে—সেটা যেন নজর না এড়ায়। এবারে দ্বিতীয় পত্রের ১ (ঘ) সংখ্যক প্রশ্নটিতে [১৯৭৬-৭৭ সিলেবাস] 'মেজদা' গদ্যাংশের "সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে" বাক্যটি তুলে দিয়ে চাওয়া হয়েছে (ক) দিনটা কেমন ছিল, (খ) সে সন্ধ্যায় শ্রীকান্তদের বৈঠকখানায় ও বৈঠকখানার বাইরে কে কোথায় ছিল, এবং (গ) তারা কে কী করছিল। যত খাতা দেখেছি তার অধিকাংশের উত্তরে 'খ' আর 'গ' গুলিয়ে ফেলেছে। লক্ষ করো, দুটো পরিষ্কার আলাদা প্রশ্ন : কে কোথায় ছিল, আর কে কী করছিল—কিছুতেই এক কথা নয়। একটায় শুধু মানুষগুলির 'শারীরিক অবস্থান' জানতে চাওয়া হয়েছে, আরেকটায় তাদের 'কার্যকলাপের বিবরণ' চাওয়া হয়েছে। দুটো মিশিয়ে ফেললে পরীক্ষক ক্ষমা করবেন কেন? একটু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে তো!

এই নিছক অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্নেই আবার কখনো তোমাদের একটু ভাবতে বা মন্তব্য করতে বলা হয়। কঠিন কিছুই নয়, সোজা ব্যাপার—কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র তার হদিসই পায় না। ধরো ঐ দ্বিতীয় পত্রেরই ১৯৭৮-৭৯ সিলেবাসের ১ (খ) প্রশ্নটি। 'সাগর সঙ্গমে নবকুমার' গদ্যাংশে পুরুষেরা দুর্গানাম জপ করছিল কেন, এই প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে

"শুধু একটি স্ত্রীলোক কাঁদে নাই কেন?'' বেশির ভাগই লিখেছে যে, সে প্রাচীন প্রথা অনুসারে গঙ্গাসাগরে সন্তানকে জলে দিয়ে আর তুলতে পারেনি, তাই। ব্যস? ওতেই কারণটা স্পষ্ট হল কি? এটা বলতে হবে না যে, তার ফলে এখন তার কাছে জীবনের আর কোনো আকর্ষণ নেই, মৃত্যুই বেশি কাম্য—তাই সে কাঁদেনি? যারা এটুকু জুড়েছে তারা শুধু ঐ একটি প্রশ্নেই দেড় থেকে দু নম্বর বেশি পেয়েছে। অর্থাৎ বইয়ের বিষয়গুলি যেমন জানতে বা মুখস্থ করতে হবে, তেমনি মস্তিষ্ককে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে চলবে না, একটুখানি খাটাতে হবে।

ব্যাকরণে অনায়াসে বেশ কিছু নম্বর বাড়াতে পারো, যদি **সমাস, প্রত্যয়** আর **কারক-বিভক্তি**—এই তিনটে অধ্যায় খুব মন দিয়ে পড়ো। কৃৎ আর তদ্ধিত নাম বলতে পারলেই যেখানে আধখানা করে নম্বর সেখানে শত শত ছেলেমেয়ের শূন্য পাওয়া দেখে মনে বড় কষ্ট পাই। কী এমন কঠিন জিনিস? তিন-চার দিনে ঐ তিনটে বিষয় ঝরঝরে জানা হয়ে যায়—যদি আগ্রহ আর আন্তরিকতা থাকে। এখনই মাস্টারমশাই বা অভিভাবককে জিজ্ঞেস করে বুঝে নাও এগুলি।

অনুবাদের দশা দেখেও খুব মুষড়ে পড়েছি। 'পেট্রিয়ট' মানে যে 'তোতাপাখি' নয় 'দেশপ্রেমিক'—এই কথাটা মাধ্যমিকের শতকরা সত্তর ভাগ ছেলেমেয়ে জানে না, এ দেখে কার ভাল লাগে? অথচ অনুবাদে দশে সাত-আট পাওয়া কিছুই না। আর ঠিক প্রতিশব্দটি কী হবে একটু ভাববে, যেমন ভাববে বাংলা বাক্যের গঠন কী হবে। এবারের অনুবাদে দেশপ্রেমিকের কথায় বলা হয়েছে যে, তারা দেশকে to the last রক্ষা করে। আমার দেখা চার হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেবল একটি মেয়ে সেই নির্ভুল প্রার্থিত বাংলা প্রতিশব্দটি লিখেছে—'আমরণ'। আর কেউ পারেনি। মেয়েটিকে দশে নয় না দিয়ে পারা যায়?

একটি ভয়ংকর রাক্ষস আছে—বানানভুল। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কিন্তু কঠিন নয়। ব্যাকরণে অশুদ্ধ বানানের একটা তালিকা আছে—সেগুলির শুদ্ধ রূপ শুধু মুখস্থ করবে তা নয়, প্রত্যেকটি অন্তত পঞ্চাশবার লিখে অভ্যাস করবে। ঘরে দেয়ালে পোস্টারের আকারে লিখেও রাখতে পারো—তাহলে এ-জন্মে আর ভুলবে না।

সবচেয়ে বড় কথা এবার বলি, সাধু আর চলিত ভাষা মিশিয়ে ফেলবে না! এখনই প্রশ্ন লিখে লিখে দেখিয়ে নাও, শুধরে নাও এ ভুল থাকলে। এটা একটা সর্বনেশে অপরাধ, শতকরা আশি জন এই ভুলের খপ্পরে পড়ে। এক জায়গায় 'দেখে' লিখে তারপরেই যে লেখে 'বলিয়াছিলেন', তার উপর পরীক্ষকের কোনো স্নেহ জন্মায় না মনে রেখো।

ইংরেজির হেড-এগজামিনার বলছেন

নম্বর বাড়ানোর কোনো জাদুমন্ত্র নেই। তবে চেষ্টা করলে আপন গুণেই নম্বর বাড়ানোর কৌশল আয়ত্ত করা যায়। সুতরাং মূল কথা : চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ ভাল করে পড়াশুনা করতে হবে এবং যা পড়ছ তা সঠিকভাবে সংক্ষেপে লেখার অভ্যাস করতে হবে। তবেই অধীত বিদ্যা আয়ত্ত হল কি না বোঝা যাবে। ইংরেজির ক্ষেত্রে একথাটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা কিন্তু অবশ্যপাঠ্য এবং তিনটি ভাষার মধ্যে ইংরেজি সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের ভীতি সবচেয়ে বেশি। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে ইংরেজি-ভীতি একেবারে অহেতুক নয়। কারণ ইংরেজিতে অনুত্তীর্ণের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তারপরেই গণিত। অথচ ভাষা ও গণিত এই দুটিই কিন্তু শিক্ষার মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড যদি সোজা না হয় তুমি চলবে কেমন করে? গণিতের কথা থাক। ভাষা প্রসঙ্গে ইংরেজির কথায় আসি।

বলছিলাম ইংরেজি-ভীতি ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের পথে প্রধান বাধা। এ বাধা অতিক্রম করা কিন্তু কঠিন নয়। এর জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। মোটামুটি জানলেই চলে। গত বছরের পরীক্ষায় (১৯৭৮) ইংরেজিতে লেটার মার্ক উঠেছিল এবং সেও এমন কিছু একটা অসাধারণ উত্তর নয়। ছয় থেকে সাতের ঘরে নম্বর অনেকেরই ছিল। কী করে অত নম্বর তারা পেল? উত্তর সহজ। এখন যে ধরনের প্রশ্ন থাকে তাতে অনেক-গুলি প্রশ্নের উত্তরেই অঙ্কের মতো পুরো নম্বর পাওয়া যায়। লেখার মধ্যে নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতার ছাপ থাকলে এবং উত্তরগুলি মোটামুটি নির্ভুল ও যথাযথ হলে তোমরাও ভাল নম্বর পাবে।

পুরনো প্রশ্নগুলি দেখো। পর-পর চার বছরের প্রশ্ন। প্রশ্নের নতুন রীতি চার বছরে পুরনো হয়েছে নিশ্চয়ই। একই ধাঁচে তিন ধরনের প্রশ্ন। (১) বিষয়মুখী (অবজেকটিভ টাইপ) (২) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক (৩) সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক। কোনটিতে কত নম্বর তাও নির্দিষ্ট করা আছে। সুতরাং সেইভাবে নিজেকে তৈরি করো।

এখন এ বছরের (১৯৭৯) প্রশ্নপত্রে আসি। বারো পৃষ্ঠার প্রশ্নপত্র দেখে আঁতকে উঠো না। ভাল করে প্রশ্নপত্রটি পড়ো। বাঁকা হরফে লেখা কথাগুলি, যা প্রথমেই আছে, বিশেষভাবে লক্ষ করো। উত্তর সংক্ষিপ্ত (brief) এবং যথাযথ (to the point) হলে বিশেষ স্বীকৃতি পাবে। স্বভাবতই বেশি নম্বর পাবে। সেই সঙ্গে সতর্কবাণী আছে। বানান ভুল, অপরিচ্ছন্নতা ও হাতের লেখা খারাপ হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নপত্রের প্রথমেই পাঠ্যগ্রন্থ (Textbook) থেকে প্রশ্ন। গদ্য থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন : নম্বর ২৫। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন কবিতা থেকে : নম্বর ১৫। সাত পৃষ্ঠা জুড়ে এই চারটি প্রশ্ন। কিন্তু সবটা তোমাকে পড়তে হবে না। প্রতিটি প্রশ্ন দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। একটি পুরনো সিলেবাস (১৯৭৬, '৭৭) এবং অন্যটি নতুন সিলেবাস (১৯৭৮, '৭৯) থেকে। উত্তর করবে, হয় পুরনো সিলেবাস অর্থাৎ গ্রুপ 'এ' থেকে অথবা নতুন সিলেবাস অর্থাৎ গ্রুপ 'বি' থেকে। দুটো গ্রুপ মিলিয়ে উত্তর করলে নম্বর কাটা যাবে। বাংলা প্রথম ভাষায় এই ভুল কেউ কেউ করেছে। ইংরেজির বেলায় তার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়। তাই সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি যে সিলেবাসে পরীক্ষা দিচ্ছ, কেবল সেই গ্রুপের প্রশ্নগুলি পড়বে এবং সেইগুলি থেকেই উত্তর দেবে। অন্য গ্রুপ থেকে নয়, এবং সে গ্রুপের প্রশ্ন পড়ে অযথা সময় নষ্ট করার দরকারও নেই।

প্রথম ও তৃতীয় প্রশ্ন অবজেকটিভ টাইপের। প্রথমটি থেকে চারটি এবং তৃতীয়টি থেকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। প্রতিটিতে ১ নম্বর এবং উত্তর একটি শব্দে। কিন্তু তুমি উত্তর করবে একটি সম্পূর্ণ বাক্যে এবং সেখানে নির্দিষ্ট শব্দটির নীচে দাগ দেবে। উত্তরপত্রে বাঁ দিকের মার্জিনে পরিষ্কারভাবে গ্রুপ ও প্রশ্নের নম্বর লিখবে এবং ডান দিকে উত্তর লিখতে শুরু করবে। যেমন :

Group B

(a) : The word 'weak' is nearest in meaning to 'feeble'.

(b) : The word 'rule' means 'government' in the sentence.

শুধু 'weak' শব্দটি বা শুধু 'rule' শব্দটি বসালে চলবে না। প্রতিটি উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যে লিখবে।

তিন নম্বরের প্রশ্নও গ্রুপ 'বি' থেকে বেছে নেবে এবং উত্তর করবে ঠিক এমনিভাবে। এক নম্বর প্রশ্নে ৪ নম্বর এবং তিন নম্বর প্রশ্নে ৩ নম্বর আছে। তুমি পুরোপুরি ৭ নম্বরই পেতে পারো এইভাবে উত্তর করলে।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক। দ্বিতীয়টি (গদ্য) থেকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। নম্বর ৩×৭ = ২১। প্রতিটি প্রশ্নের আবার তিনটি অংশ। নম্বর ২+৩+২। চতুর্থটি (কবিতা) থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। নম্বর ২×৬ = ১২। এখানেও প্রতিটি প্রশ্নের তিনটি অংশ। নম্বর ১+৩+২। উত্তরের সীমা নির্দেশ করা আছে।

প্রথম অংশের উত্তর দুটি বাক্যের বেশি হবে না। দ্বিতীয়টি চার (কবিতার ক্ষেত্রে) থেকে পাঁচটি বাক্যের (গদ্যের ক্ষেত্রে) মধ্যে এবং তৃতীয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে সীমিত থাকবে—এইরকম নির্দেশ দেওয়া থাকে। প্রশ্নের তিনটি অংশ যখন, প্রতিটি উত্তর পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে লিখবে। মনে রেখো, উত্তর জানলেই শুধু চলবে না। সেই জানাটুকু সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গুছিয়ে লিখতে হবে। তাহলে ভাল নম্বর পাবে।

প্রথম চারটি পাঠ্যগ্রন্থের (Text-book) প্রশ্ন। তারপর গ্রামার কম্পোজিশনের প্রশ্ন। এখানে আর গ্রুপ নেই। অর্থাৎ পুরনো সিলেবাস নতুন সিলেবাসের ব্যাপার নেই। সকলকেই একই প্রশ্ন থেকে উত্তর করতে হবে। গ্রামারে ১৫ নম্বর এবং পাঁচ নম্বর প্রশ্নে গ্রামার। প্রশ্নে পাঁচটি ভাগ আছে। প্রতিটিতে ৩ নম্বর করে। প্রশ্ন 5(a): শূন্য স্থান পূরণ। লক্ষ করবে আর্টিকল ও প্রিপোজিশন প্রয়োগের পরীক্ষা। উত্তরের সময় পুরো বাক্যটি লিখবে এবং শূন্যস্থানে যেখানে আর্টিকল/প্রিপোজিশন বসালে তার নীচে দাগ দেবে। অন্য অংশগুলির উত্তর অনুরূপভাবে নির্দেশ অনুসারে লিখবে।

ছয় নম্বর প্রশ্ন ট্রান্সলেশন। দুটি প্যাসেজ। নম্বর ৭+৮ = ১৫। অনুবাদ একেবারে আক্ষরিক হবে না কিন্তু। প্রয়োজন মনে করলে বাংলা একটি বাক্যের অনুবাদ ইংরেজিতে দুটি বাক্যে করতে পারো। অর্থ বুঝে বাংলার ইংরেজি প্রতিশব্দ বসাবে। যেমন ধরো, দ্বিতীয় প্যাসেজটিতে জাহাজে যাত্রার কথা আছে। জাহাজের ছাতের ইংরেজি roof লিখলে হবে না। তেমনি জাহাজের মধ্যে নিজের 'ঘরে' শুয়ে পড়ার কথা আছে যেখানে, ঘরের প্রতিশব্দ room বললে ঠিক হবে না। cabin বলতে হবে।

শেষ প্রশ্ন সাত নম্বরের। যেমন ট্রান্সলেশন তেমনি এখানেও ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজির বিদ্যা ভালভাবে পরীক্ষার সুযোগ আছে। **প্যারাগ্রাফ, লেটার, সামারি** (নম্বর ১০+৮+৭) এগুলি সংক্ষিপ্ত **রচনাত্মক প্রশ্ন।** ভাল ছেলেমেয়েদের আসল মূল্যায়ন এখানে হবে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজস্ব রচনাশৈলী প্রকাশের অবকাশ এখানে আছে। প্যারাগ্রাফ রাইটিং তো রচনাই বলতে পারো। বিষয়টি হয়তো এমন পেলে, যেটি তুমি মুখস্থ করে রেখেছ কিন্তু মামুলি মুখস্থবিদ্যায় ভাল নম্বর ওঠে না। তোমার নিজস্ব রচনাক্ষমতা বেশি সমাদৃত হবে। লেটার রাইটিং-এ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করি, লেটারের ফর্ম সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের তেমন ধারণা হয়নি। লেটারে ৮ নম্বরের মধ্যে ফর্মে ২ এবং বিষয়বস্তুর জন্য ৬ নম্বর। নম্বর অবশ্য দুটো মিলিয়ে একসঙ্গে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত চিঠি (মা-বাবা/ভাইবোন/বন্ধুকে), অফিসিয়াল চিঠি, স্কুলের প্রধানশিক্ষকের কাছে ছাত্রের চিঠি—এগুলোর ফর্ম (সম্বোধন থেকে নিজের নাম স্বাক্ষরের আগে যা লিখতে হয়) সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। ফলে ভুল হয়। অথচ একবার ঠিকমতো শিখিয়ে দিলে ভুল হবার কথা নয়। এ বিষয়ে একটু সচেতন হয়ে মাস্টারমশায়দের কাছে জেনে নেবে ভাল করে। সামারি রাইটিং-এর সময়ে ইংরেজির দৈন্য বিশেষভাবে প্রকট হয়। প্যাসেজটি খুব ভালভাবে কয়েকবার পড়বে। মূল প্যাসেজটির প্রথম দিকের কিছু অংশ, মধ্যের কিছু এবং শেষের দিকের কিছু অংশ তুলে দিলেই সামারি হয় না। প্যাসেজের ভাবটি তোমাকে নিজের কথায় সংক্ষেপে সুন্দর করে লিখতে হবে। বাড়িতে অবশ্যই অভ্যাস করতে হবে।

সাত নম্বর প্রশ্নের শেষের অংশটি বিষয়বোধের পরীক্ষা (কম্প্রিহেনশন টেস্ট)। অনেকগুলি বিকল্প উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর বেছে নিতে হবে। প্যাসেজটি ঠিকমতো বুঝতে না পারলে উত্তর ঠিক হবে না। সুতরাং ভাল করে বার-বার পড়তে হবে। তারপর উত্তর লিখবে। (a) ii, (b) ii, (c) iii, (d) iii, (e) ii এ-রকম না লিখে প্রতিটি উত্তর পূর্ণ বাক্যে লিখবে। তাহলে পুরো নম্বর উঠবে।

বানান-ভুল সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হবে। এটা কিন্তু মামুলি উপদেশ নয়। সাধারণ বানান ভুল হলে ক্ষমা করা যায় না। যেমন ধরো truly, genius ইত্যাদি বানান। লেটারে নাম-স্বাক্ষরের আগে yours লিখতে গিয়ে your's লিখলে মারাত্মক ভুল হবে।

এতক্ষণ যে-সব কথা তোমাদের বললাম, অনেকেই তোমরা তা জানো। তবু তো ভুল কর। তাই আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম। সব-শেষে সময়মতো সমস্ত উত্তরপত্রটি রিভাইজ করবে। এটা কিন্তু বিশেষ জরুরি। ইংরেজি পরিভাষায় যাকে বলে 'মাস্ট'। দেখবে, উত্তর লেখার সময় তাড়াতাড়িতে যে-সব ভুলত্রুটি ঘটেছিল সেগুলির সংশোধন করতে পারবে। শেষে আবার প্রশ্নপত্রের গোড়ায় বাঁকা হরফে যে নির্দেশ দেওয়া আছে সেদিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ। সুতরাং কীভাবে লিখতে হবে এবং কী ও কতটুকু লিখতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা যত পরিষ্কার হবে লেখার গুণগত মান তত ভাল হবে। পরীক্ষায় নম্বর সেই অনুপাতে বেশি উঠবে।

সংস্কৃতের হেড-এগজামিনার বলছেন

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম চালু হবার পর ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের বয়স চার বছর পূর্ণ হল। সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক হিসাবে এই চার বছর যুক্ত থাকার সুবাদে সংস্কৃতে ছাত্ররা কীভাবে বেশি নম্বর পেতে পারে সে-সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

Language Group বা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতের স্থান তৃতীয় হলেও অন্য দুটির চাইতে সংস্কৃতে নম্বর তোলার সুযোগ অনেক বেশি। অবশ্য এক্ষেত্রে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম খানিকটা মনোযোগের সঙ্গে পালন করতে হয়। নির্ধারিত পাঠ্যসূচীতে একটু-আধটু অদল-বদল হলেও প্রশ্ন করার ধরনে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। প্রশ্ন করা হয় নির্ধারিত পাঠ্য-তালিকা থেকে এবং ব্যাকরণের সাধারণ জ্ঞান থেকে। পাঠ্যসূচী থেকে যে অংশ অনুবাদ করতে দেওয়া হয়, তার প্রতিটি পদের সমাস ও সন্ধি ভেঙে ভেঙে অর্থ জেনে অনুবাদ করতে হবে। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা প্রাতিপদিক রূপ জেনে নিলে দুটো সুবিধা হয়—প্রথমত, অর্থ জানা থাকায় অনুবাদ নির্ভুল হবে এবং দ্বিতীয়ত, পাঠ্যাংশ থেকে যে ব্যাকরণগত প্রশ্ন থাকে তাতেও কোন ভুল হবে না। আর অনুবাদের ভাষা ভাল অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ হলে এবং বানানভুল না থাকলে পুরো নম্বর না দিয়ে পরীক্ষকের উপায় থাকে না।

পাঠ্যপুস্তক অর্থাৎ সূক্তি রত্নাবলী থেকে দুটি শ্লোক মুখস্থ লিখতে বলা হয়। সূক্তি রত্নাবলীর শ্লোকগুলি এমনিতেই খুব সুন্দর। সেগুলির অর্থ জানা থাকলে মুখস্থ না হওয়ার

কোনো কারণ নেই। এক্ষেত্রে পুরো নম্বর পাওয়ার উপায় হল শ্লোকগুলির সন্ধি না ভেঙে অনুস্বর-বিসর্গ সহ ভাল করে মুখস্থ করতে হবে, তারপর বই বন্ধ করে খাতায় লিখে বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। কয়েকদিন এইভাবে চেষ্টা করলেই সুফল আসতে বাধ্য।

পাঠ্যপুস্তকের গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে। পাঠ্যপুস্তক পড়া থাকলে এ-সবের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে যে, প্রশ্নগুলি যেমন ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, উত্তরগুলিও তেমনি ভাগ ভাগ করে লেখা হচ্ছে কি-না। আরও একটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে, 'কে' বা 'কাকে প্রশ্নের উত্তর অমুক বা অমুককে লিখলে উত্তর ঠিক হলেও নম্বর কিন্তু পুরো দেওয়া হবে না, পুরো নম্বর পেতে হলে প্রসঙ্গটি অর্থাৎ 'অমুক' ব্যক্তি কোন্ গল্পের কে, তার বিশেষ পরিচয় ইত্যাদির উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে।

সংস্কৃত ভাষায় যে প্রশ্নোত্তর চাওয়া হয়, যাকে আমরা 'comprehension test' বলি, সে সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হল এই যে, যেহেতু প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত অতএব গল্পগুলি পরীক্ষার্থীদের কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। সুতরাং, জানা বিষয়ে উত্তর লেখা সহজ এবং উত্তরগুলি প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত থাকে। সুতরাং, এইরকম প্রশ্নে পুরো নম্বর পেতে হলে প্রশ্নগুলির উত্তর এক-একটি সম্পূর্ণ বাক্যে লিখতে হবে। বাক্য গঠনের রীতি (Syntax) ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কি না লক্ষ রেখে অর্থাৎ কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ যথাস্থানে বসিয়ে বাক্য গঠন করতে হবে।

ব্যাখ্যা লেখার প্রশ্নে নম্বর বাড়াতে হলে সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখতে হবে। 'সপ্রসঙ্গ' বলতে বোঝায় লেখক ও তাঁর রচনার নাম ও কোন্ প্রসঙ্গে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত অংশটি এসেছে তা প্রথমে লিখে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

সাধারণ ব্যাকরণগত প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে প্রথম কথাই হল যে, ধাতুরূপ, শব্দরূপ, সন্ধি, অব্যয় প্রভৃতি ভালভাবে বাড়িতে মুখস্থ করতে হবে। সন্ধিযুক্ত পদটিতে অথবা ধাতুরূপ, শব্দরূপের অনুস্বর বিসর্গ সম্পর্কে সচেতন থাকলে পুরো নম্বরই পাওয়া যায়। সমাসের নামগুলির বানান এবং কারক-বিভক্তির সূত্রগুলি যাতে নির্ভুল হয়, সে বিষয়েও মনোযোগী হতে হবে। অব্যয় পদগুলি পুরো একটি বাক্যে যথাযথ প্রয়োগ এবং যুগ্ম শব্দ দুটিকে পৃথক পৃথক বাক্যে সার্থক প্রয়োগ পূর্ণ নম্বর আনতে সাহায্য করে। বাচ্যান্তরের অতি-অবশ্য প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল করতে হলে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে বাড়িতে কয়েকদিন অভ্যাস করতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে পুরো নম্বর পেতে অসুবিধা হবে না।

প্রশ্নপত্রে অনুবাদ দেওয়া হয় দু' ধরনের—একটি সংস্কৃত থেকে মাতৃভাষায়, অপরটি মাতৃভাষা থেকে সংস্কৃতে। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিশেষ বক্তব্য হল এই যে, বাক্যগুলি বারংবার পড়ে প্রথমেই সমাপিকা ক্রিয়াপদ খুঁজে বার করা। তারপর তার কর্তা, কর্ম ঠিক করে নিলে বাক্যার্থ বোঝা সহজ হয়ে যায়। তখন তাকে সাজিয়ে শুদ্ধ বাংলায় অনুবাদ করলেই পুরো নম্বর পাওয়া যাবে। মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের ক্ষেত্রে বক্তব্য হল এই যে, শুদ্ধ বাংলা লিখে তাতে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া অনুযায়ী সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের ব্যবহার করতে হবে। এর উপর কর্তা ও ক্রিয়াপদে যাতে পুরুষ ও বচনের মধ্যে ঐক্য থাকে এবং বিশেষ্য-বিশেষণে যাতে লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তিগত ঐক্য থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। ক্রিয়ার কাল সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। বড় বড় বাক্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে প্রকাশ করা যেতে পারে, তবে সে ব্যাপারে বাক্য যেন নির্ভুল হয় তা দেখতে হবে।

সবশেষে সেই পুরনো বক্তব্য—পরিষ্কার হাতের লেখা আর শুদ্ধ বানান পরীক্ষায় ভাল ফল করার অন্যতম চাবিকাঠি।

গণিতে নম্বর কাটা যায় কেন

রামকৃষ্ণ ঘোষ

আসছে বছর (অর্থাৎ ১৯৮০ সালে) মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার জন্য যারা প্রস্তুত হচ্ছ, বিশেষ করে তাদের উদ্দেশে বলছি :

তোমাদের নিশ্চয়ই একটি প্রশ্ন : গণিতে কী করে বেশি নম্বর পাওয়া যায়? এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটিই— There is no substitute for hard work.

অর্থাৎ পরিশ্রম ছাড়া গণিত কেন, কোনো বিষয়েই ভাল ফল করা যায় না। তবে কীভাবে উত্তর করলে পরীক্ষকরা নম্বর কাটতে পারবেন না সে-সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলছি শোনো।

১। লেখাটি ঝকঝকে হলে পরীক্ষকের মন আদ্ধেক জয় করা যায়। হিজিবিজি লেখা কে আর পড়তে চায় বলো?

২। দুটি বিষয় মনে রেখো—যা লিখেছ তা সঠিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করেছ কি না আর প্রয়োজনানুসারে 'রাফ' কাজ দেখিয়ে দিয়েছ কি না।

৩। প্রতিটি প্রশ্ন খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেবে—এমন দু-একটা শব্দ থাকে প্রশ্নের ভেতর যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরো—

(ক) কয়েকটি জটিল রাশি দেওয়া আছে—বলতে হবে বৃহত্তম রাশিটির মান কত? এখানে 'মান' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ— যে আকারে রাশিটি আছে তা নয়, তার সরলীকৃত মান চাওয়া হয়েছে।

(খ) পর পর কয়েকটি উক্তি দেওয়া আছে—টিক্ (✓) করে নির্দেশ করতে হবে কোন্ কোন্ উক্তি সঠিক নয়— এখানে মনে রাখতে হবে যেগুলো সঠিক সেগুলো টিক্ করতে হবে না, আর একাধিক উক্তিও টিক্ করতে হতে পারে।

৪। বীজগণিতের সাহায্যে সমীকরণ তৈরি করে যদি কোনো প্রশ্নের সমাধান করতে হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দু-একটি সমাধান বর্জন করতে হতে পারে—কেন ঐ সমাধান গ্রহণযোগ্য হল না তার সঠিক কারণ তোমাকে বলতে হবে; তা না হলে নম্বর কাটা যাবে।

৫। সবচেয়ে গোলমালের উত্তর পাওয়া যায় অসমীকরণের প্রশ্নটিতে। মনে রেখো, অসমীকরণটি কোন্ অঞ্চলে সিদ্ধ হবে সেই অঞ্চলটি স্পষ্ট করে শেডিং করে দেখাতে হয়। দুটি অসমীকরণ দেওয়া থাকলে উভয় অসমীকরণই যে অঞ্চলে সিদ্ধ হবে সেই সাধারণ অঞ্চলটি স্পষ্ট করে লেখচিত্রে দেখিয়ে দেবে- আরও ভাল হয়, যদি কথায়ও সেটা প্রকাশ করে দাও।

৬। জ্যামিতির প্রশ্নের উত্তরগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক হয় না। গণিতের অন্যান্য অংশে ভাল নম্বর উঠলেও দেখা যায় জ্যামিতির জন্য খুব বেশি নম্বর ওঠে না। তার প্রধান কারণ সংহতিপূর্ণ যুক্তির অভাব। উপপাদ্য মুখস্থ করে নম্বর পাওয়ার দিন আর নেই।

মনে করো, দুটি ত্রিভুজের সর্বসমতা দেখাতে হবে। দেখা গেল যে ত্রিভুজ দুটিতে একটি করে কোণ সমকোণ আর দুটি বাহুও পরস্পর সমান। এখন দেখতে হবে সর্বসমতা হবে কোন্ সূত্র অনুসারে? বাহু—কোণ—বাহু অথবা সমকোণ—অতিভুজ—বাহু, এই সূত্র দুটির ভেতর কোন্‌টি প্রযোজ্য? যে সূত্রটি প্রযোজ্য তা কেন প্রযোজ্য হল তার সঠিক যুক্তি না দিলে **কোনো নম্বরই পাবে না।**

অঙ্কনের প্রশ্নগুলিতে প্রতিটি স্টেপে (যেমন লম্বদ্বিখণ্ডিত করা বা সমান্তরাল অঙ্কন করা) অঙ্কন-চিহ্ন আছে কি না তা খুঁটিয়ে দেখা হয়। বহু ছাত্র-ছাত্রী এই প্রশ্নটিতে নম্বর কম পায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চিত্র না আঁকলে নম্বর পাওয়া যায় না।

তোমার জ্যামিতির জ্ঞান যাচাই করা হবে যেসব 'রাইডার' দেওয়া হয় তার প্রমাণের ধরন দেখে। উপপাদ্যের সিদ্ধান্তগুলো ব্যবহার করতে হবে অত্যন্ত সাবধানে, যেন যুক্তির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। যারা ভাল পরীক্ষা দিয়েও আশানুরূপ নম্বর পায় না তাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জ্যামিতির প্রশ্নগুলিতে সঠিক যুক্তির অভাব লক্ষ করা যায়। জ্যামিতির উপর নজর না দিলে ভাল নম্বর উঠবে না।

কী ভাবে গণিতে ভাল করা যায়

ধীরেন্দ্ররঞ্জন ভট্টাচার্য

প্রক্রিয়া-পদ্ধতি আর মূলগত তত্ত্বগুলো ভাল করে জানলেই অঙ্কে ছাঁকা নম্বর তোলা যায়। এসব মোটামুটি জেনেও অনেকে ভাল করে না, তার কারণ তারা অসতর্ক, তাদের উত্তর লেখায় ছোট-বড় নানান ত্রুটি। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরিখেই আলোচনা করছি।

এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রথম অংশ বস্তুভিত্তিক। এতে পাটীগণিতের যে দু-একটা প্রশ্ন থাকে, তার ভিত্তি হল মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে। এ ব্যাপারে তৈরি হতে গেলে, প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, অঙ্কে-লেখা সংখ্যাগুলো হল কথার ভাষায় বিশেষ্যস্থানীয় ও প্রক্রিয়া-চিহ্নগুলো সূচিত করে ক্রিয়াপদ। উদাহরণ দিয়ে বলছি। লক্ষ কর :

(1) $15 \div 5 \times 3$—এর মধ্যে 15, 5 এবং 3 হচ্ছে বিশেষ্য-স্থানীয়। ভাগ ও গুণ চিহ্ন দুটি সূচিত করছে যথাক্রমে 'ভাগ করো' ও 'গুণ করো'—এই দুটি ক্রিয়াপদ। কথার ভাষায় তাই $15 \div 5 \times 3$-এর মানে হল : 15-কে 5 দিয়ে ভাগ করে 3 দিয়ে গুণ করো। তাহলে দাঁড়ায়,

$$15 \div 5 \times 3 = 3 \times 3 = 9$$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে **গণিতের ভাষায় পাশাপাশি দুটি ক্রিয়াপদ থাকলে প্রথমটি অসমাপিকা হয়ে যায়।** এখানে ভাগ করো (÷) এবং গুণ করো (×) বলতে বোঝাচ্ছে 'ভাগ করে গুণ করো'—অর্থাৎ প্রথম ক্রিয়াপদটি হয়ে যাচ্ছে অসমাপিকা।

(2) $3 \times 15 \div 5$—এই গণিত-ভাষা তাহলে কথার ভাষায় দাঁড়াবে 3-কে 15 দিয়ে গুণ করে 5 দিয়ে ভাগ করো। তাতে হবে—

$$3 \times 15 \div 5 = 45 \div 5 = 9$$

(3) $15 \div 5 \div 3$ —এর মধ্যেও দুটি ক্রিয়াপদ যার প্রথমটিকে অসমাপিকা ধরে কথার ভাষায় লেখা যায়, 15-কে 5 দিয়ে ভাগ করে 3 দিয়ে ভাগ করো। দাঁড়াবে তাহলে,

$$15 \div 5 \div 3 = 3 \div 3 = 1$$

(4) $15 \div 5$ এর 3—এর মধ্যে কিন্তু একটি মাত্র ক্রিয়াপদ এবং তা হল 'ভাগ করো' (÷)। 'এর' কথাটি ক্রিয়াপদ নয় এবং তা দিয়ে যুক্ত 5 এর 3—একটি অবিচ্ছেদ্য বিশেষ্য শব্দ সূচিত করে। '5 এর 3' মানে 15; 'এর' শব্দাংশটি দিয়ে গুণ বা অংশ বোঝানো হয়।

সুতরাং, $15 \div 5$ এর $3 = 15 \div 15 = 1$

গণিতের ভাষায় +, –, x এবং ÷ যথাক্রমে 'যোগ করো', 'বিয়োগ করো', 'গুণ করো' এবং 'ভাগ করো'—এই চারটি ক্রিয়াপদ সূচিত করে।

প্রক্রিয়া-চিহ্ন সম্বন্ধে যা বললাম তার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। উপরের উদাহরণগুলো থেকে বেশ কয়েকটি বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন হতে পারে। তা ছাড়া গণিতের সর্বত্র প্রক্রিয়া-চিহ্নগুলোর সঠিক তাৎপর্য জানা অপরিহার্য।

পাটীগণিতের প্রশ্নে ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ প্রভৃতির নিয়মগুলো ভাল করে বুঝে রাখা দরকার। ভগ্নাংশের মধ্যে, প্রকৃত, অপ্রকৃত ও জটিল—এই তিনটির উপর সাধারণ চারটি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ জানতে হবে ভাল করে। এবার জটিল-ভগ্নাংশের উপর তিনটে প্রশ্ন এসেছে, সামনের বার হয়তো আসবে দশমিক ভগ্নাংশের উপর। ভগ্নাংশ থেকে দশমিকে, দশমিক থেকে ভগ্নাংশে রূপান্তর এবং দশমিকের চারটি প্রক্রিয়ার অভ্যাস হয় নিচের শ্রেণীতে — ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণীর মধ্যে। ওগুলো আবার ঝালিয়ে নিতে হবে। পাটীগণিতের অন্যান্য প্রশ্ন আসবে শতকরা হিসেব, সুদ-কষা, লাভ-ক্ষতি এবং অনুপাত-সমানুপাত সম্বন্ধে। প্রথম তিনটি বিষয়ে ভাল করতে গেলে, শতকরা হিসেব শিখতে হবে একটু ধৈর্যের সঙ্গে। ভগ্নাংশ থেকে সরাসরি শতকরা হারে এবং শতকরা হার থেকে সরাসরি কীভাবে ভগ্নাংশে আসা যায়—এই সহজ ব্যাপারটায় অনেকেই মাথা দেয় না। অথচ ওটা রপ্ত করলে, শতকরা হিসেব, সুদ-কষা ও লাভ-ক্ষতির অঙ্ক নির্ভুলভাবে কষা যায়। এই তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন বীজগণিতের সাহায্যে সমাধান করাও সহজ। ঐকিক নিয়মেই বরং বেশি ঘোর-প্যাঁচ এবং তাতে ভুলও হয় বেশি। অনুপাত-সমানুপাতের প্রশ্ন অবশ্যই বেশ খানিকটা জটিল। এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও অভ্যেস ছাড়া অন্য কোনো সহজ নিদান নির্দেশ করা যায় না।

বীজগণিতের ব্যাপারে প্রথমেই জানা দরকার (১) ঋণাত্মক সংখ্যার অর্থ, (২) গুণ ও ভাগ সম্বন্ধে সূচক নিয়ম, (৩) বিনিময়, সাহচর্য ও বিচ্ছেদ নিয়ম, এবং (৪) বন্ধনীর প্রয়োগ ও মোচন সম্বন্ধে নিয়ম-কয়টি। বস্তুভিত্তিক অংশে এইগুলোর উপরই প্রশ্ন থাকে।

তারপর আসছে সূত্রাবলীর প্রয়োগ, উৎপাদক-বিশ্লেষণ এবং ল. সা. গু. ও গ. সা. গু. নির্ণয় সংক্রান্ত প্রশ্ন। দেখা যায়, অনেকে সূত্রগুলোই মন দিয়ে শেখে না। লেখে $(a+b)^2 = a^2+b^2$ বা ওই ধরনের কিছু। ফলে গোড়ায় গলদের খেসারত দিতে হয় অনেককেই। উৎপাদক বিশ্লেষণের ব্যাপারে পাঠ্যক্রমবহির্ভূত আজেবাজে প্রক্রিয়ায় মাথা গলানো বৃথা। জানা দরকার (i) $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$—এই সূত্রটির সাহায্যে বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, (ii) মধ্যপদ ভেঙে উৎপাদক নির্ণয়ের নিয়ম, (iii) $a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$ — এই সূত্রটির প্রয়োগে বা $a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ — এই সূত্রের প্রয়োগে উৎপাদক-বিশ্লেষণ এবং (iv) সুবিধামত সংঘবদ্ধ করে সাধারণ উৎপাদক বেছে নিয়ে উৎপাদক নির্ণয়ের পদ্ধতি। এই কটি নিয়ম জানলে ল. সা. গু. ও গ. সা. গু. বার করার কাজও প্রায় সবটাই হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, তিনটে রাশিমালাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে যেন এ-রকম দাঁড়ায় :

$a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$

$a^2b-ab^2+b^3 = b(a^2-ab+b^2)$

এবং $a^4+a^2b^2+b^4 = (a^2+b^2)^2-a^2b^2$

$= (a^2+b^2+ab)(a^2+b^2-ab)$

এখানে একটিমাত্র সাধারণ উৎপাদক, সেটি হল (a^2-ab+b^2), কাজেই ওটিই গ. সা. গু.। কিন্তু ল. সা. গু. হবে এখানে $b(a+b)(a^2-ab+b^2)(a^2+ab+b^2)$

সরল সমীকরণের ব্যাপারে গোল বাধে যখন আক্ষরিক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। এ-সম্বন্ধে একটু অভ্যেস করা দরকার। দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান এই স্তরে উৎপাদক বিশ্লেষণ করেই করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে একটি অজ্ঞাত রাশিসংবলিত প্রত্যেকটি দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ নির্ণয় করতে হবে। একটি দিলে চলবে না।

লেখ-অঙ্কনের বেলায় লিখে বলতে হবে :

(i) কোন্ দুটো অক্ষ এবং কোন্‌টা মূল বিন্দু, (ii) ছক-কাগজের ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্যের কত গুণকে একক ধরা হয়েছে। (iii) দিতে হবে অজ্ঞাত রাশি দুইটির অর্থাৎ x ও y-এর অনুরূপ মানের একটি তালিকা। তারপর (iv) x ও y-এর অনুরূপ প্রতিটি যুগলমান-সূচিত বিন্দুগুলো স্থাপন করার কথা লিখে বলতে হবে। তারপর (v) ঐভাবে স্থাপিত অন্তত তিনটি বিন্দুকে একটি সন্তত রেখায় আলতো করে যোগ করে দুদিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। (vi) সবার শেষে ঐ রেখার যে-কোনো একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যে প্রদত্ত সমীকরণে সিদ্ধ হয় তা দেখিয়ে বলতে হবে ঐ রেখাটিই নির্ণেয় লেখ। পুরো নম্বর পেতে গেলে এসব ঠিক-ঠিক লিখতেই হবে।

অসমীকরণের বেলায় শুধু লেখ-অঙ্কনের কাজেই পাঠ্যক্রম সীমাবদ্ধ। মনে রাখতে হবে, অসমীকরণের লেখ একটি অঞ্চল নির্দেশ করে, আর সমীকরণের লেখ নির্দেশ করে একটি রেখা। কাজেই অঞ্চলটিকে শেড দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।

এবার আসছে জ্যামিতির কথা। এ ব্যাপারে দেখা যায়, না বুঝে মুখস্থ করার একটা ঝোঁক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$-এর সর্বসমতা সম্বন্ধে একটা উপপাদ্য যে শিখেছে তাকে যদি ত্রিভুজ দুটোর নাম বদলে $\triangle PQR$ ও $\triangle ABC$ করে দিয়ে সেইটেই লিখতে বলা হয়, তবেই ল্যাঠা। কাজেই জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্থ করা বৃথা। বুঝে বুঝে লিখে লিখে যুক্তির ধাপগুলো আয়ত্ত করতে হবে এবং সেই-ভাবেই রীতিসিদ্ধভাবে উত্তর লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, উপপাদ্য লেখার সময় (i) সাধারণ নির্বাচন, (ii) বিশেষ নির্বাচন, (iii) অঙ্কন ও (iv) প্রমাণ—এই চারটি অংশে সাজাতে হবে উত্তর।

ছবির মজা

এই ছবির মধ্যে দুটি গল্পের বই লুকোনো আছে। তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে বলো, বই দুটি সে খুঁজে বার করুক।
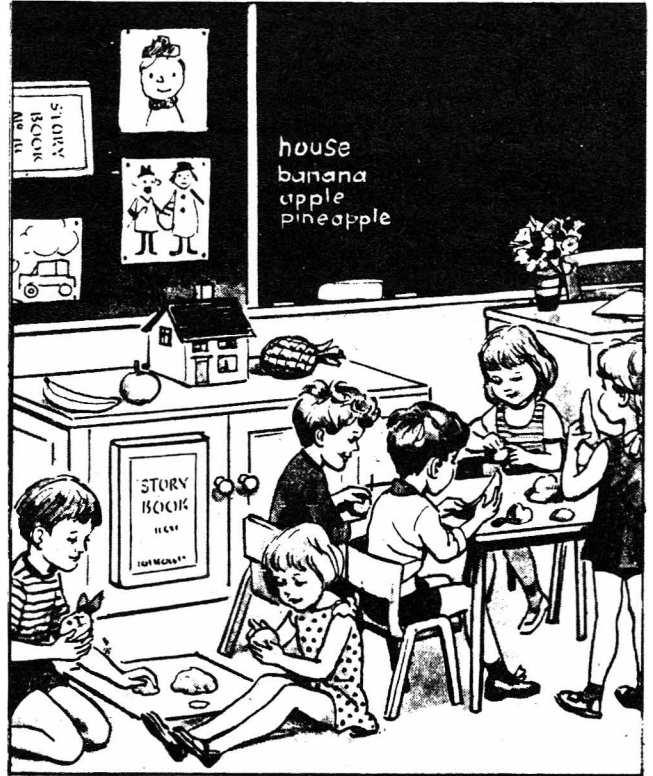
এই ছবির মধ্যেও দুটি গল্পের বই লুকোনো আছে। তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোন যদি এই দুটি বইও খুঁজে বার করতে পারে তবে তাকে একটা লজেন্স দাও।
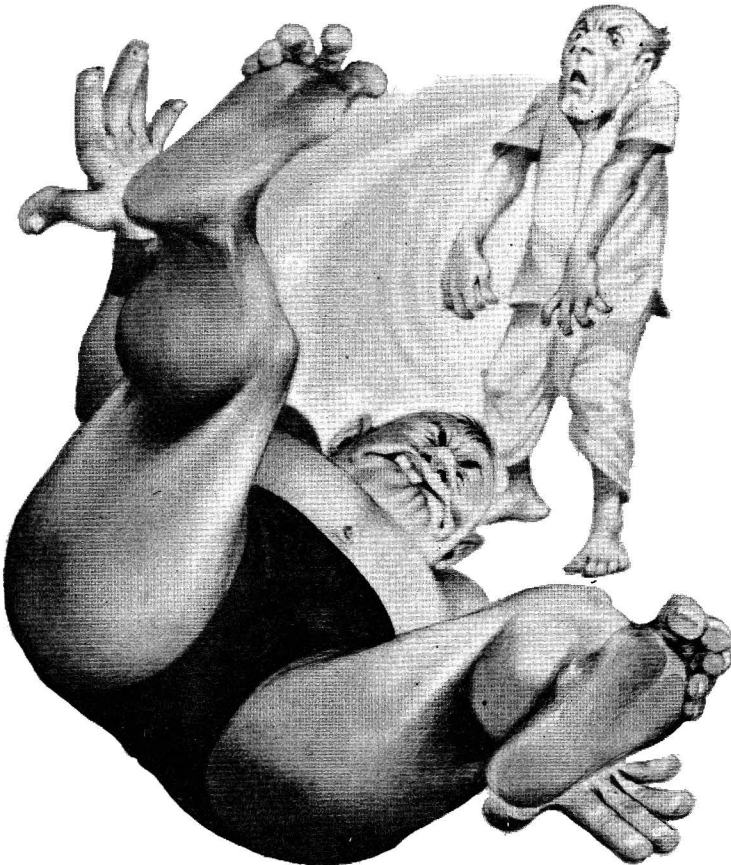
ওই যে দেখছ ছোকরাকে, খুব
হট্টাকট্টা তাগড়া,
রোজ গিয়ে ও কুস্তি লড়ত
কেষ্ট ঘোষের আখড়ায়।
সেই দেমাকেই শোনাচ্ছিল
লম্বাচওড়া বাক্য
হারানচন্দ্র দত্তকে, তাঁর
মাসতুতো ভাই সাক্ষী।

হারানচন্দ্র প্রৌঢ় মানুষ
বয়স তা পঞ্চান্ন
শুদ্ধাচারী দুগ্ধাহারী,
সবাই করে মান্য।
ছোকরা তাঁকে বলছিল যে,
শক্তিবৃদ্ধি করতে
দুগ্ধপোষ্য লোকগুলোকে
মাংস হবে ধরতে।

হারান করেন হাস্য। বলেন
"দুর্বিনীত ছোকরা,
দুগ্ধতত্ত্বে অজ্ঞ বড়ই
মাংসখেকো লোকরা।
যাক্ গে, আমি সে-সব কথা
বলতে চাই না বারবার,
বরং তোমায় শূন্যে তুলে
আছ্ড়ে দিচ্ছি চারবার।"

দুগ্ধপোষ্য মাংসখেকো

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পয়লা আছাড় যেই দিয়েছেন,
ছোকরা কপাল চাপ্ড়ে
ডুকরে বলে, "গেলুম, গেলুম,
মাপ করে দিন, বাপ রে!
আপনি মহৎ ব্যক্তি, আমি
আলাপ করেই মুগ্ধ,
দিচ্ছি কথা, এখন থেকে
নিত্য খাব দুগ্ধ।"

হারান বলেন, "মাংসে শুধুই
মাংসবৃদ্ধি, কলুজে
শক্ত হবে দুগ্ধ খেলে,
দুগ্ধে বৃদ্ধি বল যে।"
ছোকরাটি কয়, "ঠিক মহাশয়,
এ-সত্যে সংশয় কার,
মলছি আমি কর্ণ, বলছি—
দুগ্ধেরই জয়জয়কার!"

ছবি বিমল দাস

ওদের কথা মনে রেখো

ওরাও তো তোমাদের মতই। তোমাদের মতই যত্ন-ভালবাসা-খাদ্য-আশ্রয়-শিক্ষা—মানুষের বাঁচার অধিকার নিয়েই ওরা জন্মেছে। তবু ওরা বলতে গেলে কিছুই পায় না। কেউ রাস্তায় কাগজ কুড়োয়, কেউ বা ভাবে কবে বাবার মত রিক্সা টেনে, বা কোনো ভাগ্যবানের গাড়ী ধুয়ে মুছে অথবা মায়ের মত পরের বাড়ী বাসন মেজে দু'চারটে পয়সা আনবে কোনমতে টিঁকে থাকার জন্য।

এখন তোমরা ওদের অবস্থা যাদুমন্ত্রে বদলে দিতে পার না জানি, কিন্তু এও জানি তোমরা ওদের কাছে ডেকে নিতে পার, ওদের দুঃখের ভাগ নিতে পার, ভালোবাসতে পার—সেও তো কিছু কম নয়।

আর ওদের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেদের এমন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পার যে বড় হয়ে দেশ-সমাজকে তোমরা এমন ভাবে বদলে দেবে, যেখানে কোন শিশুই অবহেলিত-বঞ্চিত হয়ে থাকবে না, সবাই পাবে পর্য্যাপ্ত খাদ্য-আশ্রয়-স্নেহ-শিক্ষা-সমাদর।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিসঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

হেড অফিস : ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

চেয়ারম্যান— জে, এন, বিশ্বাস

Progressive—UIB—69/79

ANANDAMELA PUJA NUMBER 1979
Regd. No. WB|CC-264